আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ | ১ম সংখ্যা

সূচনা

সুদীর্ঘ দুই বৎসর বিশ্রাম লাভের পর আবার আমি আয়ুর্ব্বেদের সেবায় মনোভিনিবেশ করিলাম "আয়ুর্ব্বেদে"র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন স্বর্গীয় কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায়। সন ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমারই উপর উহার সম্পাদনের ভার নিহিত ছিল। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাস— অষ্টম বর্ষ পর্য্যন্ত আমি উহা সম্পাদন করার পর নানা কারণে কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়।

কাগজ খানির সম্পাদন ভিন্ন উহার পরিচালন কার্য্যেও সুদীর্ঘ কাল আমাকে বড় কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই, এক কথায় বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহু বিঘ্ন সত্ত্বেও কাগজ খানিকে বহুদিন পর্য্যন্ত আমিই জীবিত রাখিয়াছিলাম

কাগজখানির জীবিত অবস্থায় উহার গ্রাহক এবং পাঠক সংখ্যা নিতান্ত কম না থাকিলেও নানা কারণে কাগজখানি উঠিয়া গিয়াছিল। ফলে উহা বন্ধ হওয়ার পর দেশের লোকে উহার অভাব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে প্রতি দিনই রাশি রাশি চিঠি পাইতে লাগিলাম, কেহ লিখিতেছেন— "ভিঃ পিঃ করিয়া টাকা গ্রহণ করুন।" কেহ লিখিতেছেন, —"আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করুন," কেহ লিখিতেছেন, --"নমুনা পাঠান"--ইত্যাদি। বাঙ্গলা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত কাগজ কেবল "আয়ুর্ব্বেদ"ই ছিল, সেখানি উঠিয়া যাওয়ার পর আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় কাগজের নাম বাঙ্গলা হইতে বিলুপ্ত হইল।

আয়ুর্ব্বেদ বলিতে যে শুধু রোগের চিকিৎসাই বুঝায়— এমন নহে, আয়ুর্ব্বেদ শব্দের অর্থ -

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আয়ুর হিত এবং অহিত, ব্যাধির নিদান এবং প্রশমনের উপায় বর্ণিত থাকে, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুস শব্দের অর্থ জীবিত কাল। এই জীবিত কালে সদাচারী হইয়া আয়ুর হিতজনক কার্য্য করিলে রোগ হইতে পারে না। এখনকার মানব যে এত রোগ পীড়িত, নানারূপ আধিব্যাধির তাণ্ডবলীলায় বাঙ্গলা দেশ যে অধুনা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, আয়ুর অহিতাচারী সকল কর্ম্ম করাই যে তাহার প্রধান কারণ—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। হিন্দু যে ধর্ম্মের নামে কাঁপিয়া থাকে, স্বধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য হিন্দুর প্রাণ যে সর্ব্বদাই

আগ্রাবিত, বার-ব্রত পালন, তিথি নক্ষত্রের বাচ বিচার, হিন্দুর ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ করণীয়ের যে ব্যবস্থা আছে, ইহার সকলের সহিতই স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ নিহিত, —গ্রহ বিপর্য্যয়ে এখন অনেকেই তাহা মানিতে চাহেন না, হিন্দুর সংসারে ইহারই জন্য না এত রোগাসুরের প্রাদুর্ভাব,—নিত্য নিত্য নতন নূতন রোগের তাণ্ডব লীলায় বাঙ্গালী ধ্বংস হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে

যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদ বলিলে শুধু চিকিৎসা বিষয়ক না বুঝিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ক বুঝিলেই ঠিক বলা হয়। প্রকৃত কথা, আয়ুর্ব্বেদের চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এক এক খানি অমূল্য বস্তু। কাশীরাম দাস যেমন বলিয়া গিয়াছেন,—"যা' নাই ভারতে—তা' নাই ভারতে" আমরাও সেইরূপ জোর করিয়া বলিতে পারি চিকিৎসা জগতের আদি গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতে প্রত্যেক মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে—বিশদভাবে বিবৃত সত্য কথা বলিতে কি ঐ দুই খানি গ্রন্থরত্ন যদি কেহ আয়ত্ত করিয়া বর্ণে বর্ণে উহার কথা মানিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে আর তাঁহার জীবনে শারীরিক কোন কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নাই। একাধারে স্বাস্থ্য এবং স্বধর্ম্ম রক্ষার এরূপ অপূর্ব্ব পুস্তক এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয় নাই

যাহা হউক 'কলিকাতা বুক ডিপো'র সাহায্য লইয়া "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" নামে আবার আমি আয়ুর্ব্বেদের কাগজ বাহির করিলাম স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক নানারূপ গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ সকল পূর্ব্ববৎ পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাবার আমি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। আর্থিক লাভ অপেক্ষা রোগপীড়িত স্বদেশবাসী বন্ধুবান্ধবদিগকে রোগাসুরের আক্রমণ হইতে অক্ষত রাখাই আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য বজায় রাখিবার জন্য আমি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিব। "আয়ুর্ব্বেদে"র মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ১৺০ আনা এখনো সেই মূল্যেই ইহা প্রদান করা হইবে, কিন্তু এবারের আকার অনেক বৃদ্ধি করা হইল, তদ্ভিন্ন ছাপা এবং কাগজেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ করা হইল। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় ইহা রক্ষিত হউক, প্রত্যেক বাঙ্গালী ইহার লিখিত প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আপন আপন পরিবারের স্বাস্থ্য সুখ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করুন—ইহাই আমার কামনা,—'আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে'র প্রকাশে অর্থ অপেক্ষা এই টুকু লাভ করিতে পারিলেই আমি ধন্যমন হইতে পারিব

প্রকৃত কথা বলিতে কি, পৃথিবীর বড় দুর্দ্দিন।—সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দিন বাঙ্গালী জাতির। বাঙ্গালীর আগেকার মত বুকে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া দেখ তাহার মুখে এক গভীর কালিমা কোন অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে কে যেন মাখাইয়া দিয়াছে তাপিত বক্ষের সন্তপ্ত নিঃশ্বাস তাহার নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া অলক্ষিতে বাহির হইতেছে গাড়ীর চাকার পড়িতে যাইতেছে—কাশিতেছে, কিন্তু রাশি রাশি পুস্তকের সহিত অবিশ্রান্ত ভাবে দ্বন্দ্ব করিয়া তাহার অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে সে আর উপচক্ষুর সাহায্য ভিন্ন এক বর্ণ পড়িতে পারে না আফিসে কেরাণীকুল নাকে মুখে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন গুঁজিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্মস্থলে গমন করিতেছেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই তাঁহার যে আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে তাঁহার যে অন্তিমকাল নিকট হইয়া পড়িল, একথা তাঁহার ভাবিবার অবকাশ নাই সহরে সুখে থাকিবেন বলিয়া অনেকে সহধর্ম্মিণীকে সহরসঙ্গিনী করিয়া এরূপ কদর্য্য বাসা ভাড়া লইয়াছেন যে আলোক রৌদ্রের অভাবে প্রতি পলে তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে। এতো গেল সহরের কথা, ইহা ভিন্ন পল্লীগ্রামগুলির দুর্দ্দশার কথা মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। ম্যালেরিয়া কলেরা বারমাসই পল্লীগ্রামগুলিকে প্রান্তরভূমি করিয়া তুলিয়াছে পল্লীগ্রামের ছেলেদের দিকে চাহিয়া দেখ—পেটজোড়া পীলা,—পাণ্ডু কামলা মুখ জুড়িয়া তাহার

দারিদ্র্যের জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বলুন তো পাঠক! দেশের দুর্দ্দিন আর কাহাকে বলে? এই দুর্দ্দিনে রোগ বাহুল্যের মত চিকিৎসক বাহুল্যও হইয়াছে বটে, কিন্তু শুধু কি কামনা—রোগই হউক আর চিকিৎসায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করি? এই জন্যই না স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ আবশ্যক। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" সেই অভাব পূরণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবে।

আগে আমাদের দেশে এত রোগও ছিল না, এত ওঝা বা রোজাও ছিলনা রোগের আক্রমণে ওঝা ও রোজার প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু এই চিকিৎসক বৃদ্ধি অপেক্ষা যাহাতে রোগের পরিমাণ দেশ হইতে কমিয়া যায়—তাহা করা কি উচিত নহে? আমরা এই রোগের পরিমাণ কমাইবার জন্য সরকার বাহাদুরকে দোষ দিয়া থাকি, কিন্তু সরকার করিবেন কি? প্রতিকার যে আমাদের নিজেদের হাতে আমরা যদি আবার স্বদেশ—তথা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল যথাযথ মানিয়া চলি, প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যদি আমরা পরিমিত ব্যবহারের অন্যথাচরণ না করি তাহা হইলে সাধ্য কি যে, আমাদিগকে স্বাস্থ্যের দৈন্যজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয়? প্রকৃত কথা বলিতে কি, আমাদের স্বাস্থ্যহানি, আমাদের অকালবার্দ্ধক্য—আমাদের অকালমৃত্যুকে যে আমরাই বরণ করিয়া লইয়াছি—ইহা অতি সত্য কথা। স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচিতে চাও অক্ষত স্বাস্থ্য নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া যদি আবার আগের মত বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপরায়ণ হইতে ইচ্ছা কর,—তাহা হইলে তুমি সে কালের ধর্ম্মবিজড়িত স্বাস্থ্যনীতির সেবা কার্য্যে একেবারে আত্মনিয়োগ কর, দেখিবে তোমার সংসারে আবার পূর্ব্বশান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, রোগ রাক্ষসের তাণ্ডবলীলা যে স্থানে যত প্রকাশিত হয় হউক- তোমার সংসারের সীমানাতেও তাহারা দেখিতে পারিবে না, তুমি চির শান্তি উপভোগ করিবে, তোমারই সংসারে নন্দন কাননের পারিজাত ফুটিয়াছে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিবে।

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে আমরা এ সকল কথারই অধিক করিয়া আলোচনা করিব আমাদের উদ্দেশ্য- রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা আমাদের দেশ হইতে রোগবাহুল্য হ্রাস প্রাপ্ত হউক। যিনি এই বিশ্ব রচনার মূলাধার, যাঁহার পলকে এই বিশাল বিশ্বের সংস্থা ও হইয়া থাকে, সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নির্দিষ্ট নিদান—তাঁহারই চরণে আত্মনিয়োগ করিয়া আবার আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম, গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, স্নেহভাজনদিগের অনুকম্পা এবং সহৃদয় পাঠকবৃন্দের সহানুভূতি পাইলে আবার আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ হইব ইষ্টদেবের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আবার আমি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, স্বদেশভক্ত সাধু ব্যক্তিই আমার সহায়কারী হউন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীসত্যচরণ সেন।

আয়ুর্ব্বেদে নবযুগ

আয়ুর্ব্বেদে যে আবার নবযুগের সাড়া পড়িয়াছে—ইহা অতি সত্য কথা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থগুলি জাগতিক সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাগ্রন্থের মূল ভিত্তি। ইহা দেবতার দান। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ শ্লোক পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা নামে ইহা প্রণয়ন করেন, তাঁহার নিকট হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষপ্রজাপতির নিকট হইতে অশ্বিনী কুমার

হয়, অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের নিকট হইতে দেবরাজ ইন্দ্র ইহা শিক্ষা করেন। ইন্দ্রের নিকট ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষিগণ ইহা আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববাসীর চক্ষে আয়ুর্ব্বেদের অপূর্ব্ব আলোক প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আয়ুর্ব্বেদের আদিগ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত। ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—আড়াই সহস্র বৎসরেরও অধিক-কাল পূর্ব্বে। তখন যাহার যে কোনো ব্যাধিই শরীরে উপস্থিত হউক না কেন, একমাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতেই তাহা নিরাময় হইত। এখন যে অনেকের ধারণা—এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভিন্ন অনেক রোগে সদ্যঃ সুফল পাওয়া যায় না, তখনকার-দিনে সে ধারণা কাহারও ছিল না। সত্য কথা বলিতে কি, ধারণাও ছিল না, উপায়ও ছিল না। চিকিৎসা বলিতে তখন লোকে বুঝিত—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা, চিকিৎসক বলিতে তখন লোকে বুঝিত—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। এই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ভার এক সম্প্রদায়ের উপর নিহিত ছিল বলিয়াই সেকালে "বৈদ্য" বলিয়া একটি জাতিরও পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত সেই ধারণার বশেই বৈদ্য বলিয়া একটি জাতি বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে।

যাক সে কথা, যে সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন বঙ্গবাসীকে—তথা ভারতবাসীকে অন্য চিকিৎসার আশ্রয় হইতে হয় নাই, পক্ষান্তরে বঙ্গবাসী—তথা ভারতবাসী অন্য চিকিৎসার নাম পর্য্যন্ত যৎকালে শ্রবণ করেন নাই, তখন শুধু কায়চিকিৎসা নহে, শস্ত্র চিকিৎসাও করিতেন এই বৈদ্যেরা। চরক—কায়চিকিৎসাপ্রধান গ্রন্থ হইলেও বিশ্বামিত্র পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতা শস্ত্র চিকিৎসাপ্রধান অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এখনকার পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে শস্ত্রকর্ম্মে অনভিজ্ঞ বলিলে কি হইবে,—মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতায় কিন্তু তাঁহাদের এনাটমী ও সার্জ্জারির কথা অতি সুন্দর ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন—সুশ্রুতসংহিতায় শবব্যবচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিবৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদে যে এনাটমী ও সার্জ্জারির চিকিৎসা প্রচলন ছিল এবং অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই যে এক একজন পাকা সার্জ্জন ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদের ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থ হইতেই বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্য চিকিৎসা যে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে—তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথমে আয়ুর্ব্বেদের চরক ও সুশ্রুত অবলম্বনে আরবী ভাষায় হাকিমী চিকিৎসার প্রচার করেন, তাহার পরে পাশ্চাত্যদেশে ইহা অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের চিকিৎসা প্রসারিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু কালে আদিম চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদ অপেক্ষা অন্য চিকিৎসা যে সমুন্নত হইয়া পড়িল—ইহার জন্য কিন্তু দায়ী অন্যে নহে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণই ইহার জন্য সর্ব্বতো-ভাবে দায়ী। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে এনাটমী ও সার্জ্জারি প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক চিকিৎসক চিকিৎসার সময় একমাত্র কায়চিকিৎসা ভিন্ন শস্ত্রকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলেন। এই সময় বৈদ্য বলিলে কেবল কায়চিকিৎসক দিগকেই বুঝাইত এবং যে সকল বৈদ্য কেবল শস্ত্রচিকিৎসা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ধন্বন্তরি সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করা হইত। ফলে চিকিৎসা-জগতে উভয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কালক্রমে দেশ হইতে কমিয়া গেল,—এমন কি, ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের চিকিৎসকদিগকে লোকে বিশেষ দায়ে না ঠেকিলে সাধারণতঃ চিকিৎসক বলিয়া স্বীকার করিতেও চাহিত না।

এদিকে কতকগুলি বৈদ্য কেবল কায়চিকিৎসার সাধনা করিলেও চিকিৎসা বৃত্তিটা যেন বৈদ্য সন্তানের মৌরসী সত্ত্ব হইয়া পড়িল। সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবার দিগের মধ্যে প্রবাদ শুনিয়াছি—সেই সকল কায়স্থ জাতির—কোনো সন্তান বিশেষ লেখা পড়া যাঁহারা শিখিতেন না,—তাঁহাদের জননীরা বলিতেন,—"না হয় আমার ছেলে দারোগাগিরি করিয়া খাইবে।" ইহার অর্থ সেকালের কায়স্থদিগের প্রায় সকলেই বড় বড় চাকুরী করিতেন, যাঁহাদের সুশিক্ষার অভাবে উচ্চপদস্থ চাকুরী জুটিবার সম্ভাবনা থাকিত না, তাঁহাদেরও চাকুরির ভাবনা ছিল না। অন্ততঃ দারোগাগিরিও জুটিত। বৈদ্যের অবস্থাও ক্রমশঃ তাহাই হইয়া উঠিল। এমন কি, কালক্রমে বৈদ্যজাতির অবস্থা এরূপ হইয়া উঠিল যে, বৈদ্যের ঘরে যে সন্তানটি মূর্খ হইত, তাহাকেই ব্রতী করা হইত আয়ুর্ব্বেদ পড়িতে। ফলে আয়ুর্ব্বেদের মত এরূপ একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইলে কিরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য—সে কথা অপত্য স্নেহে অন্ধ অভিভাবকগণ চিন্তা করিতেন না।

যাহা হউক মধ্যযুগে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির প্রধান কারণ যে আমরা নিজেরাই—তাহার সন্দেহ নাই। শল্য চিকিৎসার চর্চ্চা তখন ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পর কায়চিকিৎসার শিক্ষাও অনেকে ভাল করিয়া করিতেন না, এরূপ অবস্থায় এ চিকিৎসার অবনতি হইবে না তো হইবে কাহার?

দেশে এই সময় ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হইল। এই ম্যালেরিয়া ক্রমশঃ মহামারীতে পরিণত হইয়া বহু গ্রাম—বহুজনপদ ধ্বংস করিয়া ফেলিল। আশু জ্বরবন্ধকারী 'কুইনাইন' এই সময় আমাদের দেশে দেখা দিলেন! সাধারণে দেখিল—অতি সুন্দর ঔষধ, অপূর্ব্ব চিকিৎসা! এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তখন আমাদের দেশে নূতন দেখা দিয়াছে। শল্য চিকিৎসায় তখন এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার উপর ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ দেশবাসীকে মুগ্ধ করিয়া তুলিলেন। দেশবাসীর সে মুহ্যমান অবস্থার পরিণতি হইল—সকল রোগেই বিলাতী শিশির চাকচিক্যে ভুলিয়া যাওয়া—বিদেশীয় চিকিৎসার শরণ গ্রহণ করা!

আমাদের দেশে এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এইরূপভাবেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শুধু প্রবেশ লাভ করিয়াছে নহে, বিশেষভাবে বিস্তার লাভও করিয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, বড় বড় লোকের বাড়ীতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা হইতেছে শুনিলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চনও করিতেন। বড় বড় লোকেরা যে কবিরাজী চিকিৎসা একেবারেই করাইতেন না, এমন কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু জ্বর বিকারে বা আকস্মিক ব্যাধি উপস্থিত হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক অপেক্ষা এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরই প্রভাব পরিদৃষ্ট হইত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদে যে নবযুগের সাড়া পড়িয়াছে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য চিকিৎসার চাকচিক্যশালী মোহ এখন অনেকেরই কাটিয়া গিয়াছে! অনেকেই বুঝিয়াছেন,—আমাদের দেশের লোকের ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে আমাদের নিকট আমাদের দেশীয় ঔষধ যেরূপ উপকারী, এরূপ আর অন্য দেশের ঔষধ হইতে পারেনা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই এই কারণে অধুনা সকল চিকিৎসার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের কয়েকটি ঔষধ ভিন্ন সকল ঔষধের ব্যবহার-প্রণালী অবগত নহেন, সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকে স্বীকার করিলেও সকল রোগে সকল প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিতে সকলে সক্ষম নহেন। আয়ুর্ব্বেদের পুনরুত্থান উদ্দেশে বৈদ্য জাতীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মেডিকেল কলেজ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পরিশেষে যেরূপ আয়ুর্ব্বেদের

শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই তাঁহাদের সার সর্ব্বস্ব হইয়াছে, সকল এলোপ্যাথিক চিকিৎসকই যদি সেইরূপ ভাবে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা করেন, তাহা হইলে এ চিকিৎসার পূর্ব্ব গৌরব আবার যেমন অতি শীঘ্র ফিরিয়া আসে, সেইরূপ এ চিকিৎসার ফলে দেশবাসীরও পরম কল্যাণ সাধিত হয়। আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার গোড়ামী করিতেছিনা, কিন্তু একথা জোর করিয়াই বলিব—উগ্রবীর্য্য কুইনাইন অপেক্ষা আমাদের দেশজাত নাটার বীজ সহস্রগুণে আমাদের ধাতু ও প্রকৃতির উপযোগী। কুইনাইনে সদ্যঃ জ্বর বন্ধ করে সত্য, কিন্তু উহার অতি ব্যবহারে পাকস্থলীর ক্রিয়া যে বিকৃত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে নানারূপ রোগ উপস্থিত হইতে পারে—একথা শুধু আমাদের উক্তি নহে, বড় বড় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকেরাও বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের নাটায় বা আমাদের হরিতালে পাকস্থলীর বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ফল কথা, আমাদের দেশের ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে আমাদের দেশীয় ঔষধই যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, সে বিষয় আজকাল অনেক বিজ্ঞানবিদই স্বীকার করিতেছেন।

যাহাহউক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি মধ্যযুগে যে একটা অনাস্থার ভাব সাধারণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, সুখের কথা, এখন সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। বিহার এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে এখন বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। আমাদের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এখনো পর্য্যন্ত ইহার জন্য অর্থব্যয় না করিলেও আমাদের আশা আছে, বিহার এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের মত তাঁহারাও এই সনাতন চিকিৎসার উন্নতি কল্পে অবহিত হইবেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এখনো পর্য্যন্ত কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গলার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি গুলির অনেকেই ইহার জন্য যথাসম্ভব অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কলিকাতা করপোরেশন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামক দুই কলেজে প্রতিবৎসর নিয়মিত সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই অর্থে কলিকাতার মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এলোপ্যাথ দিগের মত অনেক কবিরাজও এখন করপোরেসন এবং জেলাবোর্ড সমূহের দাতব্য প্রতিষ্ঠান গুলিতে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদে যে একটা নবযুগের সাড়া পড়িয়াছে, ইহা অতি সত্য। এই নবযুগের জাগরণে বাঙ্গলা বিহার -উড়িষ্যা—তথা সমগ্র ভারতবাসী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মত সনাতন চিকিৎসাকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার বরণ করিয়া লউন,—আয়ুর্ব্বেদের আশীর্ব্বাদে সমগ্র ভারত সন্তান সর্ব্বপ্রকার রোগের হস্ত হইতে অক্ষত থাকুন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। ভারতবাসী মনে রাখিও—"যস্য দেশস্য যো জন্তুঃ তজ্জং তস্যৌষধম্ হিতম্।" অর্থাৎ যে দেশের প্রাণী, ঔষধও সেই দেশজাত হওয়া হিতকর। তোমরা এই পরম হিতকর ঔষধ ভুলিয়া গিয়াছিলে বলিয়াই না তোমাদের দারুণ দুর্গতি! তোমাদের অশোক, তোমাদের বাসক, তোমাদের কালমেঘ, তোমাদের গুলঞ্চ—তোমাদের পক্ষে—শুধু তোমাদের পক্ষে নহে—পৃথিবীর তাবৎ প্রদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষেই যে অশেষ কল্যাণকর মহৌষধ—ইহা তোমরা স্বীকার না করিলেও তোমাদের বরণীয়—এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অম্লান বদনে এখন স্বীকার করিতেছেন, সেই স্বীকৃতির ফলেই তোমাদের ঐ সকল ঔষধের তরলসার পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া বিলাতী শিশির সম্পদ বর্দ্ধন করিতেছে তোমাদের মকরধ্বজ—এখন তো পৃথিবীর সকল দেশেই সুপরিচিত,—এলোপ্যাথিক সকল দোকানেই এখন এই মকরধ্বজ বিক্রীত হইতেছে,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসকগণের প্রেস্‌কৃপসনেও এখন ইহা লিপিবদ্ধ হইতেছে। সেইজন্য বলি, এতদিন যাহা হইবার হইয়াছে, আমাদের দেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান,

—এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের ধাতু ও প্রকৃতিতে উগ্রবীর্য্য ঔষধে আশু উপকার দর্শিলেও উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকারী ইহা অবিসংবাদিত সত্য কথা। তোমরা এই অতি সত্য বুঝিতে চেষ্টা কর ইহাই অনুরোধ ইহা ভিন্ন বেশী কিছু বলিবার নাই

আয়ুর্ব্বেদের প্রস্তাবনা

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ ; এল, এম, এস]

আয়ুর্ব্বেদ অতি বিশাল ও গভীর শাস্ত্র, ইহা একমাত্র অনন্ত রত্নাকরের সহিত তুলনীয়। এই শাস্ত্রের কতকগুলি অবশ্য-শিক্ষণীয় পূর্ব্বাঙ্গ আছে যথা—শারীর বিদ্যা (Anatomy and Physiology), দ্রব্যগুণ (Materia Medica) ও নিদান (বা রোগবিজ্ঞান)। এইগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ। আয়ুর্ব্বেদের এই পূর্ব্বাঙ্গগুলির শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পরে চিকিৎসাবিদ্যায় প্রবেশাধিকার জন্মে। চিকিৎসা বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ মতে আটটী প্রধান অঙ্গে বিভক্ত, এই জন্য আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ' বলে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কায়চিকিৎসা (অর্থাৎ ঔষধসাধ্য রোগের চিকিৎসা বা Medicine) শল্যতন্ত্র (অর্থাৎ শস্ত্রবিদ্যা বা Surgery), শালাক্যতন্ত্র (চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতির চিকিৎসা) প্রভৃতি আটটী তন্ত্র সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চিকিৎসা-শাস্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র "কায়চিকিৎসা" নামক অঙ্গেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। শল্যতন্ত্রাদি অন্যান্য অঙ্গ এক্ষণে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ভাবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ইদানীং শবচ্ছেদলব্ধ শারীর-জ্ঞান এবং কার্য্যোপদেশের অভাবে ঐ সকল তন্ত্রানুসারে চিকিৎসায় সুনিপুণ নহেন। জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে এক্ষণে কোন বিপন্না গর্ভিণীকে প্রসব করাইতে হইলে, কোন ভগ্নাস্থির প্রতিসন্ধান করিতে হইলে, কিংবা যে কোনরূপ শস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে সমুদ্রপারাগত ভিন্ন জাতীয় চিকিৎসক বা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ভারতবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে?

বহুশতাব্দী ব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লব, বিদেশীয় জাতির আক্রমণ, বিধর্ম্মী রাজগণের অত্যাচার ও অবজ্ঞা এবং ধর্ম্মবিপ্লব প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। মৎপ্রণীত "প্রত্যক্ষশারীর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের উপোদ্ঘাত প্রকরণে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবনতির কারণ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে।

সুখের বিষয়, এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুনরুজ্জীবন ও অঙ্গপুষ্টির জন্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্যে এক্ষণে চারিদিকেই একটা জাগরণ দেখা যাইতেছে। এই শুভ জাগরণের দিনে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ ভারতীয় মঙ্গলারতি করিতেছেন, তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। ইতি পূর্ব্বে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য আমি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি, সংস্কৃতভাষায় লিখিত বলিয়া—সমগ্র ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইলেও—অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্রগণের পক্ষে সুগম হয় নাই। এই হেতু সংস্কৃত

তাহাতে অব্যুৎপন্ন বাঙ্গালী ছাত্রগণের সুবিধার জন্যও আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে।

শরীরের ন্যায় দুরূহশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমে চিত্রাদি দ্বারা ও গুরূপদেশ সাহায্যে দর্শনীয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া, পরে শবচ্ছেদ সাহায্যে ঐ জ্ঞানের যথার্থতা নিরূপণ করিতে হয়। প্রথম হইতে বিষয়-জ্ঞান না থাকিলে কেবল শবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কোন ফল হয় না। প্রতিপাদ্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য শারীর-গ্রন্থের সহিত অনেক চিত্রেরও প্রয়োজন। আমি এই সকল কথাই ভাল করিয়া "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে" বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা করিতে হইলে,—প্রথমেই আয়ুর্ব্বেদ-পরিচয় এবং আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের পর, শারীরবিদ্যার শিক্ষা করা উচিত, কেন না উহাই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। শারীর-বিদ্যায় জ্ঞান না থাকিলে শল্যতন্ত্র, প্রসূতিতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রানুসারে চিকিৎসা আদৌ চলিতে পারে না। শারীর বিদ্যার অভাবে কায়চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সম্যক্ জ্ঞান লাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্যই কায়চিকিৎসাদি চিকিৎসাঙ্গ সমূহের বর্ণনার পূর্ব্বেই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাগুলিতে "শারীরস্থান" বর্ণিত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদীয় কায়চিকিৎসা প্রকরণ গুলিতে জ্বর, গ্রহণী, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি অনেক রোগের সম্প্রাপ্তি (বিকৃতি-বিজ্ঞান বা Pathology) বর্ণনাতেও আমাশয়, পক্বাশয়, হৃদয় প্রভৃতির উল্লেখ পদে পদে দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদের ত্রিদোষতত্ত্ব বর্ণনেও শারীর-যন্ত্র গুলি ও তাহাদের ক্রিয়ার কথা প্রতি পদে আলোচিত হইয়াছে। এজন্য ত্রিদোষ-বিজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে হইলেও পূর্ব্বে শারীর-বিদ্যায় সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক। যে যন্ত্রের স্থান ও নির্ম্মাণ বিষয়ে কিছুই জানা নাই, সেই যন্ত্রের কার্য্য বুঝিতে বা উহার সংশোধন করিতে যাওয়া আর অন্ধের দৃশ্যবস্তু দর্শনের বা চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস—প্রায় একই কথা। ঋষিকল্পিত ভেষজ-সংযোজ-মহিমায় কোন কোন রোগের আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রতীকার শারীরবিদ্যায় অনভিজ্ঞের পক্ষে সম্ভব হইলেও, শারীর-বর্জ্জিত রোগ বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় প্রভূত অন্ধকার এবং অপূর্ণতা থাকে। প্রধানতঃ এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ এক্ষণে বিদেশীয়শিক্ষা-লব্ধ চিকিৎসকগণের তুলনায় অনেকাংশে প্রতিপত্তিহীন ও অনাদৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

শারীরজ্ঞান যে সমগ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ এবং শারীর জ্ঞান ব্যতীত যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না, তাহা সমগ্র চিকিৎসা-শাস্ত্রই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—

"শরীরং সর্ব্বথা সর্ব্বং সর্ব্বদা বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্ব্বেদং স কাৎর্স্ন্যেন বেদ লোক সুখপ্রদম্॥"
(চরকসংহিতা, শারীর স্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ—"যে চিকিৎসক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পূর্ণ শারীর শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ও উহা সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে স্মরণ রাখেন, তিনিই লোকহিতকর সমগ্র আয়ুর্ব্বেদজ্ঞানের অধিকারী।" ভগবান্ ধন্বন্তরি বলেন:—

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্ বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ॥
প্রত্যক্ষতশ্চ যদ্ দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥
(সুশ্রুতসংহিতা, শারীর স্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ "শরীর ও শাস্ত্র—উভয় দেখিয়া শারীর জ্ঞান বিষয়ে কুশলতা লাভ করিতে হয়। দৃষ্ট ও শ্রুত—উভয়ের সমন্বয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যাহা প্রত্যক্ষভাবে শবচ্ছেদাদিপূর্ব্বক দৃষ্ট এবং যাহা শাস্ত্রে অধীত, তদুভয়ের সমন্বয়ই বিশেষতঃ জ্ঞানবৃদ্ধিকর হইয়া থাকে।"

সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়েও প্রাচীন শারীর-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির সন্ধান ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সকল

গ্রন্থের স্থানে স্থানে শারীরবিদ্যার কথা বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ত্তমান। আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান প্রচলিত গ্রন্থগুলিতে শারীরের কথা 'শারীর স্থানে' "শারীর-বিধান" অতি অল্পই দেখা যায়, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে প্রসঙ্গক্রমে অনেক শারীরতত্ত্বই বর্ত্তমান। সেই সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ও সঙ্কলন করিয়া প্রাচীন নাম গুলির অর্থনিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রপারদর্শিতা ও শবচ্ছেদমূলক শারীরজ্ঞান—উভয়ই আবশ্যক।

কথিত আছে, ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষশ্লোকময় সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ "আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা" নামক আয়ুর্ব্বেদের আদি মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এক্ষণে উক্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। উক্ত সংহিতায় সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ যেরূপে আটভাগে বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী সংহিতা সমূহ প্রণীত হইয়াছে।

শারীরজ্ঞান, রোগনির্ণয়, শস্ত্র-চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে কালবশে আয়ুর্ব্বেদের যে সকল অংশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এখনও পরিশ্রম করিলে সে সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ-সিদ্ধান্তগুলির সহিত সমন্বয় করিয়া সেই সকল বিষয়ের পুনরুদ্ধার করা এখন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

কালবশে দেশের জল বায়ু এবং লোকের আহার-বিহারের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ কারণ বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ রোগের লক্ষণও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অনেক রোগ নূতন রূপ ও নাম ধারণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় কালোপযোগী রোগ-বিজ্ঞান গ্রন্থের আবশ্যকতা ও অনুভূত হইতেছে। এইরূপ রোগবিজ্ঞানমূলক চিকিৎসা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পূর্ব্ব গৌরব আবার যে ফিরিয়া আসিবেনা তাহা সুনিশ্চিত। আধুনিক চিকিৎসক গণ যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে চাহেন—তাঁহারা এই কথা স্মরণ রাখিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতিসংস্কারে মনোযোগী হউন—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

আজকাল "খাঁটি আয়ুর্ব্বেদ" বলিয়া একটা ধুয়া কোথাও কোথাও শুনিতে পাই। এই ধুয়াটী নিতান্ত অজ্ঞানতা মূলক। আমরা যদি প্রাচীন ঋষিগণের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি অবিকল পাইতাম, তাহা হইলেও এই "খাঁটি আয়ুর্ব্বেদ" কথার কতকটা সার্থকতা থাকিত। "ভগ্ন ও বিধ্বস্ত প্রায় আয়ুর্ব্বেদ" লইয়া যাহাদিগকে চলিতে হয়, তাঁহারা নূতন মসলা দিয়া ভগ্ন সংস্কার করা হইবেনা—বলিলে, লোকের কি তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা বাড়িতে পারে?

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ৬/৭টি অঙ্গ বিলুপ্ত প্রায় এবং ভগ্ন বা বিধ্বস্ত হইলেও কায় চিকিৎসাই এখনো আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা করিতেছে, কিন্তু এই টুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবেনা, বিশেষতঃ যখন কায়চিকিৎসাঙ্গেরও মূল ভিত্তি শারীর স্থান এবং শারীর বিজ্ঞান ভগ্ন প্রায় ও অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট উপেক্ষিত। আয়ুর্ব্বেদকে যদি জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান করিয়া তুলিতে হয়, তবে আমাদিগকে সর্ব্বাংশে স্বাবলম্বী হইতে হইবে; বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ স্বাবলম্বিতার জন্য পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের নিকট হইতে আমাদিগকে কোনো কোনো অংশ লইতে হইবে। এক দিন আমরা উত্তমর্ণ ছিলাম, ইউরোপ অধমর্ণ ছিল,—এখন কোনো কোনো বিষয় ইউরোপের নিকট হইতে আমাদের সুদ শুদ্ধ ঋণ শোধ লইবার সময় আসিয়াছে, হয়তো কিছু দিনের জন্য পুনরায় অধমর্ণ হইয়াই আমাদিগকে থাকিতে হইবে। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। জাপান যেরূপ করিয়া আজ স্বাবলম্বী ও ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদকেও সেইরূপ করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে।

ফল কথা, ব্যর্থ ও অজ্ঞানতামূলক গোঁড়ামীতে আমাদের অনেক সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদের এই জাগরণের দিনে পুনরায় সেই গোঁড়ামীর প্রভাবে আমরা যদি চক্ষু নিমীলিত করিয়া শয়ন করিয়া থাকি, তবে পুনরায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে আমরা যে তিমিরে পড়িয়াছি, সেই তিমিরেই থাকিব।

সংযম

[রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি-আই-ই, আই-এস্-ও, এম-বি]

সংযম স্বাস্থ্যরক্ষার মূলমন্ত্র। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, আমোদ-প্রমোদ—সকল বিষয়ে যথোচিত সংযম আচরিত হইলে, দীর্ঘজীবন ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায়। প্রবৃত্তির অসংযত ক্রিয়ার দ্বারাই আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে।

শারীরিক প্রবৃত্তি মাত্রেরই যথোচিত সংযম আবশ্যক হইলেও, ইন্দ্রিয়-সংযম বলিলে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তদ্বিষয়ে আমাদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয়ের অসংযত পরিচালনা দ্বারা যেরূপ মহানিষ্ট সংঘটিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।

সমাজ-রক্ষার জন্য বিবাহের সৃষ্টি। প্রজাবৃদ্ধি ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহা যে প্রবৃত্তি-সংযমের পক্ষে প্রধান সহায়, তাহা সকল সমাজে ও সকল ধর্ম্মে একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। পুনশ্চ, বিবাহ দ্বারা জীবনের সুখ-দুঃখভাগী একজন সঙ্গী লাভ করিয়া, স্ত্রী পুরুষ, উভয়েরই গার্হস্থ্য জীবন মধুময় হইয়া উঠে।

আমাদিগের হিন্দু-সমাজে বিবাহ অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে এই নিয়ম যে সমাজের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলপ্রদ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন কোন লোকের পক্ষে বিবাহ উপযোগী না হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ ঘটনার সংযোজনা অতি বিরল, সুতরাং বিবাহ—জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া যে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রকারগণের বহুদর্শিতা ও সমাজ-তত্ত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে অসংযত প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই পরম মঙ্গলকর প্রথার অপব্যবহার দ্বারা কি বিষময় ফল না উৎপাদন করিয়া থাকি! ইন্দ্রিয়-সংযমই বিবাহের উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক স্থলে উহা ইন্দ্রিয়ের অগাধ পরিচালনার উপায় স্বরূপ বিবেচিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যেও এই বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পুত্রোৎপাদন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন না করিলে, কুলপাবন পুত্র কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রঘুবংশে আমরা পড়িয়াছি যে, মহারাজ দিলীপ সস্ত্রীক বহুদিন কঠিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরে রঘুর ন্যায় দিগ্বিজয়ী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই তত্ত্বটুকু বিশিষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যে বয়সে, যে অবস্থায় এবং যেভাবে আমাদিগের দেশে পুত্র-কন্যা জন্মিতেছে, তাহাতে তাহারা যে ক্ষীণশক্তি, চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পিতা মাতার দেহ পূর্ণতা লাভ করিবার বহুদিন পূর্ব্বেই তাহাদিগের দেহে ইন্দ্রিয়-চালনা-জনিত ক্ষয়ের আরম্ভ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে অধিকাংশ লোকের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যপ্রদ আবাসভূমি প্রভৃতি যে সকল অনুকূল উপায় দ্বারা শারীরিক বৃদ্ধি সংসাধিত ও শক্তি সঞ্চয় হইয়া থাকে, অধিকাংশ পরিবারের মধ্যেই তাহাদিগের অভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ২৪।২৫ বৎসরের ন্যূনে পুরুষের দেহ পূর্ণতালাভ করে না; ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইলে অপূর্ণ দেহ হইতে সবল সন্তান লাভ করিবার আশা—দুরাশা মাত্র। তদুপরি সাংসারিক অস্বচ্ছলতা হেতু শারীরিক এই অপূর্ণতা আরো অধিক পরিমাণে আমাদিগের যুবকবৃন্দের

মধ্যে বিদ্যমান থাকে। বালিকাদিগের যে বয়সে বিবাহ হয় এবং যে বয়সে তাহারা জননীপদগৌরব লাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই সকল দুগ্ধপোষ্যা বালিকাদিগের গর্ভ হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা যে কখন জীবনে শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা বাতুলের কার্য্য মাত্র। আমাদিগের দেশে শিশু-দিগের মৃত্যু-সংখ্যা যত অধিক, পৃথিবীর অপর কোন দেশে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুদর্শী চিকিৎ-সকদিগের মত এই, যে, অপরিণত পিতা মাতা হইতে উদ্ভূত বলিয়াই এই সকল শিশুদিগের জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ, এবং সামান্য কারণেই উহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও কোনরূপে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম না করিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, খাওয়াইবার সঙ্গতি নাই, শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত বস্ত্রসংস্থানের উপায় নাই, রোগ হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই, পুত্রকন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই, অথচ ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে এরূপ অবস্থার গৃহস্থকে প্রতি বৎসর সন্তানের মুখ দেখিবার আশায় নিরাশ হইতে হয় না! এই সংযমের অভাবে আমাদিগের গৃহস্থগণ (Middle class men) দিন দিন ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে। কবে আমাদিগের এই সর্ব্বনাশকারী ইন্দ্রিয়-মোহ ঘুচিয়া যাইবে, কবে আমরা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মতৃপ্তি-সাধন-সম্বন্ধে সংযম অভ্যাস করিতে যত্ন পাইব, কবে জীবনের সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবশ্য আচরণীয় বলিয়া আমাদের চিত্তে দৃঢ় ধারণা হইবে এবং আমরা তৎসাধনো-পযোগী শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব? তখন দেখিব যে, এই দীন দুঃখী পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল জাতির পরিবর্ত্তে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে বিভূষিত, সম্পদশালী এক মহাজাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই জাতি বিনা আয়াসে জগতের অপর সকল জাতির নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বালকদিগের বিবাহ দেওয়া একান্ত অনুচিত। সাধারণতঃ ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচীন ভারতেও এই বয়স পর্য্যন্ত শিষ্য—গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিত, সুতরাং ইহার পূর্ব্বে বালকের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যতীত আরও অনেক সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বিবাহ হইলে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে, শিক্ষা-শেষ হইবার পূর্ব্বে পুত্রকন্যা জন্মিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণ-চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে হয়, অর্থের প্রয়োজন হেতু জীবনের উচ্চ আকাঙ্খা অনেক সময়ে স্বপ্নে পরিণত হয় এবং অবস্থাবৈগুণ্যে সামান্য উপজীবিকার জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আত্মসম্মান ও মনুষ্যোচিত অন্যান্য সদ্‌গুণাবলীকে চিরবিদায় প্রদান করিতে হয়। সুখের বিষয় এই যে, সুশিক্ষার বিস্তারে বর্ত্তমান সময়ে অনেকানেক অভিভাবক এই প্রথার দোষ উপলব্ধি করিতেছেন এবং বালকদিগের বিবাহের বয়স ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা দূষণীয় হইলেও বালিকাদিগের বিবাহের বয়সবৃদ্ধি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিতেছে। সুশ্রুতের মতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হওয়া একান্ত অনুচিত এবং ইহা নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে যে, উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রাচীন ভারতে এই বয়সেই বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইন্দুমতী রুক্মিণী, দময়ন্তী দ্রৌপদী, সংযুক্তা প্রভৃতি বরণীয়া আর্য্যরমণীগণ স্বয়ম্বরকালে কি দুগ্ধপোষ্যা বালিকা ছিলেন,

না তাঁহারা হিন্দুসমাজের বহির্ভূত ছিলেন? প্রাচীন ভারতের প্রথা আমাদের সমাজে পুনঃ প্রচলিত হইলে আমাদের জাতি যে পুনরায় অর্থ, সামর্থ্য ও পূর্ব্ব গৌরব-লাভের অধিকারী হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের বালিকাগণ অল্প বয়সে সন্তান-প্রসব করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে অথবা তজ্জনিত ব্যাধি হইতে আজন্ম কষ্ট পাইতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত এ দেশীয় চিকিৎসকদিগের অগোচর নাই। অথচ আমরা এমনই অল্পবুদ্ধি যে, জানিয়া শুনিয়া আমাদিগের কন্যা ও ভগিনীগণকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছি! আমরা শিক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু আগুনে হাত পুড়িবে জানিয়াও যদি কেহ আগুনের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা কি তাহার বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকি?

প্রাচীন প্রথা বা দেশাচারের দোহাই দিয়া যদি বাল্যবিবাহের সমর্থন করা যায়, তাহা হইলে এ কথা বুঝিতে হইবে যে, সকল দেশেই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেশাচারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচারের পরিবর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি আমরা এরূপ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে চিরকাল অপর সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া জগতের অধিকাংশ দুঃখ-দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হইবে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, কাহারও অনুরোধে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবে না। যদি কেহ ব্যতিক্রম করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সমুদ্রের প্রতি ক্যানিউটের বাক্যের ন্যায় ("Thus far and no further") তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে মাত্র।

গতবারের লোক-গণনায় জানা গিয়াছে যে, হিন্দু-জাতির মধ্যে ১০ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্কা বহুসংখ্যক বালিকা বিধবা রহিয়াছে। কি পরিতাপের বিষয়, যাহারা বিবাহ শব্দের অর্থ বুঝে না, তাহাদের বিবাহ-জীবনের সুখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা—সকলই বিকশিত হইবার পূর্ব্বে স্বপ্নের মত উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে! একটু বেশী বয়সে বিবাহ দিলে এতগুলি বালিকাকে বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারা যায় না কি?

বাল্যবিবাহ—স্বাস্থ্যনাশ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের যেমন একটী কারণ, অসমান বিবাহও তদ্রূপ অনেক স্থলে রোগ ও অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পুরুষেরা যে কোন বয়সে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু বালিকাদের বিবাহ ১১।১২, এমন কি ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প বয়সে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং ৪০।৫০ বা তদধিক বয়স্ক পুরুষকে ৯।১০ বৎসর বয়সের বালিকাকে বিবাহ করিবার দৃশ্য নিতান্ত বিরল নহে। এইরূপ অসমান বিবাহে বালিকার অকাল-পক্কতা এবং পুরুষের স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে দেখা যায়। বহুমূত্র, ক্ষয়, হৃদরোগ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট রোগ এরূপ অবস্থায় পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। একে তো পুত্র কন্যা বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহ করা অবিবেচনার কার্য্য—ইহাতে সংসারে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যতে নানা অনর্থপাত ও অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখা হয়। তদুপরি যখন এই কার্য্য দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন আশা করা যায় যে, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই এরূপ অনর্থমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

প্রাচীন ভারতে ছাত্রাবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য-আচরণের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, পুনরায় তাহার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে। বালককাল হইতে ইন্দ্রিয়-সংযমের অভ্যাস না করিলে, ইহার আজীবন-ব্যাপী সুফল লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। যাহা কয়েকদিন অভ্যাস করিবে, তাহাই চিরদিন জীবনে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। আমরা সকলেই জানি যে, যে কোন কদভ্যাস কিছুদিন

জন্মাইতে দিলে উহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা সুকঠিন হইয়া উঠে। অতএব বালককাল হইতেই প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা সদভ্যাস বদ্ধমূল করিয়া সকল কদভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। অভিভাবক ও শিক্ষকগণ কুরুচিপূর্ণ পুস্তক বা চিত্র, থিয়েটারের কুভাব উদ্রেকক দৃশ্য বা সঙ্গীত, কুসঙ্গ, কদালাপ প্রভৃতি বিষয় হইতে বালককে পৃথক্ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন এবং নিজে চরিত্রবান্ হইয়া সেই উচ্চ আদর্শ তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা উপস্থাপিত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

পুত্র-কন্যাগণের যথাকালে বিবাহ দিলে গৃহ সুখসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে—দারিদ্র্য, অশান্তি, রোগ, অকাল-মৃত্যু সংসার হইতে ক্রমশঃ অবসর গ্রহণ করিবে—পুনরায় আমরা সৎসাহসে ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিব। এরূপ চিন্তা করিতেও মনোমধ্যে যে আশা ও আনন্দের উদয় হয়, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

আর্য্যসঙ্গীত

তোমরা কি সেই আর্য্য সন্তান
—অমিত বীর্য্য যা'দের ছিল,
শৌর্য্য যা'দেরই শিরাতে শিরাতে
একদিন ওগো বহা'য়ে দিল ?
অতুল বিক্রমে কীর্ত্তি যা'দের,
'প্রতাপ-আদিত্য' স্বাক্ষ্য যা'র।
লাঠিয়াল বলি গর্ব্ব যা'দের,
ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিতেছে তা'র।
তোমরা কি সেই আর্য্যসন্তান—
জ্ঞানের জ্বলন্ত উজ্জ্বল রবি ?
আছে কি এখন সেকালের গর্ব্ব ?
না কালের করালে গিয়াছে সবি ?
অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম লইয়া
তোমরাই নাকি করিতে গর্ব্ব ?
ধর্ম্ম পালনে স্বাস্থ্য পালন—
তোমাদেরি নাকি ছিল গো সর্ব্ব।

তোমরাই নাকি এদেশে একদা
বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলে ?
তোমরাই নাকি বিশ্বমাঝারে
জ্ঞানের আলোকে মাতা'য়ে দিলে?
তোমাদেরি কীর্ত্তি একদিন নাকি
আরব-তুরস্ক শুনিতে পেয়ে
তোমাদের গর্ব্ব আর্য্য-চিকিৎসা
অম্লানবদনে গেল গো নিয়ে।
সে দেশ হইতে দেশ বিদেশে
ভারতের গর্ব্ব প্রচার হ'ল।
তোমাদের দেশে ছিল যে রত্ন
অন্যে তাহারে আদর দিল !
আর্য্য বলিতে যা' কিছু গর্ব্ব
—সবটুকু আহা বিলা'য়ে দিলে
আজি তোমাদের এই যে দুর্গতি,
—নিজের কর্ম্মে করিয়া নিলে !

বেরিবেরি বা ব্যাপক শোথ

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

সম্প্রতি এক প্রকার শোথ বিশেষ ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই রোগের সাধারণ লক্ষণ পায়ে শোথ, হৃদদৌর্ব্বল্য, তজ্জন্য হৃদস্পন্দন ও শ্বাস। রোগ বৃদ্ধির সহিত শোথেরও সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার দেখা যায়। এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত রোগ বেরিবেরি নামে কথিত হইতেছে। এই রোগটী সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় কোন একটী সাধারণ কারণ হইতে এই রোগের যে উৎপত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন যে, অধুনা বাজারে যে অন্তস্ত্বগ্ রহিত চাউল বিক্রয় হয়, তাহার পুষ্টিকারিতা নিতান্তই অল্প। সেই চাউল সেবন জন্য লোকের শরীর দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে অযত্ন রক্ষিত চাউলে এক জাতীয় ক্রিমি সংক্রমণ হয়, সেই ক্রিমি নিঃসৃত মলাদিসম্পৃক্ত চাউলের অন্ন সেবন করিলে শরীরে যে বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়—তাহারই ফলে এই জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত শোথ দেখা দেয়। ইহাই আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত। কিন্তু তাঁহারা এখনও যে এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—একথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। যাহা হউক আমরা এবিষয়টী আয়ুর্ব্বেদের দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা পাইব।

প্রথমে শোথ রোগটী কিভাবে আরম্ভ হয় তাহারই আলোচনা করা যাউক। আমাদের শরীর পোষণার্থ অন্নরস সর্ব্বধাতুর উপাদান লইয়া বহির্গত হইয়া হৃদয় হইতে শিরাপথে রসায়নীর মধ্যদিয়া সর্ব্বধাতুর পুষ্টি দান করতঃ পুনরায় শিরাপথে হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। যদি কোন কারণে ঐ অন্নরস দোষযুক্ত হয় এবং শিরা হইতে যখন রসায়নীমার্গে বহির্গত হয়, তখন যদি পুনরায় শিরাপথে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে যেস্থানে ঐ সদোষ অন্নরস আবদ্ধ হয়—সেই স্থানই ফুলিয়া উঠে। ইহা স্থানিক ও হইতে পারে এবং সর্ব্বাঙ্গীনও হইতে পারে, চরকে উক্ত আছে যে—

বাহ্যাঃ শিরাঃ প্রাপ্য যদা কফাসৃক্ পিত্তানি সন্দূষয়তীহ বায়ুঃ।
তৈর্বদ্ধমার্গঃ স তদা বিসর্পন্নুৎসেধলিঙ্গং শ্বয়থুং করোতি॥

ইহার নিদান সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে যে,—
শুদ্ধ্যাময়াভক্তকৃশাবলানাং ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণ গুরূপসেবা।
দধ্যামমৃচ্ছাকবিরোধিদুষ্ট গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণাচ্চ॥
অর্শাংস্যচেষ্টা ন চ দেহশুদ্ধির্মর্ম্মোপঘাতো বিষমা প্রসূতিঃ।
মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাঞ্চ নিজস্য হেতুঃ শ্বয়থোঃ প্রদিষ্টঃ॥

ব্যাখ্যান :—(১) শুদ্ধি অর্থে শোধণ, দেহ হইতে মল দোষ নির্হরণ ইহা সাধারণ হেতু নহে সুতরাং ইহাকে বেরিবেরি নিদান বলা যায় না, (২) আময় অর্থে রোগ। দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া যদি পাণ্ড্বাদি উপদ্রব দেখা যায়, তবে শোথ হইতে পারে। ইহাও বেরিবেরির নিদান নহে। (৩) অভক্ত :—ভক্ত শব্দের অর্থ ভাত ; ন ভক্ত=অভক্ত ; অন্নাভাব **বা আবশ্যকানুরূপ অন্নের অভাব** (৪) কৃশব্যক্তি সহজেই শোথ রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু এই রোগে স্থূলব্যক্তিও আক্রান্ত হয় বলিয়া ইহাকে নিদান বলা চলে না, (৫) অবল অর্থে **বলহীন** (৬) ক্ষারাম্লতীক্ষ্ণোষ্ণগুরূপসেবা :—ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণও উষ্ণবীর্য্য এবং গুরুপাক দ্রব্যসেবন (৭) দধিভোজন :—অতি মাত্রায়, অকালে ও প্রত্যহ দধি সেবন করিলে শরীরের গুরুত্ব উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে মুখ ও চোখ ফুলে (৮) আম অর্থে অপক্ক, যে সকল দ্রব্য পাক করিয়া অথবা কাল বশে স্বয়ং পাকিলে খাইতে হয়, তাহাদিগকে যদি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়।

(৯) মৃৎ অর্থে মাটী। (১০) শাক অধিক বা কেবল শাক খাইলে অধিক পরিমাণে মল সঞ্চয় হয় এবং পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে। (১১) বিরোধ ভোজন অর্থে বিরুদ্ধাহার। যেরূপ আহার করিলে স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ হয়। যেমন, সংযোগ বিরুদ্ধ, যথা ক্ষীর, মৎস্য একত্রে ভোজন, সংস্কার বিরুদ্ধ—যথা সর্ষপ তৈল ভৃষ্ট কপোতমাংস। মাত্রা বিরুদ্ধ যথা—হীন বা অধিক ভোজন। দেশ বিরুদ্ধ যেমন শীতপ্রধান দেশে শীতবীর্য্য দ্রব্য সেবন। কাল বিরুদ্ধ—শীত কালে শীতবীর্য্য দ্রব্য সেবন। স্বভাব বিরুদ্ধ বাতপ্রকৃতির বাতাবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন। (১২) দুষ্ট ভোজন—দ্রব্য বিকৃত হইলে যদি সেই দ্রব্য সেবিত হয় তবে তাহাকে দুষ্ট ভোজন কহে। (১৩) গরোপসৃষ্টান্ননিষেবণ। গর সংযোগজ বিষ অন্ন পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি সেই দ্রব্য বিষের ন্যায় কার্য্যকরে, তবে তাহাকে গর কহে। **অন্ন যদি গরোপসৃষ্ট হয়, তবে সেই অন্ন শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শোথ উৎপাদন করে।** (১৪) অর্শ রোগের পরিণামে রক্তহীনতা জন্য শোথ হয়। (১৫) **অচেষ্টা—কোন প্রকার কার্য্যাদি না করিয়া অলসভাবে থাকা।** (১৬) ন চ দেহশুদ্ধি—যথাকালে মলাদি নির্হরণ না করা (১৭) মর্ম্মোপঘাত—মর্ম্ম শব্দের অর্থ vital parts of the body অর্থাৎ শরীরের যে প্রদেশ আহত হইলে জীবের মৃত্যু হয়। মনুষ্য শরীরে ১০৭টী মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে শিরঃ, হৃৎ ও বস্তি—এই তিনটীই প্রধান। মহর্ষি চরক ত্রি-মর্ম্মীয় অধ্যায়ে এই তিনটীর উল্লেখ করিয়াছেন। চরক ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে চরকের মতই অনুবর্ত্তনীয় বলিয়া আমরা এই তিনটীকেই এখানে ধরিলাম। (১৮) ইহাদের উপঘাত অর্থাৎ বৈকল্য। বিষমা প্রসূতি অর্থে স্ত্রীলোকের প্রসব বৈষম্য। (১৯) মিথ্যোপচারঃ প্রতিকর্ম্মণাং অর্থে পঞ্চ কর্ম্ম বলিয়া যে শোধন চিকিৎসা আছে—তাহার অসম্যক্ প্রয়োগ। শোথরোগের এই ১৯টী কারণ আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিপ্রতিনিয়ত এবং কতকগুলি সাধারণ। এইরোগ যখন ব্যাপক ভাবে সমাজে দেখা দিয়াছে—তখন প্রতিনিয়ত কারণগুলিকে বাদ দিয়া সাধারণ কারণগুলি ধরিয়া বিচার করা যাউক। সাধারণ কারণগুলিও বড় অক্ষরে প্রদত্ত হইয়াছে। (১) অভক্ত, আবশ্যকানুরূপ অন্নের অভাব (২) অবল বলহীনতা (৩) গরোপসৃষ্টান্ন নিষেবণ (৪) মর্ম্মোপঘাত। এই চারিটী সাধারণ কারণ আমরা এই রোগের নিদান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। যদিও আবশ্যকানুরূপ অন্নের অভাব সকল স্থলে পরিদৃষ্ট হয় না, তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই আজ অন্নাভাবে ক্ষিণ হইয়া পড়িতেছে, সেজন্য বাঙ্গালীর বলহীনতা বিশ্ববিশ্রুত। ধনীও যে এ রোগে আক্রান্ত হইতেছেন না—তাহা নহে। পরিশ্রমবিমুখ বিলাসী বাঙ্গালী অঙ্গ চালনার অভাবে দুর্ব্বল হইতেছেন, ইহা (১) অস্বীকার করা যায় না—; দ্বিতীয় কারণ বলহীনতা—ধনী দরিদ্র উভয়েরই সম্পত্তি। যদি দুর্ব্বল শরীরে গরোপসৃষ্টান্ন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে দুষ্ট তণ্ডুলকৃত অন্ন সেবিত হয়—যাহার প্রভাবে মর্ম্মোপঘাত জন্মে অর্থাৎ শিরঃ, হৃৎ ও বস্তির বৈকল্য উপস্থিত হয়, তখনই শোথ ও মর্ম্মপীড়া আসিতে পারে। আমাদের শরীরাভ্যন্তর্গত শিরঃ নামক মর্ম্মে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রের প্রাণবহস্রোতঃ সমূহ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় শরীরে একাদশটী,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক মন। ইহাদের স্থান শিরঃ। এই স্থান হইতে ইহাদিগকে স্বকর্ম্মে বিনিয়োগ করিবার জন্য সর্ব্বদেহবিস্তৃত স্রোতঃ সকলের মূলও এই স্থান। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি স্রোতঃ শরীরের অন্যান্য ব্যাপার সাধন করিতেছে—যাহার ফলে নিমেষ, উন্মেষ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, উৎক্ষেপন এবং অবক্ষেপণ প্রভৃতি কর্ম্ম সাধিত হইতেছে। এক কথা, শরীরের ভিতর যে সকল কার্য্য সাধিত হইতেছে—তাহা এই শিরঃস্থ ইন্দ্রিয় প্রাণবহ স্রোতঃ সকলের শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে।

ইহার বৈকল্য হইলে শ্বাসগ্রহণ, উচ্ছ্বাস ত্যাগ, রসাদির-প্রাপ্তি, পরিপাকক্রিয়া মলাদির কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মে। ইহার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র, বস্তিযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল হৃদয় পূর্ব্বে কথিত রসকে আর সম্যক্ ফিরাইয়া আনিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলে বলিয়া হৃদয় হইতে দূরবর্ত্তিস্থান পাদদেশে শোথ দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া ইহাকে জোর করিয়া কাজ করাইবার জন্য শ্বাসযন্ত্রের যে চেষ্টাধিক্য হয়—তাহার ফলে রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্রতা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের শরীরের অসার জলীয়াংশ এবং শরীরের সঞ্চিত ক্লেদগুলি বস্তিযন্ত্র দ্বারা নিরন্তর বহির্গত হইতেছে। বস্তি দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন যদি তাহারা নির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে শরীরে সঞ্চিত থাকিয়া শোথের পরিবৃদ্ধি সাধন করে। এই রোগে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায় বলিয়া অনেক সময় উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব আইসে। বস্তি মার্গে অনিঃসৃত ক্লেদ ও গরোপসৃষ্টায়ের বিষক্রিয়া জন্য রক্তচ্ছর্দ্দি অনেক সময় দেখা যায়। তাহার ফলে রোগী—কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় এবং অধোঃ রক্তপিত্তের লক্ষণও দেখা যায়। রক্তচ্ছর্দ্দি ও হৃদোপঘাত এই দুইটী এই রোগের আশঙ্কার কারণ। এই দুইটী কারণ হইতেই রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। অনেক সময় এই রোগের সহিত জ্বর ও কাস বিদ্যমান থাকে

এই রোগের চিকিৎসায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই. অবশ্য এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য তাঁহাদের গবেষণা চলিতেছে। ভগবান্ তাঁহাদিগকে সাফল্য দান করুন। নূতন কোন বিষয় আবিষ্কারের পূর্ব্বে তাঁহারা যদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ গুলি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। আমরা নিম্নে এইরোগের আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসা লিপিবদ্ধ করিলাম।

শোথ প্রকাশ পইবা মাত্র রোগীর কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম করা একান্ত আবশ্যক। লবণ সেবন এই রোগে ভাল নহে, উহা বন্ধ করা উচিত। একেবারে না পারিলে সামান্য পরিমাণে সৈন্ধব লবণ দেওয়া যায় সৈন্ধব ব্যবস্থা করিতে হইলে লবণের সহিত বিল্বপত্র রস মিশ্রিত করিয়া ভাজিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে লবণের দোষ অনেকটা কমিয়া যায়। দুগ্ধ এই রোগের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ্য ; বিশেষতঃ ধারোষ্ণ দুগ্ধ। যে পরিমাণ দুগ্ধ হজম করিতে কোন কষ্ট হয় না—তত পরিমাণ দুগ্ধ রোগীকে দিতে হইবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধের অভাব হইলে এক বল্কা দুধ প্রয়োজ্য, ফলকথা ঘন দুধ দিতে নাই। মানকচুও একটী সুপথ্য। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—যে চাউল ধুইলে জল শ্বেতবর্ণের হইয়া যায়—সেই চাউল এই রোগের নিদান। চাউল পরীক্ষা করিয়া যাহাতে এই বিষদোষ না থাকে, সেইরূপ চাউলের অন্ন—সম্ভব হইলে টাট্‌কা ঢেঁকিছাঁটা চাউলের অন্ন সেব্য। অনেকে লাল আটার রুটী বা লুচি ব্যবস্থা করেন, কিন্তু লুচি বা রুটী বাঙ্গালীর পেটে সহজে হজম হয় না, পেট খারাপ করে। যদি একান্তই খাইতে হয় —তবে পেট না ভরিয়া আধপেটা খাইলে বিশেষ অপকার করে না। ভাল চাউলের ভাত, রুটী বা লুচি, মানকচু সিদ্ধ, পুনর্নবাশাক, মসুর বা মুগের ডাউল, ভাল মাছের বা মাংসের ঝোল, লেবু,দুধ এবং চিনি এই রোগের পথ্য। এতদ্ভিন্ন আঙ্গুর, বেদানা, খেজুর পানিফল ও কমলালেবু প্রভৃতিও দেওয়া যায়। জ্বর থাকিলে ভাত বন্ধ করিয়া দুধ-খৈ বা দুধরুটী প্রয়োজ্য।

ঔষধ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলা কঠিন, কারণ অবস্থা-ভেদে ঔষধেরও পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন করিতে হয়। তবে সাধারণতঃ নবায়স লৌহ ও মকরধ্বজ—পুনর্নবার রস মধু সহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যাধিক্য হইলে ইহার সহিত নাগার্জ্জুনাভ্র একবার প্রয়োজ্য। শ্বাস থাকিলে-বহেড়ার শাঁস ৵৹আনা, পিপুলচূর্ণ ২রতি ও মধু—এই অনুপানে নাগার্জ্জুনাভ্র প্রয়োগ করিতে হয়। নিম্নলিখিত পাচনটী এইরোগে মূত্রকৃচ্ছ্রতা থাকিলে বিশেষ উপকারী :—পুনর্নবা, গোক্ষুরবীজ, অশ্বগন্ধা ও অর্জ্জুন ছাল প্রতি দ্রব্য ॥৹ তোলা, জল ৷॥৹ সের শেষ ৴৵৹ পোয়া, ছাঁকিয়া তাহার

সহিত অর্দ্ধতোলা মিশ্রিচূর্ণ মিশাইয়া সেব্য। ইহাতে জ্বর দেখা গেলে 'সর্ব্বতোভদ্র' এবং উদরাময় দেখা গেলে 'মহাগন্ধক' প্রয়োজ্য। মিঠাবিষ সংযুক্ত ঔষধ এবং 'শুভ্র-পর্পটী' এই রোগে প্রয়োগ না করাই ভাল। এই রোগী দুর্ব্বল হইলে 'চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ' অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। রক্তপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লাক্ষাচূর্ণ ৵০ আনা, উড়ুম্বর রসক্রিয়া ৩রতি, চিনি।০ আনা ও ছাগদুগ্ধ ৵০ছটাক—একত্র মিশাইয়া প্রযুজ্য। বিষক্রিয়া জন্য বর্ণ বৈষম্য বা অন্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পূর্ব্বোক্ত পাচনের সহিত অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা ও গুলঞ্চ মিশাইয়া পাচনের নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। শোথ বেশী হইলে "শুষ্ক মূলকাদি তৈল"—শোথ স্থলে মালিসের জন্য প্রযুজ্য।

এই রোগের আক্রমণ হইতে যাঁহারা নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন সকালে ও বৈকালে একটু একটু শারীরিক পরিশ্রম করেন, ভাল চাউলের অন্ন সেবন করেন, পায়ে যেন বেশী করিয়া সর্ষপ তৈল মালিস করেন এবং যথাসম্ভব দুগ্ধ পান করেন, তাহা হইলে এ রোগ আক্রমণ করিতে পারিবে না।

শিশুর জন্মের পূর্ব্বে ধাত্রীর কর্ত্তব্য

(ডাঃ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি)

প্রত্যেক লোকেরই—বিশেষতঃ যাহারা ধাত্রীর কাজ করেন—তাঁহাদের সাধারণ পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই পরিচ্ছন্নতার অভাবেই প্রসূতি ও নবজাত শিশুর অনেক প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক ধাত্রীর পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করা, প্রত্যহ স্নান করা, দাঁত মাজা, নখ ছোট করিয়া কাটা ও প্রসব করাইবার পূর্ব্বে হাত বিশোধিত (যথা Lysol) লাইসল প্রভৃতি জীবাণু ধ্বংসকারী ঔষধ দ্বারা উত্তমরূপে ধোয়া উচিত।

শিশু ও পোয়াতিকে যে শয্যায় শোয়াইবে, যে কাপড়ে তাহাদের গা ঢাকা দিবে, তাহা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার থাকা উচিত। এই সমস্ত জিনিষ পূর্ব্ব হইতে গরম জলে ফুটাইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলেই ভাল হয়।

ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগগুলি জীবাণু হইতে জন্মে। এই সকল জীবাণু সাধারণতঃ আস্তাবল প্রভৃতি অপরিষ্কৃত স্থানে বাস করে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবাণু সকল নষ্ট করিবার কতকগুলি ঔষধ আছে। (Lysol) লাইসল তাহার মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট। জল গরম করিয়া ১ সের জলে ২ চামচে লাইসল মিশাইয়া তাহাতে প্রসবকালীন যে যে যন্ত্রের দরকার—তাহা ও ধাত্রীর হাত ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া দরকার।

পূর্ব্বে নবজাত শিশুর নাড়ী অপরিষ্কৃত চাঁচারি দ্বারা কাটা হইত। ফলে বহু শিশু ধনুষ্টংকার প্রভৃতি রোগে মারা যাইত এবং লোকে বলিত—'শিশুকে পেঁচোয় পেয়েছে।' কিন্তু ইহা কিছুই নয়। ইহা জীবাণুর কাণ্ড। অপরিষ্কৃত চাঁচারি হইতে ঐ জীবাণু—শিশুর ক্ষত স্থানে লাগিয়া ঐ সকল ব্যাধি সৃষ্টি করিত।

আমরা আগুণকে দেবতা, ব্রহ্মা মনে করিয়া পূজা করিয়া থাকি, বস্তুতঃ আগুণ উপাস্য দেবতাই বটে। অগ্নি—জীবাণু ধ্বংস করিবার পক্ষে অন্যতম, তাই আগুণ ডাক্তারগণের নিকট একটী বিশেষ ঔষধ। অপারেশন ও প্রসব কালীন যে যে যন্ত্রের আবশ্যক, তাহা যদি গরম জলে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ফুটাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল যন্ত্রস্থিত সমস্ত জীবাণু মরিয়া যায় এবং তাহা হইতে রোগীর অস্ত্রপ্রয়োগ বা প্রসবের পর উক্ত জীবাণু হইতে কোনও নূতন রোগ হইবার ভয় থাকে না। প্রত্যেক ধাত্রীকেই অপরিষ্কৃত চাঁচারির পরিবর্ত্তে শিশুর নাড়ী কাটার জন্য কাঁচি ব্যবহার করা উচিত এবং উহা গরম জলে টগ্‌বগ্ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ফুটাইয়া লওয়া অথবা লাইসন-লোসনে ডুবাইয়া রাখা বিধেয়।

যে ঘরে প্রসূতি ও শিশু থাকিবে, সে ঘর যতদূর সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। ঘরে বেশী আসবাব পত্র রাখিবেনা। রোদ ও বাতাস প্রবেশের সুবন্দোবস্ত রাখিবে। শিশু ও মাতাকে পরিষ্কৃত শয্যায় শোয়াইবে ও যাহাতে মশায় না কামড়ায় ও বিরক্ত না করে—সে জন্য মশারি খাটাইবে। ঘরে বেশী ধুলা-বালি জমিতে দিবে না। অপরিষ্কৃত ও ময়লা কাপড় পরিধানকারী কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। যক্ষা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ কোনও রোগীকে আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

জীবাণু হইতে রোগীর বিপদ।

নিম্ন লিখিত জীবাণুগুলি প্রসূতির জননেন্দ্রিয়ের পথে প্রসব হইবার সময় বা প্রসবের কিছু পরেই প্রসূতির রক্তের সহিত মিশিয়া সূতিকা জ্বরের সৃষ্টি করে।

(১) ষ্ট্রেপ্টককাস্ (Streptococcus) জীবাণুগুলিই সব চেয়ে সাঙ্ঘাতিক।

(২) ষ্টেফাইল ককাচ অরিয়াচ্ উহা হইতে কম সাঙ্ঘাতিক। কখন কখন এই দুই জীবাণু এক সঙ্গে রোগীকে আক্রমণ করে ও জরায়ুর পশ্চাৎ দিকে পুঁজ উৎপত্তি করে।

(৩) বেছিলাস কোলাই সময় সময় একলা অথবা উপরোক্ত দুই জীবাণুর সহিত মিশিয়া রোগীকে আক্রমণ করে। এই জীবাণু রোগীর মলদ্বারে স্বভাবতঃ থাকে। প্রথম অবস্থায় রোগ তত সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করে না, কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। Diphtheria (ডিপথিরিয়া)-জীবাণু সময় সময় এই অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে পাওয়া যায়।

৪। বেছিলাস এরিজেনাস ক্যাপস্যুলেটস বা গ্যাসের জীবাণু—শিরার মধ্যে গ্যাসের বুদ্‌বুদ সৃষ্টি করে এবং অতিশয় দুর্গন্ধ উৎপাদন করে। এই রোগ হইলে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

কোন কোন সময় জীবাণু—রক্তের মধ্যে থাকে না কিন্তু তাহাদের বিষ (toxin) রক্তের সহিত মিশিয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে জীবাণুগুলি প্রসূতির শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

১। ধাত্রী বা দাইএর নোংরা হাত ও নোংরা যন্ত্রাদি (ডুস, ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি) ব্যবহার করা। প্রসবের শেষ মাসে সঙ্গম করা। প্রসূতির স্বীয় অঙ্গুলিদ্বারা অন্যমনস্ক ভাবে জননেন্দ্রিয়ে হাত দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে জীবাণু সকল প্রসূতির শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। কোলাই-জীবাণু ঘটিত রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে বা সংক্রামক। যদি কোনও দাই এই রোগগ্রস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া কোনও সুস্থ-লোককে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে সুস্থ লোকেরও এই রোগ হইতে পারে। প্রসবের সময় যদি প্রসবদ্বার ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে জীবাণু সহজেই ঐ ক্ষত স্থানে ঘা ও পুঁজ সৃষ্টি করে ও রোগীর রক্তের সহিত মিশিয়া ভয়ানক আকার ধারণ করে। সময় সময় জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া যায় এবং উহাতে খুব দুর্গন্ধ হয়, প্রসবের পূর্ব্বে গুহ্যদ্বারে ডুস দিয়া লইলে সাধারণতঃ

মলদ্বার হইতে কোন রোগ ঐ স্থানে বিস্তৃত হইতে পারে না।

এই সমস্ত রোগ [ক্রমে জরায়ু হইতে জীবকোষ, পেরিটনিয়াম) প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া ওভেরাইটিস, সেলপিনজাইটিস, পেরিটনাইসিস প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রসূতির প্রসবের পর ১০০ ডিগ্রীর উপর জ্বর হইলেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অল্প আক্রান্তের জ্বর ২।৩ দিনের বেশী থাকে না, কিন্তু বেশী আক্রান্ত হইলে শীত হইয়া জ্বর আসে এবং ১০২।১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর হয়, তলপেটে ব্যথা হয়, পুঁজের ন্যায় স্রাব হয়। জ্বর খুব বাড়িলে স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ঘন ঘন প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের থলিতে প্রদাহ হয়; জরায়ুর আকার ক্রমশঃ কমে না এবং দাস্ত বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রত্যেক ধাত্রীরই নিকটবর্ত্তী ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া উচিত।

ইহার সহিত ম্যালেরিয়া (malaria) টাইফয়েড্ (Typhoid) ও দুধের জন্য যে জ্বর হয়, তাহার সহিত গোলযোগ হইতে পারে। অবশ্য দুধের জন্য যে জ্বর হয়, তাহাতে কোন ভয় নাই।

ঔষধের দ্বারা শুদ্ধির উপায় (Lysol) লাইছল এর ব্যবহার

প্রত্যেক ধাত্রীরই মনে রাখা উচিত যে, প্রসূতি ও নবজাত শিশুর পীড়ার কারণ অনেকটা তাহাদের পরিচ্ছন্নতার অভাব। যখনই কোন প্রসূতিকে পরিচর্য্যা করিতে বা পরীক্ষা করিতে যাইবে, তখনই ঔষধ দ্বারা হস্ত প্রভৃতি ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া দরকার। নিম্নে কতক গুলি ঔষধ ও তাহার গুণ দেওয়া গেল—

১। কারবলিক সোপ্ (Carbolic soap)—প্রসূতিকে দেখিবার পূর্ব্বে গরম জল ও কার্ব্বলিক সোপ দ্বারা কনুই পর্য্যন্ত সমস্ত হাত ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া উচিত এবং নখ ছোট করিয়া কাটিয়া যাহাতে নখের মধ্যে কিছু মাত্র ময়লা না থাকে, সে জন্য ব্রুষ দিয়া হাত ভাল করিয়া গরম জল ও কার্ব্বলিক সোপ দিয়া ঘষিয়া ধৌত করা উচিত। তা'রপর Mercuric Bin'olide নামক লোসন দ্বারা ভাল করিয়া হাত ধুইয়া লইবে। রবারের দস্তানা থাকিলে উহা ভাল করিয়া গরম জলে ফুটাইয়া লইবে।

২। Tinct Iodine:—এই ঔষধও জীবাণু নাশের পক্ষে উত্তম। কোনও জায়গা ছড়িয়া বা কাটিয়া গেলে সে স্থানে এই ঔষধ লাগাইলে সে স্থান সহজেই সারিয়া যায় এবং পরে জীবাণু ঘটিত কোনও রোগের ভয় থাকে না। এই ঔষধটা খানিক গরম জলে ফেলিয়া লোসন তৈয়ারী করিয়া তাহা দ্বারা হাত ধোয়া ও প্রসূতির জননেন্দ্রিয় ধোয়া যাইতে পারে।

৩। Boric acid—এই ঔষধও প্রসবের সময় খুব কাজে লাগে। Boric cotton নামে যে তুলা পাওয়া যায়, তাহাতে এই ঔষধ মিশান থাকে। প্রসবের পূর্ব্বে বা পরে পোয়াতীর জননেন্দ্রিয় এই তুলা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া গরম জলে ভিজাইয়া ধোয়া যায়। নাড়ী কাটার পর এই তুলা ব্যবহার হয় এবং প্রসবের পরও প্রসূতির জননেন্দ্রিয়ে এই তুলা ব্যবহার হয়।

৪। লাইছল। (Lysol)—একসের জলে এক চামচে (Lysol) মিশাইলে যে লোসন তৈয়ার হয়, তাহাতে Boric cotton দিয়া প্রসূতির জননেন্দ্রিয়—প্রসবের আগে কি পরে ধোয়াইয়া লইলে প্রসূতির কোনও জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। ইহা জীবাণু নষ্ট করিবার একটা প্রধান ঔষধ। এই ঔষধ দ্বারা ডুস dush ও দেওয়া যাইতে পারে।

গর্ভের লক্ষণ

১। ঋতু বন্ধ হওয়া।

২। বমি ২য় মাসে দেখা দেয় এবং ৪ মাসের পর থাকে না। ঘুম থেকে উঠিবার পরেই গা নেকার নেকার করে ও বমি হয়; কেবল থুঁথু উঠে। কোন কোন

পোয়াতির বাহা খায়—তাহা উঠিয়া যায় এই সময় সুচিকিৎসক দরকার।

৩। থুঁথু উঠা—কাহারও এত বেশী থুথু উঠে যে, খুব কষ্ট হয়।

৪। অরুচি ও অসাধারণ খাবারে রুচি।—সময় সময় খড়িমাটি প্রভৃতি অসাধারণ জিনিস খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ভাত খাইতে ইচ্ছা হয় না।

৫। স্তন টাটান।—প্রথম মাসের শেষেই স্তন টন্ টন্ করে, ভারি ভারি বোধ হয় এবং টিপিলে ব্যথা লাগে।

৬। পেটে ছেলে নড়া।—সাড়ে চার মাসে ছেলে নড়া—পোয়াতি টের পায়। প্রথম প্রথম মনে হয় পেটে কি নড়ে, তারপরে পেটে ঘুসি লাথি মারা টের পায়।

৭। গর্ভের প্রথমে ও শেষে প্রস্রাব বাড়ে।

এই সকল লক্ষণগুলি পোয়াতির নিজে টের পায়, কিন্তু নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি অপরে বা ধাত্রী যে পরীক্ষা করে সে বুঝিতে পারে—।

১। স্তনের পরিবর্ত্তন -দ্বিতীয় মাস হইতে স্তন বড় হইতে থাকে, স্তনের উপর কাল কাল শির দাঁড়ায়। ৩য় মাসে বোঁটার চারি ধার বেশ কাল হয়। একে বলে 'ত্যালা'। পরে (areola) এরিওলা উঁচু হয়, আঙ্গুল দিলে নরম বোধ হয় ও ভিজা ভিজা ঠেকে, ৫।৬ মাসের শেষাশেষি ইহার চারিদিকে আরও এরিওলা পরে এবং ইহার উপর ফুস্কুরির মত হয়—ইহাকে "মণ্টগমারি কলিক্ল" বলে। স্তনের বোঁটা ক্রমশঃ বড় হয় তিন মাসে এই বোঁটা টিপিলে ইহা হইতে আঠার মত বা'র হয়, এই আঠাই ক্রমশঃ দুধ হয়। স্তনের উপর টান পড়িলে সাদা সাদা দাগ হয়

২। পেট উঁচু হয়, তিন মাসের শেষে চার মাসের প্রথমে পেট উঁচু হইতে থাকে। ৪ মাসের শেষে জরায়ু— পেটের পিউবিক বোনের উপর তিন আঙ্গুল উঠে। পাঁচ মাসের মাঝামাঝি এই হাড় ও নাইয়ের মাঝামাঝি; ৬ মাসে নাইয়ের সমান। ৭ মাসে নাইয়ের ৩ আঙ্গুল উপরে। ৮ মাসের শেষে নাই ও বুকের কড়ার মাঝামাঝি, ৯ মাসে বুকের কড়া পর্য্যন্ত। প্রসবের ২।৩ সপ্তাহ আগে জরায়ু নেমে ৮ মাসে যত উঁচু ছিল—তত উঁচু হয়।

৩। পেটে কটা, নীল ও কাল দাগ—পেট খুব উঁচু হ'লে ফাটার দাগ হয়। এই দাগ তলপেটের নীচ হইতে তলপেটের মাঝ পর্য্যন্ত উঠে, সময় সময় বুকের কড়া পর্য্যন্ত উঠে।

৪। জরায়ুর সঙ্কোচ—৩ মাসের শেষে পেটে হাত দিলে একটা ময়দার পিণ্ডের মত টের পাওয়া যায়, সেইটা থেকে থেকে শক্ত হয় একেই বলে জরায়ুর সঙ্কোচ বা কন্ট্রাকসান। ৪।৫ মিনিট শক্ত থাকিয়া আবার নরম হইয়া যায়।

৫। ছেলের হাত পা—যে সব পোয়াতির পেটের চামড়া পুরু নহে—তাহাদের পেটে ৬।৭ মাসে হাত দিলেই ছেলের হাত পা টের পাওয়া যায়।

৬। ছেলে নড়া—৫।৬ মাসের পোয়াতির পেটে হাত দিলে টের পাওয়া যায়—ছেলে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় সরিয়া যায়।

৭। জরায়ুর মুখ নরম হয়। যোনির ভিতর আঙ্গুল দিলে ইহা দ্বিতীয় মাসের শেষে টের পাওয়া যায়। ঠোঁট টিপিলে যেমন নরম বোধ হয়, ঠিক সেই রকম। ক্রমশঃ সমস্ত জরায়ুর উপর (সারভিক্স) নরম হয়।

৮। ভেজাইনা—গোলাপি রং, বেগুণে বা গাঢ় নীল হয়। ৪।৫ মাসে যোনিতে হাত দিলে শিরার দপদপানি টের পাওয়া যায়।

৯। বেলটমো—অচ্ এর উপরে জরায়ুর গায়ে আঙ্গুল দিয়া ধাক্কা দিলে কি একটা ভারি জিনিস আঙ্গুলের আগায় টপ্ করে পড়ে।

চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্ব্বেদের স্থান

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল দাশগুপ্ত, কাব্যতীর্থ কবিভূষণ)

আয়ুর্ব্বেদের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্ব্বেদের আদিমত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় প্রকাশ করেন না। এই প্রাচীন শাস্ত্রের প্রারম্ভকাল যথাযথরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয়ও নহে। কার্য্যকারিতা ও উপযোগিতা গুণে আয়ুর্ব্বেদের স্থান নির্দ্দেশই আমাদের লক্ষ্য। আজকাল এক শ্রেণীর নব্যশিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসক ধুয়া ধরিয়াছেন যে, "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—বিজ্ঞান সম্মত নহে। বিজ্ঞানের কঠোর পরিমাপক দণ্ডের আঘাত লাগিলেই ইহা ক্ষণভঙ্গুর কাচখণ্ডের মত চূর্ণ হইয়া যায়। বৈদ্যক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রাচীন কালের সভ্যতাশূন্য হাতুড়েদের খেয়ালের পরিচয় মাত্র।" এইরূপ মতবাদ যদিও উপেক্ষার চোখেই দেখা উচিত, তথাপি সাধারণের হিতকামনায় এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ না বলিয়াও নিরস্ত হইতে পারিলাম না। কোন্ চিকিৎসা বিজ্ঞানসিদ্ধ বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ এ সম্বন্ধে মীমাংসা রূপে করা যায়? যদি চিকিৎসা শাস্ত্র কথিত ঔষধগুলি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইলে রোগীর রোগোপশম ও স্বাস্থ্যলাভ ঘটে; তাহা হইলে ঐ চিকিৎসা-শাস্ত্র বা তদুক্ত ঔষধকে বিজ্ঞান সম্মত বলা যায় কি না। সাধারণভাবে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী সহজবোধ্য করা যাক্। বৈদ্যকশাস্ত্রে গুলঞ্চের গুণের মধ্যে ত্রিদোষনাশক, জ্বরঘ্ন, রক্তশোধক প্রভৃতি গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ব্যবহারেও শত শত রোগীকে জ্বর, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে, এক্ষণে এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঔষধটীকে বিজ্ঞানসিদ্ধ বা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিব? বিজ্ঞান যদি ব্যবহারিক দ্রব্যের পরিচয় জ্ঞাপনের উপায় বলিয়াই ধরা যায়, তবে এ স্থলে 'বিজ্ঞান বিরুদ্ধ' একথা কোনমতেই বলা যায় না। এ স্থলে গুলঞ্চের গুণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। দর্শনশাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমিতি, শাব্দবোধক এই চারিপ্রকারই প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ে আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। তবে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি স্থলে পৃথক কথা। সে স্থলে ভ্রমযুক্ত বুদ্ধিবশে সর্পাকৃতি রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, সুতরাং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা যায় না। বস্তুগত এই ভ্রম সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই সম্ভবপর। তারপর দ্রব্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়াদির পরিচয়ও বৈদ্যশাস্ত্রে যথেষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যগত মৌলিক উপাদান এবং ঐ উপাদানের অংশাংশ কল্পনা অর্থাৎ কোন দ্রব্যে কোন্ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণে বর্ত্তমান এ সমস্তই অতি বিস্তৃতভাবে কথিত আছে। উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ দিতে হইলেও একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। স্থূলভাবে সাধারণের অবগতির জন্য মহর্ষি চরকোক্ত দ্রব্যগুণাদির পরিচয়-প্রণালীর মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সমস্ত দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক। অর্থাৎ পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় ও আকাশীয় অংশের সমবায়ে ঘটিত। পার্থিবাদি ভাগের তারতম্যেই দ্রব্যের নানাবিধত্ব এবং গুণ—ক্রিয়াদিরও পার্থক্য সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পার্থিব ভাগ প্রধান দ্রব্য—গুরু, খর, কঠিন, স্থৈর্য্যশালী, স্থূল, সান্দ্র, গন্ধযুক্তাদি গুণ সম্পন্ন হয়। জলীয় ভাগ প্রধান দ্রব্য—তরল, স্নিগ্ধ, শীতল, মৃদু, পিচ্ছিলাদি গুণযুক্ত হইয়া থাকে। তৈজসাংশ প্রধান দ্রব্য—উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, লঘু, রুক্ষ, ও বিশদাদি গুণসম্পন্ন হয়। বায়ব্য ভাগাধিক দ্রব্য—লঘু,

শীতল, খর, রুক্ষ ও স্পর্শগুণ প্রধান হইয়া থাকে। আকাশ ভাগ বহুল দ্রব্য—মৃদু, লঘু, শ্লক্ষ্ণ, ও শব্দগুণ প্রধান হয়। পার্থিবাদি ভাগের ন্যূনাতিরেক ভেদে যেমন প্রত্যেক বস্তুর গুণের পার্থক্য হয়, সেই মত উক্ত হেতুতে প্রত্যেক দ্রব্যের ক্রিয়ারও পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

পার্থিবাংশ প্রধান দ্রব্য—উপচয়, সঙ্ঘাত, গুরুত্ব ও স্থৈর্য্য সম্পাদক।

জলীয়াংশ প্রধান দ্রব্য—উপক্লেদ, স্নেহ, বন্ধ, বিষ্যন্দ, মার্দ্দব ও আহ্লাদজনক।

বায়ব্য ভাগ বহুল দ্রব্য—রৌক্ষ্য, গ্লানি, বিচারণা, বৈষদ্য ও লঘুতাকারক।

আগ্নেয়ভাগ প্রধান দ্রব্য—দাহ, পাক, প্রভা, বর্ণ, ও প্রকাশজনক।

আকাশ ভাগাধিক দ্রব্য—মার্দ্দব, ছিদ্র, লঘুতা সম্পাদক।

উল্লিখিত দ্রব্য-পরিচয়ের উপদেশ দ্বারা সাধারণভাবে দ্রব্যের গুণ ও কর্ম্মের বিষয় এবং চিকিৎসোপযোগিতার মূল কারণও অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তা'রপর মধুরাদি ষড়বিধ রসের পরিচয় বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যেরূপভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা বহুকালার্জ্জিত অসামান্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল। মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়—এই ছয়টী মৌলিক রস। দ্রব্যমাত্রেই রসের অবস্থান আছে। প্রায় সকল দ্রব্যেই সমস্ত রসের অস্তিত্ব থাকে, কিন্তু যে দ্রব্যে যে রসের প্রাধান্য থাকে, তদনুসারেই সেই দ্রব্যের গুণ-ক্রিয়াদির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্যের উপাদানের তারতম্যই রসের নানাবিধত্বের কারণ। ব্যাধির আরম্ভক দোষ বিচার করিয়া কোন্ রসের দ্বারা সেই দোষ উপশমনীয় তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। ব্যাধি যেমন এক দোষজ প্রায়ই হয় না, কিন্তু আরম্ভক ও প্রধান দোষের নামানুসারেই রোগের বাতজরাদি ব্যপদেশ হয়, দ্রব্যও সেইরূপ এক রস সম্পন্ন হয় না, উহাতে যে রসের প্রাচুর্য্য থাকে, তাহার নামানুসারেই দ্রব্যের মধুরাদি বিশেষণ প্রয়োজ্য হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সমস্ত দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক। পার্থিবাদি ভাগের তারতম্যে বস্তুর নানাকারতা ও নানাজাতীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে। রসের ষড়্‌বিধত্ব ব্যাপারেও এই পাঞ্চভৌতিক সংযোগ-বিয়োগকেই নিমিত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা—মধুর রস—সৌম্য অর্থাৎ জলীয়ভাগাধিক্য হইতে উৎপন্ন। অম্লরস—পার্থিব ও তৈজসগুণের প্রাধান্যে জাত। লবণরস—জলীয় ও তৈজস গুণাধিক্যে। কটুরস—বায়বীয় ও আকাশ গুণের আধিক্যে। বায়ু ও আকাশ গুণের আধিক্যে—তিক্তরস; বায়ু ও পার্থিব গুণের আধিক্যে কষায় রস উৎপন্ন হয়। কোন কোন বৈদ্য—ক্ষার পদার্থকেও একটী পৃথক রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা সিদ্ধান্ত সম্মত নহে। ক্ষার—রস হইতে পারে না, কারণ উহা অনেক রসযুক্ত দ্রব্য হইতে সমুৎপন্ন। অতএব উহা অনেক রসবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ বিশেষ। তবে উহাতে সাধারণতঃ কটু ও লবণ রসেরই আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষার যে রস নহে তাহার বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ এই যে, ক্ষার—স্পর্শ ও গন্ধযুক্ত। কিন্তু রসে স্পর্শ ও গন্ধ নাই, একমাত্র রসনেন্দ্রিয়েরই উহা গ্রাহ্য। ক্ষার—পদার্থ, প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা উহা উৎপন্ন হয়, কিন্তু রস—দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ, অতএব ক্ষার রস নহে, উহা দ্রব্য। রসের আধিক্য অনুসারে দ্রব্যের গুণ ও কর্ম্মাদির পার্থক্য হইয়া থাকে। ঐ পার্থক্য বোধ করিয়া যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কোন্ রস সেবনে কোন্ দোষের প্রকোপ বা প্রশমন হয়, তদ্বিষয়ে বৈদ্যকশাস্ত্রে বহু যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইয়াছে। আমি সংক্ষেপে উক্ত বিষয়ের মূল বিবরণী মাত্র এখানে প্রমাণ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা—তৈজস ও বায়বীয় গুণাধিক রস—বায়ুর লঘুতা ও গতিশালিতাবশতঃ এবং অগ্নির ঊর্দ্ধ জ্বলনত্ব হেতু প্রায়ই দেহের ঊর্দ্ধভাগে ক্রিয়া প্রদর্শন করে। জলীয় ও পার্থিব গুণাধিক রস জলের নীচগামিতা ও পার্থিব ভাগের ভারবত্তা

বশতঃ শরীরের অধোভাগে ক্রিয়াকরী হয়। ব্যামিশ্রাত্মক রস নিজ নিজ শক্তি প্রভাবে অঙ্গের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে কার্য্য করে। এই সব স্থলে রস শব্দে সেই সেই রসযুক্ত দ্রব্যকেই বুঝিতে হইবে। কারণ দ্রব্য হইতে রসকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। পৃথক পৃথক রসের গুণ-ক্রিয়াদির বিষয় যথাযথ ভাবে উল্লেখ করিতে হইলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়, সুতরাং তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

মধুর রস—শরীরের সমস্ত ধাতুর (রস, রক্ত, মাংসাদির) পরিপোষক, আয়ুবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাকারী, বল ও কান্তিজনক। পিত্তদোষ, বিষদোষ ও বায়ুর শান্তিজনক, তৃষ্ণাহর, চর্ম্ম ও কেশের হিতকারী, স্থৈর্য্যকর, ভঙ্গসংযোজক, নাসামুখরন্ধ্র ও জিহ্বার বিশুদ্ধি কারক, দাহ ও মূর্চ্ছার প্রশমনকারী, ইত্যাদি গুণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু মধুর রসের অতি সেবনে অথবা কেবল এই রস সেবনে শরীরের অযথা স্থূলতা, মৃদুতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, গাত্র গৌরব, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, সর্দ্দি, প্রতিশ্যায়, অলসক, নেত্ররোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, মুখ ও নেত্রস্রাব প্রভৃতি কফজনিত বিবিধ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়।

অম্লরস—খাদ্যে রুচিজনক, অগ্নিদীপক, পুষ্টি ও তেজোবর্দ্ধক, মানসিক শক্তির উদ্বোধক, ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, বলবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমক, লালাস্রাবক, ভুক্ত দ্রব্যের ক্লিন্নতাকারক। ইহা লঘু, উষ্ণ, ও স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন। কিন্তু অম্ল রসের অতি সেবনে বা কেবল ঐ রস ব্যবহারে দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ জন্মায়, কফকে তরল করে, পিত্তকে বর্দ্ধিত করে, রক্তদুষ্টি, মাংস বৃদ্ধি, দেহ শৈথিল্য, ক্ষীণ, কৃশ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির দেহে শোথ, প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। অধিকন্তু অম্লরস উষ্ণ প্রকৃতি বলিয়া ক্ষত, অভিঘাতপ্রাপ্ত, দগ্ধ, ভগ্ন, শোথ ছিন্ন, ভিন্ন ও উৎপিষ্টাদি স্থানের পাক জন্মায় এবং কণ্ঠ, হৃদয় ও বক্ষঃস্থলে জ্বালা উৎপাদন করে।

লবণ রস—পাচক, ক্লেদজনক, অগ্নিদীপক, স্রাবজনক ছেদন (গাঢ় মলাদির উচ্ছেদক) ভেদক, সারক, বাতহর, স্তব্ধ ও বিবদ্ধ ভাবের নাশক, মুখস্রাবজনক, কফনিঃসারক, স্রোতঃ শোধক, দেহের মার্দ্দব কারক, ভোজনে রুচিকর লবণরস অনতিগুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। লবণরসের অতি সেবনে পিত্তের প্রকোপ ও রক্ত বিবৃদ্ধি জন্মায়, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মোহ ও দেহতাপ বৃদ্ধি করে, দেহ বিদীর্ণ করে, কুষ্ঠকে গলিত করে, বিষের শক্তি বর্দ্ধন করে, শোথকে স্ফুটিত করে, দন্তচ্যুতি করে, পুরুষত্ব হানি জন্মায়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তির উপরোধ করে, অকালে বলিপলিত জন্মায় এবং রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, বিসর্প, বাতরক্ত, বিচর্চিকা ও ইন্দ্রলুপ্তাদি রোগ উৎপাদন করে।

কটু রস—মুখের বিশুদ্ধি জনক, অগ্নির দীপক, ভুক্ত বস্তুর শোষক, নাসা স্রাবজনক, অশ্রুস্রাবকর, ইন্দ্রিয়গণের প্রব্যক্তিজনক, অলসক, শোথ, উপচয়, অভিষ্যন্দ, উদর্দ্দ স্বেদ, ক্লেদ প্রভৃতির উপশমকারী, ভোজনে রুচিজনক, কণ্ডু, ব্রণ ও ক্রিমিনাশক, মাংসের বিলেখনকারী, রক্তের গাঢ়তানাশক, বিবদ্ধতাহর, স্রোতঃ সমূহের বিকাশ কারক ও কফের প্রশমক। এই রস লঘু, উষ্ণ, ও রুক্ষ গুণ সম্পন্ন। কিন্তু অতি মাত্রায় কটু রস সেবনে পুরুষত্ব হানি হয়; এবং মোহ, গ্লানি, অবসাদ, মূর্চ্ছাদি রোগ মত্ততা, দবথু, (নেত্রাদির তাপ) কম্প, সূচীভেদবৎব্যথা ও হস্ত পদাদিতে বায়ুজনিত বিবিধ পীড়া জন্মাইতে পারে।

তিক্তরস—নিজে অরোচিষ্ণু তথাপি অরুচিনাশক, বিষদোষ নাশক, ক্রিমিঘ্ন, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা কণ্ডু ও কুষ্ঠাদির প্রশমকারী, ত্বক্ ও মাংসের স্থৈর্য্যসম্পাদক, জ্বরঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক, স্তন্যশোধক, ক্লেদ, মেদ, লসীকা, পূয, স্বেদ, মল, মূত্র, কফ ও পিত্তাদির শোষক, ইহা রুক্ষ, শীতল ও লঘু। অতিরিক্ত পরিমাণে তিক্তরস সেবনে রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর শোষণ হয়। স্রোতঃ সকলখরতা প্রাপ্ত হয়, বলহানি, দেহের হ্রস,

কৃশতা, মোহ, ভ্রম, মুখশোষও বিবিধ বায়ুজন্য রোগ উৎপন্ন হয়।

কষায় রস—সংশোধন, মল মূত্রাদির রোধক, শোণাদির আকর্ষণ ও সংকোচনকারক, ক্ষতস্থানের পূরণকারী, ক্লেদ-পূযাদির শোষক, রক্তপিত্ত ও কফের প্রশম জনক। ইহা রুক্ষ, শীতল ও গুরু। কষায় রসের অতিমাত্রা সেবনে মুখশোষ, হৃদয়পীড়া, উদরের আধ্মান, কথার জড়তা, স্রোতঃ সমূহের উপরোধ, শরীরের শ্যাববর্ণতা পুরুষত্ব হানি, বাত, মল, মূত্র ও শুক্রের বিবন্ধ, কৃশতা তৃষ্ণা ও স্তব্ধতা সম্পাদন করে এবং পক্ষাঘাত, অপতানক, অর্দ্দিত প্রভৃতি বাতব্যাধি জন্মে। উক্ত রস সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা বৈদ্যকে প্রচারিত আছে এরূপ আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে কি না সন্দেহ। প্রকৃতি ভেদে যথাযথ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ রসের প্রয়োগ করিতে পারিলে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে—রুগ্নাবস্থায় রোগের দোষের বলাবল বুঝিয়া তৎতদ্ দোষোপশমক রস প্রয়োগে ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। অতএব কি সুস্থ দেহে, কি রুগ্নাবস্থায় আয়ুর্বেদীয় রসবিজ্ঞান চিকিৎসাজগতে যে অতি উপাদেয় ও সমাদরের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

মন্দানল

(কবিরাজ শ্রীশীতল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন)

আহার—শরীরীর শরীর ধারণের ও পোষণের হেতু এবং ওজোবল-বর্ণোপচয়ের বিশিষ্ট কারণ। মাত্রাবৎ অর্থাৎ যথোচিত পরিমিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় - এই চতুর্ব্বিধ আহার উদর্য্য পাচকের সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দ্বিধা বিভক্ত হয় অর্থাৎ দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। আহার্য্যের শরীর পোষণোপযোগী সারভাগ পঞ্চভূত প্রসাদজ * শ্বেত-স্বচ্ছ-তরল রস ধাতুতে পরিণত হয়; অসারাংশের জলীয়ভাগ মূত্ররূপে এবং পার্থিবাংশ মলরূপে পরিণত হইয়া অপান বায়ুর সহায়তায় স্ব স্ব মল পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। উক্ত রসকে আদ্য ধাতু বলে। আদ্য ধাতু রঞ্জক পিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত ধাতুতে পরিণত হয়। রক্ত যথাক্রমে মাংসাদি ধাতুগণকে পোষণ করে।

"নহ্যপক্কাদ্রসাদয়ঃ" অর্থাৎ পরিপাক যন্ত্র পরম্পরায় আহার্য্য দ্রব্য পিষ্ট-ক্লিন্ন স্নিগ্ধ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইলে রসের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। তজ্জন্য যাহাতে পরিপাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত না হয়, জিজীবিষু দেহি মাত্রেরই তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ "রোগাঃ সর্ব্বেঽপি মন্দেঽগ্নৌ" অর্থাৎ অগ্নি মন্দ হইলে শরীরে অজীর্ণ এবং আরও নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। কথাটা স্মরণ রাখিয়া যাহাতে পরিপাক শক্তির বিপর্য্যয় না ঘটে তাহা করা উচিত।

* জীবের শরীর পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজঃ এবং আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে জীবদেহ গঠিত। ক্ষীয়মাণ শরীরের পোষণোপযোগী ক্ষিতি প্রভৃতি উপাদান পঞ্চক আহারজ রসে বিদ্যমান থাকে। এই জন্য রসসংজ্ঞক আদ্য ধাতুকে পঞ্চভূত প্রসাদজ বলে।

কি করিলে পরিপাক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—সংক্ষেপে তাহা বলা যাইতেছে।

সুপক্ক, হিত, পরিমিত, শুচি এবং সাত্ম্যাহার ভোজন-বিধি অনুসরণ করিয়া ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য যথাকালে সুজীর্ণ হয়*। পরিমিত মাত্রায়, নির্ম্মল জল পান, নির্ম্মল বায়ু নিষেবন, আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম এবং বৈধনিদ্রা প্রভৃতিও ভুক্তান্ন পরিপাকের অন্যান্য সহকারী কারণ।

সুপক্কাহার—রন্ধন-কুশল পাচক কর্ত্তৃক যথাযথরূপে পাক করা গুণবদ্ খাদ্য দ্রব্যকে সুপক্কাহার্য্য দ্রব্য বলে। সুপক্কাহার্য্য দ্রব্য সুস্বাদু এবং সুখপাচ্য। অপক্ক বা অসম্যক্ পক্ক আহার্য্য বিস্বাদু, দুষ্পাচ্য এবং নানা রোগের হেতু।

হিতাহার—মধুর প্রায়ঃ, ষড়্রস সমন্বিত শরীর পোষণের উপযোগী উপাদানবৎ আহারই হিতাহার। হিতাহার মনেরও তৃপ্তিপ্রদ।

মিতাহার—কোষ্ঠে যে পরিমিত আহার যথাসময়ে সুজীর্ণ হয় তাহার নাম মিতাহার। মিতাহারের অপর নাম মাত্রাবদাহার। তদ্বিপরীত আহারের নাম অমাত্রাহার। আহারের অমাত্রাবত্ব হীন এবং অধিক ভেদে দুই প্রকার। হীনমাত্রাহারে অপর নাম প্রমিতাশন। যে আহার্য্যে শরীর পোষণোপযোগী সমস্ত উপাদান বিদ্যমান না থাকে, তাহা ভোজন করা এবং উপাদানবৎ আহার্য্য অত্যল্প পরিমাণে ভোজন করার নাম প্রমিতাশন। †

ভোজন সময়ে তন্মনা হইতে হইবে। যখন বুঝিবে অন্নদ্বারা অর্দ্ধোদর পূর্ণ হইয়াছে আর পানীয় দ্বারা একচতুর্থাংশ পূর্ণ হইয়াছে অবশিষ্ট চারিভাগের একভাগ খালি আছে, তখনই ভোজন সমাপন করিবে।

সুশ্রুতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্বনাচার্য্য পরিমিতাহারের নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

"অপীড়নং ভবেৎ কুক্ষেঃ পার্শ্বয়োরবিপাটনম্।
নাস্নেন হৃদয়াবাধো জঠরস্তম্ভগৌরবম্।
প্রীণনং চক্ষুরাদীনাং শমনং ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
উচ্ছ্বাস শ্বাসহাস্যাদি কথাসু সুখ বর্ত্তনম্।
সুখেন পরিণামস্যাদয়ে ভুক্তে দিবানিশি।"

ইহার ভাবার্থ—যে পরিমিত আহার করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয় অথচ কুক্ষিদেশের, পার্শ্বদ্বয়ের এবং হৃদয়ের কোন প্রকার অস্বাস্থ্য উপস্থিত না হয়, উদর দেশ বেশ লঘু বোধ হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুপ্রসন্ন থাকে, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণে কোন কষ্টানুভূতি হয় না মনঃ সুপ্রসন্ন থাকে, তজ্জন্য হাসিতে ও কথা বলিতে অনিচ্ছা থাকেনা এবং ভুক্তান্ন সুখে জীর্ণ হয়।

সাত্ম্যাহার—মধুররসবহুল ষড়রসাত্মক আহারই নর-নারী গণের প্রকৃত সাত্ম্যাহার। কিন্তু সকলের প্রকৃতি একরূপ হয় না। তজ্জন্য একই প্রকারের আহার সকল নর-নারীর পক্ষে সম্যক উপযোগী হয় না। যাহার পক্ষে যেরূপ আহার হিতকর, তাহারই সেই রূপ আহার সাত্ম্যাহার।

শুচি আহার—রন্ধন দ্রব্যের এবং সুপক্ক অন্ন, ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ প্রভৃতির শুচিত্ব রক্ষা করা ভোক্তৃগণের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশুদ্ধ রন্ধন দ্রব্য সর্ব্বপ্রযত্নে আহরণ করিবে। রন্ধন সময়েও সাবধান হইতে হইবে। পাক করা অন্নাদিও আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। এক প্রহর কাল অতীত হইলে রন্ধন করা অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি অশুচি হয়; তদধিককাল অতিক্রম করিলে ভ্রষ্টরস ও বিস্বাদু হইয়া যায়। পূতি—পর্য্যুষিত অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি অত্যন্ত

* সায়ং প্রাতশ্চ সুখেন পরিণমনম্। তদন্নস্য পাকস্য নির্দ্দিষ্ট কালঃ। চরক সংহিতা, বিমানবস্থানম্।

† অমাত্রাবত্বং পুনর্দ্বিবধমোচক্ষতে হীনমধিকঞ্চ। তত্র হীনমাত্রমাহাররাশি বলবর্ণোপচয় ক্ষয়করমতৃপ্তি করমুদাবর্ত্তকরমবৃষ্য মনায়ুষ্য মনোজস্যং শারীর মনোবুদ্ধে ক্রিয়োপঘাতকরং সারবিধমন মলক্ষ্যাবহমশীতেশ্চ বাত বিকারাণামায়তন মাচক্ষতে সর্ব্বকুশলাঃ। অতিমাত্রং পুনঃ সর্ব্বদোষ প্রকোপনম্।

দ্বিতীয়তঃ তাহাতে আবার কালের অনুগ্রহে প্রাকৃতিক উত্তাপের সহিত মানবদেহের সংস্পর্শ কম থাকায় এবং রাত্রি দীর্ঘ হওয়ায় মানবের পরিপাকশক্তিও শীতকালে বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে,—মানুষ যাহা খায়—তাহা যেন সহজেই এই সময় জীর্ণ হইয়া যায়, সুতরং খাদ্যাদির পুষ্টি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারায় মানবদেহ পুষ্ট ও বলশালী হইয়া থাকে। এই সময়ে নদ-নদী-সরোবরের স্বচ্ছ-সুনির্ম্মল জল, মেঘ শূন্য সুনীল আকাশ ও বিশুদ্ধ বাতাস বাস্তবিকই দেহ-মনের বিশেষ তৃপ্তিসাধন করে, এই সকল কারণে শীতকালই মানবের দেহবলের চরম উৎকর্ষ সাধক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এইরূপ সুসময়কে সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে হেলায় অতিবাহিত করা কোন স্বাস্থ্যকামীরই উচিত নহে। এক্ষণে কি করিলে—কিরূপ নিয়মে চলিলে ঋতুর অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে লাভ করা যায়—তাহারই আলোচনা করা যাউক। অন্য ঋতু অপেক্ষা শীতঋতুতে রাত্রি দীর্ঘ হয় বলিয়া রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই মানুষ সাধারণতঃ ক্ষুধিত হইয়া পড়ে, সুতরাং মলমূত্রাদি পরিত্যাগ, দন্তধাবন, মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি আবশ্যকীয় প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পরই কিছু লঘু আহার করা উচিত।

দেহ সুগঠিত ও স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে হইলে,অপরিপক্ক দেহ বালক এবং জরাজীর্ণকায় বৃদ্ধ ব্যতীত প্রত্যেক মানবেরই অল্লাধিক পরিমাণে প্রত্যহ ব্যায়াম করা আবশ্যক,শীতকাল—ব্যায়ামের পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। এই কালে শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনের পর ব্যায়াম আরম্ভ করা ভাল, অপর ব্যায়াম অপেক্ষা সমবয়স্কের সহিত মল্লযুদ্ধ-কুস্তী-লড়াই দেহের দৃঢ়তা ও বল বৃদ্ধির বিশেষ সহায়ক মনে রাখিতে হইবে। সকল ব্যায়ামেরই একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা আছে। অত্যধিক ব্যায়াম বিবিধ রোগ উৎপন্ন করিয়া জীবন বিপন্ন করিতে পারে, এজন্ত প্রত্যেকেরই শরীরের শ্রান্তি বোধ করিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ব্যায়াম কাল নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। নিজেকে পরিশ্রান্ত বোধ করিবামাত্র ব্যায়াম—সেদিনকার মত স্থগিদ রাখিবে। শীতকালে শরীরের সমস্ত পেশীর সঞ্চালন ও মর্দ্দন-ঘর্ষণ হয়—এরূপ একটা ব্যায়ামের প্রয়োজন। সুতরাং সমান বয়স ও বল বিশিষ্ট দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত হাতে হাতে ও পায়ে পায়ে কুস্তী করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সঙ্গত। নিজ অপেক্ষা অধিক বলীয়ানের সহিত কুস্তী করা দেহের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। বলা বাহুল্য যে, মুক্ত বায়ু প্রবাহ বিশিষ্ট স্থানই ব্যায়ামের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। ব্যায়াম শেষ করিবার একটু পরে লোধছাল, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও বেণার মূল প্রত্যেকটি সমান ভাগে (আনুমানিক এক তোলা করিয়া) লইয়া শীতল জলে পেষণ করতঃ সর্ব্বাঙ্গে লেপন ও আস্তে আস্তে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। শীতকালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা ভাল। এই কালে স্নানের পর কুঙ্কুম-কস্তুরী—জলে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপনের বিধান আছে, ইহা ব্যয়বহুল এবং সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, সুতরাং অভাব পক্ষে অন্ততঃ গরম কাপড়ের পাতলা জামা পরিধান করিয়া সেই সময়কার ঠাণ্ডা হইতে শরীর রক্ষা করিবেন, তৎপরে অগুরু কাষ্ঠ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ও ঈষৎ চূর্ণ করিয়া তাহা জলন্ত অঙ্গারে নিঃক্ষেপ করতঃ তাহার ধুম সর্ব্বাঙ্গে গ্রহণ করিবেন।

শীতকালে প্রচুর পরিমাণে আহার করা উচিত, নতুবা প্রদীপ্ত ক্ষুধা দেহের রসাদি শোষণ করিয়া দেহকে কৃশ করিয়া ফেলে। এই সময় মিষ্টরস, অম্ল রস ও লবণ রস যুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ আলু, পটোল, বেগুণ, লাউ, ওল, মানকচু, কুমড়া, চাল্‌তা, এখনকার ফুলকপি প্রভৃতি তরীতরকারী এবং হৃষ্টপুষ্ট ছাগ, মেষ ও হরিণের চর্ব্বিযুক্ত মাংস বেশী পরিমাণে বিশুদ্ধ ঘৃতে কিম্বা তৈলে রন্ধন করিয়া খাওয়া ভাল। নূতন চাউলের অন্ন, পায়স, ছানা, সন্দেশ প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং গম ও চাউলের আটার দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকাদি প্রভূত পরিমাণে যাহা গুরুপাক বলিয়া অন্য ঋতুতে জীর্ণ না হইয়া অম্ল উৎপাদন করে—তাহা শীতকালে প্রদীপ্ত পাচকাগ্নিতে সহজে জীর্ণ হইয়া দেহের বলবৃদ্ধি সাধন

করে। এই সময়ে গালিচা, মৃগচর্ম্ম প্রভৃতির আসনে উপবেশন এবং অবস্থানুসারে কম্বল, বনাত প্রভৃতি গরম কাপড়ে আবৃতশয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। শয়ন কালে তুলা নির্ম্মিত হাল্‌কা লেপ কিম্বা বালাপোষ প্রভৃতির দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবেন। শীতকালে সহ্যমত সামান্য অগ্নিতাপ এবং যথোপযুক্ত মাত্রায় সূর্য্যকিরণ শরীরে লাগান উচিত। এই কালে জুতা, খরম প্রভৃতি পাদত্রাণ সর্ব্বদা ব্যবহার করা ভাল।

শীতকালে চতুর্দ্দিকে ঘেরা বারান্দা বিশিষ্ট বাড়ীর মধ্যে গৃহে অবস্থান—স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী। গৃহে নির্ধূম অগ্নিভাণ্ড রাখিলে বাহির হইতে আগত গৃহের বাতাস উষ্ণ থাকে। ফলে তাহার দ্বারা সর্দ্দি-কাসির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া কখনো গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তাহাতে আগুণ রাখিয়া বাস করা কিম্বা রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে, ইহা মারাত্মক অনিষ্টকারী বলিয়া মনে রাখিবেন। শীতকালে এই সকল বিধান মানিয়া চলিলে বলবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বলা বাহুল্য যে, এতদ্‌-ভিন্ন অজীর্ণ সত্বে পুনরায় ভোজন না করা ও মল মূত্রাদির বেগ ধারণ না করা এবং আহার-বিহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা প্রভৃতি সাধারণ-স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম গুলি অবশ্য পালনীয়। এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, শীতকাল বলিতে আমি এখানে হেমন্ত ও শীত—উভয় ঋতুকে লইয়াই গণনা করিয়াছি, কারণ এই দুই ঋতুতেই অল্লাধিক পরিমাণে শীত বর্ত্তমান থাকে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানগুলিও উভয় ঋতুতে এই প্রকারের বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদে সুস্থ অবস্থায় সেবনোপযোগী সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকারক কয়েক প্রকার ঔষধের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দ্রাক্ষারিষ্ট ও দশমূলারিষ্ট প্রভৃতি বলকারক উষ্ণবীর্য্য ঔষধ এই সময়ে অল্প মাত্রায় সেবন বিশেষ উপকারী। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন শুধু মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে—এমন নহে, অনেক পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এই সময় হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর হইয়া উঠে। সাধারণতঃ শীতকালে কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ ও হস্তীকে অতিশয় বলবান হইতে দেখা যায়।

সম্প্রতি শীতকাল হইতে মানবদেহের কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে—তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই সময়ে সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাবই পৃথিবীতে প্রবল এবং তজ্জন্য শৈত্যের অনুভূতি অধিক। এই শীতলতা, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি চান্দ্রগুণে এবং তাহারই ফলে পরিপুষ্ট ধান্যগোধূমাদি আহার্য্য পদার্থের গুরুপাক নিবন্ধন শীতকালে কফের সঞ্চয় হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা হাঁপ কাশ প্রভৃতি এই সময়েই সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়, প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে রক্তহীন শোথ রোগীর শোথ এবং উদরী রোগের উদর বৃদ্ধি এই সময়ে অধিক হইয়া থাকে, তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই এরূপ রোগগ্রস্ত রোগীর সাবধান হওয়া উচিত। হাঁপ কাশের পক্ষে গরম জল পান ও সহ্যমত গরম জলে স্নান উপকারী। যে সকল হাঁপের রোগীর অগ্নিতপ্ত জল সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে রৌদ্রতপ্ত জল ব্যবহার করা বিধেয়। অম্ল দ্রব্য ও মিষ্ট দ্রব্য ইহাদের পক্ষে এই সময়ে উপযোগী নহে, পূর্ব্বোক্ত চর্ব্বিযুক্ত মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য গুলি ইহাঁদের পক্ষে অপকারী অর্থাৎ সঞ্চিত শ্লেষ্মাকে বর্দ্ধিত করিয়া হাঁপকাস বাড়ায়, শোথ ও উদর রোগীরও এই সকল আহার না করা উচিত। তাঁহাদের পক্ষে ওল, মান, কাঁচাকলা, কাঁচা পেঁপে প্রভৃতির শুষ্ক ব্যঞ্জন (ভাজী) সহ গমের আটার পাতলা রুটী ও দুধ-ভাত, দুধ-খৈ প্রভৃতি উপকারক। স্নিগ্ধ ও তরল দ্রব্য উভয়ই শোথ, উদর বৃদ্ধিকারক। অতএব এই রোগগুলি যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে তজ্জন্য এরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে পালনীয়—শীতকালের পূর্ব্ব লিখিত বিধান গুলি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, নতুবা তাঁহাদের রোগবৃদ্ধি অনিবার্য্য।

হরীতকী

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস)

হরীতকী অতি অবত্ন সুলভ সামান্য দ্রব্য হইলেও ইহা অতিশয় গুণসম্পন্ন নানারূপ রোগনাশক। ইহা দ্বারা বিরেচনকার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কথিত আছে, একদা এক বৈদ্য কোনো রাজার জন্য হরীতকী সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাজা সেই ব্যবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোনোরূপ অনিষ্ট হইবে না তো!"

বৈদ্য তাহার উত্তর দিলেন, –

"হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজন্ মাতেব প্রতিপালিনী।
যদি বা কুপ্যতে মাতা ন কুপিতা হরীতকী॥"

অর্থাৎ হে রাজন্, তুমি হরীতকী সেবন কর, ইহা মাতার ন্যায় প্রতিপালিনী। মাতাও যদি কখনো কুপিতা হন, হরীতকী কখনও কুপিতা হয় না। অর্থাৎ কোনো কোনো বিরেচন ঔষধে যদি কোষ্ঠ নিঃসরণ না হয়, তাহা হইলে পেট গরম হইয়া থাকে, হরীতকী সেবনে সে আশঙ্কা নাই, ইহাতে নিশ্চয়ই মল নিঃসৃত হইবে।

এই হরীতকী লইয়া নানারূপ গল্পের রচনা হইয়াছে। নিম্নে আমরা একটি গল্পের অবতারণা করিতেছি।

এক কবিরাজের একটি ভৃত্য ছিল। সে লেখা পড়া না জানিলেও খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। কবিরাজ—রোগী দিগকে যে সকল ব্যবস্থা করিতেন, ঐ ভৃত্য তাহা বেশ মনোযোগের সহিত দেখিত। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের ফলে সে দেখিল, কবিরাজ মহাশয় অনেক রোগীকেই হরীতকী ব্যবস্থা করিতেছেন এবং তাহাতে রোগীও নিরাময় হইতেছে।

ইহার পর সে, কবিরাজ মহাশয়কে বলিল, "আমি আর আপনার চাকুরী করিব না, আপনার নিকট থাকিয়া আপনার বিদ্যা আমি সবই আয়ত্ত করিয়াছি। আমি এইবার নিজ গ্রামে গিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিব।"

কবিরাজ মহাশয় ভৃত্যের এই কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। তিনি ভাবিলেন, এ বর্ব্বর কি বলিতেছে! কবিরাজীটা কি এতই সোজা যে, এই ভৃত্য আমার নিকট কয়েক বৎসর চাকুরী করিতেছে বলিয়া, কবিরাজী করিতে পারিবে? যাহা হউক ভৃত্যকে বলিলেন,— "তুই কি বলিতেছিস্! তুই কবিরাজী করিবি কি! লেখাপড়া না জানিলে কি এ বৃত্তি অবলম্বন করা যায় বোকা! তোর এ দুর্ম্মতি কেন হইল?"

ভৃত্য বলিল—"না কর্ত্তা, ও সব কথায় আমার কাজ নাই—আপনারা লেখাপড়া করিয়া যাহা না করিয়াছেন, আমি আপনার আশীর্ব্বাদের জোরে লেখাপড়া না শিখিয়াও তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিব। আমি চলিলাম, আমাকে আর নিষেধ করিবেন না।" এই বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল, কবিরাজ—মূর্খের কাণ্ড দেখিয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পথপানে তাকাইয়া থাকিলেন।

ভৃত্য গিয়া চিকিৎসালয় খুলিল নিজের গ্রামে। সেখানে গিয়া সে প্রচার করিল—অনেক দিন সে এক বিখ্যাত কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া এখন একজন মস্ত কবিরাজ হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক তাহার জাঁক জমক ও কথাবার্ত্তার জোরে তাহার রোগীর অভাব হইল না, শুধু নিজের গ্রামে নহে, পার্শ্ববর্ত্তী নানা গ্রাম হইতেই তাহার নিকট বহু রোগী আসিতে লাগিল।

নূতন কবিরাজ বা সেই ভৃত্যপ্রবরের একমাত্র ঔষধ কিন্তু সেই হরীতকী। যে কোনো প্রকারের রোগীই আসুক না কেন, সে এই নূতন কবিরাজের নিকট হরীতকীর গুঁড়া পাইতে লাগিল। ফলে হরীতকীর বিরেচনশক্তির জন্য সকল রোগেই দাস্ত পরিষ্কার হওয়ায় অনেকেই আরোগ্য লাভও করিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল—"বাস্তবিকই কবিরাজটি খুব ভাল, ইহার ঔষধ ডাকিলে কথা কহিয়া থাকে।" এমনই করিয়া তাহার পসার খুব বাড়িয়া উঠিল।

একদা সেই অঞ্চলের রাণীর হইল উদরে একটি

ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া। বহু চিকিৎসককে আনা হইল। সকলেই দেখিয়া বলিলেন,—না কাটিলে ইহা সারিবে না। ফলে সকলের মতে ফোড়াটির অস্ত্রোপচার করাই সাব্যস্ত হইল। রাণী ইহাতে ভীতা হইলেন, রাজারও শঙ্কা হইল। মন্ত্রী বলিলেন। "মহারাজ, একবার কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইলে হয় না? শুনিয়াছি তিনি বড় বিচক্ষণ, সকল রোগেই ধন্বন্তরি সদৃশ।"

রাজা ও রাণী—উভয়েই এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। কবিরাজপুঙ্গবকে ডাকিয়া আনা হইল। কবিরাজ আসিয়া তাঁহার সেই মামুলী ব্যবস্থা করিলেন—হরীতকী। হরীতকী সেবনের ফলে রাণীকে অনেকবার পায়খানায় যাইতে হইল, তাড়া তাড়ি গমনাগমনের জন্ত চাড় পাইয়া ফোড়াটি ফাটিয়া গেল। রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"আঃ বাচিলাম, কবিরাজ মহাশয় বাস্তবিকই ধন্বন্তরি বটেন।"

ইহার কিছুদিন পরে অন্ত এক প্রদেশের রাজা সেই রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"কবিরাজ মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া যাউক।" রাজা বলিলেন—"মন্ত্রী,তুমি পাগল নাকি? একি কাহারও রোগ হইয়াছে? কবিাজ ইহাতে করিবে কি?" মন্ত্রী বলিলেন—"না,মহারাজ,আপদ কালে সকলের বুদ্ধি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কাহারও রোগ হয় নাই সত্য,কিন্তু কবিরাজ মহাশয় হয়তো একটা ভাল যুক্তিও দিতে পারেন।"

যাহা হউক কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি সব কথা শুনিয়া বলিলেন, "ভয় কি মহারাজ।" আমি ঔষধ দিতেছি, আপনি সকল সৈন্তকে সেই ঔষধ সেবন করান, দেখিবেন যুদ্ধে জয় নিশ্চয়ই হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"তথাস্তু।" কবিরাজ—সকল সৈন্তকে রাত্রিকালে সেই হরীতকী চূর্ণ খুব বেশী করিয়া সেবন করাইয়া দিলেন।

পরদিন প্রভাতে সৈনিকের দল ঘটি হাতে লইয়া ক্রমাগত পায়খানা যাইতে লাগিল। একজনই বহু বার গমন করায় একজনকে দশ জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষের সেনানিগণ নদীর পরপারে অবস্থিত ছিল। তাহারা এ দৃশ্য দেখিয়া মনে করিল—এ রাজার সৈন্য আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী—সুতরাং এ রাজার সহিত লড়াই করিলে আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইব। ক্রমে বিপক্ষের রাজার নিকট এ কথা পঁহুছিলে তিনি বলিলেন,—"কাজ নাই আর যুদ্ধ করিয়া, সৈন্তগণ ফিরিয়া আসুক।" ফলে বিনাযুদ্ধে কবিরাজ মহাশয়ের হরীতকীর গুণে কবিরাজ মহাশয়ের রাজা জয় লাভ করিলেন। হরীতকীর এমনই গুণ।

যাক্ সে কথা,—হরীতকী অনেক রোগে ব্যবহার করান যায়, এইবার শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে যে সকল কথা আছে, পাঠকদিগকে তাহা শুনাইব।

চক্ষুরোগে—হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার চক্ষুর পীড়ায় উপকার হইয়া থাকে।

সান্নিপাত জ্বরে—হরীতকী,তিলতৈল, ঘৃত কিম্বা মধু—ইহাদের যে কোনটির সহিত লেহন করিলে সন্নিপাতের কণ্ঠদাহ নিবারিত হয়।

আমাজীর্ণে—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, আমাজীর্ণ, অর্শও কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর।

পিত্তশূলে—হরীতকী—ঘৃত কিম্বা গুড়ের সহিত সেবনে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

বাতরক্তে—পাঁচটি কিম্বা তিনটি হরীতকী সেবন পূর্ব্বক গুলঞ্চের কাথ পান করিলে অতি উগ্র বাতরক্তও প্রশমিত হয়।

রক্তপিত্তে—বাসকের রসে হরীতকী চূর্ণ সাত বার ভাবনা দিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তপিত্ত জয় করা যায়।

শোথে—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন শোথে হিত কর।

বৃদ্ধি রোগে—গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী—এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণের সহিত চূর্ণ করিয়া সেবন করাইয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করাইলে বৃদ্ধি রোগের উপকার দর্শিয়া থাকে।

কণ্ঠ রোগে—হরীতকীর কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কণ্ঠ রোগে উপকার হইয়া থাকে।

হিক্কায়—গরম জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করাইলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

গুল্মে—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন গুল্মরোগে হিতকর।

অর্শে—প্রতিদিন প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

বমন রোগে—মধুর সহিত হরীতকী লেহন করিলে অধোগামী হইয়া বমন রোগ নিবারিত হয়।

উদর রোগে—হরীতকী সেবন উদররোগে বিশেষ হিতকর।

পাণ্ডুরোগে—গো মূত্রে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া গো-মূত্রে পেষণ পূর্ব্বক কফ-পাণ্ডুরোগে ব্যবস্থা করিবে।

আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ চরক সংহিতা—হরীতকীকে অর্শোঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাস্থাপন এবং বয়স্থাপনবর্গে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

এই হরীতকী সাত প্রকার, কিন্তু অধুনা হরীতকী বলিলে যাহা আমরা বুঝিয়া থাকি, তাহা এবং জাঙ্গী হরীতকী ভিন্ন অন্য পাঁচ প্রকার হরীতকী দুর্লভ। ঔষধার্থে হরীতকীর ফল ও বীজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা—ফল চূর্ণ চারি আনা হইতে এক ভরি। জাঙ্গী হরীতকী অধিক বিরেচক, এজন্য ইহার মাত্রা সাধারণ হরীতকীর অর্দ্ধেক লওয়া উচিত।

ভারতীয় ঔষধে গবেষণা

(শ্রীঅমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল)

আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস। তাহাদের ভাষাও বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারও নানা প্রকারের। রোগেও ভুগিতেছে ইহাদের মধ্যে অনেক লোক,নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রতিবৎসর হাজার হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তা' ছাড়া এদেশে প্রায়ই নূতন নূতন রোগের প্রকাশ পাইতেছে। এই সকল রোগ নিবারণের জন্য জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিভিন্নতার জন্য এই দেশে নানা প্রকারচিকিৎসাও প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে, যেখানে বেশীর ভাগ লোকই দরিদ্র, সেই জায়গায় অল্পব্যয় সাধ্য ও অতি শীঘ্র ফলদায়ক চিকিৎসার প্রচলন হওয়ারই বিশেষ দরকার। সেইজন্যই আজকাল আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসার উন্নতির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভেষজ বিজ্ঞানের ঔষধ সকলও এ দেশে বিশেষ দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে বটে, তথাপি এই এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালীতে এই বিরাট অন্নসমস্যার শতকরা দশজনও চিকিৎসিত হইতেছে না। এই চিকিৎসা-প্রণালীর ঔষধের মূল্য খুব বেশী। সেইজন্য যাঁহারা সহর হইতে সাধারণতঃ দূর গ্রামে বাস করেন,

তাঁদের বিশেষ কোন উপকারে আসিতে পারে না। এদেশের অধিকাংশ লোকেই আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীতেই চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও নানা কারণে এই চিকিৎসা অন্য চিকিৎসা অপেক্ষা অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের শৈথিল্য, গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির অভাব, আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমান সময়ে এই অবস্থায় আনিয়াছে। পূর্ব্বে মহাভারতের যুগে লোকে 'বেদ' পাঁচটি বলিয়া জানিত। চারিবেদ ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রথিত হইত। যদি এই হিন্দু-আয়ুর্ব্বেদীয়শাস্ত্রের উন্নতি করিতে হয়, তবে যাঁহারা ইহার সেবা করেন, তাঁহাদের মনকে প্রশস্ত ও উদার করিতে হইবে। কেবল যাহা চরক সুশ্রুত লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই বেদ বাক্য বলিয়া মানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। স্মরণ রাখিবেন, আমাদের এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ন্যায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থ—চরক ও সুশ্রুতের ঔষধগুলি ছাড়াও আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে নানাপ্রকার ঔষধ—টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ বলিয়া প্রবেশলাভ করিয়াছে। অনেকে মনে করেন, সেগুলিও আর্য্যঋষির উপদিষ্ট ঔষধ। হয়তো সে সকলের ভিতর ও অনেক ভাল জিনিস থাকিতে পারে, কিন্তু যেগুলি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সম্মত নয়, সেগুলি দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। এক কথায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতামত সমূহের যোগ্যতা বর্ত্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ নানা ঔষধের নানাপ্রকার গুণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ সেই সকল ঔষধে লিখিত সমস্ত গুণই বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ Pharmacological, রাসায়নিক ও Biological প্রণালীতে ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যদি হিন্দু materia medicaর ঔষধ সমূহও উপরি উক্ত প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষিত হয়, তবে এই সমস্ত ঔষধ কেবল ভারতে নয়, বিদেশেও বেশ প্রচলিত হইতে পারে এবং আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে এ বিষয়ে গোঁড়া হইলে চলিবে না।

এ বিষয়ে Calcutta Tropicai School of medicine and Hygiene বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সেখানে রাসায়নিক ও অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর দ্বারা বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ভারতীয় ভেষজেরও গুণাগুণ পরীক্ষা করা হইতেছে। কেবল পাঁচ বৎসর হইল এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সকল ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সমস্ত ঔষধ পরীক্ষা করিবার প্রণালী বহু সময় সাপেক্ষ। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া ৩৪টি ঔষধ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারিটি খনিজ পদার্থ। যথা—অভ্রভস্ম, বঙ্গভস্ম, মকরধ্বজ, শিলাজতু। বাকী যে সব ঔষধ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদের সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) খাটি হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকার ঔষধ (২) ভারতীয় ঔষধ যাহার স্থানে বিদেশীয় সেই গুণযুক্ত ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধের পরীক্ষা শেষ হয় নাই। যথা—উলটকম্বল, অরহর, আখরোট, কর্কটশৃঙ্গি, অশোক, সোমরাজ, বেড়েলা, এবং ছোট গোক্ষুরী। যে সমস্ত ঔষধ পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহাদের ভেষজ গুণ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে; শিলাজতু তাহাদের মধ্যে একটি। ইহা বহুমূত্র রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পাহাড় হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা হইতে তৈয়ারী। ইহার মধ্যে Calcium benzoate, hippuric acid দিয়া তৈরী। কিন্তু অনেকস্থলে বহুমূত্র রোগে ইহা রক্ত ও প্রস্রাব হইতে চিনির অংশ কমাইতে সমর্থ হয় নাই। তেলাকুচার পাতা ও কালজীরার বীজ সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে

পারে। দারুহরিদ্রার গুণের সম্বন্ধেও সেই প্রকার সন্দেহ করা যাইতে পারে।

যদিও এই নূতন প্রকারের গবেষণায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত অনেক ঔষধ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তথাপি অন্যান্য ঔষধের গুণ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, পুনর্ণবা (Boerhavia) যকৃৎ ও প্লীহার পক্ষে কিরূপ উপকারী তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পলাশের বীজ বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে এবং ইহা round worms (কৃমির) পক্ষেই বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কিরূপ উপকারী তাহা কবিরাজেরা ভালই জানেন। বাসকের পাতার গুণ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। বাসকের পাতায় যে তৈলের ন্যায় পদার্থ আছে, তাহা কোন উপকারে আসে কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই, এজন্য বাসক পাতার পরীক্ষা একটু হতাশজনক হইয়াছে মনে হয়। কারণ আয়ুর্ব্বেদের মতে ফুসফুস সম্বন্ধীয় রোগে বাসকের পাতায় বিশেষ উপকার হয় দেখা যায়,—কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা সে গুণ প্রমাণিত হয় নাই। ইহা হাঁপানির রোগীদেরও কোন উপকারে আসে না। ইহার ছাল এবং মূল সম্বন্ধে কোন গবেষণা এখনও হয় নাই। কুড়্চির ছাল আমাশয়ের বিশেষ উপকারী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত, এখন পরীক্ষা দ্বারাও ইহার গুণ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদে ও ইউনানী শাস্ত্রে কুশমূলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গাছটি কাশ্মীর এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে পাওয়া যায়। ইহা সুগন্ধির জন্য আদৃত হয় এবং চীন দেশে রপ্তানি করা হয়। রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ইহার তৈলে শ্লেষ্মাবর্দ্ধনের গুণ আছে এবং ইহা হাঁপানির প্রতিষেধক। এই তৈলে পচন নিবারক ও রোগ প্রতিষেধকের ক্ষমতা আছে এবং ঘা, ফোড়া এবং ক্ষত (ul er) এর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। অর্জ্জুন গাছের ছাল লইয়া কয়েক বৎসর গবেষণার পর দেখা গিয়াছে, হিন্দু ভেষজশাস্ত্র ইহাকে যে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় রোগের ঔষধরূপে ব্যবহার করেন, তাহা যথার্থ। কোন কোন স্থলে ইহা digitalis হইতে বেশী উপকার দিয়াছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষে আজকাল খুব স্বরাজের আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে—দেশকে স্বাধীন করা। দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলনে ধনাগম বৃদ্ধি না করিলে দেশকে অর্থের দিক দিয়া স্বাধীন (Economic Independence) করা যাইবে না। দেশীয় ঔষধের প্রচলন ও কিরূপে দেশীয় গাছ গাছড়া হতে ঔষধ তৈয়ারী করা যায়—তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এখন বিদেশ হইতে যে সব ঔষধ আমদানী হয়, ইহার অনেক ঔষধই আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। সেই সব বিদেশী ঔষধ ও দেশী ঔষধের গুণ সমানই। বিদেশী ঔষধের আমদানী বন্ধ করিয়া দেশী ঔষধের প্রচলন বাড়াইতে হইবে। অনেকে বলিতে পারেন যে, দেশী ঔষধের গুণ হয় তো বিদেশী ঔষধের মতন হইবে না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল ধারণা। সকলেরই মনে রাখা উচিত, যে সমস্ত ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেক ঔষধ এখানে জন্মিয়া থাকে। যেমন India ı Bellado.ıa, Hyoscyamus, I'odophylum, V..lcrian। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপরোক্ত ঔষধগুলি গুণে বিদেশীয় ঔষধের সমান, ভারতীয় ıalcian ভারতের বাহিরেও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। Ipecacuahna roots কেবল fred'erated মালয়ষ্টেটে পাওয়া যায় এবং E I Ipecae বলা হয়। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ এই Ipecacএর ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছেন, এমন কি, ঐ দ্রব্য লণ্ডন ব্যবসায়ীদের ছাড়া এক কণাও ভারতে আসিতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট এই ঔষধ Cinchona plantatiorএ জন্মাইতে আরম্ভ করিয়া খুবই প্রশংসার কার্য্য করিয়াছেন। এই গাছ—বহুল পরিমাণ হওয়াতে mungloo

plantationএ Emitine hydrochloride তৈয়ারী হইতেছে, ইহা গুণে বিদেশী ঔষধ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কাশ্মীরজাত digitalis, বিদেশী digitalisএর সমান।

এতদিন পর্য্যন্ত central এসিয়ার অনেক প্রদেশই santonine উৎপন্নের প্রধান স্থান ছিল। বিগত যুদ্ধের মধ্যে এবং পরে ইহার factoryটির অনেক পরিবর্ত্তন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার দামও অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ১৯২০ অব্দে কাশ্মীরজাত Atemisia Brevifolia পাওয়া যাওয়ায় অনেকেই খুব আশা করিয়াছিলেন যে, ভারতে santonineএর দুঃখ দূর হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় santonine, রাসায়নিক ও অন্যান্য গুণে বিদেশীয় ঐ ঔষধের সমতুল্য। শীঘ্রই এই ঔষধ প্রস্তুতের জন্য কাশ্মীর উপত্যকায় একটি ব্রিটিশ ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না। চাউল হইতেছে এ দেশের প্রধান খাদ্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ধারণের উপায়। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ভাত খাওয়া বন্ধ করা উচিত। আজকাল খুব বেরিবেরির (Epidemic Dropsy) প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে সমস্ত চাউল গুদামে খারাপ ভাবে রাখা হয়, সেই সব চাউল আহার করিলেই বেরিবেরি রোগ হইয়া থাকে। যাহারা ধান মজুদ রাখিয়া, তাহা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া লয়, তাহারাও এ রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায় না, জাভাতে এবং বর্ম্মায় বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ফলকথা ইহা বেরিবেরি বা Epidemic Dropsyর কারণ হইতেছে খারাপভাবে চাউল গুদামে রাখা।

Calcutta School of Tropical Medicineএ এই ভারতীয় ঔষধের নানাপ্রকার গবেষণা চলিতেছে। এখানকার গবেষণাকারীগণ তাঁহাদের গবেষণার ফল ধারাবাহিকরূপে Indian Medical Gazetteএ লিখিতেছেন। যাঁহারা এইরূপভাবে ভারতীয় ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

আমাদের দেশে যেমন বিদেশী বস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে, সেইরূপ বিদেশী ঔষধের বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালান উচিত। যে সমস্ত ঔষধ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে, আমরা যদি সেই সকল ঔষধ দেশে পাই, তবে কেন বিদেশী ঔষধ ব্যবহার করিব? যদি দেশীয় ব্যবসায়ীগণ দেশের লোকের নিকট সহানুভূতি ও সাহায্য না পান, তবে তাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভই বা করিবেন কি প্রকারে?

পারিবারিক-চিকিৎসা

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন)

আগে আমাদের দেশে মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে তাহার উপদেশ বড় একটা লইতে হইত না, বুড়া ঠানদিদির ঝুলির ভিতর হইতেই সে সকল মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা বাহির হইত। এখনকার বড় বড় চিকিৎসকদিগের অপেক্ষা সে সকল ব্যবহারে বড় কম ফল হইত না। আমরা সেই সকল ব্যবস্থা ধারাবাহিকরূপে এই অধ্যায়ে প্রকাশ করিব। পাঠকবর্গ এই ব্যবস্থানুসারে আপন আপন পরিবারের অনেক রোগই উপশম করিতে সমর্থ হইবেন।

সাধারণ নূতন জ্বরে।—জ্বর হইবামাত্র ঔষধ সেবন করিও না, বেশ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া উপবাস

দিয়া শুইয়া থাক। রসের পরিপাক হইয়া অনেক সময় আপনা-আপনি ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

যদি ইহাতে জ্বর না ছাড়ে অথবা ছাড়িয়া আবার আসে, তাহা হইলে কতকগুলি বেলপাতা লইয়া বেশ করিয়া থেঁতো করিয়া একটি পাথরের বাটিতে চাপা দিয়া রাখ এবং দশ মিনিট পরে ঢাকা খুলিয়া নেকড়ার সাহায্যে নিঙড়াইয়া লইয়া রস বাহির কর। এরূপ করিবার কারণ, বেলপাতা হইতে ঐরূপ না করিলে রস বাহির হয় না। যাহাহউক সেই রস গরম করিয়া ফেনাটুকু বাদ দিয়া গরম গরম খাইয়া ফেল। দুই একদিন এইরূপ করিলেই হয় তো তোমার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।

যদি জ্বর শ্লেষ্মা প্রধান হয়, তাহা হইলে আদার রস এবং আদার কুচি একটু লবণ মিশাইয়া খাওয়া ভাল। তুলসীর পাতার রস, সিউলী পাতার রস, নিসিন্দা পাতার রস, ভাঁট পাতার রস কিম্বা গুলঞ্চ ও ক্ষেৎপাঁপড়া—এগুলি থেঁতো করিয়া রস বাহির করিয়া খাইলেও অনেক সময় সাধারণ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধের অনুপানে যেগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনেক সময় সেই গুলিই এক একটি জ্বরের ঔষধ।

শ্লেষ্মা-প্রধান জ্বরে ২ রত্তি পিপুলের গুড়া, মধুর সহিত মিশাইয়া যদি ২ বার করিয়া সেবন করা যায়, তাহা হইলেও অনেক সময় জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

নবজ্বরে দাস্ত করান ডাক্তারদিগের মত, কিন্তু কবিরাজেরা তাহা বড় একটা করিতে চাহেন না। কবিরাজ মহাশয়েরা তাহা না করাইলেও তাঁহারা যে রসের পরিপাকের জন্য ঔষধ দিয়া থাকেন, তাহার ফলে কোষ্ঠ পরিষ্কার সহজেই হইয়া থাকে। ফল কথা, রসের পরিপাকই জ্বরের প্রথম চিকিৎসা, ইহা না করিয়া কোনো বড় ঔষধ দেওয়া উচিত নহে।

নবজ্বরে উপরের লিখিত ব্যবস্থা করিয়া কোনো ফল না পাইলে, তখন অন্যরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত বিষমজ্বরে।—প্লীহা যকৃত সংযুক্ত বিষমজ্বর বড় কঠিন। এই জ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই জ্বরে রক্তরোড়া একটি ভাল ঔষধ। এই রক্তরোড়ার ছাল ২ তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ৩।৪ রত্তি যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া যদি প্রাতঃকালে সেবন করান যায়, তাহা হইলে প্লীহা ও যকৃত উপশমিত হইয়া জ্বরও সারিয়া থাকে। রক্তরোড়ার ছাল গুঁড়া করিয়া এক আনা মাত্রায় সেবন করিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়।

রসুন—প্লীহা রোগের একটি ভাল ঔষধ। রসুন চারি আনা, পিপুল মূল ।০ আনা এবং হরীতকী ।০ চারি আনা—একত্র মিশাইয়া গোমূত্রে বাটিয়া প্রাতঃকালে পান করিলেও প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত বিষমজ্বরে বেশ উপকার হইয়া থাকে।

শঙ্খনাভি চূর্ণ অর্দ্ধতোলা, গোঁড়া লেবুর রসে মাড়িয়া সেবন করিলে কূর্ম্ম সমান প্লীহাও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনার ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষে আধ পোয়া, এই কাথে চিতামূল চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ—তিন রত্তি করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া কয়েকদিন পান করিলে প্লীহা ও যকৃৎ শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

তালজটা ভস্ম—দুই আনা, প্রত্যহ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে অতি বড় প্লীহাও আরোগ্য হইয়া থাকে।

তিল, তিসী, এরণ্ডবীজ ও শ্বেত সরিষা যকৃত স্থানে প্রলেপ দিলে যকৃত উপশমিত হইয়া থাকে।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রক্তরোড়া—প্রত্যেকটি ৶১০ ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া চারি আনা যবক্ষার ও এক আনা পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

চিতামূল বাটিয়া বটি করিবে। মাত্রা এক বটি ২ রত্তি।

এই বটী প্রত্যহ কলার মধ্যে পুরিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

চিতামূল, হরিদ্রা, আকন্দপত্র অথবা ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ৩ রতি—পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়।

পুরাতন মানকচু—প্লীহা ও যকৃৎ রোগের মহৌষধ। প্লীহা ও যকৃতগ্রস্ত রোগীকে মানকচু যথেষ্টভাবে সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

পালাজ্বরে—বক ফুলের পাতার রস নাসিকা দ্বারা টানিলে ২ দিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হয়। শিরীষ ফুলের রসের সহিত হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা চূর্ণ গব্যঘৃতে মিশাইয়া নাসিকা দ্বারা টানিলে ২ দিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেত আকন্দ কিম্বা শ্বেত করবীর মূল—অশ্বিনী নক্ষত্রে তুলিয়া চাউল ধোয়া জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে ২ দিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হয়।

১ দিন অন্তর পালাজ্বরে—রবিবারে আপাঙ্গের মূল, সাত গাছি লাল সূতা দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিবার ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে ১ দিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হইবে। এইরূপ জ্বরে পালার দিন আসসেওড়ার পাতা থেঁতো করিয়া একখানি নেকড়া—হলুদে ছোবাইয়া এবং উহাতে ঐ থেঁতোকরা পাতাগুলি বাঁধিয়া শুঁকিতে দিবে। ইহা দ্বারা ১দিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হইবে।

সকল প্রকার জ্বরে আরও কয়েকটি টোটকা (১) শ্বেত জয়ন্তীর মূল মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। (২) কেশরাজের মূল সাত খণ্ড করিয়া প্রত্যহ এক এক খণ্ড আদার সহিত ভক্ষণ করিলে সর্ব্ব প্রকার বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

অজীর্ণে—অজীর্ণ হইবা মাত্র কোনো ঔষধ না খাইয়া উপবাস দিয়া নিদ্রা যাওয়া হিতকর। দিবা নিদ্রা অন্যক্ষেত্রে অহিতকর হইলেও এক্ষেত্রে উপকারী। একটা মেয়েলি কথায় আছে—"অজীর্ণ যদি সারা'তে চাও, অনাহারে নিদ্রা যাও।"

অজীর্ণের দাস্ত প্রথমেই বন্ধ করিলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য—অজীর্ণজনিত ভেদ হইবা মাত্র ঔষধ দিও না। অজীর্ণ জনিত দাস্ত নির্গত হইয়া গেলে বিনা ঔষধেও ইহা আপনা আপনিই আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি আপনা আপনি ভেদ বন্ধ না হয়, তাহা হইলে জোয়ান ও লবণ চারি আনা মাত্রায় কিম্বা ২।৩টি গোলমরিচ ও দুই আনা লবণ চিবাইয়া একটু জল খাইবে। ইহাতে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অজীর্ণজনিত দাস্ত বেশী হইলে ধনে এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা—আধ সের জলে জালদিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই জল পান করিতে দিবে—কিম্বা ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ—এক একটি দ্রব্য সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে জাল দিয়া এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

দাড়িমপত্র, জাম পত্র এবং পানিফল পত্র, বালা, মুথা, শুঁঠ, ও কাঁচড়াপত্র—প্রত্যেকটি ৶১০ সাড়ে তিন আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে জাল দিয়া সেবন করাইলেও অজীর্ণ জনিত অধিক ভেদে উপকার হইয়া থাকে।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত—অজীর্ণের দাস্ত বন্ধ করিতে নাই—বিশেষ বাড়াবাড়ি না হইলে উপরের লিখিত যোগ কয়টির দ্বারা দাস্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না।

বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে বিশিষ্ট ব্যবস্থা—কাঁটাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া অজীর্ণ হইলে ঘৃত খাইলে পরিপাক হয়। ঘৃতের পরিপাকের জন্য লেবুর রস উৎকৃষ্ট। নারিকেল ও তালশাঁস খাইয়া অজীর্ণ হইলে কতকগুলি আতপ চাউল চিবাইয়া খাওয়া হিতজনক। আম খাইয়া অজীর্ণ

হইলে দুগ্ধ পান হিতকর। খেজুর খাইয়া অজীর্ণ হইলে নিম্বফল খাইবে অথবা এক আনা পরিমিত শুঁঠের গুঁড়া সেবন করিবে। পানিফল খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঁঠের গুঁড়া এক আনা সেবনে জীর্ণ হইয়া থাকে। অন্ন আহারের ফলে অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ এবং দুগ্ধ পানের ফলে অজীর্ণ হইলে কুঙ্কুম প্রশস্ত। চিঁড়া খাইয়া অজীর্ণ হইলে পিঁপুল এক আনা ও কুঙ্কুম এক আনা সেবনের ব্যবস্থা করিবে। দাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কাঁজি খাইলে উপকার হয়। পিষ্টার খাইয়া অজীর্ণ হইলে শীতল জল পান করিবে। খিচুড়ি খাইয়া অজীর্ণ হইলে এক আনা পরিমিত সৈন্ধব লবণ মুখে ফেলিয়া শীতল জল পান করিবে। পায়স খাইয়া অজীর্ণ হইলে পিঁপুলের মূল এক আনা সেবন করিবে।

অজীর্ণ রোগীর নিত্য ব্যবস্থা। যাঁহারা বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রত্যহ আহারের পরে বিটলবণের গুঁড়া এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সৈন্ধব লবণ ১ ভাগ, পিঁপুল মূল ২ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, চৈ ৪ ভাগ, চিতা ৫ ভাগ, শুঁঠ ৬ ভাগ এবং হরীতকী ৭ ভাগ—একত্র মিশাইয়া দুই আনা মাত্রায় অল্প গরম জল দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বহুদিন হইতে অজীর্ণগ্রস্থ রোগীর বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, পিঁপুল ও চিতা-মূল সমভাগে গুঁড়া করিয়া লইয়া ঐরূপ দুই আনা মাত্রায়—গরম জলের সহিত বৈকালে সেবনের ব্যবস্থা করিলে বহু কাল জাত অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ প্রত্যহ সেবন করিলে অজীর্ণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অজীর্ণ রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠ চূর্ণ—এক একটি এক আনা মাত্রায় অথবা কেবল মাত্র শুঁঠ চূর্ণ এক আনা মাত্রায়—গব্যঘৃতের সহিত কিম্বা গরম জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী ও শুঁঠ চূর্ণ গুড় বা সৈন্ধব লবণের সহিত নিত্য সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয়।

বাঙ্গালীর স্বরাজ

(শ্রীসুশীলকুমার সেন শর্ম্মা বি-এস্‌-সি)

হায়রে বাঙ্গালী, স্বাস্থ্য ভুলিয়া—ভুলিয়া নিজের ঘর,
পরেরে আপন করিতে ব্যাকুল, আপনে করিতে পর!
আপনার গৃহ শাসিতে যাহারা সর্ব্বথা অক্ষম,
গৃহদ্বারে যা'র সদাই বসিয়া ম্যালেরিয়া আদি যম,
ভায়ে ভায়ে হায় বিবাদ সদাই মায়েরে দেয় না খাদ্য,
তাহারা লভিবে স্বরাজ হায়রে! বাজায়ে স্বরাজ বাদ্য!

বাটীর পার্শ্বে ছোট্ট পুকুর—পচা পাঁক পানা ভরা,
হ'তে না হ'তে বয়স পঁচিশ আসে যাহাদের জরা,
অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট সদাই কেরাণী-জীবন যা'র,
তাহারা ঘুচা'বে দেশের দুঃখ ঘুচা'বে দুঃখ মা'র!

মরিবার আগে শতবার মরে এই যে বাঙ্গালী জাতি—
চাকুরী যা'দের চরম লক্ষ্য—আলস্য যা'র সাথী!
আপন দেশের রতন ঠেলিয়া বিদেশীর কৃপা চায়
তাহারা আনিবে দেশের স্বরাজ ঘুচা'বে দুঃখ হায়!

হিংসা ও দ্বেষ জীবনের সার—মিথ্যা যা'দের সাথী—
এখনো যে কেন রয়েছে ধরায় হতভাগা এই জাতি?

সত্যে যাহারা করে অপমান, বান্ধবে দেয় গালি,—
তাহারা করিবে স্বদেশ স্বাধীন মুছায়ে দেশের কালি ?

আপনার দেশের শাস্ত্রে-বস্ত্রে করে যা'রা অপমান,
বিদেশীর কৃপা লভিবার তরে ব্যাকুল যা'দের প্রাণ,

স্বজনে শাসন করিতে পারে না—স্বদেশ শাসিতে চায়,
এমনি উদার এমনি সাহসী এ বাঙ্গালী জাতি হায় !

বাক্যের রাজা তুমি হে বাঙ্গালী, তবু বলি শোন ভাই,
স্বদেশ শাসন করিতে হইলে নিজের শাসন চাই।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ

(Practice of medicine)

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন)

প্রমেহ

অতিরিক্ত কফজনক ক্রিয়াই সকল প্রকার প্রমেহের হেতু। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রমেহ রোগ বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সকল মেহই প্রথমতঃ কফজনক হয়, তাহার পর পিত্ত বা বায়ু দূষিত হইয়া পিত্তজ বা বাতজ মেহে পরিণত হয়। একেবারে অনলস হইয়া পরিশ্রম ত্যাগ, নিশ্চিন্তভাবে উপবেশন ও সুখশয্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিক নিদ্রা, দধি, দুগ্ধ, জলজাত ও জলভূমিজাত প্রাণীসমূহের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালের নূতন জল পান, গুড় বা গুড়জাত দ্রব্য অধিক ভোজন এবং যাবতীয় কফজনক আহার-বিহারাদি দ্বারা বস্তিগত কফ দুষ্ট হইয়া মেদ, মাংস এবং শরীরস্থ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া মেহ রোগ উৎপন্ন করে। এইরূপ উষ্ণবীর্য্য ও উষ্ণস্পর্শ দ্রব্য সেবনের ফলে পিত্তকুপিত হইয়া—মেদ প্রভৃতিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিক মেহ উৎপন্ন করে। আর কফ ও পিত্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া পড়িলে বায়ু কুপিত হইয়া উঠে এবং বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা পদার্থকে বস্তিমুখে আনয়ন করিয়া বাতজ মেহ উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রকার ভেদ—কফজ মেহ দশ প্রকার, যথা—উদক মেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতা মেহ, শীতমেহ, শনৈর্ম্মেহ ও লালা মেহ। পিত্তজ মেহ ছয় প্রকার, যথা—ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ ও রক্তমেহ। বাতজ মেহ চারি প্রকার—বসামেহ, মজ্জামেহ, ক্ষৌদ্রমেহ ও হস্তীমেহ। সকল প্রকার মেহ উৎপন্নের পূর্ব্বেই দন্ত, চক্ষু, ও কণ্ঠাদি স্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত ও পদের জ্বালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা, মুখের মধুরতা—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। মূত্রের পরিমাণাধিক্য ও আবিলতা—এই লক্ষণ দুইটি ও সকল প্রকার মেহেই বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করান উচিত, কারণ এই রোগ স্বভাবতঃই কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে পরিণামে পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই রোগ অসাধ্য হইয়া পড়ে। বঙ্গ—সকল প্রকার মেহ রোগেই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুলঞ্চের রস, আমলকীর রস, শিমুল মূলের রস, গঁদ্ ভিজান জল বা কাঁচাহরিদ্রার রস বা হরিদ্রা চূর্ণের সহিত ২ রতি পরিমিত বঙ্গভস্ম সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহই নিবারিত হয়। প্রথমতঃ কতকগুলি মুষ্টিযোগ ও কষায় প্রয়োগের কথা বলিয়া পরে এই রোগের ঔষধের কথা বলা যাইতেছে।

মুষ্টিযোগ।—(১) শতমূলীর রস ও কাঁচা দুগ্ধ এবং জল একত্র প্রাতঃকালে পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহই বিনষ্ট হয়। (২) গুলঞ্চের পাল—মধুর সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার মেহের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকার হয়। (৩) পলাশ পুষ্প ১ তোলা এবং চিনি অর্দ্ধ তোলা—একত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয়। (৪) ফটকিরী চূর্ণ—সজল নারিকেলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ফটকিরি চূর্ণ সংযুক্ত জল পান করিলে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কষায় প্রয়োগের মধ্যে 'ফলত্রিকাদি' এবং 'দার্ব্বাদি' নামক দুইটি কষায়ই সকল প্রকার প্রমেহে হিতকর। নিম্নে ঐ দুইটির উপাদান বলা যাইতেছে—

ফলত্রিকাদি

ফলত্রিকং দারুনিশাং বিশালাং মুস্তাঞ্চ নিঃকাথ্য নিশাংশ কল্কম্।

পিবেৎ কষায়ং মধুসংপ্রযুক্তং সর্ব্বপ্রমেহেষু সমুত্থিতেষু

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, রাখালশসা ও মুতা—ইহাদের কাথে হরিদ্রা চূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ উপশমিত হয়।

দার্ব্বাদি।

কটঙ্গটেরী মধুক-ত্রিফলা চিত্রকৈঃ সমৈঃ।
সিদ্ধঃ কষায়ঃ পাতব্যঃ প্রমেহাণাং বিনাশনঃ॥

দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, চিতামূল—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

সকল প্রকার প্রমেহ নিবারণের জন্য আরও কতকগুলি যোগের কথা বলা যাইতেছে :—

(১) লোধ, অর্জ্জুনছাল, বেণার মূল ও রক্তচন্দন (২) নিমছাল, বেণার মূল, আমলকী ও হরীতকী (৩) আমলকী, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল ও কুড়চিছাল (৪) নীলোৎপল, তিনিশ ও অর্জ্জুনছাল—এই চারিপ্রকারের মধ্যে যে কোন প্রকার দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রমেহ রোগীকে পান করিতে দিবে।

এইবার অন্যান্য ঔষধের কথা বলা যাইতেছে। প্রাতে প্রথমাবস্থায় 'স্বল্প বা বৃহদ্বঙ্গেশ্বর', মধ্যাহ্নে পরিপাক ক্রিয়ার জন্য একটি পাচক অথচ সারক ঔষধ (যথা বৃহৎ অগ্নিকুমার) এবং বৈকালে 'চন্দনাদি চূর্ণ' ব্যবস্থা করিলে অনেকস্থলেই শুভ ফল দর্শিয়া থাকে। নিম্নে ঐ ঔষধগুলির উপাদান বলা যাইতেছে :—

স্বল্প বঙ্গেশ্বর।—রসসিন্দুর ১ তোলা ও বঙ্গ ১ তোলা—একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটি। অনুপান, পেষিত কুচের মূল ও দুগ্ধ অথবা যজ্ঞডুমুরের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর, অভ্র—প্রত্যেকটি দুই তোলা এবং স্বর্ণ ও মুক্তা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধতোলা। কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রত্তি পরিমিত বটি। অনুপান পূর্ব্বের ন্যায়।

চন্দনাদি চূর্ণ।—শ্বেতচন্দন, শিমুল মূল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মুথা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোণামুখী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বংশলোচন, বামুনহাটি, দেবদারু ও হরীতকী—সকল দ্রব্য সমভাগ। লোহ সর্ব্বসমান। মাত্রা এক আনা। ইহা সর্ব্ববিধ মেহরোগনাশক।

'মেহমুদ্গর রস', 'মেহকুলান্তক রস' এবং 'বঙ্গাষ্টক' নামক ঔষধ কয়টির যে কোনোটিও বৈকালে 'চন্দনাদি-চূর্ণের' পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়। নিম্নে ঐ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

মেহমুদ্গর।—রসাঞ্জন, বিটলবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িম বীজ—প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। লৌহ ৬ তোলা এবং গুগগুলু ৮ তোলা। একত্র গব্যঘৃতে বাটিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ৬ রত্তি। ইহা

সেবনে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

মেহকুলান্তক রস।—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিঁপুলমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা। বনকাকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান ছাগদুগ্ধ ও জল। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

বঙ্গাষ্টক।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র—প্রত্যেকটি সমভাগ। সর্ব্ব সমান বঙ্গ। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান—হরিদ্রা চূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হইয়া থাকে।

'বিড়ঙ্গাদি লৌহ নামক' আর একটি ঔষধ আমরা মেহ রোগের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল লাভ পাইয়া থাকি। তাহার উপাদান গুলি এই—

বিড়ঙ্গাদি লৌহ—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা—প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। সর্ব্ব সমান লৌহ। জল দিয়া মর্দ্দন। মাত্রা ৩।৪ রতি। সর্ব্বপ্রকার মূত্রবিকার ও প্রমেহ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

'শুক্র মাতৃকা বটি' সকল প্রকার মেহরোগের বিখ্যাত ঔষধ। প্রাচীন চিকিৎসকগণ এই ঔষধটির বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। ইহার উপাদান—

শুক্র মাতৃকা বটি—গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, পলাশপত্র, চই ও দাড়িম বীজ,—প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা, গুগগুলু ২ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকটি আট তোলা। জল দিয়া মর্দ্দন করতঃ ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিয়া ২ আনা পরিমাণে সেব্য। অনুপান দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক—সকল প্রকার মেহ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

'কুশাবলেহ' যে প্রমেহে জ্বালা যন্ত্রণা অধিক ভাবে বর্ত্তমান, সে স্থলে বিশেষ উপকারী। ইহার উপাদান গুলি —

কুশাবলেহ—কুশ, কাশ, বেণা, রক্তেক্ষু ও খাগড়া—প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ক্কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত ১২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে এবং লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে চুল্লী হইতে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাকুড়বীজ, কুষ্মাণ্ডবীজ, ছোটএলাইচ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে প্রমেহাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

শিলাজতু—সকল প্রকার প্রমেহের একটি বিখ্যাত ঔষধ। ত্রিফলাচূর্ণ, লৌহ ও শিলাজতু একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে প্রমেহে মূত্রাধিক্য হইয়া থাকে, সেই প্রমেহ রোগীকে 'সোমেশ্বর' রস, 'সোমনাথ রস', বা 'বসন্ত কুসুমাকর রসের' ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে—

সোমেশ্বর রস।—শালমূলের ছাল, অর্জ্জুন মূলের ছাল, লোধকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্ত চন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম্ববীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল, ও বেণার মূল—প্রত্যেকটি ৪ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, ধনে, মুতা, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ

তোলা এবং গুগ্‌গুলু ৪ তোলা। সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গব্য ঘৃতে মাড়িয়া ষোল রতি প্রমাণ বটী। অনুপান ছাগ দুগ্ধ, নারিকেল জল, যবের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবনে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক ও সোমরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে।

সোমনাথ রস।—পানিধার রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলার কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত আট তোলা লৌহ মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে তাহাতে অভ্র, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ—প্রত্যেক দ্রব্য এক তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসের ভাবনা দিবে। ২ রতি পরিমিত বটি। প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি যাবতীয় মূত্রবিকার ইহার দ্বারা আরোগ্য হয়।

বসন্ত কুসুমাকর রস।—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য দুইভাগ, বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক দ্রব্য তিনভাগ এবং অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা—প্রত্যেক দ্রব্য চারিভাগ, সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসক ছালের রস, লাক্ষার কাথ, বালার কাথ, কদলী মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, কুঙ্কুমের জল ও মৃগনাভি—এই সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা পুরাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেবলমাত্র শুক্র মেহ নিবারণের জন্য 'চন্দনাসব' একটি অপূর্ব্ব ঔষধ। দুর্ব্বল শুক্রমেহগ্রস্ত রোগীদিগকে ইহা সেবন করান উচিত।

চন্দনাসব—শ্বেত চন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারী, ফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন, আকনাদি, চিরতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শঠী, ক্ষেৎপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল, ও মোচরস—প্রত্যেক দ্রব্য এক পল, ধাইফুল ১৬ ষোল পল, দ্রাক্ষা ২০ কুড়ি পল, চিনি ১২॥ সের, গুড় /৬।০ সওয়া ছয় সের, একত্র জলে মিশ্রিত করিয়া আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। পরে উহার কল্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে।

প্রমেহের পরিণতি বাত এবং নানাপ্রকার ব্যাধি। যে প্রমেহ রোগী অনেক দিন ভুগিয়া বাতরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা বিবেচনায় প্রমেহের অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া 'দেবদার্ব্বরিষ্ট' ব্যবস্থা করিও। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

দেবদার্ব্বরিষ্ট।—দেবদারু /৬। ছয় সের এক পোয়া, বাসক ছাল /২॥ আড়াই সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্র যব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জ্জুন ছাল—প্রত্যেকটি এক সের এক পোয়া। যমানী, ইন্দ্রযব, রক্ত চন্দন, গুলঞ্চ, কটকী ও চিতামূল—প্রত্যেকটি এক সের। পাকার্থজল ৫১২ পাঁচশত বার সের, শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের। একত্র পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ৩৭॥ সাড়ে সাইত্রিশ সের, ধাইফুল /২ দুই সের, ত্রিকটু /।০ এক পোয়া, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ—প্রত্যেক /॥০ আধ সের, প্রিয়ঙ্গু /॥০ সের এবং নাগেশ্বর /।০ এক পোয়া—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ ঐ কাথে নিক্ষেপ করিয়া এবং ঘৃতভাণ্ডে এক মাস রাখিবে।

'প্রমেহমিহির তৈল'টি সকল প্রকার প্রমেহেই মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। উহার উপাদান—

প্রমেহমিহির তৈল।—তিল তৈল /৪ চারি সের, কাথার্থ লাক্ষা /৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের। কল্কার্থ, শুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, রেণুকা, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, দারুচিনি, এলাইচ, বামুনহাটি, চই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, লোধ, মৌরি, বচ, জীরা, বেণারমূল, জায়ফল, বাসকছাল,

ও তগরপাদুকা—প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাক করিবে।

প্রমেহের সহিত যেখানে শুক্রতারল্য সেখানে একবার করিয়া 'স্বর্ণবঙ্গের' ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। উহার উপাদান—

স্বর্ণবঙ্গ।—পারদ, নিশাদল, ও গন্ধক—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং উভয়ে মিশ্রিত হইলে তাহাতে নিশাদল ও গন্ধক চূর্ণ দিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পরে একটি কাচের শিশিতে তাহা পুরিয়া শিশির উপরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। শুষ্ক হইলে মকরধ্বজ পাকের ন্যায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। স্বর্ণাকার উজ্জ্বল পদার্থ প্রস্তুত হইলে ঔষধ প্রস্তুত লইয়াছে বুঝিতে হইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—প্রমেহ রোগের অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিবে।

মেহরোগে মূত্ররোধ হইলে।—কাঁকুড় বীজ চূর্ণ, সৈন্ধব লবণ ও ত্রিফলা—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে কিম্বা এলাইচ, শিলাজতু, পিঁপুল ও পাথরকুচি—প্রত্যেক দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিতে দিবে কিম্বা কুশ, কাশ, বেণা, কুক্ষেক্ষু ও খাগড়ার মূল—প্রত্যেকটি ৶১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া এক আনা সোরা মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে।

ঔপসর্গিক মেহ বা আগন্তুক মেহ—আজকাল গণোরিয়া বলিয়া যে রোগটি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আয়ুর্ব্বেদের বিংশতি প্রকার মেহের অন্তর্নিহিত নহে। এই ঔপসর্গিক মেহ-নিদানে লিখিত হয় নাই, এজন্য তাহার পরিচয় এখানে একটু দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

বেশ্যাগমনই বিষাক্ত গণোরিয়া বা ঔপসর্গিক মেহ উৎপত্তির প্রধান কারণ। বহুসংসর্গ জন্য বেশ্যারা প্রায়ই ক্লিন্না ও ক্ষতযোনি হইয়া থাকে। এই রোগবীজ অন্যের সংসর্গে তাহাদের যোনিমধ্যে সঞ্চারিত হয়। তাহার সহিত সহবাসের ফলে পুরুষ সেই রোগবীজ নিজ দেহে সংক্রামিত করিয়া লয়। এই রোগ-বীজ মূত্রনালীর মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইবামাত্রই তিন দিন হইতে একুশ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমতঃ এই রোগে লিঙ্গের অগ্রভাগে কণ্ডু এবং মূত্রনালীর মধ্যে বিষাক্ত ক্ষত ও প্রদাহ উপস্থিত হয়। বারংবার মূত্রত্যাগে ইচ্ছা হয়, প্রস্রাবের বেগ আসে অথচ প্রস্রাব বাহির হইতে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হয়। মূত্রনালীর মধ্যে ভয়ানক জ্বালা, মুহুর্মুহুঃ অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ অল্প অল্প প্রস্রাব, জননেন্দ্রিয়ের আরক্তিম ভাব এবং জননেন্দ্রিয় হইতে নিয়ত পুঁযের মত রস নির্গত হইতে থাকে। কখন বা অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত দুইধারায় মূত্রনির্গম ও মূত্রত্যাগ কালে রক্ত নির্গমও হইয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থায় সরলভাবে প্রস্রাব নির্গম এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পূর্ব্বে যে কুশ, কাশ, বেণা, কুক্ষেক্ষু ও খাগড়ামূলের পাচনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী। গোক্ষুরের ফাণ্ট এবং গোক্ষুরবীজ, কাঁকুরবীজ, শসার বীজ, ও পাথরকুচি—একত্র বাটিয়া সেবন করিতে দিলে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই রোগের চিকিৎসা দীর্ঘ দিন ধরিয়া করিবার প্রয়োজন। অচিকিৎসা বা দুষ্ট চিকিৎসার ফলে এই রোগ হইতে ষ্ট্রিকচার বা মূত্রনালীর সংকীর্ণতা উপস্থিত হয়। এই রোগের পরিণতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি। সন্ধিবাতগ্রস্ত অনেক রোগীরই মূল অন্বেষণ করিলে এই রোগই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রমেহ রোগে যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মূত্রকারক ঔষধগুলিই এই রোগে প্রযুজ্য। মূত্র কোষে ক্রমাগত মূত্র সঞ্চিত হইয়াছে অথচ মূত্র বাহির হইতেছে না—এইরূপ অবস্থা হইলে শলাকা প্রবেশ করাইয়া প্রস্রাব করান উচিত, নতুবা জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা করা যায়। বস্তিকর্ম্ম বা পিচকারির সাহায্যে

প্রস্রাব করানও মন্দ নহে। ত্রিফলার কাথ, বাবলার ছালের কাথ, অশ্বত্থছালের কাথ, জাতীপাতার কাথ, খদির ভিজান জল এবং দধির মাত দ্বারা পিচকারি দিলে ক্ষতের শান্তি এবং যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। কাবাব চিনির গুঁড়া তিন আনা, সোরা এক আনা, সোনামুখীর গুঁড়া এক আনা,—গরম জলসহ প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে কিম্বা কাবাব চিনির গুঁড়া এক আনা, কর্পূর দুই রতি ও অহিফেন অর্দ্ধ রতি ও একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে গণোরিয়ার উপকার হইয়া থাকে। যে 'বঙ্গেশ্বরের' এবং 'মেহ মুদ্গরে'র কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐ দুইটির কোনো একটি ঔষধ বাবলাপাতার রস বা গদ ভিজান জল সহ সেবন করাইলে ক্লেদ ও পূযাদির স্রাব শীঘ্র উপশমিত হয়। এ দুইটি ঔষধ—তেঁতুলপাতার কাটি ভিজান জল বা গুলঞ্চের রস সহ সেবন করাইলে অসহ্য যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শীত লিঙ্গ ঈষদুষ্ণ জাতীপত্রের কাথে বা ত্রিফলার কাথে ডুবাইয়া রাখিলে জালা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পীড়ায় সর্ব্বদা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা করিবে। স্থূল পদ্মের পাতা অথবা পাতরকুচির পাতার রসের সহিত যে 'কুশাবলেহে'র কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মূত্র পরিষ্কারের জন্য তাহা সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিও।

পথ্যাপথ্য—এক বেলা পুরাতন চালের অন্ন ও এক বেলা আটার রুটি বা লুচি। মসুর, মুগ, ছোলারদাল, অল্প পরিমাণে ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, শশক, ঘুঘু প্রভৃতি মাংসরস—পটোল ডুমুর, বেগুণ, মানকচু, সজিনার ডাটা, থোড়, মোচা, ঠোটে কলা প্রভৃতির তরকারী, পাতি বা কাগজী লেবু এবং সকল প্রকার তিক্ত ও কষায় রস যুক্ত দ্রব্য প্রমেহে উপকারী। জলখাবার, ইক্ষু, খেজুর, বাদাম, পানিফল, ছোলা ভিজা, কিস্মিস, বাদাম প্রভৃতি। বেশী মিষ্ট ভাল নহে। স্নান সহ্য মত। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় স্নান কম করিলে ভাল। অধিক দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, অধিক মৎস্য, লঙ্কার ঝাল, শাক, কলাইয়ের দাল, দধি, গুড, লাউ, অম্ল দ্রব্য এবং সকল প্রকার কফবর্দ্ধক দ্রব্য বর্জ্জনীয়। মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মূত্রের বেগ ধারণ, রৌদ্রলাগান এবং অধিক ধূমপান একেবারে বর্জ্জনীয়।

অপামার্গ

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

লোকসমাজে এক একজন ব্যক্তি যেমন স্বয়ং এবং অপরের সাহায্যে নানারূপ লোকহিতকর কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন, তদ্রূপ বৃক্ষলতাদি ভেষজ সমস্ত স্বয়ং এবং দ্রব্যান্তরের সাহায্যে নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিয়া লোকের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।

যে সকল ভেষজ সাধারণতঃ অযত্নে স্বয়ম্ভূত হইয়া জনসমূহের উপকারার্থ আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য পল্লীর গৃহ পার্শ্বে উপেক্ষিত অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকে,—সেই সকল পরোপকারক ভেষজ সমূহের পরিচয় আমরা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" পাঠকগণকে ক্রমশঃ উপহার দিতে থাকিব। ইহা দ্বারা অনেকেই বিনা ব্যয়ে অনেক দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে সাধারণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে,—তাঁহারাও যদি কোন বৃক্ষ

লতাদির রোগনিবারণের অপূর্ব্ব শক্তির কথা অবগত থাকেন অথবা আমরা যে সকল ভেষজের গুণাগুণ সকল বর্ণন করিব, তৎসম্বন্ধে যদি তাঁহাদেরও নূতন কোন কথা জানা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকল কথা সাধারণের অবগতির জন্য এই পত্রিকায় প্রকাশ করিলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

আজ আমি যে ভেষজটীর পরিচয় আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি—ইহার নাম অপামার্গ। বাঙ্গলাদেশে লোকে সাধারণতঃ ইহাকে 'আপাঙ্' 'চব্‌চবে' বা 'চিরচরে' বলিয়া থাকে। এই অপামার্গ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, সে সকল তো আমরা বলিবই, অধিকন্তু প্রচলিত শাস্ত্রসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই অথচ লোক-পরম্পরায় দৈব ঔষধ প্রভৃতি নাম দিয়া সে সকল ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে,—সে সকলের যথাজ্ঞান উল্লেখ করিয়া যাইব।

বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় এমন কোন গ্রামই নাই—যেখানে কেহ না কেহ অপামার্গকে চেনে না। অপামার্গের গাছ সকল বর্ষার প্রারম্ভে আপনা হইতে জন্মাইতে থাকে এবং শীতে কোনরূপে জীবন ধারণ করিয়া প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পত্র পুষ্প শীষ শূন্য হইয়া "শাকের মড়ো"র মত দেখিতে হয়। অপামার্গের পত্র, মূল, কাণ্ড, বীজ প্রভৃতি সকল অংশই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু, ও ভাবপ্রকাশ বলেন,—অপামার্গ—তিক্ত, কটু, সর ও উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা পাচক, অগ্নিদীপক, কফনাশক রক্তরোধক ও অর্শঃ, কণ্ডু, উদর, আম, উদরাময় প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার।

(১) **শিরোবিরেচনে**—অর্থাৎ ঊর্দ্ধশ্লেষ্মার জন্য মাথা ভার, মাথার যন্ত্রণা ও কপাল টন্‌টন্ করিতে থাকিলে অপামার্গের বীজ হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া খুব সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে এবং আবশ্যক মত নস্য গ্রহণ করিবে। ইহাতে নাক দিয়া বসা সর্দ্দি-কফ সকল নির্গত হইয়া গেলে শিরঃপীড়ার উপশম হইয়া যাইবে। চরক

(২) **অর্শে**—অপামার্গের মূল একটা (চারি আনা পরিমাণ। চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া ঐ জলে গুলিয়া কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া পান করিবে। এইরূপ দিন কতক করিলে অর্শোযন্ত্রণা ও রক্তস্রাব নিবৃত্তি হইবে। ইহা কফানুবদ্ধ পিত্ত জন্য রক্তার্শে প্রয়োজ্য। (সুশ্রুত)

(৩) **প্রমেহে**—শিরীষ ও অপামার্গের মূলের রস দুই আনা হইতে চারি আনা পরিমিত মধু মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে হয়। (সুশ্রুত)

(৪) **সদ্যোব্রণের রক্তস্রাবে,**—অর্থাৎ কোনস্থান কাটিয়া গেলে বা চোট লাগিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে অপামার্গের পাতা বাটিয়া কিম্বা পাতার রসে পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া ক্ষতপটীর মত করিয়া দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলে ক্ষতের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাইবে।

(৫) **বাধির্য্য ও কর্ণনাদে**—অর্থাৎ কাণে কম শুনিতে পাইলে বা কাণ ভোঁ ভোঁ করিতে থাকিলে,—অপামার্গের ক্ষার জল দিয়া এবং অপামার্গের কল্ক দিয়া তিল তৈল পাক করিবে। সেই তৈল কাণে দিলে কর্ণনাদ ও বাধির্য্য নিবারিত হয়।

(৬) **নূতন চোক উঠায়,**—একটা তামপাত্রে দধির জল একটু দিবে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-লবণসহ ১টী অপামার্গের মূল ঘষিতে থাকিবে ও তাহাতে ক্রমশঃ একটু করিয়া দধির জল দিতে থাকিবে। এইরূপে আবশ্যক মত দধির জলে অপামার্গের মূল ঘষা মিশাইয়া লইবে। পরে সেই জল দিয়া চক্ষুঃপূর্ণ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। এইরূপ দিনের মধ্যে ৩।৪ বার করিলে চোক উঠা সারিয়া যাইবে। (চক্রদত্ত)

(৭) **বিসূচিকায় বা কলেরাতে,**—অপামার্গের মূল বাটিয়া জলে গুলিয়া পান করিলে—কলেরায় পেটের যাবতীয় যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়। (ভাবপ্রকাশ)

(৮) **রক্তার্শে**—রক্তস্রাব নিবারণ করিতে

হইলে অপামার্গের বীজ—চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া সেই জলসহ পান করিবে। ইহাতে নিশ্চয় অর্শ দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। (শার্ঙ্গধর)

(৯) **উন্মাদরোগে**—শ্বেত বেড়েলামূল ৭ তোলা এবং অপামার্গ মূল ছুই তোলা বেশ করিয়া কুটিয়া একসের এগার ছটাক জল ও নয় ছটাক দুগ্ধসহ পাক করিবে। জল মরিয়া গিয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে প্রবল উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়।

(১০) **আগন্তুকব্রণে,**—অপামার্গ ও বেড়েলার মূল বাটিয়া সেই কল্কসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল প্রয়োগ করিলে আগন্তুক ক্ষত ভাল হয়। (বঙ্গসেন)

(১১) **অনিদ্রায়**—অপামার্গ ও কাকজঙ্ঘার মূলের ক্বাথ পান করিলে অনিদ্রা রোগ দূর হয়।

(১২) **শোথে,**—অপামার্গ ও কুলেখাড়া (কোকিলাক্ষ কুট্টিত করিয়া একটা আবৃত মুখপাত্রে সিদ্ধ করিবে এবং সেই রুদ্ধমুখ পাত্রের মুখস্থিত শরাতে একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটা লম্বা (হুকার নল) লাগাইয়া দিবে। যখন সেই নল হইতে বাষ্প নির্গত হইতে থাকিবে, তখন সেই বাষ্প ধীরে ধীরে সহ্য মত শোথে লাগাইতে থাকিবে। অথবা অপামার্গ ও কুলেখাড়া কুট্টিত করিয়া ন্যাকড়ার পুঁটলীতে বাঁধিয়া সিদ্ধ করিবে ও সিদ্ধ হইলে সেই গরম পুঁটলী দিয়া ধীরে ধীরে সহ্য মত শোথে স্বেদ দিবে। (হারীত)

(১৩) **পালাজ্বরে,**—রবিবারে সকালে সাত গাছি লাল সূতা দিয়া একটা অপামার্গের মূল কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে একদিন অন্তর যে জ্বর আসে—সেই জ্বর বন্ধ হয়। (আয়ুর্বেদসংগ্রহ)।

লোক ব্যবহারে—অপামার্গ

আয়ুর্বেদশাস্ত্র অসংখ্য। সকল শাস্ত্র আমাদের অধিগত নহে। আমরা যে সকল সচরাচর দেখিতে পাই, সে সকল শাস্ত্রে অপামার্গের ব্যবহার যেরূপ কথিত হইয়াছে, সে সকল উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন লোকসমাজে গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যবহৃত এবং আমার জ্ঞাত অপামার্গ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োগ অতঃপর লিখিত হইতেছে। হইতে পারে—এ কয়টী এবং আরও কত মুষ্টিযোগ প্রকাশিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থের জীর্ণকুক্ষিতে গোপনে অবস্থান করিতেছে।

১ **মূর্চ্ছা বা অপস্মারে**—মূল হয় নাই এরূপ অপামার্গের মূল একটা লইয়া তামার মাদুলীতে পুরিয়া রবিবারের দিন সকালে রোগীকে ধারণ করাইয়া দিবে। রোগ সারিলে অভীষ্ট দেবতার পূজা দিবে। ইহা **দৈব ঔষধ** বলিয়া খ্যাত। সুতরাং রোগীকে এই ঔষধের কথা জানিতে দিবে না।

(২) **শ্বাসে অর্থাৎ হাঁপানিতে,**—একটা অপামার্গের মূল ও ১৯॥০টা গোলমরিচ জলে বাটিয়া একদিন মাত্র প্রাতে রোগীকে খাইতে দিবে। ঔষধ খাওয়ার পর রোগীর বুকে পিঠে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে হয়। এই ঔষধ খাইলে রোগীকে জন্মের মত গুড় ও দধি ত্যাগ করিতে হয় এবং একাদশী করিতে হয়। আর এক কথা, যিনি ঔষধ বাটিবেন—তিনি স্নান করিয়া আসিয়াই মাথা না মুছিয়া এবং কাপড় না নিঙড়াইয়া সিক্ত বসনচুলে ঔষধ বাটিবেন। ইহাও **দৈব ঔষধ** বলিয়া খ্যাত। সুতরাং রোগীকে জানাইবেন না।

(৩) **ওলাউঠায় বা প্রবল বমন অতিসারে,**—যখনই দেখিবে কলেরার মত ভেদবমি আরম্ভ হইয়াছে, তখনই একটা অপামার্গের মূল ২৯টা গোলমরিচ সহ জলে বাটিয়া একবারে সমস্তটা রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। এই একবার মাত্র প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে। না হয়তো আর একবার মাত্র প্রয়োগ করিবে। ইহা দৈব নামে খ্যাত।

(৪) **কোষবৃদ্ধি বা একশিরাতে,**—অপামার্গের মূল একটা তামার মাদুলীতে পুরিয়া একটা

আবশ্যকমত লম্বা সূতা দিয়া কোমরের ঘুন্সীতে এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখিবে—যাহাতে মাদুলীটী যেন সর্ব্বদা তুলা কোটীতে স্পর্শ করিয়া থাকে। এইরূপ সাতদিন রাখার পর মাদুলী কোমরে বাঁধিয়া রাখিবে। মাদুলী কিনিবার পয়সা শনিবারে তুলসী তলায় রাখিয়া দিবে এবং পরদিন সেই পয়সায় মাদুলী কিনিবে। অপামার্গের মূলটীতে একটু তুলা জড়াইয়া মাদুলীতে পুরিবে। রোগ সারিয়া গেলে বাবা বৈদ্যনাথের পূজা দিবে। এই ঔষধ ধারণ করিলে শ্মশানে যাওয়া, মড়া ছোঁয়া ও আঁতুরঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য ইহাও দৈব।

(৫) **প্রসব বাধায়**—প্রসব বেদনা খুব অথচ সন্তান প্রসব হইতেছে না, এরূপ অবস্থায় একটা অপামার্গের মূল গর্ভিণীর দক্ষিণদিকে কেশে বাঁধিয়া নাকের কাছে ঝুলাইয়া দিবে। অল্পক্ষণ মধ্যে গর্ভিণী সন্তান প্রসব করিবে। প্রস্রাব হইবামাত্র মুলটী খুলিয়া ফেলিয়া দিবে।

(৬) **মৃতবৎসায়,**—একটী পূর্ণ বয়স্ক অথচ ফুল হয় নাই এরূপ অপামার্গের সমগ্র মূলটী লইয়া সাতটী খণ্ড করিবে। পরে একটী ঘুরঘুরে পোকাকে (প্রায়ই মাটীর মধ্যে থাকে, অত্যন্ত অস্থির পোকা) এক বাটী হলুদ গোলা জলে ৩।৪ বার চুবাইবে ও সেই জলের ঝাপটা দিবে। এইরূপ করিলে পোকাটী মরিয়া যাইবে। তখন সেই পূর্ব্বকৃত অপামার্গের মূলের একটী খণ্ড লইয়া মৃত পোকাটীর গায়ে সাতবার বুলাইবে এবং যখন দেখিবে সেই সপ্তখণ্ড অপামার্গের মুলের যে খণ্ডটীর দ্বারা পোকাটী নড়িতে থাকিবে ও তাহার স্পর্শে ক্রমশঃ বাঁচিয়া উঠিবে, সেই খণ্ডটী লইয়া একটী সোনার বা তামার মাদুলীতে পুরিয়া মৃতবৎসা নারীর কণ্ঠে ধারণ করাইয়া দিবে এবং সন্তান জন্মাইবামাত্র মাদুলীটী সদ্যোজাত শিশুর গলায় পরাইয়া দিবে। ইহাও দৈব ঔষধ। ঔষধ ধারণ করিয়া সদাচারে থাকিতে হয়। পেঁয়াজ, মাংস, সূতিকাগৃহ, মৃতদেহ, শ্মশান প্রভৃতি স্পর্শ নিষিদ্ধ। সন্তান বাঁচিলে অভিমত দেবতার পূজা দিতে হয়।

(৭) **সর্ব্বাঙ্গ শোথে,**—যেখানে দেখিবে হঠাৎ সমস্ত শরীর ফুলিয়া গিয়াছে অথচ কোনার কারণ বুঝা যাইতেছে না, প্রস্রাব কমিয়া গিয়াছে—সেরূপ অবস্থায় অপামার্গের ক্ষার—জলে গুলিয়া একটু একটু করিয়া দিনে ৩।৪ বার রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অত্যন্ত প্রস্রাব হওয়ায় শোথ সারিয়া যায়।

(৮ **সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে**—যেমনই ঘা হউক না কেন গব্যঘৃতে অপামার্গ পাতার রস ও কিঞ্চিৎ পেঁয়াজের রস দিয়া পাক করিয়া সেই ঘৃত লাগাইলে সকল রকম ঘা সারিয়া যায়।

(৯) **"ঘুরে ঘুরে ঘা"**—যে ঘা একবার সারিয়া গেল আবার কিছুদিন পরে আপনা হইতে দেখা দিল, এইরূপে যে ঘা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে, সেই ঘায়ে অপামার্গের পাতা কাঁচা হলুদ ও পাঁপড়ি খয়ের—হুকার জলে বাটিয়া ঘায়ে প্রলেপ দিতে থাকিবে। এইরূপ দিন কতক করিলেই নির্দ্দোষভাবে ঘা সারিয়া যায়।

✓ সাময়িকী

পশুচিকিৎসা বিভাগ। বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা বিভাগ—বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের অন্তর্গত। ১৯২৫।২৬ সালের পশুচিকিৎসা বিভাগের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ছাত্রসংখ্যা বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা ৪৯ হইতে ২৯ হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের ছাত্র ইহার তুলনায় অধিক। বঙ্গের জেলাবোর্ড সমূহ পশুচিকিৎসা

...র পাশকরা ডাক্তার নিযুক্ত করিতেছেন না এবং ... গবর্ণমেণ্ট পশুচিকিৎসা কলেজের ছাত্রগণকে ... বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া ছাত্রসংখ্যা এইরূপ হ্রাস ...য়াছে, বঙ্গীয় সরকার এইরূপ মনে করেন। আলোচ্য ...রে সংক্রামক রোগে ৩৩,১২৪টী পশু মৃত্যুমুখে পতিত ...য়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মাত্র ২১,৯০১টী পশু ...মুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে ...র মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ...মক রোগের আক্রমণ নিবারণের জন্য ১৭৩,৭৬টী ...কে টীকা দেওয়া হইয়াছে। পশু বিভাগের সহকারী ...গণ ১৫,৪২৯ গ্রাম পরিদর্শন করিয়া ১,০০,৮৩০টী ... চিকিৎসা করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে রংপুর ...র জেলা বোর্ড পশুচিকিৎসার সম্প্রসারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। রংপুরে ৭টী পশু চিকিৎসালয় ... জেলার উপর পশুচিকিৎসার একটী হাসপাতাল ...।

কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট। ...১৩ আপার সারকুলার রোডস্থ কলিকাতা মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটের হাসপাতালের জন্য একটি অতিরিক্ত ব্লক নির্ম্মাণ করা হইবে। এই উদ্দেশে সাধারণকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

"পল্লী মঙ্গল উৎসব"। বিগত ২০শে কার্ত্তিক ফরিদপুর জন্ডাবিঝারী বাজারস্থিত ৺কালী বাড়ীতে মহাসমারোহের সহিত "পল্লীমঙ্গল উৎসব" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরান্তে পল্লীবাসীদের মধ্যে তাদের আদানপ্রদান, সহজ ও শিক্ষাপ্রদ আনন্দ বিতরণ ও তাহাদের সর্ব্বতোমুখীন শক্তি অনুশীলনের পরিচয় লাভের জন্য কতিপয় উদ্যমশীল গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় এই উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ সভা—বিগত ২৪শে কার্ত্তিক বুধবার ৩৯নং মাণিক বসু ঘাট ষ্ট্রীটে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় ... সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আয়ুর্ব্বেদ সভার দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ৭ম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন আয়ুর্ব্বেদ-সভা আজ পর্য্যন্ত কলিকাতার মধ্যে ৬টি এবং কলিকাতার বাহিরে চাকুরিয়াতে ১টী দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কবিরাজী হাসপাতাল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়স্থ ইন্‌ডোর হাসপাতাল অতি শীঘ্র খোলা হইবে। ইহার আউটডোর বিভাগে আজকাল এক শতেরও উপর রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য সমিতির ১নং ওয়ার্ড। কলিকাতা স্বাস্থ্য সমিতির ১নং ওয়ার্ডের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে চলিতেছে। এই ওয়ার্ডে করপোরেসনের সাহায্যে যে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়টি ২।১ বি গালিফ লেন— বাগবাজারে অবস্থিত, তাহাতেও রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই চিকিৎালয়টি সারকুলার রোড নন্দনবাগান হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায়, উত্তর কলিকাতার অধিবাসীদিগের বিশেষ উপকারই হইয়াছে।

মাতৃমঙ্গল সম্মিলন—আগামী ৪ঠা হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লীতে এক মাতৃমঙ্গল সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সেই সম্পর্কে আয়োজনাদি করা হইতেছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দিল্লীর চীফ কমিশনার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বড় লাট পত্নী লেডী আর উইন এই সম্মিলনে এক বক্তৃতা করিবেন।

বিনা লাইসেন্সে আফিম। ফিয়ারলেনের আবদুল নামক এক মুসলমানের বাটী হইতে, প্রায় আড়াই সের আফিম পাওয়া যায়। ঐ আফিমের জন্য লাইসেন্স ছিল না। বিনা লাইসেন্সে আফিম রাখিবার অপরাধে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুলের পাঁচ শত টাকা অর্থ দণ্ডের বিধান করিয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিতে পারিলে আসামীকে তিন মাস সশ্রম কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

'আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৷৵৹ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৹ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হইলে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হইবে। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরের খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধ—সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Rs. 20 Per Page.

পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	৯৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	৫৲

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

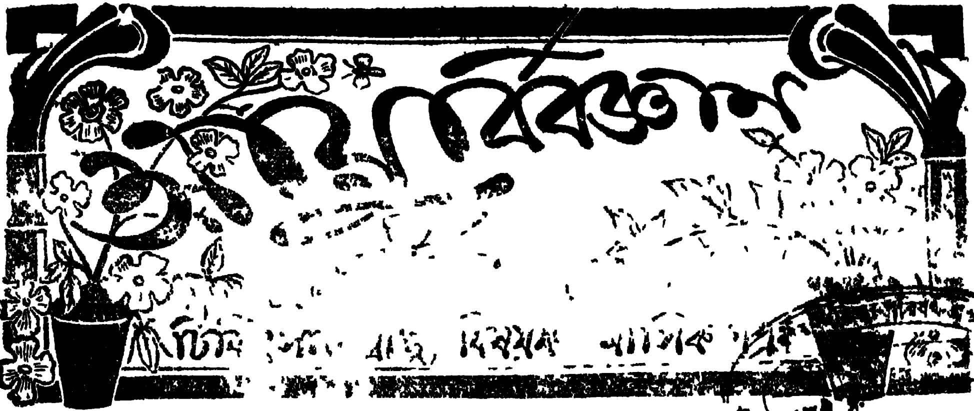
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
কলিকাতা বুক ডিপো—২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by the Sub Editor Sj. Bhupal Chandra Bhattacherjee B. A
at the Gobordhon Press. 200 Cornwallis Street, Calcutta

১ম বর্ষ। পৌষ ১৩৩৩।

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"

২য় সংখ্যা। December 1926.



Journal of Health & Indian Medicines

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রী সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন।

সহঃ সম্পাদক—কবিরাজ শ্রী ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

বার্ষিক মূল্য ৩॥০

স্বত্বাধিকারী—কলিকাতা বুক ডিপো।

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা।০



"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

'আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৴০ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হইলে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হইবে। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরের খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধ—সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন দাতা লক্ষ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Rs. 20 Per Page.

পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	...	...	১৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		...	...	৯৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম		...	...	৫৲

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
কলিকাতা বুক ডিপো—২০৪ন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ,
বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন, বেদান্তভূষণ প্রণীত

সচিত্র প্রসূতি-তন্ত্র বা আয়ুর্ব্বেদীয়-ধাত্রী-বিদ্যা।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

গৃহস্থের ও চিকিৎসক মাত্রের নিত্যপ্রয়োজনীয় আয়ুর্ব্বেদীয় স্ত্রী চিকিৎসা গ্রন্থ। ইহাতে বিবাহ হইতে গর্ভাধান, প্রসব, ও প্রসূতি এবং শিশু পরিচর্য্যা প্রভৃতি যাবতীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গর্ভিণীর গর্ভাধান হইতে সন্তান প্রসব পর্য্যন্ত যাবতীয় বিপৎ-প্রতীকার এই গ্রন্থের সাহায্যে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। একখানি পুস্তক গৃহে রাখিলে অনেক আপদ বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী, কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, প্রভৃতি সুধীবর্গ এবং অমৃতবাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী ও বসুমতী প্রভৃতি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

৫২ বৎসরের বহুদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসক, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, এম, ডি প্রণীত ইংরাজি বাঙ্গলা সংবাদপত্র কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সর্ব্বদা আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

চিকিৎসা-রত্ন ১৭শ সংস্করণ প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা মূল্য ৩৲ টাকা, চিকিৎসাসার ৫ম সংস্করণ ১১০ পৃষ্ঠা ॥০, মেটেরিয়া মেডিকা (ভৈষজ্য তত্ত্ব) ৫ম সংস্করণ ৯৪ পৃষ্ঠা ॥০, জ্বর-চিকিৎসা ৫ম সংস্করণ ৮০ পৃষ্ঠা ৷৹০, শিশু-চিকিৎসা ৪র্থ সংস্করণ ৬১ পৃষ্ঠা ॥৵০, স্ত্রী চিকিৎসা ৪র্থ সংস্করণ ৮৮ পৃষ্ঠা ৷৹০, ওলাউঠা চিকিৎসা ৬ষ্ঠ সংস্করণ ৩৪ পৃষ্ঠা ।৵০, শরীর তত্ত্ব ৫ম সংস্করণ ৯৬ পৃষ্ঠা ১৲, এনাটমি বা অস্থিতত্ত্ব ৫ম সংস্করণ ৪০ পৃষ্ঠা ৷৹০, এলোপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা ৫ম সংস্করণ ১৬ পৃষ্ঠা ।০, ডাক্তারি অভিধান ৩য় সংস্করণ ১৭৬ পৃষ্ঠা পাতলা কাগজে ১৲।

"General treatment" 10th edition page 217 cloth bound Rs. 2/- Practitioner or "Family guide" 10th edition page 82 price /8/-

আরও কয়েক খানি চিকিৎসা পুস্তক

চরকসংহিতা সানুবাদ) ৩॥০, ঐ (সতীশ শর্ম্মা) ৮৲, সুশ্রুতসংহিতা (সানুবাদ) ২৷৹০, ঐ সটীকানুবাদ ৫৲, ভাবপ্রকাশ (ঐ) ৫৲, চক্রদত্ত (সটীকানুবাদ) ৩৲, শার্ঙ্গধর সংগ্রহ (ঐ) ১॥০, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ (সটীকানুবাদ) ১।০, মাধব নিদান (ঐ) ১৷৹০, নিদানার্থ-চন্দ্রিকা ॥৵০, মুক্তাবলী (সানুবাদ) ২৲, বৃহৎসারকৌমুদী (ঐ) ১৲, রসরত্নাকর (ঐ) ২।০, পরীক্ষিত আদি অর্কপ্রকাশ ১৲, চিকিৎসাদর্পণ ১৲, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ॥৵০, পথ্যাদিনির্ণয় ॥০, পরিভাষাপ্রদীপ ।৹০, অনুপানদর্পণ ॥০, ভৈষজ্যধন্বন্তরি ২৲, ভৈষজ্যরত্নাবলী ৯৲, রসেন্দ্রচিন্তামণি ৷৵০, আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা (অমৃতগুপ্ত) ৭।০, কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা ১।০, আয়ুর্ব্বেদ সোপান (রামচন্দ্র) ১।০, মহামহো-পাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন প্রকাশিত—পথ্যাপথ্য ।০, গার্হস্থ্য মুষ্টিযোগ ॥০

ভৈষজ্যরত্নাবলী ৯৲, অষ্টাঙ্গহৃদয় (বাগ্‌ভট, সরল বঙ্গানুবাদ সমেত) ৪৲। কবিরাজ দেবেন্দ্র (উপেন্দ্র) নাথ সেন প্রকাশিত—নিদান (সটীকানুবাদ) ২৲ সুশ্রুত সংহিতা মূল্য ৩৲, ঐ বঙ্গানুবাদ ৩।০, একত্র ৫৲; চক্রদত্ত (সটীক) ২৲, ঐ অনুবাদ ২৲, একত্র ৩৲; আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ (পরিবর্দ্ধিত, পরিশিষ্ট সমেত) ।।০, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ (সটীক) ১॥০, ঐ অনুবাদ ।০, একত্র ২।০ মদনপাল নির্ঘণ্ট (সানুবাদ) ১. পাচনসংগ্রহ ॥০, দ্রব্যগুণ ১৲, পরিভাষাপ্রদীপ ॥০, আয়ুর্ব্বেদ প্রদীপ ॥০, নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ী প্রকাশ (সানুবাদ) ।০, শার্ঙ্গধর (ঐ) ১।০, ভাব-প্রকাশ (সটীকানুবাদ) ৫. অষ্টাঙ্গহৃদয় (বাগ্‌ভট, অরুণ দত্ত টীকা সহ) ৯৲, ঐ অনুবাদ ৩৲; রসরত্নসমুচ্চয় (সানুবাদ) ১॥০; কবিরাজ ভবলাল গুপ্ত প্রকাশিত—আয়ুর্ব্বেদচন্দ্রিকা ৪॥০, পরিভাষাপ্রদীপ ॥৵০, আয়ুর্ব্বেদ-ভাষাভিধান ॥৵০, পাচনসংগ্রহ ॥০, নাড়ীজ্ঞানশিক্ষা ।৵০, সিদ্ধমুষ্টিযোগ ।৵০; কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন প্রকাশিত—পাঁচন ও মুষ্টিযোগ ৷৹০, নিদান ২৲, কবিরাজী শিক্ষা ৩।০।

কলিকাতা বুকডিপো, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আরোগ্য নিকেতনের

কয়েকটি সদ্যঃ ফলপ্রদ ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার স্ত্রী রোগের মহৌষধ।

অশোকামৃত।

আমাদের **অশোকামৃত** সর্ব্বপ্রকার প্রদর এবং বাধক রোগের সুখসেব্য অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। রক্ত বা শ্বেত প্রদর এবং অতি কষ্টসাধ্য বাধক—যেরূপ ও যত দিনের হউক, নিয়ম পূর্ব্বক ইহা কিছুদিন ব্যবহার করিলে অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে। ঋতুকালে ভয়ানক যন্ত্রণা, অতিকষ্টে রজঃ-নিঃসরণ, উরুদেশ, তলপেট বা কোমরে বেদনা, শরীরের অবসাদ, মস্তিষ্কশূন্যতা, মনের অপ্রফুল্ল ভাব—এ সকল উপসর্গ নাশ করিতে অশোকামৃতের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদের মতে এই **অশোকামৃত** সেবনে স্ত্রীলোকদিগের আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা অত্যধিক লাবণ্যবতী হইয়া থাকেন। মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত ১৸০ আনা, ভিঃ পিতে সর্ব্বসমেত ২৷০ আনা। একত্র ৩ শিশি লইলে ৪৷০ টাকায় দেওয়া যায়।

শূলান্তক চূর্ণ।

অত্যন্ত কষ্টকর অম্ল বা গুল্মজনিত শূল বেদনা ধরিলে এই মহৌষধ সেবনের ৫ মিনিট পরেই অসহ্য বেদনা উপশমিত হইয়া থাকে। ইহা বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বজন-পরিচিত সুখসেব্য মহৌষধ। সেবনে কোন কষ্টকর নিয়ম নাই। বেদনাকালীন কেবলমাত্র জল দিয়া এক মাত্রা সেবন করিতে হয়। ৭ পুরিয়ার মূল্য ১৲ টাকা; ৩০ পুরিয়া ৩৷০ টাকা। মাশুলাদি ।৵০ আনা।

পরিপাকবটী।

(অম্লজনিত রোগের সদ্যঃফলপ্রদ ও সুখসেব্য মহৌষধ)

প্রত্যহ আহারান্তে শীতল জলের সহিত ইহা সেবন করিলে উত্তমরূপে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া, ভুক্ত অন্নের পরিপাক, অম্লঘটিত বুক জ্বালা, আহারের অরুচি বা অনিচ্ছা, দমকা দাস্ত বা মল বদ্ধতা, উদর ভার, উদর বেদনা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া শরীর স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে। মূল্য ১৫ দিনের উপযুক্ত ১৲ টাকা। মাশুলাদি ৬ আনা।

উদরাময় বটী।

সকল প্রকার পেটের পীড়ায় ইহা ব্রহ্মাস্ত্র। সাধারণতঃ দু' এক দিন সেবনেই সর্ব্ববিধ উদরাময় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য ৭ বটি পূর্ণ কৌটা ১৷০ টাকা।

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী ভিষগরত্ন,

এল, এ, এম, এস, এইচ, এম, বি।

১১।২ বলরাম ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুত পঞ্চানন রায় কবিভূষণ ও

কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী

সম্পাদিত

"বঙ্গ-রত্ন"

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র

আজ ২২ বৎসর হইতে নদীয়া জেলার হিতকল্পে বাহির হইতেছে। প্রত্যেক নদীয়াবাসীর এই পত্রিকাখানি পড়া উচিত—কারণ ইহাতে নদীয়া জেলার যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, আদালতের নীলাম ইস্তাহার সমূহ বাহির হইয়া থাকে।

দেশ-বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ইহার লেখক। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। বিজ্ঞাপনদাতাগণের অপূর্ব্ব সুযোগ।

শ্রীকানাইলাল দাস

ম্যানেজার "বঙ্গরত্ন" গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

বাঙলার ভাবধারার সহিত প্রবাসী বাঙালীর

সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য

উত্তরা

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

আশ্বিনে ১৩৩৩ সালে দ্বিতীয় বর্ষ সুরু হইয়াছে।

সম্পাদক :—সুকবি **শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন** বার-এট্-ল, মনীষী পণ্ডিত ও ডাঃ **শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়** এম্-এ-পি-আর-এস্-পি-এচ্-ডি

রস-সাহিত্য, মৌলিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, সুচিন্তিত দার্শনিক গবেষণা, সুরচিত গল্প, কবিতা, প্রবাসী বাঙালীর নানাপ্রদেশের তথ্য, উত্তর-ভারতের হিন্দি ও উর্দ্দু সুকবিগণের উৎকৃষ্ট কবিতার বঙ্গানুবাদ ও এ প্রদেশের লোকাচার, গাথা, গান প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ—এ সমস্তই এ পত্রিকার বিশেষত্ব।

প্রতি সংখ্যায় বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীগণের রঙিন ছবি থাকে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য ছবিও থাকে।

"উত্তরা" আকারে "প্রবাসী" ও "ভারতবর্ষ" পত্রিকার অনুরূপ। ৮০ হইতে ১০০শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

অথচ বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷০ টাকা।

কলিকাতা বুক ডিপো

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন—

১ম সংখ্যার মত ২য় সংখ্যার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান"ও আপনার নিকট প্রেরিত হইল। ১ম সংখ্যা প্রেরণকালে আমরা বলিয়াছিলাম ২য় সংখ্যার কাগজ আপনাকে ভিঃপিঃতে পাঠান হইবে, কিন্তু এবারও তাহা না করিয়া সাধারণ পোষ্টেই পাঠাইয়া দিলাম, এই সংখ্যা পাইয়াই দয়া করিয়া ইহার বার্ষিক মূল্য মণিঅর্ডারে প্রেরণ করেন—ইহাই বিনীত অনুরোধ। ইহার পরবর্ত্তী সংখ্যা ঠিক ১লা মাঘ প্রকাশিত হইবে। ইহার মধ্যে যদি আপনার নিকট হইতে মণিঅর্ডার না পাই, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, ভিঃপিঃ করিবার জন্য আপনি অনুমতি করিতেছেন এবং তদনুসারে ভিঃপিঃ প্রেরণ করিব। যদি কাহারও ভিঃপিঃ গ্রহণে আপত্তি থাকে বা গ্রাহক হইতে সম্মত না হন, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক ১ম ও ২য় সংখ্যার মূল্য ‖৹ মণিঅর্ডার সহ দুই ছত্র লিখিয়া জানাইলে আমরা আর ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিব না।

যাঁহারা ইহারই মধ্যে বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১ম ও ২য় সংখ্যার কাগজ নিঃশেষ প্রায়, সুতরাং এখন হইতে গ্রাহক না হইলে ইহার পর ১ম হইতে কাগজ দিতে পারিব কি না সন্দেহ।

ম্যানেজার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,

২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ { পৌষ, ১৩৩৩ } ২য় সংখ্যা

চিকিৎসায় স্বরাজ

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস,)

কবিবর রঙ্গলাল বলিয়া গিয়াছেন, -

"কোটী কল্প দাস থাক নরকের প্রায়,
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায়।"

স্বরাজ—সকলেরই কাম্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু মানুষের সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন যে তিনটি বস্তুতে—সে তিনটি বস্তু আয়ত্ত না হইলে স্বরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই তিনটি বস্তু অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ। অন্ন যদি নিজের ঘরে না জন্মে, পরের নিকট ধার করিয়া প্রত্যেক আহার্য্য বস্তুটি সংগ্রহ করিতে হয়, তবে মানুষ পরম বুদ্ধিমান ও ধনবান্ হইলেও পরাধীন। এই জন্যই এ দেশে কৃষিকার্য্যের উপর প্রাচীন কাল হইতে এতদূর আগ্রহ এবং আজ গবর্ণমেণ্টই আমাদের agricultureএর উন্নতির আশ্বাস দিয়া প্রজার মন কাড়িয়া লইতে চাহেন। বস্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে, আজ মহাত্মা গান্ধী ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খদ্দরের প্রবর্ত্তন ও প্রচারের দ্বারা লোকের মন কাড়িয়া লইয়াছেন কিন্তু চিকিৎসা অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? সে কথা লইয়া আন্দোলন করিতে কোন নেতাকেই যে দেখা যায় না—একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চিকিৎসা বলিলে যে কেবল ঔষধ সেবন বুঝায়—তাহা নহে উত্তম পথ্য, [illegible] পদ্ধতি দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ হইলে তাহার প্রতিকার এই উভয়ই চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয়।

প্রথম কথা। স্বাস্থ্যরক্ষা—ইংরাজের পদ্ধতি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যাঁহারা দেশের সনাতন সুশিক্ষামূলক স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি ভুলিয়া অসার বলিয়া তুলিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন, স্বাস্থ্যরক্ষাটা বুঝি এ দেশে নূতন জিনিষ, Hygiene বা ইংরাজেরই দান। আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রে ইহাই যে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ—ইহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। ইংরাজীতে যাহাকে Hygiene বলে, উহার সহিত আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি কোন স্থানে না মিলিতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন স্বাস্থ্যরক্ষা বা দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা প্রভৃতির যে নিয়মগুলি

(Personal Hygeine) আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল বাটী, পায়খানা প্রভৃতি নির্ম্মাণের কৌশলাদি দ্বারাই যে ষোলআনা স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না—একথা ভাবিবারও এখন সময় আসিয়াছে। বিদেশী ও স্বদেশী আহার-বিহার এবং ঔষধের দোষগুণের তুলনার কথা পরে বলিব।

সদ্য সদ্য স্বরাজ লাভের জন্য যাহারা আজ ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ যে প্রশংসনীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থই ত্যাগী ও দেশহিতৈষণার জন্য কর্ম্মী, তাঁহারা যে আপামর সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র, সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের প্রার্থনা যে, তাঁহাদিগকে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্যই যদি ভগ্ন হইয়া পড়িল, বাল্যেই জ্বর-যকৃৎ পীড়া এবং কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলেই যদি জরা তোমার সর্ব্ব শরীর আক্রমণ করিল,—অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমরণকে যদি চির সুহৃদ্ বলিয়া বরণ করিয়াই লইলে, তাহা হইলে স্বরাজ লাভ করিয়া স্বাধীনতার সুখ ভোগ তুমি কবে কিরূপে করিবে? স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা কাহার না অভিপ্রেত? বহুকালাবধি পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীরও পিঞ্জরের অর্গল ভগ্ন করিয়া স্বাধীনভাবে গগনমার্গে উড়িবার আকাঙ্খা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সুদীর্ঘকালাবধি পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার জন্য স্বাধীনভাবে উড়িবার শক্তি যে তাহার অনেকটা লোপ পাইয়াছে—সে তাহা বুঝিতে পারে না। সত্য কথা বলিতে কি, আমাদেরও এখন সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বহুকালাবধি "নিজবাস ভূমে পরবাসী" হইয়া রোগ-শোক-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মুক্ত আকাশে উড়িবার সামর্থ্য যে অনেকটা লোপ পাইয়াছে, ইহা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে। আমি মনে করি, এই শক্তিলোপের অন্যতম প্রধান কারণ আমাদের সনাতন আর্য্য চিকিৎসার প্রতি অনাস্থা। আয়ুর্ব্বেদই যে আদিম চিকিৎসা, সেই চিকিৎসার সূত্র অবলম্বনেই যে সকল প্রকার চিকিৎসার উৎপত্তি হইয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা—যে আজও জীর্ণশীর্ণহতাশ রোগীর একমাত্র ভরসার স্থল,—একথা আর এখনকার দিনে বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা। অধুনা অন্যান্য চিকিৎসা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সেই অন্য চিকিৎসাবলম্বীরাও তাঁহাদের এই প্রতিপত্তির মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের উৎকর্ষ অনেকস্থলে অস্বীকার করেন না। অস্বীকার তো করেনই না, বরং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রণালী যে অতি সুন্দর, এই চিকিৎসার ঔষধগুলি যে তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসার ঔষধগুলি অপেক্ষাও অনেকস্থলে অধিক কার্য্যকরী, আয়ুর্ব্বেদের সংহিতা গ্রন্থ—চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা পুনঃ প্রচলিত হইলে আবার যে ভারতবাসীর ভগ্নস্বাস্থ্য পুনর্গঠিত হইতে পারে—এ সকল কথা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহারা না দেখিয়া শুনিয়া অন্ধভাবে বা স্বার্থের প্রতিযোগিতায় আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাহারা ধীরভাবে আয়ুর্ব্বেদের কিছু আলোচনা করিয়াছেন বা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার—অবশ্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে—ফলাফল দেখিয়াছেন, তাঁহারা অকপটে আয়ুর্ব্বেদের প্রশংসাই করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মতই তুলিয়া দেখান যায়, কিন্তু তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে বলিয়া—আমরা এস্থলে ২।১টী মাত্র উদ্ধৃত করিব।

কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার চার্লস (এখন Sir Havlock Charles) সাহেব মেডিকেল কলেজে শারীর বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, "হে হিন্দু ছাত্রগণ, তোমাদের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন, আজ সেই বিদ্যাই আমি অসম্পূর্ণভাবে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

ভারতের চিকিৎসাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টার জেনারেল সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লিউকিস Sir Charles Poardey Lukis কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়া-

ছিলেন,—"বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে 'চিকিৎসা-প্রণালী' এবং ঔষধের আবিষ্কার বলি ও বড়ই গৌরব অনুভব করি, এখন দেখিতেছি যে, ভারতের ঋষিগণ বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি আর একবার কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন,—"আমরা যে মনে করি যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আমাদেরই পাশ্চাত্য চিকিৎসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ইহা আমাদের নিতান্ত দম্ভ। আমি যদি বিদেশে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হই, তবে আমি একজন বিজ্ঞ কবিরাজের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আজ নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারকে বিশ্বাস করিব না।"

বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তারগণ শোথ পীড়ায় লবণ ও জল পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিতে ব্যবস্থা দিতেছেন, ইহা ভারতের যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত চিকিৎসা—তাহা এখন অনেকেই বুঝিতেছেন। কেননা ভারতের একজন সামান্য পল্লীচিকিৎসকও শোথ রোগে লবণ জল বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকে। এই জন্যই পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহ লিখিয়াছেন,—"উন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসা লইয়া আমরা যতই জাঁকজমক করি না কেন, কিন্তু বহুশতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কৃত ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালীর অনেক বিষয়ের নিকট আমাদের মস্তক অবনত করিতে হয়।"

কেহ লিখিয়াছেন,—"কি আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা অধুনা যে সকল ও নব তত্ত্ব বলিয়া মনে মনে বড়ই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, তাহার প্রায় অধিকাংশই দেখিতেছি, ভারতীয় ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।"

উল্লিখিত অভিমতগুলি পড়িলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরই সংস্থাপিত এ বিষয়ের আস্থা জন্মে। একটু ধীর ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূলভিত্তি যে ত্রিদোষ তত্ত্ব এবং উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত যে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসাতত্ত্ব তাহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। স্বরাজ্য লাভের জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়াছি, কিন্তু স্বরাজ লাভ করিতে হইলে "চিকিৎসার স্বরাজ" লাভের প্রয়াস করা যে আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, একথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার নানা কারণে অধঃপতন ঘটিয়াছিল, এখনও অনেক অঙ্গ বিলুপ্ত ও ভগ্নাবশেষ, তথাপি চিকিৎসা জগতে আয়ুর্ব্বেদের বিশ্ববিমোহিনী শক্তি আছে একথা ভুলিলে চলিবে না। আয়ুর্ব্বেদের অধঃপতনের কারণগুলি নানা প্রকারে দূরীভূত করিবার চেষ্টাও এখন চলিতেছে।

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

[রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু, সি-আই-ই, আই-এস-ও, এম বি]

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি প্রতিপালন করিলেও কোন কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সময়ে আমরা অনেক স্থলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই না। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার যে সকল কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই আমাদিগের এই দুরবস্থার প্রধান কারণ। সুতরাং লোকসমাজে যাহাতে এই সকল অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা প্রত্যেক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য।

আমরা দেখিতে পাই যে, পরিবারের মধ্যে একজনের কোনরূপ সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে একটির পর আর একটি করিয়া বাটির সমস্ত লোক কষ্ট দায়ক ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ক্রমে পল্লীর মধ্যে ঐ রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক স্থলে উহা মহামারীর আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য লোকের অকালমৃত্যুর কারণ হয়। কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিতে এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যেও উহাদিগের পরিব্যাপ্তি কতকাংশে নিবারণ করিতে সমর্থ হই। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিলে, পল্লীর মধ্যেও এই রোগের বিস্তৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং এইরূপ কার্য্য দ্বারা কেবল যে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা নহে, প্রতিবেশী সমাজকেও নানারূপ অসুবিধা, ক্লেশ, ও বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, এইরূপ বিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথমত সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে এবং কিরূপে উহার উৎপত্তি হয়, তাহাই আমাদের উত্তমরূপে জানা উচিত। রোগের প্রকৃত কারণ জানা না থাকিলে উহার নিবারণের চেষ্টা করা বৃথা হইয়া থাকে এবং এই জন্য আমরা অনেক সময়ে ধননাশ, জননাশ ও মনঃকষ্ট ভোগ করিয়া থাকি।

চক্ষুর অগোচর কতিপয় নিম্নশ্রেণী বিশেষ বিশেষ জীব উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ আমাদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদের কতকগুলির আকৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্পর্শ দ্বারা, অপরগুলি স্পর্শ ব্যতীত অন্য উপায়ে, রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চুলকনা খোসপাঁচড়া, দাদ হাম বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সমূহ, রোগীর সংস্পর্শ বা রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র ও শয্যাদির স্পর্শ দ্বারা, অথবা বায়ু দ্বারা পরিবাহিত হইয়া, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। যক্ষ্মার বীজ—রোগীর পরিত্যক্ত শ্লেষ্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, উহা শুষ্ক হইলে পর উহার সূক্ষ্মাংশ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া বায়ুদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয় এবং খাদ্য বা নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ ফিভার প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ মনুষ্যের শরীর হইতে বমন বা মলের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া যদি পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় এবং উক্ত জল বা খাদ্য কোন প্রকারে আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সকল সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। ডিপথিরিয়া রোগের বীজ একজন রোগীর গলদেশ হইতে বায়ুর দ্বারা পরিবাহিত হইয়া অপর রোগীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এবং এক প্রকার বিষাক্ত রস নিঃসরণ করিয়া, স্বল্পকালের মধ্যে সাংঘাতিক রোগ উৎপাদন করে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগের বীজ (এক প্রকার কীটাণু) স্পর্শ দ্বারা অথবা পানীয় জল বা দূষিত খাদ্য সহযোগে একের শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহাদিগের বীজ কোনরূপে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে উহাদিগের পরিব্যাপ্তি অসম্ভব। ম্যালেরিয়া রোগের বীজ রোগীর রক্তের মধ্যে অবস্থিতি করে। এক জাতীয় মশকী দংশন কালে রোগীর শরীর হইতে শোষিত রক্তের সহিত উহা উঠাইয়া লয়, পরে উক্ত কীটাণু ঐ মশকীর দেহাভ্যন্তরে পুষ্টিলাভ করে এবং উহা যখন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তখন তাহার শরীরে ঐ বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে ইয়োলো ফিবার্ (Yellow fever) ফাইলেরিয়েসিস (Filariaasis), কাল নিদ্রা (Sleeping

Sickness) প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ বিভিন্নজাতীয় মশক, মক্ষিকা বা পোকার দংশন দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্লেগ রোগ ইন্দুরের দেহে অবস্থিত এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা মনুষ্যের শরীরে সংক্রামিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আসামের সাংঘাতিক কালাজ্বর (Kala azar) ছারপোকা দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। জলাতঙ্ক রোগের (Hydrophobia) বীজ ক্ষিপ্ত কুকুর শৃগাল প্রভৃতির (Salvia) মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন ঐ কুকুর - মনুষ্য বা অপর প্রাণীকে দংশন করে, তখন উক্ত রোগের বীজ লালার সহিত তাহার ক্ষতস্থানের রক্তের সহিত একেবারে মিশ্রিত হইয়া যায়।

বহুশ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড ফিভার, যক্ষ্মা, প্লেগ, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি অনেকানেক সংক্রামক রোগের বীজের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল বীজ বিভিন্ন নিম্নশ্রেণী উদ্ভিজ্জাতীয় ইহারা চক্ষুর অগোচর, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহাদিগের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিবার পর অনুকূল অবস্থা পাইলে ইহাদিগের এক একটী অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য উদ্ভিদাণুতে পরিণত হয় এবং সেই সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) উৎপাদন করে। ইহাই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। হাম, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ কিরূপ, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ঐ সকল রোগে যখন 'ছাল' উঠিতে আরম্ভ হয়, সেই ছালের মধ্যে ঐ সকল রোগের বীজ নিহিত থাকে এবং বায়ু—বস্ত্রও শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, রোগের বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যে উক্তরোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যে কোন রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক স্বাভাবিক শক্তি (Natural immunity) আমাদের শরীরের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। নানাকারণে এই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথোচিত পুষ্টিকর আহারের অভাবে অত্যধিক পরিশ্রম বা অন্যান্য নানাবিধ শারীরিক অত্যাচারের ফলে, অথবা স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিলে, এই শক্তি যথোচিত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় কোন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে, উহা অবাধে বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহারা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে অথবা যাহারা যথেষ্ট-পরিমাণ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না, তাহারাই অধিক সংখ্যায় উক্ত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী যথারীতি পালন করিলে এই শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয়, সুতরাং রোগ-বিস্তৃতির মধ্যে বাস করিয়াও লোকে অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পুনশ্চ বসন্ত প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, যাহা একবার হইলে আর পুনরায় হইতে দেখা যায় না (Acquired immunity)। এস্থলে বলা উচিত যে, যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তির পুনরায় ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে কলেরা, টাইফয়েড ফিভার, প্লেগ প্রভৃতি রোগে এই রক্ষণশীল অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

উপর্য্যুক্ত তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজকে আমাদের পরীক্ষাগারে কৌশলক্রমে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া, উহাদিগের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারা যায় যে, তদবস্থায় উহারা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে ঐ সকল রোগ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হয়। রোগের বীজ এইরূপে

ব্যবহৃত হইলে উহাকে "টীকা" দেওয়া কহে। এতদ্দারা ঐ সকল রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে স্বল্প বা দীর্ঘ কালের জন্য অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। বসন্ত রোগের "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিকাংশ স্থলেই বহুদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়; এইজন্য যাহাদের একবার বসন্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে প্রায় দেখা যায় না। প্লেগ্, টাইফয়েড্ ফিভার্, কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জন্যও এইরূপ "টিকার" ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল রোগে "টিকার" রক্ষণশীল শক্তি অধিক দিন বিদ্যমান না থাকিলেও, যে সময়ে উহারা মহামারীরূপে আবির্ভূত হয়, তখন "টিকা" লইলে উহাদিগের আক্রমণ হইতে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে পরে দুই চারিটী কথা বলিব।

সংক্রামকতা-বাহক কীটাদি।—মশা, মাছি প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র প্রাণীর সাহায্যে সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হয়; ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে, অপরগুলি পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে। মশক প্রভৃতি কতকগুলি কীট দংশন দ্বারা রক্তের সহিত রোগের বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয়। সাধারণ মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীসমূহ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের মধ্যে রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না; তাহারা পদ, শুঁয়া, ডানা বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির দ্বারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এই অবস্থায় উহারা আমাদিগের খাদ্যাদির সংস্রবে আসিলে, তাহা রোগের বীজ সংলগ্ন হইয়া যায়। ঐ খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি।

১। মশক (Mosquitoes)—ইহাদিগের মধ্যে বিস্তর জাতিবিভাগ আছে। অবশ্য সকল জাতি মশকই রোগ-বিস্তারের সহায়তা করে না। এনোফিলিস্ (Anoplеles) জাতীয় মশকের দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর, কিউলেক্স্ (Culex) জাতীয় মশকের দ্বারা কাইলিউরিয়া (Chyluria), গোদ প্রভৃতি রোগ ও ডেঙ্গু এবং ষ্টেগোমিয়া (Stegomia) জাতীয় মশকের দ্বারা ইয়োলো ফিভার্ (Yellow fever) এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া জ্বরের সহিত এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দূষিত জল পান, দূষিত বায়ুসেবন প্রভৃতি যে সকল কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা হইত, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে একটীও ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃত কারণ নহে। যেখানে মশা নাই, সেখানে ম্যালেরিয়াও নাই, ইহাই বর্ত্তমান-বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, স্ত্রী মশকদিগের জিঘাংসাবৃত্তি অতিশয় প্রবল। মশকীরাই রক্ত শোষণ করে এবং ইহাদিগের দংশন দ্বারাই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। মশক-বেচারিরা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

২। মিজেস্ (Midges)—ইহারাও মশকজাতীয়, কিন্তু মশক অপেক্ষা আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র। ইহাদের খাদ্য গলিত উদ্ভিদ্। ইহাদের মধ্যে জাতি-বিভাগ আছে এবং প্রায় সকলগুলিই জলের মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহারা দংশন দ্বারা পেলাগ্রা (Pellagra—আমবাতের ন্যায় রোগবিশেষ) নামক রোগ-বিস্তারের সহায়তা করিয়া থাকে।

৩। স্যাণ্ড-ফ্লাই (Sand-fly)—ইহারা আকৃতিতে মশকের ন্যায়, কিন্তু আয়তনে তদপেক্ষা এত ছোট যে, "নেটের" মশারির ছিদ্র দ্বারাও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া বড় জ্বালাতন করিয়া থাকে। মশকীর ন্যায় ইহাদিগের স্ত্রীজাতিই দংশনপটু এবং দংশন দ্বারা তিন হইতে পাঁচ দিন স্থায়ী এক প্রকার জ্বররোগের (Phlebotomom or Three days fever) বীজ

রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অন্ধকারময় শীতল আর্দ্র স্থানে ইহারা দিবাভাগে থাকিতে ভালবাসে। তরকারীর খোসা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আবর্জ্জনা ইহাদিগের প্রধান আহার; যে সকল স্থানে এইরূপ আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় ইহারা অবস্থিতি করে এবং ডিম পাড়ে। অতএব এই জাতীয় আবর্জ্জনা যাহাতে বাটীর সন্নিকটে সঞ্চিত না থাকে, তাহার উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। **ফ্লী** (Flea)—ইহারা একজাতীয় পোকা; ইহাদিগের ডানা নাই। ইহাদিগের মধ্যে নানা জাতি বিভাগ আছে। কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি কতকগুলি গৃহ-পালিত পশুর শরীরে এই জাতীয় পোকা বাস করিতে দেখা যায়, কিন্তু উহাদিগের দ্বারা মানুষের কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। যে জাতীয় পোকা ইন্দুরের শরীরে বাস করে (Rat-flea), তাহারাই দংশন দ্বারা প্লেগ্‌গ্রস্ত ইন্দুরের শরীর হইতে মনুষ্য শরীরে প্লেগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশে সাণ্ড্‌ফ্লী (Sand flea) বা চিগর্ (Chigger) নামক এই জাতীয় পোকাকে বালুকাময় ভূমির মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়; ইহাদিগের দংশনে এক প্রকার ক্ষতরোগ ও জ্বর উৎপন্ন হয়। এক্ষণে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে এই পোকার আবির্ভাব দেখা দিয়াছে।

৫। **ছারপোকা** Bed-bug—কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই যে আসামের বিষম কালাজ্বর (Kala azar) ছারপোকার দংশন দ্বারা রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তবে এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কুষ্ঠ রোগও ছারপোকা দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। যাহাহউক, বিছানা-মাদুরে অথবা বসিবার আসনাদিতে ছারপোকা যাহাতে কোন মতে থাকিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। ছারপোকা একবার জন্মিলে তাহা নির্ম্মূল করা বড়ই কঠিন ব্যাপার—বিশেষতঃ ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া (অর্থাৎ রক্তপান না করিয়াও) বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

৬। **টিক্‌স** (Ticks)—ইহারা মাকড়সা জাতীয় অতি ক্ষুদ্র পোকাবিশেষ; ইহারাও ছারপোকার ন্যায় বহুদিন উপবাসী থাকিতে পারে। ইহারা মেঝের ছিদ্রের বা দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে দিবাভাগে লুক্কায়িত থাকে এবং ছারপোকার ন্যায় রাত্রিকালে বাহির হইয়া মনুষ্যকে দংশন করে। ইহাদিগের দংশনে রিলাপ্সিং ফিভার্ (Relapsing fever), মিয়ানা (Miana) প্রভৃতি কতকগুলি রোগ একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

৭। **টেট্‌সী ফ্লাই** (Tse-Tse fly)—আফ্রিকা মহাদেশের স্থানবিশেষে ইহারা বাস করে। ইহারা মক্ষিকা জাতীয়। ইহারা দিবাভাগেই উপদ্রব করে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয় জাতিই দংশন দ্বারা রক্ত শোষণ করিয়া লয়। ইহাদিগের দংশনে সাংঘাতিক "কালনিদ্রা" (Sleeping sickness) রোগের বীজ (Trypanosomes) এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। আফ্রিকার অন্তঃপাতী উগাণ্ডা (Uganda) প্রদেশে বহু-সংখ্যক লোক এই মক্ষিকার দ্বারা "কালনিদ্রায়" অভিভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে।

৮। **সাধারণ মক্ষিকা** (House-fly)—আমাদিগের বাটীর মধ্যে সচরাচর মেকাসে রংয়ের ছোট মাছি ও নীল রংয়ের বড় মাছি দেখিতে পাই। ইহাদের কোনটাই দংশন করে না, সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষভাবে রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেয় না। তবে ইহারা রোগের বীজ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পদ বা অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে রোগ-বিস্তৃতির সহায়তা করে। টাইফয়েড্ জ্বর বা কলেরা রোগীর পরিত্যক্ত মলাদির

উপর এই সকল মক্ষিকা বসিলে উহাদিগের পদদেশে ঐ সকল রোগের বীজ বহুল পরিমাণে সংলগ্ন হইয়া যায়। অতঃপর ঐ সকল মাছি তদবস্থায় আমাদিগের খাদ্য-দ্রব্যে উপবেশন করিলে উহাদিগের পদসংলগ্ন রোগের বীজ খাদ্যের সহিত সংশ্রিত হইয়া যায় এবং ঐ দূষিত খাদ্য আমাদিগের উদরস্থ হইলে আমরা ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যক্ষ্মা রোগের বীজ ও মক্ষিকা-সাহায্যে এইরূপে স্থানান্তরে পরিবাহিত হইবার সম্ভাবনা। পুনশ্চ কোন খাদ্যদ্রব্যে মাছি বসিলে ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে উহার পেট হইতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ খাদ্যদ্রব্যের উপর উদ্গার করিয়া দেয়, এই উদ্গীর্ণ পদার্থের মধ্যে বিবিধ সংক্রামক রোগের বীজ অবস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বাটীর মধ্যে, বিশেষতঃ রান্না ঘরে, যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয় এবং উহারা যাহাতে কোন মতে কোন খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত সাবধান হওয়া উচিত। এক স্ত্রী-মক্ষিকা তাহার জীবনে ৪৩০০০০ হইতে ৮৪০০০০ পর্য্যন্ত মাছি প্রসব করিতে পারে।

অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বাড়ীর নিকটে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব না থাকিলেও পরিবারের মধ্যে কাহারও সহসা সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে; এরূপস্থলে যথোচিত সাবধানতা সত্ত্বেও আমাদিগের অজ্ঞাতসারে মক্ষিকা দ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি হওয়া অসম্ভব নহে। অনেক সময়ে শুনা যায় যে, দোকানের খাবার খাইয়া "কলেরা" হইয়াছে। দোকানে যেরূপ ভাবে খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হয় এবং তজ্জন্য তাহার উপর যেরূপ মাছির উপদ্রব হইয়া থাকে, তাহাতে যাঁহারা বাজারের খাবার ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সর্ব্বদা সম্ভাবনা। খাবার সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিলে এরূপ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাবার কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। গলিত ফলমূল এবং পচা মাছ-মাংসাদি ব্যতীত মনুষ্যের ও গৃহপালিত পশুদিগের বিষ্ঠাও মাছির প্রধান খাদ্য, সুতরাং ইহারা যে তন্মধ্যস্থিত রোগের বীজ একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে অথবা আপনাদের উদরের মধ্যে উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই কথাটি সর্ব্বদা আমাদিগের মনে থাকিলে বোধ হয় আমরা মাছির উপদ্রব নিবারণ করিতে কখনই অনোযোগী হইব না।

৯। **পিপীলিকা** (Ants)—ইহারাও প্রত্যক্ষভাবে রোগবিস্তারের সহায়তা করে না, তবে সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় রোগের বীজ বহন করিয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ইহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। আমাদিগের গৃহিণীরা খাবারে "পিপড়া ধরা" বড় একটা দোষের কথা মনে করেন না, পিপড়া ঝাড়িয়া সেই খাবার বালকবালিকাদিগের হাতে দিতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেন না। অবশ্য অনেক স্থলে ইহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত না হইলেও স্থলবিশেষে মহা অনর্থপাত হইতে পারে। সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য যাহাতে পিপীলিকা সংলগ্ন না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইলে এরূপ বিপদপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না। খাদ্যদ্রব্যের পাত্র জলপূর্ণ অন্য পাত্রের উপর বসাইয়া রাখিলে পিপীলিকার উপদ্রব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। পুনশ্চ তদুপরি সূক্ষ্ম জালের ঢাকা চাপা দিলে মাছির উপদ্রবেরও আশঙ্কা থাকে না। প্রত্যেক বাটীতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের এইরূপ সুব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

খোসের পোকা (Itch-insect)—খোস পাঁচড়া একপ্রকার মাকড়সা জাতীয় পোকার আক্রমণে উৎপন্ন হয়। ইহারা রক্ত শোষণ করে না, তবে স্পর্শ দ্বারা অথবা রোগী ব্যবহৃত বস্ত্র, গাত্রমার্জ্জনী বা শয্যা দ্বারা একের শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, এই জাতীয় পোকা দ্বারা রোগ বিস্তৃতি লাভ করে।

উকুন (Pediculidae)—ইহাদিগকে মস্তকের কেশের মধ্যে এবং গায়ের রোমের গোড়ায় অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। রক্তপায়ীদের ন্যায় ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী স্ত্রী উকুনকে ২ মাসের মধ্যে ১০০০০ হাজার উকুনশাবক উৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে। গায়ের উকুন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সহজে সংক্রামিত হইয়া থাকে। ইহার দংশন দ্বারা রিলাপ্সিং ফিভার (Relapsing fever) নামক জ্বরের বীজ রোগীর শরীর হইতে সুস্থ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। উকুন মারিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেই ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করে, ইহা যে তাহার বিশেষ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্রমশ

বেরিবেরি বা সংক্রামক ফুলা রোগ

(ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত এম-ডি)

এবারে বেরিবেরি রোগে এত লোক আক্রান্ত হইয়াছেন, এত লোকের সহসা এই রোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে ও এই রোগে এত নূতন অদ্ভুত লক্ষণ দেখা গিয়াছে যে, এ রোগ কি জাতীয় ও ইহার কি প্রতিকার—জানা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

এই রোগে আক্রান্ত লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব আছে। তাহার উপর এ রোগ সারিয়া গেলেও রক্ষা নাই। রোগভোগের বহুদিন পরে ও কাহারও হৃদ্‌রোগ দেখা যায়, কাহারও চক্ষু রোগ দেখা যায়, জীবনে হয়ত কখনও আর কর্ম্মক্ষম হইতে পারা যায় না—এমন অবস্থাও ঘটিয়া থাকে।

এ রোগ কি জাতীয়? সাধারণ লোকে ইহাকে বেরিবেরি বলিলেও আমাদের মনে হয় যে, ইহা বেরিবেরি নয়। অনেকেই আমাদের আজ কাল এই কথাই বলেন। বেরিবেরি রোগে যে পা পড়িয়া যায়, হাঁটিতে কষ্ট হয় ও পায়ের ডিমে ব্যথা হয়, তাহা এই রোগে কখনও দেখা যায় না। হাঁটুর নীচে টোকা দিলে যে পা সুস্থ শরীরে লাফাইয়া উঠে—তাহাও যখন পাবই পাওয়া যায়—তখন এ রোগকে বেরিবেরি বলা ত চলে না। কখনও কখনও পা ফুলিয়া ভার হইয়া উঠিলে অবশ্য এই লক্ষণটি দেখা যায় না। তাহা হইলেও Nerveটি পড়িয়া গিয়াছে—এ কথাও বলা যায় না। বেরিবেরিতেও এই রোগের মত পায়ের ফুলা ও হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয় বলিয়াই বোধ হয় দুইটি রোগকে একই বলিয়াছে। যাহাহউক চীনাদের যে Beriberi হয়, এ রোগ ও সে রোগে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

রোগের উৎপত্তি—বলা বাহুল্য যে, যে রোগের স্বরূপই জানা নাই, তাহার উৎপত্তি স্থির করার চেষ্টা বিড়ম্বনা। তাহার উপর এক বেরিবেরি নাম দেওয়াতে আরও গোল লাগাইয়া দিয়াছে। বেরিবেরি যাহার জন্য হয়, এ রোগও তাহার জন্য হয়—অনেকেই এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। অপরের কথা কি বলিব, বিশেষজ্ঞ লোকেও কিরূপ ভুল করিয়াছেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকার

বাহাদুর একজন বড় সাহেব ডাক্তারকে কলিকাতায় এই রোগের কারণ নির্ণয় করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বহু পরীক্ষার পর স্থির করেন যে, এই সংক্রামক ফুলা রোগ কলের ছাটা চাল খাওয়ার ফলে জন্মায়। তিনি দেখিলেন,পায়রাকে কলে ছাঁটা চাল খাওয়াইতে খাওয়াইতে 'নিউরাইটিস' হয়। এই সংক্রামক ফুলা রোগে নিউরাইটিস হয় না, কিন্তু আসল বেরিবেরিতে নিউরাইটিস হয়। দুই রোগের এক নাম হওয়াতে তিনি সাব্যস্ত করিলেন, ইহা সংক্রামক ফুলা রোগ, ইহা কলে ছাঁটা চাল খাওয়ার ফলে জন্মায়। ধান ভানিতে শিবের গীত আর কাহাকে বলে ?

ইদানীং আবার সাহেব ডাক্তারেরা বলিতেছেন,—"না, না; কলেছাঁটা চাল এ রোগের কারণ নহে। চাল গুলি বর্ষাকালে জলে ভিজিয়া গেলে তাহাতে এক রকম ছাতা ধরে ; এই ছাতাধরা চাল খাইতে খাইতেই লোকের এই ফুলা রোগ হয়।"

তাঁহাদের এ কথাও টিকিবে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাইতেছে, যাহারা জীবনে চাল খায় না—অনেক ক্ষেত্রে তাহাদেরও এই রোগ হইয়াছে। তা' ছাড়া হঠাৎ দেশময় লোকের ভিজা ছাতাধরা চাল খাইয়া অসুখ করিতে লাগিল ? একই সময় কলিকাতা, নোয়াখালি, বহরমপুরে এই ছাতাধরা চাল খাইয়া অসুখ করিতে লাগিল, ইহা সম্ভবপর নয়। দেখিলেই বুঝা যায়—এ রোগ সংক্রামক,—এমন কি যে সকল গ্রামের লোক কলিকাতায় কর্ম্মোপলক্ষে নিত্য যাতায়াত করে, সেই সকল গ্রামেও রোগের আধিক্য প্রাদুর্ভূত হওয়ায় ইহা বুঝা যায় যে, এই রোগ বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জার মত রোগীর দেহ হইতে সুস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়।

আমার নিজেরও ধারণা হইয়াছে যে, এই ফুলারোগ সংক্রামক জাতীয় রোগ। জ্বর ও পেটের গোলমাল লইয়া এই রোগের সূত্রপাত হয়, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই রোগ দূষিত বিষাক্ত আহার্য্য বিশেষ এবং দূষিত পানীয় জলের সাহায্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। শীঘ্রই এই রোগের বীজাণু পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। রোগের বীজাণু পাওয়া গেলেই আমরা মনে করিয়া থাকি যে, রোগের কারণ নির্ণীত হইল। এরূপ মনে করা আদৌ সঙ্গত নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা-ব্যাসিলাস্ নামক জীবাণু ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কখনও ইনফ্লুয়েঞ্জা-জীবাণুতে সামান্য সর্দ্দি জ্বর মাত্র হয়, আর কখনও (যেমন ইং ১৯১৮ সালে) তাহাতে এক ভারতবর্ষেই ৬০ লক্ষ লোক মারা যায় কেন ? কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন ইহার আরও একটী কারণ আছে এবং সেইটাই প্রধান,—জীবাণুটি একটী ছুতা মাত্র। সেদিন পড়িলাম, বিখ্যাত ডাক্তার জেমস্ সাহেব বহু পরীক্ষার পর লিখিতেছেন যে, মশার কামড়ে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়, কিন্তু যদি বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা হয় অথবা হাওয়ায় বেশী জলময় বাষ্প থাকে বা কম বাষ্প থাকে, তবে মশা কামড়াইতে চাহে না ও কামড়াইলেও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত হয় না। কাজেই শুধু মশার কামড়কে ম্যালেরিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আমরা একদেশদর্শিতা দোষ করিয়া আসিতেছি। মশার কামড় ও ম্যালেরিয়া রোগ এ দেশের নিত্য সহচর ছিল। তাহাতে এত ম্যালেরিয়া তো বিস্তৃতি হয় নাই। কিন্তু জঙ্গল বেশী হইয়া অথবা রেল লাইনে জলের প্রবাহ ভাল না হইয়া দেশ বেশী স্যাঁৎসেঁতে হওয়ার ফলে ম্যালেরিয়া এ দেশে সংক্রামক ব্যাধি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সেইরূপ Bacillus coli নামক জীবাণু আমাদের শরীরে সর্ব্বদা থাকে। আবার এই bacillus coli বহু ভয়াবহ রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। Leonord williams সাহেব ইহার একটি সুন্দর কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মাংস জাতীয় বস্তুর সংশ্রবে থাকিলে এই bacillus coli ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, নচেৎ চিনি

জাতীয় বস্তুর সংশ্রবে ইহা পরম উপকারী। আমরা যদি ঢেঁকি ছাটা চাল, আটা, ডাল ও শাক খাই, তাহা হইলে এই সকল ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণ অংশ অন্ত্রনালীর বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে ও যেখানে bacillus coli থাকে - সেখানে পৌছায়। এই চিনি জাতীয় পদার্থ পাইলে bacillus coli আর কোনও অনিষ্ট করে না, উপকারই করে।

অতএব দেখা যাইতেছে, বীজাণু হইতে রোগ হয় বলিলে আমরা নিতান্ত ভুল কথা বলি। আমাদের দেহের ভিতরে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনেই রোগের সৃষ্টি। জীবাণু ত সর্ব্বদা বর্ত্তমান, কিন্তু রোগ উৎপন্ন করিতে পারে না ত? এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ আহার বিহারের দোষ, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ মিথ্যা আহার ও বিহারকে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পর এই সংক্রামক ফুলা রোগের উৎপত্তির কারণ দুইটি বলা যাইতে পারে (১) দূষিত পানীয় জল—জলের সহিত সংক্রামক জীবাণু আমাদের দেশে প্রবেশ করে। দূষিত পানীয় জল বলিলে আমরা পানাপুকুরের জল মনে করি। কলিকাতার পানীয় জল পরম বিশুদ্ধ বলিয়া জানি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জল এমনই দুষ্ট যে, পানের অযোগ্য। কলিকাতার উত্তরে গঙ্গার উভয় পার্শ্বের পাটের কলগুলির সহস্র সহস্র কুলি-মজুরের মল নিয়ত গঙ্গায় ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঢালিবার পূর্ব্বে কয়েকটি ঔষধ দিয়া এই মলের দোষ নষ্ট করিবার চেষ্টা করা হয়। তাহাতে আকৃতির পরিবর্ত্তন হইলেই কি এই জল পানীয় হইবার যোগ্য হইতে পারে? কলিকাতার যত কলেরা রোগ দেখা যায়, প্রায় সকলেই গঙ্গাজল ব্যবহার করিয়া এই রোগগ্রস্ত হয়। এ গঙ্গাজল এমনই বিষ! সেই গঙ্গাজল শোধন করিলে কিরূপেই বা পানের যোগ্য হইতে পারে? ড্রেণের জল ফুটাইলে কি তাহা পান করা যায়? এই জন্যই না কলিকাতায় ১৯১৫ সালে যত লোক Typhoid এ মারা গিয়াছিল, ১৯২৩ সালে ঠিক তাহার তিন গুণ লোক এই রোগে মারা পড়িয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, দূষিত পানীয় জলে রোগের বীজাণুর যথেষ্ট সরবরাহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই বীজাণু ছাড়া আর। রোগের দ্বিতীয় কারণটিই আসল। সেটি কি তাহা আন্দাজ করা যাইতে পারে।

(১) কলে ছাঁটা চাল,—চাল কলে ছাঁটিলে চালের বাহিরের অতি প্রয়োজনীয় অংশ চলিয়া যায়। এই চাল খাইলে শরীরের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া যায় না বলিয়া শরীর শীঘ্র রোগগ্রস্ত হয়।

(২) সিদ্ধ চাল।

(৩) ভেজাল তৈল।

(৪) ভেজাল ঘি

(৫) মাছ খাওয়া, -মাড়ওয়ারীদের প্রায়ই এ রোগ হয় না বলিয়া তাঁহারা বলেন, মাছ খাওয়ায় বাঙ্গালীর beriberi হয়।

(৬) খাদ্যের অভাব

(৭) স্যাঁতাসেঁতে বাড়ী

উপরোক্ত কারণ গুলির যে কোনও একটি এই রোগের প্রধান কারণ—ইহা প্রায় সকলেই বলেন। এই রোগে বাঙ্গালীই বেশী আক্রান্ত হয় দেখিয়া চালে বা সরিষার তৈলে কিছু দোষ হইবার সম্ভব বলিয়া মনে হয়। মাড়োয়ারীদিগের এই রোগ হয় না দেখিয়া কেহ কেহ মাছ খাওয়াই এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমান করেন। খাদ্যের অভাব কারণ হওয়া সম্ভব নয়—অনেক ধনী ব্যক্তিরও এই রোগ দেখা গিয়াছে। স্যাঁতাসেঁতে বাড়ী গুলিতে বেরিবেরি হয় তাহা দেখা যায়।

শবব্যবচ্ছেদে দেখা গিয়াছে—যে শরীরের সর্ব্বত্র—এমন কি মাথার ভিতরও জল জমিয়াছে। হৃৎপিণ্ড জীবিতাবস্থায় এত রোগগ্রস্ত মনে হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরে হৃৎপিণ্ডের দোষ প্রায়ই পাওয়া যায় না।

জীবাণুর সন্ধান করিয়া বিশেষ কিছু পাই নাই।

রোগ লক্ষণ :—সংক্ষেপে

(১) পায়ের ফুলা—পা লাল হয়, ব্যথা হয়; সমস্ত শরীরে ফুলা হয়, মাথায় পর্য্যন্ত হইতে পারে।

(২) পেটের গোলমাল—পেট ফাঁপা; পাৎলা দাস্ত, অনেক ক্ষেত্রে পেটের গোলমাল সারিয়া যাওয়ার পরই বুক ধড়ফড় বাড়িয়া যায়।

(৩) হৃৎপিণ্ডের রোগ ;—হৃৎপিণ্ড বড় হয়, হাঁপ হয় ও হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

(৪ রক্তস্রাবের সম্ভাবনা ;—সর্ব্বদ্বার দিয়া রক্ত পড়ে, অর্শ প্রায়ই হয়।

(৫) বড় যকৃৎ,—কখনও বা হৃৎপিণ্ডের দোষে যকৃৎ বড় হয়, অধিকাংশ স্থলে পেটের গোলমাল ও যকৃতের দোষ প্রথমেই হয়।

(৬) ফুসফুসে সর্দ্দি ও জল ভরা।

(৭) চোখে glaucoma সময় সময় বহুদিন থাকে।

(৮) জ্বর।

হৃৎপিণ্ডের রোগ কষ্ট ভোগ—এ বিষয়ে একটু বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হৃৎপিণ্ডের গোলমালেই বেরিবেরি রোগী মারা যায়।

এই রোগে প্রথম হইতেই পেটের গোলমাল বা পায়ের ফুলা দেখা যায়। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে প্রথমেই হাপ এবং বুক ধড়ফড় করিয়া এই রোগের প্রকাশ হয়। কখনও কিছুদিন রোগভোগের পর বুক ধড়ফড় ও হাঁফ হয়। তখন বুঝা যায় যে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া, পড়িতেছে। ক্রমশঃ ফুলা বাড়ে, পা খুব ফুলিয়া পড়ে, পেটে জল হয় ও হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য ভাবে বেরিবেরি দেখা যায়। হাত পায়ের ফুলা একটু হইয়াই আর দেখা গেল না। রোগী ভাল হইয়াছে মনে করিয়া আফিসে বা নিজের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে বুকে ব্যথা, সিঁড়িতে উঠিতে একটু হাঁফ লাগা ভিন্ন রোগের কোনও লক্ষণ থাকে না। এমন সময় একদিন হঠাৎ অত্যন্ত বুকে ব্যথা বা হাঁপ হইয়া রোগী শুইয়া পড়িলেন; এই রকম রোগী প্রায়ই মারা যান। এমন হাঁপ হইতে থাকে যে, দেখিলে কষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাসি আরম্ভ হয়, সময় সময় সে কাসি ক্রমাগত চলিতে থাকে, থামিতে চায় না। কাসিতে কাসিতে হঠাৎ লালাভ জলের মত কাসি উঠিতে থাকে। এক এক সময় দেখিয়াছি, বাটি বাটি এই রকম কাস উঠিতেছে। এই সকল রোগী ২।৪ ঘণ্টায় মারা যায়। নাড়ী এই অবস্থায় কেবলই দ্রুত চলিতে থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে রোগীর ভাল হইয়া যাওয়ার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত বুক ধড়ফড় করে ও বুকে একটু ব্যথা থাকে।

এই বেরিবেরি রোগে কে মারা যায় ও কে বাঁচে—তাহা পূর্ব্ব হইতে প্রায়ই বলা যায় না। তবে মোটা মুটি এই টুকু বলা যাইতে পারে যে, যাহারা চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, তাহারা সামান্য চিকিৎসাতেই সারিয়া উঠে; আর যাহারা চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, তাহাদেরও অনেকেই সারিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাদের ভিতর কাহারও আয়ুর নিশ্চিত নাই। যাহার হৃৎপিণ্ডের রোগ ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়, সে যখন পড়ে, তখন অনেক সময়েই আর উঠেনা।

পথ্য—এবৎসর যখন এই রোগের প্রথম সূত্রপাত হইল, তখন আমি ধুয়ায় পড়িয়া সকলকে ভাত ছাড়াইলাম। সকলকে দু'বেলা রুটী বা লুচি খাওয়াইয়া দেখিলাম—অনেকেরই পেট বিগ্‌ড়াইল। তখন সাহস করিয়া এক বেলা ভাত দিতে আরম্ভ করিলাম। মোটের উপর তাহাতে ফল খারাপ হয় নাই। ভাতের সঙ্গে এই রোগের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা ঠিক জানা না থাকায়

সাহস করিয়া সাধারণ আহার্য্য না দি। পুরাতন দেশী আতপ চালের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, তাহাতে ভালই ফল হইয়াছে। কেহ কেহ নূতন চাউল খাইতে বলিতেছেন। এই প্রস্তাব সর্ব্বাংশে অযৌক্তিক মনে হয়। পেটের গোলমালের উপর নূতন চাউল বিশেষ অনর্থ ঘটাইতে পারে। রাত্রে লুচি বা রুটি দিয়া থাকি। দুধ, ছানা ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে দিই। মাছ খাইতে দিই বটে, কিন্তু যাহারা মাংসে অভ্যস্ত নন, তাঁহাদের মাংস খাইতে দিই না। প্রচলিত মতানুসারে বেশী মাংস দেওয়া উচিত। কিন্তু বড় বড় যকৃৎ ও পেটের গোলমালে মাংস দেওয়ার তাৎপর্য্য কি—তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি মাংস বন্ধ করিয়া খুবই ভাল ফল পাইয়াছি। ভেজাল খাদ্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আমরা বেরিবেরি রোগের সহিত ভেজাল খাদ্যের কতটুকু কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে—না জানিলেও এরূপ সর্ব্বনাশকারী রোগে ভেজাল খাদ্য দিয়া রোগীকে আরও মৃত্যুমুখে যাইতে দিয়া মূর্খের মত কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহি। এইজন্য আমি সকলকেই বলি,—খাও না খাও, তেলটা ভেজাল ব্যবহার করিও না, ময়দা ছাড়িয়া আটা ধর, যেমন করিয়াই হোক ভেজাল ঘি ত্যাগ কর, আর সিদ্ধ চাউল ছাড়িয়া আতপ ব্যবহার কর, সস্তার জন্য রেঙ্গুন চাউল ধরিও না।

প্রত্যেককে জল ফুটাইয়া খাইতে বলি। আমি দেখিয়াছি—এই নিয়ম যাঁহারা পালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে বেরিবেরি খুব কম হইয়াছে।

পরিশেষে আমার নিবেদন যে, এই রোগে আমাদের সকলের যে শিক্ষা হইয়াছে তাহা যেন না ভুলি। সে শিক্ষা এই যে, আমরা লক্ষ্মীর পুত্র ভিক্ষা মাগি। আমাদের চাল এমন করিয়া কলে ছাঁটা হয় যে, তাহাতে বাহিরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেওয়া হয়। আমাদের ঢেঁকিতে ছাঁটা চাল উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের ময়দায় পাথর মিশান থাকে, আমাদের দু'ধে জল মিশ্রিত থাকে কি জলে দুধ মিশ্রিত থাকে—তাহা জানি না। আর সেই দুধ টুকু শুধু মহিষের দুধ নয়, তাহাতে সাদা রঙয়ের জন্য নানারূপ মসলার ব্যবস্থা থাকে। আমাদের তেলে সর্ষপের পরিবর্ত্তে পাকড়া প্রভৃতি অদ্ভুত সব জিনিষ থাকে। আমাদের দেবতপণ ঘৃত—চর্ব্বি ও নারিকেল তেলের সংমিশ্রণ মাত্র। অসংখ্য পাটের কলের গুণে আমাদের গঙ্গাজল খাইলে সদ্যঃ কলেরা হয়, আর সেই জল শোধন করিয়া যে কলের জল—তাহা সকল রোগের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এত রকমে বিষ প্রয়োগ করিলে দেবতারাও অমর থাকিতেন কি না সন্দেহ। বাঙ্গালী যে মরিয়া জ্বালা মিটাইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

অতএব আমাদের এখন কর্ত্তব্য যে, গঙ্গায় বিষ্ঠা ঢালা বন্ধ করান আর আহার্য্যে ভেজাল বন্ধ করা। একটু চেষ্টা করিলে আমাদের পক্ষে এই সব বন্ধ করা কৌন্সিলে বেশী শক্ত নয়। আমরা সচেষ্ট থাকিলে, যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করাইতে পারিবেন এরূপ সহজেই মনে হয়। ভেজাল বন্ধ করা শক্ত নয়, যাহারা এই ভাবে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে অর্থ লোভে প্রাণনাশ করে, তাহাদের জরিমানা না করিয়া জেলের ব্যবস্থা করিলে বেশীদিন এ উৎপাত থাকিবে না। আর পাটের কলের গঙ্গা Septic tank উঠাইয়া বিষ্ঠা পুড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শক্ত। কিন্তু আশা করা যায় যে, চেষ্টা করিলে ইহারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

পারিবারিক চিকিৎসা

(২)

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম্, এস,]।

পেটের অসুখ।—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহাকে অতীসার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, চলিত কথায় তাহারই নাম পেটের পীড়া। এই অতিসার বা পেটের পীড়া নানা কারণে হইয়া থাকে। অনেক সময় অজীর্ণই ইহার কারণ। এই অজীর্ণ কারণে যদি তরল দাস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে অজীর্ণের চিকিৎসা বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে চিকিৎসা করিবে। পেটের পীড়ায় সাধারণতঃ দোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি সাধনের জন্য শুঁঠ, মুতা, বালা, বেলশুঁঠ এবং ধনে - প্রত্যেকটি ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ও আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইয়া সেই ক্বাথ সেবন করান হিতকর। যদি পেটে খুব বেদনা এবং পিপাসা থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ধনে ও শুঁঠ—এক একটি এক তোলা করিয়া লইয়া, অথবা শুঁঠ, মুতা ও আতইচ - এই তিনটি দ্রব্যের এক একটি ৷৷৶১০ সাড়ে এগার আনা ওজনে লইয়া, আধ সের জলে জ্বাল দিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ পান করিতে দিবে।

অতীসারের আমদোষ এবং উদরের বেদনার নিবৃত্তির জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা যদি ফললাভ না হয়, তাহা হইলে ২০ কুড়িটি মুতা ওজনে যত হইবে—তাহার আট গুণ ছাগদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধের চারিগুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধটুকু অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইবে।

অতীসার দুই প্রকার, আমাতিসার ও পক্বাতিসার। আমাতিসারে কখনো ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিতে নাই, তাহার ফল অতি ভয়ানক হইয়া থাকে। আমাতিসারে অল্প অল্প গুটলে মলভেদ হইতে থাকিলে এবং উদরে কামড়ানি থাকিলে আধ তোলা হরীতকী এবং দুই আনা পিপুল—জলের সহিত বাটিয়া অল্প গরম করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই মাত্রা কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য। যদি রোগী সাধারণতঃ ক্ষীণকায় অর্থাৎ দুর্ব্বল হয়—তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রা ব্যবস্থেয়।

পক্বাতিসারে কুড়চি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোনো ঔষধ না পাইলে, কেবল কুড়চির ছাল ২ দুই তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ সেবনেই উপকার হইয়া থাকে।

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুতা, শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য ।১০ সাড়ে চারি আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে জ্বাল দিয়া এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই ক্বাথ সেবন করাইলে —প্রবল অতিসার নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।

জায়ফল ঘসিয়া নাভির উপরে প্রলেপ্ দিলে প্রবল অতিসারের দাস্ত বন্ধ হইয়া থাকে। কাঁচা আমলকী অথবা শুষ্ক আমলা শীতল জলে বাটিয়া নাভির চারি পার্শ্বে বেশ পুরু করিয়া লেপ দিবে এবং খানিকটা আদার রস গরম করিয়া নাভিস্থান পূর্ণ করিবে। ঐ আদার রস শীতল হইলে শুষ্ক বস্ত্র দিয়া উহা শুষিয়া লইয়া, পুনরায় আদার রস গরম করিয়া প্রদান করিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী এই প্রক্রিয়া করিবার দরকার হইবে না। ইহাতে প্রবল অতিসার নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে।

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুতা, আকনাদি ও মোচরস প্রত্যেক দ্রব্য ।৶১০ সাড়ে ছয় আনা, জল আধ সের, শেষ

আধ পোয়া—এই পাচনটির সহিত একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে প্রবল অতিসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

রক্তাতিসারের চিকিৎসা।—কচি দাড়িম ফলের ছাল ও কুড়চির ছাল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক তোলা, আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে রক্তাতিসারে বিশেষ উপকার হয়। আম, জাম ও আমলকীর কচি পাতা—এক সঙ্গে ছেঁতো করিয়া, তাহার রস ২ দুই তোলা, মধু ও ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়। কাঁটানটের মূল চারিআনা চাউল ধোয়া জল সহ—বাটিয়া একটু চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে রক্তাতিসারে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। আধ তোলা কৃষ্ণতিল বাটিয়া তাহার সহিত একটু চিনি মিশাইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে সুফল হইয়া থাকে। আয়াপান দুই তোলা বা কুকসিমার পাতা দুইতোলা—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে চিনি মিশাইয়া পান করাইলে অথবা কেবল আয়াপান পাতার রস বা কুকসিমার পাতার রসে একটু চিনি মিশাইয়া পান করাইলে রক্তাতিসারে বেশ ফল দর্শিয়া থাকে। এই দুইটী দ্রব্যের রসের মাত্রা পূর্ণবয়স্কের জন্য এক তোলা।

গুহ্যদ্বারের বেদনা থাকিলে—যদি রক্তাতিসারে গুহ্যদ্বারে অতিশয় বেদনা থাকে, তাহা হইলে আফিং ৪ চারি রতি, খদির ৪ চারি রতি ও ময়দা ৮ রতি—একত্র মিশাইয়া এবং গব্যঘৃত মাখাইয়া কয়েকটি বড়ি অর্থাৎ বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতির এক একটি দুই ঘণ্টা অন্তর গুহ্যদ্বারে অঙ্গুলি দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। গুগ্‌লি—ঘৃতে ভাজিয়া তাহার স্বেদ দিলেও এরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকার হয়।

অতিসারের জীর্ণ অবস্থায়—অতিসার বহুদিনের পুরাতন অর্থাৎ জীর্ণ হইলে, কুড়চিঘটিত ঔষধ বিশেষ উপকারী। এরূপ অবস্থায় কুড়চির ছাল, মুতা, বেলশুঁঠ, ধাই, সোহাগার খই, খদির ও মোচরস—প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা এবং অহিফেন অর্দ্ধ তোলা—একত্র মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় আয়াপানের ক্বাথ বা শীতল জল সহ সমস্ত দিনে ৩।৪ বার সেবন করাইলে সুফল দর্শিয়া থাকে। কিন্তু এ ঔষধ শিশুকে ব্যবস্থা করিও না।

আমাশয় রোগ।—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার নাম প্রবাহিকা। সাধারণতঃ ইহার চিকিৎসা-প্রণালী অতীসারেরই মত। এ রোগে তেঁতুলচারার মূল দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় ঘোলের সহিত বাটিয়া—সমস্ত দিনে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। তেঁতুলচারার কচিপাতা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ পান করাইলেও এরূপ অবস্থায় উপকার হয়। আমরুলের রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও আমাশয় বা প্রবাহিকায় সুফল দর্শে। কচি দাড়িমের রস, দাড়িম পাতার রস, আয়াপানের রস, এবং কুড়চির ছালের রসও সকল প্রকার আমাশয়ে বিশেষ উপকারী। তবে আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় কুড়চির ছাল দিতে নাই। কচি বেলপোড়ার শাঁস ॥০ তোলা ও খোসা তোলা তিল আধ তোলা, আধ তোলা, দধির সহিত মিশাইয়া আমাশয়গ্রস্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কচি বেলপোড়ার শাঁস দুই তোলা, ইক্ষুগুড় এক তোলা, পিপুল এবং শুঁঠের গুঁড়া।০ চারি আনা এবং অল্প তিল তৈল, একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলেও আমাশয়ে সুফল হইয়া থাকে। পিপুল, চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা অথবা মরিচচূর্ণ।০ চারি আনা—অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে বহুকালজাত আমাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে। আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ ৫।৬ পাঁচ ছয় রতি—শীতল জলের সহিত আমাশয়ের রোগীকে সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা, মোচরস, বেলশুঁঠ, আতইচ ও ও দাড়িম ফলের ছাল—প্রত্যেকটি চারি আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ প্রবাহিকার রোগীকে পান করিতে দিবে।

সাদাধুনার গুঁড়া ও চিনি—এক একটি এক আনা মাত্রায় লইয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলেও আমাশয় প্রশমিত হয়।

আমাশয়ের বিশেষ উপদ্রব ও চিকিৎসা।—আমাশয় রোগের বিশেষ উপদ্রব হইল—অল্প অল্প মল নিঃসৃত হওয়া ও তাহার সহিত কুন্থন থাকা। প্রথমতঃ হইতে শ্লেষ্মাজড়িত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত আঠাল মল নির্গত হইতে থাকে, তদ্ভিন্ন রক্তও নির্গত হয়। নাভির নিকট কর্ত্তনবৎ বেদনাও এইরূপ রোগে অনুভূত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় অর্দ্ধ ছটাক এরণ্ড তৈলের জোলাপ লইয়া তাহার পর অন্য ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। জোলাপ লইলে নাভির নিকট কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কুন্থনের কষ্ট কমিয়া যায়। জোলাপ লওয়ার পরে শুঁঠ চূর্ণ ২ রতি, কুড়চির মূল চূর্ণ ৮ রতি, গদ চূর্ণ ৪ রতি এবং অহিফেন ½ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দিনে ২ বার তিনবার সেবন করাইলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, অহিফেনঘটিত ঔষধ শিশুকে সেবন করাইতে নাই। শিশুকে এই ঔষধ সেবন করাইতে হইলে অহিফেন বাদ দিয়া সেবন করান আবশ্যক। অবশ্য শিশুর মাত্রাও বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। যে মাত্রার কথা বলা হইল, তাহা পূর্ণ বয়স্কের উপযুক্ত। অতীসারের চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে হরীতকী অর্দ্ধ তোলা ও পিঁপুল চূর্ণ দুই আনা একত্র মিশাইয়া গরম জলের সহিত সেবনের কথা বলিয়াছি, আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, কিন্তু এরণ্ড তৈলের জোলাপ লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অনেকে আমাশয়ের প্রথমাবস্থায় কুড়চি ঘটিত ঔষধ বা অন্য ঔষধ দিয়া যে দাস্ত বন্ধের চেষ্টা করেন, তাহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এরূপ ব্যবস্থার ফলে তখনি তখনি মল নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরে নানারূপ উৎকট রোগ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য আমাশয়ের প্রথমাবস্থায় কখনো দাস্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে নাই।

উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য।—আমাশয়ে উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য তার্পিনতৈল উদরের উপর মালিশ করিবে কিম্বা সেওড়ার পাতা দুই তোলা, কচি কাঁঠালি কলা দুইটী—খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া, আতপ চাউল দুই তোলা এবং জল এক পোয়া—একটি পাথরের বাটিতে বেশ করিয়া চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর সেই জলের সিকি অংশ একটি পিত্তলের পাত্রে রাখিয়া আগুনে চড়াইয়া জাল দিয়া তাহার অর্দ্ধেক ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা সেবন করিতে দিবে। সমস্ত দিনে তিন ঘণ্টা অন্তর চারি বার ইহা সেবন করাইলে উদরের বেদনা প্রশমিত হয়।

পুরাতন আমাশয়ে।—পিঁপুল চূর্ণ চারি আনা ও মরিচ চূর্ণ চারি আনা—অর্দ্ধ পোয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত ২।৩ দিন সেবন করাইলে আমাশয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বেলশুঁঠ (কচি বেলকুচি কুচি করিয়া কাটিয়া তাহা শুকাইয়া লইলে বেল শুঁঠ প্রস্তুত হয়) মরিচ, আকের গুড় ও লোধ কাষ্ঠ (বেনের দোকানে পাওয়া যায়) সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া কৃষ্ণ তিল তেলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। যে দধির ননী তুলিয়া লওয়া হয় নাই, তাহা মধুর সহিত কিম্বা দুগ্ধের মধ্যে গরম গরম লৌহশলাকা ডুবাইয়া লইয়া সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তাহাতে একটু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে উপকার হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—অপক্ক অতিসারে উপবাস দেওয়াই সুপথ্য। কিন্তু রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে একেবারে লঙ্ঘন না দিয়া এরারুট, বার্লি, পানিফলের পালো, ভাতের মণ্ড, ছাগদুগ্ধ, কচিবেলপোড়া প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। অপক্ক অতিসারে প্রথমতঃ উপবাস দিবার প্রয়োজন হইলেও এক দিনের কিম্বা দুই দিনের বেশী উপবাস দিবার প্রয়োজন নাই, তখন উপরি লিখিত পথ্যের ব্যবস্থা করাই ভাল।

পক্কাতিসারে—পুরাতন মিহি চালের অন্ন, মসুর দালের যূষ, ঠোটেকলা, ডুম্বুর, গন্ধভাদুলে, বেগুন ও পটোলের তরকারী। কই, মাগুর, শিঙ্গী, মউরোলা প্রভৃতি মাছের ঝোল। জীর্ণ অতিসারে—চূণের জলের জলের সহি দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। রক্তাতিসারে গব্য দুগ্ধ না দিয়া ছাগ দুগ্ধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বেলের মোরব্বা বা কাঁচা বেল পোড়াইয়া ইক্ষুগুড় বা চিনির সহিত খাইতে দেওয়া জীর্ণ অতিসারে উপকারী। অতিসারের রোগীকে গরম জল শীতল করিয়া সেই জল পান করিতে দেওয়া উচিত। ১ তোলা ধনে ও ১ তোলা বালা—একত্র লইয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই জল পিপাসার সময় পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি এবং অতিসারের উপকার হইয়া থাকে।

সম্পাদকের সাজি

রোগ হইলে চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

* * * *

সকল বিষয়ে মিতাচারী হইলেই স্বাস্থ্যবান্ হইতে পা। যায় এবং স্বাস্থ্যবান হইলেই রোগের আক্রমণ কম হইয়া থাকে।

* * * *

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা চিরদারিদ্র্যকে বরণ করিয়া স্বাস্থ্যবান হওয়াও সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর।

* * * *

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রকৃতির দান বিধাতার অপার করুণাসম্ভূত। প্রভাত-সমীর যেরূপ শরীর স্নিগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ বালার্ককিরণচ্ছটা প্রত্যহ দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিলে, মানসিক প্রফুল্লতা লাভও সুনিশ্চয়। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা কখনো কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

* * * *

প্রত্যহ চায়ের পেয়ালায় প্রাভাতিক আরাম উপভোগ না করিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পানে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চা পানের ফলে আধুনিক ডিস্‌পেপসিয়া নামক ব্যাধিকে যে বরণ করিয়া আনা হয়—ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে।

* * * *

চায়ের নেশা যদি একান্তই ছাড়িতে না পারা যায়, তাহা হইলে খালি পেটে কখনো উহা পান করিও না। খালি পেটে চা পান করা আর অঞ্জলি অঞ্জলি বিষ পান করা সমান কথা।

* * * *

দোকানের চা পান আরও অনিষ্টকর। একই পেয়ালায় বহু প্রকার ধাতু ও প্রকৃতির লোকে যে দোকানে বসিয়া চা পান করিয়া থাকে, তাহার ফলে অনেক সংক্রামক রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। আমাদের দেশের লোকে একথা বুঝেন না বলিয়াই এদেশে এত রোগবাহুল্য।

* * * *

নিমন্ত্রণ খাওয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেই হয়, তাহা হইলে কখনো অধিক আহার করিও না। অধিক আহারই সকলপ্রকার রোগের হেতু।

* * * *

প্রাতঃকালে চা পান অপেক্ষা আমাদের দেশে যে আগে ছোলা ভিজা ও আদা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল—তাহা সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর ঐ দুইটা দ্রব্য সেবনে বায়ু পিত্ত, কফ—তিনটি ধাতুরই উপকার হইয়া থাকে।

* * * *

চা পানের মত দোকানের খাবারও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ঘৃত ও তৈল দৈহিক উন্নতির পক্ষে যেরূপ উপযোগী, সেইরূপ যদি ঐ দুইটি দ্রব্য ভেজালে পূর্ণ হয় তাহা হইলে দৈহিক উন্নতির পরিবর্ত্তে দৈহিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

* * * *

গুড়, চিনি ও মিছরি—বিশুদ্ধ খাদ্য। দোকানের খাবারের অপেক্ষা নারিকেলের সহিত গুড়, চিনি বা মিছরির মিশ্রণে ঘরে নারিকেলের সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া খাইলে দৈহিক উন্নতি হইয়া থাকে। এখনকার ডিস্‌পেপসিয়াগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা আহার এবং ঔষধ।

* * * *

বিস্কুট অপেক্ষা মুড়ি উত্তম খাদ্য। আত্ম সম্মানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সহরের সভ্য বাঙ্গালী যদি আপন আপন পরিবারে মুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন খরচ কমিয়া যায়, সেইরূপ অন্যদিকে পরিবারস্থ সকলকে স্বাস্থ্যবান করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

* * * *

মাছ-মাংস অধিক খাইলেই যে শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে—তাহা নহে, শাক সব্জীও শারীরিক পুষ্টি বিধানের বিশেষ সাহায্যকারী। আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ আহারে যে দৈহিক উন্নতি বেশী হইয়া থাকে, আমাদের দেশের বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তাঁহারা একবেলা আহার করেন, আমিষ ভোজন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু তাঁহাদের শরীরে যে দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, অনেক মাছ-মাংস ভোজীর তথা প্রাভাতিক-মাধ্যাহ্নিক এবং নৈশ ভোজীর তাহা নাই।

* * * *

ঘৃত, দুগ্ধ বেশী করিয়া খাইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু ভেজাল দ্রব্য কখনো সেবন করিও না। এখন যে উদ্ভিজ্জ ঘৃতের আবিষ্কার হইয়াছে, উহা শরীর পুষ্টির কখনো সহায়ক নহে, ফুঁকা দেওয়া দুগ্ধ পানে নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ভেজাল দ্রব্য আহার করা অপেক্ষা, সে দ্রব্য আহার না করা উচিত।

* * * *

খাঁটি দুগ্ধ ও ঘৃত যাঁহাদের খাইবার উপায় নাই, তাঁহাদের পক্ষে বেশী করিয়া দাল খাওয়া উচিত। মসূর এবং মুগের দাল—মাংসের কাথ অপেক্ষা কম উপকারী নহে। আমাদের দেশে গরীব শ্রমিকগণ—দুগ্ধ ও ঘৃত খাইবার যাহাদের সামর্থ্য নাই তাহারা এ কথা খুবই পালন করিয়া থাকে।

হিন্দুস্থানীদিগের দাল-রুটিই একমাত্র পুষ্টিকর আহার্য্য।

* * * *

ময়দাতেও এখন যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে। এক প্রকার পাথরের গুঁড়া ময়দায় মিশাল দেওয়া হয় ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, এজন্য ময়দা না খাইয়া আটা খাওয়া উচিত। এই আটা ঘরে তৈয়ার করিলে আরও ভাল হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ঐ ব্যবস্থা আছে এবং সেই জন্যই সে দেশের লোকে বাঙ্গালীর অপেক্ষা অধিক বলশালী।

* * * *

স্বাস্থ্যের জন্য দৈহিক শ্রম একান্তই আবশ্যক, কিন্তু শ্রমের সীমা লঙ্ঘন করিতে নাই। যাঁহাদিগকে অধিক ভাবে মানসিক শ্রম করিতে হয়, তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রাভাতিক এবং সান্ধ্য বায়ু সেবন একান্তই কর্ত্তব্য। অনেক চিন্তাশীল মনীষী শারীরিক শ্রম-বিমুখ হইয়া অকালে বার্দ্ধক্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন, ইহার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া যাইতে পারে।

* * * *

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তজ্জন্য অধিক রাত্রিজাগরণ বিধেয় নহে। দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণের মত স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর আর কিছুই নাই।

* * * *

আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরিবর্ত্তন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। নৈশভোজন রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। অধিক রাত্রে আহার করিলে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়।

* * * *

রোগ হইবা মাত্র ঔষধ খাইও না। অনেক সময় কেবল নিয়ম পালনেই অনেক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ব্যাধি-বিনাশে সুনিয়মই একমাত্র ঔষধ। অনেকে কার্য্যানুরোধে যে রোগ হইবামাত্র ঔষধের সাহায্যে উহা দূর করিতে চেষ্টা করেন, উহার ফলে সদ্যঃ সুফল পাইলেও পরিণামে কিন্তু উহা অন্য রোগ উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

* * * *

মাদক দ্রব্য সেবনে শরীরকে উত্তেজিত করা কখনো উচিত নহে। মাদক দ্রব্যের শক্তি শরীরে অতি শীঘ্র সঞ্চারিত হয় এবং তাহার পরিণাম অন্য রোগ আনয়নের হেতু হইয়া থাকে। যাঁহারা সখ্ করিয়া সিদ্ধিঘটিত মোদক ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিনাকারণে অন্য রোগকে ডাকিয়া আনেন।

* * * *

সিদ্ধিঘটিত মোদক আবার এখনকার দিনে যেখানে-সেখানে—পানের দোকানে—ষ্টেসনারি দোকানে পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সস্তার প্রলোভনে অনেকে সেই সকল মোদক কিনিয়া আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। এই মোদকগুলি বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকারী। "মদনানন্দ মোদক' বলিয়া এই সকল মোদক বিক্রীত হইলেও এই সকল মোদক—রাবণ কথিত শাস্ত্রীয় প্রকৃত মোদক নহে। নেশার জন্য উহা একরূপ অভিনব

প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়। স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই সকল মোদকের দোকান হইতে দূরে থাকা উচিত।

* * * *

এখন উপন্যাসের যুগ আসিয়াছে। গল্পপুস্তক অনেকেই পড়িতে চান। সর্ব্বাপেক্ষা দেশের যুবক যুবতীরা ইহার অধিক অনুরাগী। কিন্তু কুরুচিপূর্ণ গল্পপুস্তক স্বভাবসুলভ মনোজ্ঞ হইলেও উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতজনক নহে। গল্প বা উপন্যাস পাঠ অপেক্ষা সাধুজনের জীবনী বা স্বদেশের ইতিহাস পাঠ বহুগুণে শ্রেয়স্কর।

* * * *

অবিবাহিত যুবক যুবতীর হস্তে গল্প পুস্তক দিলে তো আরও বিষময় ফল ফলিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলকে অস্বাভাবিক উত্তেজিত করিতে এরূপ শত্রু আর নাই। কুরুচিপূর্ণ চিত্র দর্শনের ফলও এইরূপ হইয়া থাকে।

* * * *

কথা অল্প বলিতে চেষ্টা করা উচিত। বেশী কথা কহিতে গেলে যেমন অনেক সময় মিথ্যার আরোপ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ বেশী কথার ফলে বায়ুর বিকৃতি ঘটিয়া নানারূপ রোগও হইতে পারে। সকলপ্রকার ইন্দ্রিয় সংযম শিক্ষা করিতে হইলে আগে বাক্‌সংযমের শিক্ষা করা উচিত।

* * * *

সৎসঙ্গে মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে, মানসিক প্রফুল্লতা স্বাস্থ্য সুখের হেতু। যেরূপ সঙ্গ করিবে, সেইরূপ ভাবে মনও গঠিত হইবে। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে, কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যেখানে পরনিন্দা নাই, পরচর্চ্চা নাই এমন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। পরের আলোচনায় নিজের কোনো লাভই হয় না, উহা কেবল বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র।

* * * *

পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিবার পূর্ব্বে নিজের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। অপরের যে দোষ দেখিয়া আমি হাস্য করিয়া থাকি, আমার নিজের হয়তো তাহা অপেক্ষা বহুগুণে দোষ থাকিতে পারে। এজন্য পরের দোষ বাহির করিবার জন্য মনকে ব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। পরের দোষ বাহির করিতে চেষ্টা না করিয়া পরের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। আর্ত্ত ব্যক্তির দৈন্য দূর করিলে যে আত্মতৃপ্তি উপস্থিত হয়, নানাপ্রকার বলকারক ঔষধ সেবন অপেক্ষা তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বহুগুণে উপকারী।

আয়ুর্ব্বেদ—অতীত ও বর্ত্তমান।

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ)

আজকাল সভাসমিতিতে, বিদ্যালয়ে, মাসিকপত্রিকায়, সংবাদপত্রে ও লোকমুখে আয়ুর্ব্বেদের নাম প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।—পূর্ব্বে এতটা শুনা যাইত না। সে বেশীদিনের কথা নয়, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি কেহ সকল চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া আয়ুর্ব্বেদের কৃপায় জীবনলাভ করিতেন, তবেই তিনি আত্মীয় স্বজনের নিকট আয়ুর্ব্বেদের নাম উল্লেখ করিতেন এবং যাহাদের অর্থের অভাবে ইংরাজী পড়িবার সুবিধা হইতনা, সাধারণতঃ তাহারাই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিত বা আয়ুর্ব্বেদের আলোচনায় মন দিত। এখন আর সেদিন নাই। এখন রীতিমত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বি এ, এম্ এ এবং সংস্কৃত উপাধি প্রভৃতি লাভ করিয়া যাহারা দীর্ঘ কাল কঠোর অধ্যবসায় সহকারে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ অনন্ত-সাধারণ-মেধাবী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বর্ত্তমান প্রচলিত ডাক্তারী চিকিৎসা শিক্ষার মোহ ত্যাগ করিয়া কবিরাজীতে মন দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ের একাধিক আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়, অসংখ্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক, ঔষধালয় ও বড় বড় কবিরাজী ঔষধের কারখানা দেখিয়া মনে হয়, এখন আর সেদিন নাই। এখন বোধহয় বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের প্রবোধকাল উপস্থিত হইয়াছে,—আয়ুর্ব্বেদ যে আবার পূর্ণমহিমায়—প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে, তাহার সূচনা হইয়াছে। কিন্তু যে কালনিদ্রায় অভিভূত থাকে, সে কখনও নিজের চৈতন্য নিজে সম্পাদন করিতে পারে না। অপর জ্ঞানবান্ শক্তিমান্ পুরুষ আসিয়া তাহার মোহ নিদ্রার অবসান ঘটাইয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলে এবং তাহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে,—ইহাই চিরন্তনী [illegible]। দৈবক্রমে আয়ুর্ব্বেদেরও বর্ত্তমানে সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। অথচ ভারতে আয়ুর্ব্বেদ এক দিন [illegible] ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করিয়াছি[illegible] সমস্ত দেশের লোককে চিকিৎসা-বিজ্ঞান [illegible] না। তখন আয়ুর্ব্বেদই [illegible] শিখাইয়াছিল। তারপর দীর্ঘ [illegible] আসিয়া আয়ুর্ব্বেদকে সুষুপ্তিমগ্ন করিয়া দিয়াছে। [illegible] প্রখর কিরণ-মালা যেমন [illegible] অন্ধকারে বিলীন প্রায় হয়, [illegible] ও প্রভাব আর এখন [illegible]। [illegible] গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সেই [illegible] আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমানে যাহারা [illegible] পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় বলেন,—"আয়ুর্ব্বেদ সনাতন শাস্ত্র, উহা চিরদিনই অব্যাহতভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছে এবং থাকিবেও। কালের মোহ-মলিন ছায়া উহার জ্যোতিঃ ম্লান করিয়া দিতে পারে না। কেবল শিক্ষার অভাবে উহা এখন অন্ধকারাবৃত আছে। সুতরাং উহা যেমন আছে, তেমনি থাক, কেবল ভাল করিয়া শিক্ষা দেওয়া হউক, উহার সংস্কারের কোন আবশ্যক নাই ইত্যাদি।" আর এক সম্প্রদায় বলেন,—"হাঁ, আয়ুর্ব্বেদ সনাতন শাস্ত্র বটে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের যে সকল গ্রন্থ ইদানীং পাওয়া যায় না, অথচ যাহাদের পরিচয় পদে পদে বর্ত্তমান, সেইগুলির আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, এখন আয়ুর্ব্বেদের আটটী

অঙ্গের মধ্যে একটী অঙ্গের কিয়দংশ মাত্র প্রচলিত, অপর অংশগুলি বিলুপ্ত প্রায়। ঐ সকল অঙ্গের পূর্ব্বে যে অনেক গ্রন্থ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। সেই সকল গ্রন্থ নষ্ট হওয়ায় এবং প্রচলিত গ্রন্থগুলির চর্চ্চার অভাবে আয়ুর্ব্বেদের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে। এমন কি আয়ুর্ব্বেদের প্রধান ভিত্তি যে শারীরস্থান, তাহার অধিকাংশই এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রাচীন বিলুপ্ত গ্রন্থগুলির উদ্ধার, বর্ত্তমান চরক সুশ্রুতাদির বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ এবং প্রত্যঙ্গ-জ্ঞান মূলক শবচ্ছেদ-লব্ধ শারীরশিক্ষা প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদকে এখন মাজিয়া ঘসিয়া ও জীর্ণসংস্কার করিয়া লইতে হইবে—ইত্যাদি।" সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদ লইয়া কবিরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা বিশেষ মত-ভেদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা কোন প্রকার সংস্কার বা পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন না,—তাঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং যাহারা সংস্কার বা পরিবর্ত্তন কামনা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক। অনেকে মনে করিতে পারেন,—যাহারা প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত, —তাঁহারা পরিবর্ত্তনবিরোধী এবং যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহারাই পরিবর্ত্তনকামী। বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু বহু আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান দশা দেখিয়া দুঃখিত এবং সংস্কারকামী। আমরা এই উভয় সম্প্রদায়েরই বক্তব্য সকল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া পাঠকগণের নিকট বিচারার্থ উপস্থিত করিব। কেন না,—আয়ুর্ব্বেদ শুধু কবিরাজগণেরই সম্পত্তি নহে, উহাতে সাধারণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। দেশ আর এখন নিশ্চেষ্ট জড়ভাবে থাকিতে চাহিতেছে না। এখন তাহার জাগরণ কাল উপস্থিত। তাই সকলদিকেই প্রবোধের সাড়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই আয়ুর্ব্বেদ লইয়া এত সভা-সমিতি, স্কুল কলেজ ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি। এই জাগরণের দিনে যদি আয়ুর্ব্বেদ সাম্প্রদায়িক বিরোধের মধ্যে পড়িয়া পুনরায় অঙ্গহীন বা মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয় কিংবা নিজের বৈশিষ্ট হারাইয়া—কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি ধারণ করে —তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে। আর যদি শস্ত্রপ্রয়োগ ভয়ে ভীত দুষ্টব্রণগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ সংস্কার পরাঙ্মুখ হইয়া প্রাণ হারায়, তাহা হইলেও স্বরাজের একটা প্রধান অঙ্গ বিকল হইয়া যাইবে। সুতরাং এই সঙ্কট কালে ভারতবাসী মাত্রেরই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। এইজন্য বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ কি দশায় উপনীত হইয়াছে—তাহাই আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন, ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব নামে চারিটী বেদ আছে। কথিত আছে, বেদ চতুষ্টয়ের অন্যতম অথর্ব্ব বেদের সার সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা লক্ষ-শ্লোকময়ী—একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা রচনা করেন, উহার নাম ব্রহ্মসংহিতা। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি পিতার নিকট সেই সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "দক্ষসংহিতা"। দক্ষ-প্রজাপতির শিষ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। তাঁহারা দক্ষ প্রজাপতির নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বর্গরাজ্যে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। (শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা কাটা মাথা, জোড়া দিতেন, আর চিকিৎসার তো কথাই নাই) তাঁহারাও একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "অশ্বিনীকুমারসংহিতা"। স্বর্গ-পতি ইন্দ্র,—অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের চিকিৎসা নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অধ্যয়ন-অন্তে স্বনামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "বাসব-সংহিতা" বা "ঐন্দ্রসংহিতা।" এই সকল দেখিয়া বোধ হয় প্রাচীনকালে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা বড় পণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা নিজের অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়া এক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতেন। ঋষি প্রণীত গ্রন্থের নাম সংহিতা। বলা বাহুল্য—ঐ সকল

সংহিতার মধ্যে একখানিও বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের পর আর যে কোন দেবতা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এরূপও শুনা যায় না। তিনিই দেবতাগণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের শেষ আচার্য্য বলিয়া সকলের শরণ্য হইয়াছিলেন। তারপর যখন এই মর্ত্ত্যলোকে রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রজাসমূহকে ধ্বংস করিতে লাগিল,—এমন কি মহর্ষিগণেরও তপস্যা ব্রত ও অধ্যয়নাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল যখন বিঘ্নবহুল হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা হিমালয়ের পাদদেশে এক মহাসভার অনুষ্ঠান করিলেন। সেই মহাসভার মহর্ষিগণ একত্র সমবেত হইয়া রোগ নিবারণের উপায় জানিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়া দেখিলেন—"স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ আছে, সেই আয়ুর্ব্বেদকে অধিগত করিয়া এখানে আনিয়া প্রচার করিতে পারিলে—এই দারুণ ব্যাধি সকলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্বর্গে গিয়া আয়ুর্ব্বেদ লইয়া আসা তো সহজ কথা নয়। কে এই দুরূহ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইবে? এই বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন সেই ঋষিসঙ্ঘের মধ্যে মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন —"অহমর্থে নিযুজ্যেয়ম্" আপনারা আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি গিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ লইয়া আসিব।" তাহা শুনিয়া সকলেই পরম আনন্দে অশেষ সাধুবাদ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট গিয়া যথারীতি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মহর্ষিসঙ্ঘের নিকট যথাবৎ আয়ুর্ব্বেদ বর্ণনা করিলেন। তদবধি এই মর্ত্ত্যলোকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার লাভ করিল। মহর্ষিগণ সেই সর্ব্বলোক-হিতকর আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা পরম কল্যাণ ও অনশ্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রজাগণকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। (চরক-সংহিতা)

মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে যে আয়ুর্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছিলেন, উহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইলেও আত্রেয়ের শিষ্যগণ উহার কায় চিকিৎসা অঙ্গ (Practice of medicine) কে প্রধান করিয়াই কয়েকখানি সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য আত্রেয় সম্প্রদায়কে কায় চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians) বলা হয়। ইঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থে শল্য চিকিৎসাকে প্রধান না করিয়া কায়চিকিৎসাকেই প্রধান করিয়া আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং যেখানে যেখানে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানে সেইখানে "তত্র ধান্বন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ"—বলিয়া তাঁহাদের সময়ে প্রসিদ্ধ ধন্বন্তরি সম্প্রদায় (School of Surgeons) বা শল্য চিকিৎসকগণের উপর ভার দিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের কথা আমরা পরে বলিতেছি।

মহর্ষিগণের মধ্যে ভগবান পুনর্ব্বসু আত্রেয় (ভাব প্রকাশমতে ভরদ্বাজই আত্রেয়) ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব নামে এক একখানি বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল সংহিতার মধ্যে অগ্নিবেশ সংহিতাখানি সর্ব্বোত্তম বলিয়া অদ্যাপি উহার প্রচার বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে অগ্নিবেশ সংহিতারও অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভগবান অনন্তদেব যখন জীবগণের কুশলাকুশল জানিবার নিমিত্ত চররূপে পৃথিবী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং উক্ত 'অগ্নিবেশ সংহিতা'র জীর্ণ সংস্কার করেন। চররূপে অবতীর্ণ বলিয়া চরক নামে খ্যাত মুনিকর্তৃক সংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতা—চরকসংহিতা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। (ভোজরাজের মতে এই চরকই মহর্ষি পতঞ্জলি)। কালক্রমে উক্ত চরকসংহিতার শেষাংশ বিলুপ্ত হইলে কাশ্মীর-বাসী বা পঞ্জাবী পণ্ডিত 'দৃঢ়বল' তাহার শেষাংশ রচনা করিয়া উহাতে সংযোজিত করিয়া দেন,—এই সকল কথা বর্ত্তমান চরক-সংহিতাতেই আছে। মূল অগ্নিবেশসংহিতা এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি চরক—

অগ্নিবেশ সংহিতার আমূল সংস্কার করিয়াছিলেন, যাহাকে নূতন গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও পারা যায়। এইজন্য পণ্ডিত দৃঢ়বল বলিয়াছিলেন, "সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ পুনর্নবম্ —ইত্যাদি।" এই পর্য্যন্ত আমরা আত্রেয় সম্প্রদায়ের কথা বলিলাম।

মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ লইয়া আসিয়া প্রজাগণের হিতার্থে জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনই ভগবান্ কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরিও ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া লোকহিতার্থে বারাণসী ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লোকহিতৈষণা ও আয়ুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় কুশলতার জন্য তিনি সমুদ্রমন্থনসম্ভূত দেবতা ধন্বন্তরির অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ ধন্বন্তরির— সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র, পুষ্কলাবত, বৈতরণ ও ভোজ প্রভৃতি বহু মহর্ষি শিষ্য ছিলেন। ইহারা সকলেই ধন্বন্তরির নিকট অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া শল্যতন্ত্রের অর্থাৎ শস্ত্রচিকিৎসা-প্রধান আয়ুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তন করেন। এই জন্য ইঁহাদিগকে শল্য চিকিৎসক সম্প্রদায় বা ধন্বন্তরি সম্প্রদায় (School of Surgeon) বলা হয়। এই উভয় সম্প্রদায়ই তৎকালে সমধিক প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। আত্রেয় সম্প্রদায়ের ন্যায় ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ও বহু বহু শস্ত্রচিকিৎসার গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে সকল গ্রন্থেরও অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদিও বা সুশ্রুত সংহিতা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সংস্কারকগণের হাতে পড়িয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের নাম উচ্চারণ করিলেই যেমন সাধারণের চিত্তে কবিরাজী ঔষধ ও চিকিৎসার কথা মনে হয়, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। তখনকার আয়ুর্ব্বেদ এক বিরাট্ ব্যাপার ছিল। মানুষের মন ও শরীর লইয়া যাবতীয় আধিব্যাধি। সেই সকলেরই তত্ত্ব-নির্ণয় ও প্রতীকার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ করিতেন। শুধু মানুষ কেন, যাহাদের প্রাণ বা জীবন আছে—সে সকলেরই দুঃখ নিবারণের জন্য আয়ুর্ব্বেদ রচিত হইয়াছিল —এজন্য বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ব[illegible] বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই মনুষ্য দেহ লইয়া [illegible] আয়ুর্ব্বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহা আট ভাগে বিভক্ত ছিল আয়ুর্ব্বেদের সেই আটটী ভাগকে আটটী অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দে[illegible] করা হইত, এজন্য আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদও বল[illegible] হইত। অঙ্গ সকলের নাম যথা—(১) শল্যতন্ত্র (Surgery বা সাধারণ শস্ত্রসাধ্য রোগ সমূহের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রসূতিতন্ত্র বা Midwifery ইহারই অন্তর্গত। (২ শালাক্যতন্ত্র বা চক্ষুঃকর্ণ নাসিকা ও কণ্ঠস্থল প্রভৃতি[illegible] বিজ্ঞান ও চিকিৎসা Deseases of the eye, ear nose and throat)। (৩) কায়-চিকিৎসা বা ঔষধ-সাধ্য সাধারণ রোগসমূহের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা (Practice of Medicine)। (৪) ভূতবিদ্যা বা যাবতীয় মানসরোগ সমূহের নিদান ও প্রতীকার। ভূতপ্রেত-পিশাচাদিকৃত রোগ সমূহের চিকিৎসাও ইহার অন্তর্গত (Treatment of mental diseases)। (৫) কৌমারভৃত্য বা শিশু-পালন ও শিশু চিকিৎসা (Deseases of the children) (৬) অগদতন্ত্র বা বিষচিকিৎসা—সর্পদংশন ও ক্ষিপ্তশৃগাল কুক্কুরাদির চিকিৎসা ও ইহার অন্তর্গত (Toxicology) (৭ রসায়ন-তন্ত্র বা অকাল-বার্দ্ধক্য ও তৎসম্বন্ধীয় ব্যাধি-সকলের প্রতীকার—(Treatment for Health and Longevity) এবং (৮) বাজীকরণ-তন্ত্র বা স্ত্রীপুরুষের প্রজনন শক্তির সম্যক্পালনও তৎসম্পর্কিত রোগসমূহের (Science and treatment of sexual diseases) নিরাকরণ।

পূর্ব্বোক্ত আত্রেয়-সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্রেয়-সম্প্রদায় অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র এবং বাজীকরণ-তন্ত্র ও কৌমারভৃত্য নামক এই ছয়টি অঙ্গের বিশেষভাবে উপাসনা করিতেন। আর ধন্বন্তরি-সম্প্রদায়ের উপর শল্য ও শালাক্য এই অঙ্গদ্বয়ের ভার ন্যস্ত ছিল। পরে উক্ত— (পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রসূতিতন্ত্র বা মিডওয়াইফারী শল্য-

তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত) সম্প্রদায় দুইটীর এতাদৃশ উন্নতি ঘটিয়াছিল যে, আধুনিক ডাক্তারীর ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের এক একটী অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া এক একটী বিশিষ্ট (special) সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে যেমন এক একটী বিষয় বিশেষ অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক বহু চিকিৎসাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রাচীনকালেও আয়ুর্ব্বেদের এক একটী অঙ্গবিশেষকে অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত। এমন কি, চরক সুশ্রুতাদির বহু পরে রচিত নিদান চক্রদত্ত প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থাদির টীকাকারগণ স্বমত-সমর্থনের জন্য যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থও এখন আর পাওয়া যায় না। অথবা এই বিপুল ভারতের কোথায় কোন্ গ্রন্থ আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছে, কে তাহার উদ্ধার সাধনে যত্ন-পরায়ণ হইবে?

পূর্ব্বোক্ত আত্রেয়-সম্প্রদায় ও ধন্বন্তরি-সম্প্রদায় ব্যতিরিক্ত আরও একটী সম্প্রদায় চিকিৎসা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহার নাম রসবৈদ্য-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায় রস বা পারদ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ সকলের প্রয়োগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া সেই সম্প্রদায় 'রসবৈদ্য'-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন স্বয়ং মহাদেব। সিদ্ধা নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। বৌদ্ধযুগেই উক্ত সম্প্রদায় ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

এইরূপে আত্রেয় সম্প্রদায়, ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ও রসবৈদ্য-সম্প্রদায়—এই তিন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক একদিন আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তখনকার আয়ুর্ব্বেদ কিরূপ ছিল, তাহা এক কথায় জানাইতে হইলে মহর্ষি চরকাচার্য্যের বাক্যটী উদ্ধৃত করিতে হয়, যথা—

"হিতাহিতং সুখং দুঃখং আয়ুস্তস্য হিতাহিতম্।
মানঞ্চ তত্র যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদ স উচ্যতে॥"

মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে কাল,—তাহারই নাম আয়ুঃ। এই যে জীবনের অবস্থিতিকাল আয়ুঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই আয়ুঃ কাহারও হিত অর্থাৎ কল্যাণময়, কাহারও অহিত অর্থাৎ অকল্যাণময় এবং কাহারও সুখময় এবং কাহারও দুঃখময় হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে সকল পুণ্যাত্মার জীবন দ্বারা জগতের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হয়, তাঁহাদের আয়ুই হিত আয়ুঃ। অপিচ যাহারা সমগ্র জীবনটা কেবল সুখেই অতিবাহিত করেন, তাহাদের আয়ুঃ সুখ আয়ুঃ এবং যাহাদের জীবনে সুখের লেশমাত্র নাই, তাহাদের আয়ুঃ-দুঃখ আয়ুঃ। এই হিতাহিত সুখ দুঃখময় আয়ুর কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া জগতের কল্যাণে লাগিতে পারে এবং সেই আয়ুর পরিমাণই বা কি? ইত্যাদি আয়ুঃ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা অর্থাৎ জীবনকে অবলম্বন করিয়া মানুষের যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, সে সকলেরই নির্দ্দেশ যাহাতে করা হইয়াছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। সুতরাং অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝায় আয়ুর্ব্বেদ বলিলে তাহা বুঝায় না। মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু কর্ম্মময় বা ধর্ম্মময় ব্যাপার, এক কথায় মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-সিদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ আরোগ্যের অশেষবিধ উপায়, উপদেশ ও অনুষ্ঠান সকল এই আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে নিহিত আছে। শুধু শরীরের স্বাস্থ্য-লাভ করিয়া মানব আপনাকে স্বাস্থ্য সুখে সুখী বলিয়া মনে করিতে পারে না, মনের সুখও সে আকাঙ্ক্ষা করে। মনের সকল সুখের আয়োজন বর্ত্তমান থাকিলেও দেহের দুঃখেও জীব আপনাকে দুঃখী বলিয়া মনে করে। অতএব যুগপৎ শারীর ও মানস সুখেই মানুষ আপনাকে প্রকৃত সুখী বলিয়া মনে করে। সেই শারীর ও মানস সর্ব্ববিধ সুখের উপদেষ্টা আয়ুর্ব্বেদ। ইহাও আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ যখনই শারীর সুখের উপায়

সকলের উপদেশ দিয়াছেন, তখনই মানসিক সুখের উপায় সকলও বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহারা পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি তাহারাই প্রত্যক্ষ বা বর্ত্তমান ছাড়া মানবের উপাস্ত আর কিছু নাই বলিয়া মনে করে। বুদ্ধিমান্ বিবেকী মানব তাহা মনে করেন না। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালকেই বুদ্ধি দ্বারা অধিগত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাই বুদ্ধিমান্ অনুপহত-সত্ত্ব-বুদ্ধি-পৌরুষ-পরাক্রম পুরুষ বুদ্ধিকৌশলে সমুপাগত শারীর ও মানস বিকার সকলের প্রতীকার করিয়াই নিশ্চিন্ত হন না, অজাত রোগ সমূহেরও যাহাতে উৎপত্তি না হয়, এরূপ উপায় সকলও অবলম্বন করিয়া সার্ব্বকালিক কল্যাণের অধিকারী হইয়া থাকেন। যেমন পোষাক বদলাইলে মানুষ বদলায় না, তেমনই দেহের মৃত্যুতে মনের মৃত্যু হয় না। সুতরাং মনের হাত হইতে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। মনোবশেই জীবের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে এবং মনেরই উচ্চাবচ অবস্থা দ্বারাই লোকান্তরেও জীবের সুখ দুঃখের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই মনকে স্ববশে রাখিয়া কল্যাণাভিনিবেশী করা সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্ম নহে। তবে যদি আহার ব্যবহারের মধ্য দিয়া আপনাপনি মন পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে না। এই যে চিত্তশুদ্ধির সুগম পন্থা, এই পন্থারই নির্দেশ করিয়াছেন আমাদের আয়ুর্ব্বেদ। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম জগতে চেষ্টা করে না কে? সেই স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদের বিধি-নিষেধ সকল মানিয়া চলিলে, অজ্ঞাতসারে মানবের ধর্ম্ম সকলও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ম প্রকৃতিভেদে যে আহার-বিধির নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে আহারাদি করিলে মানুষের চিত্ত আপনা হইতেই পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন, "আহারশুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধিঃ।" আহারের অন্তিম সূক্ষ্ম-পরিণতিই মন। অপবিত্র অমেধ্য মধু-মাংসাদি ভোজন দ্বারা চিত্ত কলুষিত এবং পবিত্র ঘৃত পায়সাদি পান ভোজন দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয়, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? উপনিষৎ বলেন,—"অন্নময়ং খলু সৌম্য মনঃ।"—আহার্য্য বস্তুর প্রকৃতির অনুসারে মানসিক প্রবৃত্তি সকল জন্মিয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের প্রায় সকল ঔষধই সুরা-সম্বলিত,আর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ তাহার তুলনায় অমৃত। এক বাজীকরণাধিকারোক্ত ঔষধ সকল ব্যতিরিক্ত কোন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে মানুষের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে না। এজন্য ভগবচ্চিন্তানিরত মুমূর্ষু মানবের অন্তিম দশায় চিত্তের চাঞ্চল্য না ঘটাইয়া যদি কোন ঔষধে তাহার উপকার করিতে পারে, তবে সে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ। এজন্য এখনও ভারতের হিন্দু বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ মৃত্যুকালে ডাক্তারী ঔষধ স্পর্শ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। অতএব কি জীবদ্দশা, কি মরণ কাল সকল অবস্থাতেই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ আর্য্যগণের পরম কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। এজন্য মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছিলেন,—"বক্ষ্যতেঽয়ং মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতম্"।

চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্ব্বেদের স্থান।

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(২)

স্থূলভাবে রসের গুণ ও ক্রিয়া বলা হইয়াছে। পরন্তু রস যে গুণ বা শক্তি প্রভাবে নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। রস অর্থে রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্বাদ বিশেষ। কোন বস্তু জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হইলে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত বা কষায়—এই ষড়্ রসের মধ্যে কোন একটার অনুভূতি হয়, ঐ অনুভূত রসের নামানুসারেই উক্ত দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া যায়। যেমন শর্করা—মধুর রস, গুলঞ্চ—তিক্ত রস প্রভৃতি। কিন্তু কেবল এরূপ পরিচয়ের দ্বারা রসের প্রকৃতি সমগ্ররূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। কারণ অনেক সময়ে আপাত অনুভূত রস পরিণামে অর্থাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্য রসে পরিণত হয়। উহাকে বিপাক বলে, বিপাক স্থলে রসের গুণ ও ক্রিয়াদিরও অন্যথা হইতে পারে। এই জন্য বৈদ্যকশাস্ত্রে রসের বিপাক অর্থাৎ কোন্ রস পরিপাকাবস্থায় কোন্ রসে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা আছে। এস্থলে সংক্ষেপে উহার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হয়; অম্ল রসের বিপাক অম্ল, মধুর রসের ও লবণ রসের বিপাক মধুর। বিপাকীভূত মধুর, অম্ল, ও লবণ রস স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা গুণে মল, মূত্র ও অধোবায়ুর নিঃসরণের অনুকূল হয়। কটু, তিক্ত ও কষায় রস স্বাভাবিক রুক্ষভাবশতঃ মল, মূত্র, অধোবায়ু ও শুক্রের মোক্ষণ বিষয়ে প্রতিকূল হইয়া থাকে।

কটু বিপাক বস্তু শুক্রনাশক, মল মূত্রাদির বিবন্ধজনক ও বায়ুবর্দ্ধক। মধুর বিপাক দ্রব্য মল-মূত্রাদির প্রবর্ত্তক, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধক। অম্লবিপাকী দ্রব্য পিত্তজনক, মলমূত্রাদির প্রবর্ত্তক ও শুক্রের নাশক হয়। এ স্থলে দ্রব্যগত মধুরাদি রসের পরিমাণের তারতম্য অনুসারে বিপাকীভূত রসেরও তারতম্য বুঝিতে হইবে। এই কারণেই এক জাতীয় রসের প্রয়োগে পৃথক্ পৃথক্ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ বৈদ্য—রসবিষয়ক তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ও যোগ্যস্থলে প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ ফল পাইতে পারেন। স্থূলভাবে রস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বলা হইল। এস্থলে অনুষঙ্গ ক্রমে আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যের বীর্য্য ও প্রভাব সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক, নতুবা বিষয়ের সম্পূর্ণতা হইতে পারে না। রসের তারতম্যানুসারে দ্রব্যগত গুণের যে তারতম্য হয়, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, কোন্ কোন্ রস বিপাকে কোন্ কোন্ রসে পরিণত হইয়া কি কার্য্য করে তাহাও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যে শক্তিতে রস এই বিপাক প্রাপ্ত হইয়া উক্তরূপ কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদে বীর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যেই বিশেষ বীর্য্য বা শক্তি আছে—যাহার সাহায্যে দ্রব্য সকল নিজ নিজ গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। এই শক্তিহীন অর্থাৎ বীর্য্যহীন দ্রব্য কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হয় না। কেহ কেহ বলেন, বীর্য্য দ্বিবিধ, শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। কোন কোন পণ্ডিত-বৈদ্যের মতে বীর্য্য অষ্টবিধ, যথা—মৃদু, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ ও শীতল। উভয় মতেরই সামঞ্জস্য আছে, কারণ সাধারণতঃ দ্রব্য মাত্রেই শীত বা উষ্ণ স্বভাবের মধ্যে একতর থাকিবেই সুতরাং স্থূলভাবে দ্রব্যের শীতোষ্ণ ভেদে বীর্য্যের দ্বিবিধত্ব বলা যাইতে পারে। অপর মৃদু আদি যে আট প্রকার বীর্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাও এই শীত ও উষ্ণ বীর্য্যের অন্তর্নিহিত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শীতবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য যে

কোন বস্তু হউক না কেন, তাহাতে মৃদু তীক্ষ্ণতাদি রসম্পর্কানুসারে মৃদুবীর্য্য বা তীক্ষ্ণবীর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই উভয় মতের সামঞ্জস্য। বৈদ্যকশাস্ত্রে রসোল্লেখের পরই বীর্য্য কথিত হইয়াছে, কারণ, বীর্য্যের সাহায্যেই বিপাক ও রসের কার্য্যাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমি সাধারণের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া এই ক্রমভঙ্গ করিয়া বিপাকের পরেই বীর্য্যের পরিচয় দিলাম।

কোন কোন স্থলে রস, বীর্য্য বা বিপাকের তুল্যতা সত্ত্বেও দ্রব্যদ্বয়ে পৃথকরূপ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন চিত্রক ও দন্তী, এই দুইটী বস্তুই কটু রস, কটু বিপাক ও উষ্ণবীর্য্য। কটুরস, কটু বিপাক ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ক্রিয়া—শুক্র হানি, মলমূত্রের বিবন্ধ প্রভৃতি। চিত্রকে এই সমস্ত কার্য্যই পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু দন্তীতে শুক্র হননাদি ক্রিয়া থাকিলেও মলমূত্রাদির বিবন্ধকারিতা নাই, অধিকন্তু দন্তীর প্রয়োগে বিরেচনই হইয়া থাকে, অতএব একাংশে চিত্রকের সহিত দন্তীর বিপরীত কার্য্যকারিতা দেখা যাইতেছে। রস, বীর্য্য ও বিপাকের নির্দিষ্ট ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই এস্থলে দেখা যাইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। কোন স্থলে রসের সহিত, কোথায় ও বা বিপাকের সহিত, কোন কোন স্থানে বীর্য্যের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও দ্রব্যের ক্রিয়াকারিতার সময় প্রচুর পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া মনীষী বৈদ্যমহর্ষিগণ দ্রব্যগত আর একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার নাম প্রভাব, অর্থাৎ দ্রব্যের অচিন্ত্যশক্তি। এই শক্তির কার্য্যকারণের প্রণালী সাধারণ নিয়মের অধীন নহে, অথবা যুক্তিতর্কেরও বিষয়ীভূত নহে, এই জন্যই ইহাকে অচিন্ত্য বলা হইয়াছে। দন্তীতে এই অচিন্ত্য শক্তি বা প্রভাবগুণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিত্রকে উহা নাই, সুতরাং রসবীর্য্যাদিতে তুল্যগুণসম্পন্ন হইয়াও প্রভাব গুণে দন্তী অন্যরূপ কার্য্যকারিতা প্রকাশ করে। এই প্রভাব বলেই স্থাবরবিষ জঙ্গমবিষের নাশক ও, জঙ্গমবিষ স্থাবর বিষের নাশক হইয়া থাকে। জঙ্গমবিষের ঊর্দ্ধগমন ও স্থাবরবিষের অধোগমনেরও একমাত্র হেতু এই প্রভাব। যেখানে রস, বিপাক, বীর্য্য বা প্রভাবের তুল্যবল হয়, সেখানে বিপাক—রসকে পরাজয় করে অর্থাৎ তথায় রসের কার্য্য না হইয়া বিপাকরসের ক্রিয়াই প্রকাশ পায়। যেমন তিক্তরস—পিত্তের শান্তিজনক, কিন্তু তিক্ত রসের বিপাক কটু, কটু রস পিত্তবর্দ্ধক। এমত স্থলে ঐ তিক্তরস পিত্তের শান্তিকারক না হইয়া বর্দ্ধনকারীই হইবে। আবার দ্রব্যের বীর্য্য (মৃদুতীক্ষ্ণ প্রভৃতি) রস ও বিপাক উভয়কেই পরাভূত করে অর্থাৎ সে স্থলে রস ও বিপাকের ক্রিয়া না হইয়া বীর্য্যেরই কার্য্য প্রকাশ পায়। যেমন অগুরু ও আকন্দ প্রভৃতির তিক্তরস, কটু বিপাক ও উষ্ণ-বীর্য্য; কিন্তু ঐ আকন্দাদি বস্তু তিক্তরস বা কটুবিপাকের কার্য্য না করিয়া উষ্ণ বীর্য্যের ক্রিয়াই করিয়া থাকে। আবার প্রভাবগুণ—রস, বীর্য্য ও বিপাকের ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া নিজের ক্রিয়াই প্রকাশ করে। যেমন দন্তী—কটুরস, কটুবিপাক বা উষ্ণবীর্য্য হইয়াও তৎতদ্রস বিপাক বীর্য্যের কার্য্য না করিয়া প্রভাবগুণে বিপরীত বিরেচন ক্রিয়াই সম্পাদন করে। বৈদ্যকে সর্ব্বত্রই সমস্ত গুণাপেক্ষা এই প্রভাবেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে; কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। উক্ত রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব পরিজ্ঞাত না হইলে কেহই রোগ প্রতীকারে বা স্বাস্থ্যসম্পদ রক্ষণে নৈপুণ্য-লাভ করিতে পারে না। কি ভেষজবস্তু, কি ভোজ্যবস্তু, সর্ব্বত্রই রসাদির পরিচয় জানিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে রোগী ও ভোগী উভয়েই শান্তিলাভ করিতে পারে। সুস্থদেহী মানবের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক দোষের অনুকূল খাদ্য-পানীয়াদি প্রয়োগ করিতে পারিলে যেমত স্বাস্থ্যসম্পৎ অটুট থাকে, রুগ্নদেহেও তেমনি রোগজনক দোষের বলাবল অবগত হইয়া ভেষজ প্রয়োগে রোগের উপশম হইয়া থাকে। ফলকথা চিকিৎসকের পক্ষে এই রস-বীর্য্যাদির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যেমন আবশ্যক, স্বাস্থ্যকামীর পক্ষেও তেমনি প্রয়োজনীয়। আয়ুর্ব্বেদে

সমস্ত বস্তুরই রস, বীর্য্য, বিপাক ও যে স্থলে কোন প্রভাব লক্ষিত হয়, তথায় প্রভাবের পরিচয় বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা যাবতীয় বস্তুর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রস-বীর্য্যাদির বিশ্লেষণ ও তদনুসারে কার্য্যকারিতা শক্তির যথাযথ পরিচয় দিয়া সমস্ত জগতের মহৎ কল্যাণ ও বৈদ্যকশাস্ত্রের অনুপম গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই মহামহিমশালী, ত্রিকালদর্শী, পরমবৈজ্ঞানিক ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদ্যাবতংসগণ আজ চিরানন্দ দেবধামে থাকিয়া আমাদের ন্যায় পল্লবগ্রাহী শাস্ত্রানভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে তাঁহাদের বহু গবেষণার ফল বৈদ্যকশাস্ত্রের অধোগতি ও অবহেলা দর্শন করিয়া না জানি কতই মর্ম্মব্যথা অনুভব করিতেছেন, বোধ হয় তাঁহাদের মনোদুঃখজনিত দীর্ঘশ্বাস ও অভিশাপেই আজ আয়ুর্ব্বেদের এই অবমাননা। কিন্তু যাহা অভ্রান্ত, ধ্রুব, চিরন্তন, অবিনশ্বর, অপার্থিবশক্তিসম্পন্ন, তাহার বিনাশ কদাপি সম্ভবপর নহে। দৈশিক রীতিনীতি ও শিক্ষা স্রোতের প্রতিকূলতায় সাময়িক অবসাদপ্রাপ্ত হইলেও নিজপ্রভাবে পুনরুজ্জীবিত ও সন্দীপ্ত হইয়া আবার সমগ্র বিশ্ববাসীর মঙ্গলময় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র স্বকীয় পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময় হইতেই সেই শুভদিনের সূচনা লক্ষিত হইতেছে। অনেক খ্যতনামা, পাশ্চাত্য চিকিৎসায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকও আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনতা ও যাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসূতিত্ব স্বীকারও অবিসম্বাদিতরূপে যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। নানা শাস্ত্রপারদর্শী, দর্শননিপুণ, বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পঠন পাঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিশাল ভারতের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই আয়ুর্ব্বেদের সমধিক চর্চ্চার জন্য বিরাট্ বিদ্যামন্দির ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহু শিক্ষালোকদীপ্ত মহাত্মাই আয়ুর্ব্বেদের লোপোন্মুখ অংশগুলির পূর্ণতাসাধনে কায়মন ও সম্পত্তির সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সব শুভচিহ্ন দেখিয়া সর্ব্বসাধারণেই আয়ুর্ব্বেদের অচিরভাবিনী সমুন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইতেছেন। রোগীগণও আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসিত হইবার জন্য ক্রমেই অধিক আগ্রহান্বিত হইতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিশুদ্ধতা ও আমাদের প্রকৃতির উপযোগিতা, দেশবাসী এক্ষণে ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। শিক্ষিত ও কর্ম্মকুশল বৈদ্যের সংখ্যা এবং চিকিৎসার প্রসারপ্রতিপত্তিও দিন দিন বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে প্রস্তুত বিষয়ের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি; সংযমের হীনতা ও মানসিক উত্তেজনাই সেজন্য দায়ী, অতএব অনুগ্রহপরায়ণ পাঠকগণ আমার এই অনিচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম ক্ষমা করিবেন। "আয়ুর্ব্বেদ" কোন উচ্চস্থানে ও উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ের নিদর্শন দেখানই আমার লক্ষ্য, কিন্তু প্রস্তাব্যবিষয়ের অবতারণা করিয়াই আমি নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতঃ লক্ষ্যস্থলে উপস্থিতি বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িতেছি। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত বিধান সমূহের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি, ততদূর পর্য্যন্ত সমস্তই আমার নিকট তুল্যমূল্য ও সমান প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হইতেছে। যাহা হউক সর্ব্বসাধারণের নিত্য আবশ্যকীয় ও অনুসরণীয় বিষয়গুলি বাছিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। স্বীয় কীর্ত্তিস্থাপন বা নামের প্রতিষ্ঠা কামনায় আমি এই দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি নাই, তবে যদি কোন যোগ্যতর মনীষী আমার এই প্রারব্ধ কার্য্যের দোষত্রুটী দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া বিষয়টীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপূর্ণতা সহকারে প্রকাশ করতঃ দেশের হিতসাধন করেন—ইহাই আমার একান্ত কামনা।

দ্রব্যের রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব সম্বন্ধে স্থূলভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কোন কোন বস্তুর বীর্য্য রসাদির বিরুদ্ধও দেখা যায়; সে সব বিশেষরূপে জানা আবশ্যক, নতুবা চিকিৎসা ব্যাপারে সাফল্যলাভ করা দুঃসাধ্য হয়। দৃষ্টান্তরূপে কতিপয় দ্রব্যের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে; যথা—বিল্বাদিপঞ্চমূলের কষায় (বেল

শাল, শোনা, গাম্ভারী, পারুলী ও গণিয়ারী) তিক্তরস হইলে ও উহা উষ্ণবীর্য্য। জলচর প্রাণী বা জলপ্রায় স্থানবর্ত্তী জীবের মাংস—মধুর রস হইয়াও উষ্ণবীর্য্য, লবণ রসযুক্ত সৈন্ধব লবণের স্বাভাবিক উষ্ণতাগুণবর্জ্জিত, অম্ল রস—আমলকী উষ্ণগুণহীন। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত বৈদ্যকশাস্ত্রে নিহিত আছে, বিশেষ জিজ্ঞাসুগ্রাহক অনুসন্ধান করিলেই তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

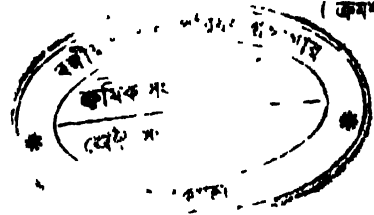
আরোগ্য ও স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে আর একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে—যাহা অপরাপর চিকিৎসা শাস্ত্রে কুত্রাপি আলোচিত হয় নাই। কোন বস্তু কোন বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইলে ভোজনে অপকারী হয় এবং কি নিমিত্ত ঐ অপকার জন্মে—তাহা যুক্তি সহকারে বিস্তৃতভাবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কতকগুলি সংযোগবিরুদ্ধ বস্তু দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—দুগ্ধসহ মৎস্য ভক্ষণ করিবে না, যেহেতু দুগ্ধ ও মৎস্য উভয়ই মধুর রস, মধুর বিপাক, অতএব উভয়ের একত্র আহার অত্যভিষ্যন্দজনক হয়। পক্ষান্তরে দুগ্ধ শীতবীর্য্য ও মৎস্য উষ্ণবীর্য্য, অতএব পরস্পরের এই বিরুদ্ধ বীর্য্যের একত্র সংযোগে রক্তদুষ্টি জন্মে এবং অত্যভিষ্যন্দকরত্ব বশতঃ স্রোতঃ সমূহের অবরোধ ঘটে।

মধু, তিল, গুড়, দুগ্ধ, মূলক প্রভৃতির সহিত গ্রাম্য, আনুপ বা জলচর জীবের মাংস ভোজন করিবে না। ঐরূপ ভোজনে, ব্যাধির্য্য, অন্ধতা,কম্প,জড়তা, বিকলাঙ্গতা, মূকত্ব, মিন্‌মিন্‌ভাবিত্ব অথবা মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। মধু এবং দুগ্ধসহ পুষ্করশাক ও রোহিণীশাক এবং সর্ষপ তৈল ভর্জিত কপোতমাংস খাইবে না। উহা ভোজনে রক্তাভিষ্যন্দ, ধমনীবিস্তার অপস্মার মৃগীরোগ) গলগণ্ড প্রভৃতি ব্যাধি জন্মে। মূলক,রসোন, সজিনাশাক ও তুলসী ভক্ষণান্তে দুগ্ধ পান করিবেন। কারণ তাহাতে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে। আম্র, আমড়া, ছোলঙ্গলেবু, কামরাঙ্গা, কুল, চাল্‌তা, জাম, কয়েতবেল, তেঁতুল, আখরোট, কাঁঠাল, দাড়িম, নারিকেল, আমলকী প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য অথবা যে কোনও অম্লরস প্রধান বস্তু—দুগ্ধসহ সেবন করিবে না। কাউনধান, বনমুগ, কুলথ কলাই, মাষকলাই, ও শিম, ইহারাও দুগ্ধসহ ভোজনে অপকারজনক হয়। শর্করাজাত মদ্য, মৈরেয় মদ্য ও মধু একত্র ভোজন নিষিদ্ধ, ঐরূপ ভোজনে অত্যধিক বায়ুর প্রকোপ ও তজ্জনিত বিবিধ পীড়া জনিতে পারে।

হরেল পাখীর মাংস সর্ষপ তৈলে ভর্জ্জিত হইলে বিরুদ্ধ হয়, উহার ভোজনে অতিশয় পিত্তের প্রকোপ হয়। এরণ্ডকাষ্ঠের আগুনে পক্ব ময়ূর মাংস সদ্যঃ প্রাণনাশক। মধু উষ্ণ পান করিলে অথবা উষ্ণার্ত্ত অবস্থায় মধু পান করিলেও মরণ সম্ভবপর হয়। সমপ্রমাণ ঘৃত ও মধু একত্র পান করিলে, পদ্মবীজ ও মধু ভক্ষণে, মধু পানান্তে উষ্ণজল বা উষ্ণজল পানান্তে মধু সেবনে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। শলাকা দ্বারা ও অঙ্গারের অগ্নিতে সিদ্ধ ভাস পক্ষীর মাংস বিরুদ্ধ। এইরূপ সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজনের অনেক উদাহরণ বৈদ্যশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, এস্থলে তৎভাবতের উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকর্ত্তা মহানুভব মহর্ষিগণের গভীর গবেষণা, কঠোর পরিশ্রম ও পরীক্ষার ফলমাত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই কতকগুলি বিষয় সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, পাঠকগণ ইহা স্মরণ রাখিয়া প্রবন্ধের সমালোচনা করিবেন। সংযোগ বিরুদ্ধ ভোজনে সাধারণতঃ ক্লৈব্য, অন্ধতা, বিসর্প,জলোদর, বিস্ফোট, উন্মাদ, ভগন্দর, মূর্চ্ছা, অপস্মার, আধ্মান,গলরোগ পাণ্ডু রোগ, কুষ্ঠ, কিলাস, গ্রহণী, শোথ, অম্লপিত্ত জ্বর, পীনস ও মৃতবৎসাদি ব্যাধি জন্মিতে পারে। দ্রব্যের গুণকর্ম্মাদির বিশ্লেষণ জন্য বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ নানা উপায়ের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আর্ষ, প্রমাদভ্রান্তিহীনশাস্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য চতুর্ব্বর্গের সাধনক্ষেত্রস্বরূপ প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা। রোগের প্রতীকার ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। যে সব নিয়মের অনুকরণে রোগাসুর দেহে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না,তাহাই বিস্তৃতরূপে আয়ুর্ব্বেদে

বর্ণিত আছে। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে এমন একটা পুণ্যময়, প্রীতিকর সময় ছিল, যখন অধিকাংশ মানবই আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিধিব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে সুখশান্তির সহিত দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিয়া উপযুক্তকালে কালগ্রাসে পতিত হইত। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত বৈদ্যকে বর্ণিত আছে তাহা আলোচনা করিলে সকলেই প্রীতি লাভ করিতে পারিবেন। কোন্ ঋতুতে, কোন্ প্রণালীতে দেহযাত্রা করিবে, কোন্ সময়ে কি প্রকার খাদ্য খাইবে বা কোন্ কালে কোন্ দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ, কোন্ কালে কিভাবে অঙ্গচালনা (ব্যায়াম) কর্ত্তব্য, কোন্ প্রকৃতির পক্ষে কিরূপ ভাবে আহার বিহারাদি করা কর্ত্তব্য, প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়গুলি আয়ুর্ব্বেদে অতি বিশদভাবে বর্ণিত আছে, কিঞ্চিৎ প্রণিধান পূর্ব্বক ঐ সব বিধিব্যবস্থার কতকটাও যদি মানিয়া চলা যায়, তাহাতেও স্বাস্থ্য ও শক্তি সঞ্চয়ের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য পাওয়া যাইবে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেও ভারতীয় মানবগণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতানুসারে অভ্যাস ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াও উক্ত বিষয়গুলির অনুবর্ত্তনে তৎপর থাকিত এবং সেইজন্য দীর্ঘজীবন স্বাস্থ্যসম্পদে সম্পন্ন থাকিয়া মনের আনন্দে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিতে পারিত।

(ক্রমশঃ)



সোণার ভারত

এই কি মোদের সোণার ভারত
　　বীর-প্রসবিনী আখ্যা যা'র
ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ, যথা জনমিয়া
　　গলায় পরিল বিজয় হার
এই কি সে দেশ—যে দেশে একদা
　　শিবাজী-প্রতাপ জনম নিল।
এই সে ভারত—মহিলা রত্ন
　　'করম দেবী' যথায় ছিল !
এই কি সে দেশ—যেথাকার লোকে
　　ধর্ম্ম বলিতে বুঝিত কর্ম্ম,
ধর্ম্ম অর্থে স্বাস্থ্য রক্ষা—
　　শরীর পালন যাহার মর্ম্ম !
এই কি সে দেশ—যে দেশ দেখিয়া
　　অন্য দেশবাসী ঈর্ষামনে
বলিত ভারত, তুমিই ধন্য
　　এত সুখ তুমি কেমনে পেলে ?
বিশ্ববাসীর সব সুখ টুকু
　　তোমারি অঙ্গে র'য়েছে মাখা.
পুণ্য-জোছনা তোমারি আকাশে—
　　তোমারি দেহেতে র'য়েছে আঁকা।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ মুরতি
　　একাধারে ওগো ভারত ভূমি,
তুমিই ধন্য, তুমিই গণ্য,—
　　তোমারি তুলনা কেবল তুমি।

এই কি মোদের সোণার ভারত,
　　ভরদ্বাজ আদি আর্য্য ঋষি,

উদাত্ত সুরেতে গাইল যেথায়
স্বাস্থ্যরক্ষা বিরলে বসি।
বৃদ্ধ চ্যবনের বার্দ্ধক্য জরা
ঘুচিয়া যাইল একদা যথা,
মহর্ষি সুশ্রুত যথা জনমিয়া
কহিল শারীর বিদ্যার কথা।
যথা ভিষথর বাভট' জনমি
রাজবৈদ্য হ'ল পাণ্ডব কুলে
যথা 'সিদ্ধনাথ', যথায় 'টুণ্টুনি'
'রসের' সাধনা দেখাল তুলে
যথা ''মাধবের' অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—
'ভাবমিশ্র' যথা জনম নিল,
যথায় একদা আর্য্য সমাজ
বিজ্ঞান চর্চ্চায় মত্ত ছিল ?
বরুণ কণ্ঠে খনার' বচন
উঠিল যথায় ছড়ার ছন্দে,
মহিলা হ'লেও সমগ্র ভারত
এখনও যাঁহার চরণ বন্দে !
স্বাস্থ্য লাগিয়া শক্তি-সাধনা
তুমিই তুলিলে ভারত ভূমি,
তুমিই ধন্য, তুমিই গণ্য,
তোমারি তুলনা কেবল তুমি।

যুগ যুগ বহি তোমারি কীর্ত্তি
দীপ্ত কণ্ঠে গায়ক গায়,
তিল তিল করি সকলি গিয়াছে,
এখন কেবল স্মৃতিটি হায় !
শৌর্য্য বীর্য্য নাহিক কাহারো
উপাসনাও তা'র করে না কেহ,
দীর্ঘ জীবনে কারো সাধ নাই,
চাহেনাক কেহ সুস্থ দেহ।
'বচন সর্ব্বস্ব' কেবল সকলে,
গর্ব্ব কেবল স্মৃতিটি ল'য়ে,
'পিতামহ ছিল শ্রেষ্ঠ বলী'—
হৃদয়ে শান্তি ইহাই ক'য়ে।
এরূপ পতন হ'য়েছে যা'দের
না মরিয়া তা'রা মরিবে কা'রা
অকাল মরণ তা'রি ফল ভোগ,
তা রি ফলভোগ যুবার জরা।
প্রতিদিন এত শিশুর মৃত্যু,
মহিলা মড়ক লেগেছে দেশে।
সুস্থ সবল একজনও নাই--
অকাল পক্কতা নেহার কেশে;
সকলের চেয়ে স্বাস্থ্য পালন—
পরম ধর্ম্ম জানিতে তুমি,
তাহারি অভাবে আজি না দুর্গতি
তুমিই বলনা ভারত ভূমি।

অগ্রহায়ণে "আয়ুর্বিজ্ঞানের" প্রথমাবির্ভাব কেন ?

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, পলে পলে যখন এই দীনা ক্ষীণা ভারতের মেরুদণ্ডটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহার জীর্ণ কঙ্কাল টানিয়া বাহির করিয়াছিল, তখন আর্ত্তপীড়িত মানবের অশ্রু অন্ধ অহিংসা-পূত-পারম্য-প্রাঙ্গণ হইতে যে বরাভয়ের আশীর্ব্বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—তাহারই নাম "আয়ুর্বিজ্ঞান"। বহুযুগ পরে, সেই "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" হস্তে লইয়া, সুহৃদ্বর সত্যচরণ সেন—আবার আমাদিগকে স্বাস্থ্য কথা শুনাইতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বৈশাখকে বাদ দিয়া অগ্রহায়ণে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বর্ষারম্ভ হইল কেন ? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, অগ্রহায়ণেরই একটু পরিচয় দিতে হইবে।

পঞ্জিকায় দেখি—"বৈশাখ" মাস হইতেই—বর্ষ গণনার আরম্ভ। বৈশাখের নাম "নববর্ষ।" কিন্তু সনাতন সৃষ্টিতে সবই যে পুরাতন। যাহাদের জীবনে বৈচিত্র্য নাই, তাহাদের আবার "নববর্ষ" কি ? যাহা সৌন্দর্য্যময়-আনন্দময়-প্রাণময়—তাহাই ত নূতন, সে নূতন' আমরা কোথায় পাইব? নববর্ষ" কথাটাই বৃথা; দিবস রজনী, উদয় অস্ত, জল-স্থল, পাখী-শাখী হাস্য-রোদন, জন্ম-মৃত্যু, সবই সেই একঘেয়ে, সবই সেই অপরিবর্ত্তিত, তবে বৈশাখকে নববর্ষ বলিয়া লাভ কি ? কবে কোন্ রসজ্ঞকবি মধু ঋতুর বুকের বেদীতে বসাইয়া বৈশাখকে বর্ষরাজ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কবে কোন্ রাজাধিরাজ বৈশাখ হইতে বর্ষগণনার প্রচার করিয়াছেন,—ইতিবৃত্ত তাহার সত্য [illegible] পারিবে না। কিন্তু আর্য্যভূমি যখন [illegible] নর ও নারায়ণকে নিগূঢ় আলিঙ্গনে একসঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল,—সেই মহোৎসবের মহা মিলনের [illegible] এ দেশে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বর্ষ গণনা [illegible] ছিল। বৈদিকযুগ ব্রাহ্মণযুগ, আচার্য্য যুগ—ভারতের দর্পদৃপ্ত যুগ। আর্য্যঋষি [illegible] সাক্ষী হিমালয়ের সানুদেশ হইতে স্বাধীনচারী [illegible] ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা [illegible] মর্ম্মর বেদিকায় "অগ্রহায়ণের" শুচিশোভা দেখিয়া [illegible] হইয়াছিলেন। "অগ্র" প্রথম, "হায়ন" বৎসর—[illegible] নামকরণেই সে রহস্য আমাদের চক্ষে ধরা পড়িয়া [illegible]। বিশাখা হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ—এই [illegible] নক্ষত্রের নামে চৈত্র পর্য্যন্ত একাদশ মাসের নামকরণ হইয়াছিল, কেবল অগ্রহায়ণের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। হায়নস্য অগ্রং, ইতি অগ্রহায়নং—যে মাস বৎসরের প্রথম মাস, তাহার সম্মান দেখাইতে গেলে, অন্যান্য মাসের মত নক্ষত্রের নামে—তাহার নাম রাখা চলে না। বৌদ্ধ যুগ—ভারতের বিজয় মণ্ডিত [illegible] শিক্ষার, সভ্যতার, শিল্পকলার আদিযুগ। সেই ইতিহাসের আরম্ভ যুগে—অজ্ঞানকে জ্ঞান বিতরণের জন্য—[illegible] ত্যাগী শ্রমণাচার্য্য—ভারতের চতুঃসীমার বাহিরে [illegible] অগ্রহায়ণেই পরিভ্রমণে প্রথম যাত্রা করিয়াছিলেন। [illegible] এ মাসের আর একটী নাম "মার্গশীর্ষ"। [illegible] মহাসাধককে একদিন এই অগ্রহায়ণ শ্রেষ্ঠ পথ [illegible] দিয়াছিল। জ্যোতিষী বলেন—"মৃগশিরা [illegible] পৌর্ণমাসী যত্র মাসে"—যে মাসের পূর্ণিমায় মৃগশিরা [illegible] থাকে—তাহার নাম "মার্গশীর্ষ"। তান্ত্রিক—[illegible] তিব্যাহারে শক্তিশালী হইয়া, নির্জ্জন বনে, [illegible] অন্ধকারে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া এই অগ্রহায়ণেই [illegible] প্রথম আহুতি ঢালিয়াছিলেন। কাল—[illegible] অখণ্ড, অবিনশ্বর ও অব্যভিচারী। [illegible] সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা—প্রকৃতির অহোরাত্রের [illegible] লক্ষ্য করিয়া একটানার ভিতরে যে, [illegible] করিয়াছিল, তাহার বিকাশ-বিকাশ [illegible]

"অগ্রহায়ণ"। জীবের আমিত্বের গতি ও পরিণতি—এই অগ্রহায়ণ। সময়ের নিঃশ্বাস-মুহূর্ত্ত, জিরাইবার অবসর, পশ্চাদৃষ্টির অবকাশ—অপরিমেয় অতীতের স্মারক—এই অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণ—জাতির সৃষ্টি ও সমষ্টিগত আমিত্বের বিশ্রাম। কি জানি কেন এ দুর্ব্বলতা। কি জানি কিসের এ আকুল পিপাসা। একটানা দুঃখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কেন মানুষ পুরাতনকে নূতন আবরণে ঢাকিতে যায়। আমার বাল্য-কৈশোর-যৌবন-জরা—আমাকে নূতনের সাধনা শিখাইয়া দেয়। আমার বড় সাধের দাম্পত্য প্রেম—পুরাতন হইয়া পড়িলে, পুত্রবাৎসল্যে আবার নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই অমোঘ আদান প্রদানই—অগ্রহায়ণ। আমরা ত "গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি" কোটি কল্পকালের পরিমাণে—শকাব্দা,শতাব্দি,শাল-সনের ভাগ দেখিয়া হাসি পাইলেও, একটু হাঁপ ছাড়িবার সময় খুঁজি। অগ্রহায়ণ আমার পূর্ব্ব পুরুষকে যবনিকার অন্তরালে লুকাইয়া আমাকে অভ্যুদয়ের অরুণালোকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। আমি 'যমুনার' ভাই ফোঁটা কপালে পরিয়া, কার্ত্তিকেয় যমাষ্টকের সান্নিপাতিক সন্তাপ এড়াইয়া, অগ্রহায়ণের অনুরাগ রক্তিম দেব মূর্ত্তির আরতি করিতেছি ; এইত আমার আনন্দময় প্রথম বর্ষ। এইত আমার সুধারসের অমৃত আস্বাদ। অগ্রহায়ণে—গ্রীষ্মের উগ্রতা নাই, বর্ষার বিরসবিষণ্ণতা নাই, শরতের শ্যাম জৌলাক নাই, বসন্তের ব্যাকুলবেদনা নাই, শিশিরের স্তব্ধ জড়তা নাই ; অথচ অগ্রহায়ণ—সর্ব্ব ঋতুর সমাধি। সকল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগাতায়। অগ্রহায়ণ—শস্যক্ষেত্রের দিগন্ত-ব্যাপী স্বর্ণ হিল্লোল দেশময় সুভিক্ষের সূচনা করে, অনশন ক্লিষ্ট প্রকৃতির হাতে অন্নপূর্ণার বিপুল সম্পদ বিলাইয়া দেয়, মানুষকে তাপসকণ্ঠের স্বস্তি বচন শুনাইয়া যায়। সেই আনন্দ ধারার অভিসিঞ্চনে—পুরাতন আবার নূতন হইয়া দাঁড়ায়। নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষের বাণী তুলিয়া, নারায়ণের মুখে 'নবান্ন' দিয়া নিখিলের নর নারী আবার নূতন সংসার পাতিয়া বসে।

দেশে নিত্য নূতন রোগের আবির্ভাব, মহাকালে ডমরুধ্বনিতে—মৃত্যুর বিরাট তাণ্ডবে নাচিয়া উঠিয়াছে জগৎ ব্যাধিক্লিষ্ট, জীবন অভাবপিষ্ট, শিল্প—মৃতাবশি খাদ্য দ্রব্য অতি নিকৃষ্ট, সংসার অনৈক্যদুষ্ট, জ্ঞানী—আবা ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম ক্ষেত্রে—অসত্য অভাব ও অন্নকষ্ট ;—এই যে আয়ুর্ব্বিজ্ঞান প্রচারের সময়। সাহিত্যিক সত্যচর সুচিকিৎসক, সত্যচরণ, স্বদেশ প্রাণ সত্যচরণ—স্বাস্থ্যহী নর নারীকে 'আয়ুর্ব্বিজ্ঞান' বুঝাইয়া সঙ্কট হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করি—তাঁহা সঙ্কল্প—সিদ্ধির পথে অগ্রসর হউক।

এ জগতে প্রত্নতাত্ত্বিকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তাঁহারা এক টুকরা কলসীর কাণা কুড়াইয়া পাইলে চৈতন্য প্রভুর জন্ম তারিখ লিখিয়া ফেলিতে পারেন। এ অব ব্যবসায়ে বৈজ্ঞানিক হইলেও—কর্ম্মক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে "প্রত্নতাত্ত্বিক"। তাই "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে"র পাঠকবর্গের কাছে—অগ্রহায়ণের পরিচয় দিবার সাধ হইয়াছে। যদি ও আমার বিশ্বাস—এরূপ প্রবন্ধ 'চ বৈ তু হি'র দলে—কেবল পাদপূরণের জন্য।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি—সে কালে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বর্ষ গণনা হইত। অগ্রহায়ণ—ঋষিযুগের অম্লান-অমর-রশ্মিরেখায়—মহত্ত্বের মহা শ্মশানে আজিও দণ্ডায়মান। এই অর্চ্চনীয় অগ্রহায়ণ মাসে—ময়ূখমালী সূর্য্যদেব বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করেন। অগ্রহায়ণে অস্তাচলগামী সূর্য্যদেবকে দর্শন করা উচিত নহে। তাহাতে চক্ষুরোগ হইবার সম্ভাবনা। এ মাসে প্রাতঃ সূর্য্যের বন্দনা করিলে পরমায়ু লাভ হইয়া থাকে।

এ মাসে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সংস্কার এবং তন্ত্রোক্ত বলি-হোম প্রশস্ত। অগ্রহায়ণের শুক্ল চতুর্দ্দশীর নাম "বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশী"। ইহাকে কেহ কেহ "পাষাণ চতুর্দ্দশী"ও বলিয়া থাকেন। এই দিনে ব্রত ধারিণীগণ—পিষ্টকাদি উপহার দিয়া গৌরীপূজা করিয়া স্বর্গ কামনা করেন।

এই মাসে শুক্লপক্ষে—নূতন তণ্ডুল, নূতন গুড় দিয়া ইষ্টদেবের অর্চ্চনা ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শেষে ব্রাহ্মণ, গবাদি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিকে নবান্নে পরিতুষ্ট করিয়া,নূতন অন্ন ভোজন করিতে হয়।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তদিবস আমলকী ভক্ষণ, দ্বিতীয় সপ্তাহের ৭ দিন কৃষ্ণ তিল চর্ব্বণ, তৃতীয় সপ্তাহে—বিল্ব পত্রের কল্কপান এবং চতুর্থ সপ্তাহে দধিসিক্ত যবশক্তু (যবের ছাতু) সেবন করিলে রমণীর মৃতবৎসা দোষ সারিয়া যায়। এই সময় কেবল দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিতে হইবে, লবণাক্ত ব্যঞ্জন নিষিদ্ধ। শৈবসিদ্ধান্ত তন্ত্রে—মহাদেব পার্ব্বতীকে ইহা উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই মাসে জন্মিলে—জাতক পরোপকারী, সুশীল, বিলাসী, ধনবান্ এবং তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইয়া থাকে। নারী প্রথম রজস্বলা হইলে ধর্ম্মশালী এবং প্রথম গর্ভবতী হইলে বংশতিলক পুত্র প্রসব করিয়া থাকে।

লোকাচার মতে—অগ্রহায়ণে প্রথম গর্ভজাত পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ। মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্মা —এ মাসে জ্যেষ্ঠ কুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন, সে পুত্র বিবাহের পক্ষকাল পরে—ইহলোককে অগ্রাহ্য করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর গোপাল দেবের প্রথম কন্যাকে দ্বিরাগমনের পূর্ব্বে—সীমন্তের সিন্দুর-অরুণিমা মুছিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। "নহ মূলা জন শ্রুতি" বোধ হয় সেই জন্যই—সম্পন্ন গৃহস্থ এ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন না। এমন ভয়ঙ্করী পণ প্রথার দিনেও এ মাসে লোকে প্রথম পুত্র বা প্রথম কন্যার পরিণয় দিবার সাহস করেন না। নিতান্ত ভবিতব্যতা থাকিলে—দশ দিন বাদ দিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করেন।

এ মাসে নব ধান্য ছেদন ও স্থাপন, বিদ্যারম্ভ, গৃহ নির্ম্মাণ, তীর্থযাত্রা, বাণিজ্যযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, আহুতি, প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম—প্রশস্ত।

এ মাসে নানাবিধ তরি-তরকারী এবং প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। কৃষকের গৃহে মা লক্ষ্মীর সিন্দুর চন্দনাঙ্কিত পাদপীঠ রচিত হয়। রবিশস্যাদির রোপণ ও বপন আরম্ভ হয়। রোগের প্রকোপ—শান্তভাব ধারণ করে। চির আর্ত্ত মর্ত্ত্যলোকে উৎসবের সাড়া পড়িয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসে—পটোল, ওল, ঝিঙ্গা, নিম্ব, মায়াফু (তরমুজ), আম্রাতক (আমড়া) এবং কলম্বীশাক খাইতে নাই।

এ মাসে—নারিকেল, দধি, কন্দশাক (মূলা, মান, কচু, চুপড়ী আলু প্রভৃতি) ডুমুর, মোচা, থোড়, অলাবু বা লাউ, কুষ্মাণ্ড, কপিত্থ (কয়েৎবেল) চালতা, বার্ত্তাকু, রাজমাষ (বরবটী) কিলাট (ছানা) খর্জ্জুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য—ভক্ষণ করা উচিত।

অগ্রহায়ণের উষায় উষ্ণোদক পান করিলে, অপামার্গ শাখায় দন্তধাবন করিলে, সর্ব্বাঙ্গে তিল তৈল মাখিলে, স্ত্রী সেবায় বিরত থাকিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এ মাসে রসায়নভেষজ ব্যবহার করিলে অকাল বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারে না। বৈদ্যশাস্ত্রের সেই রসায়ন বিধির বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাবলী ভুলিয়া গিয়া এ দেশের লোক দিন দিন স্বল্পজীবী হইয়া পড়িতেছে। স্নায়বিকদৌর্ব্বল্যের দারুণ অবসাদ যুবা সমাজে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রবাদপ্রসঙ্গও প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি—"বেদ বাণার থাকে" বঙ্গদেশে একজন ও বেদ বিদ্ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আদিশূর—কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। সেই পঞ্চব্রাহ্মণ, পঞ্চ কায়স্থের সঙ্গে এই অগ্রহায়ণ মাসেই সোণার বাংলায় প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণের অনুরাধা নক্ষত্রে—নদীনীরে নিস্পন্ন মঙ্গলস্নানা বন্ধ্যানারী—কটিদেশে অপরাজিতার মূল ধারণ করিলে অচিরে গর্ভবতী হইয়া থাকে।

গীতার জ্ঞানবতার, কুরুক্ষেত্রের কর্ণধার, অর্জ্জুনের কাছে—"মাসানাং মার্গ শীর্ষহহং" মাসের মধ্যে আমি

"অগ্রহায়ণ-মাস" বলিয়া যে অগ্রহায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই অতীতসমৃদ্ধি-গরীয়ান পবিত্র মাসে সত্যচরণ সবান্ধবে "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রচার করিয়া দেশের যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যহানির কারণ ও তাহার প্রতিকার

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ)

(ক) আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যহানির কারণ ও তাহার প্রতিকার। আমরা প্রথমতঃ অতীতকালের ও অন্যদেশের সহিত তুলনায় বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহানি কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা করিয়া,পরে তাহার যথাসম্ভব কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতীকারের পন্থা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

(ক) স্বাস্থ্য-হানি

বাঙ্গালীর দৈহিক বল, জীবন ধারণের কাল ও আরোগ্য-সুখ—তাহার আশা, উদ্যম ও আনন্দের ন্যায় দিনে দিনে কিরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে—তাহা অল্প-বিস্তর সকলেই অবগত আছেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম ও নগরগুলির স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় দুরবস্থার সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই, পরন্তু যাঁহারা কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি ও অবনতির সন্ধান রাখিতে চেষ্টা করেন না বা রাখিতে পারেন না অথবা যাঁহারা ঐ দুরবস্থার বিষয় অবগত থাকিয়াও ইহাকে স্বাভাবিক নিয়তির কঠোর কৌতুক মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন—তাঁহাদিগের ও অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। উপেক্ষার ভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার আহ্বান তাঁহাদিগের নিকটও পৌঁছিয়াছে। কারণ আজ দেশে একটা জাগরণের চিহ্ন নানা আকারে লক্ষিত হইতেছে এবং সংবাদ পত্র, পুস্তিকা প্রভৃতির সাহায্যে দেশের প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণের নিকট পরিস্ফুটভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

বাঙ্গালীর অতীত যে আনন্দময় ছিল, কৃষি ও গৃহশিল্পের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া তাহার পল্লীজীবন যে সরল সহজভাবে কাটিত,বাঙ্গালীর এক সময়ে যে বাহুবল ছিল, বাঙ্গালী যে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই দুর্দ্দান্ত মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হইত, একদা বাঙ্গলার বীরই যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া দেশ বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিত, আজ তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়াছে,—বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য তাহার প্রমাণ বহন করিতেছে। এখনও অতি বৃদ্ধ কোন কোন পল্লীবাসীর নিকট তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কুক্ষণে বাঙ্গালায় দ্বৈত শাসন প্রবেশ করিয়াছিল, কোন্ কুক্ষণে ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর আসিয়া বাঙ্গলার পল্লী শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল, সেই অবধি একটার পর আর একটা করিয়া যে দুর্য্যোগ চলিতেছে,—কবে তাহার অবধি হইবে কে জানে? কোন কোন বিশেষজ্ঞ বাঙ্গালীকে যে ধ্বংসোন্মুখ জাতি বলিয়াছেন, হয়ত তাঁহাদের আশঙ্কাই সত্য হইবে।

আজ বঙ্গভূমিকে সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য-শ্যামলা প্রভৃতি বলিয়া বন্দনা ক'রলে যেন দারুণ উপহাস করা হয়। পূজা পার্ব্বণে আর সে জীবন্ত ভাব নাই, দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জনে কোন ইতর-বিশেষ আছে

কিনা সন্দেহ। সন্তানের জন্ম, বিবাহ, লালনপালন— সমস্তই বিষাদজড়িত, দিনে দিনে নূতন নূতন সংক্রামক রোগ আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া—পল্লীসমূহকে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। জীবনে যে কোন আনন্দ আছে, বাঙ্গালী তাহা ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে। স্বদেশে বিদেশে—সর্ব্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর পরাজয় ঘটিতেছে এবং তজ্জনিত অবসাদে তাহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে। সকল রকমেই 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইতে বোধহয় বাঙ্গালীর মত কোন জাতি পারে নাই।

বাঙ্গলার জনসংখ্যা যে ক্রমে হীনবল হইতেছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক বৃদ্ধিশীল জাতির লক্ষণ এই যে, জন্মের হার, মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে এবং তদনুসারে লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আদমসুমারী গৃহীত হয়, প্রথম প্রথম লোক গণনা বিশেষ কষ্টকর ব্যাপার ছিল, সাধারণ লোক ইহার অর্থ না বুঝিয়া অমূলক আশঙ্কা বশতঃ যাথার্থ সংখ্যাকে হ্রাস করিয়া বলিত। এইজন্য লোক গণনা ঠিক হইত না, গভর্ণমেণ্টের বিগত আদমসুমারীর পরিচালকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বেকার লোক সংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমান লোক সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও সেই আধিক্য—প্রকৃত আধিক্য অপেক্ষা অনেক বেশী, এবং সেই আধিক্যের অন্যান্য প্রধান কারণ বিদ্যমান। ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী দলে দলে বাঙ্গলায় আসিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। অতএব প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না, আদমসুমারীর রিপোর্টে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, সেই বৃদ্ধি অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম এবং সেই বৃদ্ধির হারও ক্রমে যেন কমিয়া আসিতেছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪টী আদমসুমারীর রিপোর্টে বৃদ্ধির হার প্রায় একইরূপ দেখা যায়। ঐ সময়ের বৃদ্ধির হার শতকরা ৬'৭ হইতে ৮' পর্য্যন্ত ছিল, বিগত আদমসুমারীতে প্রকাশ যে, বৃদ্ধির হার শতকরা ৮ হইতে ২'৮এ নামিয়া গিয়াছে। এই হারে নামিতে থাকিলে পরবর্ত্তী লোকগণনার সময় দেখা যাইবে যে, লোকসংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি না হইযা ক্রমহ্রাস হইয়াছে। পল্লীসমূহে সংক্রামক রোগ গুলির যেরূপ উপদ্রব দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস, কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলার কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রেসিডেন্সি—বিশেষতঃ বর্দ্ধমান বিভাগের কথা আলোচনা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্তম্ভিত হইবেন। উক্ত দশ বৎসর বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মের সংখ্যা মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ৩ লক্ষ ৭১ হাজার কমিয়া গিয়াছে এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগে ১ লক্ষ ৮০ হাজার কমিয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগের মধ্যে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম এই তিনটি জেলার জনসংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পাইতেছে। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গেই জনসংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, এই হ্রাস দ্রুত ধ্বংসশীল জাতির লক্ষণ।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল স্যোস্যাল সার্ভিসলীগ যে প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহাতে ইউরোপ ও এসিয়ায় ২২টি দেশের জন্ম ও মৃত্যুর হার তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, একমাত্র বাঙ্গলা দেশেই মৃত্যুর সংখ্যা জন্মের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক,। রাসিয়ায় প্রতি ৪৮ জনের জন্ম ও ৩১ জনে মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ প্রতি সহস্র জন্মের সংখ্যা মৃত্যু অপেক্ষা ১৭টী অধিক, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, জার্ম্মনী প্রভৃতি সমস্ত দেশেই জন্মের হার—মৃত্যুর হার অপেক্ষা এইরূপে অধিক, ভারতবর্ষেও আজমীর, ইউনাইটেড প্রভিন্স, সেণ্ট্রাল প্রভিন্স প্রভৃতি স্থানে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক, কিন্তু বঙ্গদেশে প্রতি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ৩২ জনের জন্ম ও ৩৩ জনের মৃত্যু

হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতি সহস্রে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা একটী অধিক। এমন দুর্ভাগ্য দেশ পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যে আদমসুমারী গৃহীত হয়, তাহাতে প্রকাশ, যে, ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা মোট সাড়ে সাত লক্ষ অধিক হইয়াছে।

প্রকৃত কথা ভারতবাসীর আয়ু অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। সুইডেনবাসীর আয়ু গড়ে ৫০ বৎসর, ফ্রান্সে ৪৫ বৎসর, ইংলণ্ডে ৪৪ কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র ২৩ বৎসর। ডেন্মার্কে প্রতি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে ১৩ জনের, ইংলণ্ডে ১৫ জনের, ফ্রান্সে ১৯ জনের ও জাপানে ২১ জনের মৃত্যু হয়, ভারতবর্ষে সেইস্থলে ৪২ জনের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গলাদেশে শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। এই কলিকাতা সহরে প্রতি সহস্র শিশুর মধ্যে ৩১০টী শিশু মাতৃগর্ভে প্রাণত্যাগ করে এবং যাঁহারা জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, তন্মধ্যে প্রতি ৯টী শিশুর ৩টী—একবৎসরের মধ্যেই ইহধাম ত্যাগ করে। প্রসূতির মৃত্যুসংখ্যাও অত্যন্ত ভীষণ। ইংলণ্ডে যেস্থলে প্রতি ২০০০এর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু ঘটে, কলিকাতায় সেই স্থলে প্রতি ৪০ জনের মধ্যে ১ জন প্রসূতির মৃত্যু সংঘটিত হয়, অর্থাৎ ১ জন ইংরাজজননীর স্থলে ৫০ জন ভারতীয় জননী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

জন্মমৃত্যুর এই বিবরণ পাঠ করিলে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়, আমরা কি সত্যসত্যই বহু প্রাচীন জাতির ন্যায় ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে চলিয়াছি?

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের আলোচনা করিলেও আমাদের বিষাদের সীমা থাকে না। ক্ষীণায়ু বাঙ্গালী যে কয়েক বৎসর জীবন ধারণ করে, সেই কয়েক বৎসরই যদি সুখে কাটাইতে পারিত, তাহা হইলেও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতাম। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি গুলি বাঙ্গলাকেই যেন স্থায়ী লীলা-নিকেতন করিয়া তুলিয়াছে, নিত্য নূতন আগন্তুক আসিয়া বাঙ্গলার উর্ব্বর ক্ষেত্রে আশ্রয় লইতেছে এবং যে আসিতেছে, সে আর ভুলিয়াও বিদায় লইতেছে না। বিগত শতাব্দীতে ১৮৭২ হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার মড়ক আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব ছিল কি না,তাহা পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানের বিষয়। উর্দ্ধ দশ বৎসরে সমগ্র বাঙ্গলায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ ত্যাগ করে। একমাত্র বর্দ্ধমান জেলায় দেড় লক্ষ, মেদিনীপুর ও বীরভূম প্রত্যেক স্থলেই ন্যূনাধিক দেড়লক্ষ এবং বীরভূম জেলায় ৮৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। গভর্ণমেণ্ট ইহাকে Burdwan fever নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং গত সেন্সাস্ রিপোর্টে ইহাকেই পশ্চিম বঙ্গে জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল অংশই ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্লেগের অস্তিত্ব ছিল না। কালাজ্বর প্রথমে আসামেই আবদ্ধ ছিল, এখন সুবিধা বুঝিয়া বঙ্গদেশেও রাজত্ব করিতেছে, যক্ষ্মায় মৃত্যু সংখ্যা কি পল্লী, কি সহর—সর্ব্বত্রই বাড়িতেছে। গণোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রোগ গুলি এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যে একটী সুস্থ সবল লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। যাঁহারা পল্লীগ্রামস্থ রোগীদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ধাতের পীড়া কিশোর যুবক-বৃদ্ধ অধিকাংশকেই কিরূপ জীর্ণশীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রীলোকের বিশেষ বিশেষ ব্যাধি সমূহও জনে জনে পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল বিবিধ ব্যাধিগণে জড়িত হইয়া বাঙ্গালী জাতি জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। নীরোগতার আনন্দ বাঙ্গালীর নিকট আকাশকুসুমবৎ দুর্ল্লভ হইয়াছে। এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রায় কোন পার্থক্য নাই, উভয়েরই জীবন যাত্রা নিরানন্দ-ময়, অশিক্ষিত ব্যক্তি তাহার অজ্ঞতার ফলে যেরূপ ভুগিতেছে, শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সেইরূপই

ভুগিতেছে। যাহারা জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্থল বলিয়া কথিত হন, তাহারা যখন নিস্ফল বিদ্যার বিশাল ভার স্কন্ধে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হন, তখন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অংশ চলিয়া গিয়াছে, দেহ রুগ্ন ও পরিশ্রমকাতর, চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট প্রায়, এবং মন আপনার ও আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণের নিমিত্ত কোন প্রশস্ত পথ না পাইয়া অবসাদে পরিপূর্ণ,—এরূপ অবস্থায় অনেকেই অতি অল্প বেতনে কোন একটী চাকরী খুঁজিয়া পাইলে জীবনের ও শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইল, এরূপ ভাবিতে বাধ্য হন। এই জন্যই তাঁহাদের মার্জ্জিত বিদ্যাকে নিস্ফল বলিয়াছি।

(২) কারণ

এখন আমরা বাঙ্গালীর এই ভীষণ স্বাস্থ্যহানির কারণ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হইব। এই কার্য্যটী সহজসাধ্য নহে, কি কারণে বাঙ্গলার স্নিগ্ধ শ্যামল উর্ব্বরক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে, কি কারণে বাঙ্গালীর দৈহিক বল, রোগনিবারকশক্তি ও আয়ু ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে, কি কারণে বাঙ্গালী যৌবনে জরাক্রান্ত, বয়স ৪০ পার হইতে না হইতেই পলিতকেশ এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রায় সকল সময়েই নানা জটিল ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সংসারকে একান্তই অসার এবং বাঁচিয়া থাকাকে পাপের ফল বলিয়া মনে করিতেছে—তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির আবশ্যক একটী মাত্র ঘটনাকে ইহার কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। বহু ঘটনার সমন্বয়, বহু দুর্ব্বোধ্য সামাজিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তন, দেশকাল প্রভৃতির নানাবিধ পরিবর্ত্তন একত্র মিলিত হইয়া বাঙ্গলার এই অবস্থা আনয়ন করিয়াছে। তবে মোটামুটী ইহাকে পাশ্চাত্যসভ্যতার একটী বিষময় ফল বলা যাইতে পারে। অতঃপর যদৃচ্ছাক্রমে যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইবে, সেইগুলি হইতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে।

মহর্ষি চরক সাধারণ স্বাস্থ্যহানি ও জনপদ ধ্বংসের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা প্রধানতঃ সেইগুলির সহায়তায় বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহানির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব।

চরক বলিয়াছেন—রোগের আক্রমণ ৩টী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম—অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থসংযোগ অর্থাৎ আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই যে পাঁচটী বিষয় রহিয়াছে। এইগুলির অতিমাত্রায় সেবন, হীন মাত্রায় সেবন বা বিকৃতভাবে সেবন।

দ্বিতীয়—বাক্য, মন ও শরীরের প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্মের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ। বিহিত বাক্য, বিহিত মানসকর্ম্ম চিন্তাদি, এবং বিহিত শারীর কর্ম্ম অর্থাৎ দৈহিক শ্রম—অতিমাত্রায় করিলে উহাদের অতিযোগ এবং অল্প মাত্রায় করিলে উহাদের মিথ্যাযোগ ও অযোগ হইয়া থাকে। অবিহিত বাক্য যথা—মিথ্যা, কর্কশ বা কলহসূচক বাক্য, —অবিহিত মানসকর্ম্ম যথা—ভয়, শোক, লোভাদির দ্বারা অভিভূত হওয়া এবং অবিহিত শারীর কর্ম্ম যথা—পরদার গমনাদি নিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম,—যথাক্রমে বাক্য, মানসকর্ম্ম ও শারীরকর্ম্মের মিথ্যাযোগ। কর্ম্মের এই অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগকে প্রজ্ঞাপরাধ বলা হয়।

তৃতীয়—কালের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ, শীত,গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই ত্রিবিধ লক্ষণযুক্ত কাল স্বধর্ম্ম অতি-মাত্রায় প্রকাশ করিলে তাহা কালের অতিযোগ,অল্পমাত্রায় প্রকাশ করিলে অযোগ এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে শীতাদি আবির্ভূত না হইয়া সময়ান্তরে স্বধর্ম্ম প্রকাশ করিলে তাহাকে কালের মিথ্যাযোগ বলা হয়।

এই তিনটী কারণই সর্ব্বত্র স্বাস্থ্যহানির বা রোগাবি-র্ভাবের হেতু। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কারণ অনুসন্ধান করিলেও আমরা এই ত্রিবিধ কারণ দেখিতে পাইব। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর কথা উল্লেখ করিতেছি।

অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগের মধ্যে রূপের অসাত্ম্য-সংযোগকে বাঙ্গলার ছাত্রমণ্ডলীর সাধারণ দৃষ্টিশক্তিমান্দ্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রতি ১০জন বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে ছয় জনের দৃষ্টিশক্তি বিকৃত।

ইত্যাদির আলোয় রমুখে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কষ্টের সহিত অধ্যয়ন যুবকের দৃষ্টিশক্তি হানির একটী প্রধান চিকিৎসকগণ তাহা স্বীকার করিয়া

সেবনকে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান যাইতে পারে। খাদ্য—শরীর ধারণের মূল। সংযোগ ব্যতীত প্রদীপ যেরূপ জ্বলিতে উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শরীরের স্থিতিও অসম্ভব। মনুষ্যদেহ যেরূপ রস-বীর্য্যাদি বিশিষ্ট উপাদানযুক্ত খাদ্যের সেবন দ্বারা সুস্থ থাকে, খাদ্যের অভাব ঘটিলে সত্বর রোগপ্রবণ হইয়া শরীরের স্বাভাবিক রোগহারিণী শক্তি যাহাকে Immunity বলেন, তাহা উপযুক্ত খাদ্যের হইয়া যায় এবং ইহা নষ্ট হইলে সামান্য কারণেই শরীর জর্জ্জর হইয়া পড়ে, বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। কি পল্লী, কি সহর— একই রকম অবস্থা। পূর্ব্বে দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি যে খাদ্য বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সেইগুলির অযোগ ঘটিতেছে। পল্লীগ্রামে পাওয়া যায় না, গরুর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। এখনও যাহা আছে, অধিকাংশই অস্থিচর্ম্মসার। সহরে সকল খাদ্য সুলভ হই-ভেজালমিশ্রিত। ফলে খাঁটী জিনিষ দুর্লভ হইয়া নানারূপ জটিল অর্থনৈতিক কারণে বাঙ্গালী আপনার জীবিকার্জ্জন করিয়া, অখাদ্য-কুখাদ্য উদর পূরণ করিতেছে। যাঁহারা সহর ও পরিচিত, তাঁহারা নিশ্চয়ই অধিকাংশ দেখিয়াছেন। খাদ্যের প্রকৃতি, খাদ্যের উপযোগের নিয়ম প্রভৃতি আহার্য্য প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি অল্প লোকেই পারে। দেখা যাইতেছে যে, কুখাদ্যের

প্রয়োগ, কুখাদ্যের অতিযোগ এবং অনিয়মিতরূপে আহার-গ্রহণ আমাদিগকে ক্রমে হীনবল করিয়া নূতন নূতন দুরারোগ্য ব্যাধিকে ডাকিয়া আনিতেছে। আমরা কিন্তু রোগবীজাণুর উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া অনুসন্ধানের নিষ্ফল সংগ্রাম করিতেছি।

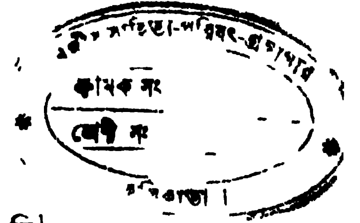
বিশেষ প্রয়োজনাভাব বশতঃ অন্যান্য অসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ-সংযোগের কথা লিখিত হইল না।

প্রজ্ঞাপরাধের মধ্যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব। বাক্যের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ মিথ্যাকথন প্রভৃতি নৈতিক দুর্ব্বলতা সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে কিরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পূর্ব্বে সরলপ্রকৃতির লোকে সম্পত্তির আদানপ্রদান প্রভৃতি কার্য্যেও কিরূপ সত্য ব্যবহার করিত, প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আইনের বেড়াজাল যেরূপ বাড়িতেছে, আদালত প্রভৃতির প্রচলন যত অধিক হইতেছে, দুর্নীতির স্রোত ততই প্রখর হইতেছে। মানসিক কর্ম্মের মিথ্যাযোগ লোভ, মোহ, ক্রোধাদি জনসাধারণের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের—হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রবল হইতেছে। স্বাস্থ্য-হানির সহিত এইগুলির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দৃষ্ট না হইলেও একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, ইহারা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রবল অন্তরায়। যেমন মোহ, ঈর্ষা প্রভৃতি মানসিক মিথ্যা-যোগবশতঃ কোন আগন্তুক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা অনেকস্থলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। দৈহিক কর্ম্মের অতিযোগ—সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম, বিশ্রামের অভাব প্রভৃতি যেরূপ অহিতকর, দৈহিক কর্ম্মের অযোগ, আলস্য, কর্ম্মবিমুখতা, ঔদাসিন্য প্রভৃতি তদ্রূপ স্বাস্থ্যহানিকর। বাঙ্গালী-ছাত্রসমাজে, এমন কি পল্লীর কৃষককুলের মধ্যেও শেষোক্ত পাপ অর্থাৎ উপযুক্ত শরীর চালনার অভাব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

দৈহিককর্ম্মের মিথ্যাযোগ অর্থাৎ পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান কত তীব্র ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে—তাহা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই জানেন।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার কুফল ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। দেশী ও বিলাতী প্রমেহ নিবারক বহুবিধ প্যাটেণ্ট ঔষধের অসম্ভব কাট্‌তি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কৈশোর না আরম্ভ হইতেই গর্হিত উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জীবনের সকল সুখশান্তি হইতে বঞ্চিত হইতে অনেককে দেখা যায়। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, বাঙ্গলার পল্লীগুলির মধ্যে জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত কোনপ্রকার রোগে আক্রান্ত নহে, এমন লোকের সংখ্যা অতি বিরল। এখন কেবল কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইতেছে এবং ব্রহ্মচর্য্য ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

(ক্রমশঃ)



আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের তালিকা

[ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, এম্-ডি, ডি এস্-সি]

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতে প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের যে অপরিসীম বিস্তার ছিল, এই তালিকা হইতে তাহার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। গত পাঁচ সাত শত বৎসর ধরিয়া ভারতের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সমধিক অবনতি হইয়াছে। বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের হস্তলিপি নষ্ট হইয়াছে, তথাচ এখনও যে বহু গ্রন্থ অজ্ঞাতভাবে রহিয়াছে, তাহার উদ্ধার করিলে আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধন করা যায়।

এই বর্ণানুক্রমিক তালিকায় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের নাম, বিষয় গ্রন্থকারের নাম এবং যে পুস্তকাগারে ঐগুলি রক্ষিত হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধের আবশ্যকমত কিছু কিছু বর্ণনা করাও হইয়াছে।

এই তালিকার জন্য দুই রকমের সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। দ্বিতীয়তঃ, যে যে পুস্তকাগারে পুঁথি সকল রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পুনশ্চ নানাস্থানে অনেক পণ্ডিতের গৃহে বহু পুঁথির সন্ধান করিয়া কতিপয় পণ্ডিত তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না, এই সকল হস্তলিপির তালিকার নামেও সঙ্কেত ব্যবহৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম ও তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(১) কায়চিকিৎসা (Practice of medicine) প্রাচীন সংহিতার্গুলি ইহার অন্তর্গত। [কা]

(২) শল্যতন্ত্র (Surgery) [শ]

(৩) কৌমার ভৃত্য তন্ত্র (Diseases of children) [কৌ,]

(৪) অগদতন্ত্র (Toxiology) [অ]

(৫) রসায়ন তন্ত্র (Hygiene) [র]

(৬) নিদানশাস্ত্র (Pathology) [নি]

(৭) দ্রব্যগুণ (Matrica medica and therapeuties) [দ্র]

(৮) রসগ্রন্থ (on minerals used in medicine [রস]

(৯) বাজীকরণ গ্রন্থ (on sexual invigaoration) [বা]

(১০) বৈদ্যককোষ (medical dictionary and glossary) [কো,]

(১১) পশু চিকিৎসা (veterinary science) [প]

বিভিন্ন পুস্তকাগারের নাম ও তাহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(১ মাদ্রাজের থিয়জফিক্যাল সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হস্তলিপির তালিকা ; ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। [অ১]

(২) অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা এ, বি কীথ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। [অই]

(৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বড্লিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ২ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রথমখণ্ড ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোর আউফ্রেক্ট দ্বারা সঙ্কলিত ; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এম্ বিন্তারনিৎস্ এবং এ, বি কীথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [অক্স ১, অক্স ২]

(৪) আলোয়ার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পি, পিটার্স ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত [আ]

(৫) লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা ; জে, এগেল্লিং কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহা সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। পঞ্চম খণ্ডে বৈদ্যকগ্রন্থের তালিকা আছে [ই ১] এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি পুঁথি এই তালিকা প্রস্তুত হইবার পর এই পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

(৬) কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ইহা মুদ্রিত হয় নাই। [ইম্প]

(৭) কলিকাতা এসিয়াটিক অফ্ বেঙ্গলের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ইহা তিন খণ্ডে ১৮৯৯—১৯০১ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত [এ১] এই তালিকা মুদ্রিত হইবার পর অনেকগুলি পুঁথি সঞ্চিত হইয়াছে। [এ২]

(৮) কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের পুস্তকাগারে রক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পুঁথির তালিকা [এ, গ,]

(৯) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১০ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ১০ম খণ্ডের ১ম অংশে বৈদ্যকগ্রন্থের তালিকা আছে। [ক সং]

(১০) কাশীর সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৯১১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত [কা ২] ; এতদ্ভিন্ন ১৮৯৭ হইতে ১৯১৮-১৯ পর্য্যন্ত ২৩ খণ্ডে ঐ পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা প্রতি বৎসর মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তালিকা মুদ্রণের পর এই শেষোক্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইবে [কা ১]

(১১) কাশ্মীরপ্রদেশে রঘুনাথ মন্দিরে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এম্, এ ষ্টীন্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। [কা, র]

(১২) কোপেনহেগেনে রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা—এন্, এল্, বেস্তার গার্দ কর্ত্তৃক সম্পাদিত [কো]।

(১৩) গেতিংগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। এফ, কীলহর্ণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত [গে]।

(১৪) আরায় জৈন সিদ্ধান্ত ভবনে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা [জৈ]।

(১৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা—অমুদ্রিত। [ঢাকা]।

(১৬) তাঞ্জোর রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে। [তা]।

(১৭) তুবিঙ্গান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। ১৮৬৬ এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দুইখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। [তু]।

(১৮) ত্রিবেন্দ্রাম রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [ত্রি]।

(১৯) নেপালের দরবার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। তিন ভাগে মুদ্রিত—১ম ভাগ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা সঙ্কলিত ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই সঙ্কলিত নোটিসেস্ অফ স্যাংস্কৃট ম্যানুস্ক্রিপ্টস্, ২য় সংখ্যার ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত; তৃতীয় ভাগ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বারাই সঙ্কলিত। [নে ১, নে ২, নে ৩]।

(২০) কাবার্ত দ্বারা সঙ্কলিত প্যারিসের জাতীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা; ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ [পা]।

(২১) পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। এই তালিকা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব মঞ্জুষার ১ম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। [পুরী]।

(২২) পুনার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। চারিটী তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে ১ম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দুই খণ্ডে এফ, কীলহর্ণ এবং আর্ জি, ভাণ্ডারকার দ্বারা সঙ্কলিত। ২য়, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এস, আর, ভাণ্ডরেকার দ্বারা সঙ্কলিত। ৩য় বেদ সম্বন্ধীয় পুঁথি; ৪র্থ, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। [পুনা]।

(২৩) উত্তরপশ্চিম প্রদেশের প্রভিন্সিয়াল মিউজিয়মের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। [প্র]।

(২৪) বরোদার সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বৈদ্যক পুঁথির তালিকা। মুদ্রিত হয় নাই। [ব]।

(২৫) বর্লিন সহরে পাণ্ডুলিপির আগারে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুথির তালিকা [বল্]।

(২৬) বার্লিন সহরে রাজকীয় পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা, তিন খণ্ডে মুদ্রিত [বা ১, বা ২]।

(২৭) বিকানীর মহারাজের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত [বিকা]।

(২৮) বিশপ কলেজের পুস্তকাগারে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা; ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা সঙ্কলিত। [বিশ]।

(২৯) বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। [বৃ]।

(৩০) বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাই শাখার পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ১ম খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে [বো]।

(৩১) জেসেলমীর ভাণ্ডারে রক্ষিত পুথির তালিকা। [ভা]।

(৩২) ভাউদাজি মেমোরিয়ালে রক্ষিত পুঁথির তালিকা [ভাউ]।

(৩৩) ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুথির তালিকা [ভি]।

(৩৪) মহীশূর রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা [মহী]।

(৩৫) মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ম্যানুস্ক্রিপ্টস্ লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুথির তালিকা, ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত, ২৩শ খণ্ডে বৈদ্যক গ্রন্থের তালিকা আছে। [মা]।

(৩৬) মিউনিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা। ২ খণ্ডে মুদ্রিত [মি]।

(৩৭) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা [র]।

(৩৮) লিপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [লি]।

(৩৯) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [লু]।

(৪০) রাজসাহীর বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা, মুদ্রিত হয় নাই। [বরে]।

(৪১) বোলপুর, শান্তিনিকেতনের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [শা]।

(৪২) কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। [সং]।

(৪৩) কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। [সা]।

(৪৪) সিংহল দ্বীপের গবর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃতাদি পুঁথির তালিকা। [সিং]।

(৪৫) বাওয়ার পুঁথি এ, এফ রডলফ হির্ণলি দ্বারা সঙ্কলিত। [বা]

শিশুপরিচর্য্যা

(শ্রীসুশীলকুমার সেন শর্ম্মা, বি, এস, সি,)

বাঙ্গালীর আশা যাহারা, বার্দ্ধক্যে বাঙ্গালী ভরসা যাহারা, ভবিষ্যতের দীপশিখা যাহারা, সেই শিশুগণ আজ প্রতিদিন কালের করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। অকালে নির্ম্মল সুকুমার শিশুর বক্ষের উপর চিতাগ্নি জলিয়া উঠিতেছে। ঘরে ঘরে পুত্রহারা-জননীর হৃদয়ভেদী ক্রন্দনধ্বনি, পুত্রহীন পিতার বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। অথচ কেহই প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করেন বলিয়া মনে হয় না। দেশ শ্মশান হইতে চলিল, "কি করিব? ঈশ্বরের ইচ্ছা।" অকালে কত শিশু অনাঘ্রাত কুসুমের মত সংসার হইতে চিরবিদায় লইল; বাঙ্গালী কি করিবে, উপায় নাই সকলই যে ঈশ্বরের ইচ্ছা! এই অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কল্পনা করিলেও মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

বাঙ্গালী পারে না কি? বক্তৃতা? বাঙ্গালীর সমকক্ষ কোন্ দেশে কতজন আছে? অভিনয়? এ বিষয়েও বাঙ্গালী অতুলনীয়। কার্য্যকারিতা? তাহাতেই বা বাঙ্গলার যোগ্য সন্তানেরা পশ্চাদপদ কই? বোধ হয় অনেক পাঠকেরই marchant officeএ প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটিয়াছে তথায় দেখিবেন বাঙ্গালীর অসীম অধ্যবসায়, অতুল কার্য্যদক্ষতা। বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে দিস্তা দিস্তা কাগজের উপর খসড়া করিয়া বস্তা করিয়া ফেলিতেছেন; তবে বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের অভাব কোথায়? ব্যবসা! বাঙ্গালীর মত কোন দেশে কোন জাতি স্বজাতির গলায় ছুরী চালাইয়া ব্যবসা করিতে পারে। বিদ্যা? প্রতিবৎসরই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ভ হইতে যে সংখ্যক Graduate প্রসবিত হয়, তাহা হইতেই অনুমিত হয় যে, বাঙ্গালী কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে।

বিনয়? এ বিষয়ে বাঙ্গালী অদ্বিতীয়। পৃথিবীর বুকে বাঙ্গালীর মত বিদেশীর অপমান সহ্য করিয়া আর কোন জাতি কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিতে পারে কি? দৈহিক বল? থাক সে কথা নাই বা বলিলাম। তবে বলিতে চাহিতেছি এই যে, বাঙ্গালীর নাই কি? বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, অধ্যবসায় যাহা কিছু মানব জীবনের প্রয়োজনীয় তাহার সবই আছে, তবে নাই কেবল স্বজন শাসন, নাই কেবল নিজেকে মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে এই শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে অনাহারে মরিতে হইত না।

স্বজন শাসন যদি বাঙ্গালীর থাকিত, তাহা হইলে অকালে শত সহস্র শিশুকে অগ্নির লেলিহান জিহ্বায় আহুতি দিতে হইত না।

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর যেরূপ শিশু মৃত্যুর আধিক্য হইতেছে, তাহাতে হয় তো বাঙ্গালীর নামই শতাব্দী পরে লুপ্ত হইবে।

অতএব প্রত্যেক বাঙ্গালীরই শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক বাঙ্গালী জননীরও শিশুপালন সম্বন্ধে যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ কি?

এ বিষয়ে ভারতের চিকিৎসক চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী তাহার সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য চিকিৎসা নামক পুস্তিকায় যাহা বলিয়াছেন—তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"শিশুপালন ও চিকিৎসা সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে। মাতার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকিলে ও মাতার শরীর নীরোগ হইলে শিশু প্রায়ই রুগ্ন হয় না—এবং উহার শরীর স্বতঃই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই দরিদ্র লোকের শিশুরা বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু হয়।

"স্তন দুগ্ধের অভাবে শিশুর লালনপালন করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত দাঁত না উঠে, কেবল গো-দুগ্ধ বা বার্লি-এরারুট মিশ্রিত গো-দুগ্ধ শিশুকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ঐরূপ আহার দিলে শিশুর প্রায়ই উদরাময়, জ্বর, অস্থি শোথ (Rickets) এবং শিশুযকৃত (Infantile liver) প্রভৃতি রোগ জন্মে। উহার উপর ম্যালেরিয়ার সংযোগ হইলে আরও ভয়ানক কথা।

স্তনদুগ্ধের অভাবে স্তনদুগ্ধের অনুকরণে প্রস্তুত কোন ডাক্তারী ফুড বা খাদ্য (যথা Glaxo, Mellens food প্রভৃতি) শিশুর বয়ঃক্রম অনুসারে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত দুগ্ধও শিশুর পক্ষে সুপথ্য। উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সমান ভাগ জল মিশাইয়া এক বলকা মাত্র ফুটাইয়া নামাইয়া লইয়া পান করাইবার সময় ঐ দুগ্ধের সহিত (এক ছটাক ১/২ তোলা) মধু মিশাইয়া পান করাইবে। মধু মিশ্রিত দুগ্ধ কদাচ গরম করিবেন না। যদি শিশুর সর্দ্দি হয়, তবে দুগ্ধ প্রস্তুতকালে তাহাতে একটী ছোট পিপুল বা শুঁঠ দিয়া সিদ্ধ করিবে।

দুগ্ধ সেবনের সময়:—

শিশুকে নিতান্ত শীঘ্র শীঘ্র দুগ্ধ পান করাইবেন না। প্রথম ৩।৪ মাসের শিশুকে দিনে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে ৩ বার মাত্র দুগ্ধ পান করাইলেই যথেষ্ট।

৩।৪ মাসের শিশুকে দিনে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিবে। রাত্রি ৯টার পর দুগ্ধ না দেওয়াই ভাল। অনেকেই শিশু কাঁদিলে দুগ্ধপান করাইতে চাহেন কিন্তু ঐরূপ কদাচ করিবে না। শিশু অনেক সময়ে পিপাসায় কাঁদিতে থাকে, সেজন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে শীতল জলপান করান কর্ত্তব্য। শিশু আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে দুগ্ধপান না করানই ভাল।

Feeding bottle এ শিশুকে দুগ্ধপান করান অনিষ্টজনক। অতএব Feeding bottle এ দুগ্ধপান না করাইয়া চিরপ্রচলিত ঝিনুক বা চামচে দ্বারা দুগ্ধপান করানই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

শিশুর শয্যা ও গাত্রবস্ত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাও উহার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। শীত ও বর্ষাকালে শিশুর যাহাতে সহসা ঠাণ্ডা না লাগে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে।"

শিশুকে সর্ব্বদা মশারীর মধ্যে শয়ন করান কর্ত্তব্য। আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনী গৃহিণীরা শিশুকে প্রসব করিয়াই কোন ধাত্রী বা ঝির—নিকট তাহাকে পালন করিতে দিয়া নিজেরা সন্তান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়েন। হয়তো ঐ কারণেই অনেক জননীকে পুত্রহারা হইতে হয়।

জননীর কার্য্য কোন ধাত্রী বা ঝি'র দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কতটুকু সম্ভবপর—পাঠকগণের উপরই—তাহার বিবেচনা দেওয়া যাইতেছে। সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জননীর দায়িত্ব কতখানি, প্রত্যেক—স্বামীরই তাঁহার স্ত্রীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। বিদেশী সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে শিশুপালন করিবার জন্য আয়া বা ধাত্রীর প্রয়োজন হইত না—তখনকার ইতিহাস অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর এত আধিক্য ছিল না তখন আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবান্, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী শিশু জন্মগ্রহণ করিত। অতএব ইহা বেশ বুঝা যায়, অকালে শত সহস্র শিশুর পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাওয়ার জন্য দায়ী তাহাদেরই পিতা-মাতা, অন্য কেহ নহে।

পুনর্ণবা

(শ্রীভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ)

আজকাল কলিকাতা সহরে বেরিবেরি রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে আমাদের আলোচ্য পুনর্ণবা প্রবন্ধ সময়োপযোগী হইবে বলিয়া এসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

পুনর্ণবা দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্ত। উভয় প্রকার পুনর্ণবাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। বেরিবেরি বা শোথ রোগে শ্বেত পুনর্ণবাই ব্যবহার করা উচিত, এই শ্বেত পুনর্ণবার একটি নামই হইল শোথঘ্নী।

শ্বেত পুনর্ণবার পাতাগুলি কোমল ও মাংসল এবং এক একটি পাতা প্রায় এক একখানি চাকার মত। ইহার সাদা সাদা ফুল হইয়া থাকে। ইহার পাতা, ডাঁটা এবং ফুল—সবই লাল।

শুধু যে শোথ রোগেই পুনর্ণবা ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে বৈদ্যক শাস্ত্রে পুনর্ণবা দ্বারা নানাপ্রকার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে—লিখিত আছে। নিম্নে আমরা উহার পরিচয় দিতেছি :—

কুষ্ঠরোগে। দধির সরের সহিত পুনর্ণবার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। **জ্বরে পুনর্ণবা**। ক্ষীরপাকের বিধানানুসারে পুনর্ণবার কাথ সর্ব্ববিধ জ্বর নাশক। **রসায়নার্থ**। শ্বেত পুনর্ণবা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক এক বৎসরকাল সেবন করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও যুবার মত বিক্রমশালী হইয়া থাকে। **আমবাতে**। আমবাতগ্রস্ত রোগী প্রতিদিন পুনর্ণবার শাক খাইলে ঐ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। **বাতব্যাধিতে**।—শ্বেত পুনর্ণবার সহিত তৈল সিদ্ধ করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে বাত ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। **দুই দিন অন্তর পালাজ্বরে**।—শ্বেত পুনর্ণবার মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া কিম্বা পানের সহিত চিবাইয়া সেবন করিলে দুইদিন অন্তর পালাজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। **মদ্যপান জনিত ওজো ধাতুক্ষয় হইলে**।—শ্বেত পুনর্ণবার সহিত ঘৃত পাক করিয়া নিয়মিত সেবন করিলে অতিরিক্ত মদ্যপান জনিত যাহাদের ওজোধাতু ক্ষয় হইয়া দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকেন। **কুকুর আদির বিষে**।—ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইলে শ্বেত পুনর্ণবার মূল ও ধুতুরার বীজ একত্র মিশাইয়া সেবনে উপকার হয়। **ইঁদুরের বিষে**।—কাহাকেও ইঁদুরে কামড়াইলে ঐ বিষ নষ্টের জন্য মধুর সহিত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। **অশ্মরী রোগে**। ক্ষীরপাকের বিধানমতে পুনর্ণবার কাথ সেবন করিলে অশ্মরী রোগ আরোগ্য হয়।

পুনর্ণবার অতগুলি রোগ আরোগ্যের শক্তি নিহিত থাকিলেও সাধারণতঃ ইহা শোথ রোগেই ব্যবহৃত হয়। এবং শোথ রোগে পুনর্ণবার কাথ কিম্বা পুনর্ণবার মূলের কল্ক ও আদা একত্র সেবন, পুনর্ণবাষ্টক পাচন সেবন এবং ঔষধের সহিত পুনর্ণবার রস সেবনের সাধারণতঃ ব্যবস্থা করা হয়। এখনকার বেরিবেরির সময় সুস্থ শরীরেও পুনর্ণবার শাক ভাজিয়া খাওয়া উচিত। বর্দ্ধমান-হুগলী প্রভৃতি রাঢ় জেলায় এখন পর্য্যন্ত অন্যান্য শাকের মতন পুনর্ণবার শাকও ভাজিয়া খাওয়ার প্রথা আছে। সকল দেশেই বিশেষত: এসময় কলিকাতা সহরে সকলেরই ইহা খাইবার ব্যবস্থা করা উচিত।

বেরিবেরি রোগে শুধু ইহা সেবন নহে, ইহার প্রলেপেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগকে যদি ইহা সপ্তাহে ২ দিন করিয়া সেবন করান যায়, তাহা হইলে কৃমি রোগের হস্ত হইতে তাহারা অব্যাহত থাকিতে পারে। শিশুদিগকে মধ্যে মধ্যে ইহা সেবন করাইলে তাহাদিগের বিরেচনের কার্য্যও ইহা দ্বারা সাধিত হয়, কারণ ইহা স্বভাবতঃ মৃদু ও বিরেচক। বুকে শ্লেষ্মা বসিলে পুনর্ণবার শাক ভাজিয়া খাইলে উহা সহজে নিঃসারিত হইয়া থাকে। শ্বাসপীড়িত ব্যক্তিও ইহা সেবনে শ্বাসের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

শ্বেত পুনর্ণবার গুণ পরিচয়ে অবগত হওয়া যায়, —পাণ্ডু, শোথ, বায়ুবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাধিক্য, ব্রণ, উদররোগ, কাস, হৃদ্রোগ, অর্শ ও শূল—প্রভৃতি ইহা সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে। রক্ত পুনর্ণবার গুণ পরিচয়ে অবগত হওয়া যায়, ইহা কফ ও রক্তপিত্ত নিবারক। উভয় প্রকার পুনর্ণবার সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা স্বরস ১ হইতে ২ তোলা, কাথ ৫ হইতে ১০ তোলা, মূলের কল্ক ৪ হইতে আট আনা।

পরলোকে কয়েকজন কবিরাজ

"একে একে নিবিছে সকলি"! আয়ুর্ব্বেদের একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্তকর্ম্মী, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, দানবীর কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায় মহাশয়ের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই আবার কয়েক জন প্রসিদ্ধ কবিরাজের বিয়োগে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমাদিগকে এই অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্যথা প্রদান করিয়াছেন, স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমচন্দ্র সেন। কয়েকমাস হইতে ইনি বেরি-বেরি রোগে ভুগিতেছিলেন। পিতার সকল গুণেরই ইনি অধিকারী হইয়াছিলেন। সরল ও অমায়িক ব্যবহারে ইনি সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন, ইঁহার কেহ শত্রু ছিল কিনা আমরা জানি না। এক কথায় ইঁহাকে বিশ্ববন্ধু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পরলোক গমন ঘটিয়াছে, মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৬ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ইনিও একজন কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। কলিকাতা-আয়ুর্ব্বেদ সভাটি ইঁহারই চেষ্টায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে কবিরাজ হেমচন্দ্রের ধ্যান-ধারণা ছিল—আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি সাধন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতিকল্পে যে অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, কবিরাজ হেমচন্দ্র ছিলেন তাহার মধ্যে একজন বিশেষ উদ্যোগী। আয়ুর্ব্বেদের কোন উন্নতিকর প্রস্তাব শুনিলে হেমচন্দ্র যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন, এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই পাইতেন কিনা জানি না। মৃত্যুকালে তিনি পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ভিন্ন চারিটি পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তিনটি যোগ্য ভ্রাতা বর্ত্তমান। ইঁহাদের যেরূপ ভ্রাতৃসৌহৃদ্য ছিল, তাহাতে হেমচন্দ্রের চির আকাঙ্খিত আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতাগণ এখন হইতে আরও বেশী চেষ্টাশীল হইবেন—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীভগবান তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন এ দুর্দ্দিনে আমাদের ইহা ভিন্ন আর বলিবার কিছু নাই।

(২)

ইহার পরে আর একটি পরমবন্ধু কবিরাজের বিয়োগ সংবাদ আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইতেছে। ইঁহার নাম কবিরাজ অনুকূল চন্দ্র বিশারদ। ইঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জেলার রাণাঘাট-আড়ুলিয়ায়। ইঁহার কর্ম্মস্থান ছিল ২নং হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে। ইনি "জারনাল অব আয়ুর্ব্বেদ" ও "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড" পত্রিকা দুইখানির পরিচালক ছিলেন। কিছুকাল "বেঙ্গলী" এবং "পাওয়ার এণ্ড গার্জ্জেন" নামক পত্রিকা দুইখানিরও ইনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রেকর্ড' চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজের প্রতিভায় ইনি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৯। গত ২৮শে নভেম্বর ইনি ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার অভাবও আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

(৩)

আর একজন কবিরাজের বিয়োগ সংবাদও আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইতেছে। ইঁহার নাম দুর্গাদাস ভট্ট এম এ। ইনি আগে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, শেষে স্বনামধন্য স্বর্গীয় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার ব্যবসায়ও সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল।

(৪)

আরও কলিকাতার একজন প্রবীন কবিরাজের বিয়োগ সংবাদ আমরা সর্ব্বশেষে পাইলাম। ইঁহার নাম হরি নারায়ণ সেন। শোভাবাজারে ইঁহার চিকিৎসালয় ছিল। ইঁহার ব্যবসায়ও বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

সাময়িকী

মাদক নিবারণী সভা।—সেদিন সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রযত্নে তাঁহারই বাটীতে মাদক নিবারণী সভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্বদেশের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই সদনুষ্ঠানে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

পরীক্ষার ফল।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এবার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১ম বিভাগ—শ্রীমান সুখদাচরণ ভট্টাচার্য্য। ২য় বিভাগ—(গুণানুসারে) শ্রীমান যামিনী কুমার রায়। বৈকুণ্ঠ নাথ বড়ুয়া, সুধীর চন্দ্র সেন শর্ম্মা, (খ), ক্ষিতীশ চন্দ্র

রায়, রবীন্দ্র নাথ পাণ্ডে, ডব্লিউ, টি, গুণতিলক, সুধীর চন্দ্র সেন গুপ্ত (ক), এস, সি, ডব্লিউ শ্রীবর্দ্ধন, সরোজ কুমার মহলানবিশ, ক্ষীরোদ মোহন রায়, নৃপেন্দ্র নারায়ণ সেন গুপ্ত। উল্লিখিত ছাত্রগণ ভিন্ন আরও কয়েকটি ছাত্র supplimentery পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের ফল আগামী বারে প্রকাশ করা হইবে।

স্বাস্থ্য সমিতি।—কলিকাতা স্বাস্থ্য সমিতির ২নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ১নং ওয়ার্ডেও শীঘ্র খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ১নং ওয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে আটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু, উকীল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়গণ সাধারণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণে যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা যে সাধারণের ধন্যবাদার্হ—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—পরলোকগত কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্য গত ২৫শে অগ্রহায়ণ এই সভা হইতে এক শোকসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য।—মিস লুইস্ ক্লার্ক আমেরিকা নিবাসিনী শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং সমগ্র আমেরিকার মধ্যে স্বাস্থ্যবতী। তিনি সংপ্রতি আমেরিকার "Eave ing Journal" এ কি উপায়ে মানুষ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যলাভ করিতে পারে—ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয়ের মুখ্য কথা—Deep Breatning স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ব্যায়াম চর্চ্চা অপেক্ষা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বিষয়ে অবহিত হইলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া জানালার ধারে মুক্ত আলোক ও বাতাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ Deep Breathing Exercise করিলে দেহ ও মনে চমৎকার একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সঞ্জীবতার ভাব যে উপস্থিত হইয়া থাকে—তাহাই আমাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির প্রধান উপায়। তিনি এই প্রসঙ্গে সন্তরণ এবং পদব্রজে ভ্রমণের উপকারিতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ এ সকল কথা বহুকাল পূর্ব্বে আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা তো সে সকল উপদেশ পালন করি না,—আমাদের স্বাস্থ্যের দুর্গতিও না ইহারই জন্য। এখন এই আমেরিকাবাসিনী-মহিলার উপদেশে যদি সকলে আবার পূর্ব্ব ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনেন, এই আশায় তাঁহার কথা তুলিয়া দিলাম।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্ণেল বার্ণাডো।—গত ২২শে অগ্রহায়ণ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সংযম যে স্বাস্থ্যোন্নতির মূলসূত্র—এ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম,—"সমস্ত শিশুর শরীরে যক্ষারোগের জীবাণু বিদ্য ান থাকায় তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যদি ইহা বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আনীত সকল শিশুর শরীরেই এই জীবাণু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ হইল—সহরের ঘন বসতি এবং সভ্যতার বিস্তার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায় ব্যায়ামচর্চ্চা। অধিক খাদ্য খাইলেও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। প্রাণায়াম যোগ স্বাস্থ্যোন্নতির সর্ব্ব প্রধান উপায়। ইহার ফলে ফুসফুস পরিষ্কৃত হয় এবং কোনরূপ ফুসফুসের পীড়া হইতে পারে না।" এই প্রাণায়ামের উপকারিতা বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য ঋষি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এখন কর্ণেল বার্ণাডোর কথায় ছাত্রেরা যদি প্রাণায়ামে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে আবার যে দেশের মঙ্গল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দীর্ঘজীবির মৃত্যু।—সংপ্রতি হাওড়া জেলার আমতার নিকট পুরাণ গ্রামের ডাক্তার খোদাবক্স পালোয়ান ১২০ বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর ১ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিদিন স্নান করিবার সময় সাঁতার দিতেন ও ১ সপ্তাহ আগেও স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া বেড়াইতেন। মৃত্যুর দিনও প্রাতঃকালে নাপিত ডাকাইয়া তিনি চুল কাটিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর একঘণ্টা আগেও সজ্ঞানে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

পদব্রজে ভারত ভ্রমণ।—শ্রীমান দীনেশ বর্ম্মণ, অবনী দাশ গুপ্ত ও পরেশ দত্ত নামক তিনটি যুবক পদব্রজে ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সংপ্রতি কাশীধাম হইতে তাঁহারা পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রিটিশ স্বাস্থ্য সমিতি।—বিটিশ হাইজিন কাউন্সিলের ডেলিগেটগণ সংপ্রতি কলিকাতায় আসিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তৃতার সার মর্ম্ম:—"কি ভাবে জীবন প্রবাহ সংযত ভাবে পরিচালিত করা যায়, সেইরূপ শিক্ষা বালকবালিকাদিগকে প্রদান করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত দোষগুণের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই বিষয়ের শিক্ষা দিবার জন্য পিতা মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকগণের এক যোগে কার্য্য করা উচিত। এরূপ শিক্ষা প্রাথমিক জীবনে তাহাদের মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহারা স্বাভাবিক ইচ্ছা বৃত্তিকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিবে এবং শান্ত ও সংযত হইয়া স্বাস্থ্য সম্পদ লাভের অধিকারী হইবে।"

Printed and Published by the Sub-Editor Sj. Bhupal Chandra Bhattacherjee B. A

204, Cornwallis Street, Calcutta

Regd. No. C—1537.

৯ম বর্ষ। মাঘ ১৩৩৩।

৩য় সংখ্যা। January 1927.

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"



JOURNAL OF HEALTH AND INDIAN MEDICINES.

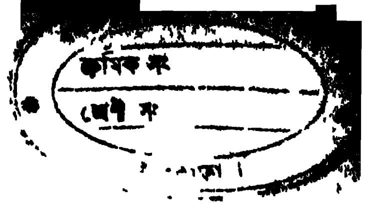
সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন।

সহঃ সম্পাদক [illegible] কবিরাজ [illegible] সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী—কলিকাতা বুক ডিপো লিমিটেড।



মাঘের সূচী।



আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ } মাঘ, ১৩৩৩ } ৩য় সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদ ও গবর্ণমেণ্ট

গবর্ণমেণ্ট আমাদের আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদের উপর অনেক সময় দোষ চাপাইয়া থাকি, কিন্তু ইহা গবর্ণমেণ্টের দোষ কি আমাদের দোষ—সে বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদের জন্য কিছু করুন আর নাই করুন, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই,—কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং চতুষ্পাঠীগুলিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চেষ্টাশীল, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাই হইল তাহার মূলসূত্র। এখন বাঙ্গলা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদের কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষাতেই আয়ুর্ব্বেদের সংহিতা এবং অন্যান্য গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থ আবার এরূপভাবে প্রণীত যে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে হইলে শুধু স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার কথা নহে, ন্যায় এবং দর্শন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যও আবশ্যক হইয়া থাকে। চরকের সূত্র ও বিমানস্থানে জ্ঞান অর্জ্জন[illegible] হইলে তৎপূর্ব্বে রীতিমত দর্শন-শাস্ত্রে জ্ঞান[illegible] আবশ্যক।

যাহা হউক আমাদের রাজার জাতি—ইংরাজ [illegible] আপন চিকিৎসার উন্নতিকল্পে মনোযোগ [illegible] করিলেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারকল্পে যখন সাহায্য করিলেন, তখন আমরা কিন্তু তাহাতে বিশেষ [illegible] প্রদর্শন করিলাম না। আমাদের লক্ষ্য [illegible] চাকুরির উপর। দেশে তখন ভারতবাসী—[illegible] বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকের ভাগ্যে বড় বড় চা[illegible] ঘটিয়াছে। তাহা দেখিয়া অন্যান্য জাতির [illegible] চিকিৎসকের জাতি—বৈদ্য সন্তানও মনে করিতে[illegible] লেখাপড়া শিখিবার উদ্দেশ্য চাকুরি করা। [illegible] আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, ইহারই ফলে সংস্কৃত শিক্ষা লোপ পাইতে বসিল। আয়ুর্ব্বেদের [illegible] কারণগুলির মধ্যে ইহাই যে সর্ব্বপ্রথম—তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

স্বীকার করি, মহাত্মা গঙ্গাধর এবং তাঁহার[illegible]

অনেকজন কবিরাজ ন্যায় ও দর্শনাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, অধিকাংশ কবিরাজই তাঁহাদের পন্থানুসরণ পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য—সে কথা আদৌ মনে করেন নাই, অধিক কি চারবিধ দেশের বাঙ্গালী যখন মুহ্যমান, তখন দেশের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, বৈদ্যের ঘরে যে সন্তানটি মূর্খ হইত, তাহাকেই দেওয়া হইত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে। সে শিক্ষার ফল কিরূপ অশুভপ্রদ হইতে পারে, তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন

চিকিৎসার সাফল্য লাভ করিতে হইলে, কায়চিকিৎসার সঙ্গে শস্ত্র-চিকিৎসারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের যুগে প্রকৃত এই শস্ত্রচিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছিল। আমাদের সুশ্রুত সংহিতায় শস্ত্র চিকিৎসার সকল কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং মহাত্মা গঙ্গাধর এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কৃতবিদ্য চিকিৎসকেরা সুশ্রুত সংহিতায় লিখিত শস্ত্র চিকিৎসা অবগত ছিলেন শুধু এ কথা বলিলে চলিবে না, প্রকৃতপক্ষে তখন যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের নিকট হইতে শস্ত্র-চিকিৎসা লোপ পাইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু লোপ পাওয়া নহে, এক সময়ে—ঋষিযুগে যে শস্ত্রসাধ্যকার্য্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরাই কৃতিত্ব দেখাইতেন, মহাত্মা গঙ্গাধরের সময়ে সেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ—এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগকে "মড়াকাটা, ডাক্তার" বলিয়া ঘৃণা পর্য্যন্ত করিতেন। বৈদ্যবংশাবতংস ৺মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় যে দিন মেডিকেল কলেজে শবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সে দিন ইহারই ফলে গবর্ণমেণ্ট হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল।

যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে আমরা যে কোন সাহায্য পাই নাই—তাহার জন্য আমাদের নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা চিন্তা করিলে গবর্ণমেণ্টকে দোষী করিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদে শস্ত্রকর্ম্মের সকলি আছে—ইহা না বলিয়া যদি আমরা সে কথার সার্থকতা দেখাইতে সমর্থ হইতাম, এক কথায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সকল বিষয়েই যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যলাভ করিতে পারিতাম এবং তাহার পর গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সাহায্য চাহিয়া যদি আমরা বিফল মনোরথ হইতাম, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি অবিচার করিতেছেন,—কেবলমাত্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসার সাহায্য করিয়া তাঁহারা পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন। কিন্তু আমরা যাহা নহি, তাহার জন্য অন্যায় দাবী করিলে চলিবে কেন? আমাদের মধ্যে যে সহস্র দোষ, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি কি?

বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে একটা নব জাগরণের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় চিকিৎসাবিদ চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় কায়চিকিৎসা ও শস্ত্র চিকিৎসার সমন্বয়ে শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজেও সৃষ্টি হইয়াছে এখন আর গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য নিশ্চিন্ত নহেন। বিহার-পাটনায় গবর্ণমেণ্ট হইতে আয়ুর্ব্বেদ স্কুলের প্রতিষ্ঠান ইহারই ফলসম্ভূত। হরিদ্বারের গুরুকুল ও ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় দুইটিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য করা হইতেছে। নানাস্থানের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ আয়ুর্ব্বেদের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেছেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এখনও সেরূপ কিছু না করিলেও কিছুকাল পূর্ব্বে কয়েকজন বাঙ্গালী চিকিৎসককে লইয়া একটি কমিটি গঠন পূর্ব্বক অনুসন্ধান দ্বারা এ বিষয়ের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট হইতেও যে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হইতে পারিবে—এরূপ আশা করা যায়। ফল কথা, আমরা যখন ঘুমাইতে ছিলাম, আমাদের গবর্ণমেণ্টও তখন আমাদের সম্বন্ধে

নিশ্চিন্ত ছিলেন, এখন আমরা যখন জাগিয়াছি, তখন গবর্ণমেণ্টও যে আমাদের জন্য সচেষ্ট হইবেন—তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদের এখন কর্ত্তব্য একদিন আয়ুর্ব্বেদ যে চিকিৎসার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়ে বিশ্বসংসার বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন—যে চিকিৎসার গুণপরিচয়ে সমগ্র জগত বিস্মিত হইয়াছিল, যে চিকিৎসার অপূর্ব্ব শক্তি অন্য দেশবাসী লোলুপ দৃষ্টিতে গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, বিশেষ হেতু কারণ, ইতস্ততঃ সন্ধান চেষ্টা করিয়া, অন্যের নিকট শিক্ষিত হইবার সে আগ্রহ ত্যাগ করিয়া, স্বাধীন ভাবে পরীক্ষিত চিকিৎসকগণের দ্বারা অনধীন হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে চিকিৎসা। সাধনা লাভ করিতে চেষ্টা করি এইরূপ করিলে, গবর্ণমেণ্টও যে আমাদিগের জন্য চেষ্টাশীল হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার পূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইব—তাহা নিশ্চয়। দেশের লোকে এ সকল কথা ভাবিবেন কি?

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা।

(রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু সি, আই, ই ; আই, এস, ও ; এম, বি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শুশ্রূষার ব্যবস্থা।—বাটীর মধ্যে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে, যেরূপে তাহার শুশ্রূষা করিলে ঐ রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ বিষয়ের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধা, ক্লেশ, অর্থনাশ ও মনস্তাপ সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া থাকি।

সকল দেশেই রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার প্রধানতঃ রমণীদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতি স্বভাবতঃই ধীর, মধুর ও স্নেহপ্রবণ, শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। অবস্থাবৈগুণ্যে তাঁহাদিগকে পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর শারীরিক ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে দেখা যায়। রোগীর যিনি সেবা করিবেন, তাঁহার এই সকল গুণ থাকা বিশেষ আবশ্যক এবং সর্ব্বত্র রোগীর ভার রমণীদিগের হস্তে যে অর্পিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা একপ্রকার প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে।

ইউরোপে শুশ্রূষা শিক্ষা করিবার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। তথায় বহুসংখ্যক রমণী যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়া শুশ্রূষা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইহারা নার্শ (Nurse) নামে পরিচিত এবং ইহারাই সাধারণ চিকিৎসালয়ে (Hospital) এবং ভদ্রলোকের বাটীতে রোগীর সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের দ্বারা রোগীর সেবা করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তখন সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহেও পুরুষদিগের দ্বারাই সেবার কার্য্য সম্পন্ন হইত। এক্ষণে আমাদের দেশের বড় বড় সহরে, বিদেশী ও স্বদেশী, অনেক স্ত্রীলোক এই বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া নার্সের ব্যবসা করিতেছেন। কিন্তু অনেক সময়ে হিন্দু পরিবারের মধ্যে ইহাদিগের দ্বারা রোগীর সেবাকার্য্য সুবিধাজনক হয় না। নার্সের জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া অনেক স্থলেই গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাঁহাদের হস্তে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিতে অনেকেই (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা)

সমর্থ হন না। অপরন্তু ব্যয়বাহুল্যবশতঃ অধিকাংশ গৃহস্থ মাত্রেই রোগীর সেবার নিমিত্ত নার্স নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নার্সের নিয়োগ-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া এখনও বহু সময় সাপেক্ষ। যাঁহারা নার্স নিয়োগ করিতে সমর্থ, তাঁহাদিগের বাটীতেও দেখা যায় যে, নার্স নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ হৃদয়েরআবেগ বশতঃ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, নার্সকে বড় কিছু করিতে দেন না; সুতরাং যখন এখনও অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে রোগীর শুশ্রূষার ভার অর্পিত থাকিবে, তখন এ বিষয়ের প্রকৃত শিক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে বিস্তার লাভ করে, তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তির সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আরোগ্য হওয়া—সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা—এই উভয় ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, একের অভাব হইলে রোগ উপশমের সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। চিকিৎসক যদি সেবাকার্য্যে অভিজ্ঞব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, রোগী-চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং তিনি শীঘ্র তাঁহার চিকিৎসার সুফলের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এইজন্য বলিতেছি যে, যাহাতে শুশ্রূষা সম্বন্ধে প্রকৃতজ্ঞান বিস্তারিত ভাবে আমাদিগের সমাজে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত।

অনেক সময়ে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাবশতঃ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই অনভিজ্ঞতা হেতু কত আশাপ্রদ জীবনপ্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে, কত পরিবারের সুখ শান্তি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইলে যে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ আমরা সংক্রামক রোগের শুশ্রূষার সাধারণ ব্যবস্থা গুলির বিষয় আলোচনা করিব। পরে রোগবিশেষে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিব।

যে কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তির মেশামিশি যত কম হয়, ততই রোগের পরিব্যাপ্তির সম্ভাবনা অল্প হইয়া থাকে। একারণ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি হইতে যতদূর সম্ভব পৃথক করিয়া রাখা উচিত। এ বিষয়ে আমরা যথোচিত সাবধান হইনা বলিয়া অনেক সময় আমাদিকে গুরুতর বিপদ ভোগ করিতে হয়। রোগীর জন্য এরূপ একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যাহার মধ্যে পরিবারস্থ অপর কাহারও সর্ব্বদা যাইবার আবশ্যকতা হয় না। এই গৃহের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশের সুবিধা থাকা উচিত। যথোচিত বায়ু ও আলোকের অভাবে গৃহ সর্ব্বদা আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা; এরূপ গৃহে রোগী বাস করিলে, রোগ ও রোগের সংক্রামকতা দোষ, উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এবং রোগীর চিত্তও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। যদি বাসগৃহ দ্বিতল বা ত্রিতল হয়, তাহা হইলে রোগীর গৃহ সর্ব্বোচ্চ তলে অবস্থিত হওয়া শ্রেয়স্কর; গৃহটি এক পার্শ্বে ও সাধারণের গমনাগমনের পথ হইতে দূরে অবস্থিত হওয়া উচিত, কারণ ঐ গৃহের নিকট দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করিলে রোগীর বিশ্রামের যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, শুধু তাহা নহে, এতদ্বারা নানাকারণে ঐ রোগ সুস্থব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

রোগীর মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা তাহার গৃহের সন্নিকটে কোন স্থানে হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। যেস্থানে বাটীর অপর সকলে মলমূত্র ত্যাগের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তথায় রোগীর গমন করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অধিকাংশ সংক্রামক রোগে মলমূত্রের সহিত রোগোৎপাদক বীজাণু দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং

এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা পরিজনবর্গের মধ্যে পরিব্যাপ্তি সহজেই সংঘটিত হইয়া থাক। অতএব সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র স্থানে হওয়া আবশ্যক। ঐস্থানে স্বতন্ত্র পাত্র রাখিয়া মলমূত্র ত্যাগের পর উহার সহিত কোন বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া উহাকে বাটী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিলে রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষভাবে নিবারণ করা যাইতে পারে।

যে গৃহ রোগীর অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়, তন্মধ্যে গৃহসজ্জা যত কম থাকে, ততই রোগীর পক্ষে শুভ। রোগীর গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুস্থান (Air-space) থাকা আবশ্যক। গৃহসজ্জার পরিমাণ যত অধিক হইবে, গৃহের বায়ুস্থান ততই কমিয়া যাইবে। সুতরাং ইহা দ্বারা রোগ উপশমের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা রোগীর সেবাসুশ্রূষা করিবেন, তাঁহাদের আহার ও বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রোগীর গৃহের পার্শ্বে আর একটী ঘর থাকা আবশ্যক। অভাব পক্ষে রোগীর গৃহে রোগীর বিছানা ব্যতীত, যিনি তাঁহার সেবা করিবেন, তাঁহার শয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিছানার বন্দোবস্ত করা উচিত। যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রাত্রিকালে রোগীর সহিত তাঁহার এক বিছানায় শয়ন করা নিতান্ত দোষাবহ। মশার উপদ্রবের জন্য রাত্রিকালে মশারির মধ্যে শয়ন করিলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। অনেক স্থলে স্বামী হইতে স্ত্রীর অথবা স্ত্রী হইতে স্বামীর দেহে ক্ষয়কাস এইরূপে বিস্তারলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দুইটি বিছানা ব্যতীত ঔষধ ও পথ্যাদি রাখিবার জন্য একখানি চৌকি বা একটি টেবিল, একটি ফুলদানি, একখানি চেয়ার বা টুল, রোগীর বস্ত্র, তোয়ালিয়া, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি আলনা, একটি পিকদানি, একটি জলের কুঁজা ও গেলাস এবং একটি দড়ি উক্ত গৃহে রাখিবার আবশ্যকতা হয়। গৃহ বিস্তৃত হইলে তন্মধ্যে একখানি আরাম-চৌকি রাখা যাইতে পারে, যিনি রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন, প্রয়োজন মত তিনি উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ রোগীর গৃহে অপর কোনরূপ গৃহসজ্জার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং অনাবশ্যক গৃহসজ্জা যত শীঘ্র স্থানান্তরিত করা যায়, ততই রোগীর সত্বর আরোগ্যলাভের সুবিধা হইয়া থাকে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সংক্রামক রোগের বীজাণু, বস্ত্র বা শয্যাদির সহিত একবার সংলগ্ন হইলে, উহাকে সহজে দূরীকৃত করিতে পারা যায় না এবং এইরূপে বস্ত্র বা শয্যাদির সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটন করে। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি যতদূর সম্ভব, রোগীর গৃহ হইতে দূরে রাখিয়া দিবে। যদিও অনেক স্থলে আমাদিগের অর্থাভাব এবং বাসগৃহে যথোচিত স্থানের অসদ্ভাব হেতু এইরূপ অব্যবস্থা ঘটিতে দেখা যায়, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, ইহার সমস্ত অনিষ্ট কারিতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিলে, সকলেই যথাসাধ্য এ বিষয়ে সাবধান হইতে চেষ্টা করিবেন।

যিনি শুশ্রূষা করিবেন, রোগীর গৃহের বাহিরে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আলনা রাখা কর্ত্তব্য। যে বস্ত্র পরিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, তাহা লইয়া বাটীর অন্য কোন স্থানে গমন করা কদাচ উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়মের পালন সম্বন্ধে আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগীর সেবা করিতে করিতে অন্য কোন গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে যাওয়া তাঁহাদের সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। রন্ধন বা ভাণ্ডারগৃহে যোগাড় দিবার জন্য, পরিজনদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য, রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশোধক ঔষধ ও সাবান দ্বারা হস্তপদ ধৌত করিয়া এবং বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে অনেক বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,

তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার পালন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন না। এই অনবধানতা বশতঃ পরিবারস্থ একের অধিক লোকের কলেরা, টাইফয়েড জ্বর, হাম, রক্তামাশয় প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সংঘটিত হইয়া থাকে। অবশ্য রোগ সংক্রামক না হইলে, ইহা তত দোষের হয় না বটে, কিন্তু অনেক স্থলে রোগ সংক্রামক কিনা, তাহা প্রথম অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই সুকঠিন, এমন কি, চিকিৎসকেরাও এ বিষয়ে অনেক সময় নির্ণয় করিয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হন না। সুতরাং রোগীর স্পৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া বাটীর অন্যত্র না যাওয়াই সুবিবেচনার কার্য্য। ইহাতে অসুবিধা কিছুমাত্র নাই, অথচ ইহা পালন করিলে অনেক ভবিষ্যৎ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদিগের পরিবারস্থ রমণীরা প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রোগীর সেবা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদিগের নমস্যা। তাঁহাদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন শুশ্রূষা সম্বন্ধে এই সহজ নিয়মগুলি পালন করিয়া তাঁহাদের কার্য্য একেবারে নির্দ্দোষ করিতে যত্নবতী হয়েন।

রোগীর গৃহের বাহিরে তাহার মলমূত্র ত্যাগ করিবার পাত্র, জল, সাবান, বিশোধক ঔষধাদি সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। এই সকল দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষিত হইলে প্রয়োজনের সময় উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্য ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিবার আবশ্যকতা হয় না, সুতরাং রোগী বা যিনি তাহার সেবা করেন, কাহাকেও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

যাহাদের অবস্থা সচ্ছল নহে, যাহাদের বাটীতে দুই একটির অধিক ঘর নাই অথচ পরিজনবর্গের সংখ্যা অধিক, যাহাদের বাসগৃহে ও তাহার, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের অবস্থা স্বাস্থ্যকর নহে, এবং যাহাদের লোকবল কম, এরূপ পরিবারের মধ্যে সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে রোগীকে সাধারণ চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। আমাদের দেশের লোকের সাধারণ চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তদুপরি জাতিনাশ, শবব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রমমূলক আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সাধারণ চিকিৎসালয়ে গমন করিতে আপত্তি করিয়া থাকে। আজকাল সাধারণ চিকিসালয় সমূহে সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ সুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, সাধারণ লোকের বাটীতে তাহা ঘটিয়া উঠা একেবারেই সম্ভবপর নহে। যে একবার হস্‌পিটালে থাকিয়া আসিয়াছে, তাহার মুখে তথাকার প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা কখনই শুনা যায় না। যাহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানে না বা কিছু দেখে নাই, তাহাদিগেরই মুখে হস্‌পিটালের নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের গরীবদেশে যত অধিক লোক হস্‌পিটালে যাইয়া চিকিৎসা করাইবে, ততই অর্থব্যয় ও আরোগ্য উভয় বিষয়েই তাহারা সুফল লাভ করিবে এবং সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তিও সবিশেষ কমিয়া যাইবে। বোম্বাই সহরে যখন প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব, তখন তথাকার একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, প্লেগের সময় সাধারণ চিকিৎসালয় সমূহই প্লেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান। ইহা সাধারণ চিকিৎসালয় গুলির পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যাঁহারা শিক্ষিত এবং যাঁহাদের হস্‌পিটালের কার্য্য ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সাধারণ লোকের মনে হস্‌পিটাল সম্বন্ধে যে ভ্রান্তধারণা ও কুসংস্কার আছে, যদি তাহা অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকৃত উপকার সাধন করা হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, পরিবারস্থ অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের মেশামেশি না হইলেই ভাল হয়। একারণ যাঁহাদের শিশুসন্তান পালন করিতে হয়, তাঁহাদের উপর

রোগীর সেবার ভার ন্যস্ত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে।

দুই তিনজন লোকের উপর 'পালা' করিয়া রোগীর সেবার ভার অর্পণ করা উচিত। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ২ ঘণ্টার অধিক কালের জন্য সেবার ভার অর্পণ করা উচিত নহে। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্নেহাধিক্য বশতঃ ৩।৪ জন লোক একত্রে রোগীর কাছে দিবারাত্রি বসিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই শরীর শীঘ্র অপটু হইয়া পড়ে এবং এরূপ ব্যবস্থায় আমরা ইঁহাদিগের নিকট হইতে পূর্ণ মাত্রায় সেবার ফল প্রাপ্ত হইনা। 'পালা' করিয়া কার্য্য করিলে অল্প পরিশ্রমেই কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদ—অতীত ও বর্ত্তমান

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ কবিরত্ন)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

আয়ুর্ব্বেদের সেই একদিন আর আজ একদিন। অবস্থা চিরদিন কখনও সমান যায় না! উত্থান ও পতন লইয়া কালচক্র নিয়তই ঘুরিতেছে। যে আয়ুর্ব্বেদ একদিন উন্নতির চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, সেই আয়ুর্ব্বেদই ধীরে ধীরে অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হিন্দুরাজগণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু আয়ুর্ব্বেদ কেন, আর্য্যগণের যাহা কিছু ধর্ম্ম, রীতিনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান,—সকলই বিমলিন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে যবনরাজগণের প্রতাপ ও প্রভাব যেমন যেমন ভারতবর্ষকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল, তেমনি তেমনি রাজানুগৃহীত ধর্ম্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার, জ্ঞানবিজ্ঞান—সবই প্রাচীনের স্থান সকল অধিকার করিতে লাগিল। পরাজিতের স্বাতন্ত্র্য—বিজেতার নিকট কতদিন আত্মসংরক্ষণে সমর্থ থাকিতে পারে? দেখিতে দেখিতে সংস্কৃতভাষার স্থান—আরবী ও ফরাসী অধিকার করিল এবং আয়ুর্ব্বেদের স্থানে ইউনানী চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা হইল! হিন্দু-দেবমন্দির — মসজিদে এবং চতুষ্পাঠী—মক্তবে পরিণত হইল। রাজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহে কত হিন্দু—মুসলমান হইয়া গেল! এই সকল সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবে কত লোক স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরবৃত্তি অবলম্বন করিল! তাহার ফলে পূর্ব্বপুরুষগণের পরমযত্নে রক্ষিত গ্রন্থসকল পঠন-পাঠনার অভাবে কীটাদির আবাসে পরিণত হইল! এইরূপে কত শত গ্রন্থ যে বিনষ্ট হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কালের দারুণ অত্যাচার ও সংসারের সকল প্রকার প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া যে সকল বৈদ্যব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রসকলকে প্রাণসম প্রিয় করিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কৃপায় আজও আমরা প্রাচীন শাস্ত্রসকল প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছি। কিন্তু শস্ত্র শাস্ত্র, ও সলিল সর্ব্বদা পাত্রকে অপেক্ষা করিয়া গুণাগুণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। যে শস্ত্র বীরপুরুষের হস্তস্থিত হইয়া দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, সেই শস্ত্রই কাপুরুষের হাতে গিয়া আত্মরক্ষা করিতেও সমর্থ হয় না—প্রত্যুত বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া পড়ে, তদ্রূপ শাস্ত্রও পণ্ডিতগণের নিকট একরূপ অর্থ প্রকাশ করে, আর অপণ্ডিতের নিকট আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষমূলক ও কল্পনামূলক জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। এজন্য বলে'—'শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ, যস্তু ক্রিয়াবান্ স হি পণ্ডিতঃ স্যাৎ।" হিন্দু

রাজগণের শাসনকালে আয়ুর্ব্বেদের যে দশা ছিল, বৌদ্ধ যুগে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। আবার বৌদ্ধযুগে যাহা ছিল, তাহা যাবনযুগে অন্তর্হিত হয়। অতি প্রাচীনকালে আর্য-যুগে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত,—বৌদ্ধযুগে তাহা তিরোহিত হয়, তখন হইতেই শল্য চিকিৎসকগণের অবনতির সূত্রপাত হয়। এই সময়ে কায়চিকিৎসকগণের সমধিক উন্নতি ঘটে। একে তো তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ভেষজ সমুদায়ে সম্পন্ন ছিলেন,—তাহার উপর রসতন্ত্রেরও এই সময়ে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বৌদ্ধরাজগণের অনুগ্রহে বহু আরোগ্যশালা (Hospital) নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে যবনরাজগণের নিগ্রহে সে সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ—প্রত্যক্ষ ব্যবহার মূলক শাস্ত্র। প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা আয়ুর্ব্বেদে পাণ্ডিত হইতে পারা যায় না—এবং শাস্ত্র ব্যতিরেকেও কেবল প্রত্যক্ষ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদে পাণ্ডিত্য জন্মে না। গুরু সকাশে কর্ম্মাভ্যাস ও শাস্ত্রজ্ঞান এতদুভয়াত্মক জ্ঞান দ্বারা যিনি কুশলতা লাভ করেন, তাঁহারই জ্ঞান বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন,—

"প্রত্যক্ষতশ্চ যদ্ দৃষ্টং শাস্ত্র দৃষ্টং চ যদ্ভবেৎ,

সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনম্॥"

চিকিৎসা-বিদ্যার্থীর আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতিরেকে চিকিৎসাকর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ দুর্ঘট। সেজন্য যখনই আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ কেবল গুরুমুখগম্য হইল, তখন হইতেই আয়ুর্ব্বেদ অর্দ্ধাঙ্গ রুগ্ন পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অর্দ্ধ বিকল হইয়া পড়িল। এইরূপে কালক্রমে ধীরে ধীরে অঙ্গ ভঙ্গ বিকল ও বিমলিন হইয়া আয়ুর্ব্বেদ বর্ত্তমানে কতকগুলি সুচিন্তিত মহর্ষিকল্পিত ঔষধের পেটিকা রূপে কায় চিকিৎসকগণের কক্ষগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহার আর পূর্ব্বের মত শবব্যবচ্ছেদ নাই এবং শল্য-শালাক্য-কৌমার ভৃত্যের অপূর্ব্ব কর্ম্মকৌশল নাই,—পঞ্চ কর্ম্মের পঞ্চত্ব ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের শিক্ষা দেন—এমন গুরু নাই—সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সমুদয়যুক্ত-শান্ত-দান্ত-ব্রতশীলপরায়ণ-শিষ্যও নাই, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসেন—এমন গৃহস্থ নাই এবং কেবল ভূতদয়াকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া চিকিৎসা করেন, এমন চিকিৎসকও নাই। আয়ুর্ব্বেদের এহেন দুর্দ্দশাকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও যে সকল মহাপুরুষ বলেন—'আয়ুর্ব্বেদের সব আছে, আমরা সব পারি'—তাঁহাদিগকে আমরা আর কি বলিব?

ভগবৎ কৃপায় বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকের একটা জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে। এখন আর কেহ অন্ধ বিশ্বাসে গতানুগতিক মার্গে বিচরণ করিতে চাহে না। সকলেই এখন বুঝিতে পারে, বর্ত্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ডাক্তারগণ কোন্ কোন্ বিষয়ে সমধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন এবং কবিরাজগণ বা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারেন। কি ডাক্তার কি কবিরাজ কেহই এখন চিকিৎসাক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু একদিন এমন ছিল, যে দিন লোকে ডাক্তারী চিকিৎসাকেই একমাত্র চিকিৎসা বলিয়া মনে করিয়াছিল, এখন আর সে দিন নাই। এখন লোকের বিলাতীমোহ ধীরে ধীরে কাটিতে বসিয়াছে, তাই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিও ধীরে ধীরে জাগিতেছে। এক শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি এবং প্রসূতি তন্ত্র বা মিডওয়াইফারী ব্যতিরেকে অন্য ক্ষেত্রে ডাক্তারগণের তাদৃশ নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ আছে এবং রোগ বিজ্ঞানের যে সকল অপূর্ব্ব কৌশল বিদ্যমান আছে, সে সকল যদি কোনদিন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বুদ্ধিগম্য হয়, তাহা হইলে—ডাক্তারী চিকিৎসাই একদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহাও আর অসম্ভব বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণের যেরূপ সমুদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহারা ধীরে ধীরে আয়ুর্ব্বেদের ধন রত্ন সকল আত্মসাৎ করিয়া

তাহা কি আমাদের দেশের লোক চাহিয়া দেখেন? শুধু উদ্ভিজ্জ নহে, ধাতু সকলের দিকেও তাঁহাদের নজর পড়িয়াছে। অনেকদিন হইতেই তাঁহারা লৌহ ও পারদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন আবার "মকরধ্বজ" পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। এখন জার্ম্মাণী হইতে "মকরধ্বজ" প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকল জিনিসই যেমন বিদেশ হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে,—তেমনই কালে হয়তো কবিরাজীর তৈল,ঘৃত, অরিষ্ট, আসব—সবই একদিন বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আমাদের অভাব দূর করিবে! আর আমরা নিলর্জ্জের মত হাসিতে হাসিতে বুক ফুলাইয়া বলিব—সবই আমাদের আয়ুর্ব্বেদের!! যেদিন হইতে মানুষ ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার মোহে নষ্টদৃষ্টি হইয়া নিজের অক্ষমতা ও অভাবকে ঢাকিবার জন্য সত্য ত্যাগ করিয়া অসত্যকে আশ্রয় করে, সেইদিনই তা'র প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। পাছে এই অসত্য আসিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলে সে জন্য মহর্ষি চরক প্রথম হইতে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—"বাবা, সত্য বলিতে কখনও লজ্জা করিও না—বিকারাণামকুশলো জিহীয়ান্ন কদাচন, নহি সর্ব্ববিকারানাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ।" শুধু তাই নয়, অকপটে সত্যকে বরণ করিবে—এবং জানিবে "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে।" সত্যের জয় সর্ব্বত্র, তাহার আর পাত্রাপাত্র নাই, কালাকাল নাই, শত্রু-মিত্র নাই। যে যখনই সত্যকে অবলম্বন করিবে, সে তখনই বিজয় লাভ করিবে। এজন্য যখনই যে বিজয় কামনা করিয়াছে, সে তখনই সত্যকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বিজয়ী বীরের সহিত সত্যের অন্যোন্যাশ্রয়ী সম্বন্ধ বড়ই মধুর। সেইজন্য মুসলমান রাজত্ব-কালে ইউনানী চিকিৎসকগণ আর্য্য ঋষিগণের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইয়া অকপটে আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ সমুদায়কে গ্রহণ করিয়াছিল। তাই এখনও বহু বহু আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজকে ইউনানী চিকিৎসকগণের করগত দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায়,—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহোদয়—অধুনা কবিরাজগণের নিকট বিলুপ্ত জীবনীয়-গণের মধ্যে জীবকাদি অষ্টবর্গকে ইউনানী চিকিৎসক-গণের হস্তগ্রহ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—মেদা, মহামেদা প্রভৃতি ভেষজ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, কেবল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইউনানীর কুক্ষিগত হইয়াছিল। উক্ত অষ্টবর্গের ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা,মহামেদা, জীবক ও ঋষভক যবন সম্পর্কে স্বনাম ত্যাগ করিয়া যাবন নামে অভিহিত হইতে-ছিল। কিন্তু নাম পরিবর্ত্তন করিলেও গুণ ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হয় না,—তাই তিনি তাহাদের গুণগ্রামও মূর্ত্তি দেখিয়া বহু কষ্টে চিনিতে ও চিনাইতে পারিয়াছেন।

স্বাধীনতাই জাতির জীবন এবং পরাধীনতাই জাতির মৃত্যু। যে জীবন্ত, সে কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—তাই আজ স্বাধীন ইংরাজ আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে কত নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া জগতকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছে। একদিন আমাদেরও এমনই দিন ছিল,—যেদিন হিন্দুগণ স্বাধীন ছিলেন। তখন হিন্দুগণ যখন যাহা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—তখনই তাহার সংস্কারসাধন করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এজন্য প্রাচীন স্মৃতির স্থানে নব্যস্মৃতি, প্রাচীন ন্যায়ের স্থানে নব্য ন্যায় পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল। আবার যদি হিন্দুগণের সেই প্রবৃত্তি—স্বাধীন প্রবৃত্তি জাগে, তখন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, আপনা হইতেই হিন্দুর জ্ঞানবিজ্ঞান, আচারব্যবহার—সবই আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিবে। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং—সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।" কিন্তু কবে সে সুপ্রভাত হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার তো উপায় নাই। দিনের পর দিন কত নূতন নূতন আধিব্যাধি আসিয়া আমাদের শরীর ও মনকে জীর্ণভগ্ন করিয়া মরণের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। এখন আপদ্ধর্ম্মের ন্যায় সদ্যোমরণ-নিবারক যে কোন উপায় হউক না কেন—

তাহাই অবলম্বন না করিয়া আর কেহ থাকিতে পারিতেছে না। তাই আজ সম্পূর্ণ আরোগ্যপ্রদ পরিণাম হিতকর আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার দিকে লোকে সহজে আকৃষ্ট না হইয়া আপাতহিতকর পাশ্চাত্য চিকিৎসার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে ধাবিত হইতেছে। পরিণাম চিন্তা কয়জন মনুষ্যের থাকিতে পারে? কোনরূপে বর্ত্তমানের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেই লোক কৃতার্থ হয়! যদি এই মনুষ্যসমাজকে অপরিসংখ্যেয় ব্যাধির করালকবল হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তবে তাঁহাদের উচিত—অকপটে প্রকাশ্যভাবে সত্যের উপাসনা করা। ডাক্তারগণ যেমন যেখানে যেটুকু ভাল ও সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, উহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন,—তেমনি আমাদেরও উচিত—আপাত আপদুদ্ধারকল্পে জনহিতকর ভেষজাদি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়া, আয়ুর্ব্বেদকে বর্ত্তমানকালের উপযোগী সর্ব্বব্যাধির প্রতিকারক্ষম করিয়া তোলা। তারপর যখন আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন আমরা বলিতে পারিব—আমাদের অন্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে। এজন্য আমাদের সর্ব্বথা উচিত যে, শল্য-শালাক্য-কৌমারভৃত্য প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় অঙ্গ সকলের সংস্কার জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের নিকট শরণাপন্ন হওয়া। আমাদেরই শাস্ত্রে আছে "সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইবষট্পদঃ।" অপিচ "শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী উদ্ধাবত্তান্যযোৎসৃজেৎ। বিহায় শাস্ত্রজ্ঞানানি সৎ সতাং তদুপাস্ততাম্।" স্বকীয় জ্ঞানসৌকর্য্যার্থ পাশ্চাত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার সারসত্য গ্রহণ করিতে শাস্ত্রেরই উপদেশ। আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিই মুখে। অন্তরে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি সত্য সত্যই শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় দেখিয়া মর্য্যাদা দিবার প্রবৃত্তি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের এত অধোগতি কখনই হইত না—একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য আয়ুর্ব্বেদের হিতৈষীব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা যখন আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণ কামনায় বহু প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং দেশের লোকেরও এ বিষয়ে মতিগতি ফিরিয়াছে, তখন যাহাতে আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত উন্নতি হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।—আয়ুর্ব্বেদ চিরদিনই অসাম্প্রদায়িক, তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন দিলে চলিবে কেন?

অতঃপর আমরা আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিবেদন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব এবং প্রবন্ধান্তরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের এক একটী অঙ্গ লইয়া তাহার অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা সকল বিস্তারিতভাবে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের যাহা কিছু পদার্থ—সবই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে যেন জগতের কোন ভাবই অবস্থান করিতে পারে না। সকলেরই জন্ম, বৃদ্ধি ও হ্রাস আছে। এই ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে—এমন কোন পদার্থ জগতে আছে বলিয়া তো মনে হয় না। জন্ম হইতে বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি হইতে হ্রাস—এ সকলই মরণের অবস্থান্তর মাত্র। এই মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সকল পদার্থই প্রতিনিয়ত সংস্কার প্রার্থনা করিতেছে। যে বা যাহারা জীবন্ত, তাহারাই প্রতিনিয়ত সংস্কারদ্বারা কালকৃত অনিবার্য্য জরামরণের করাল কবল হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতেছে। এই সংস্কার যে করিতে পারে না বা যাহার করা হয় না—তাহার মরণ অনিবার্য্য। এই সংস্কারেরই অপর নাম চিকিৎসা। জীবন্ত দেহ প্রতিক্ষণই নিজের সংস্কার নিজেই করিতেছে। যখন সে নিজে অক্ষম হয়, তখন অপরের সাহায্য প্রার্থনা করে। এইরূপ মনও প্রতিক্ষণ বুদ্ধির সাহায্যে নিজের মালিন্য সংস্কার করিয়া পরম পবিত্র হইতেছে। জগতে এমন জিনিস আজ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই—যাহাকে কালে কালি মাখাইয়া না মলিন করিয়া দিয়াছে। অমন যে পরম পবিত্র ধর্ম্ম—তাহাও কালবশে মলিন হইয়া পড়িলে স্বয়ং

ভগবান্ আসিয়া তাহার সংস্কার করিয়া দিয়া গিয়া থাকেন; আর জড়পদার্থের সংস্কারের তো কথাই নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পরিবর্ত্তিত না হইয়া জগতের কোন জিনিসই কখনও থাকিতে পারে না। কালক্রমে মনুষ্যগণের বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল, তখন মনুষ্যগণের বুদ্ধিও অতি নির্ম্মল ছিল,—তাই সকলেই বেদ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। তারপর যখন মনুষ্যবুদ্ধি কালপ্রভাবে ক্রমশঃ মলিন হইতে লাগিল, তখন তাহাদের বুদ্ধির অনুরূপ করিয়া সংহিতা, স্মৃতি ও পুরাণাদি রচিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, বেদ যাহা শিক্ষা দিত—তাহাই সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণাদিতে লিখিত হইয়াছিল। যে জ্ঞান বা ভগবান্‌কে পাইবার জন্য বেদ রচিত হইয়াছিল—স্মৃতি পুরাণাদিও তাহাকে পাইবার জন্য বিরচিত হইয়াছিল। কেবল গৃহীতার গ্রহণ-সামর্থ্য লক্ষ্য করিয়া এইরূপ করিতে হইয়াছিল। যতদিন আমাদের দেশ জীবিত ছিল, ততদিন এইরূপ শাস্ত্রাদির সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি কার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেমন প্রয়োজনানুরোধে প্রাচীন স্মৃতিস্থলে নব্যস্মৃতি; প্রাচীন ন্যায় স্থলে নব্য ন্যায় প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল—তেমনি যদি আবার কোনদিন সুদিন আসে তো আমরা দেখিব—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদস্থলে নবীন আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহা যেদিন দেখিব, সেদিন আমরা নিশ্চিত জানিব—আমাদের দেহে প্রাণ আসিয়াছে,—নতুবা আমরা ঘুমন্ত অথবা মৃত।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যহানির কারণ ও তাহার প্রতীকার



(কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

সদ্বৃত্ত অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবশ্যপাল্য নিয়মগুলির অননুষ্ঠান, সদাচার পরিত্যাগ, পাশ্চাত্যসভ্যতায় কৃত্রিম জীবনযাপনপ্রণালীগ্রহণ প্রভৃতিকে প্রজ্ঞাপরাধের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। যে খাদ্য, যে বেশভূষা বাঙ্গালীর দৈহিক গঠনের উপযোগী, যে সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন বাঙ্গালীর সহজসাধ্য, যে ভেষজদ্রব্য তাহার স্বদেশজাত ও শরীররক্ষার সম্যক সহায়, আমরা অনেক স্থলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বৈদেশিক সভ্যতার মোহে বৈদেশিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছি। স্বগৃহে স্বহস্তে প্রস্তুত পবিত্র খাদ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্য আদর্শে পরিচালিত ভোজনশালাগুলির অপরিচিত, পর্য্যুষিত ও কুক্রিয়াপর পরিচারকগণ কর্ত্তৃক পরিবেশিত বিদেশীয় খাদ্যই অনেক স্থলে আমাদের অধিক রুচিকর হইয়াছে। আমরা অনেকেই শিশুদিগকে বৈদেশিক পরিচ্ছদে আবৃত দেখিতে ভালবাসি, স্নান-ভোজনাদিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যালয় বা কর্ম্মস্থলে গমনপূর্ব্বক মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবার ফলে ছাত্র ও চাকুরিয়াগণের কিরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা অবহিত নহি। স্ত্রীলোকগণকে বিদ্যার সহিত কর্ম্মবিমুখতা শিক্ষা দিয়া, তাঁহাদিগকে সুসন্তানের জননী হইবার কি ঘোর অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছি, সে বিষয়ে প্রসূতিবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। মোটের উপর

আমরা জাতীয়ভাব ও জাতীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এক বিজাতীয় সভ্যতার কবলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছি ও দিনে দিনে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি। পুরাতনকে বর্জ্জন করতঃ নূতনকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু সেই নূতনের প্রখর উত্তাপ আমাদের ধাতে সহিতেছে না। একূল-ওকূল—দুই কূল হারাইয়া আমরা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

বিধাতাও যেন সময় বুঝিয়া বিমুখ হইয়াছেন। পরিণাম অর্থাৎ কালের অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যাযোগরূপ দৈববিপদ প্রায়ই ঘটিতেছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অকালবর্ষণ প্রায়ই লাগিয়া রহিয়াছে, প্রতি বৎসরই বাঙ্গলার কোন না কোন অঞ্চলে জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক রোগের আক্রমণ ঘটিতেছে এবং তাহার ফলে লোকবহুল সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ জনপদ বিধ্বস্ত হইতেছে।

জনপদোদ্ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে মহর্ষি চরক বলিয়াছেন যে, "যখন দেশ, নগর, নিগম ও জনপদের অধ্যক্ষগণ ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া জনমণ্ডলীকে অধর্ম্ম সহায়ে পালন করেন, তাঁহাদের আশ্রিত পৌর ও জানপদ লোকসমূহ এবং ব্যবহারাজীবগণ সেই অধর্ম্মকে পরিবর্দ্ধিত করেন, তখন তাহা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া ফেলে। অধর্ম্মাভিভূত ব্যক্তিগণকে দেবতারাও পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মের অন্তর্ধান, অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ও দেবতাগণের প্রাতিকূল্য ঘটিলে ঋতু সকল ব্যাপন্ন হয়, তাহার ফলে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বা বিকৃতবর্ষণ ঘটে, সম্যক্ বায়ু প্রবাহিত হয় না, ভূমিও ব্যাপন্ন হয়, জলাশয় সমূহ শুকাইয়া যায়, ওষধিসমূহ স্বাভাবিক গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত হয়। তদনন্তর খাদ্যাদির দুষ্টিবশতঃ সমস্ত জনপদ বিধ্বস্ত হইতে থাকে। বায়ু, জল, দেশ এবং কাল—এই চারিটী বস্তু একই ভূভাগে অবস্থিত সমস্ত মানবের পক্ষেই সাধারণ। এইগুলি দূষিত হইলে তাহার কুফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়, এই জন্য বয়স, দেহ, বল, প্রকৃতি, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও বহু ব্যক্তি একই সময়ে রোগাক্রান্ত হইতে পারে। বায়ু, কাল, দেশ ও জলের দুষ্টিবশতঃ বহু ব্যক্তির রোগ নিবারক শক্তি একই সময়ে ক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং কোন সংক্রামক ব্যাধি সহজেই ছড়াইয়া পড়ে।

বাঙ্গলার সাধারণ রোগপ্রবণতা ও ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি বহুবিস্তৃত ব্যাধিগুলির কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রধানতঃ আমরা উক্ত চারিটী কারণই দেখিতে পাইব।

বায়ুদুষ্টি যথা,—যে ঋতুতে যে দিক হইতে বায়ুর সঞ্চার স্বাভাবিক, তাহার বিপরীত হইলে সংক্রামক রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গে শীতের সময় দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বহিলেই কলেরার প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে। বায়ু অসাত্ম্যগন্ধবিশিষ্ট হইলে দূষিত হয়, পাট চাষের ফলে জল পচিয়া বায়ুকে কিরূপ দূষিত করে এবং তজ্জন্য ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিরূপ বর্দ্ধিত হয়, পল্লীবাসীমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অসাত্ম্যগন্ধবিশিষ্ট বায়ুর অপকারিতা কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ পল্লীগুলিতে এবং মফস্বলস্থ বহু নগরে গেলেই বুঝিতে পারা যায়। বাষ্পধূলি ও ধূমসঙ্কুল বায়ুও দূষিত হইয়া থাকে, সুবৃহৎ কারখানা গুলিতে ও তাহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহার কুফল ফলিতেছে।

বাঙ্গলাদেশে জলদুষ্টিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পল্লীবাসী পানীয়জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। যে জলাশয় হইতে পানীয় জল আহরণ করা হয়, সেই জলাশয়েই শৌচক্রিয়া, গবাদি পশুর স্নান ক্রিয়া, বাসনপরিষ্কার করা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। ইহার ফলে জল বিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শ বিশিষ্ট, ক্লেদবহুল ও বিগুণ গুণ হইয়া সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারের যে সহায়তা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গ্রীষ্মকালে বহুস্থানে জলের অত্যন্ত অভাব ঘটে, শুষ্কপ্রায় একটী মাত্র পুষ্করিণীই হয়ত বহুগৃহস্থের অবলম্বন স্বরূপ

হইয়া থাকে, এরূপক্ষেত্রে বিসূচিকার আবির্ভাব হইলেই উহা দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

দূষিত, স্রোতহীন আবদ্ধ জলরাশিকে চিকিৎসকগণ ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও স্থিতির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাঙ্গলার বহু স্থলে এইরূপ অনাবশ্যক, অব্যবহার্য্য জলাভূমি রহিয়াছে। বিশেষতঃ রেললাইন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ আবদ্ধ জলভাগের আয়তন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ই, আই, রেল লাইন বসাইবার অব্যবহিত পরেই ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দৃষ্ট হইয়াছিল। রেল লাইনের দুইদিকে অগভীর জলাভূমিগুলি ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশকসমূহের প্রধান উৎপত্তি স্থল। রেললাইনগুলির দ্বারা আর একটী অপকার সাধিত হইতেছে। ইহারা জলনিকাশের পথ অবরুদ্ধ করায়, প্লাবনের সময় নিকটবর্ত্তী ভূভাগের মহান্ অনিষ্ট হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে যে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

চরক দেশদুষ্টির যে সকল লক্ষণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গলার স্বাস্থ্যহানির প্রতি এই কয়েকটী উলেখ যোগ্য, যথা—দেশের প্রকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিকৃত হইলে, উহা ক্লেদবহুল এবং সরীসৃপ,মশক (যাহা ম্যালেরিয়ার বীজবাহী পতঙ্গ, মক্ষিকা (যাহা কলেরার বীজবাহী), মূষিক (যাহা প্লেগের বীজবাহী), পেচক, শকুনি ও শৃগাল প্রভৃতির দ্বারা উপক্রুত হইলে, তৃণ-লতা-গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে, দেশবাসী ধর্ম্ম, লজ্জা, আচার ও সদগুণ সমূহ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, দেশের দুষ্টি হইয়াছে—বুঝিতে হইবে। বঙ্গদেশে এই সকল দোষ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে।

কালের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগরূপ দুষ্টি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির প্রতি যে সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই কারণের মধ্যে কতকগুলি, পরকৃত, কতকগুলি আত্মকৃত, কতকগুলি এতদুভয়াত্মক এবং অবশিষ্টগুলি দৈবকৃত। পরকৃত কারণ যথা—পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তন, বিদেশীয়গণের আধিপত্য, কলকারখানা, রেল লাইন প্রভৃতি স্থাপন, রাজ্য ও বাণিজ্যসহায়ে অর্থ শোষণ ইত্যাদি। এগুলিকে অবশ্য জাতির কর্ম্মফল বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

আত্মকৃত্য কারণ অসংখ্য ও সর্ব্বপ্রধান। যথা—সদাচার পরিত্যাগ স্বস্থবৃত্তের অননুষ্ঠান, জাতীয়ভাববর্জ্জন, ধর্ম্ম ও নীতির অননুসরণ, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব, নিয়মিত ভাবে শরীর চালনার অভাব, চাকুরীর মোহে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ, ঈর্ষাপরায়ণতা, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব, দেশী ও বিদেশী বহু অজ্ঞাত পেটেণ্ট ঔষধ সেবন, পল্লী অঞ্চলে কোথাও চিকিৎসকের অযোগ বা অতিযোগ এবং কোথাও বা কুচিকিৎসকের মিথ্যাযোগ প্রভৃতি বহু বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গুলির মূল প্রজ্ঞাপরাধ। দৈবকৃত কারণ যথা—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঋতুবৈষম্য, ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস, নদী সমূহের শুষ্কতা জলপ্লাবন ইত্যাদি।

(৩) প্রতিকার

অতঃপর আমরা প্রতীকারের পন্থা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব। কি করিলে এই মুমূর্ষু বাঙ্গালী জাতি আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিরই তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এদেশে সমস্যার অবধি নাই। সমাজ-সমস্যা রাজনৈতিক-সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি সকল সমস্যাই এককালে জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে এবং সকল গুলিরই আশু প্রতীকার আবশ্যক, কিন্তু স্বাস্থ্য-সমস্যাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ এবং সর্ব্বাগ্রে ইহার সমাধান আবশ্যক। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত সকল সমস্যাই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, অন্য সকল গুলিকে বাদ দিয়া মাত্র একটীর সমাধান অসম্ভব, যথা—স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে গেলেই অর্থের ও সুশিক্ষাদানের আবশ্যকতা প্রথমে অনুভূত হইবে, রাজকীয়

সাহায্য ব্যতীত কৃতকার্য্য হওয়া বহুস্থলে সম্ভব হইবে না। এই জন্য অন্যান্য সমস্যার সহিত বিশেষভাবে স্বাস্থ্যসমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। জাতির জীবন ও মৃত্যু যাহার উপর নির্ভর করিতেছে, সুখশান্তি, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি-ধর্ম্ম—সমস্তই যাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে, সেই স্বাস্থ্যই প্রথম প্রার্থনীয়।

প্রতীকারের পথ নির্দ্দেশ করিতে হইলে কর্ত্তব্য, কর্ম্মী, ও করণ এই তিনটি বস্তু নির্ণয় করা আবশ্যক। আমরা একে একে এই তিনটি নির্ণয় করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমতঃ কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দেশের স্বাস্থ্যসম্পৎ ফিরিতে পারে, সিদ্ধিলাভের জন্য কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক, তাহারই আলোচনা করা যাক।

কোনও বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে দুইটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম আসন্ন বিপদের সহিত দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা, দ্বিতীয়—বিপদের ভবিষ্যৎ আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও শক্তি সঞ্চয় করা। দ্বিতীয় উপায়টী যথাসময়ে অবলম্বিত হইলে বিপদ্ সম্মুখীন হইতে সাহস করে না অথবা সম্মুখীন হইলেও সহজে পরাজিত হয়। স্বাস্থ্যভঙ্গ রূপ বিপদ্ দূর করিতে হইলেও আমাদিগকে এইরূপ দুইটী উপায় গ্রহণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে একটী শক্তিসঞ্চয় মূলক এবং অপরটী বাধা প্রদান মূলক, শক্তিসঞ্চয়মূলক কর্ত্তব্য গুলির প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া প্রথমে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের শরীরে এমন একটী শক্তি আছে—যাহা সমুদয় রোগের আক্রমণ বিফল করিতে চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম গুলি যথানিয়মে পালন করিলে এবং দেশকাল-জলবায়ু প্রভৃতি দূষিত না হইলে সেই শক্তি অব্যাহত থাকে, পক্ষান্তরে উপযুক্ত খাদ্য-পানীয়ের অভাবে ও স্বস্থবৃত্তি সমূহের বিপরীত আচরণ বশতঃ অথবা দেশকালাদির দুষ্টিবশতঃ সেই শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে ও শরীর ব্যাধিপ্রবণ হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বাস্থ্যহানির প্রতীকার করিতে হইলে—যাহাতে দেহের রোগ নিবারণী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে ব্যাধির উৎপত্তি বাধা প্রাপ্ত হয়, এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটী কার্য্য করা আবশ্যক, শিক্ষাদান তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সুশিক্ষার বিস্তার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রজ্ঞাপরাধ জনিত স্বাস্থ্য হানি ও অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে—দেশবাসীকে রক্ষা করা যাইবে না, সমাজে যাহাতে সদাচার ফিরিয়া আসে, স্বাস্থ্যরক্ষার মূল তত্ত্বগুলি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপ জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সংক্রামক ব্যাধিগুলির প্রকোপ আরম্ভ হইলেই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে,—বালক ও যুবকগণের মধ্যে যাহাতে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা হইতে থাকে এবং তাহারা ইন্দ্রিয়চালনার কুফল ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের সুফল বুঝিতে পারিয়া যাহাতে ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করে—ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সুশিক্ষায় প্রচার করিতে হইবে। বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, নিয়মানুবর্ত্তিতা শাস্ত্রোক্ত এবং সময়োপযোগী মহাকল্যাণকর বিধিগুলির সম্যক্ অনুষ্ঠান, একান্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণ খাদ্য ও দ্রব্য সমূহের দোষ গুণ অল্প বিস্তর সকলেরই জানা উচিত। কিরূপ গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য, পানীয় জলের বিশুদ্ধি কি ভাবে রক্ষা করা উচিত, তাহাও শিক্ষা দিতে হইবে। মোটের উপর স্বাস্থ্যোন্নতির ও ব্যাধির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই যতদূর সম্ভব জানাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক, নৈশ বিদ্যালয় ম্যাজিক লণ্ঠন, সভা-সমিতি প্রভৃতি দ্বারা এই শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে।

শিক্ষাদান ব্যতীত অন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যথা উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয় যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সুলভ হয়—এরূপ ব্যবস্থা করা। অবশ্য ইহা সর্ব্বত্র সম্ভব ও অনায়াসসাধ্য নহে। কারণ ব্যক্তিবিশেষের আর্থিক অবস্থার উপর তাহার পানাহার নির্ভর করে।

তথাপি যে সকলক্ষেত্রে উত্তম খাদ্য ও পানীয়ের অভাব ধনী নির্ধন সকলকেই সমান ভাবে সহ্য করিতে হয়, সেই সব-ক্ষেত্রে প্রতীকারের চেষ্টা করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সহরের ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ করা যায়। দুগ্ধ ভারতবাসীর একটী প্রধান খাদ্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় গোচারণ ভূমির অভাবে এবং অন্যান্য কারণে গোকুলের ক্রমে বিলোপ সাধিত হইতেছে। যাহাতে পুনরায় গোপালন সম্যক্‌রূপে আরব্ধ হয়, বিদেশে গরুর রপ্তানী যাহাতে বন্ধ হয় এরূপ চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক।

পল্লীসমূহে পানীয় জলের অভাব দূর করা কর্ত্তব্য। আবার অনাবশ্যক পচা খানাডোবা প্রভৃতি যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলিতে হইবে। দেশভূমি ও জলের যে সকল দুষ্ট পূর্ব্বে বিকৃত হইয়াছে, সেইগুলি দূর না করিলে জনপদোধ্বংসের কারণ স্বরূপ সংক্রামক রোগগুলির প্রকোপ কমিবে না।

বাধাদানমূলক কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন এবং সর্ব্বত্র সুচিকিৎসকের অভাব দূর করাই প্রধান। কোনো স্থানে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ আরম্ভ হইলেই উপযুক্ত প্রতিষেধক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। সেই স্থানের অধিবাসীগণকে আহার-বিহার সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পীড়িতের সেবার নিমিত্ত অভিজ্ঞ শুশ্রূষাকারীর দল নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়—এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। মোটের উপর ব্যাধির আক্রমণ ও প্রাদুর্ভাব ঘটিলে যে সকল উপায়ে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে এবং ব্যাধির প্রকোপ দূর করা যাইতে পারে—দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্যের মধ্যে সেই-গুলিকে ধরা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, কাহারা এই মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবে? ম্যালেরিয়াপীড়িত, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের আকরস্বরূপ বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের মধ্যে থাকিয়া, শত অসুবিধা বরণ করিয়া লইয়া ঈর্ষা, দ্বেষ, আত্মপ্রশংসা, প্রভৃতি বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা মুছিয়া ফেলিয়া কাহারা নীরবে দেশের হিতকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে? যেখানে সৎকার্য্যের বিনিময়ে জয়ধ্বনি নাই, করতালি নাই, যেখানে লোকনিন্দার কঠোর উপেক্ষাই অধিকাংশ স্থলে অকপট হিতচেষ্টার প্রতিদান,—কে সেখানে নিশ্চলভাবে ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিবে? দেশের শিক্ষিত ও ধনীসম্প্রদায় সহরের পক্ষপাতী, চিকিৎসকগণও প্রধানতঃ সহরেই উদরান্নের সংস্থান করিতে চেষ্টা করেন। বাঙ্গলার পল্লী—শ্মশানে পরিণত হয় হউক তাহাতে কাহার ও কিছুই আসিয়া যায় না, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এই উপেক্ষা ও স্বার্থপরতার ভাব দেখাইয়া আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের মূলে নিষ্ঠুরভাবে কুঠারাঘাত করিতেছি।

বাঙ্গলায় কিছুকাল হইল একটা জাগরণের ভাব নানা আকারে দেখা দিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত সেবাধর্ম্ম একদল স্বার্থত্যাগী যুবককে নূতন আদর্শে অনু-প্রাণিত করিয়াছে। দেশকে অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য অপর একদল কর্ম্মী রাজনীতির চর্চ্চা করিতে-ছেন, ইঁহারাও অনেকেই পল্লীসংস্কারের (Village reconstruction) আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছেন সুতরাং আশা করা যায় যে, অচির ভবিষ্যতেই এমন একদল কর্ম্মী দেখা যাইবে, যাহারা বিশেষভাবে পল্লীসংগঠনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন ইতিমধ্যেই এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, Health Association প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ননকো-অপারে-শনের যুগে যাহারা জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন আশা করা যায় যে, তাঁহারাও অচিরে এই কার্য্যে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন। রোগ-যন্ত্রণা দূর করা

চিকিৎসকের যেমন কর্ত্তব্য, রোগের উৎপত্তি যাহাতে না হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা ও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানযুগের নবভাবে অনুপ্রাণিত চিকিৎসকগণকে এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে যে, যেন তাঁহারা তাঁহাদের যত্নার্জ্জিত বিদ্যার সাহায্যে দেশের রোগ ও রোগীর সংখ্যা হ্রাস করিতে পারেন। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি যেন তাঁহাদের কামনার বস্তু না হয়, কেবল চিকিৎসক নহে, প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। প্রতি পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিয়া স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহার পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যসমিতিগুলি পূর্ব্বোক্ত উভয়প্রকার কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকিবে। কংগ্রেস, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড প্রভৃতি যে সকল শক্তিশালী অনুষ্ঠান বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপাততঃ সেইগুলির ভিতর দিয়া কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। যে সকল সেবাসংঘ বা পল্লীসমিতি বা জনহিতকর যে কোন প্রকারের প্রতিষ্ঠান অধুনা বিদ্যমান, সেগুলিরও বিশেষভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ব্যতীত অনেক কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব, কিন্তু এদেশে সেরূপ সহায়তা সহজলভ্য নহে। আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইয়া পল্লীসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী কর্ম্মী হইলেই ত চলিবে না। পল্লীসংস্কার কার্য্য সম্যকভাবে চালাইতে হইলে, দেশ, জল ও বায়ুর পূর্ব্বোক্ত দুষ্টি নিবারণ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক, কোথা হইতে সেই অর্থ আসিবে? দেশের দারিদ্র্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য অন্তরায় আছে—যথা রেললাইন, শুষ্কপ্রায় নদী, দৈবদুর্য্যোগ প্রভৃতি স্বাস্থ্যহানির কারণগুলির প্রতীকার সম্ভব নহে। আর একটী গুরুতর সমস্যারও উল্লেখ করা আবশ্যক। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব দেশের স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ। অর্থ থাকিলেই উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয়ের সংস্থান হইতে পারে, সুতরাং দেশে আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইলে—কেবল স্বাস্থ্যনীতি প্রচার ও পীড়িতের চিকিৎসা করিলে বিশেষ কোন সুফ ফলিবে না।

উপরোক্ত আপত্তিগুলি সত্য, কিন্তু নিরাশ হইলে চলিবে না, আমরা যদি প্রকৃত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমিকতা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে না এবং যে সকল কারণের প্রতীকার করা সম্ভব, কেবল সেইগুলিতেই আমাদের কার্য্যশীলতা আবদ্ধ থাকিবে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা ও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। তবে ইহা অতি কঠিন ব্যাপার, দেশের শাসন প্রণালীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বৈদিশিক অবাধ বাণিজ্যের ফলে ভারতের দারিদ্র্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। চরকা, তাঁত প্রভৃতি গৃহশিল্পগুলি যাহাতে পুনর্জ্জীবিত হয়—এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদিগকে এককালে সকল দিক্ দিয়াই জাগিতে হইবে। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশ এখন সমস্যা-জালে জড়িত। এবং সকল সমস্যাই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অন্যান্য বিপদের ন্যায় স্বাস্থ্যহানির প্রতীকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে এই বিপদের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং প্রকৃত দেশানুরাগের সহিত সংঘবদ্ধভাবে উপায় সম্মুখীন হইতে হইবে। কোথাও কোথাও জাগরণের চিহ্ন দেখা গেলেও আমাদের নিদ্রার ঘোর এখনও যায় নাই, আমরা যে সত্যসত্যই অধুনা বিলুপ্ত বহুজাতির ন্যায় ধ্বংসের পথে চলিয়াছি, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দুরবস্থার, যে অবধি নাই, এইটী সকলকে প্রাণে প্রাণে বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা এবং পাশ্চাত্যভাবে কৃত্রিম জীবনযাপন প্রণালীর প্রবল মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। তাহা হইলে প্রতীকারের পথ অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

থেরাপুটিকস

(রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট)

ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা যে আধুনিক য়ুরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূলে, তৎসম্বন্ধে আমরা একবার "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকায় ক্ষুদ্র একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছিলাম। এখানে সেই কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া লিখিতেছি।

অশোকের রাজত্বকালে এই দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ দয়াপরবশ হইয়া জাগতিক সমস্ত জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। এই চেষ্টাই ভারতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞানকে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছিল। শুধু মানুষদিগের জন্য নহে, কিন্তু জীবমাত্রেরই ব্যাধি উপশমনের জন্য দেশময় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যিনি "সদয়হৃদয়ে পশু-ঘাত" দেখাইয়া যজ্ঞ-বিধির নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহারই দয়ার্দ্র-হৃদয়-সাগর মথিত সহানুভূতি শত শত পশুচিকিৎসাশালার সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জগতে সার্ব্বভৌম করুণার স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল।

অশোকের অনুশাসনে আমরা এই কয়েকটি ছত্র পাইতেছি। "সবতা বিজিতসি দেবানং পিয়সা পিয়দসি সা লাজিনে যেচ অংতা অথা চোড়া পংডিয়া সাতিয়পুতো কেললপুতো তং রপংনি অন্তিয়োগে নাম যোন লাজা যে চা অংনে তসা অংতি যোগসা সামংতা লাজানো সবতা দেবানং পিয়সা পিয়সা পিয়দসি সা লাজিনে দুবে চিকিসকা কটা মানুস চিকিসা চা পসু-চিকিসা চা ওসধানি মনুসোপগানি চা পশোপগানি চা এবমেবা মুলানি চা ফলানি চা অততা নাথ সবতা হালাপিতা চা লোপপাপিতা চা মগেসু লুখানি লোপিতানি উডুপাপানি চা খানাপিতানি পাঠভোগায়ে পসমুনসানং" (দ্বিতীয় লেখঃ)

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার স্বাধিকার ভুক্ত সমস্ত রাজ্যে তথা তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সমূহে—তথা চোল, পাণ্ডুয়া, সত্যপুত্র, তাম্রপর্ণী এবং গ্রীকরাজ এ্যান্টিয়োকাস এবং তদীয় সামন্ত রাজা দিগের রাজ্যে সর্ব্বত্র দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দুই প্রকারের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন, মানুষদের জন্য এবং পশুদিগের জন্য। যে সকল স্থানে ঔষধ ও ভেষজ সুলভ ও যথায় তাহা দুর্লভ সমস্ত স্থানেই তাহাদের প্রচুর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র নানা প্রকার ভেষজ বৃক্ষমূল, লতা বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই সমস্ত রাজ্যে মহারাজা প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক পশু ও মনুষ্যদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বড় রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহাদের দুই পার্শ্বে ছায়া-প্রদায়ী ফল পুষ্প বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।"

এতদ্বারা দৃষ্ট হয়, অশোকের প্রেরিত চিকিৎসকগণ সেই যুগে জগতের সমস্ত বিখ্যাত রাজ্যেই মানুষ ও পশু চিকিৎসালয়ের স্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে—বিশেষ বৌদ্ধযুগে—"পুত্র" শব্দটা অত্যন্ত বহুলরূপে প্রচারিত ছিল। যথা ব্রাহ্মণকে বুঝাইতে "বামুনের পুত", ভদ্রলোককে বুঝাইতে "ভদ্রলোকের পুত" এইরূপ কথা সর্ব্বত্র শোনা যাইত। এখনও পাড়া গাঁয়ে এই রীতি আছে। অশোকের এই ক্ষুদ্র অনুশাসনটিতেও এই প্রকারের ব্যবহার দুইবার পাইতেছি যথা "কেবল পুতো" এবং "সাতিয় পুতো"।

বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তিদিগকে 'স্থবির" বলা হইত। এই স্থবির বা স্থবির পুত্র হইতে উদ্ভূত থের ও থেরাপুত কথাও বৌদ্ধ জগতে খুব প্রচলিত আছে। এখন আমরা দেখিতেছি এই 'থেরা' বা 'থেরাপুতেরা শুধু ভারতবর্ষে নহে, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে যাইয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহাদের রাজ-সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে "থেরাপুটিকস" বলা হয়। ইহাতে কি সহজে অনুমান

হয় না যে, এই "থেরাপুটিকস" শব্দ "থেরা পুত" হইতেই উদ্ভূত? এই 'থেরাপুটিক্‌স' শব্দের অর্থ অনুধাবন করিলে এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আপনারা ওয়েবেষ্টার ডিক্সনারিতে ঐ শব্দটির অর্থ খুঁজিয়া দেখিবেন, তাহাতে লিখিত আছে:—

Theraputae from (Gr *θεοpia*) knowledge of things divine. A name given to certain ascetics said to have ancientey dwelt in the nighbourhood of Alexandria; of or pertaining to the healing art etc.

এই অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলেকজেন্দ্রার সন্নিহিত কোনস্থানবাসী সন্ন্যাসীদের নাম হইতে উক্ত শব্দ গৃহীত হইতেছে। ইহার আর এক অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং ভৈষজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই স্থবির সন্ন্যাসীরা এখনও বৌদ্ধ জগতের সর্ব্বত্র 'থেরা এবং থেরাপুত' নামে পরিচিত। সুতরাং থেরাপুটিক নাম যে ইঁহাদেরই তৎসম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে?

ক'বরেজ কাকা

(শ্রীমতী কমলাবালা দেবী

শিউলি দিদি ছিল আমার অপেক্ষা দু' বৎসরের বড়, তা'র ছোট বোন্ পারুল আমার সমবয়সী। শিউলি দিদির ভাল নাম ছিল সেফালিকা। সেফালিকা, পারুল ও আমি তিনজনে একসঙ্গে খেলা করিতাম; আমাদের খেলার বিষয় ছিল পুতুলের বিয়ে। কখনো বা আমি ক'নের মা সাজিয়া পারুলের ছেলেটির সঙ্গে আমার পুতুলের বিবাহ দিতাম, শিউলি দিদি তখন প্রতিবাসী বোস গিন্নি সাজিয়া পারুলদের বাড়ী আসিয়া নাকমুখ সিট্‌কাইয়া বলিতেন,—"ওমা, তোমার অমন ছেলের বিয়ে এমন একটা কালো কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে দিলে?" জগদম্বা বলিয়া আমাদের আর একজন খেলার সাথী ছিল, সে তখন পারুলের কন্যা সাজিয়া ননদিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিত—"ওমা, ননদঝাঁপি এই দিয়াছে। ছি! ছি! ছি! এমন একটা নামজাদা বাড়ীতে, এমন ছেলের সহিত বিবাহ দিল,—দান সামগ্রী যা দিয়াছে, তা'র তো সবগুলি সমান—ননদ ঝাঁপির বেলাও এই কাণ্ড। ব'য়ের সহস্র দোষ আমি শতমুখে বা'র ক'রব, না, মা, ও সব জিনিষ পত্র তোমার সাধের বেয়ানকে ফিরাইয়া দাও, আমি তো এ ননদ ঝাঁপি কিছুতেই লইব না।"

আমাদের বাল্য জীবন এইরূপ ভাবে কাটিতেছিল। কে জানিত তখন আমাদের শিশুকালের সাধের খেলাই এক সময়ে আমাদের নিকট বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়া তুলিবে।

এখন আমাদের আর সেদিন নাই, আমরা সকলেই এক একজন সংসারের ভবিষ্যত গৃহিণী। শিশুকালের সঙ্গিনীদিগের সহিত এখন আর পরস্পরের দেখা সাক্ষাতের বড় একটা সুবিধা হয় না, মাঝে মাঝে চিঠি পত্রের আদান প্রদানই এখন আমাদের বাল্যস্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমার সহিত আমার বাল্যসঙ্গিনীদিগের মধ্যে সকলের চেয়ে চিঠি পত্র বেশী লেখালেখি চলিত—শিউলি দিদির সহিত। শিউলি দিদি আমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে

ভাল স্থানে পড়িয়াছিল—কলিকাতায়। শিউলি দিদির স্বামী ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে চাকুরি করিতেন, সংসারে তিনি, তাঁর মা ও শিউলি দিদি। শিউলি দিদির স্বামীর নাম ছিল মদনমোহন। আমরা বাল্যকালে দীনবন্ধু বাবুর নাটক পড়িয়া "মদনমোহন মুরলীবদন, বল বিবরণ কোথায় ছিলে?"—বলিয়া শিউলি দিদির স্বামীকে অনেক সময় খেপাইতে চেষ্টা করিতাম। শিউলি দিদির স্বামী কিন্তু তাহাতে খেপিতেননা বা রাগ করিতেন না, তিনি আমাদের চাপল্য দেখিয়া মুচকিয়া হাসিতেন—এই পর্য্যন্ত।

শিউলি দিদির সংসারে জ্বালা যন্ত্রণার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাহার স্বামী তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসতেন। শাশুড়ীর মেয়ে ছিল না,—সুতরাং একমাত্র পুত্র মদনমোহনের বিবাহ দিয়া তিনি একটি কন্যা লাভই করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিতেন। এক কথায় ছোট বেলায় আমরা পুতুলের বিবাহ দিয়া কল্পনায় যে সকল চিত্র অঙ্কন করিতাম, শিউলী দিদির নূতন সংসারে সে সকল চিত্রের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সংসারে, মাত্র তিনটি প্রাণী, তাহার উপর স্বামী মোটা বেতনের চাকুরি করিতেন—বেশ সুখেস্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়া যাইত।

কিন্তু সকল সুখ বুঝি মানুষের ভাগ্যে ঘটে না কিছুকাল সুখ ভোগের পর শিউলি দিদির অদৃষ্টেও বুঝি সুখ ভোগের শেষ হইয়া আসিল। শিউলি দিদির বয়স ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল, শিউলি দিদি সাতাইশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, তথাপি তাঁহার সন্তান সম্ভাবনা হইল না। শিউলি দিদি বা তাহার স্বামীর এজন্য কোনো চিন্তাই ছিল না। কিন্তু তাঁহার শাশুড়ীর পক্ষে ইহা বিশেষ কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, পৌত্রমুখ সন্দর্শন না ঘটিলে বুঝি তাহার জীবনই বৃথা হইবে।

* * * *

একদিন শিউলি দিদির একখানি পত্র পাইয়া জানিলাম, শিউলি দিদির গর্ভে ছেলে হইল না বলিয়া তাহার শাশুড়ী আবার তাহার স্বামীর বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন এজন্য চারিদিকে পাত্রী খোঁজা হইতেছে, শিউলী দিদি আরও লিখিয়াছে, — 'আবারও তাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বন্ধ্যা তো হইয়াছিই, তা ছাড়া অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানারূপ অসুখেও জীবনটি বিড়ম্বনাময় করিয়া তুলিয়াছি। আর তাই বাঁচিয়া সুখ নাই, স্বামীর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ভগবানের অশেষ দয়া বলিয়া মনে করিতে পারি।'

পত্রখানি পড়িয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কৈশোর যৌবনের সন্ধিস্থলে একটি পুরুষ ও রমণী উভয়ে যখন ভালবাসার অচ্ছেদ্যবন্ধনে মিলিত হয় তখন স্বার্থ বলিয়া কোনো পদার্থ তাহাদের পরস্পরের নিকট থাকিতেই পারে না। কিন্তু কালের কঠিন চাকে সে বন্ধন এরূপ ভাবে শিথিল হইতে পারে নারী হইয়া একথা তো আমি ধারণা করিতেই পারি না। আমাদের সঙ্গিনীদিগের মধ্যে মদনমোহনের মত ভাল মানুষ বা নিরীহ স্বামী আর কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই। প্রকৃতই মদনমোহন ছিল একজন গোবেচারী। সহসা তাহার এরূপ দুর্ম্মতি কেন হইল —আমি বুঝিলাম না। অনেক চিন্তা করিয়া তাহার পর মনে করিলাম, পুরুষ, নারী অপেক্ষা সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইলেও তাহার স্থান যে অনেক নীচে - সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ধর্ম্মবুদ্ধি পুরুষের লেশটুকুমাত্র নাই। সন্তান হইল না, সে কি শিউলী দিদির দোষ? ভগবান তাহাকে অপত্য-মুখ দেখিতে দেন নাই, সে কি করিবে? যাহা হউক মদনমোহনকে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিতেই হইবে—আমি স্ত্রীলোক হইয়া পুরুষের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

* * * *

আমি গরীবের মেয়ে—পড়িয়াছিলামও গরীবের ঘরে, কিন্তু সংসার ছিল আমার শান্তিময়। স্বামীগৃহে আসিবার

পূর্ব্বেই আমার শ্বশুর শাশুড়ী ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঘরে ছিলেন এক বিধবা ননদিনী। তিনি ননদিনী হইলেও তাঁহাকে পাইয়া আমি শাশুড়ীর অভাব বুঝিতে পারি নাই, এক কথায় পতি পুত্রহীনা আমার ননদিনীও আমাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনিই ছিলেন আমাদের সংসারের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁহার কথা—দেবতার আদেশ বলিয়া মনে করিতেন।

আমার বিবাহ হইয়াছিল স্বগ্রামেই। রূপবতী বলিয়া আমার প্রসিদ্ধিও ছিল আমি গরীবের মেয়ে হইলেও আমার ননদিনী—আমার রূপ দেখিয়াই বিনাপণে তাঁহার ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। ননদিনীকে রূপের ফাঁদে আমি সকল সময়েই জয় করিতে সক্ষমা হইতাম। এখন আমার একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ ঘটিয়াছে। এই পুত্র ও কন্যাটির জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইত, আমার রূপরাশির জোরেই আমার ননদিনীর নিকট আবদার ধরিয়া আমি সে সকল কার্য্য সিদ্ধি করিতে সমর্থ হইতাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শ্রাবণের ঘোর ঘনঘটা আকাশপ্রদেশ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, আবার যেন বৃষ্টি আসে আসে—এইরূপ বোধ হইতেছে। বিধবা ননদিনী রান্না বান্না শেষ করিয়া, আমার নিকট বসিয়া, খোকাকে লইয়া আদর করিতেছেন। ছয় বৎসরের খুকী—ভবানী বাদলের দিনে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিধবা ননদিনী খোকার সহিত গল্প করিতেছিলেন। খোকা সবে দুই বৎসরে পা দিয়াছিল। সে তাহার পিসীর নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিতেছিল—"চুম।" পিসী তাহার মুখ চুম্বন করিয়া স্বশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কখনো খোকা বাতায়নের দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—"চাঁদ।" পিসী তাহাকে বলিতেছিলেন,—"আজ বাদলের দিন, চাঁদ আকাশে নাই, চাদ আমার খোকার মুখে ঢুকিয়া গিয়াছে।" খোকা সে কথা শুনিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছিল, পিসী তাহার সে হাসি দেখিয়া আবার স্বর্গ ভোগ কল্পনা করিতেছিলেন।

আমি এই সময় বলিলাম—"খোকা বাবু, তোমার পিসীমাকে বল না,—আমরা একবার কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে যাই।"

খোকা বাবু বলিয়া উঠিল,—"পি-মা, কা—যাই।"

ননদিনী আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার পর খোকার দিকে বলিলেন, "কি বা, কি বলিতেছ? কালীঘাটে যাবে?"

খোকার উত্তর দিতে হইল না—আমি বলিলাম—"হাঁ ঠাকুরঝি, জীবনে কালীদর্শন তো কখনো ঘটে নাই, ইচ্ছা করিতেছি, একবার সকলে মিলিয়া মায়ের নিকট যাই।"

ননদিনী আমার স্বামীর নাম করিয়া বলিলেন,—"সে কি রাজি হইবে?"

আমি বলিলাম—তুমি বলিলে রাজি হইবেন ঠাকুরঝি।" ঠাকুরঝি বলিলেন—"আচ্ছা।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

* * * *

কালীঘাটে যাইবার অছিলায় আমরা অতিথি হইলাম, শিউলি দিদির বাড়ীতে। শিউলি দিদি আমাদের পাইয়া সত্য সত্য হাতে চাঁদ পাইলেন। তিনি যে আমাদের লইয়া কি করিবেন, কি খাওয়াইবেন, কোথায় রাখিবেন—তাহার জন্য যেন বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, "দিদি, তোমায় আমাদের লইয়া ব্যস্ত হইতে হইবে না। কালীঘাটে আসা তো একটা অছিলা মাত্র, আমি আসিয়াছি তোমাকেই দেখিতে। এখন ব্যাপার কি সব খুলিয়া বল দেখি!"

শেফালিকার দুই চক্ষু প্রান্তে অলক্ষিতে দুই বিন্দু বারি দেখা দিল। সে আমাকে পাইয়া যতটা সুখী হইয়াছিল, আমার এবম্বিধ প্রশ্নে সেই সুখ যেন অন্তর্হিত হইল। বাষ্পগদগদকণ্ঠে সে বলিল,—"ভাই, জীবনে আর সুখ নাই, শরীরটা অকেজো হইয়া পড়িয়াছে, আমি তো

তোমাকে সব কথাই লিখিয়া জানাইয়াছি, মরণই আমার পক্ষে একমাত্র মঙ্গল।"

আমি বলিলাম—"তোমার অসুখটা কি ?"

শেফালিকা বলিল—"অসুখ নানা রকম কিন্তু সব চেয়ে এখন বেশী অসুখ, আমার ছেলে হইল না বলিয়া শাশুড়ীর গঞ্জনা। তাই এ গঞ্জনা হইতে আমার মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেছি।

আমি বলিলাম, মদন বাবু কি আবার বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছেন ?"

শেফালিকা বলিল—"না হইয়া করেন কি ? মায়ের কথা তিনি কেমন করিয়া লঙ্ঘন করিবেন ?"

আমি বলিলাম—"কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন ?"

শেফালিকা উত্তর দিল—"না, এখনো বেশী কিছু অগ্রসর হন নাই, তবে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন—এরূপ স্থির হইয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা এ বিবাহ কিরূপে হয় তাহা বুঝিয়া লইব, তুমি চিন্তা করিও না, তোমার স্বামীকে আমি কখনই আর বিবাহ করিতে দিব না"

তাহার পর শেফালিকার শাশুড়ীর নিকট গিয়া প্রস্তাব করিলাম "শিউলিদিদির শরীর যেমন খারাপ দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন একটা ভাল স্থানে যাইলে বোধ হয় উপকার হয়। আমরা কালীদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে আমাদের সহিত কয়েকদিনের জন্য উঁহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন না।

শিউলি দিদির শাশুড়ীর তাহাতে বড় অমত দেখিল ম না। তিনি বোধ হয় সে সময় পুত্রবধূকে সে স্থান হইতে সরাইতে পারিলেই তাঁহার পুত্রের বিবাহ ব্যাপারের কোনো অন্তরায় থাকেনা বলিয়া মনে করিলেন। মদন বাবুরও ইহাতে আপত্তি দেখিলাম না, ফলে শিউলি দিদি আমাদের সহিত তাঁহার পিতৃভূমি দর্শনে আগমন করিলেন।

* * * *

আমাদের গ্রামে একজন বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তিনি বয়সে অতি বৃদ্ধ। আমার পিতৃদেবের অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় কি ছোট তাহা আমি জানি না—কিন্তু তাঁহাকে ক'বরেজ কাকা বলিয়া ডাকিতাম। ক'বরেজ কাকার কোনো আড়ম্বর ছিল না, একখানি সাদা ধুতি পরিয়া এবং একখানি উড়ানি গায়ে দিয়া ও ঔষধের একটি পুঁটুলি চাদরের একটি কোণে বাঁধিয়া লইয়া তিনি রোগী দেখিতে বাহির হইতেন। জাঁকজমক না থাকুক, কিন্তু যে রোগী হাতে লইতেন, তাহার রোগ মন্ত্রের মত আরোগ্য হইত। লোকে এই জন্য তাহাকে ধন্বন্তরি বলিয়া মনে করিত।

আমরা ফিরিয়া আসার পর আমি শেফালিকাকে বলিলাম,—"শিউলি দিদি, তোমাকে শুধু শুধু এখানে লইয়া আসি নাই, আমাদের গ্রামের যে ক'বরেজ কাকা আছেন, তাঁহাকে দিয়া তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইব।

শিউলি দিদি উত্তর করিলেন,—"ক'বরেজ কাকা আমার কি করিবেন ?"

আমি বলিলাম—"তোমার সকল রোগ সারিয়া যাইবে, হয় তো তুমি তাঁহার ঔষধে সন্তান-মুখও দেখিতে পাইবে।"

শিউলি দিদি রাজি হইল না,- আমিও কিন্তু নাছোড়-বান্দা। আমি জোর করিয়া ক'বরেজ কাকাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং শিউলি দিদিকে কাছে লইয়া গিয়া তাহার অসুখের সকল কথা তাহার মুখ দিয়া বলাইলাম।

শিউলি দিদির প্রধান রোগ ছিল অজীর্ণ। সে যাহা খাইত হজম হইত না, বৈকাল বেলা অম্লের ঢেকুর উঠিত, সময় সময় বুকও জ্বলিত, সন্ধ্যার দিকে পেট্‌টাও কিছু ফাঁপিত, দাস্ত ভালরূপ হইত না, কখনো কখনো দমকা ভেদ হইত। এই সকল উপদ্রবই তাহার প্রবল ছিল। তা' ছাড়া স্ত্রীধর্ম্ম বলিলে যাহা বুঝায় অর্থাৎ মাসিকটা প্রতি মাসে হইত বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার ছিল না, সে সময়

তলপেটে ভয়ঙ্কর বেদন হইত, কখনো কখনো বুকে এবং পেটে একটা শূলবং বেদনাও উপলব্ধি হইত।

এ সকল ছাড়া সন্তান না হওয়ার জন্য তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়া সকলেই স্থির ক'রিয়াছিলেন। শিউলি দিদি স্থির করিয়াছিলেন,—এই রোগটিই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

ক'বরেজ কাকা ধীরভাবে সকল কথাই শুনিলেন, শেষে বলিলেন,—'দেখ আপাততঃ বিশেষ কোনো ঔষধ দিব না। একটা টোট্‌কা-ব্যবস্থা বলিয়া দিই, সেইটা কয়দিন খাওয়াইয়া দেখ, তাহার পর যা হয় ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

আমি বলিলাম "কি টোটকা?"

ক'বরেজ কাকা বলিলেন,—বাজার হইতে এক পয়সার কি দু' পয়সার বিটলবণ আনাইয়া লও। উহা গুঁড়া করিয়া একটি শিশিতে রাখিয়া দিবে এবং প্রত্যহ দু'বেলা আহারের পর এক আনা মাত্রায় মুখে ফেলিয়া একটু জল খাইবে। এরূপ ব্যবস্থায় কয়েকদিন চলিয়া তাহার পর যাহা হয় আমাকে জানাইও।

আমি বলিলাম—"ইহাতেই সারিবে?"

তিনি বলিলেন,—"নিশ্চয়। তবে বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমি বরাবরই একটু মুখরা, আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে ব্যবস্থাটা কি?"

ক'বরেজ কাকা বলিলেন,—"ফলকল্যাণঘৃত"টি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে ঘৃত আপাততঃ "উহার সহ্য হইবে না, আর উহা তৈযার করিতেও সময় লাগিবে। যাহা হউক যে ব্যবস্থা বলিলাম, আপাততঃ এই ব্যবস্থাই ক'রিয়া দেখ।"

আমি আবার বলিলাম—"না, কাকা, তাহা হইবে না, এ ব্যবস্থা তো করিবই. কিন্তু আপনার কেই ফলকল্যাণ ঘৃত প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কত খরচ পড়িবে বলুন তো! এখনি আপনাকে দিয়া দিতেছি।"

ক'বরেজ কাকা বলিলেন,—'এখন ঘৃত সহ্য হইবে কিনা বলা যায় না, যদি ঘৃত সহ্য না হয়, তাহা হইলে এখন উহা করিয়া কোনো ফল নাই। ঘৃত সহ্য না হইলে অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

আমি আবার বলিলাম,—"সেই ব্যবস্থাটাই করিয়া দিন কাকা, আপনার এই বিটলবণের সহিত সেই ব্যবস্থাও চলুক।"

ক'বরেজ কাকা বলিলেন,—"আচ্ছা কয়দিন যে যাক।"

* * * *

ক'বরেজ কাকার বিটলবণের গুণে শিউলি দিদির অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য সারিয়া গিয়াছে। এইবার তিনি ফলকল্যাণ ঘৃতও প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এক বং গাভীর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। উহার প্রধান উপাদান হইল 'লক্ষণা মূল' ক'বরেজ কাকা বলিলেন, "যদি ঘৃত সহ্য না হয়, তাহা হইলে এই লক্ষণামূলই দুধে-জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাই খাইতে দিবেন।" লক্ষণামূল সহজে পাওয়া যায় না, বৈদ্যনাথ অঞ্চল হইতে ক'বরেজ কাকা তাঁহার এক পরিচিত লোককে পত্র লিখিয়া ইহা আনাইয়াছিলেন তাঁহার মুখে শুনিলাম—লক্ষণামূলের অদ্ভুত ক্ষমতা, লক্ষণা মূল আনাইয়া সেবন করিতে পারিলে ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই বন্ধ্যার অপত্য মুখ সন্দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

* * * *

যাহা হউক শিউলি দিদির কিন্তু আর অধিক দিন পিত্রালয়ে থাকা হইল না, সহসা কলেরা রোগে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর লোকান্তর ঘটিল। তিনি পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই কালের কঠোর আহ্বানে তাঁহাকে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হইল। শিউলি দিদি তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্যের পূর্ব্বেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে আমি ভাল করিয়া

বলিয়া দিলাম,—"ঔষধটী প্রত্যহ সেবন করিতে ভুলিওনা এই ঔষধের গুণেই তুমি নিশ্চয় পুত্রবতী হইবে, ক'বরেজ কাকার কথা কখনো মিথ্যা হয় না।"

শিউলি দিদি ভ্রূকুটি করিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"বেশ, আগে হইতে খাকার ভাতের সময় তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রয়া রাখিতেছি।" —আমি বলিলাম—"তোমার কথা নিশ্চয়ই সফল হইবে।"

*　　*　　*

সত্যই ক'বরেজ কাকার ফলকল্যাণ ঘৃতের ফল ফলিল। কয়েক মাসের পর শিউলি দিদির পত্র পাইলাম, তিনি সত্য সত্যই গর্ভবতী হইয়াছেন। তাঁহার শাশুড়ীর মৃত্যুর পরই তাঁহার স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন শাশুড়ী ঠাকরাণীর প্রেতাত্মা আসিয়াও তাঁহার স্বামীকে আদেশ করিলে—"তিনি কারণ দেখাইতে পারিতেন যে, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শেফালিকার বন্ধ্যাত্ব নাম ঘুচিয়াছে।"

*　　*　　*　　*

ইহরে কয়েক মাস পরে কলিকাতা হইতে একখানি চিঠি পাইলাম, এ চিঠি শিউলি দিদির নহে, শিউলি দিদির স্বামী এ চিঠি পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্নেহময়ী কমল, তোমার বাক্য সফল হইয়াছে, অদ্য প্রাতঃকালে ৭—১৫এর সময় তোমার শিউলি দিদি একটী নবকুমার প্রসব করিয়াছেন। নূতন অতিথির কচি ক্রন্দনে সূতিকাগারের চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তোমার শিউলিদিদির অনুরোধে অদ্য তোমাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলাম আশাকরি সকলে ভাল আছ।"

আমি ননদিনীকে বলিলাম,—"ঠাকুর ঝি, কালই আবার কালীঘাট যাইবার ব্যবস্থা কর। এবার কিন্তু ক'বরেজ কাকাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।"

পারিবারিক চিকিৎসা

(৩)

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগরত্ন, এল, এ, এম, এস)

কলেরা বা ওলাউঠা

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত বিসূচিকা এবং এখনকার কলেরা একই রোগ বলিয়া অনেকে স্থির করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুইটি রোগ এক শ্রেণীভুক্ত কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকা রোগের মূল কারণ অজীর্ণ, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, অজীর্ণের কোন লক্ষণই নাই—অথচ কলেরা রোগ উপস্থিত হইল। এরূপ অবস্থায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদগণ ইহা যে বিষাক্ত বীজাণু হইতে উপস্থিত হইয়া থাকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—তাহাই ঠিক।

কলেরার প্রকার ভেদ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদগণ এই ভয়ঙ্কর আশুপ্রাণনাশক ব্যাধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; ব্রিটিশ ও এসিয়াটিক। পাশ্চাত্যদেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে যাহারা এলোপ্যাথ্ তাঁহারা আবার ইহাকে তিন ভাগে

বিভক্ত করেন, (১) বিলিয়াস বা পৈত্তিক, ফ্লাটুলেন্ট বা বাতিক এবং স্প্যাজমোডিক বা সান্নিপাতিক। গ্রীক শব্দ কোলে হইতে 'কলেরা' নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'কোলে' শব্দের অর্থ পিত্ত।

এসিয়াটিক কলেরা।—কলেরার সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে এসিয়াটিক কলেরা অতি সাংঘাতিক। সর্ব্বপ্রথমে ইহা দেখা দিয়াছিল, আমাদেরই বাঙ্গলা দেশে। নদীয়া ও যশোহর ইহার সর্ব্ব প্রথম উৎপত্তি স্থান, ক্রমে ইহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর রোগ প্রায়ই শেষ রাত্রে, কখন বা প্রাতঃকালেও আক্রমণ করিয়া থাকে। এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হইলে সাধারণতঃ রোগী রক্ষা পায় না। শেষরাত্রে এই রোগে আক্রান্ত হইলে সে যে কিছুতেই বাঁচিবেনা—ইহা নিশ্চিত।

কলেরার সাধারণ লক্ষণ।—এই রোগ উপস্থিত হইলে প্রথমে দুই এক বার অতিসারের ন্যায় মলভেদ ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া, জলের মত, চাউল ধোয়া জলের মত অথবা পচা কুমড়ার জলের মত ভেদ ও জলের মত বমন হইতে থাকে। এক সঙ্গে ভেদও বমন—এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগে কখনো কখনো রক্তবর্ণ ভেদ হইতেও দেখা যায়, উদরে অসহ্য বেদনা হয়, মলের গন্ধ পচা মাংসের ন্যায় হয়, এবং মূত্র বন্ধ হইয়া যায়। ক্রমশঃ চক্ষু দুইটি কোটর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, ওষ্ঠদ্বয় নীল বর্ণ হয়, নাসিকা উচ্চ হয়, হস্তপদ শীতল ও সঙ্কুচিত হয়, হস্তে ও পদে খাল ধরিতে থাকে, অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ চুপসিয়া যায়, দেহ রক্তশূন্য ও ঘর্ম্মযুক্ত হয়। নাড়ীর অবস্থা অতিক্ষীণ, শীতল অথচ বেগযুক্ত অনুভূত হয়, ক্রমশঃ উহা লুপ্ত হইয়া থাকে। অত্যন্ত পিপাসা, মোহ, ভ্রম, হিক্কা, প্রলাপ, জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, দন্ত বাহির হইয়া পড়া—এই গুলি ইহার সাধারণ লক্ষণ। স্বরভঙ্গ ও গলার স্বর বসিয়া যাওয়া—কলেরা রোগীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শারীরিক সন্তাপ।—থার্ম্মোমিটার দিয়ে কলেরা রোগীর শারীরিক উত্তাপ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৯৭ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিয়া থাকে এই রোগে ভোগকালের কোনো বিশেষ নিয়ম নাই, কেহ বা দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কেহ বা দুই চারি দিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এই রোগে আক্রান্ত রোগীর অঙ্গে অতিশয় বেদনা, স্বরভঙ্গ, কম্প, অস্থিরতা এবং শান্তি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার জীবনের আশা কম যায় না।

চিকিৎসার সাধারণ কথা।—এই রোগ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই একেবারে ধারক ঔষধ দিতে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভয়ঙ্কর রোগে ভেদ ও বমন—উভয়ই হইয়া থাকে, এজন্য প্রথমেই বলবান ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভেদ নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু বমন বৃদ্ধি ও উদরাধ্মান অর্থাৎ পেটের ফাঁপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অজীর্ণ হইতে যদি এই রোগ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে অজীর্ণ রোগের ঔষধ বা মুষ্টিযোগাদির প্রয়োগে বেশ ফল পাওয়া যায়। জল এই রোগে বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ এই রোগে হঠাৎ রক্তের জলীয় অংশ কম হইয়া যায়। এই রোগে যে দারুণ পিপাসা হইয়া থাকে, তাহার কারণ হইল ইহাই রক্তের জলীয় অংশ কম হয় বলিয়া রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হাতে পায়ে খালও ধরে—ইহারই জন্য। যাহা হউক কোনোরূপে রক্তের মধ্যে যথেষ্ট জল প্রবেশ করান এই রোগে কর্ত্তব্য, এইজন্য পিপাসা পাইলে জল বন্ধ করা উচিত নহে।

চিকিৎসা—(১) দারুচিনি ৵৹ আনা, জায়ফল কুঙ্কুম) ৵৹ আনা, লবঙ্গ ।৵৹ আনা এবং ছোট এলাইচের দানা ৹ চারি আনা—পৃথক পৃথক বেশ ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া ২৫ তোলা কাশীর চিনির সহিত বেশ ভালরূপে মিশাইয়া লইবে এবং তাহার পর ওজন করিয়া ওজনে যতটা পাওয়া যাইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ চা খড়ি তাহার সহিত মিশাইয়া হইবে। এই ঔষধটি রোগীর বয়স এবং বলাবল বিবেচনা করিয়া ১০ দশ রতি হইতে ৩০ ত্রিশ রতি পর্য্যন্ত বারংবার শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগীর বয়স যদি ২০ কুড়ি বৎসরের অধিক এবং ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের কম হয়, তাহা হইলে ঐ ঔষধ ১০ দশ রতি হইতে ২০ কুড়ি রতি এবং অর্দ্ধরতি অহিফেন—একত্র মিশাইয়া সেবন করান যাইতে পারে। রোগীর বয়স কুড়ি বৎসরের কম হইলে অহিফেন মিশান কর্ত্তব্য নহে।

(২) অহিফেন ½ রতি, মরিচচূর্ণ ¼ সিকি রতি ও কর্পূর ১ এক রতি—একত্র মিশ্রিত করিয়া এক এক মাত্রা কলেরা রোগীর প্রত্যেক দাস্তের পর সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

(৩) কচি আপাঙ্গের মূল অর্দ্ধ তোলা এবং ৫।৬টি গোল মরিচ—একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া এক ছটাক জল সহ মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ৬।৭ বার খাওয়াইলে কলেরার প্রথমাবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে।

(৪) কর্পূর ২ দুইরতি, শুঁঠের গুঁড়া।৹ চারি আনা এবং চূণ ৮ আট রতি—একত্র মিশাইয়া ৮ আট ভাগ করিতে হইবে। এই ঔষধটি কলেরার প্রথমাবস্থায় পনের মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

মূত্র নিঃসরণের জন্য।—কলেরার মূত্র নিঃসরণের জন্য (১) পাথরকুচির পাতার রস ১ এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে। যদি ইহাতে মূত্রঃ নিসৃত না হয়, তাহা হইলে (২) গোক্ষুর বীজ, শসার বীজ, কাঁকুড় বীজ ও তুরালতা—এক একটী দ্রব্য অর্দ্ধতোলা করিয়া লইয়া, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহার সহিত দুই আনা পরিমিত সোরা মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। (৩) মূলার পাতার রস এবং সোরা একত্র বাটিয়া বাস্তিতে প্রলেপ দিলেও এ অবস্থায় উপকার হয়। কুশের মূল, কেশের মূল, শরের মূল, এরেরমূল এবং কুশুইশের মূল—প্রত্যেকটী ৵১০ আনা ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, তাহার সহিত দুই আনা পরিমাণে সোরা মিশাইয়া সেবন করাইলেও অনেক সময় প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া থাকে।

বমন নিবারণের জন্য।—এক খই এবং এক তোলা চিনি—দেড় পোয়া জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইবে এবং বেণার মূল এক তোলা, ছোট এলাইচ অর্দ্ধ তোলা এবং মৌরী অর্দ্ধ তোলা বাটিয়া ও শ্বেতচন্দন এক তোলা ঘসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় এই জল পান করিতে দিলে বিশেষরূপ উপকার হয়। সরিষা বাটিয়া উহার প্রলেপ দিলেও বমন নিবারিত হয়।

খালধরা নিবারণের জন্য।—হাতে পায়ে খাল ধরার জন্য সরিষার তৈলের সহিত কর্পূর মিশাইয়া কিম্বা তার্পিন তৈল ও সুরা একত্র মিশাইয়া অথবা শুঁঠ চূর্ণ অথবা কুড় ও সৈন্ধব লবণ—কাঁজি ও তিল তৈলের সহিত বাটিয়া মালিশের ব্যবস্থা করিলে উপকার হয়। এই সকল প্রক্রিয়া করিয়াও খাল্ধরার উপকার না হইলে, দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুলফা—কাঁজির সহিত বাটিয়া মালিশ করিলে উপকার হইবে।

হিক্কা নিবারণের জন্য।—রাইসরিষা বাটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে প্রলেপ দেওয়া হিতকর।

উদরের বেদনা নিবৃত্তির জন্য।—

বরফকার ও যব চূর্ণ একত্র মিশাইয়া ঘোলের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া উদরে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও উপকার দর্শে। ফ্লানেল লইয়া গরম জলের স্বেদ দিলেও উপকার হয়।

পিপাসায়।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হঠাৎ রক্তের জলীয় অংশ এই রোগে কমিয়া যায় এবং ঘন ঘন পিপাসা হইতে থাকে। এই অবস্থায় বরফের টুকরা মুখে দেওয়া বিশেষ হিতকর। বরফ না পাইলে কর্পূর মিশাইয়া শীতল জলও পান করিতে দেওয়া যায়।

ঘর্ম্মে।—আবির মাখানর ব্যবস্থা ভাল। এইরূপ অবস্থায় প্রবালভস্ম পূর্ণবয়স্কের জন্য ২ রতি মাত্রায় এবং শিশু হইলে ঐ হিসাবে মাত্রা ঠিক করিয়া মধুর সহিত সেবন করান বিশেষ হিতকর।

এই রোগে হাতের তলা ও পায়ের তলা শীতল হইলে অথবা জ্ঞান নষ্ট হইতেছে দেখিলে আগুনের স্বেদ দেওয়া উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের তালিকা

(ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-ডি, ডি-এস্ সি)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা ৮৯ স্তম্ভ ২ পঙ্‌ক্তি ১৪ "র" স্থলে "রি"
,, ৯০ ,, ১ ,, ৫ "প্য" স্থলে "প"
,, ৯০ ,, ১ ,, ৩০ "এসিয়াটিকের" পর "সোসাইটি"
,, ৯১ ,, ১ ,, ২৭ "বলুর" স্থলে "বল্" বসিবে
,, ৯২ ,, ২ ,, ৩ "বাওয়ার" স্থলে "বাওয়ার"]

ভারতের নানাস্থানে দৃষ্ট সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তালিকা।

(১) দক্ষিণ ভারতের নানা ব্যক্তির গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। গুস্তব অপ্পার্ট সাহেব দ্বারা সঙ্কলিত। দুই খণ্ডে সমাপ্ত। (অপ ১, অপ ২)

(২) উত্তরপশ্চিম প্রদেশে নানা ব্যক্তির গৃহস্থ পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা। (১৮৭৪)। [উ ১]

(৩) উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে বিভিন্ন গৃহস্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা; ১—১০ খণ্ড (১৮৭৭—৮৬ খৃষ্টাব্দ) [উ ২]

(৪) কবিন্দ্রাচার্য্যের পুস্তকালয়ের তালিকা। অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী দ্বারা সঙ্কলিত। গাইক্‌বাদ্ ওরিয়েণ্টাল্ সিরিজ বরোদা; ১৯২১। [কবি]

(৫) বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে পুঁথির অনুসন্ধানের রিপোর্ট ১৮৯১—২, ১৮৯২-৩, ১৮৯৩—৪ এবং ১৮৯৪—৫ খৃষ্টাব্দে। এ-বি-কথবতে দ্বারা সঙ্কলিত। [কথ]

(৬) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণভাগে সঞ্চিত সংস্কৃত ''থের বর্ণানুক্রমিক তালিকা। এফ্ কীলহর্ণ্ কর্তৃক সংগৃহীত। ১ম খণ্ড (১৮৬৯) [কী ১]

(৭) মধ্যপ্রদেশস্থ সংস্কৃত পুঁথির তালিকা এফ কীলহর্ণ কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৭৪ [কী ২]

(৮) ১৮৭৭—৮, ১৮৬৯—৭৮ এবং ১৮৮১ মে হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের জন্য ক্রীত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। এফ্ কীলহর্ণ্ কর্তৃক সঙ্কলিত। (১৮৮১ [কী ৩]

(৯) বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১৮৮০ ৮১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের রিপোর্ট। এফ্ কীলহর্ণ্ দ্বারা সঙ্কলিত (১৮৮১ [কী ৪]

(১০) ৮৭৯৮০ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত পুঁথির তালিকা সংগ্রহের রিপোর্ট। পণ্ডিত কাশীনাথ কুন্তে কর্তৃক সঙ্কলিত। [কু ১]

(১১) সংস্কৃত পুঁথির রিপোর্ট: ১) ১৮৮০, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর, ২) ১৮৮০, অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর (৩) ১৮৮০ ১ ৪) ১৮৮১ এপ্রিল হইতে জুন। পণ্ডিত কাশীনাথ কুন্তে কর্তৃক সঙ্কলিত। [কু ২]

(১২) পাঞ্জাবে গুজরণওয়ালা এবং দিল্লী জেলায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথির সম্বন্ধে বক্তব্য। পণ্ডিত কাশীনাথ কুন্তে কর্তৃক সঙ্কলিত। [কু ৩]

(১৩) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। জে সি নেসফিল্ড্ কর্তৃক সঙ্কলিত। ১৮৭৮) [দে ১]

(১৪) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা। পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ কর্তৃক সঙ্কলিত। (১৮৭৮) [দে ২]

(১৫) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় আবিষ্কৃত পুঁথির তালিকা। পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ কর্তৃক সঙ্কলিত। (১৮৭৯) [দে ৩]

(১৬) অযোধ্যারক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির তালিকা ১—২২ খণ্ড। (১৮৭২—১৮৯৩) [দে ৪ (১—২২)]

(১৭) বোম্বাই প্রদেশে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের কার্য্যাবলী। পি, পিটার্সন কর্তৃক সঙ্কলিত। [পি (১—৬)]

(১) প্রথম রিপোর্ট ১৮৮২ আগষ্ট—১৮৮৩ মার্চ্চ

(২) দ্বিতীয় রিপোর্ট। ১৮৮৩ এপ্রিল ১৮৮৪ মার্চ্চ

(৩) তৃতীয় রিপোর্ট। ১৮৮৪ এপ্রিল-১৮৮৬ মার্চ্চ

(৪) চতুর্থ রিপোর্ট। ১৮৮৬ এপ্রিল—১৮৯২ মার্চ্চ

(৫) পঞ্চম রিপোর্ট। ১৮৯২ এপ্রিল—১৮৯৫ মার্চ্চ

(৬) ষষ্ঠ রিপোর্ট। ১৮৯৫ এপ্রিল ১৮৯৮ মার্চ্চ

(১৮) মেওবিষ্ট সংস্কৃত কথা। [ফে]

(১৯) ফ্লোরেণ্টাইন সংস্কৃত পুঁথি। থিওডোর আউফেক্ট কর্তৃক সঙ্কলিত। [ফ্লো]

(২০) সংস্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে রিপোর্ট, ১৮৭২ ৩। [বম্বে]

(২১) গুজরাট, কচ্ছ সিন্ধু ও খান্দেশ প্রদেশে নানা গৃহস্থ পুস্তকালয়ে রক্ষিত পুঁথির তালিকা। ১—৪ খণ্ড (১৮৮১ ৩) [বু ১]

(২২) গুজরাটে ১৮৭১ ২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের ফলের রিপোর্ট। জি বুলার কর্তৃক সঙ্কলিত (১৮৭২) [বু ২]

(২৩) সংস্কৃত পুঁথির সম্বন্ধে রিপোর্ট। জি, বুলার কর্তৃক সঙ্কলিত (১৮৭৫) [বু ৩]

(২৪ কাশ্মীর, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানে ভ্রমণের রিপোর্ট। জি, বুলার কর্তৃক সঙ্কলিত। (১৮৭৭ বু ৪

(২৫) সংস্কৃত পুঁথির ৪টী তালিকা। জি, বুলার কর্তৃক সঙ্কলিত [বু ৫]

২৬) ১১১ খানা পুঁথির সম্বন্ধে রিপোর্ট। আর্-জি ভাণ্ডারকার দ্বারা সঙ্কলিত (১৮৮০ [ভা ১]

(২৭) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের রিপোর্ট আর, জি, ভাণ্ডারকার কর্তৃক সঙ্কলিত। [ভা ২]

(১) ১৮৮১-২ খৃষ্টাব্দে (১৮৮২

(২) ১৮৮২-৩ খৃষ্টাব্দে (১৮৮৩

(৩) ১৮৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে (১৮৮৭)

(৪) ১৮৮৪-৫, ১৮৮৫-৬, ১৮৮৬-৭ (১৮৯৪)

(৫) ১৮৮৭-৮, ১৮৮৮-৯, ১৮৮৯-৯০, ১৮৯০-১ (১৮৯৭)

(২৮) নোটিসেস্ অব সাংস্কৃট্ মানুস্কৃপ্টস্। রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১—১০ খণ্ড (১৮৭১—৯২) [রা (১—১০)]

(২৯) পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের গৃহে রক্ষিত পুঁথির তালিকা পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সংগৃহীত। [রাধা]

(৩০) নোটিসেস্ অব সাংস্কৃত মানুস্কৃপ্টস ১১শ খণ্ড। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। [শা ১]

(৩১) সংস্কৃত পুঁথির অনুসন্ধানের রিপোর্ট (১৮৯৫ ১৯০০)। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। [শা ২]

(৩২) নোটিসেস্ অব সাংস্কৃট্ মানুস্কৃপ্টস্। ২য় ভাগ ১—৪ খণ্ড। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। [শা ৩ (১—৪)]

(৩৩) সংস্কৃত ও তামিল পুঁথির অনুসন্ধানের রিপোর্ট শেষগিরি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১-২ সংখ্যা [শে (১-২)]

(৩৪) দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত পুঁথি সম্বন্ধে রিপোর্ট ই, হুল্টশ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১—৩ খণ্ড [হু (১—৩)]

[ক্রমশঃ]

স্বাস্থ্যরক্ষায় শ্রীশ্রীপাগল হরনাথের উপদেশ

স্ত্রীকে খেলিবার জন্য সহযোগিনী মনে করিয়া ইহ পরকালের সকল শক্তি হারান কোনো রকমে উচিত নয়। স্ত্রীকে ইহপরকালের প্রধান সঙ্গিনী মনে করিতে হয়, সামান্য পার্থিব খেলার সঙ্গিনী স্ত্রী নন্।

\+ + +

স্ত্রী—ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করেন বলিয়াই তাঁ'র নাম সহধর্ম্মিণী, আমাদের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁর নাম জায়া। তাই বলি, ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ—সকল অবস্থাতেই স্ত্রী আমাদের প্রধান সহায়, আমি যদি নরকে যাইতে চাই, তিনি নষ্ট লইয়া যাইবেন, আর স্বর্গের পথও তিনি দেখাইয়া দেন, বৈরাগ্য ও মোক্ষপদ তাঁরাই দেখাইতে পারেন।

\+ + +

স্ত্রী বিলাসের দ্রব্য নন্। স্ত্রীগণই জগজ্জীবন। তাঁ'রাই প্রেম ভক্তির আধার। আবার অসদ্ব্যবহার করিলে তাহারাই ঘোর কালরূপিণী পিশাচী ও রাক্ষসী হইয়া সকলকে গ্রাস করেন। বেশ্যাগণ এই কালান্তক মূর্ত্তির সামান্য ছবি মাত্র। স্ত্রীরূপিণী মহাসমুদ্রে মহামহা রত্ন আছে। রসিকগণ সেই সব মহারত্নের অধিকারী হইয়া সুখে জীবন কাটান, আর আমাদের মত দুর্ব্বল ও ঘৃণিত ব্যক্তিগণ কামান্ধে মত্ত হইয়া ঐ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া অচিরে অস্তিত্ব হারায়। অতি সাবধানে এ মহাশক্তির সঙ্গে ব্যবহার করিবে। কদাচ কামনয়নে স্ত্রীগণকে দেখিও না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সম্মিলন—এক স্ত্রীতেই দেখিতে পাইবে।

\+ + +

হিন্দুরমণীকে বিবি না সাজাইয়া গরিবের মা বাপ সাজাইবার চেষ্টা করিও। তা' না হ'লে সুখ নাই, লাভের মধ্যে বিস্তর কলঙ্ক ও বিপদ আছে। আদর্শ যুগল হইয়া আদর্শযুগলকে ভজনা করিবে। "পুত্রার্থং

ক্রিয়তে ভার্য্যা"। তাই বলিয়া সকল পুত্রই পুত্র নয়। একটি মাত্র পুত্র, বাকী সবগুলিই কামজ। তাই বলি, কেবল পুত্র কন্যাতে ঘর ভরিবার জন্য স্ত্রী নয়। অধিক পুত্র কন্যা—অধিক যাতনার মূল—এটি যেন মনে থাকে। পুত্র-কন্যাকে ভ্রান্তির ধ্বজা মনে করিও, সে ধ্বজা পাইবার জন্য লালায়িত হইও না। এ 'দিল্লিকা লাড্ডু' না খাওয়াই ভাল, যে খাইয়াছে, সে জনমের মত পস্তাইতেছে, অতএব এর জন্য এর দোর, তা'র দোর ক'রে বেড়াইও না। একটি ছিলে, দু'টি হ'য়েছ, আর বিস্তীর্ণ হ'বার আশা রাখিও না।

\+　　+　　+

এ পৃথিবীতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করা কেবল মাত্র স্বার্থপূরণ উদ্দেশ্যে নহে। এমন অনেক সেবা—মাবাপের আছে, যাহা সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতে নিজ দ্বারা হইতে পারে না! এইজন্য স্নেহরূপিণী দেবীর দরকার। যে সমুদ্র—চন্দ্র ও রত্নকে প্রসব করিয়া রত্নাকর হইয়াছে, প্রাণনাশক হলাহলও সেই সমুদ্র সম্ভূত—এটি যেন মনে থাকে। যখন তোমার নিকট রত্ন, বিষ দুইই রাখিয়া দিয়াছেন, তোমার ইচ্ছানুসারে যেটি খুসী—লইতে পার। স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবী করা কিংবা ঘোর পিশাচী করা—তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।

\+　　+　　+

কোনো বিষয় অধিক চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিতে ভয় পাও, সেটি মনে চিন্তা করিতে ভয় পাইবার চেষ্টা করিও। যেটি কার্য্যে কর—সেটি গোপন করিবার চেষ্টা করিও না। এমন কাজ হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, যাহার বিষয় পরে চিন্তা করিলে মনে কষ্ট পাইতে হয়। এমন কাজ করিতে নাই—যাহা লোকের নিকট বলিতে পারা যায় না।

\+　　+　　+

অসৎ চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিবে। মন্দকর্ম্ম অপেক্ষা মন্দচিন্তার বেশী ক্ষমতা, এইজন্য হঠযোগ অপেক্ষা রাজযোগ বেশী প্রশংসনীয়।

\+　　+　　+

পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। বরং কায়া দ্বারা অনিষ্ট করিবে, তবু যেন অনিষ্ট চিন্তা না করা হয়। চিন্তার শক্তি অতীব প্রবল। * * পাপ কায়া অপেক্ষা পাপের চিন্তা অধিক অনিষ্টকারী। * * চিন্তাই শরীর জীর্ণশীর্ণ করিবার প্রধান জিনিস। * চিন্তার শক্তি কর্ম্মের অপেক্ষা কোটীগুণ বলবতী। * অসৎ চিন্তা দ্বারা জগতের যত অনিষ্ট হ'তে পারে, অসৎ কর্ম্মের দ্বারা তত হ'তে পারে না। পরোপকার ব্রতকে সৎ চিন্তার সঙ্গিনী ক'রে দিও, এদের দু'টিতে সুমিল।

\+　　+　　+

কায়া অপেক্ষা চিন্তার জোর বেশী বুঝিয়াই, চিন্তাগুলি সদাই আনন্দের করিও। অন্তর ধোতের জন্য চিন্তাই সাবান জানিবে। সাবান যতই পবিত্র ও পরিষ্কার হ'বে, অন্তর ততই সুন্দর ও সুচারু হ'বে। * * সদাই সদালাপ করিবে। বন্ধুর সঙ্গে পরিহাসচ্ছলেও কখনো কুচিন্তা করিও না বা কুভাব মনে আনিও না। * * নিজ নিজ চিন্তাগুলিকে সদাই নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, যে দেখিবে সেই আনন্দিত হইবে।

\+　　+　　+

অসৎ সঙ্গে পড়িয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও কত অন্যায় কর্ম্ম করিতে হয়। অসৎসঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ সদাই প্রার্থনা করিবে। যে দ্রব্য ইচ্ছা করা যায়, তাহা কখনই দুষ্প্রাপ্য থাকে না, তাই বলি, পাও আর নাই পাও—সদাই সৎসঙ্গ অভিলাষ করিবে। * * সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য রাখিবে।

\+　　+　　+

মনের মত সঙ্গী না পাইলে সর্ব্বদাই একলা থাকিবে। সাধু সহবাস ব্যতীত যেন অসৎসঙ্গ কখনো করিবার ইচ্ছা

না হয়। নিতান্ত ভালবাসার উপরোধেও যেন অসৎ স্থানে ও অসৎসঙ্গে না যাওয়া হয়।

\+ + +

শরীর আহারের উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হ'বে? মাটির দ্রব্য কোনো ক্রমেই সোণা হইতে পারে না। সোণা—মাটি হইতে পারে না। সেই রকমই তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিক হইয়া থাকে।

\+ + +

শরীর ভাল রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান উপায়। বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই শরীর রক্ষার মূল কারণ, বীর্য্যধারণই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য এটি যেন মনে থাকে।

\+ + +

শরীর সাধনের মূল। শরীরটি সুস্থ থাকিলে যেমন ইষ্টচিন্তাতে আনন্দ হয়, তেমন রুগ্নশরীরে হয় না। এইজন্য মুনিঋষিগণ সমাধি অবলম্বন করিয়া শরীরকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতেন, কেননা তাহা করিতে পারিলে, অনেক দিন ধরিয়া সাধন করিতে পারিবেন এবং সেইজন্যই হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন।

* * *

শরীরের উপর বিশেষ যত্ন রাখিবে। যুক্ত আহার বিহারে সদাই যত্নবান ও সাবধান হইবে। ভাল খাদ্য ব্যতীত মন্দ ও উত্তেজক দ্রব্য আহার করিবে না। দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি দেবোপভোগ্য দ্রব্যের উপর নজর বেশী রাখিবে। শাক প্রভৃতি ও ফলাদি বেশী ব্যবহার করিতে পারিলে শরীর বেশ ভাল থাকে ও অনেকটা নীরোগ হইয়া থাকে মনে রাখিবে।

\+ + +

শরীর—আহারের নির্ভর করে, এই জন্য যা'র যেমন আহার, শরীর তদনুরূপই হইয়া আপন মত গুণকে অধিকার করে, এইজন্য প্রথমতঃ আহারই সাধনের মূল ভিত্তি মনে করিতে হইবে এবং আহারের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে হইবে। ব্যাধির সময় ও তা'র পর বৈদ্যগণ কেন লঘু পথ্য ব্যবস্থা করেন বল দেখি! লঘু আহার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে ও সত্ত্বগুণের উদয় করায়, আর সত্ত্বগুণটি শরীর রক্ষার একমাত্র শক্তি বলিলেও বলা যায়। আমাদের শাস্ত্রে সেইজন্যই সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আর এই গুণের বিপরীত তমগুণই নাশের কারণ, এই কারণে তম-প্রধান শিবকে সংহারকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাই বলি, শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার। সেই কারণ নিবেদন, কোনো রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারে উচিত।

\+ + +

ফল, মূল, শাক সব্জী—ইহাই সাত্ত্বিক আহার, আর মৎস্য, মাংস মদ্য, পলাণ্ডু, রসুন প্রভৃতি তামসিক আহারের মধ্যে গণ্য। শরীর নীরোগ করিতে চাও তো প্রথমতঃ আহার ঠিক করিতে চেষ্টা করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবে, মৎস্য মাংস একেবারেই ত্যাগ করিবে, যেন তা'তে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে।

\+ + +

ফলের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বফল বিল্ব, এই জন্যই প্রধান ঠাকুরটি এই বিল্বমূল সার করিয়াছেন। বিল্বপত্র, বিল্বছাল, বিল্বফুল ও ফল—প্রত্যেকেরই তমনাশের শক্তি আছে বলিয়াই শিব সকলগুলি ভাল বাসেন। এই বিল্ব ফল পাইলেই খাইবে, ফল অভাবে পাতার রস খাইবে। •

* উপদেশামৃত হইতে গৃহীত।

নিম্ব বা নিম

(শ্রীভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ)

নিম সকলেরই নিকট সুপরিচিত। বাঙ্গলার সকল পল্লীতেই ইহা যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। 'বসন্তে নিম্ব ভোজনং" —স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী বলিয়া অনেকে ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার কচি পাতা ভাজিয়াও খাইয়া থাকেন। কিন্তু শুধু ইহার পাতা নহে, ইহার পাতা, ছাল, ফুল ও ফল— সবগুলিই আমাদের বিশেষ উপকারী।

ইহা তিন প্রকার, নিম, ঘোড়া নিম ও মিঠা নিম। ঘোড়ানিমকে আর্য্যঋষিগণ মহানিম বলিয়া গিয়াছেন। মিঠানিম—হিন্দী কথা, সংস্কৃতে উহার নাম কৈডর্য্য। বাঙ্গলায় উহার স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই, বাঙ্গালীরা উহাকেও ঘোড়ানিমের প্রকারভেদ মনে করিয়া থাকেন।

যাহা হউক সকলপ্রকার নিমই যে আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী, সে বিষয় সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা যেরূপ রক্ত পরিষ্কারক, সেইরূপ বলকারক। শুধু বসন্তকালে নহে, আমাদের মনে হয়, মাঝে মাঝে যদি ইহার কচি কচি পাতা ভাজিয়া সকল সংসারে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় আমরা নানারূপ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহাকে নানারূপ রোগ বিনাশক বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,— **শিশুর জ্বরে**—মধু ও গব্যঘৃত একটু লইয়া উহার সহিত নিমের পাতা পোড়াইয়া সেই ধূম শিশুর গায়ে লাগাইলে শিশুর জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। **ক্রিমি-রোগে**—নিম্বপত্রের রস, মধুর সহিত কয়েকদিন সেবন করিলে বহুদিনের ক্রিমিরোগও আরোগ্য হইয়া থাকে। **কামলা রোগে**—নিমের ছালের বা পাতার রস মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে কয়েকদিন সেবন করিলে অতি বড় কামলা রোগও প্রশমিত হয়। **বাতরক্তে** নিমছাল বা নিমের পাতা—আধ তোলা ও পলতা আধ তোলা—একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন প্রাতঃকালে পান করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। শুধু বাতরক্ত কেন, সকলপ্রকার চর্ম্মরোগ, এমন কি কুষ্ঠ রোগীকেও ইহা ব্যবস্থা করিবে। **কুষ্ঠে**—কুষ্ঠ রোগীকে উপরিলিখিত কাথ পানের ব্যবস্থা ভিন্ন তাহার স্নানের এবং পানের জলও ঐরূপ নিমপাতা ও পলতার কাথে হওয়া উপকারক। **মেহে**—প্রত্যহ আধ তোলা নিমছাল এবং আধতোলা গুলঞ্চ একত্র আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে সকল প্রকার মেহ রোগেই উপকার হইয়া থাকে। **দাহযুক্ত জ্বরে**—দাহযুক্ত জ্বররোগীকে দুইতোলা নিমপাতা—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে চারি আনা টক্ গুড় মিশাইয়া বমন করাইলে দাহ নষ্ট হইয়া থাকে। **কফজ তৃষ্ণায়**—নিমের ফুল আধ তোলা ঐরূপ আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া গরম গরম কাথ পান করিতে দিবে। **ব্রণে**—মধুর সহিত নিমের পাতার প্রলেপ দিলে ব্রণের কদর্য্য স্রাব নিবৃত্ত হয়। **কেশের অকালপক্কতায়** একটু দীর্ঘকাল ধরিয়া নিমের তৈলের নস্য লইলে কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়। **চুলকণায়**—নিমের পাতা চূর্ণ করিয়া অথবা নিমের পাতা ও আমলকী একত্র বাটিয়া চুলকণায় লাগাইলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা নানারূপ ক্ষত এবং অম্লপিত্তও আরোগ্য হইয়া থাকে। **রক্তপিত্তে**—নিমের পাতা ভাজিয়া খাওয়া রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। **চক্ষুরোগে** নিমপাতা, অল্প শুঁঠ ও সৈন্ধব লবণ শীতল জলে পিষিয়া লইয়া গরম করিবে এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে। চক্ষু ফুলিলে বা ব্যথা হইলে বা চক্ষু চুলকাইতে থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। **কফজ হৃদ্রোগে**—নিম-

ছাল এক তোলা ও বচ এক তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ কফজ হৃদ্রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পান করাইয়া বমন করাইলে উপকার হয়। **বাতে**—নিম পাতা বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের উপকার হয়। **পুরাতন জ্বরে**—নিমের শিকড়, নিমের ছাল, নিমের পাতা নিমের ফুল ও ফল—সকল গুলি গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ গরম জলের সহিত চারি আনা হইতে আধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। পালা জ্বরেও উপরিলিখিত যোগটী বিশেষ উপকারী।

সাধারণ দৌর্ব্বল্যে—সাধারণ দুর্ব্বলতা নিবারণের জন্য নিমের পাতা ভাজিয়া খাওয়া উচিত। **শিরঃপীড়ায়**—নিমের ফুল ও পাতা—একত্র বাটিয়া গরম গরম অবস্থায় কপালে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। **নিমের তৈল**—বহুবিধ চর্ম্মরোগ নাশক। গলিত কুষ্ঠে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার **পত্র ও পুষ্প**—রসায়ন এবং মূত্র নিঃসরণের কার্য্যও ইহা দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। **ঘোড়া নিমের** ফুলের প্রলেপে মাথার চুলকানি অতি শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকে।

বাংলার স্বাস্থ্য নীতি।

(শ্রীপৃথ্বীন্দ্র প্রসাদ বিশ্বাস)

Progress and conservation উন্নতি এবং স্থিতিশীলতা এই দুইটি বিষয় লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে দার্শনিকদিগের মধ্যে নানা গবেষণা চলিতেছে। গত ইউরোপ মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য জাতি স্থিতিশীলতার উপকারিতা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমরা বাঙ্গালী জাতিটা Progress এর প্রেমে মাতোয়ারা, উন্নতির নামে পাগল,—"একটা নূতন কিছু কররে ভাই নূতন কিছু কর।" আমরা বাপ দাদার ঘুনেধরা জিনিষ আর চাই না,চাই উন্নতি,সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি, কিন্তু এই উন্নতিটা যে ভিত্তি শূন্য ভাবে স্থাপিত করিতে, চাহিতেছি, তাহা আমরা একবার ভাবিয়া দেখি না। নিজস্ব পরিত্যাগ করিয়া স্থিতিকে বাদ দিয়া উন্নতি কখনই দাঁড়াইতে পারে না। প্রত্যেকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেইটাকে বাদ দিয়া—সম্পূর্ণ নূতনত্বের উপর উন্নতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ব্যর্থ—এই মহা সত্য আমরা ভুলিয়া যাই।

স্বামী—বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে রোগে মরে এক আনা আর চিকিৎসায় মরে বার আনা। রোগ হইলেই তৎসঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ,—সংযম নাই, লঙ্ঘন না , ডাক্তার ডাক,ঔষধ দাও, ইঞ্জেকসন কর, এক ঘণ্টায় রোগ ভাল হওয়া চাই। তা' কি কখনও হয় রে ভাই, রোগেরও একটা ভোগ কাল আছে, যদি নিতান্তই রোগ আনিয়াছ, তাহার পরিপাকের জন্য একটা সময় ও সংযম থাকা আবশ্যক, কিন্তু আমাদের এত ধৈর্য্য কোথায়? আমরা চাই আশু প্রতিকার, অনায়াসে আরোগ্য,—বিনা ক্লেশে মুক্তি—যাহা অসম্ভব তাহাই সম্ভব করিতে যাইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লই।

E. Prescott sherrill লিখিয়াছেন "China, it seems to us has the most civilized, human and truly beneficial idea of the relation of doctors to health. There the physician is paid which his patients are in good health and receives for fees during their illness"

ইহাই প্রাচ্য আদর্শ। হিন্দু সুস্থ অবস্থায় রোগ না আসিতে পারে—তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। একাদশীর উপবাস, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নিশিপালন, তিথি অনুসারে খাদ্য পরিহার ইত্যাদি নানা নিয়মে হিন্দুরা তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেন, আর যদি নিতান্তই রোগ আসিয়া আক্রমণ করিত—তখন প্রথমতঃ লঙ্ঘন. এবং সাতদিন পরে ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখন আর সে দিন নাই, এখন ঔষধ দিতে ৩ ঘণ্টা বিলম্ব হইলেই সর্ব্বনাশ। পকেটে পকেটে ঔষধপূর্ণ শিশি আর চিকিৎসকের বিলম্ব না হয় তজ্জন্য মোটরের ব্যবস্থা! এ জাতি মরিবে না ত' মরিবে কে?

যাহা হউক হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা সকলের জাগিয়াছে, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, এই জাতি কিসে রক্ষা হইবে তাহার মূল প্রতিকার করিবার চেষ্টা মোটেই হইতেছে না।

"নয়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"। স্বাস্থ্য না হইলেই কিছুই হয় না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। হিন্দুকে রক্ষা করিতে হইলে, তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি প্রথম মনোনিবেশ করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য হানিকর সকল প্রকার দুর্নীতি পরিত্যাগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ত' দেখিতে পাই, দেশময় ভেজাল খাদ্য, সকলেই মুখে বলেন, ভেজালে দেশটা উচ্ছন্ন দিল, কিন্তু কেহ কি ভেজালের জাল হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়াছেন? না কাহারও খুঁজিবার অবসর বা চেষ্টা আছে? সকালবেলা ৮টা বাজিতে না বাজিতে স্নান আহার সমাপন করিয়া আফিসে যাইতে হইবে। ঘি চাই, তৈল চাই, মাছ চাই,—সকলই চাই। দোকানদার সবই জোগাইতেছেন, কম পয়সার দিকে বাবু লক্ষ্য রাখিতেছেন, তা'তে ঘৃতে ঘৃতত্ব থাক্ বা না থাক্ সে বিষয় বিচার করিবার শক্তি ও সাবকাশ বাবুর আছে কি? চাই সব, ঘি না হইলে চলিবে না, সেটা ঘি'ই হউক আর ঘৃতাস্বাদ যুক্ত সাবানের ফেনাই হউক। বাবুরা চান কম পয়সায় সংসার নির্ব্বাহ করিতে এবং প্রতিমাসে কিছু টাকা জমাইতে,—নতুবা শেষে কি হইবে?

এইরূপ উদাসীনতার ফলে অখাদ্য ও কুখাদ্য ভোজনে সহরের স্বাস্থ্য কি অবস্থায় দাড়াইয়াছে কেহ লক্ষ্য করেন কি? শুধু আহারাদির কথা নহে, চিকিৎসার বেলাও এই প্রকার ব্যবস্থা! রোগ হইল, কিন্তু আফিস করা চাই, তাড়াতাড়ি রোগ মুক্তি চাই, এত শিশি শিশি ঔষধ আর আজ ইন্‌জেকসনের ব্যবস্থাও ইহারই জন্য।

বিলাসিতা ও বাবুয়ানা এ দেশের স্বাস্থ্যহানির একটি প্রধান কারণ। নিউমোনিয়া রোগে পল্লীর কৃষক অপেক্ষা বেশী মরেন সহরের বাবু। কৃষক শেষরাত্রের শীতে একমাত্র বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া গরু লইয়া মাঠে গেল, ঠাণ্ডা রৌদ্র তাহার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু সহরের বাবু সোয়েটার গায়ে ডবল মোজা পায়ে দিয়া যাহাতে শ্লেষ্মজ ব্যাধি উপস্থিত হইতে না পারে—তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অথচ, মরিতেছেন তাঁহারাই বেশী।

সহরের স্ত্রীলোকেরাও বেশী মরিতেছেন, কারণ স্ত্রীজাতিও এখন অধিক বিলাসিনী হইয়া উঠিয়াছেন। লাল ঢেঁকি ছাটা চাউলে এখন তাঁহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। সৈন্ধব লবণ ঘরে বাটিতে তাঁহাদের হাতে ফোস্কা উঠে। হোটেলের কেনা ভাত হইলেই যেন তাঁহারা হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচেন। আমরা স্ত্রী শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা রবে দিগন্ত ধ্বনিত করিতেছি আর তাহাদের শিক্ষা দিতেছি নভেল পাঠ আর সংসারটাকে ছারে খারে দেওয়ার নীতি। ফল কথা, শিক্ষার নামে একটা কুশিক্ষা এখন আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

আমাদের বাংলাদেশটাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশী অধঃপাতে গিয়াছে, কারণ পাশ্চাত্যনীতির অনুকরণ এখানে বেশী প্রচলিত। মাড়োয়াড়ী তাহার নিয়ম পরিত্যাগ করে নাই, সে তোমাকে ভেজাল ঘি, বিলাতী নুন খাওয়াইবে কিন্তু সে তাহা স্পর্শও করিবে না। তুমি বাঙ্গালী বাবু একবার হিসাব করিয়া দেখ দেখি,

ঐ মাড়োয়ারি বড় না তুমি বড়? আজ যদি বাঙ্গলাদেশ হইতে মারোয়াড়ী, খোট্টা, ভাটিয়া চলিয়া যায়, তুমি বাঙ্গালী বাঁচিবে কি? তোমার দৈর্ঘ্য রক্ষা হইবে না, জাতি রক্ষা হইবে না, প্রাণ রক্ষা হইবে না।

যাক্ সে সকল কথা।— এখন আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র যে স্বাস্থ্য-রক্ষা ইহা—বাঙ্গালীকে বশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। শুধু 'উন্নতি' 'উন্নতি' রবে আকাশ পাতাল ফাটাইলে কোন ফলই হইবে না। এইজন্ত বলিতেছি, এতদিন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে এই জাতি বাচিতে পারে, আগের মত নীরোগ ও সুস্থ দেহে যাহাতে এই জাতি আবার দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা বাঙ্গালীর প্রথম কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী এই কর্ত্তব্য যতদিন না বুঝিবে, ততদিন তাহার মঙ্গল নাই।

কায়-চিকিৎসা-ক্রমোপদেশ

Practice of medicine

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন)

গুল্ম রোগ।

সাধারণ কথা।—গুল্ম রোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ। মল, মূত্রাদি অধো-বায়ুর কষ্টে নির্গম, অরুচি, অন্ত্রকুজন, আনাহ ও বায়ুর ঊর্দ্ধ গমন—এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি ও বস্তি—এই আভ্যন্তরিক স্থান কয়টিতে সময়ে সময়ে গোলাকার গ্রন্থি উৎপাত হয় বলিয়া ইহার নাম গুল্ম-রোগ।

প্রকারভেদের অবস্থা ও বাতজ গুল্ম।—এই গুল্মের অবস্থিতিস্থানের স্থিরতা নাই, কখন নাভিতে, কখন পার্শ্বে, কখন বস্তিদেশে এই গুল্ম চলিয়া বেড়ায়। ইহার আকারও একরূপ থাকে না,—ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গোলাকার, দীর্ঘাকার নানাপ্রকার হইয়া থাকে। এই গুল্মে আহার পরিপাক হইলে পীড়ার অধিক প্রকোপ এবং আহার করিবামাত্র পীড়ার শান্তিবোধ হইয়া থাকে। এই গুল্মে নানাপ্রকার যন্ত্রণা, মলরোধ, অধো-বায়ুর নিরোধ, মুখ ও গলনালীর শুষ্কতা, শরীরের শ্যাব বা অরুণবর্ণতা, শীতজ্বর অনুভূত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক গুল্মে—আহারের পরিপাক কালে অত্যন্ত বেদনা, ঘর্ম্ম নির্গম, জ্বালা এবং গুল্মস্থান স্পর্শ করিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে। এই গুল্মে জ্বর, পিপাসা, সমস্ত অঙ্গের—বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা হইয়া থাকে। এই গুল্ম কখনো কখনো পাকিতেও দেখা যায়।

কফজ গুল্মে—শরীর আর্দ্র বস্ত্র আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শীতজ্বর, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীর ভারবোধ, শীতানুভব, শারীরিক অবসন্নতা অনুভূত হয়। এই গুল্ম কঠিন ও উন্নত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ গুল্মে—অত্যন্ত বেদনা ও দাহযুক্ত, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক মন, শরীর ও অগ্নিবলের ক্ষয়কারক। এই গুল্ম অতি শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

রক্তগুল্মের উৎপত্তি স্থান গর্ভাশয়। গর্ভস্রাব হইলে কিম্বা যথাকালে প্রসব হওয়ার পরে বা ঋতুকালে অহিতকর আহার বিহারাদি আচরণের ফলে বায়ু কুপিত হইয়া রজো রক্তকে দূষিত করিয়া এই গুল্ম উৎপন্ন করিয়া থাকে ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুল্মের ন্যায়

লক্ষণসমূহ লক্ষিত হয়। এই গুল্ম হইলে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, মুখ পীতবর্ণ হয়, স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ হয়, স্তন হইতে দুগ্ধ নির্গমও হইতেছে দেখা যায়, বিবিধ দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা হয়, মুখ হইতে জল স্রাব হয়, আলস্য অনুভূতি হয়। এক কথায় গর্ভের মত এই গুল্মে সকল প্রকার লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। গর্ভের সহিত এই গুল্মের প্রভেদ এই যে, গর্ভ স্পন্দনকালে কোনরূপ বেদনা থাকে না, এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক সময়ে স্পন্দিত না হইয়া হস্তপদাদি এক একটি অঙ্গ বিশেষ সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়, রক্তগুল্মে সমস্ত পিণ্ডটিই অত্যন্ত বেদনা জন্মাইয়া দীর্ঘকালান্তর স্পন্দিত হইয়া থাকে।

গুল্মের অসাধ্য অবস্থা।—গুল্ম ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া যদি সমস্ত উদরে ব্যাপ্ত হয়, রস রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে, শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং কচ্ছপের ন্যায় উন্নত হইয়া থাকে এবং দুর্ব্বলতা, অরুচি, বমন বেগ, বমি, কাস, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, তৃষ্ণা ও মুখ এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব প্রভৃতি যদি রোগীর হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই গুল্ম অসাধ্য বলিয়া জানিও। গুল্ম রোগীর হৃদয়, নাভি, হস্ত ও পদে শোথ এবং জ্বর, শ্বাস, বমি ও অতিসার অথবা শ্বাস, শূল, পিপাসা, অরুচি এবং গুল্ম যদি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা অসাধ্য জানিবে।

চিকিৎসা।—কোষ্ঠকাঠিন্যই গুল্ম রোগের প্রধান উপসর্গ, এজন্য সকল প্রকার গুল্ম রোগেই কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং বায়ু প্রশমক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। যে গুল্মে দোষবিশেষের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় না—অর্থাৎ কোন্ দোষজাত গুল্ম বুঝিতে অসুবিধা হইবে—সেখানেও বায়ুপ্রশমক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এক কথায় বায়ুর শক্তিকর ঔষধ প্রয়োগ করিলে সকলপ্রকার গুল্মেরই উপশম করা যায়।

বাতজ গুল্মের বিশেষ ব্যবস্থা।—দুগ্ধ ও হরীতকী চূর্ণের সহিত এরণ্ড তৈল পান এবং স্নেহ স্বেদ বাতজ গুল্মে উপকারী। সাচীক্ষার ২ মাষা, কুড় ২ মাষা, কেতকীজটার ক্ষার ৪ মাষা—এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজ গুল্মের শান্তি হয়। শুঁঠ ৪ তোলা, খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল ষোল তোলা, পুরাতন গুড় ৮ তোলা—একত্র পিষিয়া লইয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রশমিত হয়।

পৈত্তিক গুল্মে বিশেষ ব্যবস্থা।—পৈত্তিক গুল্মে বিরেচন হিতকর। ত্রিফলার কাথের সহিত তেউড়ী চূর্ণ কিম্বা পুরাতন গুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া পৈত্তিক গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। যদি দাহ, শূল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জ্বর প্রকাশ পায়, তাহা হইলে গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিবে এবং ব্রণ পাকিবার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গুল্ম পাকিলে অন্তর্বিদ্রধি রোগের ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক।

কফজ গুল্মে বিশেষ ব্যবস্থা।—কফজ গুল্মে উপবাস ও স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু উহার দ্বারা যাহাতে বায়ু কুপিত হয়—এরূপ কদাচ যেন করিও না।

কফজ গুল্মে অবস্থা বিবেচনায় বমন করাইতেও পারা যায়। বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারি ছালের যথারীতি কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করাইলেও কফজ গুল্মের শান্তি হয়। যমানী চূর্ণ ও বিটলবণ—ঘোলের সহিত পান করাইলে বায়ু, মূত্র ও পুরীষের অনুলোম হইয়া কফজ গুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। তিল, এরণ্ড বীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া উষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা তাহার উপর স্বেদ দিবে।

সকল প্রকার গুল্মে কতিপয় ব্যবস্থা। হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুঁঠ—এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় যবের

ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমূহ দূরীভূত হয়। সর্জ্জিকা ক্ষার অর্দ্ধতোলা এবং পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা একত্র মর্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলেও গুল্ম রোগের শান্তি হয়।

রক্তগুল্মে।—রক্তগুল্মে একাদশ মাসের পর চিকিৎসা করা আবশ্যক, কারণ রক্তগুল্ম ও গর্ভ নির্ণয় করিয়া তাহার পর চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন রক্তগুল্ম পুরাতন হইলেই সুখসাধ্য হয়। এই গুল্মে প্রথমতঃ স্নেহপান, স্বেদকার্য্য ও স্নিগ্ধ বিরেচন আবশ্যক। গুলঞ্চ, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটি ও পিপুল—সমভাগে একত্র করিয়া তিলের ক্বাথের সহিত সেবন করাইলে রক্তগুল্মের শান্তি হইয়া থাকে। তিলের ক্বাথের সহিত পুরাতন গুড়, হিং ও বামনহাটী চূর্ণ ও এই গুল্মে সেবন করাইতে পারা যায়। মরিচ চূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান এই গুল্মে উপকারক।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—কাঙ্কায়ণ গুড়িকা—সকল প্রকার গুল্ম রোগেরই মহৌষধ। এই ঔষধ মদ্য বা অম্ল-দ্রব্য সহ সেবনে বাতজ গুল্ম, দুগ্ধের সহিত সেবনে পৈত্তিক গুল্ম, গোমূত্রসহ সেবনে কফজ গুল্ম, ত্রিফলার ক্বাথ বা গোমূত্রসহ সেবনে সান্নিপাতিক গুল্ম এবং উটের দুগ্ধ সহ সেবনে স্ত্রীলোকদিগের রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়। নিম্নে এই ঔষধের উপাদান বলা যাইতেছে,—

কাঙ্কায়ণ গুড়িকা।—শঠী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা, হিং ২৪ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, অম্লবেতস ১৬ তোলা, যমানী, জীরা, মরিচ, ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী—প্রত্যেকের ৪ তোলা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ যথোক্ত পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে।

এই ঔষধ সেবনের কোনো অনুপানের অভাব হইলে গরম জল অনুপানে সকল প্রকার গুল্মেই ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

অন্যান্য ঔষধ।—প্রাতে কাঙ্কায়ন গুড়িকা, মধ্যাহ্নে হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ বা বচাদি চূর্ণ কিম্বা লবঙ্গাদি চূর্ণ ও বৈকালে গুল্ম কালানল রস অথবা যেখানে স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক। সেই স্থলে ত্র্যষণাদ্যঘৃত বা নারাচ ঘৃত—ব্যবস্থা করিবে। নিম্নে এ গুলির উপাদান বলা যাইতেছে।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ।—হিং ১ তোলা, বচ ২ তোলা, বিটলবণ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) ৭ তোলা, কুড় ৮ তোলা। এগুলি একত্র করিয়া ।• আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য। গুল্ম রোগ ভিন্ন উদর এবং অজীর্ণ রোগেও ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বচাদি চূর্ণ।—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী—সমস্ত চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য।

লবঙ্গাদি চূর্ণ।—লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনে, চিতামূল, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কটকী, কিসমিস, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রযব—এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাবে লইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেব্য। এই ঔষধে অর্শ, শোথ, আমবাত এবং বহুকালজাত সর্ব্বপ্রকার উদর রোগও প্রশমিত হয়।

গুল্মে কালানল রস।—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতরা ও কেশুরিয়া—ইহাদের পত্রের রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৪ রত্তি পরিমিত বটী। অনুপান জল ব

হয়। সর্ব্ববিধ গুল্ম, যকৃত, প্লীহা উদর, কামলা, পাণ্ডু ও শোথাদি আরোগ্য হয়।

ত্র্যূষণাদ্য ঘৃত।—ঘৃত ৴৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল—সমুদায়ে ৴১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গরম দুগ্ধ সহ সেব্য।

নারাচ ঘৃত।—ঘৃত ৴১ সের। কল্কার্থ—চিতামূল হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সীজ বৃক্ষের আটা ও বিড়ঙ্গ—প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত, প্লীহা ও অর্শ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দন্তী হরীতকীও গুল্ম রোগের বিখ্যাত ঔষধ। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

দন্তী হরীতকী।—বস্ত্রে পুটলী বাঁধা হরীতকী ২৫টি, দন্তী মূল তিন সের অর্দ্ধ পোয়া এবং চিতামূল তিন সের অর্দ্ধ পোয়া। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৴৮ সের, ঐ কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত তিন সের আধ পোয়া ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫টা, ৩২ তোলা তিল তৈল দ্বারা ঈষৎ ভর্জ্জিত করিয়া গুড় মিশ্রিত কাথ জলে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইলে তেউড়ী চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠ চূর্ণ ৪ তোলা মিশাইয়া লইবে এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ ২ তোলা ও ১টি হরীতকী সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া প্লীহা, শোথ, গুল্ম ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃত, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর এবং শূল প্রভৃতি আরোগ্যের জন্য কেহ কেহ একবার করিয়া গুল্ম বজ্রিনী বটিকা নামক ঔষধটি সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। নিম্নে উহার উপাদান বলা যাইতেছে :—

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।—পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস, সোহাগার খই ও হরিতাল প্রত্যেক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উদ্যমপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা।

গুল্মশার্দ্দূল রস নামক ঔষধেও প্লীহা, যকৃত, কামলা, উদাবর্ত্ত, শোথ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও রক্তজ গুল্ম প্রশমিত হইয়া থাকে। উহার উপাদান গুলি এই :—

গুল্মশার্দ্দূল রস।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগ্গুলু, অশ্বথ ছাল, তেউড়ী, পিপুল, শুঁঠ শঠী, ধনে, ও জীরা প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা ও জয়পাল বীজ চারি তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও উষ্ণ জলসহ উহার ২ দুইটি করিয়া বটিকা সেবন করিতে দিবে।

কফজ গুল্মে কেহ কেহ অন্য ঘৃত না দিয়া ভল্লাতক ঘৃত সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। উহার উপাদানগুলি এই :—

ভল্লাতক ঘৃত।—ভেলা ১ পল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর মিলিত ১ পল, বিদারী গন্ধা ১ পল, জল ৴১৬ সের, শেষ ৴৪ সের। কল্কার্থ, পিপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, যবক্ষার, বিট লবণ, শঠী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রাস্না—প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, ঘৃত ৴৪ সের ও দুগ্ধ ৴৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী ও কাসে ইহা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

ক্ষীর ষটপল ঘৃত ও ধাত্রী ষটপল ঘৃত নামক ঔষধ দুইটি ও কফজ গুল্মে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। নিম্নে উহাদের উপাদান বলা যাইতেছে—

ক্ষীরষটপল ঘৃত।—ঘৃত ৴৪ সের, কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার—প্রত্যেক

৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস প্রভৃতিও এই ঘৃত সেবনে আরোগ্য হইয়া থাকে।

ধাত্রীষট্পল ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের, আমলকীর রস ষোল সের, কল্কার্থ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার—প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া পাক শেষ হইলে তিন পোয়া চিনি ও ১ পোয়া সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। সর্ব্ব প্রকার গুল্মেই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

বাতব্যাধি অধিকারোক্ত চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বাতচিন্তামণি, বিষ্ণু তৈল প্রভৃতি এবং অগ্নিমান্দ্য অধিকারোক্ত ভাস্করলবণ নামক ঔষধটি অবস্থা বিবেচনায় গুল্মরোগে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

রক্তগুল্মে বিশেষ ব্যবস্থা।—তিলের কাথে ত্রিকটু, হিং ও বামুনহাটি মিলিত সিকি তোলা ও ইক্ষু গুড় সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। মদ্য সহ যবক্ষার ৶০ আনা ও ত্রিকটু মিলিত ৶০ আনা পান করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। বজ্রক্ষার ৪ ভাগ ও রসসিন্দূর ১ ভাগ পেষণ করিয়া ৶০ আনা মাত্রায় শীতল জল অথবা কাঁজিসহ সেবন করাইলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। ঘৃত /৪ সের, অন্তর্ধূমে পলাশ ছাল ভস্ম /৮ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ৩২ সের। এই জল ২১ বার পরিস্রুত করিয়া তাহার পর ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতে কল্ক দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা রক্তগুল্মের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

পথ্যাপথ্য। লঘু আহার এবং অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ বায়ুনাশক ও বলকারক দ্রব্য সকলও গুল্মরোগে উপকারী।

শুষ্ক মাংস, কাঁচ মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মধুর ফল গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ অপথ্য।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

[কবিরাজ শ্রীভূদেবচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন]

(১) **মেহরোগে।** স্থলপদ্মের ডাঁটা—আধ তোলা, এক ছটাক জল দিয়া নূতন মাটির পাত্রে শিশিরে রাখিবে এবং প্রাতঃকালে খুব চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া খাইয়া ফেলিবে। যে মেহে জ্বালা যন্ত্রণা বেশী—সেইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। (২ গোক্ষুরের বীজ আধতোলা—বেশ করিয়া বাটিয়া মিশ্রির পানার সহিত সেবন করিলে জ্বালা-যন্ত্রণাময় মেহ আরোগ্য হয়। (৩) চারি আনা সোরা—ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া সেবন করিলে যন্ত্রণাময় প্রমেহের উপশম হইয়া থাকে।

দাঁতের পীড়ায়। দাঁত নড়িতে থাকিলে এবং সেজন্য যন্ত্রণা হইলে, সৈন্ধব লবণ—জলে ভিজাইয়া সেই জলের কুলকুচা করিয়া এবং সৈন্ধব লবণ, পাতখোলার মাটি ও গোলমরিচ—সমান ভাগে মিশাইয়া লইয়া উহা দ্বারা দাঁত মাজিবার ব্যবস্থা করিবে।

চোখ উঠিলে। পাতিলেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাটিয়া চক্ষের নীচে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

চক্ষুর ছানিতে। শ্বেত পুনর্ণবার শিকড় কাঁজির সহিত ঘসিয়া চক্ষে দিলে ছানি ভাল হয়।

চক্ষু ফুলিলে। হরিদ্রার মত হরীতকী মধুর সহিত ঘসিয়া গরম করিয়া চক্ষের পাতার ফুলায় প্রলেপ দিলে ফুলা ভাল হইবে

কাণ পাকায়। সরিষার তৈলের সহিত শামুক ভাজিয়া ঐ তৈল ছাঁকিয়া কাণে দিলে কাণ পাকা আরোগ্য হয়।

(১) **অর্শরোগে।** ১) হরিতকীর গুঁড়া আধ তোলা, নবনীত আধ তোলা, পিপুলের গুঁড়া দুই আনা এবং চিনি আধ তোলা, আধপোয়া জলে গুলিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ২) মাখন, মিশ্রি ও ঘসা তিল—একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ৩ ওলটকম্বলের শিকড় আধতোলা—আড়াইটী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া এবং তাহার সহিত আকের রস মিশাইয়া কয়েক-দিন সেবন করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দদ্রুরোগে। বনপালঙ্গের পাতা—লবণের সহিত রগড়াইয়া ঘুটিয়া দিয়া চুলকাইয়া লাগাইয়া দিলে দদ্রুরোগ আরোগ্য হয়।

মাথায় টাক পড়িলে। শোধিত হরিতাল, বহেড়া ও বৃহতীর মূল—সমভাগে পেষণ করিয়া মাথায় দিলে টাকপড়ায় উপকার হয়।

সুর্য্যাবর্ত্ত বা আধকপালে রোগে। —(১) হুড়হুড়ে বীজ—হুড়হুড়ে পাতার রসে পিষিয়া লইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে আধকপালে রোগ আরোগ্য হয়। (২) ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগ দুগ্ধ সমভাগে লইয়া সূর্য্যের কিরণে গরম করিয়া নস্য লইলেও আধকপালে আরোগ্য হয়।

স্তনের বেদনায়।— ১) ধুতুরা ও হরিদ্রা—একত্র বাটিয়া স্তনের বেদনার স্থানে প্রলেপ দিলে বেদনা আরোগ্য হয়। (২) রাখালশশার মূলের প্রলেপেও উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাধকে।—(১) ওলট কম্বলের মূল ।০ চারি আনা ও গোলমরিচ ✓০ আনা বাটিয়া শীতল জল সহ সেবনে বাধক আরোগ্য হইয়া গর্ভোৎপত্তি হয়। (২) রসাঞ্জন, বিটলবণ ও রক্তচিতার মূল সমানভাগে চূর্ণ করিয়া এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় লইয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হয়। (৩) বাধকের বেদনার সময়ে সিদ্ধ চাউল ধোয়া জল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, ইক্ষু গুড় ১ তোলা, কাঁটানটের রস ১ তোলা ও কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা—একত্র মিশাইয়া পান করিলে বাধকের বেদনা প্রশমিত হয়।

একদিন অন্তর পালা জ্বরে।—(১) সকাল বেলা মুখ না ধুইয়া কোন এক ব্যক্তি বাম হস্ত দ্বারা, কোন একটি রবিবারে সাতগাছি লালবর্ণের সুতা দ্বারা আপাং মূল রোগীর কোমরে বাঁধিয়া দিলে একদিন অন্তর পালা জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) চিরতা, গুলঞ্চ রক্তচন্দন ও শুঁঠ—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই পাচনটি কয়েক দিন পান করিলে এক দিন অন্তর জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহায়।—(১) পলাশ ছালের ক্ষার করিয়া উহা এক আনা ও যবক্ষার এক আনা—গরম জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়। (২) সজিনার ছালের ক্বাথে রক্তচিতা শোধন করিয়া লইয়া ঐ রক্তচিতার মূল ১ রতি, সৈন্ধব লবণ ২ রতি এবং পিঁপুলের গুঁড়া ৩ রতি—একত্র কয়দিন গরম জল সহ সেবন করিলে প্লীহা আরোগ্য হয়।

স্বর্গীয় কবিরাজ যামিনী ভূষণ ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

[কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাশ কাব্যতীর্থ কবিরত্ন]



স্বর্গীয় কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়

সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা, যে বৎসরের এই সময়ে নিখিল ভারতের বিজ্ঞ কবিরাজগণ স্বর্গগত যামিনী ভূষণকে অধিনায়কত্বের শ্রেষ্ঠপদে বরণ করিয়া চরম সম্মানিত করিয়াছিলেন। সেবারে ছিল বৈদ্য সম্মিলীর সপ্তম অধিবেশন এবং তাহার স্থান ছিল মন্দ্রদেশে। মান্দ্রাজের গভর্ণমেণ্ট-সম্মানিত শ্রেষ্ঠ কবিরাজ স্বর্গীয় বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডি, গোপালাচালু মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সম্মুখবর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহারই অশেষ চেষ্টা এবং অক্লান্ত কর্ম্মে সে বারের অধিবেশন আশাতিরিক্ত সফলতা লাভ করিয়াছিল। সে দিনকার কথা মনে হইলে এখনো হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়—যে দিন মান্দ্রাজবাসী শিক্ষিতগণ যামিনী ভূষণকে অভূত পূর্ব্ব সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল ব্যাপী বিরাট শোভা যাত্রা ও অজস্র পুষ্পবৃষ্টি এবং আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া যামিনী ভূষণ মাউণ্ট রোডের এক প্রাসাদোপম সুসজ্জিত বাড়ীতে

উপনীত হইলেন। সহযাত্রী ছিলেন বনৌষধিদর্পণ প্রণেতা স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসক স্বর্গীয় কবিরাজ করুণা কুমার সেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ, গভর্ণমেণ্ট অনুবাদক শ্রীযুত সত্যদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক স্বয়ং ও যামিনী ভূষণের দুইজন বিশিষ্ট ছাত্র। বিশেষ প্রশংসার সহিত মহা সম্মেলনের কার্য্য সমাপন করিবার পর যামিনী ভূষণ আমাদিগকে লইয়া মাদ্রাজের বিভিন্ন শিক্ষায়তন ও আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। আয়ুর্ব্বেদের অনুরাগী বলিয়া কিম্বা অন্য কি কারণে জানি না, পরিদৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে পণ্ডিত গোপালাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ কলেজই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুসজ্জিত বিদ্যামন্দিরের শল্য ও শালাক্য তন্ত্র শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষাপ্রণালী বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সবেমাত্র মহাসভায় আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের আলোচনামূলক সভাপতি যামিনী ভূষণের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে সকলেরই চিত্ত সেই মুখে ধাবিত, তন্মধ্যে আবার বিরজাচরণ যামিনীভূষণ ও আমি শল্য ও শালাক্য তন্ত্রের প্রধান পরিপোষক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয়েরই ছাত্র, সুতরাং মাদ্রাজের বিদ্যালয় পরিদর্শন আমাদের মনে একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করিল। বাসায় ফিরিবার পথে সমুদ্রতটে এজন্য আমাদের আনন্দ প্রকাশের অবকাশে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন—"আয়ুর্ব্বেদের গুরুস্থান বাঙ্গালার বাহিরে এরূপ সুন্দর শিক্ষায়তন, অথচ নিজ বাঙ্গালায় ইহার কিছুই নাই, যামিনী! ইচ্ছা করিলে কি আয়ুর্ব্বেদের আলোচনার এরূপ একটী অনুষ্ঠান করিতে পার না? উহাতে কত অর্থের প্রয়োজন?" উত্তরে যামিনী ভূষণ বলিলেন,—"অর্থের অভাব না হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মীর অভাব। তখন পণ্ডিত মহাশয়—বিরজাচরণ ও আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"কেন? এই সকল উৎসাহী কর্ম্মী কি আয়ুর্ব্বেদের জন্য, দেশের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না?" বলা বাহুল্য যে, তর্কভূষণ মহাশয় যামিনী ভূষণের অধ্যাপক, সেই জন্য আমরাও তাঁহাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করি। তাঁহার এই সস্নেহ উক্তির পর বিরজাচরণ ও আমি সমুদ্রতটবর্ত্তী পথচালিত শকটের উপর বসিয়া মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় এরূপ স্বীকার করিয়া বসিলাম যে, "যতদিন কলিকাতায় থাকিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকর কার্য্যে তোমার সহিত অচ্ছিন্ন থাকিব।" স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বৃক্ষের বীজ রোপণ ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ তর্কভূষণ মহাশয়ের বাক্যে মাদ্রাজের সমুদ্রতটবর্ত্তি উন্মুক্ত আকাশ ও বাতাসের সমক্ষে এই স্থানেই প্রথম হইল।

মাদ্রাজ হইতে বিজয়বিদায় লইয়া যামিনীভূষণ কয়েকজন বন্ধু সহ তাঞ্জোরের দিকে রওনা করিলেন, বিরজাচরণ প্রভৃতি আমরা অপর সহযাত্রিগণ পুরী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানে আসিয়া বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত বাড়ী সন্ধান করিবার ভার আমাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। বিরজাচরণ বাসের জন্য পূর্ব্বেই ফড়িয়া পুকুরের বাড়ীটি একবার দেখিয়াছিলেন সুতরাং ঐ জন্য আমাদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল না, অল্পদিনের মধ্যেই যামিনী ভূষণ ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনজনে মিলিয়া ২৯নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটের বাড়ীটী পছন্দ করিয়া মাসিক ৮০৲ টাকা ভাড়ায় আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য ১৩২২ সালের মাঘ মাস হইতে এগ্রিমেণ্ট দিয়া লওয়া হইল। সস্তায় বাড়ীটী পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আরও দীর্ঘ দিনের জন্য বাড়ীটী লইতে অভিমত প্রকাশ করিলে যামিনী ভূষণ উত্তরে বলিলেন, "সকলের সহানুভূতি পাইলে এই তিন বৎসরের মধ্যেই অন্যত্র নূতন বিদ্যালয় বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ফেলিতে পারিব।" যামিনীভূষণের সে ভবিষ্যৎবাণী কালে সফল হইয়াছে, ১৭০ নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ হওয়া সেই ভবিষ্যৎ বাণীর ফল। •

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ২৯ ফড়িয়া পুকুর স্ট্রীটের প্রথম অবস্থার ভাড়া বাড়ী।

এক তলা

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ।

২। শল্যচিকিৎসা বিভাগ।

৩। ঔষধালয়।

৪। বিকৃত শারীরদ্রব্য সম্ভার।

৫। ভৈষজপরিচর্য্যাগার।

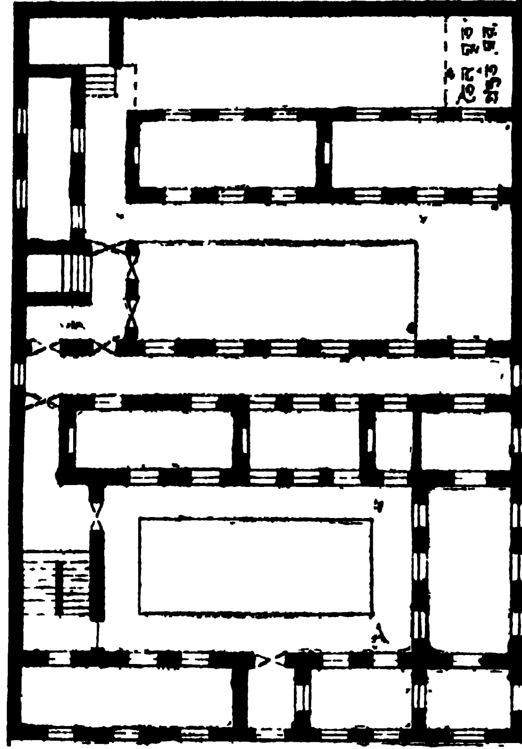
৬। আফিস ঘর।

৭। ভৈষজ ভাণ্ডার।

৮। শারীর পরিচর্য্যাগার।

৯। রসশালা।

১০। বৃক্ষবাটিকা।



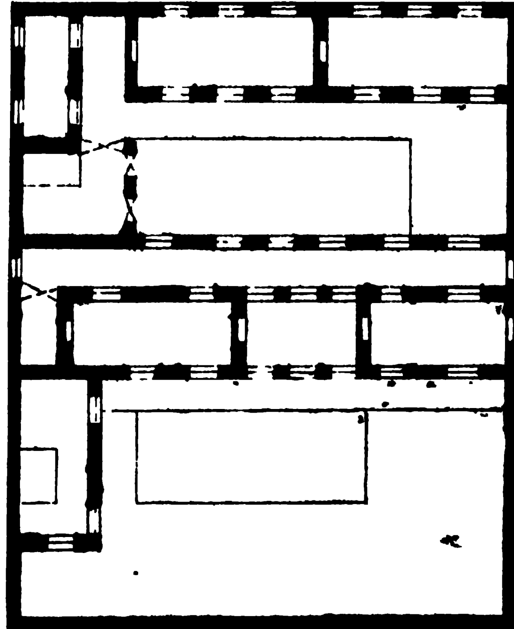
দো-তালা।

১১—১৩। পাঠাগার।

১৪। গবেষণা মন্দির ও যন্ত্রশস্ত্রাগার

১৫। অধ্যাপক সম্মেলন ও গ্রন্থাগার।

১৬। ঠাকুর ঘর।



তখনকার কথা মনে হইলে এখনও আনন্দে মন নাচিয়া উঠে। আমরা তিনজনে ঔষধ প্রস্তুতের কাজ করিতে লাগিলাম। যামিনীভূষণের কলেজ ফ্রেন্ড জুয়েলার্স শ্রীযুত হেম কুমার মিত্র মহাশয় কাঠের সরঞ্জাম—আলমারী-চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে, দিবারাত্র কাজ চলিতে লাগিল। একখানি খাতায় কে কখন আসিয়া কি কার্য্য করিয়া গেলাম—তাহা লেখা হইত। সে খাতাখানি এখনো আমার নিকট অবিকৃত অবস্থায় আছে। স্থানে স্থানে তাহার লেখা দেখিলে পাঠক আশ্চর্য্য হইবেন। কবিরাজশ্রেষ্ঠ যামিনীভূষণ লিখিয়া আসিয়াছেন, "আমরা আসিয়া শিশিতে লেবেল আঁটিয়া ও লেবুর রসে হিঙ্গুল মর্দন করিয়া গেলাম"। তিনি

ও বিরজাচরণ প্রায়ই একসঙ্গে আসিতেন। পঁচিশ দিনের মধ্যেই আমরা একরূপ প্রস্তুত হইলাম এবং সন ১৩২২ সালের মাঘ মাসের ২৭শে তারিখে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইল। আমি কনিষ্ঠ বলিয়া আমার উপরই আপাততঃ সকালে একবার দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিবার ভার অর্পিত হইল। ইহার পর হইতেই যামিনীভূষণের অন্যান্য বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আসা যাওয়া করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আসিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম ঔষধাদি সংগ্রহে যামিনীভূষণের ছাত্র ও আত্মীয় কবিরাজ শ্রীযুত ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই বৎসরের চৈত্র পর্য্যন্ত তিন মাসকাল বিদ্যালয় বিভাগের উপকরণাদি সংগ্রহ—দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোন্নতিমূলক কার্য্যে কাটিয়া গেল।

১৩২৪ সালের বৈশাখ হইতে যামিনীভূষণ তাঁহার বাড়ীর ৮টী, বিরজাচরণের ৩টী ও আমার বাসার ১টী, মোটা দ্বাদশটী ছাত্র লইয়া বিদ্যালয় আরম্ভ করিলেন। ইহার বিনাবেতনে পড়িত, অধিকন্তু আহার ও বাসস্থান পাইত। রাত্রি ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। অধ্যাপক ও আমরা তিনজন। শল্য-শালাক্য প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গই অধ্যাপিত হইবে বলিয়া বিদ্যালয়ের নামকরণ "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়" করিলেন। এই সময় যামিনীভূষণ তাঁহার বন্ধুর সহোদর উৎসাহী ও অক্লান্তকর্ম্মী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা পাইলেন এবং তাঁহাকে সেক্রেটারীর পদে বরণ করিয়া আর্থিক হিসাব নিকাশকরণ ও অর্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। তিনজনের স্থানে চারিজন কর্ম্মী হওয়ায় উৎসাহ আরো বর্দ্ধিত হইল এবং এই কয়জনকে লইয়া একটী ছোট কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইল। ঐ সমিতি যামিনীভূষণকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, বিরজাচরণকে সহঃ অধ্যক্ষ এবং সুরেন্দ্র কুমারকে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত (M. O.) করিলেন, ইহার কয়েকদিন পরেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের শল্য বিভাগ খোলা হইল এবং দেশী ঔষধে ক্ষত-চিকিৎসক মান্দ্রাজের সহযাত্রী স্বর্গীয় কবিরাজ করুণাকুমার ভিষগরত্ন সাগ্রহে প্রথমতঃ ঐ বিভাগের ভার লইলেন। ইহার পর হইতে কার্য্যের অনেকটা শৃঙ্খলা হইল এবং যামিনীভূষণ দেশহিতকল্পে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সংবাদ বাহিরে প্রচার করিয়া সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কার্য্যারম্ভে বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের আলোচনামূলক কার্য্যে মতভেদের আশঙ্কা করিয়াই তিনি ইতিপূর্ব্বে নীরবে সামান্যভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্র সংগ্রহের জন্য সংস্কৃতবোর্ড হইতে উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থানের প্রলোভন দিয়া পত্র দিতে লাগিলেন, ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল দেখিয়া পরবর্ত্তী বৎসরেই আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও ছাত্রগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪ সালের আশ্বিন হইতে "আয়ুর্ব্বেদ" নামক একখানি মাসিক পত্র—বিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করিলেন এবং আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গকে পৃথক পুস্তক আকারে সন্নিবেশিত করিবার জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। কবিরাজ বিরজাচরণ ও কবিরাজ সুরেন্দ্র কুমার তাঁহাকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ফলে "রোগবিনিশ্চয়", "কুমারতন্ত্র", "বিষতন্ত্র", "প্রকৃতিতন্ত্র", "শালাক্যতন্ত্র" প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। তাহার পরেই জনপ্রিয় যামিনীভূষণ তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর সাহচর্য্য লাভ করিলেন। রাণাঘাটের খ্যাতনামা কবিরাজ ও মালদহ-চাঁচোলের ভূতপূর্ব্ব রাজবৈদ্য, সুলেখক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন মহাশয় সে সময়ে স্বীয় ব্যবসায় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন, ইঁহাকে অদ্ভূত ও অক্লান্ত কর্ম্মী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, রাণাঘাট হইতে কলিকাতায় ইঁহার ব্যবসায় স্থানান্তরিত করণের কারণও যামিনীভূষণ। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যামিনীভূষণ কলিকাতার তো কথাই ছিল না, মফঃস্বলেও যখনই যেখানে যাইতেন, সেখানকার চিকিৎসকদিগকে এই অনুষ্ঠানে আনিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। যামিনীভূষণ

কার্য্যোপলক্ষে রাণাঘাটে গিয়া কবিরাজ সত্যচরণের কার্য্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ইঁহাকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিলেন। তাহাই হইল সত্যচরণের কলিকাতা আসিবার মুখ্য কারণ। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার আরব্ধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সত্যচরণ সেই বৎসরের শেষভাগেই প্রথমতঃ "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। সত্যচরণের চিকিৎসালয় সে সময় ১০নং কলেজস্কোয়ারে। আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার সম্পাদন ভিন্ন তিনি সেখানে বসিয়াও বিদ্যালয়ের কিছু কিছু কার্য্য করিতেন। ফল কথা ইতিপূর্ব্বে বিদ্যালয় আরম্ভের প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত যামিনীভূষণ বিরজাচরণ ও সুরেন্দ্রকুমার যাহার জন্য বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন, এবার সত্যচরণ সে সকল কাজ নিজ হাতে গ্রহণ করিয়া সকলেরই ভার লাঘব করিয়া দিলেন। যাহাহউক উৎসাহসংঘটিত বিপুল ব্যাপারের মধ্য দিয়া যামিনী-জীবনের গৌরবময় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় বর্ষ অতিবাহিত হইল। ১৩২২ সালের মাঘ মাস হইতে এই সময় পর্য্যন্ত ৩য় বর্ষ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৩২৩ সাল হইতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ হওয়ায় আমি ইহাকে দ্বিতীয় বর্ষ বলিয়াই উল্লেখ করিলাম এবং বিদ্যালয়ের বৎসর গণনাও এইভাবে চলিয়া আসিতেছে. এক কথায় ১৩২২ সালের ৩ মাসের কার্য্যাবলী ১৩২৩ সালের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যাহা হউক ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। নূতন প্রণালীতে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া ছাত্রগণকে আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাংশ অধ্যাপনা করিবার জন্য যামিনীভূষণ বহু অর্থ ও অর্থোপার্জ্জনের সময় ব্যয় করিয়া বিদ্যালয়ে মেডিক্যাল মিউজিয়াম এবং কেমিক্যাল লেবোরেটরী প্রতিষ্ঠা করিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য এরূপ অভূতপূর্ব্ব আয়োজন-সংবাদ বোম্বাই-মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়া শিক্ষার্থী আকর্ষণ করিল, ফলে বিদ্যালয়ের ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় ছাত্রগণের নিকট সামান্য বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইল।

একদিকে বিদ্যালয় ও অন্যদিকে চিকিৎসালয়,—যামিনীভূষণের অর্থ ব্যয়ের অন্ত নাই। চিকিৎসালয়ে এই সময় দৈনিক শতাধিক আতুর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে কায় চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসা বিভাগে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা সযত্নে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইতে লাগিল। যামিনীভূষণ এইবার এইবিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন মিঃ সেন সাহেব তখন চেয়ারম্যান, তিনি বিরাট চিকিৎসালয়ের ব্যয় বাহুল্য ও রোগী বাহুল্য দেখিয়া এবং ইহার চিকিৎসা দ্বারা কলিকাতার উত্তরাংশের দরিদ্র অধিবাসীর প্রভূত উপকার হইতেছে বুঝিয়া ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বলা বাহুল্য যে, বহুকাল হইতে নানা কারণে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হতশ্রদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের সহানুভূতি কবিরাজ যামিনীভূষণের চরম চেষ্টায় এই প্রথম, বর্ত্তমানে এই সাহায্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজার টাকা।

১৩২৬ সালে বিদ্যালয়ের উন্নতির বিশেষ ক্ষতি হইল বিধাতা যামিনীভূষণের অদম্য চেষ্টার কষ্টিপাথরে এক বিষম শোকাবহ রেখাপাত করিলেন। বিরজাচরণ ও সুরেন্দ্র কুমার যে দুইজন সহকর্ম্মীকে লইয়া যামিনীভূষণ এই অভিনব অনুষ্ঠানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বহু বিরোধিতার বিভিন্ন প্রলোভন-সংগ্রাম যে দুইজনকে যামিনীভূষণের অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই. যামিনীভূষণের সহিত যে দুইজন একই উদ্দেশ্যে একই সূত্রে গ্রথিত ছিলেন, তন্মধ্য হইতে নিষ্ঠুর কাল বিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মী আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান-বীর বনৌষধিদর্পণ-প্রণেতা বিরজাচরণকে ২৬শে মাঘ রাত্রিতে হঠাৎ ছিন্ন করিয়া লইয়া গেল। বিজয় যাত্রার মুখে এইরূপ বীর সৈন্যের অতর্কিত তিরোধান যামিনীভূষণকে শোকে মহ্যমান করিল, কারণ সর্ব্ববিষয়ে

বিরজাচরণের জোড়া ছিল না আজো নাই, এরূপ অসম্ভাবিত শোক তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইল সত্য, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি যুদ্ধে উন্মত্ত জিগীষু যামিনীভূষণ পশ্চাৎপদ হইলেন না। এবার তিনি রাণাঘাটের কবিরাজ সত্যচরণকে ষোল আনা সঙ্গী করিলেন, আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার কার্য্যের উপর বিদ্যালয়ের কার্য্যও তাঁহার হস্তে এই সময় সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করিলেন। কর্ম্মী সত্যচরণ কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ভার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন,এইবার বিশেষ ভাবে সকল বিষয় যামিনীভূষণকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। সত্যচরণের কর্ম্মশক্তি বিদ্যালয়ের প্রচার এবং ছাত্র সংগ্রহ ও পরিচালন কার্য্যে বিশেষ উপযোগী হইল। আজো তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় আড়াই শত দাঁড়াইয়াছে।

বিদ্যালয়ের সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশায় যামিনীভূষণ জনে জনে অনুনয় বিনয় করিয়া আনিয়া অনুষ্ঠান দেখাইয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কলিকাতার কবিরাজমণ্ডলী, দেশীয় চিকিৎসার উন্নতিবিধানের জন্য ডাক্তারগণ এবং সাধারণের—হিতকর অনুষ্ঠানে সহায়তার জন্য ধনী জমীদার ও সাধারণ—সকলেরই নিকট এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুরোধ করিয়া অনেক সময় তিনি ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। কাহারো কাহারো মনে উহা যামিনীভূষণের ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান বলিয়া সন্দেহ হইবার আশঙ্কায় উদার ও চতুর যামিনীভূষণ ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ইহাকে সাধারণ সম্পদ বলিয়া রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন এবং স্বর্গীয় কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন প্রমুখ কয়েকজনকে লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিলেন, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস, মহাশয়কে উক্ত কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইল. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা যামিনীভূষণ সভার একজন সদস্য মাত্র হইয়া থাকিলেন। দুর্ভাগ্য যামিনীর, তখনো তিনি কর্পোরেশনের সামান্য টাকা ব্যতীত আর্থিক কোন সাহায্য কাহারও নিকট পাইলেন না, একাই তাঁহাকে এই বিপুল ব্যয় বহন করিয়া যাইতে হইল।

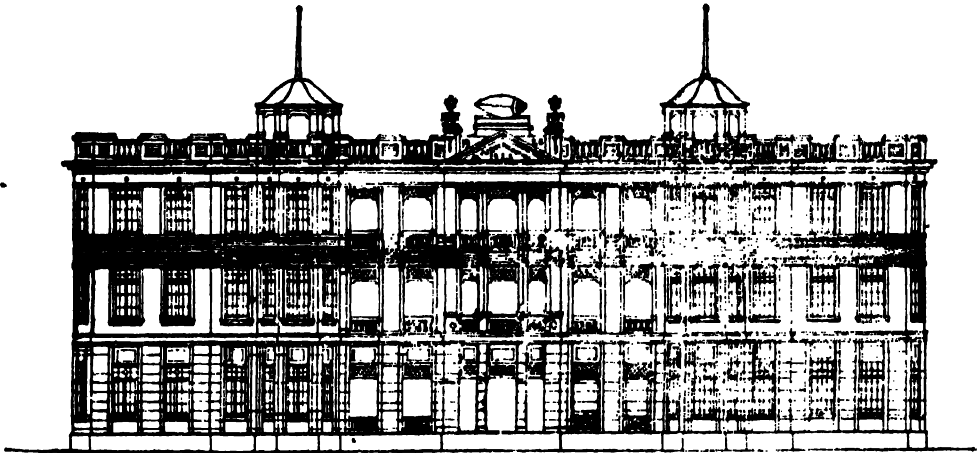
ইহার পর ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে আর থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি বিদ্যালয় ১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রিজ রোডের সুবৃহৎ বাটীতে স্থানান্তরিত করিলেন. এইখানে তাঁহাকে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য মাসিক দুই শত তিরিশ টাকা করিয়া কেবল বাড়ী ভাড়াই দিতে লাগিলেন. তদুপরি বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের ব্যয় তো ছিলই। যামিনীভূষণের জনপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ, তিনি স্বাভাবিক সারল্যে মুগ্ধ করিয়া হুবলহাটীর রাজ-কবিরাজ শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ প্রমুখ বহু পণ্ডিত কবিরাজকে এবং ডাঃ শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণকে বিদ্যালয়ের নিত্য সেবক রূপে আবদ্ধ করিলেন। এত বড় বিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপককে অর্থ দিয়া আবদ্ধ করা যামিনীভূষণের একার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন. তাই সকলকে ভ্রাতৃস্নেহে শৃঙ্খলিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার পর হইতেই কবিরাজ যামিনীভূষণ কোন্ উপায়ে কোথায় বিদ্যালয়টীকে স্থায়ীভাবে স্থাপনা করা যায়, তাহার জন্য প্রবল চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন, ইহার জন্য তাঁহার মূল্যবান সময়ের কত যে ব্যয় করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এতদিনে তাঁহার সাধনা সফল হইল, ১৩২৯ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান দেশপ্রেমিক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে তিনি কলিকাতা সহরের মধ্যেই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের জন্য ১৭০ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে নিউ শ্যাম পার্কের দক্ষিণে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রায় এক বিঘা চৌদ্দ কাঠা জমি সংগ্রহ করিলেন এবং তদুপরি বাটী নির্ম্মাণের জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর যামিনীভূষণের সংকল্প সিদ্ধির পথে আর এক

পরীক্ষা উপস্থিত হইল, তখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা স্কুল কলেজ হইতে বহু ছাত্রকে ভাসাইয়া আনিয়া নিষ্কর্ম্মা করিয়াছে। উপায় অন্তর না দেখিয়া স্বনামধন্য সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় দেশবন্ধুর সহায়তায় [illegible] সহস্র টাকা লইয়া একদিকে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অন্যদিকে তাঁহার ছাত্র কবিরাজ শ্রীযুত রামচন্দ্র মল্লিক মহাশয় কাশিমবাজারাধিপের অর্থ সাহায্যে গোবিন্দসুন্দরী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীযুত যামিনীভূষণ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাচস্পতি মহাশয়কে [illegible] করা। তিনি স্বর্গীয় কবিরাজ [illegible] মহাশয়ের বাড়ীতে বলিয়াছিলেন "আর তাঁহার [illegible] এখনো কোন প্রয়োজন হয় নাই। তিনি আয়ুর্ব্বেদ ও দেশের জন্য জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে [illegible] এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহায়তা। [illegible] এতদ্ভাবের বিশেষ বিরোধী। আজ [illegible] তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। যাহা হউক দেশবন্ধু দাস মেয়র থাকা কালীন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য দুইটি বিদ্যালয়ও কর্পোরেশনের সাহায্য লাভ করিল। যামিনীভূষণের উদ্যমের বিরাম নাই তিনি এই সময় দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের প্রতিষ্ঠানকে অগ্রগামী করিতে লাগিলেন। যাহা হউক দেশবন্ধুর স্বর্গারোহণের পর বাতাস অন্যদিকে বহিতে লাগিল, তাঁহার সহকর্ম্মী কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিলেন, তিনটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে এক করিয়া কর্পোরেশনের বিশেষ সহায়তায় একটী বিরাট অনুষ্ঠান স্থাপিত হউক এবং উহা "আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়" নামে খ্যাত হউক। আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ উন্নতিকামী আত্মাভিমানত্যাগী উদার যামিনীভূষণ এ প্রস্তাব বিশেষ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন, তিনি ও তাঁহার পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মতভেদ হইল, ফলে মিলন সম্ভব হইল না, আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভরসা 'উথায় হৃদ লীয়ন্তে" পর্য্যবসিত হইল। যামিনীভূষণ যখন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পথ এই দিকে প্রশস্ত দেখিলেন না, তখন কাজেই কর্পোরেশনের অনুগ্রহ প্রদত্ত স্থানেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বিদ্যালয় বাটী নির্ম্মাণের জন্য বিদ্যালয় বোর্ডের অন্যতম ট্রাষ্টী রাজা শ্রীযুত হৃষীকেশ লাহার হাতে একদিনেই নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়া তিনি বাটী নির্ম্মাণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই শুভ অনুষ্ঠান করিবার জন্য ১৯২৫ ইং ৬ই মে তারিখে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে একত্র করিয়া মহাত্মা গান্ধি মহারাজের দ্বারা বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন উৎসব সমাধা করিলেন এই কার্য্যেও তাঁহাকে নিজ তহবিল হইতে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অর্থ ব্যয় সার্থক হইল, মহাত্মার পূতহস্ত প্রোথিত প্রস্তর সত্য সত্যই স্বর্ণে পরিণত হইল, কারণ, ঐ দিনই যামিনীভূষণ তাঁহার প্রতিষ্ঠানে লক্ষ টাকা সাহায্য পাইলেন। পবিত্রচেতা দানবীর শ্রীযুত মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয় ঐ দিনই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ান্তর্গত আতুরালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিলেন, এই টাকার উপসত্ব বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা রোগীর খরচের জন্য ব্যয়িত হইবে স্থির হইল, এই দিনের উৎসবে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন মহাশয়ও পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন। ত্যাগী মনোমোহন বাবু উৎসবের পরদিন হইতেই যামিনী ভূষণের সহিত বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যে অক্লান্ত সহায়তা আরম্ভ করিলেন। বাড়ী নির্ম্মিত হইতে লাগিল, দিনের পর দিন অগ্রসর হইয়া ত্রিতল পর্য্যন্ত প্রায় সম্পন্ন হইল। বিগত বৎসরের ১লা জানুয়ারী দ্বিতল আরম্ভ হইবার পরই শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত করিয়া যামিনীভূষণ মাসিক ২৩০৲ টাকা ভাড়া হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এরূপ দেশহিতকর সদনুষ্ঠানে দেশের ধনী মহাজনগণের দৃষ্টি অদ্যাবধি আকৃষ্ট না হওয়ায় যামিনীভূষণ এই সময়ে অর্থ সংগ্রহের এক নূতন উপায় স্থির করিলেন, পার্ব্বণাদি উপলক্ষে বড় বড় মেলায় যেখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে তিনি বিদ্যালয় ও হাসপাতালের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইতে লাগিলেন, কোন কোন স্থানে নিজেও যাইতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে, এই কার্য্যে যাতায়াতের জন্য তিনি রেল গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিতেন এবং এক মাইলেরও বেশী দূর পর্য্যন্ত রাস্তা অনেক সময় পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—"ভিক্ষার পয়সা খরচ করিবার অধিকার আমার নাই"। অল্পদিনের মধ্যে এরূপ কষ্টে সংগৃহীত হাজার টাকারও উপর তিনি বিদ্যালয় ফণ্ডে জমা দিলেন, তাঁহাকে এভাবে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া এক এক সময়ে আমাদের মনে হইত—তিনি দুইচারি টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে না ঘুরিয়া সেই সময়ে নিজ ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে টাকা বিদ্যালয়ে দিলে যে অনেক টাকা পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহা হইলে বিদ্যালয় তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদ হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয় তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যামিনীভূষণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সামান্য অর্থের জন্য ও সাধারণের দ্বারস্থ হইতে কুণ্ঠা এবং ক্লেশ বোধ করেন নাই।



অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন বাটী

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য এইরূপ অমিত শ্রম যামিনীভূষণের দেহ আর সহ্য করিতে পারিল না, সহসা তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া গেল। প্রায় সত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া তিনি বিদ্যালয় বাটীর ত্রিতলের অধিকাংশ সম্পন্ন করিয়া রুগ্ন হইলেন এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচিতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না, বিদ্যালয়ের একটি প্রয়োজনীয় কার্য্যে তাঁহাকে দুর্ব্বল দেহ লইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিতে হইল এবং প্রত্যহই বিদ্যালয় বাটীর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইল, এই শ্রমের ফলে তিনি এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন যে, সামান্য গলার অসুখে দুই দিন মাত্র ভুগিয়া বিগত ২৬শে শ্রাবণ ইহলোক হইতে চির বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সাধের বিদ্যালয় বাটী নির্ম্মাণের শেষ তুলিকার আকাঙ্ক্ষিত অঙ্কণ তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ই ছিল যামিনী ভূষণের প্রাণ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধনই যামিনী ভূষণ তপ-জপ-আরাধনা—সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণও হইল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অপরিমিত পরিশ্রম ও অসহনীয় চিন্তা—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াই শুধু তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, ইহার স্থায়িত্ব ও সাফল্য সাধনই তাঁহার সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমরণ তিনি বিদ্যালয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন এজন্য তাঁহার বহু বিক্ষিপ্ত মুক্ত ব্যয়ের সূক্ষ্ম হিসাব সম্ভব নহে। মৃত্যুকালেও যে সকল সম্পত্তি এজন্য দান করিয়া গিয়াছেন—তাহার মূল্যও সওয়া লক্ষ টাকার উপর হইবে। প্রাণের টান কত অধিক থাকিলে যামিনীভূষণের মত গৃহস্থ লোক আয়ুর্ব্বেদের জন্য এরূপ দান করিতে পারেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয় কার্য্যকরী সমিতির অধিনায়ক মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাকেই বর্ত্তমান অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান এবং অমিত প্রতিভা যামিনী ভূষণের প্রাণের জিনিষটিকে অধিকতর উন্নত এবং চিরস্থায়ী করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ইনিও যামিনী ভূষণের মত আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামী ও এই বিদ্যালয়ের একজন পৃষ্ঠপোষক, ইতিমধ্যেই ভিত্তিস্থাপনোৎসবে প্রতিশ্রুত পঞ্চাশ হাজার টাকার কয়েক সহস্র টাকা বিদ্যালয়-বাটীর বাকী অংশ নির্ম্মাণে প্রদান করিয়াছেন।

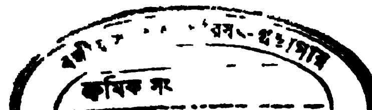
জনপ্রিয় যামিনীভূষণের ত্যাগ ও সেবক-প্রেমিকতাই হইয়াছিল বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কোচের কারণ। নিরভিমান যামিনীভূষণ এতকাল ধরিয়া কেবল সৌজন্য ও প্রীতিতে শৃঙ্খলিত করিয়া সকলকে আপ্রাণ সেবায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক কথায় যামিনীভূষণ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক সেবককে এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ মনে করিতেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনে যাইয়া আমাকে যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার মাতৃস্নেহ বিজড়িত। তিনি বিদ্যালয়-সেবকগণকে আপন কর্ম্মবন্ধু মনে করিয়া সর্ব্বদা তাহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই বিদ্যালয়টি এরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার স্থান সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি সুরক্ষিত ও উন্নত হইয়া তাঁহার অমর আত্মার তৃপ্তিসাধন করুক,—ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মৃত্যুকালে যামিনীভূষণের বয়সমাত্র ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দেশ হিতকর প্রতিষ্ঠানে আমরা দেশবাসী প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

সাময়িকী

বাঙ্গালী ভূ-পর্য্যটক।—বাঙ্গালী যুবক ভূ-পর্য্যটক মাষ্টার বিমলেন্দু দাস ১৭৮০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সংপ্রতি কলিকাতা আসিয়া আবার পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন।—মহাত্মা গান্ধী গত ২রা জানুয়ারী প্রাতে ৯টার সময় ভবানীপুর চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের রঞ্জনরশ্মি বিভাগের জন্য বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি নেতৃগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।



শান্তির পথে।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঠাকুর প্রণীত।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। সংবাদ পত্র সমূহ কি বলিতেছেন দেখুন।

মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

আত্মশক্তিঃ—শান্তির পথে একখানি আদর্শ সামাজিক উপন্যাস। সংসারে পরমুখাপেক্ষীর স্থান নাই। বঙ্গ-রমণী অতিশয় পরমুখাপেক্ষী তাই তাহাদের নানারূপ দুর্গতি। গ্রন্থকার তাহাই এ পুস্তকে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন স্বাবলম্বনের একখানি আদর্শ চিত্র এ গ্রন্থে দেখান গেল। ইহাতে ভালবাসা আছে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে লোক নিন্দা ভাসিয়া গিয়াছে। পণ প্রথা নিবারণ, চরকা গ্রহণ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। ভাষায় এবং ভাব প্রকাশে গ্রন্থকার একটু বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকাঃ—শান্তির পথে একখানি আখ্যায়িকা। গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, স্বাবলম্বন দ্বারা সহায় সম্পদহীনা নারীও অনায়াসে সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও চরকাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া জাতিকে স্বাবলম্বী হইবার পথ দেখাইছেন ব্যক্তিগতভাবেও সেই অহিংসা ও চরকার মন্ত্র সার্থক করিয়া তুলিত পারা যায়।

আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনাকরি।

Forward—The plot is simple and clear, and the writing is also colourless. On the death of Mahesh his widow with her daught Basanti falls upon evil days. Basanti though beautiful and accomplished has not paternal wealth to reconmend her beauty. However, Sachindra Roy the son of the local zeminder, happens to see her one day engeged in plying the charka anp spinning fine yearn and fails in love with her. So the problem of Basanti's marrige is satis factorilly solved.

There is no subtlety or attemt at brilliance is the delineation of character. The novel though devoid of any outsatanding excellence has no serious flaws, excepting suporious sentimentalism in several chapters. The getup of the book is quite good.

কলিকাতা বুকডিপো লি।

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by the Sub-Editor Sj. Bhupal Chandra Bhattacherjee B. A
at the Gobordhon Press, 204, Cornwallis Street, Calcutta.

গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন

আপনার অনুরোধে ৩য় সংখ্যার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান"ও আপনার নিকট প্রেরিত হইল। এই সংখ্যা পাইয়াই দয়া করিয়া ইহার বার্ষিক মূল্য মণিঅর্ডারে প্রেরণ করেন—ইহাই বিনীত অনুরোধ। ইহার মধ্যে যদি আপনার নিকট হইতে মণিঅর্ডার না পাই, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, ভিঃপিঃ করিবার জন্য আপনি অনুমতি করিতেছেন এবং তদনুসারে ভিঃপিঃ প্রেরণ করিব। যদি কাহারও ভিঃপিঃ গ্রহণে আপত্তি থাকে বা গ্রাহক হইতে সম্মত না হন, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক প্রথম তিনসংখ্যার মূল্য ৷৷৹ মণিঅর্ডার সহ দুই ছত্র লিখিয়া জানাইলে আমরা আর ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিব না।

যাঁহারা ইহারই মধ্যে বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১ম ও ২য় সংখ্যার কাগজ নিঃশেষ প্রায়, সুতরাং এখন হইতে গ্রাহক না হইলে ইহার পর ১ম হইতে কাগজ দিতে পারিব কি না সন্দেহ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,

২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and published by the Sub-Editor Sj. B[illegible] Ch[illegible] B. A
at the Gobordhon Press—204, Cornwallis Street, Calcutta
Cover Printed at the Carmichael Press—[illegible] Street, Calcutta

Regd. No. C—1537.

১ম বর্ষ । | "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্" | ৪র্থ সংখ্যা ।
[illegible] ১৩৩৩ । | February 1927.



JOURNAL OF HEALTH AND INDIAN MEDICINES

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রী[illegible] সেন কবিরঞ্জন ।

[illegible]

বার্ষিক মূল্য—৩।৵০ | স্বত্বাধিকারী—কলিকাতা বুক ডিপো লিমিটেড । | প্রতি সংখ্যা [illegible]

ফাল্গুন মাসের সূচী।



ধবল (শ্বেত) কুষ্ঠের মহৌষধ।

শত শত রোগীর শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হইতেছে সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বলেন—"ঔষধটী সত্যই বড় উপকারী। আপাদমস্তক রোগীর শ্বেতকুষ্ঠ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" মূল্য (এক মাসের) ১০ দশ টাকা হইতে ১৫৲ টাকার মধ্যে। ভিঃ পিঃ ভিন্ন।

আর, পি, ভট্টাচার্য্য।

শ্বেতকুষ্ঠের অফিস।

৫৮ বি, পটুয়া টোলা লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক "আয়ুর্ব্বেদ" ও "আয়ুর্বিজ্ঞান" মাসিক পত্রের সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক চাচোলের ভূতপূর্ব্ব রাজবৈদ্য

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত

কায়-চিকিৎসা

(Practice of medicine)

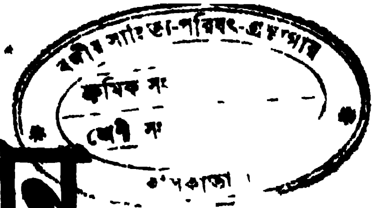
আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ অসংখ্য, গ্রন্থ ও যথেষ্ট কিন্তু কোন অবস্থায় কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়—সেরূপ গ্রন্থের একান্ত অভাব এই গ্রন্থে সেই অভাব দূর হইয়াছে। প্রত্যেক রোগের অবস্থানুযায়ী ঔষধ এবং সেই ঔষধের উপাদানগুলির গুণ পরিচয় ইহাতে বিশেষভাবে বিবৃত। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাজগতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ কলেজের চরম পরীক্ষার্থীদিগকে এতকাল যে কায়চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এ গ্রন্থে তাহাই প্রকটিত। দ্রুত ছাপা হইতেছে। মূল্য ৪৲। এখন এক খানি কার্ড লিখিয়া গ্রাহক হইলে ৩৲ টাকায় দেওয়া হইবে। ছাপা আরম্ভ হইয়াছে শীঘ্রই বাহির হইবে।

ম্যানেজার—কলিকাতা বুক ডিপো, লিমিটেড

২০৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।


কল্পতরু





আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ { ফাল্গুন, ১৩৩৩ } ৪র্থ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদ ও ধাত্রীবিদ্যা

(ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি)

নমোব্রহ্ম দিবোদাসঃ সুশ্রুতেভ্যো নমোনমঃ।

এড্মনষ্টনচার্লসায় নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ।

যিনি বুদ্ধিবৃত্তি সমুদয় প্রেরণ করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রথমে নমস্কার। যে ধন্বন্তরি দিবোদাস আমাদের জন্য আয়ুর্ব্বেদ নামক অমূল্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সুশ্রুত ঋষি ধাত্রীবিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। যাঁহার কৃপায় ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছি সেই শ্রীগুরু এড্মনষ্টন্ চার্লসকে নমস্কার করি।

ধাত্রী বলিতে কি বুঝায়? ধাত্রীশব্দে বুঝায়—মাতা, উপমাতা, আমলকী এবং ক্ষিতি। ক্ষিতি ও আমলকীর সঙ্গে আমাদের ধাত্রীর কোন সম্বন্ধ নাই—বাণীগণ ন। আমলকীর জলে স্নান করিলে ন তস্য গর্ভসম্ভবঃ',—সুতরাং এই ধাত্রী আমাদের প্রজননকুশলা বা প্রজনয়িত্রীর সম্পূর্ণ বিরোধিনী। সুতরাং যে ধাত্রী 'ধীয়তে' 'পীয়তে'—যিনি লালন পালন এবং স্তন্যদান করেন সেই ধাত্রীর সঙ্গেই আমাদের ধাত্রীর সম্বন্ধ। বোধ হয় স্তন্যদাত্রী ধাত্রীই কালে ভারতের প্রজননকুশলা এবং ভাবমিশ্রের প্রজনয়িত্রী ধাত্রীরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন।

আজকাল ধাত্রী বলিতে হইলে একদল ঘৃণনীয় জীব বুঝায়, যাহাদের স্পর্শ অপবিত্র এবং সংসর্গ অবাঞ্ছনীয়। ইংরাজীতে Mrs Grundy বলিলে ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোক বুঝায়—অথচ ইহারাই যাহাদের একমাত্র আরাধ্য. মাতৃমঙ্গল বা শিশুমঙ্গল যাহাদের লক্ষ্য নয়। পুরাকালে আমাদের দেশে ধাত্রীর স্থান কত উচ্চ ছিল, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পূতনা সম্বন্ধীয় শ্লোক তাহার প্রমাণ। শুকদেব বলিতেছেন:—

> পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
> জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিং॥
> যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিং॥

পূতনা রাক্ষসী হিংসাপরায়ণ হইয়া শ্রীহরিকে স্তন্যদান করিয়াও স্বর্গ এবং ধাত্রীগতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিরূপ ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে—এই প্রশ্নের উত্তরে সুশ্রুত বলিতেছেন—"অক্ষুদ্রকর্ম্মিণা কুলে জাতা ভূয়িষ্ঠৈশ্চ গুণৈরন্বিতা"—সে কোন নীচ কর্ম্ম করে না, সদ্বংশজাতা এবং প্রভূতগুণসম্পন্না। ভাবমিশ্রের প্রজনয়িত্রী শস্ত্রশাস্ত্র নিপুণা। কোন দুর্দ্দিনে যে পবিত্র প্রসব কার্য্যের ভার অস্পৃশ্যা নয়। নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে দেওয়া হইয়াছে ইতিহাসে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমস্ত পৃথিবী যখন অজ্ঞানতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নব সভ্যতাভিমানী জাতি সমূহ যে সময় বর্ব্বর বলিয়া গণ্য

ছিল, চিকিৎসাবিদ্যা যে সময়ে উরূপাথণ্ডের মঠের অভ্যন্তরে ধর্ম্মযাজকদের প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িতা ছিলেন, সেই সময়ের পূর্ব্বেও আমাদের বৃদ্ধ সুশ্রুত ঋষি গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভিণীব্যাকরণ, প্রসব কৌশল, মূঢ়গর্ভনিদান ও চিকিৎসা, শিশুপরিচর্য্যা ও শিশুরোগ নিদান ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে ফরাশীশ চিকিৎসক এম্‌ব্রয়শে পারে (Ambroise Pare) প্রসবে বিলম্ব হইলে পা ধরিয়া শিশুকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার প্রণালী (যাহাকে ইংরাজীতে বলে Podalic version) বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার বহু বহু শতাব্দি পূর্ব্বে সুশ্রুত এই প্রণালী বর্ণনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দিতে ফরাশী দেশের পিটার চেম্বালেন শিশু আকর্ষণের জন্য সাঁড়াশী আবিষ্কার করিয়া একশত পর্য্যন্ত তাহা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। বৎসর ইহার বহুকাল পূর্ব্বে সুশ্রুত সূচীশঙ্কু বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থে মণ্ডলাগ্র, অঙ্গুলী প্রভৃতি (যাহাকে আমরা এখন Blunt hook, perforator বলি) অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে। যে Caesarian section (বা পেট কাটিয়া ছেলে বাহির করা) ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুশ্রুত বস্তিমার-আক্রান্ত গর্ভিণীদের জন্য তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বস্তিমার বলিতে এক প্রকার নেকড়ে বাঘ বুঝায়। সেকালে গর্ভিণীকে অতি সন্তর্পণে রাখা হইত। চরক বলেন :—

"পূর্ণমিব তৈলপাত্রমসংক্ষোভয়ান্তর্ব্বত্নী ভবত্যুপচর্য্যা"

অর্থাৎ গর্ভিণীকে কোন প্রকার সংক্ষোভিত না করিয়া তৈল পরিপূর্ণ পাত্রের ন্যায় রাখিতে হইবে। সুতরাং এই প্রকার সুরক্ষিতা গর্ভিণী নেকড়ে বাঘের মুখে পড়ার সম্ভাবনাটা কষ্টকল্পনা নয় কি? বস্তি বলিতে বুঝায় সেই অস্থির খোলাবাক্স—যাহার ভিতরে গর্ভাশয় প্রভৃতি থাকে। মার শব্দের অর্থ মৃত্যু, বিঘ্ন ইত্যাদি। সুতরাং বস্তিমার শব্দের সহজ অর্থ বস্তিপর্ব্বের বিঘ্ন বা সঙ্কীর্ণ বস্তি, যাহাকে আমরা বলি Deformed pelvis বা contracted pelvis ; এই রোগে আমরাও পেট কাটিয়া সন্তান বাহির করি।

বহুদিন পূর্ব্বে আমি "অমৃতবাজার পত্রিকায়" একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,—"মূর্খ ধাত্রীদের অসাবধানতা বশতঃ বহুশিশু ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যায়।" সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশে এই রোগ অতি বিরল ছিল, এমন কি অনেক বৃদ্ধা ইহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না।" ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম,—"বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুত এই রোগের বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝা যায়, সুশ্রুতের পূতনা এবং শিশুর ধনুষ্টঙ্কার একই রোগ।"

যে কারণেই হউক সুশ্রুতের পর সমুদয় অস্ত্রবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী বিদ্যারও অধোগতি হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় "ভাবপ্রকাশ" প্রকাশিত। ভাবমিশ্র স্ত্রীলোকদের উপর প্রসবকার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছেন। সেই সময় হইতে "লঘু হস্তা ভয়োজ্‌ঝিতা"—ধাত্রীদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর কিসেরই বা ভয়! সুশ্রুতের ন্যায় বিজ্ঞ শস্ত্রনিপুণ চিকিৎসকের শাসন ত ছিল না। কিন্তু তখনও বোধ হয় ধাত্রীরা আধুনিক অশিক্ষিতা দাইদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীয়া ছিলেন। তখনও তাঁহারা "শস্ত্রশাস্ত্রার্থবিদুষী লঘুহস্তা ভয়োজ্‌ঝিতা"। এখনকার দেশীয় ধাত্রীগণ শস্ত্রচালনা করে না, কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত বক্তৃচালনা ও হস্তচালনার জন্য গর্ভিণী ও গর্ভিণীর আত্মীয়গণ যে ব্যতিব্যস্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ধাত্রীবিদ্যার অধোগতির ফল কি? ফল, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর তিন লক্ষের অধিক শিশুর এবং ২৫।৩০ হাজার প্রসূতির মৃত্যু। এই মৃত্যু—চেষ্টা করিলে নিবারণ করা যায়। যে পূতনার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়া রোগে এই চিকিৎসকবহুল কলিকাতা নগরীতেও প্রতিবৎসর ৭০০।৮০০ শিশুর মৃত্যু

হয়। কিন্তু যে সমুদয় শিশু হাসপাতালে কিম্বা সরকারী ধাত্রীদের হস্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি শিশুও অদ্যাবধি এই রোগে মারা যায় নাই। অথচ এই রোগ নিবারণ করিবার উপায় অতি সহজ। এই রোগের কারণ এক প্রকার বীজাণু। বীজাণুনাশক ঔষধ প্রয়োগে তাহা বিনষ্ট হয়।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর যতগুলি শিশু ভূমিষ্ট হয়, তন্মধ্যে প্রায় তিন হাজার বা অর্দ্ধেক শিশু জন্মের এক মাসের মধ্যেই মারা যায়। তাহার কারণ কি? সাংঘাতিক রোগ জন্ম মাত্র শিশুকে আক্রমণ করে না। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না কিম্বা রোগের সুচিকিৎসা হয় না বলিয়াই শিশু অসময়ে জন্মগ্রহণ করে অথবা জন্মের কিছুদিন পরেই সামান্য কারণে কালকবলে পতিত হয়। এইজন্য গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন গর্ভিণীর শুশ্রূষার জন্য এবং প্রসবের পর দশ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি ও শিশুর শুশ্রূষার ব্যবস্থা ইউরোপ ও আমেরিকায় করা হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে সেই সমুদয় দেশে শিশু মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। আমরা ত প্রাচীন সভ্যতার অভিমান করিয়া থাকি। কিন্তু সেই দূরকার নিউজিলণ্ডের অধিবাসীগণ এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া অনেক শিশুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাহাদের দেশে হাজার করা ৮০টী শিশু মারা যায়, এবং তাহারা আশা করেন—অতি অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা আরও হ্রাস হইবে। আমাদের অবস্থা কি? এখনও হাজার করা প্রায় ৩০০টী (তিন শত) শিশু এক বৎসর পূর্ণ না হইতে হইতেই মায়ের কোল অন্ধকার করিয়া চলিয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় এক বাড়ীতে চারিটী শিশু জন্মগ্রহণ করিলে দুইটীকে যমের কাছে ডালি দিতে হইত। এখন প্রসবের সুব্যবস্থার দরুন তিনটীর মধ্যে একটীরও কম হারাইতে হয়। প্রসূতি-মৃত্যু-সংখ্যারও হ্রাস হইতেছে। তড়কা প্রভৃতি প্রসূতিঘাতক রোগের কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণগুলি দেখা দিবামাত্র যদি তাহার প্রতীকার করা যায়, রোগ নিবারিত হয়। কিন্তু রোগ গর্ভিণীকে আক্রমণ করিলে রক্ষা করা দায়। সরকারী ধাত্রীরা সময় মত দরিদ্র গর্ভিণীদিগকে দেখিয়া সেই সমুদয় পূর্ব্ব লক্ষণ উপস্থিত হইবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া অনেক প্রসূতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। [illegible] হাতে পড়িয়া বা পরের কথায় [illegible] কত প্রসূতি [illegible] জ্বরে মারা যায়। সর্ব্ব ধাত্রীরা [illegible] বীজাণু সংক্রমণ হইয়া [illegible] সাবধানে প্রসব করাইলে ঐ সাংঘাতিক জ্বর হয় না। হাত ভাল করিয়া বীজাণুনাশক ঔষধে ধৌত করিলে সেই বীজাণুগুলি মরিয়া যায়। কিন্তু কে তাহার ব্যবস্থা করে? স্ত্রীলোক বা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা আমরা স্ত্রীলোকদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই বিষয়ে তাঁহারা স্ত্রী শাসন বা কোমলতা [illegible] চলে, একথা বলা যায়।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন "প্রসব সংক্রান্ত বিষয়ে ও প্রসব কালে স্ত্রীলোকেরাই চালক হউন। স্তরাং আমাদের [illegible]।" তাহাদিগের মধ্যে সকলেই প্রসব কুশলা তাহা নহে, কিন্তু কোন সময় প্রসবকালে চিকিৎসকের প্রয়োজন তাহা জানিয়া তাহারা তাহার ব্যবস্থা করেন। সর্ব্ব ধাত্রীরা প্রসূতিকে যমের দক্ষিণ দ্বার পর্য্যন্ত না লইয়া ছাড়ে না। এই ধাত্রীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গর্ভিণী ও প্রসূতিদিগের রোগ পরিচয় করিয়া তাহার প্রতীকার করা আবশ্যক। সুশ্রুত শিক্ষাদের পক্ষে, [illegible] অশিক্ষা অজ্ঞতা হইতে পারে না। অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন—

"অর্দ্ধবেদ্যবাদে ভাবকপক্ষাবিব দ্বিজো"

কি সুন্দর দৃষ্টান্ত। একটী ডানাওয়ালা পাখী যেমন চলিতে পারে না, এই প্রকার অর্দ্ধশিক্ষিত চিকিৎসকেরাও তেমনি চিকিৎসা কার্য্য চালাইতে অক্ষম। পরন্তু তাহাদের প্রযুক্ত ঔষধ অমৃত হইলেও শাণিত অস্ত্র, বজ্র ও বিষের ন্যায় মৃত্যুর কারণ হয়:—

"ওষধ্যোঽমৃত কল্পাস্তু শস্ত্রাশনি বিষোপমাঃ"

অতএব ভারতের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিয়া, আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসা—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, ধাত্রীবিদ্যাজ্ঞানাভাব লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যুর কারণ জানিয়া এবং এই মৃত্যু নিবারণের উপায় আপনাদের হাতে আছে—এই কথাটা অনুভব করিয়া, প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নার্থীকে ধাত্রীবিদ্যাশাস্ত্র মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—শিশুর পায়ের উপর ভর দিয়া সমগ্র জাতিকে চলিতে হয়। অর্থাৎ যে জাতির শিশুরা বলিষ্ঠ হয় না, সে জাতি উন্নতির পথে চলিতে পারে না। শিশুরা মরিয়া গেলে বংশ কেমন করিয়া রক্ষা হয়? অশ্বত্থামা সেই কথাটী বুঝিয়াছিল, তাই উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিল। উত্তরা ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া 'রক্ষ মাং রক্ষ মাং' বলিয়াছিলেন। তিনি কি আপন নিজের প্রাণের ভয়ে কি বলিয়াছিলেন? তিনি তাঁহার বংশধরকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আজ সহস্র সহস্র উত্তরা করযোড়ে জ্ঞানার্থীদিগকে বলিতেছেন,—'আমরা মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু যথোচিত জ্ঞানলাভ করিয়া এবং জ্ঞান প্রচার করিয়া আমাদের শিশুদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা কর।"

সংক্রামক রোগনিবারণের ব্যবস্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু সি-আই-ই-এস্ ও এম-বি]

রোগীর গৃহে যাঁহারা সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহাকেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এই ব্যবস্থা যদি দৃঢ়ভাবে পালন করা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় যাহার সংক্রামক রোগ হইয়াছে রোগ তাহারই মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া যায়, পরিবারের মধ্যে বা পল্লীর মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করিবার অবকাশ পায় না। আমরা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্য করিয়া থাকি। রোগ যতই দুরারোগ্য হয়, রোগীর গৃহ ততই একটী বৈঠকখানায় পরিণত হইয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—সকলেই প্রয়োজন সত্বে বা প্রয়োজনের অভাবে, তথায় সমাগত হইয়া গৃহের বায়ু দূষিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কলরবে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় এবং তাঁহার বিশুদ্ধ বায়ু সেবনেরও (যাহা তাঁহার পক্ষে ঔষধ অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়) সবিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয়। একে ত আমরা রোগীর ঘরের তাবৎ বায়ু-পথ বন্ধ করিয়া রাখা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া থাকি, তাহার উপর গৃহের মধ্যে জনতা হইলে উক্ত গৃহের বায়ুর কিরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা মনে করি যে, বাহির হইতে রোগীর সংবাদ লইলে প্রকৃত আত্মীয়তা প্রদর্শন করা হয় না; রোগীর গৃহে যাইয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে পর, তবে আত্মীয়ের কাজ করা হয়। রোগী অনেক সময়ে এই ভালবাসার উপদ্রবে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, পরিবারবর্গ অবশেষে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সংস্কার এতই প্রবল যে, অনেক স্থলে চিকিৎসকের অনুজ্ঞায়ও কোন সুফল দেখা যায় না। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমাদিগের অবিবেচনার কথা মনে হইলে বড়ই লজ্জিত হইতে হয়। আমি আশা করি যে, উপরিউক্ত কয়েক ছত্র যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তাঁহারা যেন এরূপ আচরণের অবৈধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য সকলকে সদুপদেশ প্রদান করেন। বিশেষতঃ এ কথা যেন সকলে স্মরণ রাখেন যে, অধিকাংশস্থলে রোগীর গৃহে লোক সমাগম হেতু সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে

রোগীর গৃহের দরজা ও জানালাগুলি সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং বায়ুপথ এক একটি পর্দ্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই পর্দ্দাগুলি কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণে ভিজাইয়া রাখিলে সংক্রামক রোগের বীজ গৃহ হইতে বায়ুপ্রবাহের সহিত বাহিরে আসিবার সুবিধা পায় না এবং বাহির হইতে গৃহের মধ্যে মাছি প্রবেশ করিতে পারে না। অনেক সময়ে রোগীর গৃহে মাছি প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রোগের বীজ বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এইরূপে সংক্রামক রোগের পরিব্যাপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। গরম জল একটা পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে কয়েক ফোটা ল্যাভেণ্ডার তৈল ঢালিয়া দিলে উহার গন্ধে মাছি দূরে সরিয়া যায় অথচ ইহা দ্বারা গৃহের বায় পবিত্র হয় এবং রোগীর পক্ষেও উহার আঘ্রাণ প্রীতিকর ও উপকারী। রোগীর গৃহে এই ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে।

রোগীর গৃহের বাহিরে একটা লৌহপাত্রে আগুন রাখিলে, সেই স্থানের বায়ুর বিশুদ্ধতা কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়, রোগীর পথ্য বা জল গরম করিবার প্রয়োজন হইলে সহজেই তাহা নিষ্পন্ন করিতে পারা যায় এবং যখন রোগের শ্লেষ্মাদিযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ করিবার আবশ্যকতা হয়, তখন উহাদিগকে বাটীর অন্যত্র লইয়া না যাইয়া ঐ স্থানেই ঐ কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা রোগীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় হস্ত ও পদ যে কোন বিশোধক ঔষধের দ্রাবণ ও সাবানের দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিবেন।

পরিধেয় বস্ত্র যদি জলে কাচিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে কাচিবার পূর্ব্বে কোন পাত্রের মধ্যে উহাকে বিশোধক ঔষধে একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সাবান ও উষ্ণ জলে কাচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য. এইরূপে ঐ বস্ত্রের সংক্রামকতা দোষ নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রাদি অধিকক্ষণ রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে রাখিয়া দিলে অনেক সময়ে উহার সংক্রামকতা-দোষ দূরীভূত হয়। রোগীর গাত্র-সংস্পৃষ্ট শয্যা ও বস্ত্রাদি প্রথমতঃ বিশোধক ঔষধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে জলে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইলে উহার সংক্রামকতা দোষ একেবারে বিনষ্ট হয়। অতঃপর ঐ বস্ত্র ধোপার বাড়ী হইতে পরিষ্কৃত হইয়া আসিলে উহা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

সংক্রামকতাদুষ্ট বস্ত্রাদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাড়ীতে পাঠান নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। আমরা সচরাচর রোগীর বস্ত্রাদি তদবস্থায় অথবা শুদ্ধ জল কাচা করিয়া একস্থানে জড় করিয়া রাখি, পরে ধোপা আসিলে উহাদিগকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, এরূপ ব্যবস্থায় সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। সংক্রামকতাদুষ্ট বস্ত্র কেবল জলে ধৌত করিলে উহার সংক্রামকতা নষ্ট হইয়া যায় না। এরূপ বস্ত্র বাটীর মধ্যে জড় করিয়া রাখিলে উক্ত রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা পুনশ্চ ঐ কাপড় ধোপার বাড়ী যাইলে অন্য পরিবারের ধৌত বস্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কারণ ধোপারা সচরাচর একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে বাস করে এবং তাহার মধ্যেই মলিন ও ধৌত বস্ত্রাদি পাশাপাশি রাখিয়া দেয় সুতরাং দূষিত মলিন বস্ত্র হইতে ধৌত বস্ত্রে সংক্রামক রোগের বীজ সংলগ্ন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনেক সময়ে হাম বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ বাটীর মধ্যে কোথা হইতে উপস্থিত হইল, স্থির করিতে পারা যায় না। ধোপার বাটী ফর্সা কাপড়ের সহিত উক্ত রোগের বীজের আমদানি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধোপার বাটী হইতে কাপড় আসিলে ২।৩ ঘণ্টার জন্য উহাকে রৌদ্রে রাখিয়া পরে ঘরের ভিতর তুলিলে এই দোষ অনেকাংশে কাটিয়া যায়। কেহ কেহ ধোপার বাটীর কাপড় একবার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করেন, ইহা দ্বারা কাপড়ের সংক্রামকতা-দোষ কাটিয়া যায়।

† একভাগ কার্ব্বলিক এসিড—৩৯ ভাগ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইলে এই দ্রাবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সংক্রামকতাদুষ্ট কাপড় বিশুদ্ধ না করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে তাহার পরিজন বর্গের মধ্যেও ঐ রোগের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ইহা যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এজন্য রোগীর কাপড় ও শয্যাদি পূর্ব্বেই জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া ধোপার বাটীতে পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হস্পিটালে রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি অত্যুষ্ণ জলের ভাপরায় অথবা অত্যন্ত গরম বাতাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৃহস্থের বাটীস্থ একটা বড় পাত্রে বস্ত্রাদি জলে অধিকক্ষণ ফুটাইয়া লইলেই শোধন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রোগীর গৃহ হইতে যে কোন বাসন বাহির করা হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিশোধক ঔষধদ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লওয়া উচিত। রোগী যে পাত্রে মল, মূত্র বা কফ পরিত্যাগ করিবে, গৃহের মধ্যেই উহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব উহাকে স্থানান্তরিত করিবে।

যখন রোগী আরোগ্যলাভ করিবে, তখন তাহাকে কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা উষ্ণ জলে স্নান এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া বাটীর অন্যত্র গমন করিতে বা অন্য লোকের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত। রোগ ভেদে উহার সংক্রামকতা দোষ অল্প বা অধিক দিন রোগীর শরীরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যদি উক্ত রোগী সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকে, তাহা হইলে সুস্থ ব্যক্তির ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে রোগীকে কাহারও সহিত মিশিতে না দিয়া পৃথক করিয়া রাখিলে, রোগের পরিব্যাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। অধিকাংশ রোগেরই সংক্রামকতা দোষ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

রোগী আরোগ্যলাভ করিলে, যাহাদের অবস্থা ভাল, তাঁহাদের পক্ষে তাহার বস্ত্র ও শয্যাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। গদি, লেপ, বালিশ প্রভৃতি বিছানা বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষ শূন্য করা বড়ই কঠিন। অনেক সময় রোগীর শয্যা ব্যবহার করিয়া উপর্য্যুপরি অনেক লোকের হাম, টায়ফয়েড জ্বর প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর জন্য গদি ব্যবহৃত হইলে, একখানি বড় অয়েল ক্লথ দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক মুড়িয়া দিবে, গদির উপর রোগীর মলমূত্র পতিত হইতে পারে না। সুতরাং একান্ত আবশ্যক হইলে, গদি এইরূপে রক্ষা করিয়া তোসক-বালিশ ইত্যাদি অন্যান্য বিছানা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। রোগীর জন্য অল্প ব্যয়ে যদি আমরা এক প্রস্ত বিছানা প্রস্তুত করাইয়া দিই, তাহা হইলে রোগ মুক্তির পর উহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয় না।

সামান্য অবস্থার লোক রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের পক্ষে ঐ সকল সামগ্রী এবং অন্যান্য গৃহ সজ্জা একটা রুদ্ধ গৃহের মধ্যে রাখিয়া ক্লোরিন (chlorine) গ্যাস সাহায্যে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। একটা চিনা মাটি বা এনামেলের পাত্রে অধিক পরিমাণে ব্লীচিং পাউডার (Bleaching powder) নামক বিশোধক ঔষধের গুঁড়া রাখিয়া তাহার উপর জল মিশ্রিত হাইড্রো-ক্লোরিক-এসিড (Hydrochloric Acid) ঢালিয়া দিলে, ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হইবে এবং গৃহের সমস্ত বায়ুপথে কয়েক ঘণ্টাকাল রুদ্ধ করিয়া রাখিলে শয্যা ও বস্ত্রাদি সংলগ্ন রোগের বীজ ক্লোরিন গ্যাস সাহায্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে গৃহে রোগী অবস্থান করে, আরোগ্যের পরে সেই গৃহের মধ্যেই এই ব্যবস্থা করিলে গৃহ ও গৃহসজ্জা—সমস্তই রোগের বীজমুক্ত হইয়া যাইবে। অতঃপর কয়েকদিন ঐ সকল সামগ্রী প্রখর রৌদ্রে রাখিয়া দিলে সূর্য্যকিরণমুক্তবাতাসের সাহায্যে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে ও পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

সচরাচর গন্ধকের ধূম দ্বারা রোগীর গৃহ বিশোধিত হইয়া থাকে। রোগীর গৃহে খাট, বাক্স, তোরঙ্গ প্রভৃতি কাঠের বা লোহের যে সমস্ত সামগ্রী থাকে, তাহাদিগকে

এবং ঘরের দরজা, জানালা ও দেওয়াল সমূহ কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণে সিক্ত বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঘর রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অধিক পরিমাণ গন্ধক কয়েক ঘণ্টাকাল জ্বালাইলে, ঘরের মধ্যে যে কোন স্থানে রোগের বীজ সংলগ্ন থাকিবে, তাহা গন্ধকের ধূম দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অবশেষে ঘরের দেওয়ালের চূণ কিয়দংশ চাঁচিয়া ফেলিয়া তাহাতে পুনরায় চূণ ফিরাইয়া দিলে উক্ত গৃহ পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। গৃহের মেঝে এবং ছাদের তলদেশ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত করিতে হইবে।

শাল প্রভৃতি পশমী দামী কাপড় যদি রোগীর সংস্পর্শে আইসে বা রোগীর ঘরের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপযুক্ত উপায়ে (বিশেষতঃ ক্লোরিণ সাহায্যে) বিশুদ্ধ করিতে গেলে কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতার কাপড়কে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সহজেই বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়। পশমী ও রেশমী কাপড় বিশুদ্ধ করিতে হইলে, পূর্ব্বে যে যন্ত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে উহাদিগের সংক্রামকতা দোষ নষ্ট করা উচিত। কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ একটী যন্ত্র ইটালিতে (Entally) স্থাপন করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর অনুমতি লইয়া সাধারণ লোকেও সংক্রামকতা-দুষ্ট বস্ত্র ও শয্যাদি বিশুদ্ধ করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

টিকা লওয়া:—(Inoculation ; vaccination) কোন কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে পুনরায় হইতে দেখা যায় না ;—যাহার একবার বসন্তরোগ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে বার বার বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে থাকিলেও প্রায় পুনরায় উক্ত রোগে আক্রান্ত হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসকেরা অনুমান করেন যে, সংক্রামক রোগ হইলে রক্তের এমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয় অথবা উক্ত রোগের বীজ হইতে এমন কোন বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থিত থাকে, যাহার দ্বারা ঐ ব্যক্তির শরীরে উক্ত রোগের বীজ পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে, তাহার ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা যে শুদ্ধ বসন্ত রোগেই ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। সংক্রামক রোগ মাত্রেই দেহ মধ্যে এইরূপ একটী বিষঘ্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা দেহকে ঐ রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। তবে বসন্তের ন্যায় অন্য সংক্রামক রোগে এই বিষঘ্ন পদার্থের শক্তি সেরূপ প্রবল বা বহুদিন স্থায়ী হয় না, অল্পদিনের মধ্যেই উহা হীনশক্তি হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসিলে, উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সচরাচর একেবারের অধিক হইতে দেখা যায় না, তবে কখন দুই, এমন কি, তিন বার পর্য্যন্ত হাম হইতে দেখা গিয়াছে। বসন্ত যে কখন পুনরায় হয় না, এরূপ নহে। লোকে বসন্ত রোগে দুইবার আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে, কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল এবং ঘটিলেও প্রায় প্রাণ হানি হয় না। কলেরা প্রভৃতি রোগেও এই নিবারণী-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহাকে অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক ইহা নিশ্চিত যে, যে কোন সংক্রামক রোগ একবার হইলে, অল্প বা অধিক দিন ঐ রোগে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সকল প্রকার সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার জন্য অধুনা "টিকা" দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে বীজ দ্বারা যে রোগ উৎপন্ন হয় (১) উহা অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় বা মৃতাবস্থায়, অথবা (২) উহাকে অন্য জীবের শরীরে প্রবেশ করাইয়া উহার পরিবর্তিত অবস্থায় কিংবা (৩) উহা হইতে রস বিশেষ (Antitoxin) মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করাইলে ঐ রোগের 'টিকা' দেওয়া হয়। একটী সূচল পিচকারী দ্বারা অথবা চর্ম্মের উপরিভাগের ছাল তুলিয়া তদুপরি লাগাইয়া উক্ত পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে উক্ত রোগ অতি মৃদুভাবে শরীরে

প্রবেশ পাইয়া এমন একটা বিষয় পদার্থ দেহের মধ্যে উৎপন্ন করে এবং তাহাতে শরীরের এমন এক সহ্য করিবার শক্তি জন্মায় যে, উক্ত রোগের বীজ অধিক মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ প্রবল ভাবে প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না,—এমন কি অনেক সময়ে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলে কসৌলি নামক স্থানে যে টিকা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বসন্ত নিবারণের জন্য যে মনুষ্য-বীজের টিকা লওয়া হইত; তাহাতে বসন্ত রোগীর গুটী হইতে রোগের বীজ সংগ্রহ করিয়া অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করান হইত। ইহা দ্বারা তাহার শরীরে অতি মৃদুভাবে বসন্ত রোগ প্রকাশ পাইত এবং তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত যে, তাহার পুনরায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু বসন্তের এরূপ টিকা লওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে, এইরূপ টিকা লইয়া সময়ে সময়ে সাংঘাতিক বসন্ত রোগ হইতে দেখা গিয়াছে এবং ঐ বীজ বিস্তৃত ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া কত লোকের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

মসূরিকা (Small-pox)

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

যে রোগে চর্ম্মের উপর বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত বহু পীড়কা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার নাম মসূরিকা। সাধারণতঃ বসন্তকালে এই রোগের প্রভাব দেখা যায় বলিয়া বাংলা ভাষায় ইহাকে বসন্ত বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বসন্ত -মসূরিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও হাম এবং পীড়কাযুক্ত ডেঙ্গু প্রভৃতিকেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মসূরিকা বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরাজীতে pox বলিতে যাহা বুঝায়, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বসন্ত শব্দ তাহাই বুঝাইয়া থাকে। দোষভেদে ইহা চারিপ্রকার; আশ্রয়ভেদে তিনপ্রকার এবং আকৃতিভেদে বহুপ্রকার।

সাধারণতঃ এই রোগ দেশদুষ্টি জন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্জাতীয় দোষের দ্বারা দেশ দুষ্ট হইলে বসন্তের প্রাদুর্ভাব সম্ভব, তদ্দেশে বাস জন্য যাহাদের দেহ তদ্দোষদুষ্ট হয়, সাধারণতঃ তাঁহারাই বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা একটী পিত্তশ্লেষ্মাবন সন্নিপাত ব্যাধি। বায়ুদোষ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত, কফকে প্রদুষ্ট করিয়া সম্প্রাপ্তিবিশেষের দ্বারা ত্বগাশ্রয় করিয়া বাহিরে ভিতরে এবং উভয়ত্র এই রোগ উৎপাদন করিতে পারে। হেমন্ত ও শীতকালের শৈত্যের প্রভাবে সঞ্চিত শ্লেষ্মা বসন্তকালে যখন প্রবলাযিত হয় এবং সূর্য্যসন্তাপ জন্য ঈষদুদীর্ণ পিত্ত—বায়ুকে প্রদুষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা আশয়স্থানে নীত হয়, তখনই এই পীড়কোদ্গম দৃষ্ট হয়। অন্যকালেও অহিত আহার বিহার জন্য যদি দোষ প্রকুপিত হইয়া এবম্বিধ সম্প্রাপ্তি আনয়ন করে, তাহা হইলেও এই রোগ হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় কালদুষ্টি থাকে না বলিয়া—রোগ বিশেষ ব্যাপক হয় না।

দোষ প্রকুপিত হইয়া স্থানসংশ্রয়করণান্তর রোগোৎপাদনের পূর্ব্বে রোগের কতকগুলি পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করে। তন্মধ্যে গাত্রবেদনা, গলাব্যথা, জ্বর, কণ্ডু, চক্ষুর লোহিতা ও পিচুটী, ত্বকের স্ফীতি ও বিবর্ণতা—প্রধান ভাবে লক্ষিত হয়। অনেক সময় অরতি ও ভ্রম

দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট হইবার চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে পীড়কা বাহির হয়। সাধারণতঃ পীড়কা বাহির হইবার পরই জ্বর ছাড়িয়া যায়। পীড়কাগুলি যদি বাহিরে ভাল ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রোগীর বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদি পীড়কা ভাল ভাবে বাহির না হইয়া ভিতরেই থাকে, তবে রোগীর জ্বর শান্তি হয় না; পরন্তু প্রলাপ, কাস প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকে। কালান্তরে রক্তবমন বা রক্তভেদ প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া রোগীর প্রাণনাশ করিতে পারে। অতীসার— এই রোগের একটী মারাত্মক উপদ্রব। অনেক সময় রোগীর শরীরে বিষ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর বর্ণ কৃষ্ণভাব ধারণ করে এবং কম্প ও প্রলাপ উপস্থিত হয়। ইহাও একটী মরণোন্মুখতক চিহ্ন। Pneumonia, অতীসার, রক্তস্রাব এবং বিষলক্ষণ—ইহার কোনটাই বসন্তের ভাল লক্ষণ নহে। বসন্ত রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে এই উপদ্রবগুলি যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

পীড়কাগুলি সম্যক্ বাহির হইলে ভয়ানক কণ্ডু দেখা যায়। এই সময় রোগীকে নখ দিয়া চুলকাইতে দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে। পীড়কাগুলি নখ দ্বারা ছিন্ন হইলে বিষ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে. কিন্তু শান্তির নিমিত্ত হরিদ্রা ও দূর্ব্বার রস যেখানে যেখানে কণ্ডু হইবে, সেখানে সেখানে লাগাইতে হইবে এবং ফুটন্ত জলে নেকড়া ভিজাইয়া মুছাইয়া দিতে হইবে। পীড়কা বাহির হইবার ৩।৪ দিন পরেই পাকিতে আরম্ভ করে এবং পুনরায় জ্বর দেখা যায়। পীড়কাগুলি পাকিয়া গেলে "মহাপিণ্ড তৈল" তুলি করিয়া রোগীর পীড়কাগুলিতে মাখাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে পীড়কাগুলি সত্বর শুকাইয়া যায় এবং মক্ষিকা প্রভৃতি তাহার উপর বসে না। যদি পীড়কাগুলি গলিয়া যাইয়া যায়, তাহা হইলে "খদিরাষ্টক" পাচনের কাথে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া "মহাপিণ্ড তৈল" লাগাইয়া দেওয়া উচিত। ৪।৫ দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইতে আরম্ভ করে। শুকাইয়া গেলে, নিমপাতা ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া তাহার দ্বারা রোগীর সমস্ত গাত্র মার্জ্জন করিয়া চামাটীগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। (হরিদ্রা ও নিমপাতার সহিত মিশ্রিত চামাটীগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া একটু কেরোসিন সংযোগে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।) পরে গরম জল দ্বারা গা মোছাইয়া দিতে হইবে। কোন কাঁচা ঘা থাকিলে তাহার উপর "মহাপিণ্ডতৈল" লাগাইয়া দিতে হইবে। দাগগুলিতে এই তৈল লাগাইলে বসন্তের দাগ নষ্ট হইয়া যায়। রোগীর গায়ের ঘা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না গেলে এবং চামড়া বা চামাটী সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া না গেলে রোগীকে বাহির হইতে দেওয়া উচিত নহে।

রোগীর পরিচর্য্যা :—

রোগীকে পরিষ্কার ও নরম বিছানায় শোয়াইতে হইবে। রোগীর বিছানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, উহা পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, কিন্তু ব্যবহৃত বিছানা বাহিরে আনা চলিবে না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সোডার জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। রোগীর ক্ষুধার অনুরূপ লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য দেওয়া উচিত। অনেকে পান্তা ভাত, কলায়ের ডাল পথ্য দিয়া থাকেন, ইহা উচিত নহে। যাহাতে রোগ বিস্তার লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য রোগীকে মশারির ভিতর রাখা উচিত। রোগীর ঘরে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় নিমপাতা, ধুনা, গুগগুল ও কর্পূরের ধূপ দেওয়া উচিত। রোগীকে দেখিবার জন্য শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া ভাল নহে। যদি একান্ত যাইতে হয়, তাহা হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে পারেন। কিন্তু রোগীর মশারি তুলিয়া দেখা উচিত নহে

বাড়ীতে বসন্ত হইলে যাহা যাহা করিতে হয়—

বাড়ীতে প্রত্যহ ৺শীতলা পূজা ও হোম করা উচিত। হোমের দ্বারা ভূমির আর্দ্রতা নষ্ট হয় এবং তত্রস্থ বায়ু হাল্কা হইয়া যায় বলিয়া চারিদিক হইতে বায়ু সেই অগ্নির নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। বায়ুতে যদি বসন্তের বীজ থাকে, তাহা অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না, পরন্তু ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যের সুগন্ধে বায়ুমণ্ডল পবিত্র হইয়া এক প্রকার সুগন্ধ বিস্তার করে; তাহার ফলে সকলের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়। বাড়ীতে বসন্ত হইলে মৎস্য ভক্ষণ, ভিক্ষা দেওয়া, ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়া, এবং বাড়ী হইতে কোন জিনিস বাহির করা উচিত নহে। কারণ এই প্রকারে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। বসন্ত সারিয়া যাওয়ার পর কাপড় চোপড় নিজ বাড়ীতে সোডার জলে সিদ্ধ ও পরিষ্কার জলে ধৌত করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। ইহার পরে ধোপার বাড়ী দেওয়া যাইতে পারে।

রোগীর পরিচর্য্যাকারকের অবশ্য প্রতিপাল্য কয়েকটী নিয়ম :—

১। নিজের হাত উত্তমরূপে সাবান দিয়া ধুইয়া হরিদ্রার রসে হাত রঞ্জিত করিয়া রোগীর ঘরে যাইতে হইবে।

২। যে কাপড় পরিয়া রোগীর ঘরে যাইতে হইবে, তাহা বাহিরে আনা চলিবে না।

৩। বাহিরে আসিয়াই পুনরায় সাবান দিয়া হাত, পা, মুখ ধুইয়া গাত্র মার্জ্জন করিতে হইবে।

৪। রোগীর গাত্র মার্জ্জনের জন্য সোডার জলে সিদ্ধ করা পরিষ্কার নেকড়া ব্যবহার করা উচিত এবং একবার ব্যবহৃত দ্রব্য পুনরায় ব্যবহার করা চলিবে না। উহা কেরোসিন যোগে পোড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

প্রতিষেধ :—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দেশদুষ্টি এবং শরীরের প্রতিরোধ-শক্তির হ্রাস জন্য বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাহাতে দেশ দুষ্ট হইতে না পারে এবং শরীরের প্রতিরোধক শক্তি অব্যাহত থাকে, তৎপ্রতি সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। দেশদুষ্টি সাধারণতঃ নানাপ্রকার আবর্জ্জনা পচিয়া বায়ুমণ্ডল দুষ্ট হয় বলিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে সুতরাং যাহাতে দেশ বিশুদ্ধ থাকে—তজ্জন্য কোন প্রকার আবর্জ্জনা জমিতে দেওয়া উচিত নহে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে শীতলা দেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। শীতলার ধ্যানে আমরা দেখিতে পাই, "মার্জ্জনী কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃত মস্তকাম্"। ইহার দ্বারা ইহাই ঘোষিত হইতেছে যে, দেবীর হস্তে মার্জ্জনী ও জলপূর্ণ কলস এবং মস্তকে কুলা। স্থান, আসন এবং ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসকল নিরন্তর মার্জ্জনা করিতে হইবে ও বিশুদ্ধ জল দ্বারা সকলকে ধৌত করিয়া লইতে হইবে এবং যে সকল খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইবে, তাহাদিগকে ঝাড়িয়া, বাছিয়া ধুইয়া তবে খাদ্যরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। এক কথায় ব্যবহার্য্যদ্রব্যগুলিকে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। শরীর সম্বন্ধেও এই নিয়ম। শরীরে মলমূত্রাদি কোন প্রকার আবর্জ্জনা জমিতে দেওয়া উচিত নহে। মুখ, চোখ, নাক, কাণ প্রভৃতি ছিদ্র সকল, গাত্রাবয়ব, কাপড় চোপড়—সবই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে রাখিতে হইবে। এইরূপে বাহ্য এবং আভ্যন্তর-শীতলা পূজা প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। লঘু, সুপাচ্য, পুষ্টিকর ও স্বগৃহে প্রস্তুত খাদ্য আহার করা উচিত। সর্ষপ তৈলের অভ্যঙ্গ ও নস্য লওয়া কর্ত্তব্য। ঋতুসুখকর জলে স্নান, গৃহে দুই বেলা ধূপ দান করা উচিত। প্রত্যহ যাহাতে দুইবেলা কোষ্ঠ সাফ থাকে, তজ্জন্য চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক আহার, বাহিরের কোন জিনিষ খাওয়া, থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি বহুলোক পূর্ণস্থানে অবস্থান এবং কোন

প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। এই সময় বাকী, নিম, পলতা উচ্ছে প্রভৃতি তিক্ত জিনিষ ভক্ষণ করা উচিত।

এই নিয়মে চলিলে শুধু বসন্ত কেন, সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক ও অহিত সেবন জন্য রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই সকল নিয়ম পালন না করিয়া কেবল টীকার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। টীকা না লইয়াও যদি এই সকল নিয়ম পালন করা হয়, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবল টীকার উপর নির্ভর করিলে অনেক সময় বসন্তের আক্রমণ দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদ ও গবর্ণমেণ্ট

(১)

গবর্ণমেণ্ট আমাদের আয়ুর্ব্বেদের জন্য এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করেন নাই বলিয়া অনেকে গবর্ণমেণ্টের দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বিটিশ রাজত্ব স্থাপনার পর ইংরাজ আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য যতটা পারিয়াছেন, কিছুরই ত্রুটী করেন নাই। আজ যে ছাপার অক্ষরে সমস্ত সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইতেছে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ইহা কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। অতি দূর দূরান্তর হইতে এই মুহূর্ত্তে সংবাদ আনিবার উপায়—টেলিগ্রামের ব্যবস্থা ইংরাজই আমাদিগকে করিয়া দিয়াছেন। একখানি পোষ্টকার্ডের সাহায্যে ভারতের সকল প্রদেশে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ইংরাজ ভিন্ন আমাদের কে করিয়াছিল? রাম-রাজত্বে আমরা পরম সুখে ছিলাম—সে সকল তো বহু কালের কথা, সেকাল আমরা দেখিও নাই, সেকালে কি ব্যবস্থা ছিল—তাহাও জানিনা। এ অবস্থায় অতীত কালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে আমাদের অভাব-অসুবিধার জন্য ইংরাজের উপর গালিবর্ষণ করিলে চলিবেনা,—আমাদের নিজেদের দোষগুলির কথাই সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে।

ইংরাজ আয়ুর্ব্বেদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই—ইহা অতি সত্য, কিন্তু তাহার জন্য কি দায়ী আমরাই নহি? ইংরাজ যখন এদেশে আসিলেন, তখন তো দেশের শাসন শৃঙ্খলার জন্য—বিধিব্যবস্থার জন্য—সুবিধা-অসুবিধার জন্য তাঁহারা তো আমাদের দেশের অধিবাসী বৃন্দেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারী হিসাবে, শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে, মন্ত্রণা সভার পরামর্শ দাতা হিসাবে এদেশের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ তো পর্য্যাপ্ত আসন প্রদান করিয়াছিলেন। দেশের সুখ-সুবিধার জন্য এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহা তো এ দেশবাসীরই পরামর্শের ফল। আয়ুর্ব্বেদ অতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র, এমন কি, আয়ুর্ব্বেদই যে সকল চিকিৎসা শাস্ত্রের আদি জননী—ইহা যদি দেশের লোক ইংরাজকে দেখাইয়া না দেয় এবং তাহার জন্য ইংরাজ ইহার উন্নতি কল্পে কিছু না করেন, তাহা হইলে ইহার জন্য দোষী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট না আমরা?

স্বীকার করি,—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি জগতে অতুলনীয়। সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র উত্তমরূপে অধিগত করিতে পারিলে একদিকে যেমন রোগ নির্ণয় ও ঔষধ প্রয়োগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, অন্য দিকে এই শাস্ত্র শিক্ষার ফলে মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় আধিব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারে, কিন্তু মহাত্মা গঙ্গাধর এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালের কতকগুলি চিকিৎসক ভিন্ন

সকলেই যে সেরূপভাবে ইহার সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তো কোনোক্রমেই বলিতে পারা যায় না। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপভাবে আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চা দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যদি বুঝিতাম, ঠিক সেইরূপ ভাবেই দেশের অধিবাসিগণ সনাতন আয়ুর্ব্বেদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কায়-মনোপ্রাণে চেষ্টা করিতেছেন, এবং দেশবাসীর মতিগতিও এই চিকিৎসার উপর অটুট রহিয়াছে, যদি বুঝিতাম দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত—সকল নরনারীই প্রাণান্তেও এই চিকিৎসা ভিন্ন অন্য চিকিৎসার শরণ গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক—এবং সে অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদের জন্য কিছু করিতেছেন না, তাহা হইলে বলিতাম—গবর্ণমেণ্টের সহস্র দোষ, গবর্ণমেণ্ট আমাদের আয়ুর্ব্বেদের গৌরব রক্ষা না করিয়া প্রকৃতই অন্যায়ের পো:কতা করিতেছেন।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দোষ দিব কেমন করিয়া? সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন আমাদের দেশের লোকে যেরূপ করিয়া আসিয়াছে,তাহাতে এই চিকিৎসার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন গবর্ণমেণ্টের করিবার উপায় ছিলনা। আমি এদেশের অধিবাসী হইয়া এদেশজাত ঔষধে যদি অনিচ্ছা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে বিদেশী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের চিকিৎসার জন্য মনোযোগী হইবেন—এ আশা কোনো ক্রমেই করিতে পারা যায় না। একটা চলিত কথায় আছে,"যার কাজ তা'র মনে নাই পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।" আমরা দেশের লোক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি ষোল আনা আস্থা প্রদর্শন করিয়া বিদেশীয় চিকিৎসা বর্জ্জন করিব না অথচ আমাদের গবর্ণমেণ্টকে আয়ুর্ব্বেদের জন্য সাহায্য প্রদান করিতে হইবে, এ আশা মন্দ নহে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোকে 'স্বরাজ' 'স্বরাজ' করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু এই মতের পরিপোষকগণের মধ্যে কয়জন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অনুরাগী—যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে কিন্তু দেখিবেন, অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছেন। স্বরাজ লাভ সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় কিন্তু স্বরাজ লাভের মূলমন্ত্র আর্য্য চিকিৎসার উৎকর্ষ সাধন হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়। শুধু মুখে হৈ চৈ করিলে চলিবে না। সেই হৈ চৈয়ের মধ্যে যাহার আন্তরিকতা নাই, তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই হইতে পারেনা।

সুখের বিষয় সনাতন আয়ুর্ব্বেদের এখন পূর্ব্বের মত দুরবস্থা নাই। অনেকে এখন বিশেষ ভাবেই বুঝিয়াছেন নীরোগ ও সুস্থদেহে কিছুকাল বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে আবার এই চিকিৎসারই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির সূত্রপাত তাহার ফলসম্ভূত। শুধু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় নহেন এখন দেশের সকল লোকেই এইভাব লইয়া নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জাগরণের ফল যে অতি শুভ হইবে তাহা অবিসংবাদিত সত্য। আমরা জাগিলেই গবর্ণমেণ্টেও জাগিবেন গবর্ণমেণ্ট জাগিলেই এই চিকিৎসার পুনরুন্নতি যে পূর্ব্বের মত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, সুতরাং আমাদের এই শুভ জাগরণের দিনে নিদ্রার ঘোর যাহাতে পুনরায় আসিয়া না পড়ে, তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রাচীন হিন্দুর চিকিৎসা জ্ঞান

[শ্রীহরিপদ ঘোষাল বি, এ, বি, এল, এম, বি, এইচ]

প্রাচীন হিন্দুদিগের চিকিৎসা জ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল, তাহা আয়ুর্ব্বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তিজনক অর্থে সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। ইহার বিস্তৃতিও যে আরব, পারস্য, ইউরোপ, ও সুদূর মিশরদেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যে এলোপাথির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে যাই, সেই এলোপ্যাথির জন্মদাতা যে আয়ুর্ব্বেদ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। আয়ুর্ব্বেদ শব্দের অর্থ—

"আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধে নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আয়ুর হিত ও অহিত, ব্যাধির কারণ এবং তাহা নিবারণের উপায় বর্ণিত থাকে, তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণ যে রোগ প্রতীকার জন্যই কতকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা নহে, অধিকন্তু যাহাতে লোকে রোগাক্রান্ত হইতে না পারে, তাহার বিধি-ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। এদেশে চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতা চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অগ্নিবেশ—তাঁহার শিষ্যকে যে যে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, শিষ্য তৎসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন,—ইহাই চরক সংহিতার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তি অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

আয়ুর্ব্বেদ আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—১। শল্য (Surgical Treatment) ২। শালাক্য (Treatment of diseases of the head, eyes, ears and face) ৩। কায় চিকিৎসা (Treatment of general diseases) ৪। ভূতবিদ্যা (diseases caused by evil spirit) ৫। কৌমার ভৃত্য (The treatment of infants and of the puerperal state) ৬। অগদ (Antidote to poisons) ৭। রসায়ন (Medicines promoting health and longivity) ৮। বাজী করণ (Approdisiacs)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তি আড়াই সহস্র বৎসরেরও অধিক। ইহার প্রাথমিক অবস্থায় অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা দ্বারা ইহার উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং উত্তরোত্তর ইহার উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী অবস্থা আলোচনা করিলে, আয়ুর্ব্বেদের আবার অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মা—অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত যে আয়ুর্ব্বেদকে সহস্র অধ্যায়ে এবং একলক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ করেন, কলি যুগে তাঁহারাই তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচখানি সংহিতা সঙ্কলন করেন। সেই গুলি যথাক্রমে চতুর্বিংশতি সহস্র, দ্বাদশ সহস্র, ছয় সহস্র, তিন সহস্র, ও পঞ্চদশশত শ্লোকে সমাপ্ত করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানিই সর্ব্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়।

এদেশে যে শল্য চিকিৎসা (surgery) প্রচলিত ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বৈদেশিকদিগের নিকট হইতেও পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজান্দার ভারত অভিযানের সময় এদেশে শল্যচিকিৎসা প্রচলিত দেখিয়া গিয়াছিলেন। সার্জ্জন জেনারেল সি, এ, গর্ডন এম ডি, সি, বি বলিয়াছেন "খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪ শতাব্দীতে আলেকজান্দারের এসিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের

বিষয় অল্পই জানা গিয়াছিল, তথাপি ইহা খুব প্রামাণিক যে, উক্ত আলেকজান্দারের সহিত যে সকল চিকিৎসক আসিয়াছিলেন ভারতের উত্তরপশ্চিমবাসী হিন্দুরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে অনেক উন্নত ছিলেন তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃষি, যুদ্ধ এবং মৃগয়াদি ব্যাপারে সচরাচর অনেক আঘাতজনিত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এজন্যই হিন্দুগণ অস্ত্রচিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগে বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং বেদেও অস্ত্র চিকিৎসাকে অষ্টাঙ্গ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ডাক্তার টি. এস্ উইলসন সাহেব তাঁহার বিখ্যাত "History of Medicine" (ঔষধের ইতিহাস) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"চিকিৎসা, জ্যোতিষ এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুগণ এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি উন্নত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা, যে সকল জাতির মহৎকার্য্যাদি নিদর্শনস্বরূপ রাখা যাইতে পারে, তাঁহাদের ন্যায় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা এবং অস্ত্র চিকিৎসায় প্রখর দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। * * অতি পুরাকালে হিন্দুস্থানে (ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সম্বন্ধে সুপ্রণালী সঙ্গত বা নিয়মিত গ্রন্থ সকল ছিল—তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। * * হিন্দুদিগের নিকট হইতেই আমরা প্রথম ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

মিঃ আর, সি, দত্ত তাঁহার "Ancient India" (প্রাচীন ভারত) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"২২ শতাব্দী পূর্ব্বে আলেকজান্দারের গ্রীক্ চিকিৎসকগণ যে সকল রোগ আরোগ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আলেকজান্দার সেই সকল রোগ চিকিৎসার্থে তাঁহার সভায় হিন্দু চিকিৎসকদিগকে রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং ১৯শ শতাব্দী অতীত হইল, বোগদাদের হারুণ-উল-রসিদ দুইজন হিন্দু চিকিৎসক তাঁহার নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। আরবীয় নিদর্শনাদিতে ও ইতিবৃত্তে এই চিকিৎসকদ্বয় মঙ্ক ও সালিম নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন অনুসন্ধানে আরও জানা যায় যে, আরব-গ্রন্থকার দিগের মধ্যে স্বেপিয়ন নামক জনৈক গ্রন্থকার "চরক" জার্ক নামে উল্লেখ করেন। প্রফেসার মোক্ষমূলার ও মনিয়ার উইলিয়ামস নামক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুচিকিৎসা-পদ্ধতির বহুল প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

চরক ও হারিত সংহিতায় গুল্ম, জলোদর, অশ্মরী (পাথুরি) শ্লীপদ, অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিশেষতঃ জলোদর রোগ—অস্ত্র চিকিৎসা ব্যতীত নিরাময় হওয়া যে অসম্ভব—তাহা হারিত সংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়।

প্রাচীন হিন্দুদিগের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা চরক সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা ছয় শত প্রকার বিরেচক ঔষধের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন চরকোক্ত দ্রব্যগুণে চারি প্রকার মহাস্নেহ বা তৈলবৎ পদার্থ, পঞ্চ প্রকার লবণ, অষ্ট প্রকার দুগ্ধ, অষ্টবিধ মূত্র, পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারের মূল ও ফলের বৃক্ষ, এতদ্দেশীয় শস্য পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল-নির্য্যাস প্রভৃতি বৃক্ষলতাদির গুণ, উক্ত সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, নবনী প্রভৃতির গুণ, নানাপ্রকার সুরার গুণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ প্রভৃতি অষ্ট ধাতুর গুণ, হরিতাল, দারমুজ ও গৈরিক প্রভৃতি ঔষধের গুণ নানা জাতীয় পশুপক্ষীর মাংসের গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ রসায়ন তন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

গাউট ও বাতরক্ত

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসু কাব্যবিনোদ সাহিত্যভূষণ ।

ইংরাজীতে যাহাকে গাউট বলে, তাহার অপর নাম পোডেগ্রা (Podagra) । ইহাকে কেহ কেহ বাঙ্গলা গ্রন্থিবাত বা গেটেবাতের সমসংজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গেটেবাতের ন্যায় গাউটেও ক্ষুদ্রসন্ধি আক্রান্ত হইলেও উভয়টি সম্ভবতঃ একই ব্যাধি নহে, গেটেবাত বহুলোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গাউট আমাদের দেশে খুব বেশী লোকের হয় না, ইহা ধনী ব্যক্তিদের ব্যাধি এবং আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশের নয় বলিয়া ইহাকে ধনসম্পদশালী বিলাতের ব্যাধি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গাউট, প্রোটিন খাদ্যের মাংসজাতীয় উপাদানের সমীকরণের অভাব বশতঃ জন্মিয়া থাকে। খাদ্যের মাংসজাতীয় উপাদানের রূপান্তরকে Purin bodies বলে, ইউরিক এসিড, রীতিমত সমীকৃত হয় না, সুতরাং রক্তমধ্যে উহার আধিক্যবশতঃ ইউরেট অব সোডা নামক পদার্থ হস্তপদাদির সন্ধিমধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জমিয়া যায় এবং উহা হইতে বেদনা ও স্ফীতি ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে বাতরক্ত বলে, কিন্তু গাউট অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাতরক্তের অধিকার বহুবিস্তীর্ণ।

গাউটে ক্ষুদ্রসন্ধি পীড়িত হয়, সন্ধির মধ্যে এবং উহার চতুঃপার্শ্বে সোডিয়ম বাইরেট – চা খড়ির ন্যায় জমিয়া থাকে। এই ব্যাধি শিশু ও বালকদের কখনও হইতে শুনা যায় না। কিন্তু ডাক্তার অসলার বলেন—"It is rarely seen before the thirtieth year though cases have occured before puberty and even infants at the breast" অর্থাৎ ইহা ৩০ বৎসরের ন্যূন ব্যক্তির মধ্যে কচিত দৃষ্ট হয়, কিন্তু বালক এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে। যাহা হউক, ত্রিশের উদ্ধ বয়স্কেরাই সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে এই ব্যাধির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়. উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃপিতামহ হইতে এই ব্যাধি সন্তান সন্ততিতে বর্ত্তিয়া থাকে, শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন রোগীতেই এইরূপ বংশপরম্পরা লক্ষিত হয়, মাতা অপেক্ষা পিতা হইতে অধিকাংশ স্থলে পুত্র এই ব্যাধির উত্তরাধিকারী হয়। মদ্য ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, যে সমস্ত প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে, সেই ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি এবং আমেরিকায় ইহার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকায় সম্ভবতঃ এই ব্যাধির প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। খাদ্যের সহিতও এই ব্যাধির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যাহারা কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম করেন না অথচ তাহাদের ভোজন সর্ব্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে চলে, তাহাদের গাউট হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, সেজন্য অনেকে বলেন, ইহা পরিশ্রমবিমুখ, মদ্য ও নানারূপ উপাদেয় খাদ্যাদি ভোজনশীল ধনীদের ব্যাধি, কিন্তু দরিদ্রের মধ্যে এই ব্যাধি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও একেবারে বিরল হইবার কোন কারণ নাই। অপুষ্টিকর, অল্প আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রমে জীবনশক্তির ক্ষয় এবং স্বাস্থ্যবিধির অজ্ঞানতা একত্র মিলিত হইলে দরিদ্রের মধ্যেও গাউট হইতে দেখা যায়। যাহারা মদ্যের কারখানায় কাজ করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই ব্যাধিতে ভুগিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদের বাতরক্ত এবং গাউটের কারণ এবং আক্রমণ একই প্রকার। কারণ সম্বন্ধে মহামতি চরক বলিয়াছেন—"প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহার বিহারিণাম॥" আরম্ভ সম্বন্ধেও তিনি বলেন—

"তপাস্থানং করৌ পাদবঙ্গুল্যঃ পর্ব্বসন্ধয়ঃ।
কৃত্বাদৌ হস্তপাদেতু মূলং দেহে বিধাবতি॥"

ইহার স্থান—কর, পাদ অঙ্গুলী, পর্ব্বসন্ধি প্রথমে হস্তপদে আরম্ভ হইয়া পরে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—এই ব্যাধিতে রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ ইউরিক এসিড দেখা যায়। মধ্যবর্ত্তী সময় অপেক্ষা গাউটের আক্রমণ সময়েই ইহার প্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে। ইহাতে সন্ধির টিসু মধ্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী আক্রান্ত হয়, পরে গুল্ফ্, কনুই এবং হস্তের সন্ধিগুলি আক্রমণ করিয়া থাকে। ডিপজিট সাধারণতঃ নিম্নাঙ্গের সমস্ত সন্ধিতে জমা হয় এবং উর্দ্ধাঙ্গের সন্ধিগুলি এই ডিপজিট হইতে প্রায়ই মুক্ত থাকে। তরুণ অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে প্রদাহ, রক্ত সঞ্চয়, লিগামেণ্ট টিসুর স্ফীতি এবং সন্ধিতে অপস্রাব (effusion) হইতে দেখা যায়।

ডাক্তার টিডি তৎপ্রণীত পুস্তকে গাউটের রাসায়নিক নিদানের (Chamical Patholagy) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য—

(১) ইউরিক এসিড্ এবং পিউরিন সকল অস্বাভাবিক ভাবে (abnormal form) রক্তমধ্যে গতিরোধ করে।

(২) বৃক্ক (kidney) রক্ত হইতে ইউরিক এসিড্‌কে পৃথক করিতে পারে না।

(৩) সুতরাং ইউরিক এসিড্—লবণ সমূহ রক্তে জমা হয়।

(৪) এই সমস্ত ইউরিক এসিড্ লবণ দ্রবণীয় হইতে অপেক্ষাকৃত দ্রবণীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ক্রমে শক্ত হইয়া আসে এবং রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণে জমিয়া যায়।

(৫) উক্ত অবস্থা হইতে ইউরেট জমা হয়।

(৬) আক্রান্ত সন্ধিতে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

(৭) ইউরেট জমা হইবার এবং ব্যাধির লক্ষণাদি প্রকাশ পাইবার পরে রক্ত সাময়িকভাবে অতিরিক্ত ইউরেট হইতে মুক্ত হয়, রোগী প্রায়ই সুস্থবোধ করে অজ্ঞাতকারণ এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান এবং রক্তে ইউরেট জমা পুনরায় হয়।

গাউট বাতকে সাধারণতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—তরুণ, পুরাতন এবং অনিয়মিত।

তরুণ পীড়ায় হস্তপদে ক্ষুদ্র সন্ধির বেদনা, রাত্রিকালীন অস্থিরতা বিরক্তচিত্ততা এবং অজীর্ণতা প্রাথমিক উপসর্গ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। প্রস্রাব অত্যন্ত লাল, পরিমাণে অল্প এবং অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হয়। উহাতে ইউরেট এবং সামান্য এলবুমেন তলানি পড়ে। কোন কোন রোগীর প্রস্রাবে শর্করাও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থাকে gouty glycosuria বলে। আক্রমণের পূর্ব্বে ইউরেটিক এসিডের পরিমাণও অল্প থাকে; রোগী গাউট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহার পরিমাণও কমিয়া যায়, প্রস্রাবে ফস্‌ফরিক এসিডের পরিমাণও ঐরূপ হয় কিন্তু তীব্র তরুণ লক্ষণগুলি হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বোক্ত এসিড্‌দ্বয়ের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে, কোন কোন রোগীর গলাবেদনা হয় এবং হাঁপানির ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধির আরম্ভ প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হয়, রোগী বেশ সুস্থ আছে, তাহার শরীর বিশেষ কোন অসুখ নাই, গভীর রাত্রে হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলীর যন্ত্রণায় তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সে চীৎকার করিয়া উঠে, বৃদ্ধাঙ্গুলীতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, জ্বর হয়। সকাল হইতে উপসর্গ কমিতে আরম্ভ হয়, সমস্ত দিন একরূপ ভাল ভাবেই কাটিয়া যায়, কিন্তু পরের রাত্রে আবার সেইরূপ উপসর্গ উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ ৮ দিনের পর হইতে উপসর্গ কমিতে আরম্ভ করে গাউটের পুনরাক্রমণ ঘন ঘন হইতে পারে, কাহারও কাহারও বৎসরে তিন চারিবার হইয়া থাকে। মারাত্মক

উপসর্গও উপস্থিত হইতে পারে। retrocedent বা suppressed gout এ এইরূপ হইয়া থাকে।

পুরাতন গাউট। নূতন গাউটের পুনঃপুনঃ আক্রমণে সন্ধির প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিয়া যায় এবং ক্রমে অধিকতর সন্ধি আক্রান্ত হয়। সন্ধিতে ইউরেট জমিয়া যায়, এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইলে সন্ধি স্ফীত, অসম এবং কদাকার হয়। কর্ণেটোপাস নামক এক প্রকার খড়ির ন্যায় শক্ত Ca'carious formation পড়ে। পুরাতন গাউট-পীড়িত ব্যক্তিদের প্রায়ই অজীর্ণ থাকে। প্রস্রাব পরিমাণে বেশী হয়, উহার আক্ষেপিক গুরুত্ব কম থাকে এবং উহাতে সামান্য এলবুমেন পাওয়া যায়। এককালে বহুসন্ধির প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে জ্বরও প্রকাশ পায় অথবা জ্বর না হইয়াও সন্ধির বেদনা, আরক্ততা ও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

অনিয়মিত গাউট। ইহা নানাপ্রকারের অনিয়ম লক্ষণ যুক্ত ব্যাধি। ইহাকে Gouty diathesis বলা যায়। সন্ধিতে বেদনা ও তদানুসঙ্গিক উপসর্গ ইহার প্রধান লক্ষণ গাউট ব্যাধিগ্রস্ত পরিবারে অতি সাবধানী ব্যক্তিও ইহার দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে। অতি সাবধানের জন্য তাহারা তরুণ গাউটে আক্রান্ত না হইতে পারে, কিন্তু এইরূপ উপসর্গ হইতে কখনও নিস্তার পায় না। এইরূপ পরিবারের মেয়েরা এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয় না, অথচ ছেলেরা নিস্তার পায় না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, গাউট অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদোক্ত বাতরক্তে অধিকার বড় বিস্তীর্ণ, এক বৎসর পরে বাতরক্ত প্রায়ই অসাধ্য ব্যাধি বলিয়া গণ্য হয় এবং পীড়া প্রবল হইলে ইহা হইতে কুষ্ঠ ব্যাধির লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে।

পারিবারিক চিকিৎসা

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এল, এ, এম, এস,)

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্‌পেপসিয়া —এখনকার দিনে ডিস্‌পেপসিয়া বলিয়া যে ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা আজ কাল প্রায় অধিকাংশ লোকেরই, বিশেষতঃ সহরে প্রায় পনের আনা লোকে যে ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, তাহা আয়ুর্ব্বেদের অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের অন্তর্গত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অগ্নিমান্দ্যের নিদানে আমরা জানিতে পারি, অধিক জল পান, অপরিমিত আহার, সর্ব্বদা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা, উত্তমরূপে চর্ব্বণের অভাব, পরিপাক যন্ত্রের দোষ, ক্রিমি রোগ, অধিক শীতসেবা অথবা অগ্নি, রৌদ্র প্রভৃতির আতপ সেবন, অধিক জলক্রীড়া ও অধিক পান চিবাইলে অগ্নিমান্দ্য রোগ উৎপন্ন হয়। অজীর্ণের কারণও এইগুলি, ইহা ভিন্ন কোন দিন অল্প, কোনদিন অধিক ভোজন, শুষ্ক বা পচা দ্রব্য ভোজন, অনিচ্ছায় বা ঘৃণার সহিত ভোজন, আহারকালে ভয়, ক্রোধ, লোভ, শোক বা অন্য কোন কারণে মনঃপীড়া ভোগ এবং আহার অন্তেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে। এই কারণ গুলির মধ্যে অনেকগুলি কারণই এখনকার দিনে সাধারণ লোকের মধ্যে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক ঘটিয়া থাকে। সহরে তো ইহার কারণ যথেষ্টই—বিশেষতঃ যাহাদিগকে চাকুরি করিয়া দিন গুজরাণ করিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহার কতকগুলি কারণ যে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে—তাহা সকলেই অবগত আছেন।

অজীর্ণের চিকিৎসার কথা আমরা "আয়ুর্বিজ্ঞানের" ১ম সংখ্যায় কতকটা বলিয়াছিলাম, কিন্তু ডিস্‌পেপসিয়া বলিলে শুধু অজীর্ণ নহে, অগ্নিমান্দ্যও বুঝায়, সেইজন্য এবার ইহার কথা আরও বলিব।

ডিস্‌পেপসিয়ার প্রকার ভেদ।—সাধারণতঃ ডিস্‌পেপসিয়া দুই প্রকার, কাহারও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, কাহারও বা তরল ভেদ হয়। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য ভিন্ন অম্লপিত্ত ও গ্রহণীগ্রস্ত ব্যক্তিদিগেরও অবস্থার প্রকার ভেদে ডাক্তারেরা ডিস্পেপসিয়া সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। অম্লপিত্ত কিন্তু স্বতন্ত্র রোগ,উহাকে ডিস্পেপসিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিতে আমরা প্রস্তুত নহি, তবে গ্রহণী রোগের মধ্যে যে সংগ্রহ গ্রহণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত আধুনিক ডিস্পেপসিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ফল কথা, ডিস্পেপসিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের সাদৃশ্যই বিশেষভাবে বর্ত্তমান।

ব্যবস্থা।—সর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ম পালনই অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্পেপসিয়া রোগের উত্তম চিকিৎসা। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে ব্যায়াম করা, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করা,—এই দুইটির প্রতি অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য গ্রস্থ রোগীদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অন্য ব্যায়াম করিবার সুবিধা না হইলে, প্রত্যহ দুই বেলা পদব্রজে ভ্রমণেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। রোগী বিশেষ দুর্ব্বল না হইলে ইহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।—অনেক সময় অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের মূল কারণ বায়ুই অনুমিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাকে বাতাজীর্ণ বলিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বায়ুনাশক ক্রিয়া দ্বারা অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হইয়া থাকে। এখন চা পান আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই চা পানের ফলেও আমরা অনেক সময় অজীর্ণ রোগকে ডাকিয়া আনিয়া থাকি। অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই চা পানের অভ্যাস একেবারেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। চা পান না করিয়া প্রাতঃকালে গরম জল পান করিলে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্থ ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ঐ গরম জলে খানিকটা কাগজী বা পাতি লেবুর রস মিশাইয়া পান করিলে অধিক উপকার হয়।

পথ্য।—অজীর্ণের নূতন অবস্থায় দুই একদিন উপবাসই প্রশস্ত, কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে উপবাস দিবার প্রয়োজন নাই, দিবসে অন্ন এবং রাত্রিতে রুচি বিবেচনায়, সাগু, বার্লি, লুচি বা ভাত খাইতে পারা যায়। দুগ্ধ ইহাতে উপকারী নহে, কিন্তু ঘোল মহৌষধ, একন্য অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্থ রোগী দিগের নিত্য ঘোল পান করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ।—যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, ক্ষুধা ভাল হয় না, বৈকালে পেট ভার হইয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষে—(১) দিবসে আহারের ১৫ মিনিট পরে বিট্‌ লবণের গুঁড়া—এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। (২) হরীতকী, পিপুল ও করকচ লবণ—সমান ভাগে ইহাদের চূর্ণ মিশাইয়া গরম জলসহ রাত্রে চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল—সমভাগে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া প্রত্যহ দুই আনা পরিমাণে আহারান্তে গরম জলসহ সেবন করিলে ভুক্তদ্রব্য শীঘ্র জীর্ণ হইয়া থাকে।

শুঁঠ পিপুল, মরিচ, বনযোয়ান, সৈন্ধবলবণ, জীরা কালজীরা ও হিং (হিং ঘৃতে ভাজিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়)—সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া প্রত্যহ আহারের সময় এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় ভাতের প্রথম ২।১গ্রাস গাওয়া ঘি এবং লেবুর রস মিশাইয়া সেবন করিলে বহুদিনের অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্‌পেপসিয়া রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। গব্যঘৃতে ভাজা হিং এক আনা এবং বিট্‌লবণের গুঁড়া—এক আনা—একত্র

মিশাইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলেও সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্পেপসিয়া রোগে বিশেষ উপকার হয়। কচি পেপের আটা—গরম জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলেও অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, অজীর্ণ কখনই উপেক্ষণীয় নহে। ইহা উপেক্ষা করিলে কালে ইহার দ্বারা নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়া সহজেই সম্ভব।

গ্রহণী রোগ।—সাধারণতঃ অজীর্ণ হইতে এবং অতীসার আরোগ্যের পর অগ্নিবল বৃদ্ধি পাইতে না পাইতে কুপথ্য ভোজনের ফলে এই রোগ উপস্থিত হয়। অম্লপিত্ত হইতেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বপ্রস্তাবে অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে যে কাহারও কাহারও কোষ্ঠবদ্ধতা এবং কাহারও কাহারও তরল দাস্তের কথা বলিয়াছি, ইহাতেও সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য এই রোগটীকেও পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ডিস্পেপসিয়ার মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।

সাধারণতঃ এই রোগে প্রত্যহ দুই চারিবার তরল মল ভেদ হইয়া থাকে। ক্ষুধা নষ্ট হয় এবং দুর্ব্বলতা অনুভূতি হইয়া থাকে। কখনো কখনো কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, কিন্তু ৫।৭ দিন, কাহারও কাহারও বা ১০।১৫ দিন অন্তর অতীসারের ন্যায় মলভেদ হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ ইহাকেই সংগ্রহ গ্রহণী বলিয়া গিয়াছেন এবং ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের বর্ণনায় ডিস্পেপসিয়ার অনুরূপ।

চিকিৎসা।—শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ—প্রত্যেক দ্রব্য চারি আনা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথ সেবন গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় উপকারী।

ধনে, আতইচ, বালা, যমানী, মুতা, শুঁঠ, বেড়েলা, শালপাণি চাকুলে ও বেলশুঁঠ—প্রত্যেকটী ৶১০ আনা ওজনে লইয়া, আধসের জলে জ্বাল দিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করা গ্রহণী রোগের প্রথমাবস্থায় উপকারী। পূর্ব্ব লিখিত পাচনটি ও এই পাচনটী সেবন করিলে আমদোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

শুঁঠ, মুতা, আতইচ, ধাইফুল, রসোত, কুড়চির ছাল, বেলশুঁঠ আকনাদি, কটকী—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া লইয়া ঐ চূর্ণ দুই আনা পরিমাণে চাউল ধোয়া জল ও মধুর সহিত দিবসে ২ বার সেবন করিলে সকল প্রকার গ্রহণী রোগে উপকার হইয়া থাকে।

কুড়চী—এই পীড়ায় মহৌষধ। কেবল মাত্র কুড়চীর গুঁড়া দুই আনা মাত্রায় মধুর সহিত অথবা কুড়চির ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া এই কাথে একটু চিনি বা মধু মিশাইয়া সেবন করিলেও গ্রহণী রোগে সুফল পাওয়া যায়।

কাঁচা বেল পোড়াইয়া উহা অর্দ্ধ তোলা, শুঁঠচূর্ণ চারি আনা ও কিঞ্চিৎ গুড়—একত্র সেবন করিলেও গ্রহণী রোগে ফল পাওয়া যায়।

লবঙ্গ, শুঁঠ, গোলমরিচ ও সোহাগার খই সমান ভাগে মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পর পাতিলেবুর রস ও জলসহ সেবন করিলে সকল প্রকার গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে যে অতীসার, অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যের চিকিৎসায় মুষ্টিযোগ ও ঔষধাদির কথা বলা হইয়াছে, গ্রহণীরোগেও অবস্থা বিবেচনায় সেই সকল ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। পথ্যাপথ্যও অবস্থা বিবেচনায় ঐ সকল রোগের অনুরূপ। ঘোল এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

—

পাঁচ পুরুষের পরিচয়

(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ)

পূর্ব্বে এদেশে এখনকার মত রোগ ছিল না, সুতরাং রোগীও ছিল না। তখনকার কালে দেশের স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল। কিন্তু এখন দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি কি শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে জানি না. এখন রোগও যেন আকারে-প্রকারে, শক্তি-সামর্থ্যে দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে, দেশের জল বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে! এখন আর আদা-তুলসী বাসক-বেলপাতার কাল নাই, এখন জ্বর হইলেই "ম্যালেরিয়া", তার সঙ্গে প্লীহা-যকৃতের অতি-বৃদ্ধি, আনুসঙ্গিক অনেক উপসর্গ, শেষকালে "কালাজ্বর"! সর্দ্দি হইলেই "প্লুরিসি", "নিউমোনিয়া" ও তদানুসঙ্গিক বিবিধ উপসর্গ, শেষকালে 'থাইসিস্'! দেশের এই যে অবস্থা-পরিবর্ত্তন, রোগের এই যে অতিবৃদ্ধি, এর ফল জীবনীশক্তির অল্পতা ও স্থায়ী দৌর্ব্বল্য! এই দৌর্ব্বল্য বাঙালীর বংশগত হইয়া পড়িয়াছে, বাঙালীর অস্থি-মজ্জায় ঘুণ ধরাইয়াছে। বাঙালীর বংশে এই দৌর্ব্বল্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয়প্রদর্শনের জন্য একটি পরিবারের পাঁচ পুরুষের বিষয় আলোচনা করিব। এই আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে, দেশ কি ছিল, কি হইয়াছে, এবং স্রোত এইরূপ চলিলে ভবিষ্যতেই বা কি হইবে?

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কোন বিখ্যাত গণ্ডগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বন্দ্যবংশে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম প্রকাশের প্রয়োজন নাই। মনে করুন ইঁহার নামের আদ্যক্ষর ছিল "রা"। এই "রা" বাড়ুয্যে মহাশয়কে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এরূপ লোকের মুখে এবং তাঁহার সহিত একত্র বেড়াইয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—এমন একজন বলিষ্ঠ অতিবৃদ্ধের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে অসুর অবতার বলিয়াই মনে হয়! তাঁহার হাতের লাঠি সহ্য করা তৎকালের পেষাদার লাঠিয়ালগণের বা চোর-ডাকাতের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল! এক দিন তাঁহার কোন বন্ধু বিপন্ন হইয়া দ্বিতলের ছাত হইতে লম্ফ প্রদান করেন. তিনি নিম্নে বাহু বিস্তার করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বক্ষের উপর ধরিয়া লইয়াছিলেন! ইনি মসিনা বা তিসি লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর পীড়নে তাহা হইতে তৈল নিঃসারণ করিতে পারিতেন। কাঁচা আতাফল মুষ্টি মধ্যে রাখিয়া অঙ্গুলী ও হস্ততালুর চাপে তাহাকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারিতেন ঝুনা নারিকেল নিজের মাথায় মারিয়া ভাঙ্গিয়া দিতেন। এক দিন একটি প্রকাণ্ড ষাঁড়ের পৃষ্ঠে একটি কিল মারিয়া তাহাকে ভূপতিত করিয়াছিলেন. তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কত দিনের কত কথাই শুনিয়াছি, আর ভাবিয়াছি—আমরা কি তাঁহাদেরই বংশধর!

তারপর তাঁর পুত্রের কথা। "রা" বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একজন পুত্রকে দেখিয়াছি, তাঁর নামের আদ্যক্ষর "সা". যখন তাঁ'কে দেখি, তখন তাঁ'র পরিণত বয়স। সেই বয়সেও তাঁ'র শক্তি অসাধারণ। অবশ্য সে দেখা মাত্র—দু'চার দিনের দেখা; সুতরাং বলের বিশেষ কোন পরিচয়ই পাই নাই, কিন্তু তাঁ'র আকার দেখিলেই এবং আকারের অনুপাতে আহার্য্যের পরিমাণ দেখিলেই, তিনি যে একজন খুব বলিষ্ঠ লোক, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। আমি যখন তাঁহাকে দেখি, তখন আমার বয়স ১৮ বৎসর; আমিও ব্যায়ামশীল বলিষ্ঠ যুবা; কিন্তু তাঁর প্রৌঢ় বয়সের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাকেও অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিতে হইত। তাঁহাকে দেখিতাম—আর ভাবিতাম, ইঁহার পিতা ও ভ্রাতার অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্যের যে সকল গল্প শুনিতে পাই. তাহা কোনরূপেই অতিরঞ্জিত নহে। এইবার ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কথা বলিব। ইঁহার নাম "ব"।

এই "ব" বাঁড়ুয্যে মহাশয় পূর্ণ যৌবনে, মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁ'র পূর্ব্বেই তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়া নিজগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে একজন বলিষ্ঠ লাঠিয়াল রূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই "লাঠিয়াল" কথাটা হয়ত আজ কাল অনেকেই ভদ্র লোকের পরিচয়ের পক্ষে অগৌরবের বলিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গলা ১২৬৫ কি ১২৬৬ সালে লাঠি ধরাটা ভদ্রলোকের পক্ষেও গৌরবের কথা ছিল। তাই তিনি যত্নে যে লাঠিধরা শিখিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছিল, তাঁহারই ১৯ কি ২০ বৎসর বয়সের সময় প্রবল প্রতাপ জমিদার ও কুঠিয়ালের বিরুদ্ধে তিনি লাঠি ধরিয়াছিলেন. সে ঘটনা যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে মনে হয় বাস্তবিকই তিনি তাঁহার পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন, এবং তৎকালে তাঁহার মত ক্ষিপ্রহস্ত লাঠিয়াল—পেশাদার লাঠিয়ালগণের মধ্যেও ছিলনা। একদিন তিনি একাই কুঠেল জমিদারের ২০।২৫ জন শিক্ষিত লাঠিয়ালকে জখম করিয়া বিতাড়িত পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষিত আমিনকে ধরিয়া তাহার নিকট হইতে জমি পরিমাপের যন্ত্রাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিলের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ধৃত আমিনকে বিষ্ঠার উপর নিক্ষেপ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া নিজে অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ দিন এই যুবকের বলবীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ প্রদেশের সকল লোকেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি ৫ মণ ভার বুকে করিয়া তুলিতেন, লাঙ্গলের ঈশের অগ্রভাগ মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া হাতের কব্জির চাপে লাঙ্গলের অন্য দিক মাটি হইতে তুলিতেন, বাঁকুড়ার জঙ্গলে ভালুক শিকার করিতেন।

ইঁহারা যেমন শারীরিক বলে অসাধারণ ছিলেন, ভোজনেও তেমনই অসাধারণ ছিলেন। মাছ-মাংস ঘি-দুধ ইঁহারা প্রচুর পরিমাণে খাইতেন এবং পাইতেন। তখন এদেশে একটা পাঠার দাম ছিল ।৵০ ছয় আনা হইতে দশ আনা, এক কুড়ি রুই মাছের দাম ছিল তিন টাকা হইতে পাঁচ টাকা, বিশুদ্ধ গবাঘৃত ছিল টাকায় আড়াই সের, আর দুধ ছিল টাকায় ত্রিশ সের হইতে এক মন পর্য্যন্ত! আমাদের মত পল্লীবাসী ভদ্রগৃহস্থের দুধ-ঘি কিনিয়া খাইতে হইত না, তাহা ঘরেই প্রচুর পরিমাণে হইত। তখন খাদ্যের প্রাচুর্য্যও ছিল, খাদ্য বিশুদ্ধও ছিল। এখনকার হিসাবে তখন সকলেই কিছু অধিক পরিমাণে ভোজন করিতে পারিতেন। শুনিয়াছি ইঁহাদের সংসারে উৎকৃষ্ট আধাছানার সন্দেশ সহ ক্ষীর, জলখাবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, নিত্য ভোজনে প্রচুর মৎস্যের ব্যবস্থা ছিল, আর সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন মাংসের ব্যবস্থা হইতই।

তখনকার কালে, শারীরিক শক্তিতেই হউক বা ভোজনের জন্যই হউক, যাহারা একটু অসাধারণত্ব দেখাইতেন, সমাজের সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে এক একটা উপাধি দিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। অতিরিক্ত আহার করিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের গ্রামে এক ব্রাহ্মণকে উপাধি দেওয়া হইয়াছিল "ভিস্তি"। পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের উপাধি ছিল "অগ্নিশর্ম্মা"। অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যাদি জঠরাগ্নিতে ভস্মীভূত করিতে তিনি অগ্নি সদৃশই ছিলেন! এই "অগ্নিশর্ম্মা"র পুত্রকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত পংক্তি ভোজন করিয়াছি এবং খাইতে বসিয়া তাঁহার অদ্ভুত আহার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। ইঁহাকে খাওয়াইবার জন্য, ইঁহার খাওয়া দেখিবার জন্য লোকের যে কত আগ্রহ ছিল, তাহা বলিতে পারি না। ইনি "অগ্নিশর্ম্মা"র পুত্র। অগ্নি নির্গত স্ফুলিঙ্গের সহিত ইঁহার তুলনার জন্য ইঁহার উপাধি দেওয়া হইয়াছিল "ফুলকী শর্ম্মা"। শারীরিক শক্তির জন্য আশানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাধি ছিল, "ঢেঁকি"। কেন না তিনি ঢেঁকি ঘুরাইয়া ডাকাত মারিতেন! এইরূপ আগে যার কথা বলিতেছিলাম, সেই "ব" বাঁড়ুয্যে মহাশয়েরও শক্তিজ্ঞাপক একটা উপাধি ছিল। আশানন্দ ঢেঁকির

জন্মভূমি শান্তিপুরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ গড় নামক পল্লীর গোপগণ শক্তি সামর্থ্যে,—মারামারি-লাঠালাঠিতে তৎসময়ে কিছু অসাধারণ ছিল, তাই ইহারা "গোড়ো গোয়ালা" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তখনকার লোকে 'রা' বাঁড়ুয্যে মহাশয়কেও উপাধি দিয়াছিল "গোড়ো!" তাই তাঁর নামের শেষে "গোড়ো" উপাধি যোগ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইত।

তারপর "ব" বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্রের পরিচয়। ইনি পিতামহ বা পিতার মত বলিষ্ঠ হইতে বা অতি ভোজনের শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে শারীরিক শক্তিতেও ভোজন বিষয়ে তাঁহারও কিছু বৈশিষ্ট ছিল। যৌবনকালে ইনিও মুগুর-ডম্বল লইয়া, দৌড়-ঝাপ করিয়া শক্তিচর্চ্চা করিতেন। এখন ইঁহার ব্যবহৃত মুগুর গৃহকোণে পড়িয়া আছে, ছেলেরা আর তাহা স্পর্শও করে না; স্পর্শ করিবার সামর্থ্যও তা'দের নাই! ভোজন বিষয়েও তথৈবচ! এইত গেল "রা" বাঁড়ুয্যে হইতে ৪ পুরুষের শক্তির পরিচয়! তা'রপর খোকাবাবুদের যেরূপ শারীরিক অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহারাও যে বিশেষ বলিষ্ঠ হইবে বলিয়া বোধ হয় না! এমনি করিয়াই বাঙ্গালীর বংশ ক্রমে শক্তিহীন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে।

এই ক্রমাবনতির কারণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমি সে সকলের আর পুনরুল্লেখ করিব না। তবে বাঙ্গলার সাধারণ জলবায়ু যে ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, তাহার একটা প্রমাণ অন্য দিক দিয়া দেখাইব। নগরে বাস করিয়া যাঁহারা বাঙলার পল্লীপ্রদেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কণ্ঠ ও লেখনি চালনা করিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষে হয়ত পল্লীপ্রদেশের এদৃশ্য পতিত হয় নাই। আমরা পল্লীগ্রামে বাস করিয়া শতার্দ্ধ বর্ষ হইতে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, আজ সেই সংবাদই প্রদান করিব।

এখন যেমন ক্রমে ক্রমে বাঙলার মানুষগুলি হীনবল ও ক্ষীণ আয়ু হইয়া পড়িতেছে, বাঙলার লালিত পশুগুলিও সেইরূপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; পল্লীবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এবিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। পূর্ব্বে গাভীগুলি যেরূপ আকারের হইত, এখন তাহাদের বংশ ধারায় আর সেরূপ আকারের গাভী জন্মায় না। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখনকার গাভীগুলি ক্ষীণ ও হীনবল। পূর্ব্বে যেরূপ খাদ্য খাইয়া গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধ প্রদান করিত, এখন ঠিক সেইরূপ খাদ্য খাইয়াও গাভী আর সে পরিমাণ দুগ্ধ দেয় না।

বাঙলার এই জল বায়ুর রোগপ্রবণতাকে দৈব-দুর্ব্বিপাক ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? এই প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবর্ত্তনকে অনুকূলে আনিবার জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহা করিবার সময় আসিয়াছে। আর ভাবিবার সময় নাই, যুক্তির অবসর নাই, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেই হইবে, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য।

নিদ্রা

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ কবিরত্ন)

শরীর ও মন লইয়া মানব একটা গোটা মানুষ। এই শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য ভগবান্ যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন,—সে সকল বৃত্তি যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে মানুষকে প্রতিনিয়ত আধিব্যাধি দ্বারা এত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও হয় না। সেই বিধিদত্ত বৃত্তিগুলির অপব্যবহার মানুষে যেমন করে,—অন্য জীবে তাদৃশ করে না। সেজন্য মানুষ অন্যান্য জীব অপেক্ষা অধিকতর শোক, দুঃখ ও মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে।

শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য যে সকল বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে আহার ও নিদ্রা এই দুইটী বৃত্তি শরীর রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আহার ব্যতিরেকে যেমন শরীর রক্ষা করা যায় না, নিদ্রা ব্যতিরেকেও তেমনই শরীর রক্ষিত হয় না। শরীরের পুষ্টি, স্থিতি, স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ হীনতা, শক্তিসামর্থ্য, হর্ষবিষাদ, জ্ঞান অজ্ঞান, জীবন মরণ—সবই মানুষের আহারের ন্যায় নিদ্রার দ্বারাও লাভ হইয়া থাকে। নিদ্রার অভাবে মানুষের কি যে অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা যিনি অনিদ্রা রোগে ভুগিয়াছেন, তিনিই নিদ্রা যে কত উপকারী তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি অনেক সুপণ্ডিত মনীষী ব্যক্তিকে নিদ্রার অভাবে রাত্রিতে বাড়ীর মধ্যে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে ও বালকের ন্যায় রোদন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের সকল পাণ্ডিত্য, ধৈর্য্য, স্মৃতি, আনন্দ, পরিহাস—নিদ্রার অভাবে হীনপ্রভ বা বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্মরণ করিয়া মানুষ মাত্রেরই নিদ্রা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া অকালে বা অতি মাত্রায় নিদ্রার উপাসনা করা কখনই উচিত নহে। অনিদ্রা যেমন মানুষের অশেষ রোগের নিদান, তদ্রূপ অকালনিদ্রা বা অতিনিদ্রাও মানুষের বহুবিধ রোগের কারণ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা সুখ ও দীর্ঘায়ুর কামনা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে পরিমিত ভাবে কালোচিত নিদ্রাদেবীর উপাসনা করা উচিত।

সুস্থ শরীরে কোন কারণে একটা রাত্রি যদি অনিদ্রায় কটাইতে হয়; তাহা হইলে তার পরদিন যে শরীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিয়াছেন। এই অনিদ্রা—দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হইলে মানুষের অত্যন্ত বায়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে হয় সে পাগল হইয়া যায় অথবা ক্রমশঃ তাহার শরীর শুষ্ক হওয়ায় সে ক্ষয়রোগগ্রস্ত কিংবা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। নিদ্রাই কর্ম্মক্লান্ত জীবকে—সুখময় ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া বিশ্রান্ত ও অপগতক্লম করিয়া ধাত্রীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্র—নিদ্রাকে ভূতধাত্রী বলিয়াছেন। যোগিগণ কিন্তু নিদ্রাকে তমোগুণ হইতে জাত বলিয়া পাপ স্বরূপা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং তাহার সম্পর্ক হইতে পৃথক থাকিবার জন্য বিধি ও অবিধিমত চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হয় শ্লেষ্মপ্রভবা নিদ্রার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বায়ুপ্রধানা গঞ্জিকার সেবা করিতে গিয়া বহু তরুণ সন্ন্যাসী গাঁজাখোর হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া থাকেন। নিদ্রা যে কফ স্বরূপিনী তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল লোক বা জীব কফ প্রকৃতির অথবা কফজ রোগে আক্রান্ত, তাহারাই সাধারণতঃ অতীব নিদ্রাশীল হইয়া থাকে। যে পদার্থ শরীরগত হইয়া শ্লেষ্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে, সেই

পদার্থেরই সূক্ষ্মভাব চিত্তগত হইলে তমো নামে অভিহিত হয়। চিত্তের চিত্তত্ব রক্ষা করিতে হইলে যেমন সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণের সহিত সম্বন্ধ রাখা উচিত,—তেমনই এই বাতপিত্তকফময়ী দেহপ্রকৃতিকে রক্ষা করিতে হইলে বায়ু, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক আহার বিহারাদিরও একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দৈহিক কফ প্রকৃতির পরিরক্ষার জন্য নিদ্রার আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া একান্তভাবে নিদ্রার সেবা করা কখনই উচিত নহে। তাহাতে অপরা বাত ও পিত্তপ্রকৃতির মর্য্যাদা হানি ও সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া থাকে। এই মর্য্যাদা হীনতা বা সামঞ্জস্য বিনাশই যাবতীয় রোগদুঃখের কারণ। সংসারে যাহাকে একাধিক পত্নী লইয়া ঘর করিতে হয়, তিনিই জানেন, পত্নী বিশেষের প্রতি-পক্ষপাত করিলে সংসারে কি প্রকার অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অতএব দৈহিক প্রকৃতি স্বস্থ, সবল ও সর্ব্বকর্ম্মান্বিত করিতে হইলে সকল বৃত্তি-গুলির পরিমিত ভাবে যথাকালে আবশ্যকানুরূপ সেবা করা উচিত। নতুবা পক্ষপাতী বহু পত্নীকের সংসারের ন্যায় দেহ, মন, দুঃখ ও অশান্তির আগার হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ নিদ্রা দুই প্রকারের হইয়া থাকে,—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক। স্বভাবজাত নিদ্রাও আবার দুই প্রকার। তন্মধ্যে—একপ্রকার মনের ক্লান্তিবশতঃ হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রম বা পথপর্য্যটনাদি দ্বারা শরীর ক্লান্ত হইলে উন্মুক্ত বাতাসে সুশীতল বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিলে যেমন অচিরে নিদ্রাসমাগম হইয়া থাকে, তদ্রূপ মানবচিত্ত ইন্দ্রিয়সহকারে সংসারের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সে বিষয় সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মস্থ হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কোন কোন শাস্ত্রকার স্বাভাবিক নিদ্রার মধ্যে আরও একটী প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পূর্ব্বোক্ত শারীর ও মানস ক্লান্তি ব্যতিরেকেও জীবগণের রাত্রির প্রভাব বশতঃ যে নিদ্রাসমাগম হইয়া থাকে উহাও স্বাভাবিক নিদ্রা,—এজন্য নিদ্রার অপর নাম রাত্রিপ্রভবা। কিন্তু এই রাত্রির প্রভাব প্রকটিত নিদ্রা জীব মাত্রের প্রতিই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এমন বহু জীব আছে—যাহারা রাত্রি হইলেই জাগরিত হইয়া থাকে, তাহাদের রাত্রিই দিন। তাহাদের নিকট রাত্রির প্রভাব নিদ্রা নহে, জাগরণ। মানুষের অস্বাভাবিক যে নিদ্রা, তাহা শরীরের বিকার জন্য হইয়া থাকে। শরীর শ্লেষ্মার বা শ্লেষ্ম প্রকৃতি মেদাদির প্রাদুর্ভাব হইলে কিংবা সান্নিপাতিক বিকারাদিতে শরীর শ্লেষ্মা ও চিত্ত তমোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে থাকিলে অথবা অহিফেনাদির বিষ-প্রভাবে শরীর ও মন আচ্ছন্ন বা অবসন্ন হইতে থাকিলে যে নিদ্রাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, উহাকে অস্বাভাবিক নিদ্রা বলা হইয়া থাকে। মানুষকে সর্ব্বদা স্বভাবে থাকিতে হইলে স্বভাবের অনুগত হওয়া উচিত, এই জন্য স্বাভাবিক নিদ্রা মানুষের অমৃতময়ী ক্লান্তিশ্রান্তি হারিণী এবং অস্বাভাবিক নিদ্রা মৃত্যুস্বরূপিনী হইয়া থাকে।

সর্ব্বজীবকল্যাণকর শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি করুণা-বশতঃ সমগ্র অহোরাত্রকে দিবা ও রাত্রি রূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে দিবার অধিপতি সূর্য্য। সূর্য্যের অধিকার কালে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্ম প্রবৃত্তির এবং কর্ম্মশক্তির বিকাশ ও তেজঃ-সামর্থ্য-উৎসাহ প্রভৃতির সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এতাদৃশ দিবাভাগ মানুষের কর্ম্মের দ্বারাই অতিবাহিত করা উচিত। সাধারণতঃ মানুষ মাত্রেই তাহা করিয়াও থাকে। আর রাত্রির অধিপতি চন্দ্রমা। তাঁহার অপর নাম সোম। রাত্রিকালে চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ মালা দিবসের কর্ম্মক্লান্ত জীবশরীরে অমৃতবর্ষণ করে, তখন সমগ্র জগৎ ভূতধাত্রী নিদ্রার সুখময় ক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া শরীর ও মনের সকল ক্লান্তি—সকল অবসাদ দূর করিয়া রাত্রিশেষে—বিশ্রান্ত ও নবীকৃত উৎসাহ সম্পন্ন শরীর-মন লইয়া ভগবানের জয়গান করিতে করিতে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকে—

ইহাই জীবের স্বাভাবিকী রীতি। এই অনুসারে চলিলে মানুষ অভিমত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। এই রীতি সকলেরই অনুবর্ত্তন করা উচিত। এই রীতির অবমাননা করিয়া যাহারা দিবাভাগে অতিরিক্ত মাত্রায় নিদ্রার ভজনা করে তাহাদের শরীর ভার, মাথাভার, গায়ে বেদনা, আলস্য, পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা সন্ধি-স্থানে ও বুদ্ধির জড়তা প্রভৃতি তো হইয়া থাকেই, অধিকন্তু হলীমক, পীনস, প্রতিশ্যায়, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠ, পিড়কা কণ্ডূ, তন্দ্রা, শ্বাস শোথ, অরুচি কাস, গলরোগ স্মৃতিনাশ, স্রোতঃ সকলের রোধ, ইন্দ্রিয় সকলের সামর্থ্যহীনতা প্রভৃতি বহুপ্রকার শারীর ও মানস রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্য দিবানিদ্রা সর্ব্বপ্রকারে নিন্দিত ও বর্জ্জনীয়। তবে যাহাদিগকে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা নিন্দনীয় নহে এবং যাহারা গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ, ভারবহন পথপর্য্যটন প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারা ক্লান্ত, তাহাদের দিবানিদ্রা হিতকর, আর যাহারা ক্ষয় কাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, অজীর্ণ, অতিসার, শূল ও উন্মাদ রোগগ্রস্ত এবং যাহারা পতিত, আহত, শোকার্ত্ত, ভীত ও দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা বর্জ্জনীয় নহে অধিকন্তু উপকারক। অচিরজাত শিশুগণের নিদ্রা মূলতঃ স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাদের দিবানিদ্রা বা অতিনিদ্রা দোষাবহ নহে। বৃদ্ধের পক্ষেও দিবানিদ্রা অহিতকর নহে। তবে যে সকল বৃদ্ধ কোন প্রকার মেদোরোগে পীড়িত ও জড়ীভূত, তাহাদের দিবানিদ্রা ভাল নহে। যাহাদের ধাতু সকল ক্ষীণ, শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল এবং যাহারা অনিদ্রায় কাতর—তাহাদের দিবানিদ্রা দ্বারা ধাতু সকল পুষ্ট, শরীরের বৃদ্ধি ও বলাধান প্রভৃতি হইয়া থাকে। দিবা নিদ্রা অনেকের পক্ষে নিন্দনীয় হইলেও গ্রীষ্মকালে সকলেরই পক্ষে প্রশস্ত।

যদি কোন কারণে অনিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাহাতে বায়ুর শান্তি হয় এরূপ অন্নপানাদির ব্যবস্থা করা উচিত। চিত্তের সন্তোষকর গল্প, সংগীত ও মনোমুগ্ধকর গন্ধদ্রব্য, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, গা হাত পা টেপান, সুকোমল শয্যায় শয়ন ও দধি দুগ্ধাদি পান অনিদ্রা দূর করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নানা বিষয়ে আসক্ত চিত্তকে যে কোন একটা বিষয়ে স্থির করিতে পারিলে অচিরে নিদ্রা সমাগম হইয়া থাকে। এই জন্য চঞ্চল চক্ষু বালককে একবার কোলে বা শয্যায় শয়ন করাইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া বা কাণের উপর লঘুহস্তে চাপ দিতে দিতে চাপড়াইতে, হয় ঘুম পাড়ানীর গান বা যে কোন একটা কথা বা কথার অংশ সুর করিয়া গান করার মত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে থাকিলেই বালকের চিত্ত সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা কথার মধ্যে যখন আসক্ত হয় তখনই বালক নিদ্রিত হইয়া পড়ে। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বালক অধ্যয়নার্থ চিত্তের একাগ্রতা করিলেই তাহার চক্ষু নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়ে। কর্ম্মাসক্ত বৃদ্ধের চিত্ত যখন রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবতের কথা শুনিতে শুনিতে স্থির হইয়া যায় তখন সে নিদ্রাবেশে ঢুলিতে থাকে। আরও দেখা যায়, পল্লীবৃদ্ধগণ যখন সমস্তদিন সংসারে নানান্ কাজে ছড়াইয়া ফেলা মনটাকে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার সময় হরিনামের মালায় গাঁথিয়া দেন, তখন তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত মনটা স্থির হইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরির পরিবর্ত্তে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার শরীর ও মনকে অধিকার করিয়া বসে। অতএব দেখা যায়, যে কোন প্রকারে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলে নিদ্রাগম হইয়া থাকে।

জলের রোগারোগ্যশক্তি

(কবিরাজ শ্রীচিত্তরঞ্জন আচার্য্য)

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ জলের ব্যবহার দ্বারা নানাপ্রকার উৎকট রোগের চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লুইকুনে বলিয়াছেন, সকল প্রকার রোগের পক্ষেই কোনো না কোনো জল ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। জল যে ভেষজ, তাহা বৈদিক যুগেই ভারতে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন, "আপো যাচামি ভেষজম্"। তৈঃ ব্রাঃ ২৫,৮।৬। আমরা প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনায় উক্ত মহামন্ত্র পাঠ করিয়া থাকি। জগতের প্রাচীনতম চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদেও জলের রোগ-হরণের শক্তির কথা অবগত হওয়া যায়।

জলদ্বারা কি ভাবে কি কি রোগ নিরাকৃত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

চিকিৎসার্থ জল, উষ্ণ ও শীতল —উভয়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলীয় বাষ্প দ্বারাও নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করা হয়। ইহাকে Vapour Treatment বা বাষ্প-চিকিৎসা বলে। টাইফয়েড্ (Typhoid). হাম প্রভৃতি জ্বরে যখন শরীরের তাপ অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তখন উত্তাপাধিক্যের হ্রাস করিতে শৈত্য প্রয়োগ (application of cold) সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এই শৈত্য প্রয়োগের জন্য বরফ অথবা জল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক-প্রদাহে মস্তকে শীতল জল দ্বারা ধারা প্রদান করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নাসিকা হইতে রক্ত পাতে শীতল জলের নস্য-গ্রহণে সুফল দর্শে। জলের নস্য-গ্রহণের উপকারিতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন ,—

"বঙ্গবলী পলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্
রজনীক্ষয়েহম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টি জননঞ্চ॥"

প্রত্যহ প্রত্যূষে জলের নস্য লইলে, পীনস স্বরবিকৃতি ও কাসাদিরোগ প্রশমিত হয়। ইহা রসায়ন ও দৃষ্টি-বৰ্দ্ধক।

বাত বা অজীর্ণগ্রস্ত রোগী বা যাহাদের অন্ত্র ক্রিয়াশীল নহে, তাঁহাদের পক্ষে বস্তিকর্ম্ম বা মলদ্বারে শীতল জলের পিচ্কারী প্রয়োগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

পেট ব্যথা হইলে পেটের উপর একখানা মোটা কাপড় রাখিয়া একটী বোতলে ফুটন্ত গরম জল ভরিয়া সেক দিলে শীঘ্রই বেদনা কমিয়া যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে শীতল জল ও প্রত্যূষে গরম জল পান করিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বসন্ত প্রভৃতি চর্ম্মরোগে শীতল জলে ভিজান কাপড় শরীরে জড়াইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। তলপেটে শীতল জলের পটি বাঁধিয়া অথবা বরফপূর্ণ থলি (ice-bag) রাখিয়া শয়ন করিলে বীর্য্যক্ষরণ নিবারিত হয়।

গরম জল পান করিলে বমি হইয়া থাকে। শিশুদিগের আক্ষেপ (convulsion) রোগে মস্তকে বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করিলে আশ্চর্য্য উপকার পাওয়া যায়।

নাসারোগ, সর্দ্দি ও মাথাধরা রোগে 'নাসাপান' উপকারী। নাসিকা দিয়া জল টানিয়া লইয়া নাসারন্ধ্র পরিষ্কৃত রাখা উচিত ; ইহাতে নাসিকায় দুর্গন্ধ হয় না ও নাসারন্ধ্রে কোনো ময়লা জমিতে পারে না। আয়ুর্ব্বেদ মতে, সূর্য্যের অভ্যুদয়ে দুইসের পর্য্যন্ত শীতল জল পান করিলে, বাতিক ও পৈত্তিক রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

শৈত্য মাত্রেই স্থানীয় পরমাণু সকলের নৈকট্য বৃদ্ধি করে ও রক্তকে সংযত করিয়া থাকে। সুতরাং রক্ত-রোধার্থ শীতল জল ও বরফ উপকারী।

সংজ্ঞাহীন রোগীর মুখে শীতল জলের ছাট দিলে

রোগী শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করে। কোনো স্থানে আঘাত লাগিলে জলপটি উত্তম ব্যবস্থা।

হাত পা মচ্‌কাইলে শীতল জলের ধারায় বা সজল স্পঞ্জ সারেও পটিতে ব্যথা কমে। কঠিন আঘাত জনিত স্নায়বিক অবসাদে রোগীকে মাথা নীচু করতঃ শায়িত করিয়া গরম জলের দ্বারা উপযুক্তরূপে তাপ যোগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নবজাত শিশুর শ্বাসরোধে একটি ভাণ্ডে গরমজল ও একটিতে শীতল জল রাখিয়া অল্পক্ষণের জন্য উষ্ণজলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া অব্যবহিত পরে শীতল জলে পূর্ব্বোক্তরূপে নিমজ্জিত করিলে, শিশু শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকে।

সন্ধিগত বাতরোগে প্রথমতঃ উত্তপ্ত বাষ্পে ও পরে শীতল জলে সেই অংশ নিমজ্জিত রাখিলে চমৎকার ফল দর্শিয়া থাকে।

সন্ধিরোগে গরম জলে স্নান উপকারী। নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করিলে শরীর সবল ও লাবণ্যযুক্ত হয়। এ বিষয়ে মহর্ষি চরক বলেন :—

"পবিত্রং বৃষ্যমায়ুষ্যং শ্রমস্বেদমলাপহম্।
শরীর বল সন্ধানং স্নানমোজস্করংপরম্॥

স্নান—পবিত্র, বৃষ্য, আয়ুষ্কর, স্বেদ ও শরীরের ময়লা নাশক ও বলকারক ও পরম ওজস্কর।

প্রথমতঃ তাপ্ দিয়া শীতল জলে স্নান করাইয়া মুক্ত বায়ুতে শয়ন করাইলে শীঘ্র নিদ্রা আসে।

পিষ্টক ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে শীতল জলপান করিলে অজীর্ণতা দূরীভূত হয়।

জলের সাহায্যে আরও অনেক রোগের চিকিৎসা হইতে পারে। ডাঃ কুনে তাঁহার পুস্তকে "Wet sheet pack" প্রভৃতি নানাবিধ স্নান বা ধৌতকরণ (Bath) দ্বারা বহুরোগ নিরাময়ের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে এ স্থলে সে সব বিষয়ের আর উল্লেখ করা হইলনা।

সুশ্রুতঃ

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিভূষণ)

চির বিশ্রুত সুশ্রুত! শস্ত্রবিধি
বিহিতো ভবতাতি পুরাখলুয়ঃ।
অনুসৃত্যতমদ্য বিদেশি জনাঃ
কলয়া কলয়ন্তি কতি স্বকৃতীঃ।
নিজ তীক্ষ্ণমতেঃ পরিচালনয়া
পরিকল্প্যহিতে নব যন্ত্রচয়ং।
বিদধত্যতি বিস্মিত মর্ত্ত্যজনান্
চিরবিস্মৃত সুশ্রুত শাস্ত্র গুণান্।
নৃশরীরগশস্ত্র সুসাধ্য গদান্
প্রতিকর্ত্তুমনা অমনাঙ্ মহিমা।
সহি সুশ্রুত আর্য্যভিষগ্ ভিষজাং
সকলাঙ্গময়ং বিদধৌ সুবিধিং।

নমুবীজতয়া স মহান্ হি বিধিঃ
প্রতিভাতি সমং ভুবনে অনুদিনং।
প্রতিদেশমবিপ্লুত নিত্য নবা
ধ্রুবমস্যফলং বহুশস্ত্রকৃতিঃ॥

পরিকৃত্তশিরোঽবিকলং লগয়ন্
জগদদ্ভুত ভাবময়ং কলয়ন্
ভুবি জীবতি সুশ্রুত শাস্ত্রবিধি
শ্চিরমায়ু মহত্ত্ব গুণৈর্বিজয়ী।

স্বগৃহস্থিত রত্নচয়েনবয়ং
হতদৃগ্দহো বহুদৃষ্টি পরাঃ।
পরবস্তুনি যাদৃশ তাদৃশকে
বহুমানতয়ানুরতাঃ সততঃ

বিশ্ব সুবিদিত কীর্ত্তি তুমি হে সুশ্রুত !
কত যুগ হ'ল গত শস্ত্র বিধি তব মত
ঘোষিছে গৌরব চির যশঃ সুরভিত
অদ্যাপি শিক্ষিত রাজ্যে নিত্য অনুসৃত।
লেশ মাত্র অনুকৃতি করি তব কৃতি
কত বুধ আজ কৃতী প্রসারি আপন কৃতি
স্বদেশে বিদেশে ধন্য, হে পুণ্য মূরতি.
লহ মোর ভক্তি-অর্ঘ্য সহিত প্রণতি।
আজ নিজ প্রতিভার পরিচালনায়
অভিনব যন্ত্রগণ করি কত বিরচণ
বিস্মিত করিছে বিশ্ব পাশ্চাত্য বিদ্যায়
শিক্ষিত ভিষক্ ভুলি তব গরিমায়।
শস্ত্রসাধ্য ব্যাধিচয় শান্তির কারণ
বিরচিত তব বিধি সুসম্পূর্ণ রত্ন নিধি
হায়রে মোদের মোহে না পেয়ে যতন
ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি প্রায় কালিমা মগন।
তথাপি সে বীজরূপে বিশ্বসমর্চ্চিত
অভ্রান্ত স্বশক্তিবলে আর্যবিধি ধরাতলে
অপর শারীরশাস্ত্র, শস্ত্র পরিচিত
তার (ই) ভিন্ন ফলরূপে নিশ্চয় বিদিত।
ছিন্ন শির করি লগ্ন যে বিধি, ভুবন
করিল বিস্ময় স্তব্ধ পুনঃ কি হইবে লব্ধ
হে পূত সৌশ্রুত শাস্ত্র সে ভাবে কখন
মোরা যে সেবক তাঁর মোহে বিচেতন।
নিজ গৃহমাঝে গুপ্ত মহার্ঘ রতনে
হায় মোরা অন্ধপ্রায় হেরি না বারেক তায়
সাগ্রহে সতত কিন্তু কত অকিঞ্চনে
করিছি সম্মান—ধিক্ মোদের জীবনে।

ঋষিযুগে রোগ পরীক্ষা

(কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাশ কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন)

চিকিৎসা করিতে হইলে ব্যাধিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। কেন না শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্" অর্থাৎ প্রথমে বিশেষরূপে রোগ পরীক্ষা করিয়া তারপর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা

"যস্তুরোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মণ্যারভতে ভিষক্
অপ্যৌষধ বিধানজ্ঞ স্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া"

ইত্যাদি অনেক যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা চিকিৎসা ফলবতী হয় না বলিয়াছেন,সুতরাং চিকিৎসা করিতে হইলে ব্যাধি জ্ঞানের অর্থাৎ রোগনির্ণয়ের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদিত।

এ স্থলে প্রথমেই আমি নিবেদন করিয়া রাখিতেছি যে, আমার অদ্যকার ব্যাধিবিজ্ঞান বিষয়ের সমস্ত কথাই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি কথিত সংহিতাগ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। এইগুলি তাঁহাদেরই বাক্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া আমি অনেক স্থলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ও পাঠকগণের বিরক্তির ভয়ে ঋষি বাক্যাবলীর আংশিক মাত্র উল্লেখ করিয়া ইতি-ইত্যাদি ও প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে সমাপ্ত করিয়াছি, কিন্তু প্রয়োজন হইলে আমি প্রত্যেক কথাই একাধিক ঋষিবাক্যে সমর্থন করিতে পারিব। সুতরাং আমার ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ যেন কেহ কষ্টলব্ধ প্রমাণের প্রকৃষ্ট বিরতি বলিয়া মনে না করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাধিজ্ঞানবিহীন চিকিৎসার অসাফল্য বর্ণনার প্রসঙ্গেই ঋষিগণ—

"ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যোজানাতি নচায়মম্,
বৈদ্যকর্ম্ম সচেৎ কুর্য্যাৎ বধমর্হতি রাজতঃ"

এরূপ কথার কত উল্লেখ যে করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ হইবার নহে। এই ব্যাধিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈদ্যকশাস্ত্রে প্রথমতঃ নিদান, পূর্ব্বরূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটীকেই 'বিজ্ঞানং রোগানং পঞ্চধাস্মৃতম্" বলিয়া ব্যাধিজ্ঞানের কারণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক 'বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি করণে ল্যুট' প্রত্যয়ান্ত বিজ্ঞান শব্দে উক্ত পাঁচটীকেও রোগজ্ঞানের হেতু বলা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে উহারা সকলেই প্রায় পরতন্ত্র, কারণ নিদানাদির জ্ঞান কখনই স্বতঃপ্রকাশক নহে, উহারা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ প্রভৃতি কারণান্তরকে অপেক্ষা করে, সুতরাং উক্ত পাঁচটীকে আমরা এক্ষেত্রে ব্যাধিবিজ্ঞানের মুখ্য কারণ না বলিয়া 'জনিষ্যমাণ ব্যাধির'এক একটী অবস্থা বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লইব। এ বিষয়ে অগ্নিবেশতন্ত্রও বলিতেছেন—

'জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধি লিঙ্গানি সংগ্রহে,
ব্যাধয়স্তে তদাত্বেতু লিঙ্গানীষ্টানি নাময়াঃ॥

(নাময়া ইতি যস্য ব্যাধের্যানি লিঙ্গানি সতদাখ্যো ব্যাধিস্তদিতরেনেত্যর্থঃ)

জ্ঞান কখনই ইন্দ্রিয় সম্পর্ক ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং রোগের জ্ঞানও যে ইন্দ্রিয় সম্পর্কজনিত, সে কথা অবিসংবাদিত। শব্দ স্পর্শাদি এক একটী বিষয়ের জ্ঞান শ্রোত্রত্বগাদি—এক একটী ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত—ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখন আমাদের প্রস্তাবিত রোগের জ্ঞান কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়সম্পর্কসাপেক্ষ—তাহাই দেখা যাউক।

বাগভট বলেন "দর্শন স্পর্শন প্রশ্নৈঃ পরীক্ষেতাথ রোগিণম্"। দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রোগীকে পরীক্ষা করিবে। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষজ্ঞ সংহিতাকার মহর্ষি সুশ্রুত এই তিনটীর দ্বারা সকল ব্যাধির সম্যক্ জ্ঞান হয় না বলিয়া, নিজেই তাহার উপর দোষারোপ করিয়া বলিতেছেন,—"তন্ন সম্যক্, ষড় বিধোহিরোগাণাং বিজ্ঞানোপায়ঃ তদ্যথা পঞ্চভিঃ শ্রোত্রাদিভিঃ প্রশ্নেন চ ইতি"। তাঁহার মতে—কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রশ্ন অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অন্যতম বাগিন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে সকল রোগের সম্যক জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। তিনি রোগ বিশেষে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা দেখাইতে গিয়া যাহা বলিতেছেন,তাহার মর্ম্ম এই,—"তন্মধ্যে ব্রণ প্রভৃতি রোগে খটখট, ঘুরঘুর ইত্যাদি শব্দের আবির্ভাব শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। জ্বর-শোথাদি রোগের শীত, উষ্ণ, মসৃণ, কর্কশ, মৃদু, কঠিন প্রভৃতির জ্ঞান স্পর্শেন্দ্রিয় সাপেক্ষ, নাড়ী পরীক্ষাও এই স্পর্শেন্দ্রিয়েরই অন্তর্ভুক্ত। দেহের স্থূলতা, কৃশতা, আয়ুর লক্ষণ ও বিবর্ণতা প্রভৃতি দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। প্রমেহ প্রভৃতি রোগে মূত্রের মধুরতা ইত্যাদি প্রাণী বিশেষের রসনার দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্রণ রোগবিশেষের বিবাগন্ধ ও দুর্গন্ধাদি লক্ষণ বিশেষ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিতে হয়। এতদ্ব্যতীত রোগের সময়, কোন্ দ্রব্য সেবনে রোগী সুখ বা দুঃখ বোধ করে এবং রোগীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা মল, মূত্র প্রভৃতির অবস্থা প্রশ্নের দ্বারা অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়।

মহামুনি চরকও যে বিমান স্থানে "তস্মাদাতুরং পরীক্ষেত প্রকৃতিতশ্চ, বিকৃতিতশ্চ, সারতশ্চ, সংহননতশ্চ, প্রমাণতশ্চ, সত্বতশ্চাহার শক্তিতশ্চ ব্যায়ামশক্তিতশ্চ বয়স্তশ্চেতি" এই দশ প্রকারে রোগীর পরীক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই গুলিও সুশ্রুতোক্ত ইন্দ্রিসকলের সম্পর্ক সাপেক্ষ, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীকৃত শব্দাদির সাহায্যে রোগ নির্ণয় করার নিয়ম ঋষিযুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, এখনকার দিনে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে শব্দের সাহায্যে রোগনির্ণয় করিতে দেখিলে কেহ কেহ উপহাসের

নাসিকা কুঞ্চন করেন। যাঁহারা ভাবেন শব্দশ্রুতির দ্বারা রোগ পরীক্ষার প্রথা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্‌গণই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা একবার অনুগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিবেন, মহর্ষিদিগের অব্যাহত জ্ঞানের আলোকরশ্মি কতদূর পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রভাতপ্রভায় কত কত দেশের বিজ্ঞান হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের বহুরোগে আমরা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই. আয়ুর্ব্বেদোক্ত কাস রোগে—

"পারাবতইবাকূজন্ কাস বেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ"

তমকশ্বাস রোগে—"কাসং ঘুর্ঘুরকং মোহমরুচিং পীনসং তৃষম্" বাগ্‌ভটোক্ত যক্ষ্মারোগে—

"লিম্পন্নিব কফাৎ কণ্ঠং মন্দঃ ঘুরঘুরায়তে"

এরূপ শব্দলক্ষণকসন্নিপাত প্রভৃতি অন্যান্য রোগেরও উল্লেখ আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাইতেছি, অবশ্য এই সকল রোগের শব্দ ব্যতীত অপর লক্ষণ থাকায় শব্দশ্রুতির প্রয়োজন হয় না, বিশেষতঃ শব্দগুলিও কতকটা স্থূল বলিয়া অনায়াসশ্রোতব্য বটে, কিন্তু স্থল বিশেষে তাঁহারা এমন সূক্ষ্মানুভূত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা ব্যতীত সেই রোগনির্ণয়ের অপর কোন বিশিষ্ট উপায় নাই এবং যাহা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনাও নাই। শব্দ শ্রবণের দ্বারা ব্রণের অরিষ্ট লক্ষণ বর্ণনা করিতে গিয়া মহর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন----

'ক্ষেড়ন্তি ঘুর্ঘুরায়ন্তে জ্বলন্তীব চ যে ব্রণাঃ।

ত্বঙ্‌মাংসস্থাশ্চ পবনং সশব্দং বিসৃজন্তি যে॥"

অর্থাৎ ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত যেসকল ব্রণের অভ্যন্তরে খট্ খট্ ও ঘুর্ঘুর শব্দ যুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় ও যাহা বহির্দ্দেশে দেখিতে জ্বলন্ত অগ্নি সদৃশ—তাহা অসাধ্য। টীকাকার ঘুর্ঘুরায়ন্তের অর্থ করিতে গিয়া সেই স্থলে বলিতেছেন, 'শ্বমার্জ্জারাদীনাং কোপাদন্তর্গত শব্দো ঘুর্ঘুরা শব্দ উচ্যতে"। পাঠকগণ! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ক্ষতের অভ্যন্তর প্রদেশে কুকুর বিড়ালের কণ্ঠগত অস্পষ্ট ঘুর্ঘুর শব্দ ও বায়ু প্রবাহ কি কথনও যন্ত্র ব্যতীত কেবল কর্ণের দ্বারা উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা আছে? উত্তরে যদি বলি যে, বয়স্কের পক্ষে প্রশ্নের দ্বারা এই শব্দ কিছু কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ভাষাজ্ঞানবিহীন রোদন সম্বল বালকের পক্ষে এস্থলে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে? বিশেষতঃ এই শব্দ শ্রুতি চিকিৎসকনিষ্ঠই, ইহা কখনও আতুরগম্য নয় ইহা টীকাকারের অভিপ্রায়ে বেশ বুঝা যায়, সুতরাং তথায় শব্দেরই প্রয়োজন এবং উহা যে যন্ত্রগ্রাহ্য সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, অবশ্য যোগচক্ষু ও ভূতভাবে অন্তর্দর্শী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি যদি স্বয়ং চিকিৎসক হন, তবে তিনি ঐ শব্দের উপলব্ধি অন্য প্রকারেও পারেন। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্ত মানবের কর্ণগোচর যে উহা যন্ত্র ব্যতীত কখনই হইবে না—ইহা স্থির নিশ্চিত।

একটু চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে শব্দ বোধক যন্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহারা আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্রণাদির দূষিত স্রাব ও রক্ত মোক্ষণের জন্য তাঁহারা শৃঙ্গযন্ত্র, অলাবুযন্ত্র ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন, উক্ত শৃঙ্গযন্ত্র আমাদের গো-মহিষাদির শৃঙ্গ নির্ম্মিত বর্ত্তমান শিঙা এবং অলাবু যন্ত্র কটুতুম্বী অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতি বনজাত তিতলাউয়ের ঊর্দ্ধাংশ দ্বারা নির্ম্মিত উক্ত উভয় যন্ত্রই প্রয়োজন অনুসারে শব্দশ্রুতির জন্য এখনও ব্যবহার্য্য। বর্ত্তমান চিকিৎসকদের মধ্যে যে অনেকে একপ্রকার কাষ্ঠ কিম্বা ধাতু নির্ম্মিত শব্দযন্ত্র ব্যবহার করেন,—কিছুকাল পূর্ব্বেও যাহার বেশ প্রচলন ছিল, তাহা শিঙা ও তিত লাউয়ের প্রায় সদৃশ একটু মার্জ্জিত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং ঋষিরচিত গ্রন্থের লোপ হইয়া না গেলে তো আর বলিবার উপায় নাই যে, তাঁহাদের সময়ে উহার প্রচলন ছিল না— উহা কেবল ডাক্তার মহাশয়েরাই এদেশে প্রথম আমদানি করিয়াছেন। তবে নির্ব্বিবাদে আমরা এই কথা স্বীকার করিতে পারি, যেমন এই যে বিদ্যুতের পাখা, বিদ্যুৎপরিচালিত শকট, শিশুদিগের মনোরঞ্জক নানাবিধ

ক্টিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য মুখও হইতেই এদেশে প্রথম জন্মিয়াছে, তেমনই দুই মুখ বিশিষ্ট ষ্টেথেস্কোপ নামক একটি নলিকাযন্ত্রটীও তাঁহারাই প্রথম দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে ব্যজন ও সঞ্চালনপ্রথা এবং শিশুর ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্য গুলি একেবারে ছিলনা বলিয়াই পাঠক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন? বাস্তবিক এইগুলি মানবের মার্জ্জিত বুদ্ধির এক একটী বিশিষ্ট সংস্করণ ব্যতীত অভিনব কিছুই নহে।

সুধীগণ! মহাতপাঃ ঋষিদিগের ভূমাজ্ঞানে সন্দিহান মানবের মানবোচিৎ ভ্রান্তবুদ্ধির নিরসন করিতে যাইয়া আমি কালক্ষয় পূর্ব্বক আপনাদের বড়ই ক্লেশের কারণ হইতেছি, অতএব ঋষি-দোষদর্শিদিগের সন্দেহভঞ্জক আর একটী কথা বলিয়া আমি অদ্যকার বক্তব্য সমাপ্ত করিব।

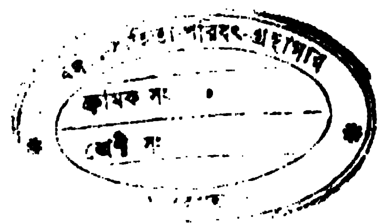
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অদ্য আমি কেবল শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দজ্ঞাপকযন্ত্রের কথারই বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলাম, কিন্তু রোগ বিশেষে পরীক্ষার প্রয়োজন হইলে এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আশ্রয় লইতে মহর্ষি সুশ্রুত বিশেষ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা এই—

"আত্মসদৃশেষু বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু তৎ স্থানীয়ৈর্জ্জানীয়াৎ," এই পাঠের টীকাকারের ব্যাখ্যা টুকু প্রয়োজন বোধে আপনাদিগকে একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তিনি বলিতেছেন—

"বড়বিধেষ্বপি বিজ্ঞানাভ্যুপায়েষু সৎস্থ, আত্মসদৃশেষু (বাত পিত্ত শ্লেষ্ম সদৃশেষু) তৎস্থানীয়ৈঃ (তেষাং শব্দাদীনাং স্থানানি শ্রোত্রাদীনি, তেষু অধিকৃতৈঃ শব্দ-স্পর্শরূপরস গন্ধৈঃ জানীয়াৎ, কান্ ব্যাধীন? অধিকার বশাদক্তৈঃ অনুক্তানপি। এতেন এতদুক্তং বাতাদি লিঙ্গৈ আয়ুর্ব্বেদেষু অনিদ্দিষ্ট নাম দেয়ানপি ব্যাধীন কুশাগ্রমতি বৈদ্যো জানীয়াদিতি সুশ্রুত—সূত্র ১ম অঃ) অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে যে রোগনির্ণয় করিবার কথা অতিসংক্ষেপে পূর্ব্বে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপরাপর রোগও তীক্ষ্ণবুদ্ধি—নিপুণ চিকিৎসকগণ দোষের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সহায়তায় অবগত হইবে।"

এই কথার পরও যদি আমরা রোগনির্ণয়ে প্রচলিত পাশ্চাত্য প্রণালী বিশেষকে আমাদের প্রাচীন-ঋষি-রাশি-রোপিত বৃক্ষের পল্লবিত অবস্থান্তর বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই সন্দেহ নিরাস করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বলিতে হইবে।

বাস্তবিক প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিতে গেলে ইহা ব্যতীত কেবল পূর্ব্বকথিত ক্ষতের অসাধ্য লক্ষণে ঘুরঘুর শব্দযুক্ত বায়ুপ্রবাহের উপলব্ধি করার বিষয় পাঠ করিয়াই আমরা ভাবাবিহীনবালকের কিম্বা স্বরভেদগ্রস্ত বয়স্কের অর্থাৎ যেখানে প্রশ্নের সাহায্যে রোগ নির্ণয়ের সম্ভাবনা নাই এরূপ উরঃক্ষত রোগ পূর্ব্বোক্ত শব্দের সাহায্যে নির্ণয় করা সপ্রমাণ করিতে পারি, সুতরাং ঋষিবর্ণিত ব্যাধিবিজ্ঞান যে একেবারে অচ্ছিদ্র ও অত্যাশ্চর্য্য জনক এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ নাই।



স্বাস্থ্যরক্ষায় শ্রীশ্রী পাগল হরনাথের উপদেশ

(২)

শরীরের যত্ন বেশী করিয়া করা উচিত। বর্ষার জলে যে যে স্থান ভাঙ্গিয়া গেছে, যত্নে তা'র মেরামত করিয়া আবার পূর্ব্বের মত কর।

অতিরিক্ত আহার যেমন নিষিদ্ধ, একেবারে কম আহারও তেমনি নিষিদ্ধ। আহার, বিহার, পান ইত্যাদি সকলই একটী নিয়মের অধীন রাখিবার চেষ্টা করিবে, সীমার বাহির হইতে দিবে না সীমার মধ্যে থাকিলে শুভ ফল পাইবে, কোন সন্দেহ নাই।

যে দেশে যে ব্যাধি বেশী, তা'র ঔষধ ও সেই দেশেই পাওয়া যায়, অন্যত্র খুঁজলে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলি সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

মাছ, মাংস, মদ ইত্যাদি দ্রব্য যাহা যৌবনে উপাদেয় মনে হইত, এখন বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করাই বিধেয়, নচেৎ শরীর নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িবে। এখন ফলমূল তরকারিতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে, আর মন ভাল হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল ক'রে ডাকিতে পারিবে।

Spiritual foodএ মনকে সবল ও সতেজ রাখে, শরীর আপনা আপনিই ভাল থাকিবে। যোগসমাধিস্থ পুরুষগণ বিনা আহারে শত সহস্র বৎসর পুষ্ট থাকিতে পারেন, অতএব যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, তা'রই চেষ্টা বিশেষ করিয়া করিবে, শরীর আপনা আপনি ভাল থাকিবে। অসৎ চিন্তা, পর পীড়ন, পরশ্রীকাতরতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা ইত্যাদি মন হইতে সরাইয়া দিলেই মন নিজের বল পাইয়া পূর্ণ মাত্রায় নিজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়।

বাল্যকাল—জীবনের কোনো অবস্থার মধ্যেই গণ্য নয়, যৌবন হইতে অবস্থার আরম্ভ, সেই অবস্থাতে মানুষ তমগুণাক্রান্ত হইয়া নানা কার্য্য করে, তখন সত্ত্বও হয়, পরে প্রৌঢ় অবস্থা আসে, তখন মানুষ তম-সত্ত্বের মাঝামাঝি থাকে, পরে বার্দ্ধক্য অবস্থা; তখন সত্ত্বগুণ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। * * * মাংস ইত্যাদি তামস ভোজনে, পশু হিংসা ইত্যাদি তামস যাগ যজ্ঞে রত থাকিয়া শরীর মন অপবিত্র করিবার আর সময় নাই। এখন শুদ্ধাহারে ও কৃষ্ণ নামে রত হওয়া উচিত।

চিন্তাই শরীর জীর্ণ শীর্ণ করিবার প্রধান জিনিষ। পার্থিব চিন্তা যেমন শরীর জীর্ণ করে, কৃষ্ণ চিন্তা তেমনই শরীর মন-প্রাণকে প্রফুল্ল করে। উভয়েরই নাম চিন্তা বটে, কিন্তু গুণ একটি অন্যের বিপরীত। একই চিন্তা অনুপান ভেদে পৃথক ফল দিয়া থাকে। অতএব সুখে থাকিতে হইলে অহরহঃ কৃষ্ণ চিন্তা করাই বিধেয়।

আতুরের দুঃখ নিবারণ না করিতে পারিলে অর্থের সার্থকতা হয় না। পুত্রকন্যারূপী যে কয়েকটি পরকে আপনার ভাবিতেছি, কেবল তাহাদের ভরণপোষণই অর্থের সার্থকতা নয়—এটি মনে মনে জানিবে এবং এটি অন্যকে জানিতে না দিয়া গোপনে সাধন করিবে।

যেমন সুশৃঙ্খলে চালিত রক্ত শরীর পোষণ করে, কিন্তু স্থগিত রক্ত শরীর নষ্ট করে, তেমনই অর্থ আসা-যাওয়াতে

হৃদয় নরম ও পবিত্র করে, আর একত্র হইয়া হৃদয়কে কঠিন ও অপবিত্র করিয়া দেয়।

সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। সঞ্চিত একটী পয়সা আর এক ভাণ্ড বিসে কোন প্রভেদ নাই। সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা বিষ বরং ভাল। বিষ সঙ্গেসঙ্গে অচৈতন্য ক'রে জারিয়া মারে। সঞ্চিত অর্থ জারে, অচৈতন্য করে, কিন্তু মারে না, কেবল জনমে জনমে নিদারুণ কষ্ট দেয় মাত্র। * * * ধনকে শাস্ত্রে 'দুষ্টমদ" ব'লেছে। একে মদ, তা'তে আবার দুষ্ট, তাই এই ধনকে কখনই এক এক পয়সা ক'রে যুড়িয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন না। যা'দের সামান্য উপার্জ্জন, তা'রাই অনেকটা সুখী,—বেশ ক'রে খায়, আর আরাম ক'রে নিদ্রা যায়, কখনই কোন দুশ্চিন্তা তা'দিগকে কষ্ট দেয় না।

অর্থ সঞ্চয় করা, স্ত্রীপরিবারের অলঙ্কার দেওয়া, কালিয়া-পোলাও খাওয়াই—অর্থের সদ্ব্যবহার নয়। দুঃখীর দুঃখ নিবারণ করা, অন্নক্লিষ্টকে অন্ন দেওয়া, বিবস্ত্রকে পরিধেয় দান করা ইত্যাদিই অর্থের সদ্ব্যবহার বলিয়া মনে রাখিবে। এ পৃথিবীতে আসিবার সময় কেহ লইয়া আসেনা, যাইবার সময়ও কেহ লইয়া যাইতে পারে না। নিয়ে যায় নিয়ে আসে কেবল সদসৎকর্ম্ম। তাই বলি, অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা অর্থ দ্বারা সৎকর্ম্ম সঞ্চয় করাই ভাল,—যাহা সঙ্গে যাবে।

এ জগতে যে কেহ আসে, খালি হাত পা নিয়ে আসে, খালি হাতে আবার ফিরে যায়। এখানকার কোনো ধনরত্ন সঙ্গে যায় না, যায় কেবল ধর্ম্ম। গরীবের দুঃখ-মোচন করাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পরীক্ষা করিবার জন্যই পরম পিতা এক একজনকে ভাণ্ডারী করিয়া অন্যান্য ভাই ভগিনীদের ভার তা'র উপর দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারী নিজ কর্ত্তব্য না করিলে, পিতা আবার তা'কে অন্যের দয়ার ভিখারী করেন এবং অপর উপযুক্ত লোককে ভাণ্ডারী পদ দেন। তাই আমার প্রার্থনা, জীবজন্তুর উপর সদয় ব্যবহার করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে ভুলিবেন না, তা'হ'লে জনমে জনমে এইরূপ ভাণ্ডারী হইয়া অর্থ ও অন্নবস্ত্র অকাতরে বিলাইতে পারিবেন।

সমস্ত কথাই মনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতেছে, মনের শক্তি অনুসারে বিষয়ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গণের গতি হয়। অর্থলালসা—অর্থপিপাসা দ্বারা জীব করিতে না পারে—এমন কর্ম্মই নাই। যা'র যত অর্থ পিপাসা কম, সে তত প্রভুর নিকট। এ সংসারে বান্ধিয়া রাখিবার একটি শক্ত শিকল "অর্থ।" এ বন্ধন ছেঁড়া বড়ই কষ্টকর, কিন্তু অসম্ভব নয়।

কতকগুলি কর্ম্মবীজ লইয়া এই শরীরটি হইয়াছে, সময়ে এক একটির ফল ভোগ করিতে হয়, কোনোটীর আস্বাদ সুমিষ্ট, কোনোটির আস্বাদ অতীব বিস্বাদ। এই জন্যই এই সংসারের সুখদুঃখে মোহিত হওয়া কদাচ উচিত নয়। যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা ভোগ করিবার, তাহা অবশ্যই ভোগ করিব, কোন উপায়ে তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, তবে মিথ্যা কেন ভাবিয়া আপন সময় নষ্ট করি? অনর্থক ভাবনার পরিবর্ত্তে বরং যাহাতে আর এ প্রকার অকাট্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া না আসিতে হয়, তাহার চেষ্টা করা কি ভাল নয়? এই কারণেই বলি, সংসারের কার্য্যগুলিকে নিয়মের এবং তজ্জন্য অবশ্যকরণীয় মনে করিয়া করা উচিত এবং তাহাতে কোনরূপ অহঙ্কারী হওয়া অনুচিত।

কাহারও জন্য বেশী ভাবিবেনা, কোন জিনিষেই বেশী মুগ্ধ হইবেনা। * * * মানুষকে মানুষ মনে করিয়া

ভাল বাসিতে শিক্ষা কর, তবে বেশী ভাল বাসিয়া প্রতারিত হইবে না। বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাক, ভবিষ্যৎ চিন্তাতে বৃথা কাতর হইবেনা। এ সংসার চির দিন থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু এ সংসারে যাহা কিছু আমার বলিতেছি, তাহা নিশ্চয় থাকিবেনা। মান বল, ধন বল, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বল, কিছুই আমার চিরদিনের জন্য নয়, এটি একেবারে স্থির। একটি বাগান কিম্বা একখানি বাড়ী আজ ভাড়া করিয়া দু'দিনের জন্য তাহাকে নিজের মনে করিতেছ সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবে, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই তাহারা আবার অন্যের হইয়া যাইবে। বাগান-বাড়ী ইত্যাদি তেমনই থাকিবে, কেবল তুমিই তা'দের অধিকারী থাকিবে না। তাই বলি, দু'দিনের যা', তা'র জন্য কেন কাতর হও? লক্ষ কোটী টাকা থাকিলেও তোমার উদর পূরণ মত মাত্রের তুমি অধিকারী, তা'রপর সকলই অন্যস্থানে একত্র হইয়া থাকে মাত্র।

এ সংসারে সম্বন্ধ সমস্তই অল্প দিনের জন্য। এজন্মের পূর্ব্বে আমরা কতবার নূতন নূতন রূপে এ সংসারে আসিয়াছি। কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন পশু, কখন পক্ষী ইত্যাদি নানারূপে এসংসারে আসিয়াছিলাম। তখনো তো আমাদের ঘর, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, মা, বাপ—সকলই ছিল, কিন্তু দেখ, তাহারা এখন কোথায়? কই আমরা তো একবারও এখন তাহাদের জন্য ভাবিনা! দেখ, তখনো এখনকার মত সুখের পাতান ভালবাসা ছিল, কিন্তু সময়ে আমরা সে সকলকে ভুলিয়া গিয়াছি। তেমনি আবার যখন এই আজকার পাতান সংসার ত্যাগ করিব, তখন আবার এই সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া যাহাদিগকে মনে করিতেছি, তাহাদিগকে একেবারে ভুলিয়া যাইব। এসংসার ছেলেদের খেলাশালের মত আজ এখানে পাতিতেছে, কাল আবার এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। * * এই কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিবেনা, আমি এই সংসারে সমস্ত আপনার জনকে ভালবাসিতে নিষেধ করিলাম। সকলেই আপন আপন বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাস, কিন্তু মগ্ন হইবে না, সদাই মনে রাখিবে যে, ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

যাহার লক্ষ ভাবনা, দিনান্তে সমস্তগুলির বিষয় ভাবিয়া শেষ করিতে পারেনা, তাহাকে আবার একটি ভাবিবার নূতন পথ দেখিয়ে দিতে হয়? একটি মানুষ মরণদশায় পতিত দেখিয়া কেহ কি তাহার গলা টিপিয়া দেয়? আমরা সর্ব্বদা চিন্তা-সমুদ্রে বাস করিতেছি, তা'র উপর মাঝে মাঝে প্রবল ঝড় ডেকে আনা কি ভাল? যাহা হউক হাসিতে শিখ, হাসাইতে শিখ, তবে দুঃখের সংসারে কিছু সুখ পাইবে। সংসারে একেই তো সুখ নাই, তা'র উপর সর্ব্বদাই কাঁদিয়া কেন দুঃখ বৃদ্ধি কর? ঘোর অন্ধকার, তাহার উপর আবার চক্ষু বুজা কেন? চাল সহজে চিবান যায় না, তাহার উপর তেঁতুল খাইয়া দাঁত টকান কেন? *

---

* উপদেশামৃত।

রক্তপিত্ত ও তাহার প্রতিকার

(কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন)

আঘাত, ক্ষত ও ব্রণ ব্যতীত এমন অনেক ব্যারাম আছে, যাহার জন্য মানুষের শরীর হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে, সাধারণতঃ এই রক্ত মুখ, নাসা ও মল মূত্র নির্গম পথে নিঃসৃত হয়, তাহা ছাড়া চোখ, কান—এমন কি সমস্ত দেহের রোমকূপ দিয়াও পড়িতে পারে।

ক্ষত ব্রণাদি ব্যতীত অপর যে সকল রোগে রক্তস্রুতি—হয়, রক্তপিত্ত তাহাদের অন্যতম। রক্তপিত্ত ভিন্ন যক্ষ্মা-রোগে মুখ দিয়া, রক্তজ প্রতিশ্যায় রোগে নাসারন্ধ্র দিয়া, রক্তাতিসার ও রক্তার্শরোগে মল নির্গম পথে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও প্রদরাদি রোগে মূত্রমার্গ দিয়া রক্তপাত হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তপিত্ত রোগের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে—যাহার জন্য এই রোগে উপরোক্ত সকল পথে—এমন কি দেহের সমস্ত রোমকূপ দিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে।

রোগ মাত্রেই কতকগুলি অস্বাভাবিক লক্ষণের সমষ্টি যাহা সুস্থ শরীরে দেখা যায় না। প্রত্যেক রোগেরই এমন কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে, যাহা তাহার নিজস্ব, আর কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে, তাহা অনেক রোগের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। রক্তপিত্তের কিন্তু রক্তস্রুতি ভিন্ন এমন কোন সাধারণ বা বিশিষ্ট লক্ষণ নাই—যাহার সাহায্যে অন্য রক্তস্রাবী রোগ হইতে ইহাকে পৃথক ভাবে জানিতে পারা যায়। অবশ্য এই রোগ প্রবল হইলে ইহার সহিত জ্বর, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি পৃথক রোগ উপসর্গরূপে দেখা যায়, কিন্তু এগুলির দ্বারা রোগ নির্ণয় না হইয়া এবং রোগীর ও আত্মীয়-স্বজনের আতঙ্ক আরও বাড়িয়া যায়।

যক্ষ্মা রোগে রক্ত নির্গমের সহিত জ্বর, কাস, শ্বাস, প্রভৃতি লক্ষণগুলি মানুষের অত্যন্ত সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। যক্ষ্মা রোগটাই দুঃসাধ্য, এমন কি অনেক স্থলে যে অসাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এহেন ভীতিপ্রদ স্থলে যদি কাহার মুখ দিয়া রক্ত নির্গম হয়, আর তাহার সঙ্গে জ্বর ও কাসির যোগ থাকে, তবে সেটা রক্তপিত্ত জন্যই হউক আর যক্ষ্মা রোগেই হউক, মানুষ নিজেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মুখীন বলিয়াই মনে করে।

শুধু যক্ষ্মা বলিয়া নয়, এই রক্তপিত্ত ব্যারামটা সাধারণের নিকট আরও অনেক রোগের সঙ্গে নিজেকে অতি আশ্চর্য্য রকম মিশিয়ে রাখিতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে প্রতিশ্যায় নামে একটি রোগের বিষয় উল্লেখ আছে, ইহার রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণের সঙ্গে রক্তপিত্তের পার্থক্য এত অল্প যে, সেরূপ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা বিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও দুরূহ হইয়া পড়ে। এই দুই রোগের সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সুশ্রুত নাসাগতরোগবিজ্ঞানে "চতুর্বিধং দ্বিপ্রভাবং দ্বিমার্গং বক্ষ্যামি ভূয়ঃ খলু রক্তপিত্তং" বলিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থলে রক্তপিত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহাও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি যে, রক্তপ্রদর বা রক্তার্শরূপে পরিচিত রোগ অনেক স্থলে প্রকৃত পক্ষে রক্তপিত্ত ব্যাধি।

আমাদের গরম দেশে সামান্য আকার হইতেই পিত্ত প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। রক্তপিত্তের রক্ত—দেহের ঊর্দ্ধ ও অধঃ—উভয় দিক দিয়া নিঃসৃত না হইলে ইহা মারাত্মক হয় না। বরং "বহ্বৌষধত্বাৎ" অর্থাৎ উপযোগী ঔষধের বাহুল্য জন্য শাস্ত্রে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিয়া থাকি।

দেশে এক্ষণে বিষমজ্বরাদি ব্যাধি প্রভাবে এবং খাদ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হইতে যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগের প্রাদুর্ভাব যে

দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যক্ষ্মা বলিয়া চিকিৎসিত হতাশ প্রায় এমন কতকগুলি রোগী আমরা হাতে পাইয়াছি, যাহা প্রকৃতই যক্ষ্মা নয় এবং রক্তপিত্তের চিকিৎসায় তাহারা নির্দোষ ভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

রক্তপিত্ত অত্যন্ত গুঢ়লিঙ্গব্যাধি, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অল্প অপচারে এই রোগ প্রকাশ হইয়া থাকে, সাধারণের অবগতির জন্য ইহার কারণাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

যে সকল ব্যক্তি অতিমাত্রায় মাষকলাই, কুলথ কলাইয়ের দাইল, অপরিমিতভাবে দই, ঘোল, আমানি প্রভৃতি ভোজন করে, প্রত্যহ শুষ্ক শাক, মূলা, সর্ষপশাক, রশুন, সজিনার ডাঁটা অধিক মাত্রায় খাইয়া থাকে; প্রধানতঃ মেষ, শূকর বা গোমাংস ভোজন করে, তিল বা তিলকৃত খাদ্য গ্রহণ করে, রৌদ্র বা অগ্নিসন্তপ্ত হইয়া উষ্ণ দুগ্ধ পান করে, ভোজনের পর অতিরিক্ত পিষ্টকাদি আহার করে, সর্ব্বদা উষ্ণ বা তীক্ষ্ণবীর্য্যপ্রধান অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করে, তাহাদের এই সকল আচরণের ফলে পিত্ত অত্যন্ত প্রকুপিত হয় এবং প্রমাণাতিরিক্ত রক্ত উৎপাদন করে। এই উপায়ে অথবা বর্দ্ধিত বেগবান রক্তের সাহায্যে সেই কুপিত পিত্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইয়া যদি যকৃৎ প্লীহাজাত রক্তবহস্রোত সমূহের মুখে অবস্থান করে এবং রক্তের সহিত একীভূত হইয়া রক্তের গন্ধ বর্ণাদি গ্রহণ করে, তখন সেই পিত্তই "রক্তপিত্ত" রূপে পরিণত হয়।

এই উপায়ে দুষ্ট পিত্ত, রক্তপিত্ত রূপে পরিণত হইলে সেই ব্যক্তির আহারে অনিচ্ছা, ভুক্তদ্রব্যের অম্লপাক, উদগারে অম্লরস ও গন্ধ, বমির বেগ, অবসন্নতা, দাহ, মুখ হইতে ধূম নির্গমের ন্যায় অনুভূতি, মল মূত্রাদি এবং দেহ ও নখ-নেত্রাদি প্রত্যঙ্গ রক্ত, পীত বা হরিদ্রাভ হইয়া থাকে। অনেক সময় মুখে বা নিঃশ্বাসে রক্ত অথবা আমিষ গন্ধ পাওয়া যায় এবং রক্ত, পীত, নীল বর্ণাদির বিকৃত স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

অহিত আহার-বিহারশীল ব্যক্তির পিত্তবিকৃতি জন্য এই সকল লক্ষণ দেখা দিলেও তখন পর্য্যন্ত রক্তপিত্ত রোগ প্রকাশ হয় না। এগুলি রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশের পূর্ব্বাবস্থা।

বলা আবশ্যক অহিত আহারের বিহার ফলে দোষের সঞ্চয় হইতে প্রকাশ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদে ৫টি ক্রিয়া বিভাগ হইয়াছে। ১ম ক্রিয়া কালে দোষের সঞ্চয় ও তাহা হইতে শরীরের মন্দোষ্ণতা বা তাপবাহুল্য প্রভৃতি লক্ষণের প্রকাশ হইয়া থাকে। লোকে এই বৈলক্ষণ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই অবস্থায় আহার বিহারের অনিয়ম করিলে ২য় ক্রিয়ার সহিত দোষের প্রকোপ হয় এবং অন্ন বিদ্বেষ, পিপাসা, দাহ, ইত্যাদি ভাবান্তর গুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পুনরায় প্রতিকূল আচরণ গ্রহণ করিলে ৩য় ক্রিয়া কাল উপস্থিত হয় এবং সঞ্চিত ও প্রকুপিত দোষ সকল অভ্যন্তরস্থ প্রবহমান বায়ুর বেগে দেহের অপর কোন অংশে প্রসারিত হয় এবং দোষ-ধর্ম্মানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলি অধিকতর পরিপুষ্ট করে। ইহার পর চতুর্থ ক্রিয়া—স্থানসংশ্রয় অর্থাৎ দোষের প্রসরণ কালেও অপ্রতিকার কিম্বা অনিয়ম হইলে সেই সঞ্চারিত দোষ দেহের যে কোন প্রদেশে রুদ্ধ হইবে এবং কুপিত দোষধর্ম্মী ও স্থানানুযায়ী ভবিষ্যৎ ব্যাধির "পূর্ব্বরূপ" রূপে প্রকাশ পাইবে। ৪র্থ ক্রিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বরূপের পর ব্যাধি লক্ষণের প্রকাশ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রক্তস্রুতি - রক্তপিত্ত রোগের একমাত্র লক্ষণ; কেবল দোষভেদে বিভিন্ন রোগীর রক্তের বর্ণাদির তারতম্য হইয়া থাকে।

রক্তপিত্ত রোগে অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে রক্ত বমন হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে জীব-রক্ত অধিক থাকেনা, দূষিত পিত্তই লোহিত রূপে বাহির হইয়া যায়। সেজন্যই এইরোগে অত্যধিক রক্তবমন হইলেও সেরূপ বিপজ্জনক বা মারাত্মক হয় না। বরং

যদি রোগী কৃশ বা দুর্ব্বল না হয়, তাহা হইলে সেই দোষ দুষ্ট রক্তের রোধ করিতে নিষেধই করা হইয়াছে এবং এই অবস্থায় দূষিত রক্ত রোধ করিলে মূর্চ্ছা, জ্বর, গুল্মাদি পীড়ার আশঙ্কার উল্লেখ আছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে যাহা বিধিব্যবস্থা, তাহা চিকিৎসকের হাতে। হয়ত অনেক সময় তাঁহারা প্রথম হইতে রক্তরোধের চেষ্টা করেন না বলিয়া রোগী বা তাঁহার আত্মীয় স্বজন ভীত হইতে পারেন, সেজন্য এখানে আমরা কথাটা উল্লেখ করিলাম। ফল কথা, আয়ুর্ব্বেদ মতে এই রোগের চিকিৎসাপ্রণালী অনিন্দ্য ও এই রোগের যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ঔষধ আছে; এবং আমাদের চিকিৎসায় সকল রোগীই আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি কখনও দু' একটি রোগী আরোগ্য না হয়, তাহার কারণ উল্লেখ কালে চরক বলিয়াছেন—

"সেবাযত্নের অভাবে, অপথ্য সেবার দ্বারা, চিকিৎসা না করাইবার জন্য এবং চিকিৎসকের দোষে কদাচিৎ আরোগ্য হয় না।" সুতরাং ঔষধ বা চিকিৎসা-প্রণালীর কোন দোষ নাই বুঝিতে হইবে। যাহাদের কখন এই রোগ হইয়াছিল বা "পূর্ব্বরূপ" দেখা দিয়াছে তাঁহাদের অবগতির জন্য অতঃপর আমরা এই রোগের যাহা পথ্য ও যেগুলি অপথ্য তাহা উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পুরাতন শালিষষ্টিক ধান্যের অন্ন, যব, গোধূম, মুগ, মসুর বা ছোলার দাইল, চিঙ্গড়ি ও বাণ মৎস্য, শশক, হরিণ, পায়রা, ঘুঘু, বটের পক্ষীর মাংস, গব্যঘৃত, ছাগ ও গব্যদুগ্ধ, দাড়িম, খর্জ্জুর, আমলকী, দ্রাক্ষা, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, কলা, পিয়াল ও ফল্সা প্রভৃতি ফল। নিমপাতা, বাকসপাতা, হেঞ্চা, কাঁচড়া, নটে প্রভৃতি শাক, পল্তা, পটোল, বেতাগ্র, পুরাতন চালকুমড়া, লাউ, পাকাতাল, কচি তালের শাঁস ও জল, খৈএর ছাতু কর্পূর বাসিত শীতল জল, নির্ঝরের জল, চন্দ্রকিরণ, শীতল দেশ ও কাল চন্দনাদি শীতল দ্রব্যের অনুলেপন, শতধৌত ঘৃত, অবগাহন স্নান প্রভৃতি হিতকর। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে মধ্যে মধ্যে বিরেচন ও অধগঃ রক্তপিত্তে সাময়িক বমনকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ধূমপান, ক্রোধ, চঞ্চলতা, স্ত্রীপ্রসঙ্গ এবং কুলত্থ কলাই, সিম, গুড়, বেগুন, তিল, মাষকলাই, সর্ষপ ও সর্ষপ তৈল, দধি, ঘোল, আমানী, ক্ষার দ্রব্য, কূপের জল, মদ্য, রসুন, সিম, পেঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতি ঝাল, অম্ল, অধিক লবণ, ভাজা বা পোড়াখাদ্য, বিলাতী কুমড়া, পান, গরম মসলা, আদা এবং গব্য ও শূকর মাংস প্রভৃতি বিশেষ অহিতকর জানিবে। চা পানও এই রোগে অকর্ত্তব্য।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হিতকর বিষয় গ্রহণে এবং অহিতকর আহার বিহার পরিত্যাগে সতত যত্নশীল হইবেন।

আকন্দ

আকন্দ দুইপ্রকার, শ্বেত ও লাল। দুইপ্রকার আকন্দই ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। শ্বেত আকন্দের পাতাগুলি শুভ্র কিন্তু ফুল একেবারে ধব ধবে সাদা নহে। রক্ত আকন্দের যে ফুল হয়, তাহার রং বেগুনে। উভয় আকন্দেরই পাতা ভাঙ্গিলে আঠা পাওয়া যায়।

উভয় প্রকার আকন্দেরই আঠা বা ক্ষীর, পাতা, ফুল

এবং মূল—ঔষধ স্বরূপ ব্যবহারের উপদেশ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। শারীরিক বিষনাশের শক্তি ইহার অদ্ভুত, এমন কি, কুকুরে কামড়াইলেও এজন্য ইহা সেবনের ব্যবস্থা আছে।

আকন্দের ইংরাজী নাম Calotropis Jigantea বা calotropis Procera। হিন্দুস্থানী দেশে ইহাকে মন্দার বলে। লাল আক, সফেদ আকও হিন্দুস্থানী নাম। গুজরাটে ইহার নাম আকডো। তৈলঙ্গে ইহাকে খোলী বলে। সিংহল দেশে ইহার নাম ওয়ারা।

সংস্কৃত ভাষায় শ্বেত আকন্দকে অলর্ক, গণধূপ, মন্দার, বসুক, বালার্ক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প ও প্রতাপস সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। লাল আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও স্ফোট।

দুইপ্রকার আকন্দই বায়ুনাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—দুইপ্রকার আকন্দ ব্যবহারেই কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা গুল্ম, অর্শ, শ্লেষ্মা, প্রদর রোগ ও পুরীষ ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বেত আকন্দের পুষ্প—বলকারক, লঘু, অগ্নির দীপ্তিকারক ও পাচক। ইহা দ্বারা অরুচি, মুখাদি হইতে জল স্রাব, অর্শ, কাস ও শ্বাস নিবারণ হয়।

লাল আকন্দের ফুল কফনাশক, সংগ্রাহী, মধুর ও তিক্ত। কুষ্ঠ, ক্রিমি, বিষ, রক্তপিত্ত, গুল্ম ও শোথরোগে ইহা প্রযুজ্য।

উভয়প্রকার আকন্দের আটা বা ক্ষীর—তিক্ত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ও লবণ রস বিশিষ্ট এবং বিরেচনে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগ আরোগ্য হয়।

আকন্দের মূল কফনিঃসারক, বমনকারক ও স্বেদজনক। ইহা সেবনে শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, অতিসার, প্রবাহিকা, রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, গ্রহণী, প্রদর ও শ্লেষ্মজ ব্যাধি সকল আরোগ্য হয়।

মাত্রা।—আঠার মাত্রা ১০ বিন্দু। বমন করাইবার জন্য মূলের ত্বকের মাত্রা ৵০ তিন আনা পর্য্যন্ত। ঘর্ম্ম এবং বমনের বেগ উপস্থিত করাইবার জন্য ২ রত্তি। পাতার রস ৬ বিন্দু। ফুল এবং মূলের কাথ সেবন করাইতে অর্দ্ধ ছটাক বা ১ আউন্স।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও এই আকন্দের ব্যবহার নানা রোগে করিয়া থাকেন। **শ্বাসের কষ্ট দূর করিবার জন্য** আকন্দ মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া চুরুট প্রস্তুত করা হয়। আগুন লাগাইয়া ঐ চুরুটের ধূম পান করিলে অসহ্য শ্বাসের কষ্ট সদ্যঃ আরোগ্য হয়। **আমরক্তাতিসারে** আকন্দ মূলের ছাল আফিংয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া "ডোভার্স পাউডারের" মত ব্যবহার করা হয়। **উদরাধ্মানে কিম্বা শূল বেদনায়** আকন্দের পাতায় তৈল মাখাইয়া উদরে স্থাপন পূর্ব্বক শান্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। **দাঁতের পোকায়** সিজের আঠার সহিত আকন্দের আঠা মিশাইয়া দাঁতে লাগাইয়া যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করা হয়। **কর্ণশূলেও** ঐরূপভাবে কর্ণমধ্যে ইহা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমরাও এরূপ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। **সিফিলিস** Syphilis **বা ফিরঙ্গ রোগে** ইহার বহুল ব্যবহার করা হয় এজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে ইহার নাম উদ্ভিজ্জ পারদ বা Vegetable mercary। **বৃশ্চিক দংশনে** আকন্দের আঠা দংশিত স্থানে লাগাইয়া দিলে তখনি তখনি যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। **বেদনা এবং সন্ধিস্থলের ফুলায়** আকন্দের আঠা লাগাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে আকন্দের প্রয়োগ-উপদেশ।—আকন্দের পাতা ও ফুল এক একটি এক তোলা করিয়া লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইবে। তাহার পর কতকগুলি যবের খোসা ছাড়াইয়া এবং যবগুলি ভাজিয়া লইয়া ঐ আকন্দের কাথের দ্বারা সাতবার ভাবনা দিবে। তাহার পর ঐ

গুলি শুকাইয়া লইয়া বেশ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার করিয়া **শ্বাস-রোগীকে** সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

প্লীহায়—একটি মাটির হাঁড়িতে কতকগুলি আকন্দের পাতা এবং তাহার এক চতুর্থাংশ সৈন্ধব লবণ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় দধির মাত অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা করিলে অতি বড় এবং কঠিন প্লীহাও অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণশূলে—আকন্দের ফুল ও পাতার অঙ্কুর কাঁজিতে বাটিয়া উহার সহিত কয়েকটি তিল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ মিশাইবে। তাহার পর একটি মনসার ডাঁটাকে খুড়িয়া লইয়া পূর্ব্ব কথিত আকন্দের ফুল ও পাতার অঙ্কুর যাহা তিল ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা আবৃত করিবে এবং তাহার উপর মাটির লেপ দিয়া শুকাইয়া লইয়া পুটপাক করিবে। এইরূপ করিলে সেই সিজের ডাঁটা হইতে আকন্দের পাতার অঙ্কুরের রস নিঃসৃত হইবে। ঐ রস অল্প গরম গরম অবস্থায় কর্ণমধ্যে বিন্দু বিন্দু প্রদান করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হইয়া থাকে। **কুকুরে কামড়াইয়া বিষ হইলে**—আকন্দের আঠা শুকাইয়া উহার সহিত দুই তোলা তিল তৈল কুটিয়া লইয়া ও দুই তোলা আকের গুড় মিশাইয়া কয়েকদিন সেবন করিতে দিলে বিষ নষ্ট হইয়া থাকে। **কুরণ্ড বা বৃদ্ধি রোগে**—আকন্দের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। **শ্লীপদ বা গোদে**—আকন্দের মূলের ছাল ঐরূপ কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। **অর্শে**—কতকগুলি আকন্দের কচি কচি পাতা কুটিয়া লইয়া উহার পরিমাণ যত হইবে, সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, সাম্ভার লবণ ও করকচ লবণ মিশাইয়া তাহার সিকিভাগ এবং একটু তিল তৈল ও আমরুল শাকের রস একত্র মিশাইয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার করিবে। এই ক্ষার দুই আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত কিছুদিন সেবন করিলে বায়ুজনিত অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। **দাঁতের বেদনায়**—আকন্দের আঠা শুকাইয়া লইয়া এবং উহা চূর্ণ করিয়া লাগাইবার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আকন্দের ফলের ভিতর যে তুলা হয়, তাহা দ্বারা আজকাল একপ্রকার গলাবাঁধা প্রস্তুত হইতেছে। উহা সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ্মজ রোগে বিশেষ হিতকারী। যাহাদের ধাতু স্বভাবতঃ শ্লেষ্মপ্রধান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই আকন্দ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার গাছ দুই হইতে ছয় হাত উচ্চ হইয়া থাকে। বিশেষ যত্ন করিয়া ইহা রক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না কিন্তু এরূপ একটি বহু গুণযুক্ত বৃক্ষের চাষ যদি একটু যত্ন করিয়া করা হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা যেমন দেশবাসীর নানা রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে, সেইরূপ ব্যবসায়িগণের অর্থোপার্জ্জনের পথও সুপরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশের লোকে এই সকল পরমোপকারী বনৌষধির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

পল্লীকুসুম

(গল্প নয়—সত্য ঘটনা)

(শ্রীমতী কমলা বালা দেবী)

তমালিনীর পিতা ছিল অতিশয় দরিদ্র, কিন্তু তাহার বিবাহ দিয়াছিল সে সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে। শ্বশুর শাশুড়ী দেবর, ননদ, জমী-যায়গা, হালচাষ—এক কথায় গৃহস্থ কৃষকের ঘরে যে সকল থাকিলে উন্নত অবস্থা বলা যায়; তমালিনীর পিতা সেইরূপ ঘরেই তমালিনীকে তাহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইল। তমালিনী পাঁচ বৎসর হইতে যখন আঠার বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন কিন্তু তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পিতৃকুলে ছিল পিতা ও মাতা, তাহারা সংসারের মায়া কাটাইয়া শ্রীভগবানের নাম লইয়া ইহসংসারের অপর পারে চলিয়া গিয়াছে। শ্বশুর কুলেও শ্বশুরশাশুড়ীরও বিগত-জীবন ঘটিয়াছে। উপর্য্যুপরি অজন্মার জন্য কতকগুলি ঋণে জমী যায়গা বন্ধক পড়িয়াছে। তমালিনীর স্বামী তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"তোমরা বাড়ীতে থাকিয়া সকল বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কর, আমি চলিলাম—কলিকাতায় চাকুরি করিতে, চাকুরী ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই।"

এইরূপ স্থির করিয়া "সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং" প্রান্তরভূমির সুশীতল আলোক বাতাস পরিত্যাগ করিয়া তমালিনীর স্বামী রাঢ় হইতে কলিকাতায় যাইল চাকুরি করিতে।

কিন্তু এই চাকুরির অবস্থা কি হইল, কেহ জানিল না। সে আজও যাইল কালও যাইল। এক, দুই, তিন করিয়া মাসের পর মাস গত হইতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতে লাগিল, এক, দুই, তিন করিয়া কয়েক বৎসরই কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার নিকট হইতে একখানি পত্র পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না—বাড়ী আসা তো দূরের কথা।

তমালিনীদের সংসারে দুইটি দেবর ও এক মাত্র ননদিনী। ননদিনীর বিবাহ হইয়াছিল সেই গ্রামেই, সে কখনো শ্বশুর বাড়ী থাকিত, কখনো বা পিত্রালয়ে আসিত। দেবর দুইটিও বিবাহিত।

এই বধূদের লইয়া সংসারে কিন্তু কিছুদিন পরে নানা অশান্তির সৃষ্টি হইল। তমালিনী সম্পর্ক হিসাবে সংসারের কর্ত্রী, কিন্তু পরস্পরের মনোমালিন্যের ফলে তাহাকে থাকিতে হইল দাসী অপেক্ষাও অধম হইয়া। দেবরেরাও তাহাকে যে চক্ষে দেখিত, এখন তাহার গ্রহ বৈগুণ্যে তাহারও পরিবর্ত্তন ঘটিল। ফলে স্বামীবিরহবিধুরা তমালিনী অহরহ দুশ্চিন্তার মধ্যে পারিবারিক অশান্তিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

× × × ×

তমালিনীর পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় একই গ্রামে। পিত্রালয়ে কিন্তু কেহই ছিলনা, বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। পিতৃকুলে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল, তাহার নাম নীলকমল। নীলকমল সম্পর্কে তমালিনীর খুড়া হইত, তমালিনীর পিতার সহিত নীলকমলের সখ্যতাও যেমন বেশী ছিল, সম্পর্কে এগার পুরুষের পার্থক্য ঘটিলেও আত্মীয়তায় অতি নিকটসম্পর্ক বলিয়াই পরস্পর মনে করিত। এই তমালিনীকে শিশুকালে নীলকমল অনেক সময় কোলে করিয়া আনন্দ সুখ উপলব্ধি করিত। তমালিনী তাহার এই অশান্তির দিনে একবার নীলকমলের সহিত দেখা করিল এবং তাহার নিকট সকল কথা জানাইয়া বলিল,—"খুড়ো, আমার তো বাবা নাই, কিন্তু তুমি আছ, তুমি যদি একটু যায়গা দিয়া দু'মুঠো খাইতে দাও, তা'হ'লে আমি আর শ্বশুর বাড়ী থাকিনা। বাবা যা'র হাতে দিয়া গিয়াছেন, তার তো কোনো খোঁজই নাই,—বেঁচে আছে—কি নেই—তাহাও জানিনা, কেই বা আমার জন্য কষ্ট করিয়া সন্ধান করিবে? যা'হোক তুমিই আমাকে এ দুর্দ্দিনে স্থান দাও খুড়ো,

আমি তোমার নিকটে থাকিয়া তোমার সংসারের সকল কাজই করিব।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে তমালিনীর চক্ষে আসিল। নীলকমল তাহার অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল। তমালিনীর পিতাকে নীলকমল দাদা বলিয়া ডাকিত। সে একবার চক্ষু বুজিয়া অতীত ঘটনার অনেক কথাই চিন্তা করিয়া ফেলিল। এই তমালিনীর বিবাহ দিয়া তাহার পিতা কিরূপ উল্লাসের সহিত আনন্দের হাসি হাসিয়া বড় গলা করিয়া সকলকে বলিয়াছিল—"মেয়ে আমার পরমা লক্ষ্মী, নইলে এমন ঘরে প'ড়্‌বে কেন! কত ভাগ্যি, তাই এ রকম জামাই জুটল।' এরূপ অনেক কথাই সে চিন্তা করিল। তারপর বলিল—"আমি একবার ওদের ব'লে দেখবো কি?"

তমালিনী বলিল—"না খুড়ো, তাতে হিতে বিপরীত হ'বে। তার চাইতে বাপের বাড়ীও তো সবাই আসে, আমার বাবা না থাকুন কিন্তু তাঁর ভাই—তুমি তো আছ। এই বলিয়া তোমার নিকট দিনকতক আসিলে কেহই কোনো আপত্তি করিবেনা। আমি বলি কি,—আমি কথাটা না তুলিয়া তুমিই তোল। তাতে দোষ কি?"

নীলকমল বলিল—"আচ্ছা।"

তারপর নীলকমল সন্ধ্যার পূর্ব্বে তমালিনীদের বাড়ী গিয়া তাহার দেবরের নিকট তাহাকে দিন কতক তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিল। তাহার দেবর এবং দেবরবধূগণও তাহাকে সরাইতে পারিলে ভাল হয় মনে করিতেছিল, সুতরাং সহজেই রাজি হইল। তমালিনী তার পর দিন প্রাতঃকালেই নীলকমলের সহিত তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

× × × ×

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তমালিনীর এখানে আসিয়া শান্তির পরিবর্ত্তে আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। নীলকমলের স্ত্রীর অন্তঃকরণ ছিল একেবারে স্বার্থপরতায় পূর্ণ। সে নিজেরটি ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, আত্মসুখই হইয়াছিল তাহার সর্ব্বস্ব, আত্মসুখ ভিন্ন অপরের সুখ-সুবিধা তাহার দ্রষ্টব্যের মধ্যেই ছিলনা।

নীলকমলের ছেলে ছিলনা, সংসারে একটি মাত্র কন্যা। সেটির বিবাহ হইয়াছিল তাহাদের গ্রাম হইতে দশ ক্রোশ ব্যবধানের পথে। তাহার শ্বশুরেরা তাহাকে বড় একটা পাঠাইতে চাহিত না। মাঝে আনিবার জন্য নীলকমল অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী পাঠায় নাই। যাহাহউক তমালিনীকে নীলকমল লইয়া আসার পরই নীলকমলের স্ত্রী জেদ ধরিল—তাহার কন্যাকে কালই লইয়া আসিতে হইবে। "একটা পরের মেয়ে আনিয়া তাহাকে পুষিবার ব্যবস্থা করিলে, আর নিজের মেয়ে চিরদিনই শ্বশুর বাড়ী পড়িয়া থাকিবে, —এ হইবে না, যেমন করিয়া পার—কালই আমার মেয়েকে আনিয়া দিতে হইবে।"

নীলকমল আর কোনো বাগবিতণ্ডা করিল না, সে বলিল—"আচ্ছা।"

ফলে সে তাহার পর দিনই কন্যার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল এবং তাহার শ্বশুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল।

কিন্তু ভবি তো ভুলিবার নয়। নীলকমলের স্ত্রী তমালিনীকে প্রথমাবধিই দেখিয়াছিল বিষনয়নে। নীলকমল তাহাকে আনিয়া স্থান দিয়াছে, সে কি করিবে। কিন্তু তাহার আগমনটা তাহার নিকট মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। যা'হোক তাহাকে দিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম—ঘর নিকানো, ছড়া ঝাট দেওয়া, রন্ধনাদি, বাসন মাজা—সকল কর্ম্মই করাইতে লাগিল। তমালিনী আলস্য কাহাকে বলে জানিত না, তাহার কাজ করা প্রথম হইতেই অভ্যাস ছিল, এজন্য অম্লান বদনে সকল কর্ম্মই সে হাসিমুখে করিতে লাগিল। নীলকমলের স্ত্রী—এদিক দিয়া তাহাকে জব্দ করিবার অবসর পাইল না।

এক সময় তমালিনীর জ্বর হইল। সেই জ্বরের অবস্থায় সে তো আর হাঁড়ি ধরিতে পারে না, কাজেই নীলকমলের কন্যা অরুণাকে সে দিন রন্ধনগৃহে গিয়া আহারীয় প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইল। অরুণাও উপযুক্ত মায়ের উপযুক্ত কন্যা, কাজকর্ম্মে বড় পটীয়সী ছিল না। ভাত নাবাইতে গিয়া ফেন পড়িয়া পুড়িয়া যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

বাঘিনী মা মেয়ের চীৎকারে রান্নাঘরে আসিয়া মেয়ের অবস্থা দেখিয়া যত রাগ সবটা প্রকাশ করিতে লাগিল, তমালিনীর উপর। তমালিনী অসুখ শরীরেও কেন দু'টি রাঁধিয়া দিলনা—এ করিলে কি পরের বাড়ী থাকা চলে—এইরূপ নানাকথায় শতমুখে চীৎকার করিতে লাগিল।

তমালিনীর জ্বর কয়দিন হইতে, কে তাহাকে দেখে? নীলুখুড়া দিনান্তে একবার মাঠ হইতে আসিয়া "কেমন আছ মা" বলিয়া এক একবার দেখিয়া যান। সেদিন জ্বরটা তাহার বেশীও হইয়াছিল। যা হোক খুড়ীমার চীৎকারে সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং রান্নাঘরে গিয়া সকলই দেখিল। তাহার পরে কোন কথা না কহিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে কয়েকটি আলু লইয়া বাটিতে লাগিল। নীলকমলের স্ত্রী উহা দেখিয়া আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু তমালিনীর তাহা শুনিবার অবসর ছিলনা। সে তাড়াতাড়ি কতকগুলি আলু বাটিয়া অরুণার দগ্ধস্থানগুলিতে মাখাইয়া দিল। অরুণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"আঃ বাঁচিলাম। ফলে ফোস্কা তো হইল না, অসহ্য যন্ত্রণাও তখনি থামিয়া গেল।

\+ + + + +

কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে? তমালিনী নীলকমলের স্ত্রীর স্নেহ—সহস্র চেষ্টা করিয়াও লাভ করিতে পারিল না। তাহার কন্যা অরুণা—তমালিনীকে মনে মনে ভাল বাসিত, তাহার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া, তাহার সরল স্নিগ্ধ অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা মায়ের অযথা লাঞ্ছনায় তমালিনী যখন বিশেষরূপে ক্লিষ্ট হইত, তখন বুঝিতে পারিয়া অরুণা, তমালিনীকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহাকে দু'টা সহানুভূতির কথা বলিবার অবসরও তাহার ঘটিত না, পাছে মা অসন্তুষ্ট হন—সদাই এই ভয়। মা বিরক্ত হইলে শুধু যে অরুণাকেই তজ্জন্য কটু কথা শুনিতে হইবে তাহা নয়; সেই বিরক্তির ফলে তমালিনীর লাঞ্ছনা আরও বাড়িয়া যাইবে,—অরুণা ইহা মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকিত।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি যখন আরম্ভ হয়, তমালিনী তখন অরুণার কেশগুলি বিনাইয়া বিনাইয়া বাঁধিয়া দিতেছিল, অরুণা বলিতেছিল—

"হাঁ ভাই তোমার তো সব ছিল, আছেও সব, তবে তুমি এরূপ ভাবে তিরস্কার সহ্য করিয়া আমাদের বাড়ীতে থাক কেন?"

তমালিনী একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিল,—"কি করিব ভাই, ভগবান যে মারিয়াছেন, নতুবা অমন স্বামী যার,—তার এ দুর্গতি হইবে কেন? তিরস্কার-গঞ্জনার কথা বলিতেছ, এতো আমার কিছুই নয়—আমি যে মনের আগুনে জ্বলিতেছি,—তাহা আমি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবে না।"

অরুণার জননী কক্ষের পশ্চাদ্দেশ হইতে সকল কথা শুনিতেছিল। সে তমালিনীর শেষ কথা কয়টি শুনিয়া মনে করিল, তাহার মন্দ অবস্থা ঘটিয়াছে, অরুণা আমার সুখে আছে, এই জন্য অরুণাকেই লক্ষ্য করিয়াই সে বলিতেছে, আমি যে মনের আগুনে জ্বলিতেছি, তাহা আমি ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেনা।

সে আর থাকিতে পারিল না, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া অরুণার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—নে—ওঠ্, ও হতচ্ছাড়ী পোড়ারমুখীর হাতে আর চুল বাঁধতে হবেনা, ওর মন্দ অবস্থা হয়েছে, তুই সুখে আছিস্। সেজন্য ও হিংসেয় ম'রছে। আসুক

তো মুখপোড়া মিলে আজ বাড়ী, তারপর বুঝব ওরই একদিন না আমার একদিন। বাপ খেয়েছেন, মা খেয়েছেন, যে ঘরে পড়েছিলেন সে ঘরের সর্ব্বনাশ ক'রেছেন, আবার আমারও ঘরে এসেছেন উচ্ছন্ন দিতে। হতভাগী, শতেকখোয়ারি, তোমার ঠাঁই কোথাও হবে না, যমের বাড়ীতেই তোমার ঠাঁই, সেখানে যেতে পার না?"

অরুণা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি অমন ক'রছ কেন? ও তো কিছু বলে নাই।"

নীলকমলের স্ত্রী আরও জ্বলিয়া উঠিল, "বলিল, বলে নাই! আর বলা কাহাকে বলে! ওর ওই দশায় তোকেও ফেলতে ও চায়। আমি কারুর কথা শুনবো না, ওকে যদি আজ ঝাঁটা মেরে বাড়ী হ'তে না তাড়িয়ে দেওয়া হয়—তো আমি গলায় দড়ি দিয়ে কি বিষ খেয়ে ম'রবো। ও আবাগী এ বাড়ীতে থা'ক্‌লে আমি আমার কথা বজায় রাখবোই রাখবো।"

নীলকমল এই সময় ভিজিতে ভিজিতে দুই পা কাদায় মাখা অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী আসিল। বাড়ীতে ঢুকিয়াই 'একখানি কাপড় দাও' বলিয়া যেমন ঘরের দাওয়ায় উঠিতে যাইবে অমনি পিছলাইয়া গিয়া উঠানে পড়িয়া গেল। দাওয়াটি উচু ছিল একজন্য পড়িয়া গিয়া লাগিলও খুব বেশী। বাম পদের হাঁটুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

নীলকমলের এই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তমালিনী ঘর হইতে উঠানে নামিয়া গেল এবং তাহার স্কন্ধে হাত দিতে বলিয়া তাহাকে কোনোরূপে দাওয়ার উপরে উঠাইয়া আনিল এবং তাহার পরে গোয়াল হইতে এক তাল্ গোবর লইয়া একটা হাঁড়িতে জল দিয়া ঐ গোবর গুলিয়া এবং রান্নাঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালিয়া, উহা খানিকটা ফুটাইয়া লইয়া ঐ জলটি একটি ঘটিতে পুরিল এবং অরুণাকে বলিল "আমি এই জল লইয়া পায়ে ধারানি দিই, তুমি ভাই বেশ করিয়া ডলিয়া দাও দিকি।" এই বলিয়া সে সেই গোবরমাখান জল নীলকমলের পায়ে ঢালিতে লাগিল এবং অরুণা ডলিয়া দিতে লাগিল।

এইরূপ খানিকক্ষণ করাতে নীলকমল কতকটা সুস্থ হইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সারিল না—অরুণা আবার গোয়াল ঘরে গেল এবং সেইরূপ খানিকটা গোবর লইয়া জলে গুলিয়া লইয়া ফুটাইয়া লইয়া আবার সেইরূপ ধারাণী দিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে এইরূপ সে তিন বার করিল। সেইরূপ অবস্থায় নীলকমল পরদিন সুস্থ হইল।

পূর্ব্বদিনের সুশ্রূষায় নীলকমল সুস্থ হইল বটে, কিন্তু তার পরদিন আর সে মাঠে যাইতে পারিল না। বেদনা বড় বেশী না থাকিলেও তখনো কিছু ছিল,—আঘাতটা লাগিয়াছিল খুবই বেশী,—তমালিনী পূর্ব্বদিনের মত আবার সেই গোবর জলের ব্যবস্থা করিল,—সে দিন তিন ঘণ্টা অন্তর ৫।৬ বার সেই ধারাণী দেওয়ার ব্যবস্থায় নীলকমল সম্পূর্ণ রূপে সুস্থতা লাভ করিল।

কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল,—অরুণা ছিল পূর্ণগর্ভা,—সেই দিনই তাহার প্রসব-ব্যথা উপস্থিত হইল। কে ধাই ডাকিতে যায়? তমালিনীর উপরই সে কাজের ভার পড়িল। তমালিনী ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিল। সমস্ত দিনমান গত হইল, রাত্রি আসিল। রাত্রি এক প্রহর, দ্বিপ্রহর করিয়া তৃতীয় প্রহর উপস্থিত হইল, অরুণা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, ধাত্রী তলপেটে তেল মাখাইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। অরুণার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। তখন তমালিনী একবার বাহিরে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি তেঁতুল চারার শিকড় তুলিয়া আনিয়া ধাত্রীকে বলিল;—'দেখ,—এইটি চুলে বাঁধিয়া দাও, এখনি প্রসব হইবে, কিন্তু সাবধান, প্রসব হইবামাত্র এইটি চুলের যে স্থানে বাঁধা হইবে—সেই স্থানটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে। দাও—চুলে বাঁধিয়া দাও —আর দেরী ক'রনা, এখনি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।

ধাত্রী বলিল—"ইহা সত্য নাকি? আমরা বুড়ি হইলাম,—আমরা তো এরূপ ঔষধের কথা কখনো শুনি নাই।"

তমালিনী বলিল,—"শোন নাই বেশ, এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহা করিয়া দেখ, এখনি সন্তান হইবে। জান তো আমার বাবা লোকনাথ বদ্দির কাছে চাকরি ক'রতেন,—আমি তাঁ'র কাছেই এ ওষুধ শিখেছি। না —আর দেরী ক'রনা। বড় কষ্ট পাচ্ছে, শিগ্‌গির চুলে বাঁধিয়া দাও।"

ধাত্রী ভাবিল ক্ষতি কি? এই ভাবিয়া সে অরুণার চুলে সেই তেঁতুল চারার শিকড় বাঁধিয়া দিল।

আশ্চর্য্য—সমস্ত দিন, সমস্ত রাত যে অসহ্য বেদনায় অরুণা ছটফট করিতেছিল, শিকড়টি বাঁধিয়া দিবার অতি অল্পক্ষণ পরেই তাহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সকলেই ভাবিল মন্ত্রৌষধি বটে।

অরুণার জননী পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—তমালিনীকে না তাড়াইলে সে জীবিতই থাকিবেনা,—স্বামীর দাওয়া হইতে পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, উপস্থিত ঘটনায় সে প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেল।

এই সময়—বাহির হইতে কে ডাকিল—"নীলু খুড়ো বাড়ী আছ?" তমালিনী শুনিল তাহার পরিচিত স্বর! আবার ডাকিল—"খুড়ো বাড়ী আছ!" তমালিনী—বুঝিল তাহার হারাণরতন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, যিনি, তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব তিনি ভিন্ন এরূপ সুকণ্ঠে এ ডাক আর কেহ ডাকিতে পারেননা। যা হোক তমালিনী নীলকমলকে বলিল,—"খুড়ো, তোমায় কে ডাকিতেছে।"

নীলকমল, অরুণার প্রসব বেদনার গোলযোগে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সারা রাত্রি বসিয়াই ছিল, এই সময় তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে ছিল। তমালিনী তাহার গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিল—"খুড়ো তোমায় কে ডাকিতেছে।"

নীলকমল বলিল—"এত রাত্রে কে আমাদের বাড়ী! যা' হোক দ্বারটা খুলিয়া দিয়া এস।"

অন্য সময় হইলে তমালিনী হয়তো বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে দ্বিধা করিতনা। এ বাড়ীতে আসিয়া সে তো দাসীর অধম হইয়াছিল—ধাত্রীকে ডাকিতে পর্য্যন্ত সে যে গিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাঠকগণ একটু আগেই পাইয়াছেন। কিন্তু এখন সে দ্বার খুলিতে যাইতে পারিল না। সে গলার স্বরেই চিনিয়াছিল, তাহার দীর্ঘকালের হারাণ স্বামী এতকাল পরে ফিরিয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করিতে আসিয়াছেন সেই জন্য সে দ্বার খুলিতে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া নীলকমলকে বলিল,—"এত রাত্রে—কে আসিয়াছে জানিনা খুড়ো? আমার দ্বার খুলিতে ভয় করিতেছে, তুমিই একটু কষ্ট করিয়া গিয়া খুলিয়া দাও।"

নীলকমল বলিল—"আচ্ছা।" তাহার পর একটি কেরোসিনের ডিবে হাতে করিয়া আস্তে আস্তে গিয়া দ্বার খুলিয়াই সে চীৎকার করিয়া বলিল—"ওগো গিন্নি, শিগ্‌গির আর একটা আলো জ্বালো। আমাদের তমালিনীর স্বামী —অধর এসেছে।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে অধরকে লইয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তমালিনী তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ার এক পার্শ্বে গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া থাকিল।

নীলকমল, অধরকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, এতদিন কোথায় ছিলে।—আমরা যে তোমার আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম বাপ! আজ তুমি কোত্থেকে এলে?"

অধর উত্তর করিল—"সে অনেক কথা খুড়ো, সব পরে বলিব। এক কথায় বলিয়া রাখি,—আমি তো গিয়াছিলাম চাকুরি করিতে, কিন্তু যে চাকুরি পাইয়াছিলাম,—তাহাতে ফিরিয়া আসিয়াছি তোমাদেরই আশীর্ব্বাদে। আমাকে কুলীর আড়কাটীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল খুড়ো,—আমি

ঝাড়কাটির হাতে বিক্রয় হইয়া আসামে চালান হইয়া গিয়াছিলাম,—এখন পাঁচ বৎসর পরে মেয়াদ ফুরাণয় দেশে আসিয়াছি।” এই বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলকমল নিজের বস্ত্রাঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া বলিল—‘যা হোক বাবা, রক্ষা পাইয়াছ, এই ঢের!—আহা তমালিনীমায়ের আমার, তোমার জন্য না কত কষ্টই ভোগ করিতে হইয়াছে, আর এমন কর্ম্ম করো না বাবা,—চাষার ছেলে,দেশ থেকে চাষ বাস কর—সুখে থাক, এই আশীর্ব্বাদই করি।

রসের কথা

(কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এম, আর, এ-এস্)

রসের আর একটী নাম পারদ। সংসাররূপ সমুদ্রের যন্ত্রণার নিবৃত্তি স্বরূপ পার প্রদান করে বলিয়াই ইহাকে পারদ বলে। “রসেশ্বর সিদ্ধান্ত” প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ ও গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য, গোবিন্দ নায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালী, কাপালী, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণ পারদ রস দ্বারা দিব্যদেহ সম্পাদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেন। পরম তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি না হইলে মুক্তি হয় না। সমাধি তাহার প্রধান উপায়, কিন্তু এই দেহে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, তাহার কারণ প্রথমতঃ এই দেহ শ্বাসকাসাদি নানা রোগের আশ্রয়, বিনশ্বর এবং সমাধিকরণ ক্লেশ সহনে অশক্ত, দ্বিতীয়তঃ বাল্যাবস্থায় ধীশক্তি জন্মে না, যৌবনাবস্থা বিষয় রসাস্বাদে ব্যগ্র থাকে এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিবেক না হইলে তৎপরেই পতন হইয়া যায়। সুতরাং দেহে সমাধি নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য প্রথমতঃ পারদ রস দ্বারা দিব্যদেহ সম্পন্ন হইলে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। সেই জন্যই রসেশ্বর দর্শন বলিয়াছেন—

‘আয়তনং বিদ্যানাং মূলং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষনাং’ ইহা সর্ব্ববিদ্যার আধার স্বরূপ। পারদ রস অন্যান্য রস অপেক্ষা উত্তম বলিয়া রসেন্দ্র বা রসেশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আদিদেব মহেশ্বরের দেহনিঃসৃত রস হইতে এই মহারস পারদের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কারণ ইহাকে রস বলে।

পৌরাণিক আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায়, একদা হিমালয়শৈলে হরগৌরী প্রীতি প্রফুল্লিতচিত্তে পরস্পর জিগীষা প্রণোদিত হইয়া সম্ভোগক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উত্তমসম্ভোগে ত্রিলোকের সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, দেবগণ সেই সংসর্গ হইতে তারকাসুরহন্তা পুত্রের আকাঙ্খা করিয়া তাঁহাদের সম্ভোগ নিবৃত্তির জন্য অগ্নিকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, অগ্নি কপোতরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া, হিমালয়-কন্দরে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের কামলীলা অবলোকন করিতে লাগিলেন। শম্ভু সেই কপোতরূপী অগ্নিকে পক্ষিবৎ অকুক্ক না দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অতি লজ্জিত হইয়া সম্ভোগক্রিয়ায় বিরত হইলেন। নিবৃত্ত হইবামাত্র তাঁহার শুক্র স্খলিত হইল; তখন শূলপানি সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া অগ্নির মুখে নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি অত্যন্ত দাহপীড়িত হইয়া গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলেন, গঙ্গাও তৎস্পর্শে দাহার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অতিভারবশ হেতু সেই শুক্র অগ্নির

মুখ হইতে অধোগামী হইয়া, তাঁহার মলাশয় হইতে সিদ্ধিপ্রদ ধাতুরূপে ভূমিতে পতিত হওয়ায় শত যোজন গভীর পাঁচটী কূপের সৃষ্টি হইল। তদবধি সেই কূপস্থ শম্ভুশুক্র ক্ষেত্রভেদানুসারে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া, রস, রসেন্দ্র, সূত, পারদ ও মিশ্রক এই পাঁচটী নামে পরিচিত হইল।

ইহা পৌরাণিক বার্ত্তা। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, শিব যেমন শিবময় অর্থাৎ নিত্য মঙ্গলময় এবং নিত্য, তদঙ্গসম্ভূত পারদও জীবনদায়ক ও নিত্য, বনৌষধির তুলনায় দেখা যায় যে, উহা বাস্তবিক নিত্য ও অব্যর্থ। পারদ, কজ্জলী, হিঙ্গুল, স্বর্ণসিন্দুর প্রভৃতি যে কোনরূপেই বিপরিণতি হউক বা যে কোন পদার্থের সহিতই মিশ্রিত হউক, পুনরায় পাতনযন্ত্রের সাহায্যে আবার স্বীয়রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। সেই জন্যই উহা নিত্য এবং শিববীর্য্য বলিয়া আখ্যাত।

পারদের পর্য্যায়ক শব্দ

রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজ, রসলেহ, রসোত্তম, সূতরাজ, চপল, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্রি লোকেশ, দুর্দ্ধর, প্রভু, রুদ্রজ, হরতেজ, রসধাতু, অচিন্ত্যজ, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়ণশ্রেষ্ঠ, যশোদ, সূতক, সিদ্ধধাতু, পারত, হরবীজ, শিববীর্য্য, শিবাহ্বয়, প্রভৃতি নাম রাজ নির্ঘণ্ট, শব্দরত্নাবলী, হেমচন্দ্র, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই নামগুলির দ্বারাই পারদের উৎপত্তি, প্রভাব, ও মহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

পুস্তক পরিচয়

আয়ুর্ব্বেদ রত্নাকর—কবিরাজ রাখাল চন্দ্র সেন এল, এম, এস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ২৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত। পুস্তক খানিতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইতে চিকিৎসার সকল কথাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। সমস্তই বাঙ্গলায় লিখিত, এজন্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকিলেও এই পুস্তক পাঠে সকলেই আয়ুর্ব্বেদের অনেক কথাই জানিতে পারিবেন। যে সকল আধুনিক রোগ আয়ুর্ব্বেদে নাই এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বহুল আয়াস স্বাকার করিয়া যে সকল রোগের তথ্য ও ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, সে গুলিও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের উপযোগিতা বাড়িয়াই গিয়াছে, সাধারণ লোকে সে গুলি পড়িয়া বিশেষ উপকারই পাইবেন। এরূপ গ্রন্থের প্রচলন এখনকার দিনে যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। আমরা এ পুস্তক পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট, অথচ মূল্য বেশী নহে, মাত্র ১॥০ দেড় টাকা। সকল গৃহস্থেরই ঘরে ঘরে এ পুস্তক থাকিলে অনেক সময় উপকারই হইবে।

ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য—কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীভুবন মোহন শর্ম্মা (সেন) প্রণীত। প্রথম সংস্করণ। ২৯।২ চাউলপটি লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে শ্রীচুণীলাল রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। হিন্দুর প্রাতরুত্থান মন্ত্র হইতে সকল প্রকার সন্ধ্যাবিধি, পৌরাণিক পূজাপদ্ধতি হোম, স্তোত্র ও নামপরিচয়ের মূলশ্লোকগুলি বঙ্গানুবাদ সহ এই পুস্তকখানি লিখিত। ভক্তিই ব্রহ্ম লাভের প্রথম সূত্র এবং কর্ম্মযোগ ভক্তিবৃদ্ধির উপায়। ব্রহ্মই পুরুষ ও প্রকৃতি। বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং তীর্থপর্য্যটনাদি

দ্বারা এই দিব্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সন্ধ্যা, পূজা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনারই সোপান। এই গ্রন্থে হিন্দুর সেই ব্রহ্মোপাসনারই সহায়তা করিবে। ভুবন বাবু বিলাত প্রত্যাগত, কিন্তু আচারবান স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু। বিলাত হইতে ফিরিয়া বিলাতী ভাবে মাথা না বিগড়াইয়া হিন্দুধর্ম্ম সাধনার জন্য তিনি যে এরূপ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। ভুবন বাবুর জয় হউক। এ গ্রন্থ সকল হিন্দুরই উপকারে আসিবে।

স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য বিধান।—২য় সংস্করণ। ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি প্রণীত। মূল্য চারি আনা। বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার সাহেব কর্ত্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। স্বাস্থ্য রক্ষার অনেক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় এই পুস্তকে সহজ কথায় লিখিত হইয়াছে। আমাদের এই রোগপীড়িত বঙ্গদেশের সকল প্রাথমিক স্কুলেই এই পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। বালক বালিকাদিগের হস্তে এই পুস্তক প্রদান করিয়া তাহাদের কুসুমসুকুমার প্রাণে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ সকল বিধিবদ্ধ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে তাহারা অনেক সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারিবে।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেন কবিরত্ন)

রক্ত বমনে—যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৮০ আনা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

হিক্কায়—(১) যষ্টিমধু চূর্ণ—মধুর সহিত অথবা পিপুল চূর্ণ চিনির সহিত বা শুঁঠ চূর্ণ—গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে হিক্কা নিবারিত হয়।

পিপুল, আমলকী ও শুঁঠ প্রত্যেকটি /০ আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবনে হিক্কা নিবারিত হয়।

আমবাতে—পুনর্নবার কাথে শঠী ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমবাত ভাল হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—গোক্ষুরবীজের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

শ্বিত্র কুষ্ঠে—শোধিত গন্ধক, শোধিত হিরাকস, হরিতাল, চিতা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত করিয়া শ্বিত্র কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

কুষ্ঠে—ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠে উপকার দর্শে।

দদ্রুরোগে—(১) কালকাসুন্দার মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ভাল হয়।

(২) সোনালুর (আরগ্বধ) পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

ক্রিমিতে—খেজুর পাতার কাথ মধুর সহিত সেবনে ক্রিমি ভাল হয়।

রক্তপিত্তে—অর্জ্জুন ছাল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল অথবা অর্জ্জুন ছালের রস বা কাথ পান করিলে রক্ত পিত্তের উপশম হয়।

শ্বাসে—অশ্বগন্ধা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে শ্বাস নিবারিত হয়।

মূত্রাঘাতে—অশোক বীজ একটী, শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত প্রস্রাব নিবারিত হয়।

অনিদ্রায়—কুলেখাড়ার মূলের কাথ পান করিলে যাহার নিদ্রা হয় না তাহার সুনিদ্রা হয়। ইহার মূল শিরা দেশে বন্ধন করিলে সুনিদ্রা হয়।

উপদংশে—করবী পত্রের পত্র সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা উপদংশের ক্ষত ধৌত করিলে বিশেষ ফল হয়। করবী পত্র জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশে উপকার হয়।

গ্রহণীতে—ধলআঁকড়া মূলের ছাল ৩ ভাগ ও আতইচ ১ ভাগ, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে গ্রহণী রোগ ভাল হয়।

মূষিকবিষে—ঐ ধল আঁকুড়া মূলের ছাল ছাগ মূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার মূষিক বিষ নষ্ট হয়

কুকুরবিষে—অঙ্কোট মূলের ছাল গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়

বিবিধ

বিদ্যালয়ে সাহায্য।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ৩৫০০ হাজার টাকা সাহায্য ভিন্ন capital গ্রাণ্ট হিসাবে কলিকাতা করপোরেসন এবৎসর আরও দশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইনডোর হাঁসপাতাল হইলে আরও পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। অতি শীঘ্রই ইন্‌ডোর হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা হইতেছে।

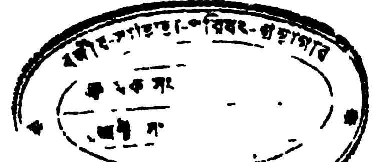
পরীক্ষার ফল।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষার ফল যাহা আমরা গত বারে বাহির করিয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন Supplimentary চরম পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্র ২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে :—(১) শ্রীমান—এস, ডি, ভল্লিও গুণশেখর ও শ্রীমান সুধাংশুভূষণ সেন। শীঘ্রই এই বিদ্যালয়ের কনভোকেসন করিয়া সকলকে ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

দাতব্য চিকিৎসালয়।—বাগবাজার ২।১ বি নং গ্যালিফ লেনস্থ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য প্রাপ্ত স্বাস্থ্যসমিতির উষাঙ্গিনী আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত কবিরাজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয় রোগী দেখিতে থাকেন। এখন হইতে অপরাহ্ণেও ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা করিয়া রোগী দেখা হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় সাধারণের উপকার বেশী রূপই হইবে। জানুয়ারী মাস হইতে এই চিকিৎসালয়ে মহিলাদিগের চিকিৎসারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গঙ্গাসাগর সেবা কার্য্য।—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়—হইতে ৮ জন ছাত্র গঙ্গাসাগরে রোগীদের—সেবা কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিল। এবারের কর্ম্মিগণের নাম ৪র্থ বর্ষের শ্রীমান সন্তোষ সেন, দেবেন্দ্র কর, উপেন্দ্র দাস, সুধীর গুহ এবং ৩য় বর্ষের শ্রীমান ফণিভূষণ দাস, মদনমোহন সান্যাল, রমেশচন্দ্র সেন ও দীনেশ বাগ্‌চি। ২৪ পরগণার ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে এই স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রেরিত হইয়া থাকে, এইজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ

কল্পতরু সারস্বত পরিষৎ। সেদিন কল্পতরু সারস্বত পরিষৎ কর্তৃক মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে সাজাহান নামক নাটকের অভিনয় মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে শ্রীমান সুশীলকুমার সেন বি,এস, সি—ঔরংজেবের অভিনয় যেরূপ দক্ষতার সহিত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। সাজাহান এবং আরও কয়েকটী ভূমিকাভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

কলিকাতায় বসন্ত। কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এ সময় আত্মরক্ষার জন্য টীকা গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রতিষেধক ঔষধ সেবনের জন্য কণ্টকারীর শিকড় চারি আনা—২।৩টি গোলমরিচের সহিত শীতল জলে বাটিয়া সপ্তাহে একদিন করিয়া সেবন করিলে ও উপকার পাওয়া যাইবে। উচ্ছে ও নিমপাতা—এ সময় প্রত্যহ সেবন করা কর্ত্তব্য। হরীতকীর আঁটি ছিদ্র করিয়া লাল সূতার সাহায্যে পুরুষের দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকের বাম হস্তে বাঁধিবার ব্যবস্থাও—শাস্ত্র উপদেশ অনুসারে করা কর্ত্তব্য।



"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

[illegible] বিজ্ঞানে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵৹ [illegible] ক সংখ্যার মূল্য ।৹ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর [illegible], বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হইলে তাঁহাকে [illegible] মূল হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা [illegible] র লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না [illegible] সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ [illegible] র খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের [illegible] পৌঁছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কাড কিম্বা টিকেট না পাঠাইলে [illegible] চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া [illegible] অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা [illegible] অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর [illegible] অসমর্থ।

[illegible] —সম্পাদক আয়ুর্ব্বিজ্ঞান—এই নামে পাঠাইবেন।
কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন।

বিজ্ঞাপন। কোন [illegible] করিতে হইলে, তাহা [illegible] মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। [illegible] তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন [illegible] বন্ধ করিবেন, [illegible] থাকিলে [illegible] লইবেন। [illegible] আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের [illegible] দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Re. 20 Per Page.

পূ পৃষ্ঠা	...	...	১৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	...	...	৯৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	..	...	৫৲

[illegible] এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের চার্জ স্বতন্ত্র।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
কলিকাতা বুক ডিপো—১০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

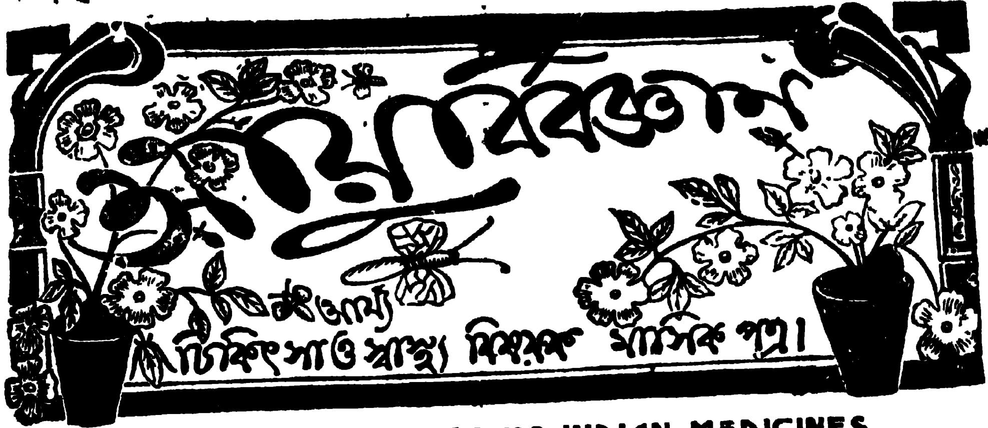
Printed and published by the Sub-Editor Sj. Bhupal Chandra Bhattacharjee B. A.
at the Gobordhon Press—204, Cornwallis Street, Calcutta.

Regd. No. C—1537.

১ম বর্ষ। আষাঢ় ১৩৩৪

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

৮ম সংখ্যা। June 1927



JOURNAL OF HEALTH AND INDIAN MEDICINES

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ [illegible] কবিরঞ্জন।

[illegible]

বার্ষিক মূল্য—৩।৵০

কার্য্যালয়—
১নং তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা।০

আষাঢ় মাসের সূচী।

Printed and pudlished by the the Sub-Editor Sj. Bhupal Chandra Bhattacharjee B. A.

a the Gobordhon Press—204, Cornwallis Street, Calcutta.

Cover Printed at the Carmichae lPress—59, Durga Charan Mitter Street. Calcutta.

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ	আষাঢ়, ১৩৩৪	৮ম সংখ্যা

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত [illegible])

(রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু সি, আই, ই, আই, এস, ও, এফ, সি, এস, [illegible])

ডিপ্থিরিয়া।—(Dipthena [illegible]) । যাঁহারা [illegible] রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহাদের মুখ বা চোখের [illegible] রোগীর থুথু বা কফ না প্রবেশ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই রোগের বীজ [illegible] রোগীর মুখ ও গলা হইতে লালা ও কফের সহিত [illegible] হয়। যদি কোন প্রকারে রোগবীজ মিশ্রিত কফ [illegible] ব্যক্তির চোখে বা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে [illegible] ঐ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২। এই রোগে রোগীর গলার মধ্যে ঔষধ [illegible] প্রয়োজন হয় এবং ঔষধ লাগাইবার সময় রোগী [illegible] কাশিতে থাকে। যিনি ঔষধ লাগাইবেন, তিনি [illegible] এক খণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা নাসিকা ও মুখ আবদ্ধ করিয়া [illegible] ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা করেন, নতুবা ঐ সময়ে তাঁহার মুখের মধ্যে রোগের বীজ বিক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৩। যে ঘরে রোগী থাকিবে, তাহার সন্নিকটে ছোট ছেলে [illegible] উচিত নহে। সুস্থ বালক [illegible] বাড়ী হইতে [illegible] করিয়া [illegible]।

[illegible]। [illegible] সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশের [illegible] বায়ু [illegible] মধ্যে [illegible]।

৫। [illegible] হইয়া বায়ুকে দূষিত না করে—তদ্বিষয়ে [illegible] সাবধান হইতে হইবে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, [illegible] সময়ে [illegible] উত্থিত গ্যাসের মধ্যে এই রোগের বীজ বিদ্যমান থাকে।

৬। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের দুগ্ধ ব্যবহার হইতে মনুষ্য-শরীরে রোগ সংক্রামিত হওয়া অসম্ভব নহে।

৭। এণ্টিটক্সিক সিরম্ নামক ঔষধ সুস্থ বালক

বালিকাদিগকে সেবন করাইলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় তাহারা নিরাপদে থাকিতে পারে।

প্লেগ (Plague) ১। বাটীর সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছিন্নাবস্থায় রাখিবে। যাহাতে বাটীর প্রত্যেক গৃহে সমস্ত দিন যথেষ্ট পরিমাণ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে—তাহার সুব্যবস্থা করিবে। অব্যবহার্য্য সামগ্রী ও আবর্জ্জনাদি বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং গৃহের মধ্যে ইঁদুরের গর্ত্ত থাকিলে উহা ইট ও সিমেণ্ট মাটী দ্বারা শক্ত করিয়া বুজাইয়া দিবে। ইঁদুর মারিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সাধন করিতে বিলম্ব বা আলস্য প্রদর্শন করিবে না।

২। মানুষের প্লেগ হইবার পূর্ব্বে ইঁদুরের প্লেগ হইতে দেখা যায়। যখন দেখিবে যে, বিনা কারণে বাটীতে ইঁদুর মরিতেছে, তখনই বুঝিবে, যে, উহারা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। এই লক্ষণ দেখিলেই অবিলম্বে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে এবং সমস্ত বাস গৃহ বিশোধক ঔষধ দ্বারা ধৌত করিয়া ও চূণ ফিরাইয়া, সমস্ত দরজা জানলা কিছুদিনের জন্য খুলিয়া রাখিলে পর তবে উহা পুনরায় বাসের যোগ্য হইবে। বাটীতে ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করিলে ফাঁকা জায়গায় চালা বাঁধিয়া কয়েক দিন বাস করিলে পরিবারস্থ কাহারো প্লেগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ; কিন্তু এরূপ অবস্থায় বিলম্ব করিয়া বাটী ত্যাগ করিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে।

৩। মৃত ইঁদুর কখনই হাত দিয়া স্পর্শ করিবে না। অজ্ঞতাবশতঃ মৃত ইঁদুর স্পর্শ করিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের প্লেগ রোগ হইয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে। মৃত ইঁদুর—চিমটার দ্বারা ধরিয়া ফাঁকা জায়গায় তাহার উপর কেরোসিন তেল ঢালিয়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। মৃত ইঁদুর কখনই রাস্তা ঘাটে ফেলিয়া দিবে না। যেখানে মৃত ইঁদুরের দেহ পতিত থাকে, তাহা ফিনাইল দ্বারা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ফেলিবে।

৪। প্লেগ রোগীকে স্পর্শ করিতে বা তাহার সেবা করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত যে সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন, প্লেগ সম্বন্ধেও তাহাই প্রতিপালন করা উচিত। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে, প্লেগরোগীর গৃহে প্রবেশ করিলে অথবা ইহাকে স্পর্শ করিলেই প্লেগ হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য বাটীতে কাহারো প্লেগ হইলে তাহার আপনার লোক ব্যতীত অপর সকলেই তাহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। এমন কি, মহামারীর প্রথমাবস্থায় অনেক স্থলে কোন কোন চিকিৎসককেও রোগীর চিকিৎসা করিতে পশ্চাৎপদ হইতে দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ধারণা অভিজ্ঞতার বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই ইঁদুরের দেহ [illegible] এক প্রকার পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা [illegible] শরীরে প্লেগ সংক্রামিত হইয়া থাকে। প্লেগ রোগী স্পর্শ করিলে উক্ত রোগ উৎপন্ন হয় না। তবে [illegible] মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে, প্লেগ রোগীকে স্পর্শ না করা উচিত এবং প্লেগ রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত ব্যক্তির দেহে যাহাতে কোনরূপ ক্ষত না হয় বা [illegible] না লাগে, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। প্লেগ-রোগীর নিউমোনিয়া (Pneumonia) হইলে, [illegible] থুথু বা কফ যাহাতে সুস্থ ব্যক্তির চোখে মুখে না লাগে—তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। এই উপায়ে [illegible] হইতে চিকিৎসকের শরীরে প্লেগ সংক্রামিত হইবার [illegible] নিতান্ত বিরল নহে। নিউমোনিয়াগ্রস্ত প্লেগ রোগীর নিঃশ্বাস ও কফ দ্বারা এই রোগের বীজ বায়ু মধ্যে [illegible] হয় ; সুতরাং এরূপ অবস্থায় যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহাদের এবিষয়ে সবিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

৫। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে পর অন্ততঃ [illegible] কাল তাহার পৃথক গৃহে বাস করা এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে না আসাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন রোগারোগ্যের পর ১০ দিন তাঁহাদের পৃথক হইয়া থাকিলে ভাল হয়।

৬। যে সকল স্থানে প্লেগ হইতেছে, তথা হইতে অন্যত্র বস্ত্র, শয্যা, পুস্তক বা শস্য রাখিবার থলিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। যে পোকার (Rat-flea) দংশন দ্বারা প্লেগ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারা এই সকল সামগ্রী দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে।

৭। প্লেগের সময় পায়ে মোজা ও জুতা দেওয়া থাকিলে, অনেক সময় উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়। এজন্য প্লেগের সময়ে কাহারও খালি পায়ে থাকা উচিত নহে।

৮। যাঁহারা প্লেগাক্রান্ত স্থানে থাকিবেন অথবা প্লেগ রোগীর চিকিৎসা বা শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহারা প্লেগের "টিকা" লইলে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময়ে এক প্রকার নিরাপদে থাকিতে পারিবেন। যদিও প্লেগের টিকার রোগনিবারণীশক্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি উহা দ্বারা সেই সময়ের মত আত্মরক্ষা এবং রোগের পরিব্যাপ্তি নিবারণ করিতে পারা যায়। সুব্যবস্থা পূর্ব্বক এই টিকা লইলে কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হয় না, অথচ যাঁহারা টিকা লইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ রোগে আক্রান্ত হন না অথবা আক্রান্ত হইলেও সহজে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্লেগের টিকা যে সময়োপযোগী ও উপকারী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা ইহার রক্ষণীশক্তি নিঃসন্দেহ রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। প্লেগের টিকা লইতে সাধারণ লোকে অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে, কিন্তু আশঙ্কা করিবার কোনো কারণ নাই।

৮। হাম, বসন্ত ইত্যাদি—১। এই সকল রোগ স্পর্শ দ্বারা, কাসির সময়ে কফ ও লালার দ্বারা অথবা বস্ত্র, শয্যা বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা রোগীর সেবা করিবেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর কাহারও (বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের) কদাচ রোগীর গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। অথবা রোগীর বস্ত্র বা শয্যাদির সংস্পর্শে আসা অকর্ত্তব্য। বাটীতে এই সকল রোগ দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ সুস্থ বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করা উচিত। যাঁহারা রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা একখানি মোটা চাদর গায়ে মুড়ি দিয়া গৃহের মধ্যে যাইবেন এবং বাহিরে যাইবার সময় ঐ চাদরখানি রোগীর গৃহের বাহিরে রাখিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। রোগীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় হস্তপদ সাবান-জলে উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত নহে।

২। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি বিশোধক ঔষধে নিমজ্জিত করিয়া পরে সাবান ও ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে কাচিয়া ধোপার বাটীতে পাঠাইবেন, নচেৎ সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল রোগ ধোপার বাটীর কাপড় দ্বারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, যতদিন না রোগী আরোগ্য লাভ করে, ততদিন ধোপার বাটীতে কাপড় দেওয়া, ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া এবং পরিবারস্থ কাহারো কোনো স্থানে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গমন করা নিষিদ্ধ ছিল। ইহাদ্বারা রোগের পরিব্যাপ্তি অনেকাংশে নিবারিত হইত। কিন্তু বস্ত্রাদি বিশোধক ঔষধ দ্বারা দোষশূন্য করিয়া ধোপার বাটী পাঠাইলে এই প্রাচীন প্রথার উপকারিতা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়।

৩। যে পরিবারের মধ্যে এই সকল রোগ দেখা দিবে, সেই বাটীর বালক-বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বিষয়ে অনবধানতা প্রযুক্ত বিদ্যালয় হইতে অনেক সময় হাম, পানবসন্ত প্রভৃতি রোগের পরিব্যাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। যে বাটীতে বসন্তরোগ দেখা দিয়াছে, সেই পরিবারের সকলেরই টিকা (vaccination) লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বাটীর মধ্যে যদি ১ মাসের শিশু সন্তানও থাকে, তথাপি তাহারও সেই সময়ে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিছুদিন পূর্ব্বে টিকা হইয়াছে বলিয়া এ সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা

কদাচ উচিত নহে। যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, তাহারা, এমন কি, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত টিকা লইলে, রোগের পরিব্যাপ্তি সবিশেষ নিবারিত হইয়া থাকে।

৫। এই সকল রোগে যখন "ছাল" উঠিতে থাকে, তখনই উহাদিগের সংক্রামকতা-দোষ প্রবল ও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্তি হইতে থাকে। অতএব সেই সময়ে সাবধান হওয়া উচিত। রোগীর গৃহের জানালা দরজায় কার্ব্বলিক এসিডের দ্রাবণে সিক্ত পর্দ্দা খাটাইয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা কার্ব্বলিক তৈল (১ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড্ ও ৯ ভাগ নারিকেল তৈল) উত্তমরূপে লাগাইয়া রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়, শরীরের ব্রণ-ক্ষতাদি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ক্ষতাদির দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রোগ-বীজও নষ্ট হয়, "ছাল" দেহ হইতে পৃথক হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না এবং গায়ে লাগিয়া বসিতে পারে না। সুতরাং রোগের পরিব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। রোগ আরোগ্য হইলে, যতদিন না সমস্ত ছাল উঠিয়া যায়, ততদিন রোগীকে সুস্থ ব্যক্তির সহিত মিশিতে হইতে দেওয়া উচিত নহে। কয়েকদিন স্নান করার পর সুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে কোনো আশঙ্কা থাকে না।

৭। বস্ত্র, শয্যাদি, রোগীর গৃহ ও গৃহসজ্জা পূর্ব্ব-কথিত প্রণালীতে উত্তমরূপে বিশোধন না করিলে রোগের পরিব্যাপ্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (ক্রমশঃ

চিকিৎসা-জগতে আয়ুর্ব্বেদের স্থান

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ)

প্রসঙ্গক্রমে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসার বিষয় এ অধ্যায়ে বলা যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণ বৈদ্যশাস্ত্রের আটটী অঙ্গ কল্পনা করিয়াছেন। যথা—শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন ও বাজীকরণ। এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেক অঙ্গের স্থূল বিবরণ—অঙ্গ বিশেষের নামকরণের দ্বারাই কতকটা বুঝিতে পারা যায়, তথাপি ভিন্নপন্থী ব্যক্তিগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সাধারণ ভাবে এস্থলে বর্ণনা করা যাইতেছে।

শল্যাঙ্গ—শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পাষাণ প্রভৃতির অবস্থান-নির্ণয়, উহাদের বহিষ্করণ-পদ্ধতি, যাতনার উপশম, নানা জাতীয় ব্রণের লক্ষণ, অবস্থানুসারে ব্রণের সংশোধন, সংশমন, ছেদন, পাচন ও রোপণের জন্য বিবিধ প্রকার যন্ত্রশস্ত্রের স্বরূপবর্ণনা, উহার প্রয়োগ পদ্ধতি, ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগে চিকিৎসা-বিধি, ভগ্ন বা বিচ্যুত অস্থি ও সন্ধিস্থানের প্রতিকার, গর্ভাশয়ে বিকৃতভাবে অবস্থিত অথবা মৃত সন্তানের বহিষ্করণবিধি, এবং এইরূপ অন্য কতকগুলি বিষয়ই শল্যাঙ্গের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

শালাক্য—যে আয়ুর্ব্বেদাঙ্গে মস্তক, শ্রবণ, নয়ন, ঘ্রাণ, রসনা, দন্ত, ওষ্ঠ, তালু ও কণ্ঠগত ব্যাধি সমূহের প্রতিবিধানবিধি বর্ণিত আছে, তাহাই শালাক্য অঙ্গ নামে অভিহিত।

কায় চিকিৎসা—সর্ব্ব দেহগত আম, পক্ক, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মূত্র, রক্ত প্রভৃতি আশয়গত রোগ সকলের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধি আয়ুর্ব্বেদীয় কায়চিকিৎসার বিষয়।

ভূতবিদ্যা—ভূতবিদ্যা অঙ্গে দেবাসুর, গন্ধর্ব্ব, রক্ষ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত মানসিক ব্যাধির উপশমের জন্য শান্তিকর্ম্ম, দেবার্চ্চন, বলি ও হোমাদির বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

কৌমার ভৃত্য—বালকদিগের রক্ষণবিধি, ধাত্রীর স্তন্যদোষের প্রতিকার ও শিশুরোগের চিকিৎসা—কৌমার ভৃত্য অঙ্গের বিষয়।

অগদ তন্ত্র—যে আয়ুর্ব্বেদাঙ্গে সর্প, কুক্কুরাদি জন্তুজনিত বিষ, ধুস্তুর ও অমৃতাদিজাত উদ্ভিজ্জ বিষ; শঙ্খমুক্ত, হরিতাল প্রভৃতি খনিজ বিষ অথবা পরস্পর সংযোগ জনিত বিষের বিষয় ও সেই সেই বিষ ভক্ষণ জনিত রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা উপদিষ্ট আছে—তাহাকে অগদতন্ত্র বলে।

রসায়ণ তন্ত্র—যে উপায় দ্বারা মানব অকাল কৃত জরাকে পরাজয় করিয়া চিরস্থায়ী যৌবন লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং আয়ু, বুদ্ধি, বল প্রভৃতির বিবর্দ্ধনকারী ভৈষজ্যনিচয় যে স্থলে বর্ণিত আছে, তাহাই আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন অঙ্গ।

বাজীকরণ—যে আয়ুর্ব্বেদীয় অঙ্গে ক্ষীণ শুক্রের বর্দ্ধন, দুষ্ট শুক্রের শোধন, বিশুদ্ধ শুক্রের উৎপাদন ও রক্ষণ এবং সুস্থজনগণের রমণশক্তির বর্দ্ধনোপায় বর্ণিত আছে, তাহাকেই বাজীকরণ বলে।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিকিৎসা-বিষয়ে যাহা কিছু আবশ্যক বলিয়া প্রণিধান করা যাইতে পারে, তৎ সমস্তই এই সমস্ত বিভাগের অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিভাগগুলি অবশ্য সাধারণ ভাবেই নির্দ্দেশ করা হইল, কারণ, ইহাদের প্রত্যেক বিভাগের পরিপূর্ণতার জন্য পৃথক্ পৃথক্ আনুষঙ্গিক বিভাগ বা উপবিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। আয়ুর্ব্বেদ-পারগ চিকিৎসক মাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। সাধারণ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এতৎসম্বন্ধে দিগ্‌দর্শনের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—উক্ত অষ্টবিধ অঙ্গের ভিতর কায়চিকিৎসাই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রধান অঙ্গ। যেহেতু অপরাপর অঙ্গগুলি তাহারই অধীন। প্রয়োজনের পার্থক্য হেতু কায়চিকিৎসার কতিপয় প্রত্যঙ্গ পরিকল্পিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা—এই দুইটীই প্রধান। আবার চিকিৎসা-ব্যাপার সম্পাদনার্থ যে সমস্ত ভৈষজ্য বস্তুর আবশ্যক, তৎসমুদায়ের পরিচয়ের জন্য "দ্রব্য বিজ্ঞান" ও তত্তৎদ্রব্যের গুণক্রিয়া বা আময়িক প্রয়োগ শিক্ষার নিমিত্ত "দ্রব্যগুণ"ও প্রত্যঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নিয়মে প্রত্যেক প্রধান অঙ্গেরই অনুরূপ প্রত্যঙ্গগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলে, বৈদ্যক শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইতে পারা যায়। প্রধান প্রধান বৈদ্যক তন্ত্রগ্রন্থে উক্ত অষ্টাঙ্গেরই সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্ত্রকারগণ কোনো কোনো তন্ত্রে কোন কোন অঙ্গকেই বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছেন। যেমন চরকসংহিতা—কায়চিকিৎসা প্রধান তন্ত্র। সুশ্রুত সংহিতা—শল্যাঙ্গ প্রধান তন্ত্র।

অতি প্রাচীন যুগে বৈদ্যশাস্ত্রে যে সমস্ত গ্রন্থের নাম নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়, সম্প্রতি সেই সেই গ্রন্থের অধিকাংশই লোপপ্রাপ্ত অথবা মানবদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। হয়ত সেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ কোন কোন দেশে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু প্রচারাভাবে তাহার অস্তিত্ব দ্বারা আমাদের কোনই উপকার প্রাপ্তির আশা করা যায় না। আজকাল বৈদ্যকশাস্ত্রের অনুশীলনে এবং বৈদ্যকচিকিৎসার অনেকেরই আগ্রহ ও তৎপরতা দেখা যাইতেছে, কিন্তু বৈদ্যকশাস্ত্রের গৌরব রক্ষার জন্য সেই শাস্ত্ররত্নগুলির উদ্ধারে কেহই প্রায় উপযুক্ত যত্ন লইতেছে না—ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের দুরপনেয় কলঙ্ক। বৈদ্যকচিকিৎসার মধ্যযুগেও অর্থাৎ যখন চক্রপাণিদত্ত, মাধবকর, বিজয় রক্ষিত, শিবদাস সেন,

ভদমিশ্র প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন বৈদ্যশাস্ত্রপারদর্শী ভিষকগণ আবির্ভূত হইয়া প্রাচীন আকরগ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলিকে শৃঙ্খলা-সহিত সমাবেশ করিয়া পৃথক পৃথক সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেকালেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এরূপ অধঃপতন হইয়াছিলনা বলিয়া প্রতীতি হয়, কারণ তাঁহাদের সংগৃহীত গ্রন্থসমূহে অথবা গ্রন্থব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা প্রাচীন যুগের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সুভাষিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাই। বৈদ্যকুলশিরোমণি মাধবকর-রচিত রোগনিদানসংগ্রহ গ্রন্থের টীকাকার বিজয়রক্ষিত কৃত ব্যাখ্যায় অনেক স্থলেই "ইতি হরিশ্চন্দ্র" "ইতি জেজ্জড়" "ইতি বাপ্যচন্দ্র" "ইতি ভালুকিতন্ত্র" "ইতি হারীত" "ইতি ঈশ্বর সেন" "ইতি বিদেহ" প্রভৃতি গ্রন্থও গ্রন্থকারের বচন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় আছে কিনা—তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কাহাকেও উদ্যোগী দেখি না। কাশীরাজ ধন্বন্তরি সমীপে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ যখন ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষি শিষ্যগণ উপস্থিত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন দিবদাস ধন্বন্তরি তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ আগ্রহের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং প্রতিভাশালী ঐ সমস্ত শিষ্যও আচার্য্যের উপদেশের মর্ম্ম যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন—ইহা সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত আছে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে একমাত্র সুশ্রুতসংহিতা ব্যতীত তৎসমকালীন প্রচলিত গ্রন্থরাজির মধ্যে আর একখানিও দৃষ্টিগোচর হয় না। এইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থরাজি কালপ্রবাহে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লব বশতঃ কতশত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান সময়ে আমরা মূলগ্রন্থের মধ্যে চরকসংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা—এই দুইখানি গ্রন্থই প্রচলিত দেখিতে পাই। এই ভাবে অমূল্য গ্রন্থ সমূহের অভাব হইলেও আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান সুদীর্ঘ যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া এই প্রকার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় অপ্রতিহত প্রভাবে এখনও যে দণ্ডায়মান আছে এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতেছে—ইহাতেই ইহার সারবত্তা, যৌক্তিকতা ও সাফল্য প্রমাণিত হয়। এ শাস্ত্রের প্রচারক মহর্ষিগণ অভ্রান্ত বাগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মল মানস-দর্পণে যাহা প্রতিবিম্বিত হইত, তাহা সত্য সিদ্ধান্তরূপেই লোকসমাজে গৃহীত হইত। আজ আমরা কালের অপ্রতিহত শক্তিতে অথবা অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় জগতের অশেষ কল্যাণকর স্বার্থত্যাগী ও চরিত্র সেই সব মহর্ষির আদিষ্ট কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতেছি। অধঃপতনের বিষয় আমার বক্তব্য নহে; দেশনায়কগণ অনেকেই এক্ষণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎপ্রতিবিধানে যত্নশীল হইয়াছেন।

আমাদের এই বহুপ্রসূ ভারতবর্ষ অনন্তরত্নপ্রসূ বলিয়াই কালে কালে নানাপ্রকার বিপ্লবের দ্বারা অভিভূত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে যখনই [illegible] প্রভুশক্তি সম্পন্ন হয়েন, তখনই তাঁহার দুর্দ্দমনীয় [illegible] বক্ষ এই ভারতের উপর নিপতিত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়াও ভারত যে বিশ্বসমাজে নিজ [illegible] দের ক্ষীণরেখাটী রক্ষিত করিয়া দণ্ডায়মান আছে, ইহাতেই তাঁহার অসীম প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজের [illegible] বিধায়ক ব্যাপারগুলি যেমন সমাজবিপ্লব বশতঃ [illegible] হইতে বিকৃত হইয়া আসিতেছে, বৈদ্যকচিকিৎসক [illegible] দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। চিকিৎসাদের মূলসূত্রগুলির প্রতি এখন অনেকেই অনুধাবন করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা যাহাতে রোগের উৎপত্তি না হয়, তৎপ্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুস্থ ও রোগী পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মাপন্ন।

রোগহীনতাই স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যহীনতাকেই রোগ বলা হয়। ফলতঃ যাহা কিছু শরীর ও মনের যন্ত্রণাদায়ক, তাহাই রোগ। মানুষের পক্ষে রোগের ন্যায় প্রবল রিপু আর নাই। রোগাক্রান্ত মানুষ নিজেকে অকর্ম্মণ্য এবং ব্যর্থজন্মা বলিয়া মনে করে; অধিক কি আত্মঘাতী হইয়াও অনেকে এই রোগযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। রোগ পরিচয় সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে সাধারণ ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে—

"দোষাণাম্ সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে"

দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, কফ—ইহাদের সমান ভাবে অবস্থানই আরোগ্য এবং বৈষম্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা তারতম্য হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এইরূপ সাধারণ চিকিৎসা-সূত্র কথিত হইয়াছে—যে ক্ষীণ ধাতুর বর্দ্ধন, বর্দ্ধিত ধাতুর হ্রাস এবং সমধাতুর পোষণ—ইহাই দেহরক্ষার মূলমন্ত্র। বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটী দোষের একটী বা দুইটী অথবা সমস্তই কুপিত হইয়া রোগের আরম্ভ হয়। প্রকুপিত দোষের প্রবলতা অনুসারে ব্যাধিসমূহকে বাতজ, পিত্তজ কফজ, দ্বন্দ্বজ অথবা ত্রিদোষজ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে দোষের প্রকোপ—প্রধান কারণ হইলেও রস রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুকেও গৌণ নিমিত্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। যে কোন দোষ প্রকুপিত হউক না কেন, এই সপ্তধাতুর মধ্যে কোন একটীকে আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত উহা রোগ-বিশেষের উৎপাদক হয় না। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ রস-রক্তাদি সপ্ত ধাতুকে দূষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দোষ ও দূষ্যের বলাবল অনুসারে ব্যাধিরও বলাবল প্রকাশ পায়। এই কারণেই একই রোগ পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত হইয়া পৃথক পৃথক অবস্থা প্রকাশ করে। উক্ত দোষ-দূষ্যের বলাবল নির্ণয় করিয়া যিনি স্বাভাবিক ধাতুসাম্য সংস্থাপন করিতে পারেন, তিনিই প্রধান বৈদ্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়া-ছেন:—

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥

যে সমস্ত ক্রিয়াদ্বারা দেহস্থিত ধাতুসমূহ সমভাবে অবস্থান করে, তাহাই রোগের চিকিৎসা এবং তাহাই চিকিৎসকের কর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

অজীর্ণ (Dyspepsia)

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ]

বাঙ্গালীর পরিপাকশক্তির বিষয় চিন্তা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, শতকরা ৯৯·৯৯ বাঙ্গালী উপযুক্ত খাদ্য হজম করিতে পারে না। প্রায় প্রত্যেকেরই কোন কোন বিষয় আছে। কাহারওবা কোষ্ঠকাঠিন্য, কাহারও বা তরল দাস্ত, কেহ বা কিছু খাইলেই অম্লাজীর্ণে কষ্ট পান, কেহ বা সম্যক্ হজম করিতে না পারিয়া অক্ষুধায় পীড়িত হন, আবার কেহ বা শূলে কষ্ট পাইতে থাকেন। এই-রূপ নানাভাবে প্রায় সকলেই কিছু না কিছু উদরের রোগে কাতর। আমাদের দেহের পুষ্টির প্রতি খাদ্যের যে কত প্রভাব তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। খাদ্য দরকার, তাহা বলিয়া কেবল কতকগুলি খাদ্য উদরে পাঠাইলেই চলিবে না। সে গুলিকে যথাযথ ভাবে পরিপাক করিয়া

শরীরের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। সম্যক্ পরিপাক না হইলে সেগুলি শরীরের উপযোগী না হইয়া বিষবৎ হইয়া শরীরের নানাপ্রকার অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত।

খাদ্যের আবশ্যকতা—সাংখ্য পণ্ডিতগণের মত—"ন পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে"—এমন একক্ষণ পাওয়া যায় না—যে সময়ে প্রকৃতি পরিণামাভিমুখী নহে। এই পরিণামবাদকে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পরিণামের তিনটী অবস্থা—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। কারণ সমূহ সমবেত হইলে তাহাকে উৎপত্তি, কারণ সমবেত কাল হইতে ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিতি এবং যে সকল কারণ সমবেত হইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সমস্ত কারণের সংযোগের ধ্বংসকে লয় বলে। এই নিয়মের কোথাও ব্যভিচার নাই। জীবদেহও এই নিয়মের অধীন। জীবও কতকগুলি কারণ-সমবায়ে উৎপন্ন। উৎপন্ন জীবের জড়ের স্থিতিতে একটু পার্থক্য আছে।

জড় উৎপন্ন হইবার প্রাক্‌ক্ষণে যে সকল কারণ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থিতি কালে সেই কারণ গুলিই তাহার সম্বল এবং সেই কারণ ধ্বংসে সে নষ্ট হয়। জীবের কিন্তু অন্য ভাব, জীব যে যে কারণসমবায়ে উৎপন্ন, মাত্র তাহাতে সীমাবদ্ধ নহে। সে বাহির হইতে কারণান্তর গ্রহণ করিয়া তাহার দেহের পরিপুষ্টি এবং রক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই জন্য জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি জন্মের সময় যেরূপ থাকে, ক্রমে তদপেক্ষা আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। দ্রব্যের বৃদ্ধির প্রতি ২টী কারণ পরিদৃষ্ট হয়—(১) উপাদানান্তর সংযোগ; (২) মারুতাধ্মান। জীবের এই দুইটীরই আবশ্যকতা, এই জন্য একদিকে যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসযোগে মারুতাধ্মান ব্যাপারটী চলিতে থাকে, অপরদিকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে উপাদানান্তর সংযোগ নিমিত্ত পঞ্চভূতাত্মক আহার গৃহীত হয়। এই আহার গৃহীত না হইলে দেহস্থ পঞ্চভূত পরস্পরের বিরোধী ক্রিয়াদ্বারা পরস্পরের উপঘাত করিয়া দেহের ধ্বংস সাধন করে। পঞ্চভূতের যে সদ্ভূত ক্রিয়া দ্বারা দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, খাদ্য দ্বারা সেই ক্রিয়ার সাম্য রক্ষিত হয় বলিয়া দেহের পুষ্টি-স্থিতি।

আহার দ্বারা শরীর রক্ষণ পোষণ—পঞ্চভূতাত্মক দেহের পুষ্টির ও স্থিতির জন্য পঞ্চভূতাত্মক খাদ্য গৃহীত হয়। খাদ্য শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই শরীরের সহিত একীভূত হইয়া যায় না। দেহের পঞ্চভূতের যেরূপ সংস্থান, খাদ্যে সেরূপ নহে। ডালে মাংসের উপাদান আছে। উপাদানগত সাম্য থাকিলেও আকৃতিগত পার্থক্য বিদ্যমান। এই ভুক্ত ডালই দেহের মাংসকে পুষ্ট করিবে। ডালে মাংসের উপাদান থাকিলেও মাংস হইতে বিসদৃশ, কারণ ইহার সহিত অপর দ্রব্যের সংমিশ্রণ আছে। ডালের যে অংশকে মাংসের উপাদান বলা হয়, তাহাও ঠিক মাংসের মত নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভুক্ত ডাল হইতে তাহার অসার অংশ বাদ দিয়া মাত্র মাংসের উপাদান গ্রহণ এবং ঐ উপাদানকে মাংস করিয়া লইয়াই ডাল সেবনের উদ্দেশ্য। ডা'ল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্য প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে ঐরূপ বলা যাইতে পারে।

তাহাহইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে (১) খাদ্যের মধ্যে দুইটী অংশ আছে, একটী সারাংশ ও অপরটী অসারাংশ (২) খাদ্যদ্রব্য হইতে শরীরের উপাদান সংগ্রহ (৩) উপাদানগুলিকে যথাযথ ভাবে প্রেরণ (৪) দেহ ধাতুর সহিত তাহাদের যথাযথ সংযোগ (৫) সংযোগ জন্য পুষ্টি

চিনি ও জল যদি একত্রে জ্বাল দেওয়া যায়, তবে হইলে উপরে যে মল সঞ্চিত হয়, তাহা চিনির অসার অংশ। খাদ্য হইতে মলাংশ পৃথক্ হয় এবং এই মলাংশ পৃথক করিবার জন্য পাকের আবশ্যক। খাদ্যের ভিতর সার ও অসারাংশ ওতঃপ্রোতঃভাবে সম্মিশ্রিত আছে। তজ্জন্য খাদ্যদ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত না হইলে, সার ও অসার বিযুক্ত হইতে পারে না। এই জন্য খাদ্যদ্রব্য যাহাতে উদরে সূক্ষ্মচূর্ণরূপে যায়—এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। জলসহ সিদ্ধ করিলে, দ্রব্যের সংহতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং

সহজে চূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা। ফলমূল না রাঁধিয়া খাওয়া হয়। সূর্য্যসন্তাপে তাহার সংহতি ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া কাঁচা অপেক্ষা নরম হয়। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্বয়ংপক্ক বা পাক করা দ্রব্যই সেবন করা উচিত। ইহারও একটী ব্যভিচার আছে। ডিম সিদ্ধ করিলে তাহার লালাবৎ যে পদার্থ—তাহা শক্ত হইয়া যায় এবং দুর্জ্জর হয়। এই পদার্থ যে যে জিনিষে থাকে, তাহা যত কম সিদ্ধ হয়, ততই সহজে জীর্ণ হয়। মাংস, ছানা প্রভৃতি খাদ্যে এই পদার্থ অধিক থাকে। কাঁচা ও শক্ত দ্রব্য যে আমরা একেবারে না খাই—এমন নহে। আমরা যত প্রকার খাদ্য খাই, তাহার গ্রহণ-বিধি অনুসারে তাহাদিগকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চারি ভাগে ভাগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে পাকা আম প্রভৃতি চোষ্য; অর্থাৎ চুষিয়া খাইতে হয়। চাটনি প্রভৃতি লেহ্য অর্থাৎ লেহন করিতে হয় বা চাটিয়া খাইতে হয়। দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি পেয় অর্থাৎ পান করিতে হয়। চর্ব্ব্য অর্থাৎ যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়। কাঁচা ও শক্ত জিনিষ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হয়, নতুবা সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত হয় না এবং সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত না হইলে সার ও অসার পৃথক না হইয়া মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। যদিও উদরপেশীর সঞ্চালনে খাদ্যের সংহতি অনেকটা ভাঙ্গে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাঙ্গিতে পারে না বলিয়া যে উদ্দেশ্যে খাদ্য গৃহীত হয়, তাহা সাধিত হয় না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে অল্পাহারেই আমরা অধিক সার গ্রহণ করিতে পারি বলিয়া এবং চর্ব্বণ কালে ক্লেদক ও শ্লেষ্মার কার্য্য চলিতে থাকে বলিয়া তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি ও পুষ্টি হয়, অধিক আহারের প্রয়োজন হয় না। অধিক আহার যে আমরা গ্রহণ করি, তাহার কারণ আমরা সম্যক চর্ব্বণ করি না বলিয়া সার কম হওয়ায় আমাদের তৃপ্তি হয় না। আজ অন্ন-সমস্যার দিনে যদি অল্পাহারেই তৃপ্তি এবং পুষ্টি পাই, তবে কেন এই সুখকর প্রথাটী অবলম্বন না করি?

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, চর্ব্বণ কালে বোধক ও ক্লেদক-শ্লেষ্মার কার্য্য চলিতে থাকে। এই দুই কফের জন্য অন্ন মধুর ও ফেনভাব প্রাপ্ত হয়, কফের দ্রবত্ব নিবন্ধন অন্নের সংঘাত ভিন্ন হয়, স্নেহত্ব নিবন্ধন ভুক্ত অন্ন স্নিগ্ধ ও মৃদুভাব প্রাপ্ত হয়। এই সময় আদানকর্ম্মা (আদান অর্থে গ্রহণ; গ্রহণ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার—সেই আদান কর্ম্মা অর্থাৎ যে ভিতরে প্রবেশ করায়) প্রাণবায়ু সেই অন্নকে কোষ্ঠে প্রেরণ করে। চর্ব্বিত অন্ন প্রথম যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার নাম আমাশয় (fundus of the stomach)। ভুক্ত অন্নের এই স্থানে এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যেরূপ রস বিশিষ্ট অন্ন সেবিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা মধুর, ফেনভাব প্রাপ্ত, ভিন্ন সংঘাত, অধিক স্নিগ্ধ ও মৃদু। এবম্বিধাবস্থা প্রাপ্ত অন্ন যখন নিম্নে কর্ষিত হয়, তখন হইতে তাহার পাক আরম্ভ হয়। এই সময় ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ পিত্তের সহিত সংযুক্ত হয়। বিদগ্ধ পিত্ত অম্লরস বিশিষ্ট। উক্তপিত্ত সংযোগে, সমান বায়ু কর্ত্তৃক মাংসপেশীর সঞ্চালন জন্য এবং সমান বায়ু দ্বারা বহ্নি সন্ধুক্ষণের ফলে যে তাপাধিক্য হয়, তাহা দ্বারা খাদ্য অনেকটা জীর্ণ ও অম্লরস বিশিষ্ট হয়। এইস্থান হইতেই শরীরে গ্রহণযোগ্য দ্রব দ্রব্য বায়ু এবং পিত্ত দ্বারা উপস্নেহন ন্যায়ে শোষিত হইতে থাকে। বিদগ্ধ পিত্তের কার্য্য যে পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, সেই স্থান হইতে উহা কিঞ্চিৎ জীর্ণ অন্ন অচ্ছপিত্ত অর্থাৎ স্বরূপস্থিত পিত্তের সহিত সংযুক্ত হয়। অচ্ছপিত্তের ক্ষার, লবণ, তিক্ত, আমগন্ধ ও উষ্ণ—এই কয়টী গুণ। ইহার ফলে স্নিগ্ধ দ্রব্যগুলি পরিপাক প্রাপ্ত হয়। স্নিগ্ধ দ্রব্য বলিতে ঘৃতাদি ও মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সকলকে বুঝায়। এখানেও যেমন শরীরের গ্রহণোপযোগী হইতেছে, তাহাও পূর্ব্ববৎ উপস্নেহন ন্যায়ে গৃহীত হইতেছে। এই স্থান পর্য্যন্তই পিত্তের ক্রিয়া চলে এবং এই স্থানেই পাক শেষ হয়, ভুক্তদ্রব্যও হৃতসার হয়। যেখান হইতে বিদগ্ধ পিত্তের কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই স্থল হইতে এই পর্য্যন্তকে পচ্যমানাশয়, গ্রহণী বা পিত্তধরা কলা বলা হয়। আবার সমস্ত স্থলটীকে আমাশয়ও বলা হয়,

"যত্রাহারো বিপচ্যতে" চরক বিমান স্থান, ২য় অধ্যায়। এইরূপে শোষিত হইতে হইতে ক্রমশঃ তিক্তপিত্ত সংযোগে তিক্ত ভাব প্রাপ্ত হয় এবং কিঞ্চিৎ দ্রব অন্ন পক্বাশয়ে নীত হইলে তাহার নিঃসার দ্রবাংশ শোষিত হয় এবং বায়ুর আধিক্য হয়। এই সময়ে দ্রবাংশ শোষিত হইয়া পরিপিণ্ডিত মল রূপে পরিণত হইয়া, অপান বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া উণ্ডুকে অর্থাৎ মলভাণ্ডে প্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দিয়া বহির্গত হয়। এই প্রণালীতে আমাদের পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হয়। শোষিত দ্রব্যকে অন্ন রস বলে। ঐ অন্নরস শোষিত হওয়ার পর হৃদয় হইতে সর্ব্ব দেহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শরীরের ভিতর নিরন্তর যে ধাতুপাক চলিতেছে, তাহার ফলে শরীরের নানা জাতীয় যে ক্লেদ সঞ্চিত হয়, সেই সকল ক্লেদের সহিত ঐ অন্নরস মিশ্রিত হয়। এই সময়ে ইহার এক প্রকার পাক চলিতে থাকে, সেই পাকে সার ও অসার বিযুক্ত হয়। ক্লেদযুক্ত অসার দ্রবাংশ ইহার মল। এই মলাংশ বস্তি মার্গে নীত হইয়া মূত্ররূপে বহির্গত হয়। মল বিমুক্ত অন্নরসকে রসধাতু বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই পর্য্যন্ত যে ব্যাপার সাধিত হয়, তাহার নাম অন্ন পাক। ইহার পর ধাতু পাক ও শরীর পোষণ আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বোক্ত অন্নপাক প্রণালী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, চর্ব্বণ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু—এই গুলির যথাযথ সন্নিবেশ নিমিত্ত আমাদের পাক ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহার সহিত আর একটী কথা আছে—সেটী আহারের মাত্রা। উপযুক্ত মাত্রায় আহার জীর্ণ হয়। অগ্নি শক্ত্যনু-সারে খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ হয়। অধিক মাত্রায় আহার করিলে অগ্নি তাহা জীর্ণ করিতে পারে না। খাদ্যের কি প্রকার মাত্রা হওয়া উচিত—এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে, কারণ সকলের অগ্নি তুল্য নহে। প্রকৃতিভেদে অগ্নির তারতম্য দেখা যায়। সান্নি-পাতিক প্রকৃতি সমমাত্রায় খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে, কারণ তাহার সমাগ্নি। বাতপ্রকৃতির অগ্ন্যধিষ্ঠানে বাতা-ধিক্য নিবন্ধন তাহার বিষমাগ্নি, সেই জন্য তাহার বিষম পাক হয়, অর্থাৎ কখন সম্যক্ পাক হয়, কদাচিৎ হয় না; আবার কতকাংশ পাক হয় এবং কতকাংশ হয় না। পিত্তপ্রকৃতির অগ্ন্যধিষ্ঠানে পিত্তাধিক্য নিবন্ধন তাহার তীক্ষ্ণাগ্নি এবং সে সর্ব্বাপচার সহ অর্থাৎ প্রভূত ভোজন করিলেও তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। কফ প্রকৃতির অগ্ন্যধিষ্ঠানে শ্লেষ্মাধিক্য নিবন্ধন তাহার মন্দাগ্নি; সেই জন্য সে অল্পাহার করিলেও সম্যক্ জীর্ণ হয় না এবং নিরন্তর অজীর্ণজন্য কষ্টভোগ করে। এই জন্য প্রকৃতিভেদে মাত্রার ভেদ করিতে হয়। বয়সভেদেও মাত্রার ভেদ আবশ্যক। একজন যুবক যে পরিমাণে খাইয়া হজম করিতে পারে, একজন বৃদ্ধ বা বালক তাহা পারে না। বাল্যকালে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকে বলিয়া, অগ্নি অল্প থাকে, এবং বৃদ্ধ বয়সে বায়ুর আধিক্য হয় বলিয়া অ... হইয়া যায়। এইরূপে কালভেদেও মাত্রার ... হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতি, বয়স ও কাল ভেদে খাদ্যের মাত্রার ভেদ করিতে হয়। এই ... উক্ত হইয়াছে—"যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রা প্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি" চরক সূত্রস্থান ৫ম অধ্যায়। অর্থাৎ যে পরিমাণ আহার করিলে যাহার শরীর ভাব-প্রকৃতির কোন পীড়া উৎপাদন না করিয়া যথাকালে জীর্ণ হয়, তাহাই তাহার উপযুক্ত আহার মাত্রা জানিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন খাদ্যপ্রকৃতিও বিচার্য্য। খাদ্যদ্রব্যকে গুরু ও লঘুভেদে দুই প্রকার নির্দ্দেশ করা হয়। যে দ্রব্যে পার্থিব ও আপ্যাংশ অধিক, সে দ্রব্য স্বভাবতঃ গুরু অর্থাৎ সেই দ্রব্যের দ্বারা যদি উদর পূর্ণ করা যায়, তবে সহজে হজম হয় না; এবং ... অগ্নি ও আকাশ-গুণবহুল দ্রব্য লঘু। সেই দ্রব্যের একটু মাত্রাধিক্য হইলেও সহজে হজম হইয়া যায়। দ্রব্য ... সংস্কার অর্থাৎ পাকদ্বারা গুরু বা লঘুতে পরিণত হয়। যেমন চাউল দ্বারা পিষ্টক তৈয়ার করিলে তাহা গুরু, আবার সেই চাউলকে মুড়িতে পরিণত করিলে তাহা ...

হইয়া থাকে। গুরুদ্রব্য ভোজন করিতে হইলে অর্দ্ধ-সৌহিত্য অর্থাৎ আধপেটা এবং লঘু দ্রব্য সেবন করিতে হইলে তৃপ্তি অর্থাৎ পেট ভরিয়া খাইতে হয়। দ্রব্যের লঘু-গুরু বিচার না করিয়া আহার করিলেই যে আহার জন্য সুফল পাওয়া যায়, তাহা নহে।

আহারের সম্যক ফল পাইতে হইলে, প্রকৃত্যাদি যে আট প্রকার আহারবিধি আছে, তাহাদের অনুসরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে (১) প্রকৃতি শব্দের অর্থ স্বভাব। ভোজ্য-দ্রব্যের গুরুত্ব, লঘুত্ব, স্নিগ্ধত্ব, রুক্ষত্ব, শীতত্ব, উষ্ণত্ব প্রভৃতি গুণ সকলের স্বাভাবিক সংযোগ। (২) করণ শব্দে সংস্কার অর্থাৎ গুণান্তরাধান বুঝায়। যে দ্রব্যে স্বভাবতঃ যে সকল গুণ আছে, সংস্কার দ্বারা তাহাতে অন্য গুণ আধান করার নাম—করণ বা সংস্কার। জল, অগ্নি, শৌচ, মন্থন, দেশ, কাল, ভাবনা, কালপ্রকর্ষ এবং পাত্র,—এইগুলির দ্বারা দ্রব্যের গুণান্তরাধান হয়। (ক) জল—কাঁচা মুগের ডাউল বা ছোলা ভিজাইয়া খাওয়ার প্রথা আমাদের দেশে বিদ্যমান আছে; ঐ দ্রব্যগুলি স্বভাবতঃ রূক্ষ ও কঠিন, কিন্তু জলে ভিজানর জন্য মৃদু ও মসৃণ হয়। (খ) অগ্নি—অগ্নিসংস্কারে মৃদু ও মসৃণ দ্রব্যগুলি রূক্ষ ও কঠিন হয়, যেমন চিড়াভাজা। (গ) শৌচ—জল দিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া, মলসংপৃক্ত দ্রব্য এইরূপ শৌচের দ্বারা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয়। (ঘ) মন্থন—দধিকে মন্থন করিয়া স্নেহাংশ উদ্ধৃত করিয়া লইলে, আমরা স্নেহবহুল মাখন ও স্নেহহীন ঘোল পাই। মাখন দধি অপেক্ষা অধিকতর স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য, আর ঘোল দধি অপেক্ষা দ্রববহুল ও স্নেহহীন। (ঙ) দেশ—শীত-প্রদেশে দ্রব দ্রব্য জমিয়া যায় এবং উষ্ণদেশে গলিয়া যায়। (চ) কাল সম্বন্ধেও এই প্রকার এবং কালেই দ্রব্যের উৎপত্তি ও পরিণতি হয়। পক্কে যে গুণ, কাঁচায় তাহা নাই এবং কাঁচায় যে গুণ, পক্কে তাহা নাই। যেমন বসন্ত কালের কাঁচা আম ও গ্রীষ্মের পাকা আম তুল্যগুণ বিশিষ্ট নহে। একই দ্রব্যের এবম্বিধ গুণভেদের প্রতি কালেরই কারণতা। (ছ) ভাবনা—দ্রব্যের সহিত কোন দ্রব পদার্থ দিয়া রৌদ্রে শুকানোর নাম ভাবনা; যেমন কাঁচা আম খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার সহিত মসলার গুঁড়া দিয়া কাঁচা তৈলে ভিজাইয়া দিয়া রৌদ্রে শুকান হয়; তৈল শুষিয়া গেলে আবার তৈল দেওয়া হয়। (জ) কাল-প্রকর্ষ—কিছুকাল থাকিলে দ্রব্যের যে গুণান্তর হয়, যেমন চাউল, গুড় ও জল একত্র রাখিলে কিছুদিন পরে তাহাতে মদ্যের উৎপত্তি হয়। (ঝ) ভাজন—পাত্র, যেমন তাম্র পাত্রে খাদ্য পাক করিলে সেই খাদ্য বিষে পরিণত হয়। সেইরূপ কাংস্যপাত্রে দশ রাত্রিস্থিত ঘৃত—বিষে পরিণত হয়।

(৩) সংযোগ—দুই বা ততোধিক দ্রব্যের একত্র মিলন। এই মিলন জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে, দ্রব্য তাহাদের স্বকীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিশেষ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। যেমন ঘৃত ও মধু বা ক্ষীর, মৎস্য ইত্যাদি। কিংবা অম্ল ও লবণের একত্র মিশ্রণ। (৪) রাশি—পরিমাণ, যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিলে আমাদের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হয় অথচ পাচকাগ্নির কোন ব্যাঘাত জন্মে না, সেই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। মাত্রা প্রকরণে ইহা আলোচিত হইয়াছে। (৫) দেশ—দ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচার-স্থানকে দেশ বলে, স্থানভেদে একই দ্রব্য ভিন্ন প্রকার হয়; যেমন বঙ্গদেশে যদি কমলালেবুর গাছ করা যায়, তাহাতে যে ফল হয়—তাহা অত্যন্ত টক হইয়া থাকে। দেশ-বিচারের আর একটি উদ্দেশ্য আছে। দেশকে আনূপ, জাঙ্গল ও সাধারণ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে আনূপদেশে কফাধিক্য, জাঙ্গলে বাতাধিক্য এবং সাধারণে ত্রিদোষ সাম্য থাকে। এইজন্য দেশসাত্ম্য খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। দেশ বলিতে যে স্থানে বসিয়া আহার গৃহীত হয় তাহাকেও বুঝায়। খাদ্য পরিপাকের প্রতি মনের প্রভাব প্রবল। সুমনা হইয়া খাদ্যগ্রহণ করিলে সহজে হজম হইয়া যায়। স্থান যদি পবিত্র হয়—সেই স্থানে মনও প্রফুল্ল থাকে। অপবিত্র স্থানে মনের উদ্বেগ জন্মে;

এবং ঘৃণার সহিত আহার করিতে হয় বলিয়া তাহাতে পরিপাকে ব্যাঘাত জন্মে এবং আমদোষের সঞ্চার হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে—"ভোক্তারং বিজনে রম্যে নিঃসম্পাতে শুভেশুচৌ। সুগন্ধী পুষ্পরচিতে সমেদেশেহথ ভোজ-যেৎ" সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ভোজন করা কিংবা ভোজনের ঘরকে ঠাকুর ঘরের মত করিয়া রাখা উচিৎ। (৬ **কাল**—যে সময় আহার গৃহীত হয়। নিত্যগ ও আবস্থিকভেদে কাল দুই প্রকার। তন্মধ্যে নিত্যগ কাল—ঋতু সাত্ম্যাপেক্ষ অর্থাৎ যে ঋতুতে যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। আবস্থিক কাল অবস্থানু-রূপ; বয়স ও ব্যাধ্যপেক্ষ। বয়স যেমন—বাল্যে ও বার্দ্ধক্যে দাঁত না থাকার জন্য চর্ব্ব্য আহার সেবন করা যায় না। ব্যাধিকালে ব্যাধির অনুরূপ আহার প্রযোজ্য। (৭) **উপযোগসংস্থা**—আহার গ্রহণের নিয়মকে উপযোগসংস্থা কহে। ইহা জীর্ণ লক্ষণাপেক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্বভুক্ত জীর্ণ হইলে ভোজন করিতে হইবে; নতুবা নহে। (৮) **উপভোক্তা**—যে আহার করিবে, নিজের প্রকৃতির অনুরূপ যে দ্রব্য সেবিত হইবে, তাহার প্রকৃতি ও সংস্কার-সংযোগ বিচার করিয়া, খাদ্যের পরিমাণ স্থির করিয়া উপযুক্ত মাত্রায়, উপযুক্ত দেশে কালানুরূপ জীর্ণাজীর্ণ লক্ষণ বিচার করিয়া যে ভোজন করিবে সেই উপভোক্তা। এই সকল নিয়ম যদি অনুসৃত হয়, তাহা হইলে শুভ, নতুবা অশুভ ফল পাইতে হয়। খাদ্যগ্রহণ কালে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, হিতদ্রব্যই আহার করিব। প্রিয় দ্রব্য যদি অহিত হয়—তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। আহারকালে তাড়াতাড়ি বা খুব আস্তে খাইতে নাই এবং তন্মনা হইয়া আহার করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি খাইলে গিলিতে হয় এবং চর্ব্বণ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং চর্ব্বণ জন্য পূর্ব্বোক্ত সুফল পাওয়া যায় না। অধিকন্তু তাড়াতাড়ি খাইলে 'বিষম' লাগার আশঙ্কা থাকে। 'বিষম' লাগি… কাসিতে কাসিতে অনেক সময় বমি হইয়া যায়—… তাড়াতাড়ি খাইতে নাই। খুব আস্তে আস্তে … আহারে তৃপ্তি হয় না এবং অনেক খাইয়া ফেলি… আহার্য্য দ্রব্য সকল ঠাণ্ডা হইয়া দুর্জ্জর হই… কতক খাদ্য জীর্ণ হইতে আরম্ভ হইলে আবার … তাহার সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া খাদ্যের সম্যক … না হইয়া বিষম পাক হইতে থাকে। এইজন্য … আস্তে খাওয়া ভাল নহে। তন্মনা হইয়া খাইবে… তদ্‌শব্দে এখানে অন্নকে বুঝায়। অন্নে নিবদ্ধ … তাহাকে তন্মনা বলে। খাইবার সময় মনকে অন্য … দিক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া খাদ্যেই নিবদ্ধ … হইবে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই যে, খাদ্যে … কারণে তৃণ, কয়লা, প্রস্তর কিংবা আরসুলা প্রভৃতি … সংক্রমিত হয় এবং ভোক্তা যদি মনকে অন্য দি… তবে ভোক্তার অলক্ষ্যে ঐ সমস্ত দ্রব্য পেটে গি… অপকার সাধন করে। খাদ্যাদিরও স্বাদাদি সম্যক … হয় না। এতদ্ভিন্ন ইহার আর একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আ… পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পরিপাকের প্রতি মনের … যথেষ্ট আছে। সেইজন্য আমি যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছি—তাহাই আমার শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক শরীরের সহিত এক-ভূত হইয়া শরীরের ও মনের তৃপ্তি এবং শরীরের … সাধন করে। সুতরাং অন্ন ও অন্নাদের একত্ব… আনিতে হইবে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। অন্ন ও অন্না… ব্রহ্মভাব কল্পনা করিয়া উভয়েরই অভেদ মনে … করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি বলিতেছে—"অন্নংব্রহ্ম.. ......অন্নবানন্নাদো ভবতি.........তদেতদ্‌… মন্নে প্রতিষ্ঠিতং।" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩য় বল্লী।

(ক্রমশঃ)

পারিবারিক চিকিৎসা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগবত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, এল-এ-এম-এস)

একশিরা বা বাতশিরা

কারণ।—বায়ু কুপিত হইয়া কুঁচকি স্থান হইতে অণ্ডকোষে আগমন করিয়া বর্দ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত করিয়া এই রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে বৃদ্ধি রোগ সাত প্রকার বলিয়া কথিত। আমরা এস্থলে একশিরা বা বাতশিরার কথা বলিব।

রোগের পরিচয়।—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, নবমী ও একাদশী তিথিতে সন্ধিসমূহে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়া এবং কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হইয়া থাকে। কোষ একটি বৃদ্ধ হইলে তাহাকে একশিরা এবং দুইটী বৃদ্ধি হইলে তাহাকে বাত শিরা কহে।

চিকিৎসা।—এই রোগের প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হওয়া সুকর হইয়া পড়ে। বিরেচন অর্থাৎ জোলাপ দেওয়া সকল প্রকার বৃদ্ধি রোগেই উত্তম ব্যবস্থা। সর্ব্বাপেক্ষা এরণ্ড তৈলের (ক্যাষ্টর অয়েলের) জোলাপ দেওয়া হিতকর। তদ্ভিন্ন শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া—সমান ভাগে দুই তোলা লইয়া আগদের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, এক আনা পরিমিত যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিরেচন হইয়া একশিরা প্রশমিত হয়। ত্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেকটি ॥৵০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই কাথের সহিত কিঞ্চিৎ গোমূত্র মিশাইয়া সেবন করিলে বাতশিরা বা কোষ-বৃদ্ধি রোগের উপশম হইয়া থাকে। একখানি তাওয়ায় করিয়া আগুনের আলে জয়ন্তী পাতা গরম করিয়া কোষে বাঁধিয়া রাখিলে একশিরা ও বাতশিরা—উভয় প্রকার রোগেই উপকার হইয়া থাকে। আকন্দ শিকড়ের মূল অথবা আকন্দ চালিতার মূল—কোমরে বাঁধিয়া রাখিলে একশিরা এবং বাতশিরা উভয় রোগেই উপকার হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় ঔষধ। নিত্যানন্দ রস—সকল প্রকার বৃদ্ধিরোগের প্রসিদ্ধ সেবনীয় ঔষধ। মালিসের জন্য সৈন্ধবাদ্য তৈল, গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল প্রভৃতি শাস্ত্রীয় চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

মুখরোগ

কারণ।—জলা ভূমিজাত জীবের মাংস, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি দ্রব্য বেশী ভোজন করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া মুখরোগ উপস্থিত করে। মুখরোগে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ থাকিলেও অধিকাংশ মুখরোগে কফের প্রাধান্যই অধিক বর্ত্তমান। ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে যে সকল পীড়া জন্মিয়া থাকে, তাহারাই মুখরোগ বলিয়া খ্যাত। আমরা এস্থলে সর্ব্ব প্রকার মুখরোগের কথা না বলিয়া, দন্তগত ও জিহ্বাগত মুখরোগ এবং মুখের ঘায়ের কথাই বর্ণনা করিব।

মুখের ঘা।—শিশুদিগের প্রায়ই মুখে ঘা হইয়া থাকে, ইহার মূল কারণ—দুগ্ধের দোষ এবং মুখ পরিষ্কার না রাখা। প্রাপ্ত বয়স্ক দিগের এইরূপ মুখরোগ—অজীর্ণ এবং অন্ন রোগের জন্যও হইয়া থাকে।

দন্তগত মুখরোগ।—দন্তগত মুখরোগের মধ্যে "শীতাদ" নামে এক প্রকার মুখরোগ আছে—

তাহাতে দাঁতের মাড়ি হইতে রক্তস্রাব হয় এবং দাঁতের মাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে। এক প্রকার দন্ত রোগ আছে, তাহাতে দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং বেদনাযুক্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদে ইহার নাম "দন্তপুপ্পুটক্" রোগ আর এক প্রকার দন্তরোগে দাঁতের মাড়ি হইতে পূঁয ও রক্ত নির্গত হয়, তাহার নাম 'দন্তবেষ্ট' রোগ। এক প্রকার দন্তরোগে দাঁতের গোড়ায় অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং উহা ফুলিয়া থাকে। কোনো কোনো দন্তরোগে দাঁতগুলি নড়িয়া যায়। এইরূপ দন্তরোগ নানা প্রকার বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে। সকল প্রকার দন্তরোগই অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ।

চিকিৎসা।—কবল করা সকল প্রকার দন্তরোগে অতি উত্তম অবস্থা। (১) শুঁঠ, সবিষা, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া—সমান ভাগে লইয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এবং এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহা দ্বারা কবল করিলে সকল প্রকার মুখরোগ ও দন্তরোগে উপকার হয়। (২) পেয়ারার ছাল দুই তোলা, ঐরূপ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া কবল করিলে সকল প্রকার দন্তরোগে উপকার হয়। (৩) নারিকেলের শিকড় দুই তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথের কবল করিলে নড়াদন্ত জোড়া লাগিয়া থাকে। কবলের দ্বারা দাঁতগুলি বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া (১) হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল—ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা (২) কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চই ও হরিদ্রা—এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে দন্ত রোগের মাংসপচন নিবারিত হয় এবং দাঁতের ফুলা ও দাঁতের বেদনা নষ্ট হইয়া থাকে। (৪) বট এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল দুই তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথের কবলও সকল প্রকার দন্তরোগে উপকারক। (৫) কচার আটার সহিত একটু সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া দাঁতের গোড়ায় টিপিয়া দিলে দন্তমূলের যন্ত্রণা আশু নিবৃত্তি হয়। (৬) কেবল মাত্র সৈন্ধব লবণ খানিকটা জলে গুলিয়া কবল করিলেও সকল প্রকার দন্তরোগে বেশ উপকার হইয়া থাকে।

মুখরোগে কয়েকটি যোগ।—(১) চামেলি পাতা অথবা ঝাঁঝীফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত লাগাইয়া দিলে সকল প্রকার মুখের ঘা আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) ভেড়ার দুগ্ধ বা ভেড়ার দুগ্ধের দধি লাগাইলে সকল প্রকার মুখের ঘা আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) সোহাগার খই ও অল্প মাত্রায় রসাঞ্জন—গব্য ঘৃতের সহিত মিশাইয়া অথবা কেবল মাত্র সোহাগার খই—গব্য ঘৃতের সহিত মিশাইয়া লাগাইয়া দিলেও সকল প্রকার মুখরোগে উপকার হইয়া থাকে। (৪) খয়ের এবং বাবলা ছাল এক একটি এক এক তোলা—এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া ও এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহা দ্বারা কুলকুচা করিলে সকল প্রকার মুখরোগের উপকার হইয়া থাকে। (৫) মানকচু ভস্ম করিয়া সৈন্ধব লবণ ও তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া জিহ্বায় লাগাইলে জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

মুখরোগ সম্বন্ধে বিশেষ কথা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে মুখরোগ জন্মিয়া থাকে, এজন্য যে কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণটি দূর করিবার জন্য মূল রোগের চিকিৎসা করাও আবশ্যক।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—"খদির বটিকা" মুখরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। ইহা মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে সকল প্রকার মুখ রোগেই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কর্ণরোগ

প্রকার ভেদ।—কর্ণ রোগ নানাপ্রকার। কর্ণ মধ্যে অতিশয় কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে

কর্ণশূল বলে। কর্ণমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার শব্দ অনুভূত হইলে তাহাকে কর্ণনাদ বলে। শব্দ বা স্রোতঃ অবরুদ্ধ হইয়া শ্রবণ শক্তি লুপ্ত হইলে তাহাকে বাধির্য্য বা কালা বলে। মস্তকে আঘাত লাগা, জলমগ্ন হওয়া অথবা কর্ণ মধ্যে কোনো প্রকার ফোড়া হইয়া পাকিয়া গেলে কর্ণ হইতে পূঁয, রক্ত ও জলাদির স্রাব হইতে থাকে, ইহার নাম কর্ণস্রাব। কাণের ভিতর সর্ব্বদা চুলকাইলে তাহার নাম কর্ণকণ্ড। যে কোনো কারণে কর্ণমধ্য হইতে পূযাদি নির্গত হইলে তাহার নাম পূতিকর্ণ। এইরূপ আরও কয়েক প্রকার কর্ণ রোগ আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।—(১) আদার রস আধ তোলা, মধু চারি আনা, সৈন্ধব লবণ এক রতি ও তিল তৈল চারি আনা, একত্র মিশাইয়া তদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল, কর্ণনাদ ও বাধির্য্য প্রভৃতি কর্ণ রোগে উপকার হইয়া থাকে। (২) রসুন, আদা, সজিনার ছাল, মূলা ও কলার বাগুড়া—ইহাদের মধ্যে যে কোনো একটির রস অল্প গরম করিয়া কর্ণ মধ্যে পূরণ করিলে কর্ণমধ্যস্থ সকল প্রকার বেদনার নিবৃত্তি হয়। (৩) কয়েকটি মনসা সীজের পাতা, আকন্দের পাতার মধ্যে জড়াইয়া আগুণে ঝলসাইয়া লইয়া সেই রস অথবা আকন্দের পাতায় ঘৃত মাখাইয়া আগুনে ঝলসাইয়া সেই রস কর্ণমধ্যে পূরণ করিলে কর্ণ শূল নিবারিত হয়। (৪) বট, অশ্বত্থ পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস—ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া এবং কয়েত বেলের রস ও মধু একত্র মিশাইয়া তদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পূতি-কর্ণ অর্থাৎ কাণপাকা রোগ আরোগ্য হয়। (৫) কয়েত বেল, টাবালেবু ও আদার রস একত্র গরম করিয়া কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। (৬) মালতী পত্রের রস—মধুর সহিত অথবা গোমূত্রের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাকা আরোগ্য হয়। (৭) হরিতাল ও গোমূত্র একত্র মিশ্রিত করিয়া পূরণ করিলে পূতিকর্ণ আরোগ্য হয়। (৮) স্তনদুগ্ধে রসাঞ্জন ঘসিয়া মধুর সহিত কর্ণে প্রদান করিলে চিরকালোৎপন্ন স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণ আরোগ্য হয়। (৯) গোমূত্র দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। (১০) আধ পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল এবং আধ ছটাক শামুকের মাংস ভাজিয়া লইয়া, উহা দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কাণপাকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। (১১) কাণের মধ্যে ব্রণ হইলে এক কোয়া রসুন দ্বারা কাণ বুজাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নাসারোগ

নাসারোগ ও তাহার চিকিৎসা।—বায়ু দ্বারা শ্লেষ্মা শোষিত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া নাসা-রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার নানাপ্রকার। তন্মধ্যে নাসিকা মধ্যে এক প্রকার মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে নাসার্শঃ বলে। চলিত কথায় ইহার নাম নাসারোগ। এই রোগে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নাসাজ্বর। এই নাসা রোগে নাসিকার মধ্যে রক্তবর্ণ একটি শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহার সহিত প্রবল জ্বর হয় ও ঘাড়ে, পিঠে এবং কোমরে বেদনা ও সম্মুখের দিকে শরীর আকুঞ্চন করিতে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সূচী দ্বারা নাসামধ্যস্থ রক্তপূর্ণ শোথ বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইলে উপকার হয়, ইহাকে চলিত কথায় নাসাভাঙ্গা বলে। এইরূপ ভাবে রক্তস্রাব করাইয়া লবণ মিশ্রিত আকন্দের আটা ও সর্ষপ তৈল অথবা তুলসী পত্রের রসের নস্য লওয়া হিতকর। এ অবস্থায় যে জ্বর হইয়া থাকে, তাহা নাসা ভাঙ্গিয়া দিলে আপনা আপনিই সারিয়া থাকে। যদি আপনা আপনি না সারে, তাহা হইলে জ্বররোগে যে সকল যোগাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্যবস্থা করিলে উপকার হইবে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে, জ্বর রোগের রসৌষধাদিও ব্যবহার করিতে পারা যায়।

পীনস নামক নাসা রোগ।—যে নাসা

রোগে নাসা মধ্যে ধূম নির্গমনের ন্যায় যাতনা হইয়া থাকে এবং নাসিকা কোনো সময়ে শুষ্ক, কোনো সময়ে আর্দ্র অর্থাৎ ভিজা বোধ হয় এবং ঘ্রাণ শক্তি, ও আস্বাদ শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম পীনস রোগ। এই রোগের প্রথমাবস্থায় মাথাভার, অরুচি, পাতলাস্রাব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নাসিকা দিয়া ক্রমাগত সর্দ্দি বাহির হইতে থাকে। এই পীনস রোগ পাকিয়া উঠিলে শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসিকা গহ্বরে বিলীন হইয়া যায় এবং স্বর পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু প্রথমাবস্থা বা অপকাবস্থায় অন্যান্য লক্ষণ ইহাই বিদ্যমান থাকে।

পীনস রোগের চিকিৎসা।—এই পীড়া উৎপন্ন হইবামাত্র (১) গুড় ও দধির সহিত গোলমরিচের গুঁড়া সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) কটফল কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা—ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে লইয়া আদার রস মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে বা ঐ সকল দ্রব্যের কাথ অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য মোটের উপর মিলিত দুই তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথের সহিত আদার রস মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে।

অন্যান্য নাসা রোগ।—ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নাসা রোগ আছে, তন্মধ্যে দুষ্ট রক্ত-পিত্ত ও কফ দ্বারা বায়ু তালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন হইয়া মুখ ও নাসিকা দিয়া নির্গত হইলে তাহাকে পূতিনস্য বলে। যে নাসারোগে নাসিকা পূতিভাবাপন্ন ও ক্লেদযুক্ত হয়, তাহার নাম নাসাপাক। ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটকী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ—ইহাদের চূর্ণের নস্য লইলে পূতিনস্য রোগ আরোগ্য হয়। নাসা পাক রোগে বটের ছাল বাটিয়া ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অথবা পিত্ত প্রশমক ব্যবস্থা করিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হইলে।—এক প্রকার নাসা রোগ আছে—তাহাতে নাসিকা হইতে রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। সেরূপ অবস্থায় আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া এবং কাঁজির সহিত বাটিয়া লইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

নাসিকা হইতে জলস্রাব হইলে।—নাসিকা হইতে ক্রমাগত জল ঝরিলে থাকিলে, আয়ুর্বেদে তাহাকে এই নাসা রোগের ভিতর প্রতিশ্যায় সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রতিশ্যায় বা সর্দ্দির চিকিৎসার কথা আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন (১) পিপুল, মরিচ, বাসকছাল ও যষ্টিমধু—প্রত্যেক দ্রব্য আধ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া—এই কাথ চিনি কিম্বা মিছরি মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) জয়ন্তী পত্র দুইখানি ঝিনুকের মধ্যে ঢাকিয়া এবং তাহার উপরে কাদা ও নেকড়া দ্বারা লেপ দিয়া শুকাইয়া লইয়া, ঘুটের আগুনে পাক করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও সরিষার তৈল মিশাইয়া সেবন করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায় আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) আহারের পরই সিদ্ধ করা মাষ-কলাই—একটু লবণের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে সকল প্রকার প্রতিশ্যায়ে বিশেষ উপকার হয়।

চক্ষুরোগ

কারণ।—খুব রৌদ্র হইতে আসিয়া তখনি অবগাহন, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ, অতি সূক্ষ্ম বস্তু সর্ব্বদা দর্শন, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, রৌদ্র, ধূলি ও ধূম—অধিকক্ষণ চক্ষুতে লাগান, সর্ব্বদা ক্রন্দন, অতিশয় ক্রোধ ও শোককরণ, মস্তকে আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নানাপ্রকার চক্ষুরোগের মধ্যে অনেকগুলিই অসাধ্য বা শস্ত্রসাধ্য। এজন্য আমরা এস্থলে সকল প্রকার চক্ষুরোগের কথা না বলিয়া সাধারণতঃ যে সকল চক্ষুরোগে মুষ্টিযোগাদির দ্বারা ফল হইয়া থাকে, তাহাদের কথাই উল্লেখ করিব।

চোখ উঠা।—ইহা প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চক্ষুরোগে (১) গোলাপ জলের সিঞ্চন বিশেষ ফলপ্রদ। (২) করবীরের কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষুতে দিলে অথবা (৩) দুই তোলা দারুহরিদ্রা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথ কিম্বা (৪) স্তনের দুগ্ধের সহিত রসাঞ্জন ঘসিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে উপশমিত হইয়া থাকে। (৫) কাঁচা আমলকীর র দ্বারা চক্ষু ধুইলেও এইরূপ অবস্থায় উপকার হয়।

চক্ষু ফুলিলে বা বেদনা হইলে।—চক্ষুরোগে বেদনা, চুলকানি, জলপড়া ও শোথ অর্থাৎ ফুলিয়া উঠিলে, অঞ্জন দিলে বিশেষ উপকার হয়। এই অঞ্জনগুলির মধ্যে (১) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দাক্ষা ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বাটিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিলে উপকার হইবে কিম্বা (২) বাবলার কাথ ঘন করিয়া মধু মিশাইয়া অঞ্জন দিবে। ইহা চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণের চমৎকার ঔষধ। (৩) বিল্বপত্রের রস অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব লবণ দুই রতি ও গব্যঘৃত চারি রতি—একত্র একটি তাম্রর পাত্রে একটি কড়িদ্বারা ঘসিয়া ঘুঁটের আগুনে গরম করিতে হইবে, তাহার পর স্তনদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর ফোলা, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব, চক্ষুতে বেদনা ও চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারিত হয়।

রাতকাণা।—(১) একটি জোনাকী পোকা—পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া খাওয়াইলে রাতকাণা রোগ আরোগ্য হয়। (২) টাটকা গোবরের রস ৫।৬ ফোঁটা স্তনদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া চক্ষে প্রদান করিলে উপকার হয়। (৩) রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র ও নিমপত্র সমান ভাগে লইয়া গোবরের রসের সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে উপকার হইয়া থাকে।

শাস্ত্রীয় ঔষধ।—মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত—চক্ষুরোগের বিখ্যাত ঔষধ। এতদ্বারা সকল প্রকার চক্ষুরোগেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শিরোরোগ

পরিচয়।—মস্তকে শূলবেদনার মত যে সমস্ত রোগ উপস্থিত হয়, তাহারাই শিরোরোগ নামে খ্যাত। এই রোগ নানা প্রকার। বায়ুজন্য যদি এই শিরোরোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয় এবং রাত্রিকালে সেই বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কাপড় দিয়া শিরোদেশ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার বোধ হয়। যে শিরোরোগে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার দ্বারা মস্তক ব্যাপ্ত রহিয়াছে মনে হয় এবং চক্ষু ও নাসিকা দ্বারা ধূম নির্গম হওয়া কষ্টের মত বোধ হয় এবং ঠাণ্ডা করিলে রাত্রিকালে উপশমিত হইয়া থাকে, তাহা পিত্তজনিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদি মস্তক কফের দ্বারা লিপ্ত রহিয়াছে মনে হয়, মস্তক ভার বোধ হয় এবং চক্ষুর জ্বালা বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহা কফপ্রধান বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতজ শিরোরোগে উপরিলিখিত সকল কারণই মিলিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন রক্তজ, ক্ষয়জ ও ক্রিমিজ নামক আরও তিন প্রকার শিরোরোগের কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।—(১) বাতজ শিরোরোগে কুড় ও এরণ্ডমূল জলে বাটিয়া অথবা (২) মুচকুন্দ ফুল জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। পৈত্তিক শিরোরোগে (১) কুমুদ বা উৎপল প্রভৃতি পুষ্প বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। (২) রক্তচন্দন, বেণারমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল—একত্র দুগ্ধসহ বাটিয়া অথবা (৩) আমলকী ও নীলোৎপল—জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। কফজ শিরোরোগে কটফলের নস্য অতিশয় উপকারী।

আধকপালে রোগ।—আধকপালে বা

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে (১) গুড়ত্বকের রসে হুড়হুড়ের বীজ পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে বিশেষ উপকার হয়। (২) দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে উপকার হয়। (৩) চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ গব্যঘৃত, শীতল জল বা নারিকেলের জল—ইহাদের সহিত কোনো একটি দ্রব্যের নস্য লইলে আধকপালে নিবারিত হয়: বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ তিল একত্র পিষিয়া লইয়া তাহার নস্য লইলে আধ্‌কপালে বা সূর্য্যাবর্ত্ত নিবারিত হয়। (৫) উনানের মধ্যস্থলের পোড়ামাটির গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া নস্য লইলে আধকপালে রোগে উপকার হয়।

উপরে যে যোগগুলির কথা বলা হইল, এগুলি শিরোরোগের মাথাধরা এবং শিরঃশূলের জন্য ব্যবস্থা করিলেও উপকার পাওয়া যায়।

শাস্ত্রীয় ঔষধ। দশমূল তৈল ষড়বিন্দু তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল প্রভৃতির নস্য গ্রহণ এবং শিরঃশূলাদি বজ্র প্রভৃতি সেবনীয় ঔষধ—সকল প্রকার শিরোরোগে হিতজনক।*

* পারিবারিক চিকিৎসা সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে, এজন্য এই প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা হইতে আর বাহির হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদে কুটজের ব্যবহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর]

(ডাঃ শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল এল এম এস)

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে 'কুটজ' কেবল মাত্র এমিবা (Amoebae) ঘটিত আমাশয় রোগেই উপকারী এবং ইহা প্রয়োগ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় ইহার বীর্য্য বা কনেসিন (conessina) ত্বক্ নিম্নে বা পেশীমধ্যে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ—যদি ও তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে যেস্থানে পিচকারী দেওয়া হয়—ঐস্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদে 'কুটজ' একটী প্রধান ঔষধ, অনেক রোগেই ইহা ব্যবহার হয়। ঔষধার্থে ইহার ত্বক্ এবং বীজ ব্যবহার করা হয়। ইহা বহুনামে খ্যাত; চরকসংহিতায় কল্পস্থানের বৎসককল্পে নিম্নলিখিত পর্য্যায় দেখা যায়, "বৎসকঃ কুটজঃ শক্রো বৃক্ষকো গিরিমল্লিকা। বীজানীন্দ্রযবস্তস্য তথোচ্যন্তে কলিঙ্গকা॥ (চরক, কল্পস্থান, ৫ম অঃ ৩) বাঙ্গলা দেশে ইহা কুরচি বা কুড়চি বলিয়া প্রসিদ্ধ; বাঙ্গলার পল্লীগ্রামে ইহা 'কুটরাজ' বলিয়া কথিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ইহার অন্যান্য বহুবিধ নাম আছে। হিন্দীতে ইহাকে 'কুড়া' বা কৌরৈয়া বলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহার নাম 'হোলেরেণা এন্টি-ডিসেন্টেরিকা' (Holarrhena Anti-Dysenterica) ইহার ত্বক্ কনেসি (conessi) বা টেলিয়েরি বার্ক—নামে অভিহিত হয়।

কুটজছালের ন্যায় কুটজবীজও আয়ুর্ব্বেদে বহুরোগে ব্যবহার হইয়া থাকে এবং কুটজের ন্যায় ইহাও দেশভেদে বহুনামে খ্যাত। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বহুনাম, যথা, ইন্দ্রযব, ভদ্রযব, বৎসকবীজ, শক্রবীজ ইত্যাদি। বাঙ্গলায় ইন্দ্রযব বা তিক্ত ইন্দ্রযব বলিয়া কথিত হয়।

কুটজের ভেদ :—একই বংশোদ্ভব তিনটী বৃক্ষ 'কুটজ' বলিয়া অভিহিত হইত; পাশ্চাত্য বা ডাক্তারী

চিকিৎসায় কুটজের অনাদরের ইহাই প্রধান কারণ অনুমিত হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিত লিনিয়াস্ (Linnaeus) এক জাতীয় বৃক্ষকেই 'কুটজ' বলিয়া বর্ণনা করেন এবং সেই অবধি এই ভুলই চলিয়া আসিতেছিল। এই বৃক্ষ তিনটীর ইংরাজী নাম হোলেরেণা এণ্টিডিসেন্‌টিরিকা (Holarrhiena Anti-dysentenrica), রিটিয়া টিঙ্কটোরিয়া (wrightia Tinctoria) এবং রিটিয়া টোমেন্‌টোসা (wrightia Tomantosa)। তৎপর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন (Brown) সাহেব এই তিনটী বৃক্ষ স্বতন্ত্র কিন্তু একই বংশগত, সুতরাং পরস্পরের বংশগত সাদৃশ্য আছে—ইহাই প্রমাণ করিয়া ভ্রম সংশোধন করেন। আধুনিক উদ্ভিদবেত্তাদিগের অনুসন্ধানের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই তিনটী বৃক্ষের মধ্যে হোলেরেণা এণ্টিডিসেন্‌টেরিকাই (Holarrhena Anti-Dysentoica) প্রকৃত 'কুটজ', অপর দুইটী ঐ বংশগত স্বতন্ত্র বৃক্ষ ; এই বৃক্ষ তিনটীর বংশগত সাদৃশ্য থাকিলেও ব্যষ্টিগত যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয় ; আবার শেষোক্ত দুইটীর গুণগত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। হোলেরেণা এণ্টি ডিসেন্‌টেরিকা বা প্রকৃত 'কুটজ' এবং রিটিয়া টিঙ্কটোরিয়া—এই দুইটীতেই গুণগত বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়, পাশ্চাত্য মতে হোলেরেণা বা প্রকৃত 'কুটজই' আমাশয় রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ, কিন্তু রিটিয়ার ঐরূপ কোন শক্তি নাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থকারেরা অধিকাংশই 'কুটজের' ভেদের বিষয় উল্লেখ করেন নাই। সুশ্রুত সংহিতা ও ভাবপ্রকাশে 'কুটজের' ভেদের সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। চরক বৎসককল্পে স্ত্রী পুংভেদে দুই প্রকার কুটজের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, "বৃহৎ ফলঃ শ্বেতপুষ্পঃ স্নিগ্ধপত্রঃ পুমান ভবেৎ। শ্যামাঽরুণ পুষ্পী স্ত্রী ফলবৃন্তৈস্তথাণুভিঃ॥" অর্থাৎ যে বৎসকবৃক্ষ, বৃহৎ ফল, শ্বেতপুষ্প ও স্নিগ্ধপত্র, তাহাকে পুরুষ বলা যায় ; আর যে বৎসক—শ্যাম, অরুণপুষ্প এবং যাহার ফল ও বৃন্ত ক্ষুদ্র, তাহাকে স্ত্রীবৎসক বলা যায়, (চরক্ কল্পস্থান, ৫মঃ অঃ ৪)। বনৌষধি-দর্পণের গ্রন্থকার হোলেরেণা বা প্রকৃত কুটজের নাম সিতকুটজ এবং রিটিয়ার নাম অসিত কুটজ প্রদান করিয়াছেন ; সুবিধাবোধে আমরাও উক্ত নাম ব্যবহার করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উভয় শ্রেণীর বৃক্ষে নিম্নলিখিত প্রভেদ দেখা যায়, যথা :—

(১) রিটিয়া (wrightia) বা অসিতকুটজের পুষ্প দেখিতে যুঁই ফুলের ন্যায়, শ্বেতবর্ণ এবং সুগন্ধি, কিন্তু হোলেরেণা (Holarrhena) বা সিতকুটজের পুষ্পের কোন গন্ধ নাই।

(২) রিটিয়া (wrightia) বা অসিত কুটজের কাণ্ডত্বক্, খদির বর্ণ, মসৃণ, চর্ব্বণ করিলে ঈষৎ তিক্ত, কিন্তু হোলেরেণা (Holarrhena) বা সিতকুটজের ত্বক্ দেখিতে পাণ্ডুবর্ণ এবং চর্ব্বণ করিলে অতিশয় তিক্ত আস্বাদ পাওয়া যায়।

(৩) হোলেরেণা বা সিতকুটজের বীজ (ইন্দ্রযব), দারুচিনি বৃক্ষের, দেখিতে যবাকৃতি এবং অতিশয় তিক্ত, রিটিয়া বা অসিত কুটজের বীজ কৃষ্ণবর্ণ, স্বাদ মধুর।

ট্রপিকাল বিদ্যালয়ের (School of Tropical medicine) পরীক্ষায় অসিত কুটজ (Wrightia Tinctoria) রোগ চিকিৎসায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু চরক উভয় প্রকার 'কুটজই' ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা—"কালে ফলানি সংগৃহ্য তয়োঃ শুষ্কানি সংক্ষিপেৎ" অর্থাৎ যথাকালে উভয় প্রকার বৃক্ষের ফল সকল সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে (চরক, কল্পস্থান, ৫ম অঃ ৬)। কিন্তু সুশ্রুত-সংহিতা বা ভাবপ্রকাশে ঐরূপ কোন শব্দই (যথা ফলানি) পাওয়া যায় না ; তাঁহারা সর্ব্বত্রই 'কুটজ' এবং (ইন্দ্রযব শব্দ) ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা বোধ হয় উক্ত গ্রন্থকারেরা খুব সম্ভব প্রকৃত 'কুটজ' (Holarrhana Anti-Dysaterica

ব্যবহারেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের বিবেচনা করা উচিত যে, উভয় প্রকার 'কুটজ' বৃক্ষের বংশগত সাদৃশ্য থাকিলেও যখন ব্যষ্টিগত যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়, তখন গুণগত পার্থক্য থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অপিচ আধুনিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে যখন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রিটিয়া বা অসিতকুটজের রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই—তখন তাঁহাদের কর্ত্তব্য হোলেরেণা বা প্রকৃত 'কুটজ' ব্যবহার করা।

সম্পাদকের সাজি

চিকিৎসা তাহাকেই বলিব—যাহাতে রোগ আরোগ্য হয় এবং তিনিই ভাল চিকিৎসক—যিনি রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। এ অবস্থায় ইহা ডাক্তারীই হউক বা কবিরাজীই হউক—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু দেখিতে হইবে—আমি কোন্ দেশের লোক এবং কোন্ কোন্ দেশের ঔষধ আমার পক্ষে উপযোগী। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যস্য দেশস্য যো জন্তুঃ তজ্জং তস্যৌষধম্‌হিতম॥ অর্থাৎ যে দেশের প্রাণী—সেই দেশ জাত ঔষধই তাহার পক্ষে উপযোগী। এই জন্যই ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষজাত ঔষধ ব্যবহারই যে একান্ত কর্ত্তব্য—সে পক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই।

* * * *

আমাদের দেশের লোকে যখন এ কথাটি বুঝিত, তখন তাহারা যে নীরোগ ও সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিত, সে বিষয়েও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল কবিরাজ, ডাক্তারদিগের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন, সে মতের পরিপোষণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। ডাক্তারেরা বলেন—'এনোফিলেস' নামক এক প্রকার মশক-দংশনের ফলে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে শুধু মুখে আপত্তি করিলে চলিবে না। যে সকল গবেষণা দ্বারা তাঁহারা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সে মতের খণ্ডন করিতে হইলে, তাঁহাদের ন্যায় গবেষণা করিয়া যুক্তি ও প্রমাণ-প্রয়োগ দেখান আবশ্যক, কিন্তু তাহা না করিয়া যাঁহারা শুধু বাক্যাড়ম্বরে উহা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারিব না।

* * * *

তবে ডাক্তারেরা বলিয়াছেন,—"কুইনাইনই একমাত্র ম্যালেরিয়ার ঔষধ" ইহার সহিত হয়তো আমাদের মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ডাক্তারের কুইনাইনকেই ম্যালেরিয়া নাশক বলায় তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে কেন? তাঁহারা বহু পরীক্ষায় কুইনাইনের দ্বারা ম্যালেরিয়ায় সুফল পাইয়াছেন। অন্য দ্রব্যদ্বারা উহা নিবারিত হইতে পারে কিনা—তাহার জন্য হয়তো তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই, কাজেই তাঁহাদের এ সম্বন্ধে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কবিরাজীতে ম্যালেরিয়া বলিয়া কোনো রোগ নাই কিন্তু ম্যালেরিয়ার মত রোগের সহিত বিষম জ্বরের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এবং বিষম জ্বরে ম্যালেরিয়ার মত অবস্থায় নাটা, ভাটপাতা এবং হরিতাল ঘটিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসার সমন্বয় করিতে হইলে ডাক্তারদিগের কুইনাইনের ব্যবহারে তাঁহাদিগকে নিন্দা না করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আমাদের ঐ দ্রব্যগুলি উপস্থাপিত করিয়া যদি উহাদের দ্বারা সুফল দেখাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, ডাক্তারেরা কুইনাইনের

মত এই সকল ঔষধের উপরও শ্রদ্ধাবান হইতে অসম্মত হইবেন না।

*   *   *   *

কিন্তু সে চেষ্টা তো আমরা করি না। আমরা কুইনাইনের উপর যেরূপ দোষ দিয়া থাকি, সেইরূপ ডাক্তার সম্প্রদায়ের উপরও অনেক কবিরাজ যেন একটা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন, দেখিতে পাই। ডাক্তার সম্প্রদায়ের ইহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না, ইহাতে ক্ষতি—কবিরাজ সম্প্রদায়েরই। এখনকার যুগে সকল ডাক্তারকেই দেখিতে পাই, তাঁহারা অনেকটা কবিরাজীরই অনুরাগী। কবিরাজী ঔষধগুলির মধ্যে যেগুলির গুণ-পরিচয় তাঁহারা বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছেন, সেগুলির ব্যবহার তাঁহারা অসঙ্কোচে করিতেছেন। কাসে বাসক, স্ত্রীরোগে অশোক, রক্তদুষ্টিতে নিম, রক্তাতিসারে কুড়চি,—শোথে পুনর্ণবা—এগুলির ব্যবহার তো আজকাল অনেক ডাক্তারই করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় ম্যালেরিয়ার যদি কোনো প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আমরা তাঁহাদিগকে প্রদান করি, তাহা হইলে তাঁহারা যে না লইবেন, এমন নয়। কিন্তু তাহা দিবার চেষ্টা তো আমাদের করিতে হইবে। আমরা সে চেষ্টা করিতেছি কই?

*   *   *   *

প্রকৃত কথা, ডাক্তারদিগের সহিত বিরোধ না করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক আর্য্যচিকিৎসার সমুন্নতি সাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এমন একদিন ছিল, যে সময় ডাক্তারদিগকে কবিরাজেরা ঘৃণা করিতেন, ডাক্তারদিগের মনেও কবিরাজদিগের উপর সেই ভাব বদ্ধমূল ছিল। এখন তো ডাক্তারদিগের মধ্যে সে ভাবের পরিবর্ত্তে একটা উদার ভাব আসিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আমরাই বা সংকীর্ণচেতা হইব কেন? বিরোধে লাভ নাই, সর্ব্বে ক্ষতি, মিলনের ফল অতি শুভ। বিশেষতঃ মশক-দংশনের ফলে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, মূষিক কর্ত্তৃক প্লেগের উৎপত্তি—আরশোলার দ্বারা নানারূপ রোগের সৃষ্টি—এ সকল তথ্য যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে তো কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই, সুতরাং সে সকল কথা একেবারে উপেক্ষার হাস্যে উড়াইয়া দিব কেন? উপেক্ষার হাস্যে ডাক্তারদিগের মীমাংসিত বিষয়গুলি উড়াইয়া না দিয়া, যদি কোনো কবিরাজ আয়ুর্ব্বেদের ভিতর হইতে ঐ সকল যুক্তির প্রতিকূলে কোনো নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহা আলোচনার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে, নতুবা যুক্তিহীন বাক্যাড়ম্বরে যে কোনো লাভই নাই—তাহা সকলেই বুঝিবেন। সকল দিক দেখিয়া আমাদের মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদের অবস্থা পূর্ব্বের মত চালাইলে ইহার পুনরুন্নতি সম্ভবপর নহে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদকে এখন সত্যসত্যই 'ঢালিয়া সাজিতে হইবে।' ডাক্তারদিগের সহিত বিরোধ করিলে চলিবে না, শারীর স্থানের সকল বিষয় আয়ুর্ব্বেদে আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, ডাক্তারদিগের নিকট হইতে উহা ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। রোগনির্ণয়ের জন্য নাড়ীজ্ঞানের সিদ্ধিলাভ—যাহা এক সময়ে কবিরাজসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল—কালবিপর্য্যয়ে এখন তাহা হ্রাস পাইয়াছে, এ অবস্থায় ডাক্তারেরা যে ভাবে এখন রোগনির্ণয় করেন, সে ভাব অবলম্বনও এখন কবিরাজী শিক্ষার জন্য আবশ্যক হইবে। এক কথায় ডাক্তারদিগের যন্ত্রাদির সাহায্যে রোগনির্ণয় করিয়া যদি কবিরাজী ঔষধ প্রয়োগ করা হয়—তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে যে চিকিৎসায় সাফল্য লাভই ঘটিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগ-নির্ণয়ের জন্য কবিরাজী চিকিৎসায় নানারূপ বিধিব্যবস্থা আছে ইহা সত্য, কিন্তু ডাক্তারেরা যে ভাবে রোগপরীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা ভিন্ন শারীর স্থানের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, শুধু মহর্ষি সুশ্রুতের দোহাই না দিয়া একটু পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিতদিগের পন্থানুসরণ করিলেই বা ক্ষতি কি? ফলকথা, ডাক্তারদিগের সহিত বিরোধ না করিয়া তাঁহাদের সহিত মৈত্রীভাব

স্থাপন পূর্ব্বক চিকিৎসা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে, তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

*　　*　　*　　*

মাসিক পত্র সম্পাদন কার্য্য কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মাসিকেরই কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট লেখক রাখিতে হয়, এক কথায় সেই সকল লেখকই পত্রিকার প্রাণ। অনেক লেখা হয় তো অযাচিত ভাবে আসিয়া জুটিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট লেখক অর্থাৎ যাঁহাদিগকে অনুরোধ-উপরোধ করিয়া লেখাইতে হয়, তাঁহাদের লেখা লইয়াও কোনো কোনো সময় হয়তো আমাদিগকে মুস্কিলে পড়িতে হয়। এমন অবস্থা ঘটে যে, ঐরূপ লিখিত প্রবন্ধের কোনো কোনো বিষয়ে আমরা একমত নহি, অথচ অনুরোধ করিয়া লিখাইয়াছি, সে অবস্থায় মত নাই বলিয়া আমরা কিছু পরিবর্ত্তনও করিতে পারি না, সেরূপ অবস্থায় পাঠকদিগের নিকট উহা রুচি বিগর্হিত হইয়া পড়ে। কোনো কোনো পাঠক এজন্য আমাদের উপর বিরক্তও হয়েন। কিন্তু এ অবস্থায় মতবিভিন্নতা ঘটিলে, বিরক্ত না হইয়া আমরা কেন উহা প্রকাশ করিয়াছি,—তাহা যদি একটু চিন্তা করেন, তাহা হইলে আর অসন্তুষ্টির কোনো কারণ থাকে না। ইতঃপূর্ব্বে "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে" এই ধরণের দুই একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ-পত্র পাইয়াও তাহা আমরা বাহির করিয়াছিলাম। ফল কথা কোনো সম্প্রদায়ের উপর যাহাতে অযথা আক্রমণ না হয় — আমাদের লেখকগণ দয়া করিয়া যদি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে আমাদের আর কোনো অসুবিধার কারণ হয় না।

*　　*　　*　　*

স্বাধীন ভাবে সকল কথা বলা হউক, তাহা প্রশংসনীয় হইবে—কিন্তু অন্যায় ভাবে কোনো পক্ষকেই আক্রমণ করা হইবে না—আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক ডাক্তারই এখন কবিরাজী ঔষধের উপর শ্রদ্ধাবান, ইহা যে আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে শুভচিহ্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতির জন্য ইহা শুভ অবসরই বলিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির প্রধানতঃ দুইটি কারণ আমরা দেখিতে পাই,—এক শল্য চিকিৎসার আলোচনার অভাব, ২য় রাজানুগ্রহের অভাবে সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি অনুকম্পার অভাব। কিন্তু একদিন যে সাধারণ জনমণ্ডলী আয়ুর্ব্বেদকে উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্যচিকিৎসার দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেই পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণই যদি এখন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুরাগী হয়েন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ যে অচিরে পূর্ব্ব গৌরব লাভে সক্ষম হইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সেই জন্য আমাদের নিবেদন, ডাক্তার ও কবিরাজগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া পরস্পরের জ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের আদানপ্রদানে সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক এই আধি ব্যাধি পরিপূরিত ভারতবর্ষ যাহাতে আবার পূর্ব্বের মত স্বাস্থ্য-গৌরবে গরীয়ান হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টান্বিত হউন। ইহাই প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য যিনি মনে না রাখিবেন, তিনি যত বড় চিকিৎসকই হউন, তাঁহার দ্বারা যে দেশের প্রকৃত হিতসাধন হইবে না—তাহা সুনিশ্চিত।

*　　*　　*　　*

দেশের সকল বিষয়েই এখন একটা পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। আগে কবিরাজী শিক্ষা করিবার জন্য কোনো স্কুল-কলেজ ছিল না। কবিরাজ মহাশয়দিগের বাড়ীতে থাকিয়াই ছাত্রেরা সকল বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিত। এখন ভারতবর্ষের কয়েকটি স্থানে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আগে কবিরাজী পড়িতে হইলে ইংরাজী শিখিবার আবশ্যক হইত না, এখন কবিরাজী স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগকে শারীরস্থানের শিক্ষা ইংরাজীভাবে করিবার জন্য ইংরাজী শিখিবার আবশ্যক হয়। এই যে একটা নূতন

পরিবর্ত্তন, এ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা তো এখন সকল শ্রেণীর কবিরাজ মহাশয়েরাই মানিয়া লইয়াছেন। রোগ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ডাক্তারেরা যে সকল বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমাদের সম্মুখে অধুনা উপস্থিত করিতেছেন, সকল কবিরাজ মহাশয়ের তাহা ভাল না লাগিলেও, অধিকাংশ কবিরাজ মহাশয়েরাই যদি তাহা অনুমোদন করিয়া লয়েন, তাহা হইলে তাহা তো সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে। ফল কথা, আমরা দেখিতে চাই, ডাক্তার মহাশয়েরা চিকিৎসা-কার্য্যে সকল বিষয়েই যেরূপ তথ্যান্বেষণের চেষ্টা করিতেছেন, কবিরাজ মহাশয়েরাও সেইরূপ চেষ্টাশীল হউন। এইরূপ চেষ্টাশীলতার ফলে সনাতন আয়ুর্ব্বেদেরই যে পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে, সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে।

বাধ্যতামূলক ব্যায়াম শিক্ষা

(শ্রীঅমিয়নাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি এল)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যে দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে, বাঙ্গালী যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণজীবি হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের এই বাংলা দেশে জন্ম সংখ্যা হইতে মৃত্যুসংখ্যা কিরূপ ভীষণ বেগে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতি শীঘ্রই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে। ফল কথা, আমাদের এই দেশে বিভিন্ন প্রকার ব্যারামে ও মড়কে দেশের, লোক উৎসন্ন যাইতেছে। বাংলার শিশু-মড়কের সংখ্যা হাজার করা ২০০ জনেরও অধিক, আর কলিকাতায় শিশু-মড়কের সংখ্যা হাজার করা ৩১০ জন। আজকাল-জীবন সংগ্রাম এত কঠিন ও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বল বাঙ্গালী সেই সংগ্রামে জয় লাভের পরিবর্ত্তে প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যাই। এই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে, দেহকে বলবান ও নিজেদের শক্তিসঞ্চয় আবশ্যক। আজ কাল আর সেদিন নাই—এখন সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলা আর নাই—যাহাতে দেশের লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বাঙ্গালী যে ক্রমে এরূপ ধ্বংসের পথে যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যবিধি-অজ্ঞতা ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। অন্যান্য জাতির সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই বাংলা দেশে পাঞ্জাবী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও মুসলমানদের মধ্যে পাঞ্জাবী ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ কিরূপ কষ্টসহিষ্ণুতার সহিত ব্যবসায় করিয়া এই দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে এবং সেই বাঙ্গালীর বাংলা দেশে বাঙ্গালী ক্রমশঃ হীনবল ও দুর্ব্বল হইতেছে ও ব্যবসায় হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার প্রধান কারণ, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, পাঞ্জাবী ও অন্যান্য দেশের লোকের দৈহিক শক্তি বাঙ্গালী হইতে অনেক বেশী এবং সেই জন্যই তাহারা বাঙ্গালী হইতে অনেক বেশী কষ্ট সহিষ্ণু। আমরা দেখিতে পাই মাড়োয়ারী ও ভাটিয়ারা ব্যবসায়ের প্রথমে কি অসম্ভব কষ্ট সহ্য করে, বাস্তবিক উহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই বাংলা দেশে খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন কত লোক যে আধপেটা, কিংবা নামমাত্র খাদ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে—তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহাদের (Vitality) রোগ-প্রতিষেধক শক্তি ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে এবং তাহারা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে। বাঙ্গালীর দারিদ্র্যও ইহার অন্যতম কারণ। সুতরাং যাহাতে বাঙ্গালীর দৈহিক বল ও কষ্ট-

সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়—তাহার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল বিদ্যালয়ে ব্যায়াম—বাধ্যতা মূলক করা হইতেছে। এই ব্যবস্থা প্রথমতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ইংরেজীস্কুলের বালক গণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। শুনিতে এই প্রস্তাব খুবই ভাল শোনায়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহা কতদূর ফলোপযোগী হইবে—তাহাই আলোচ্য। এইখানে আমাদের কেবল সহরের কথা ভাবিলেই চলিবে না, গ্রামের কথাও ভাবিতে হইবে। প্রথমতঃ ছেলেরা সাড়ে দশটার সময় স্কুলে আসে। অনেক স্থলে ছাত্রদের বহুদূর হইতে এমন কি ৫।৬ মাইল দূর হইতে ও স্কুলে আসিতে হয়। খাওয়া দাওয়ার পর এত খানি হাঁটাই প্রথমতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে ঠিক নহে, তারপর তাহাদের প্রায় ৫॥০ ঘণ্টা স্কুলে থাকিয়া নানা প্রকার মানসিক শ্রমে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। যদি ও অনেকস্থলে টিফিনের ঘণ্টা থাকে, তবে তাহা নাম মাত্র, কারণ আজকাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই বেশীর ভাগ বিদ্যাভ্যাস করে। তাহাদের অবস্থানুসারে ছেলের স্কুলের ৪।৫ টাকা মাহিয়ানা,পুস্তক প্রভৃতির খরচ চালাইয়া আবার জলখাবারের খরচ চালান মুস্কিল হইয়া পড়ে। এই ৪।৫ ঘণ্টার মানসিক শ্রান্তির পর তাহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার উপর যদি আবার শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা হইলে শরীর বলিষ্ঠ হওয়ার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলই হইয়া পড়িবে। তারপর ব্যায়াম করিবার সময় কোথায়? কারণ অনেক গ্রামে প্রায়ই ছেলেদের দুই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া স্কুলে আসিতে হয়—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ অবস্থায় আবার ছুটির পর এতখানি পথ ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আবার স্কুলে ব্যায়াম করা অতি সুকঠিন। অনেক স্থলে চলাচলেরও এত অসুবিধা যে, একবার আসিয়া আবার যাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ ব্যায়াম—স্কুলে বাধ্যতামূলক করিতে গেলে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আজ কাল এ দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর লোকেরাই প্রাণপণে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে। অনেক পরিবারে দুই-বেলার অন্ন সংস্থান হয় না। অনেকে আধপেটা খাইয়া থাকে। তারপর খাইবার পরই ৩।৪ মাইল হাটিয়া স্কুলে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী। তারপর সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে ব্যায়ামের ফলে উপকার হইতে অপকারই বেশী হইবে। তারপর আরও দুই একটি কথা ভাবিতে হইবে যে জিনিসই বাধ্যতামূলক হইবে, বালকদের নিকট তাহার আস্বাদ তিক্ত হইবে। ভাল জিনিসও যদি তাহাদের করাইতে বাধ্য করা যায়, তবে বালকেরা সহজে করিতে চায় না—ইহাই বালকদের স্বভাব। সাধারণতঃ দেখা যায় স্কুলে কিংবা বাড়ীতে বালকদের চরিত্র গঠন ও বিদ্যাভ্যাসের সুবিধার জন্য যে সব নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়, বালকেরা সেই নিয়ম পালন করিতে সহজে চায় না। সে নিয়ম পালন যে ভবিষ্যত জীবন গঠনে অনেক উপকার করিবে—ইহা জানিয়াও তাহারা উহার উপর বিরূপ হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যায়াম জিনিসটি এরূপ রুক্ষ ও শুষ্ক জিনিস যে, বালকদের উপযোগী করা ইহা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। কি ব্যায়াম-প্রণালী বালকদের উপযোগী—তাহার একটি প্রথমতঃ plan তৈরী করার দরকার। এইরূপ এই শুষ্ক জিনিসে বালকেরা যাহাতে সহজে আনন্দ পাইতে পারে এবং সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শক্তিশালী ও বলবান হইয়া উঠে—সেইরূপ ব্যবস্থা করার দরকার। স্কুলে ড্রিল যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বারা ছেলেদের যে বিশেষ কোনো উন্নতি দেখা যায় না। তাহা দেখিলে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম কিরূপ উপকারী হইবে, তাহা বেশ অনুসন্ধান করা যায়। প্রকৃত পক্ষে স্কুলের ড্রিল শিক্ষার প্রণালীতে আমাদের মনে হয় ড্রিল শিক্ষায় কোন প্রকার উপকার হয় না।

এখানে বলা আবশ্যক যে, আমরা ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। ব্যায়াম ছাত্রদের নৈতিক

ও মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ দরকারী। বাধ্যতামূলক ব্যায়াম শিক্ষার বিরুদ্ধে যে গুলির দোষ দেখান হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিয়া প্রবর্ত্তন করিলে সুফল ফলিতে পারে।

গত ৩০শে এপ্রিল মাননীয় ভাইস্ চানসেলর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে সিনেট সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের শারীরিক উন্নতি সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট সিনেট সভা অনুমোদন করিয়া বাঙ্গালী বালকগণের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার-জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কমিটি অনুরোধ করেন যে, ব্যায়াম ও ক্রীড়ার জন্য যে ফি লওয়া হয়, তাহা দ্বারা যদি ব্যায়াম শিক্ষকের সঙ্কুলান না হয় এবং পারিশ্রমিক অভাবে যদি কোনও শিক্ষক সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হন, তবে সরকার বাহাদুর যেন সেই স্কুল কলেজে অর্থ সাহায্য করেন। গভর্ণমেণ্ট যদি এরূপ অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কলেজ সমূহকে ব্যায়াম শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিবেন। কমিটি ছাত্রদের দৈহিক উন্নতি সাধনের জন্য স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রকে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন করিয়া দেশীয় কিংবা বিদেশীয় কোন ব্যায়ামে কিংবা খেলায় যোগদান করিতে হইবে। এরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও Certificate বা প্রশংসাপত্র দাখিল করিতে না পারিলে কোনও বালককে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজ সমূহের ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে সামরিক শিক্ষা প্রচলিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। যাহাতে এই ব্যবস্থা সত্বর স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত হয়, সে জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ তৎপর হওয়া উচিত। আজ কাল আমাদের দেশের স্কুলের ও কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য যেরূপ হীন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা বড়ই আশঙ্কাজনক। এই সমস্ত ছাত্রগণই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা। তাহারা যদি প্রথম বয়সেই এইরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে,—তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বই একরূপ লোপ পাইবে।

কলেরার প্রতিষেধক

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম, বি)

কলিকাতায় ও বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই সময় কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮১৭ সালে এই রোগ প্রথম যশোহর জেলায় দেখা যায়, পরে সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। এখন কলেরায় মৃত্যু বাৎসরিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বৎসর কলিকাতায় তিন সপ্তাহে গড়ে ১১৬টি, ১৩৭টি ও ১২৭টির মৃত্যুর সংবাদ মৃত্যুর রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে। ইহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় মৃত্যু যে হইয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ অনেকেই নানারূপ অসুবিধার ভয়ে কলেরায় মৃত্যু হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে চাহে না। বাঙ্গলা দেশে সকল জেলাতেই এই বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কলেরাতে মৃত্যু অনেক হইয়া থাকে। কলিকাতার মত সহরে চিকিৎসার সুবিধা থাকা সত্বেও যখন দৈনিক মৃত্যু ১৮।২০টি করিয়া হয়, তখন যাহারা এই রোগে ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করেন, তাহাদের সংখ্যা কত অধিক তাহা সহজেই অনুমেয়।

আজকাল এই মহামারী হইতে রক্ষা পাইবার সহজ

উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। অন্যান্য দেশ সেই সকল আবিষ্কারের কথা জানিয়া বিজ্ঞানসম্মতপন্থায় তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে এই মহামারীর প্রকোপ খুব কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের এই অভাগা বাঙ্গালী জাতি এতই অন্য কাজে ব্যস্ত যে, দুই চার হাজার লোক কোনও ব্যাধিতে মরিয়া গেলে বা দুই এক লক্ষ লোক ভুগিলে তাহাতে বাঙ্গালী নজর দিতে যায় না।

সেদিন কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবেরই উদ্যোগে একটি সভাতে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেনিটারী কমিশনার ডাক্তার বেণ্টলী কলেরা প্রতিষেধক আধুনিক ইনজেকশনের কথা বলিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। কলেরা যেখানে আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা, সেখানে কলেরা ভ্যাকসিন সকলকে ইন্‌জেকসান দিলে, আর কেহই কলেরাতে আক্রান্ত হইবেন না।

ডাক্তার বেণ্টলী দেখান যে, ব্যাটেভিয়াতে প্রতি বৎসরই কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৯১০ সালে সে দেশের প্রায় শতকরা ৭০ জন লোককে ভ্যাকসিন ইন্‌জেকসন করা হয়, পরে সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগে ১১০ জন, অক্টোবরে ৬০৫ জন আক্রান্ত হন, কিন্তু ডিসেম্বরে ১৬ জন ও জানুয়ারীতে কেবল ৩ জন লোকের কলেরা হয়। তাহার পর হইতে ব্যাটেভিয়াতে আর কলেরা হয় নাই।

জাপানে এই ইঞ্জেকসনের ব্যবহার আরম্ভ হওয়াতে এখন কলেরাতে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঁচ ভাগের একভাগ লোকও ভুগে না। গত যুদ্ধের সময়েও বলকান যুদ্ধে রুষিয়েরা কলেরা-ইঞ্জেকসন ব্যবহার করিতেন বলিয়া ঐ রোগে মৃত্যু তাহাদের খুব অল্পই হইয়াছিল।

জাভার সরকার পক্ষ জাপানের দেখাদেখি ঐ ভ্যাকসিন ব্যবহার করা ধারাবাহিক ও ন্যায় সঙ্গত উপায় ১৯১৯ সালে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথমেই সার্দ্ধ ১৫ লক্ষ মাত্র ইঞ্জেকসন একবারে ব্যবহার করেন। এই জাভায় মোট লোক সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী—তা'হলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কত অধিক সংখ্যা লোক একেবারেই এই ইঞ্জেকসন লইয়াছিলেন। এই অনন্য সাধারণ ইঞ্জেকসন ব্যবহারের ফল হাতে হাতেই পাওয়া গেল, সেই বৎসর কেবলমাত্র ২৫ জন লোকের কলেরা হয়, কিন্তু পর বৎসর মোট একটী লোক এই রোগে আক্রান্ত হন, তাহার পর বৎসর যদিও ৫২টী লোকের কলেরা হয় কিন্তু পর বৎসর হইতে আর জাভাতে কলেরা হয় না। গত চার বৎসর এই সংক্রামক ব্যাধি হইতে একটী লোকও জাভায় আক্রান্ত হয় নাই। বাগদাদ, ব্যাটাভিয়াতেও এইরূপ ইঞ্জেকসনের ফলে কলেরা ঐ দুই প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশেও প্রথম বৎসর লোককে এরূপ ইনজেকসন দেওয়া হয়। ক্রমশঃ ১৯২০ সালে ১ লক্ষ দশ হাজার, ২৩ সালে একলক্ষ বিশ হাজার ও গত বৎসর তিন লক্ষ বিশ হাজার মাত্রা ঔষধ ব্যবহার করা হইয়াছিল, সর্ব্বত্রই এই ঔষধে বিশেষ ফল দর্শাইয়াছিল। বেণ্টলী সাহেবের মতে আগুনে জল দিলে যেরূপ ফল হয়—এই ইঞ্জেকসনে মহামারীর উপরও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। নারায়ণপুর নামক গ্রামে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। সেখানে একজন লোক ব্যতীত সকলেই কলেরার প্রতিষেধক ভ্যাকসিন লয়েন ; কেবল একজন ঐ ইঞ্জেকসন লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ লোকটীর কেবল কলেরা হয় ও বেচারার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। পরদিবস এই কথা লোকেরা সকলেই জানিল ও পাশের গ্রামখানির সকল লোকই এই ইঞ্জেকসন ব্যবহার করিয়া নিজেদের এই সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে বাঁচাইল। এই গ্রামগুলিতে গত তিন বৎসর একটি লোকেরও কলেরা হয় নাই।

আজকাল এই ভ্যাকসিন ইঞ্জেকসনের মত ফল বিলিভ্যাকসিন (Belivaccine) দ্বারাও পাওয়া যাইতেছে।

কলিকাতায় ঐরূপ কলেরা-ইঞ্জেকসন দিবার জন্য কর্পোরেশনের তরফ হইতে মিউনিসিপাল অফিসে ও ২৪২নং কালিঘাট রোডে ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দুই

হাসপাতেই ১১টা হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বিনামূল্যে ইঞ্জেকসনের ব্যবস্থা করা হয়।

গত হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময় কলিকাতায় যাত্রিদিগকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়াছিল। শুনা গিয়াছে, হরিদ্বারের ফেরৎ লোকদের মধ্যে কেবল একটী লোকের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে।

এই বিজ্ঞানসম্মত প্রতিষেধকটির ব্যবহার যাহাতে অচিরে এই বাঙ্গলাদেশের প্রতি গ্রামে—প্রতি ডাক্তারখানায় সহজে বিনা বা অল্পমূল্যে হয়—তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

কলেরা বেশীর ভাগ যুবা বয়সেই হয়। এই ব্যাধির প্রকোপ প্রত্যেক মেলার সময় বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এখন আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকদের মধ্যে এই প্রতিকারের কথা প্রচার করা ও তাহাদের ইঞ্জেকসনের উপর বিরুদ্ধ ভাবটী দূর করার প্রয়োজন—যাহাতে তাহারা মিছামিছি বাধা দিয়া এই ভীষণ মহামারীর কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

('স্বাস্থ্য'—জ্যৈষ্ঠ)

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের তালিকা (৩)

(ডাঃ শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এস্ সি, এম-ডি)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অগ্নিকর্ম্মন। বু ১ (৪),

অগ্নিবেশ সংহিতা। বম্বে। ভা ৩,

অজীর্ণ মঞ্জরী। বা ১, বি, কে, রাধা, দে ৩, (৫)। লা

অজীর্ণ মঞ্জরী টীকা by রমানাথ বৈদ্য। উ ১,

অজীর্ণামৃত মঞ্জরী। অপ ১,

অঞ্জন নিদান। উ ১ ( ) কী ২, বু ১ (৪), বি, কে ১, রাধা, দে ৩, উ ২ (১) ৭, পি (২),

অনুপান মঞ্জরী by পিতাম্বর। বু ১ (৪)

অজীর্ণ মঞ্জরী। লা,

অঞ্জন নিদান। [illegible] ১,

অমৃত সাগর by প্রতাপ সিংহ। পি (৬),

অর্ক প্রকাশ। ভা (২),

অশ্বগন্ধাকল্প। পি (৬),

অশ্বিনীকুমার সংহিতা। লা,

অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ by বৃদ্ধ বাগ্‌ভট। ভা (৩),

অনুভবসার। বি,

অন্ন চিকিৎসা। অপ ১,

অন্নপান বিধি। অপ ১,

অমর বিনোদ। বু ১ (৪),

অর্ক চিকিৎসা। বু ১ (৪)

অর্কপ্রকাশ or অর্ক চিকিৎসা। বা (২) কী ২, রাধা, দে ৩, (৩) (১১) ৬২ (৭),

অশীতবাদনিদান। তা ১,

অষ্টধাতু মারণবিধি। রাধা,

অষ্টস্থান পরীক্ষা। অপ ১,

অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা by ভাগত। কো, ই ১ (-) বা (২) অন্ন ১, কী ২, বু ১ (৪), বি, কে, রাধা, উ ১, উ ২ (১), (৫), তা ১, কীত, তা ২ (২), অন্ন ২, অপ (২), ম ১, পি (২)।

অজীর্ণমঞ্জরী by কাশীনাথ। পি (৪),

অঞ্জন নিদান। রা, ৬২ (৪), কাজ,
অনুপান মঞ্জরী by পিতাম্বর। পি (৪),
অমৃতমঞ্জরী by কাশীনাথ। কাজ,
অর্ক প্রকাশ। কাজ,
অষ্টাঙ্গ হৃদয়সংহিতা by বাগভট। ভাদ, ভা (৩),
ই ১, ৬২ (৪), ম ১, কাজ,
আত্রেয় সংহিতা। ভা ৮, পি (৪), কাজ,
আনন্দমালা by আনন্দ সিদ্ধ। কাজ,
আমবাত চিকিৎসা। কাজ,
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ by মাধব। ভা (৩), ই ১, কাজ,
অঞ্জন নিদান।
অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা by বাগভট।
অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংগ্রহ। তা ১,
আত্রেয় সংহিতা। ই ১ (-) রা ১, কী ২, বু ১ (৪)
রাধা, উ ২ (৫), বম্বে, অপ ১, পি (৩) বু ৬,
আত্রেয় সংহিতাসার। বু ১ (৪),
আনন্দমালা by আনন্দসিদ্ধ। বু ১ (৪), দে ১ (৯),
আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। অপ (২),
আয়ুর্ব্বেদ। বা ১, বি, তা ১,
আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা। উ ২ (৫),
আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ। রাধা, দে ৩ (১৫),
আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি। ই ১ (-) বু ১ (৪), তা ১,
আয়ুর্ব্বেদ রসশাস্ত্র। by মাধব। বু ১ (৪)
অত্রেয় সংহিতা।
আনন্দ মালিকা by আনন্দসিদ্ধ।
আত্রেয় সংহিতা। কথ, পি (৬),
আনন্দমালা by আনন্দসিদ্ধ। কথ,
আরোগ্যদর্পণ। ই১,
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত সংবোধিনী by কামেশ্বর। ই১,
আয়ুর্ব্বেদ সুধানিধি। অপ (২),
আরোগ্য চিন্তামণি। কী ২,
আরোগ্য দর্পণ। রাধা,
আরোগ্যমালা। বু ১ (৪),
ঈশ্বরীকল্প। তা ১,
উদকমঞ্জরী। বা (৯)
উদকলক্ষণ। কী ২,
উন্মাদ চিকিৎসাপটল। অপ (১),
উপদংশাধিকার from জ্ঞানভাস্কর। ✕
উমামহেশ্বর সংবাদ। তা ১,
উষানিদান। বু ১ (৪),
উষ্ট্রপয়ঃকল্প। বু ১ (৪)
ঋতুগুণ। রা ১,
ঋতুচর্য্যা। বু ১ (৪),
ঋতুসংহার। রাধা,
ঋতুচর্য্যা by সুন্দরদেব। Sri ভূপবল্লভ,
ঔষধকল্প। তা ২, পি (৬),
ঔষধিকল্প। পি (৪),
ঔষধকল্প বু ১ (৪), বি,
ঔষধ গ্রন্থ। অপ (২),
ঔষধ প্রকার by কৃষ্ণ ভট্ট। বি,
ঔষধ প্রয়োগ by ধন্বন্তরি। অপ (১),

গণোরিয়া ও সিফিলিস

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন)

গণোরিয়া ও সিফিলিসের সম্বন্ধে আমরা গত দুই বারে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি,—পাঠকগণ সেই সকল আলোচনা হইতে অবশ্যই বুঝিয়াছেন,—এই দুইটি রোগের ফলে হইতে পারে না—এমন রোগই নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যায় ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

উপদংশের ফলে মনোবিকার।—উপদংশের ফলে একটি লোকের কিরূপ চিত্তবিকার ঘটিয়াছিল, বর্ণিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। রোগী জাপান দেশীয়, নাম—এস, করকোনার। ইহার কর্ম্মস্থল ছিল—লণ্ডনে একটি চামড়া-ব্যবসায়ীর দোকানে। কুৎসিত অভিগমনের ফলে ইহার উপদংশ হইল। সর্ব্বপ্রথম ইহার শিশ্নত্বকের মধ্যস্থলে এবং কিছু দিন পরে লিঙ্গচর্ম্মের উপরে গলিত ক্ষত দেখা দিল। দক্ষিণ বাহুমূলের কুঁচকিও পাকিয়া উঠিল,—অস্ত্র চিকিৎসার ফলে কুঁচকি সারিয়া যাইল, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে ঘৃষ্ট হইয়া শোথক্ষত উপস্থিত হইল। ইহার জন্য ৩।৪ মাস তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হইল। আরোগ্য লাভ হইলে হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া যথারীতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিছুদিন পরে তাহার কিন্তু চিত্তবিভ্রম দেখা দিল, স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইল। কারখানায় জিনিসপত্র কোথায় রাখে—কি করে—কিছুই বলিতে পারে না। সে কারখানায় বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল; এজন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আবার তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এবার কিন্তু হাঁসপাতালে গিয়া সে আর আরোগ্য হইতে পারিল না, সেখানকার চিকিৎসকেরা স্থির করিলেন,—রোগের ভাবী কুফলের চিন্তায় সে এতই মুহ্যমান হইয়াছিল যে, তাহারই পরিণতি এই চিত্তবিকার।

উপদংশের ফলে চক্ষুরোগ।—উপদংশের ফলে নানারূপ চক্ষুরোগ হইতে পারে। এমন কি, অন্ধত্বও হওয়া অসম্ভব নহে। উপদংশের ফলে বধিরতাও হইয়া থাকে। ফলকথা, উপদংশের ফলে শারীরিক ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের কোনো না কোনোটি আক্রান্ত হইয়া নানারূপ যান্ত্রিকবিকার উপস্থিত করিয়া থাকে। হয়তো অনেক সময় এমনও ঘটিয়া থাকে যে, উপদংশ সারিয়া যাওয়ার পর ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কোনো রোগী বেশ ভাল থাকিল, কিন্তু ২০ বৎসরের পরে এমন একটি যন্ত্রবিকার ঘটিল যে, তাহা অতি ভয়ানক, ঐ যন্ত্রবিকারের মূলসূত্র যে উপদংশ-বিষ—তাহাও পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল। এইজন্য অনেক বিলাতী চিকিৎসক উপদংশ আরোগ্য সম্বন্ধে একেবারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

উপদংশে ক্ষয়কাস।—প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা বলেন, উপদংশ-বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে যে কোনো সময়েই হউক না কেন, ফুসফুসদ্বয় আক্রান্ত হইতে পারে। একটি উদাহরণ দিতেছি :—

একটি লোকের যখন উপদংশ হয়, তখন তাহার বয়স ২৫ বৎসর। ডাক্তারেরা পারদঘটিত ঔষধ দিয়া তাহার রোগ আরোগ্য করেন। রোগ খুব তীব্রভাবেই আক্রমণ করিয়াছিল। যাহা হউক চিকিৎসায় উত্তমরূপই সারিয়া যায়। রোগীর বয়স যখন ৪১, তখন পর্য্যন্ত

সুস্থভাবেই তাহার কাটিতেছিল। এই ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার ৪টি সন্তানও হইল। ৪১ বৎসরের পর কিন্তু তাহার যকৃতের বিবৃদ্ধি দেখা দিল, অত্যন্ত সর্দ্দি হইল এবং দিন দিনই রোগী কৃশ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় এক বৎসর কাটিয়া গেল, রোগের দ্বিতীয় বৎসরে রোগ আরও জীর্ণ ও জটিল হইয়া পড়িল এবং রোগী আরও কৃশ হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা ক্ষয়কাস বা থাইসিস স্থির করিয়া স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে উপকার না হইয়া অপকারই হইল, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইল এবং রোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হঠাৎ একদিন অতি অস্বাভাবিক ভাবে অণ্ডকোষ ফুলিয়া উঠিল। রোগী ইহার জন্য আরও অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। চিকিৎসকেরা তখন স্থির করিলেন, অতিরিক্ত আইয়োডাইড ব্যবহার করার জন্য তাহার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই কোষবৃদ্ধির নিরাকরণের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক অনেক চিকিৎসকই বলিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিবার জন্য কেহ কেহ ব্যবস্থা করিলেন। ফলে পারদঘটিত ঔষধ ব্যবহার করান হইল এবং তাহার ফলে কোষবৃদ্ধি ত দূরীভূত হইলই, ক্ষয়কাসের যে সকল চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, তাহাও দূর হইয়া রোগী নষ্টস্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইল।

পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে পুনরাক্রমণ।— ২০ বৎসর পরে কেন, পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেও উপদংশ-বিষ পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে—এরূপ ঘটনার পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। ফলকথা এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহা দূর করা সহজসাধ্য নহে। পূর্ব্বেই প্রমাণাদি দ্বারা দেখান হইয়াছে, ২০ বৎসর বা ৩৫ বৎসর কেন, পুরুষানুক্রমেও এই রোগ শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় উপদংশ-বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে উহা আরোগ্যের পরও বিবাহ করা উচিত কিনা, সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিলাতী চিকিৎসকেরা নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন, কাহারও মত—উপদংশ বিষ শরীরে একবার প্রবেশ করিলে যখন তখন ইহার ক্রিয়া পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে, এজন্য বিবাহ করা কোনো ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অপর পক্ষ বলেন, উপদংশ সারিয়া যাওয়ার ১০।১২ বৎসর পরে বিবাহ করা উচিত। বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার জোনাথান হচিনসন এফ, আর, এস, এল, এল, ডি বলেন,—

My own rule for the last twenty years has been to insist on an interval of two full years, between the date of contracting the disease and marriage. However satisfactory the progress of the case, and however absolute may have been the absence of symptoms during the latter three fourths of the period, I have never relaxed this rule I am cognisant of the consquences in a very large number of marriages which have taken place with my professional permission after this interval and with the single exception of a case, I have never known of any hurt to either wife or child. As a rule then, to which there are very few exceptions, I think that we may hold that after two years have elapsend, there is no risk of hereditary transmissions.

Dr. Hutchinson on syphilis 492.

অর্থাৎ—তাঁহার মতে যাহার উপদংশ হইয়াছে, তাহার বিবাহ করা যে আদৌ উচিত নহে—তাহা নহে, তিনি বলেন,—উপদংশ আরোগ্যের দুই বৎসর পরে বিবাহ করা যাইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের সৃষ্টিরক্ষের মধ্যে যাহার শরীরে একবার উপদংশ-বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে যদি আজীবন বিবাহ করিতে নিষেধ করা যায়, তাহা হইলে জীবসৃষ্টির অন্তরায় ঘটে। তাহার উপর আমাদের

দেশ অপেক্ষাও পাশ্চাত্যদেশে—বিশেষতঃ লণ্ডন, প্যারি প্রভৃতি সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান স্থানগুলিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অতি ভীষণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। উপদংশের ফলে একেবারে যদি বিবাহ বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দেশে প্রজাবৃদ্ধির যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিবে। তবে ইহার কুফল বুঝিয়া এই বিষাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যাহাতে সমাজ হইতে কমিয়া যায়, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ক্ষণিক সুখ কামনায় এরূপ একটি ভয়ঙ্কর শত্রুকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া আসা যে কোনোক্রমেই কর্ত্তব্য নহে—দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল যুবকদিগের মনোমধ্যে ইহা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রকৃত কথা, উপদংশ হইতে সকল প্রকার রোগই যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সন্ন্যাসরোগে আজকাল মৃত্যুসংখ্যা যাহা অধিক হইয়া থাকে, বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রমাণ পাইয়াছেন, অনেক সময় এই সন্ন্যাসরোগও হয়তো উপদংশবিষের ফলে উপস্থিত হইয়াছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

সন্ন্যাস রোগের কারণে উপদংশ।—ঘটনাটি অবশ্য বিলাতের। মিঃ এস—নামক একটি লোক উপদংশে আক্রান্ত হয়। তাহাকে পারদ ও আইয়োডাইড ঔষধসকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, উহার ফলে ক্ষতগুলি সব আরোগ্য হইয়াছিল, কিন্তু চক্ষুর রক্তাধিক্য ও শোথ আরোগ্য হয় নাই। এই রোগীর হঠাৎ সন্ন্যাস রোগ উপস্থিত হয়। লণ্ডন-হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটিতেছিল। হাসপাতালের ডাক্তারকে এই মুমূর্ষু সংবাদ দিয়া রোগীর নিকট লইয়া আসা হয়, ডাক্তার উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, রোগীর চৈতন্য অপগত, কিন্তু এক একবার রোগী হাত ও পা নাড়িতেছিল। ডাক্তার রোগীকে প্রথমতঃ সংজ্ঞাহীন দেখিয়া বাঁচিয়া আছে কিনা সন্দেহই করিতেছিলেন। কেবল হাত ও পায়ের সময় সময় নড়নচড়ন দেখিয়া জীবিত আছে বলিয়া নির্ণয় করিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাত্রে তাহার বাম অঙ্গে ও মুখের দক্ষিণ দিকে অংশতঃ পক্ষাঘাত হইয়াছে বুঝা গেল।

হাসপাতালের ডাক্তার রোগীর স্ত্রীর নিকট হইতে এই রোগীর পূর্ব্ব ইতিহাস অন্বেষণ করিতে গিয়া সংবাদ পাইলেন যে,—তিন দিন পূর্ব্বে অসুখের সূচনা হইয়াছে এবং অসুখের সূচনার দিন একটী গানের মজলিস হইয়াছিল ও সেই মজলিসে রোগী যোগদান করিয়াছিল। সেই সময় রোগীর চক্ষে একটু বেদনার অনুভূতি হয়। চক্ষুতে ক্ষত ছিল এবং সেই জন্যই এই বেদনার অনুভূতি। যাহা হউক রোগী শয়ন করিয়া বলে—বড় শীত করিতেছে। গাত্রবস্ত্র দ্বারা শীত নিবারিত হয় না। তাহার পর, একটু ঘুমের পরে রোগী তাহার স্ত্রীকে বলে,—তাহার ডান হাত ও বাঁ পা অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িতেছে। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই তাহার জিহ্বা অসাড় হয় এবং কথা জড়াইয়া আসে। প্রাতঃকালে কিন্তু ঐ ভাব কমিয়া যায়। আবার সন্ধ্যার সময় পূর্ব্বাবস্থা উপস্থিত হয় এবং রোগী একেবারে চৈতন্য রহিত হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ রোগী ৮।১০ দিন ঐ অবস্থায় থাকার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে ডাক্তার এই রোগীর চিকিৎসা করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার মত—এই সন্ন্যাস রোগ যে উপদংশেরই ফলসম্ভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

আম, জাম, কাঁঠাল

(কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেন)।

এখন আম, জাম ও কাঁঠালের সময় বলিয়া "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে"র পাঠকবর্গকে একটু এই কয়টির কথা শুনাইব। 'আম'—নামটি শুনিলেই উহা খাইবার জন্য একটা লালসা জন্মিয়া থাকে,—নাম শুনিলেই মনে হয়, আস্বাদনে ইহা কতই না মিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আম মাত্রেই সুমিষ্ট হয় না,—কোনোটি মিষ্ট, কোনোটি টক, কোনোটি বা অম্লমধুর। তাহাহউক, তথাপি আম অতি লোভনীয় ফল, মুকুল অবস্থা হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা পাকিবে বলিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকে।

দেশভেদে নাম :—সংস্কৃতে ইহার নাম—আম্র, চ্যূত, রসাল, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ। বাঙ্গলায়—আম। হিন্দীতে আম। মহারাষ্ট্রে আম্বাফল। কর্ণাটে মাবিন ফল। তৈলঙ্গে মাবিড়ি। গুজরাটে আংবো। আসামে আম। ফারসীতে আম্বা। আরবীতে অম্বজ। ল্যাটিনে Mangifera Indica। ডাক্তারী নাম Mango।

অবস্থাভেদে গুণ।—আমের পুষ্প বা বোল—অতীসার, কফ ও রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্দ্ধক। অত্যন্ত কচি আম—কষায়, অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধক। কাঁচা আম একটু বড় হইলে—অম্লরস, রুক্ষ, বায়ু, পিত্ত ও কফজনক, রক্তদোষক। আমের মধ্যে যে গুলি গাছ পাকা, সে গুলি মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। ডাসা অবস্থায় পাড়িয়া যে আম পাকান হয়, সেই আম—অম্লরস বিহীন ও মধুররসবিশিষ্ট ও পিত্তনাশক। পাকা আম বাসি হইলে—তাহা অতিশয় রুচিজনক হইয়া থাকে এবং উহা বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বায়ু ও পিত্ত নাশক ও সারক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে আমচুর প্রস্তুত করা হয়, তাহা অম্লমধুর, কষায় রস, ভেদক ও কফ এবং বায়ুনাশক। বেশ সুপক্ক আমের রস গালিয়া খাইলে উহা বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিকর, অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং কফবর্দ্ধক গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আম খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া খাইলে, তাহা রুচিকর হয় বটে, কিন্তু উহা গুরুপাক অর্থাৎ বহু বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা আম—মধুর রস বিশিষ্ট, বলকর, শীতবীর্য্য, এবং বায়ু নাশক।

দুগ্ধের সহিত আম খাইলে।—দুগ্ধযুক্ত আম খাইলে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বর্ণপ্রসাদক, মধুর রস কিন্তু গুরুপাক। এরূপভাবে আম খাইলে রুচি জনক, পুষ্টিকারক এবং শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি হয় ও ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব।—ইহার প্রস্তুতপ্রণালী সকল গৃহস্থ-মহিলারাই অবগত আছেন। সুপক্ক আম্রের রস নেকড়ায় ছাঁকিয়া কোনো পাথর বা অন্য কোন পাত্রে লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। একবার শুকাইলে আবার এইরূপ রস লেপন করিয়া শুকাইতে হয়। এইরূপ বারংবার লেপন করিয়া যখন পুরু হইয়া থাকে, তখনই ইহা প্রস্তুত হয়।

দেশভেদে আমসত্ত্বের নাম।—হিন্দুস্থানে ইহার নাম অমট। মহারাষ্ট্র দেশে ইহার নাম আঁবেয়সাচীংপোলী। ডাক্তারি নাম Inspissated mango juice.

আমসত্ত্বের গুণ।—ইহা রৌদ্রে পাক করার জন্য লঘুপাকী হইয়া থাকে। ইহা তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক এবং রুচিকারক।

অধিক আম্র ভক্ষণের দোষ।—অধিক আম খাইলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অধিক আম খাওয়ার ফলে বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি ও চক্ষুরোগও উৎপন্ন করিয়া থাকে। শাস্ত্রকার কিন্তু বলিয়াছেন, এই নিষেধ কেবল অম্লরসযুক্ত আম সম্বন্ধে,—মধুর রসযুক্ত আম সম্বন্ধে এই নিষেধ নহে—কারণ আম ভক্ষণে চক্ষুর হিতকারিতা প্রভৃতি গুণ আছে।

অতিরিক্ত আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য হইবার পূর্ব্বে যদি ১ তোলা শুঁঠ, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করা যায়—অথবা একআনা সচল লবণ ও এক আনা জীরকের গুড়া সেবন করা যায়, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যের প্রতিষেধক হইয়া থাকে।

আম্রের রোগনাশিনী শক্তি।—এইবার আমের রোগনাশিনী-শক্তির পরিচয় প্রদান করিব।

প্লীহায়।—সুমিষ্ট পাকা আমের রস—মধুর সহিত প্রত্যহ পান করিলে প্লীহারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বায়ু প্রধান প্লীহোদরেই কিন্তু ইহা বেশী কার্য্যকারী।

রক্তস্রাবে।—আমের আঁটীর শাস অর্থাৎ আম্রকেশীর গুড়া করিয়া নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

রক্তাতিসারে।—আমছাল ২ তোলা বেশ করিয়া বাটিয়া লইয়া আধপোয়া ছাগদুগ্ধ এবং দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধটুকু অবশেষে নামাইয়া একটু চিনি দিয়া পান করিলে রক্তাতিসারে উপকার হয়।

বমনে।—(১) আম ও জামের পাতার রস এক এক তোলা লইয়া আধসের জলে জাল দিয়া এবং আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিলে পিত্তজনিত বমন আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) আমের আঁটির শাঁস দুই আনা ও একটু মধু একত্র মিশাইয়া সেবন করিলেও বমন প্রশমিত হয়।

অতিসারে।—আমের ছালের উপরের অংশটুকু চাঁচিয়া ফেলিয়া সেই ছাল দধির সহিত পেষণ করিয়া খাইলে অতিসার এবং অতিসারজনিত উদরের বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়।

অতীসারের পক্কাবস্থা।—আমের কচি পাতা এবং কয়েতবেলের শাঁস সমানভাগে লইয়া আধ তোলা মাত্রায় চাউল ধোয়া জলসহ খাইলে পক্কাতীসার আরোগ্য হয়।

মাছ খাইয়া অজীর্ণ হইলে।—কাঁচা আম খাইলে, অতিরিক্ত মাছ খাওয়ার জন্য অজীর্ণ হইলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে।—আমের আঁটির শাঁস সেবনে মাংসভক্ষণ-জনিত অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কাঁচা আম খাইলেও মাংসভক্ষণ-জনিত অজীর্ণ রোগ সারিয়া থাকে।

শোথ।—আম গাছের মূলের ছাল ও শ্বেতপুনর্ণবা—প্রত্যেকটি দ্রব্যের এক পোয়া লইয়া বেশ করিয়া কুটিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ।৪ সের গব্যঘৃত (এই ঘৃতকে পূর্ব্বে যথারীতি মূর্চ্ছা দিয়া লইতে হইবে) পাক করিবে। তাহার পর আধসের আমগাছের মূলের ছাল এবং আধসের শ্বেতপুনর্ণবা—১৬ সের জল মিশাইয়া ঐরূপে পুনরায় পাক করিয়া লইতে হইবে। এই ঘৃত শোথনাশক, গুল্ম এবং অগ্নিমান্দ্যাদির পক্ষেও ইহা হিতকর।

শিশুর মুখপাকে।—শিশুদিগের মুখের ভিতর ঘা হইলে যে আমগাছের কাঠ সারযুক্ত হইয়াছে তাহা, গেরিমাটি এবং রসাঞ্জন সমানভাগে মিলাইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে, আরোগ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিদগ্ধ স্থানে।—আমপাতা পোড়াইয়া—কোনোস্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে প্রলেপ দিলে উপশমিত হইয়া থাকে।

ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র।—আম্রকিশলয়

শুকাইয়া এবং গুঁড়া করিয়া সেবন করাইলে, ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

ক্রিমিরোগে।—আমের ছাল আধতোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া—এই ক্বাথ সেবনে ক্রিমি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চর্ম্মরোগে।—আম্র ছালের নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়া প্রলেপ দিলে, "স্ক্যাবিস" নামক চর্ম্মরোগ প্রশমিত হয়।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে।—কাঁচা আম পোড়াইয়া খাইলে সর্দ্দিগর্ম্মিতে উপকার হয়। শুধু সর্দ্দিগর্ম্মি নহে, রৌদ্র লাগা এবং পশ্চিম প্রদেশের 'লু'—লাগারও ইহা অপূর্ব্ব ঔষধ।

কাণের ঘায়ে।—আমের গাছের সাদা সাদা চটার নাম "কাণচটকা।"—এই 'কাণ চটকা'—সরিষার তৈলের সহিত ভাজিয়া শিশুদের কাণের ঘায়ে লাগাইলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডাক্তারি মত—ডাক্তারি মতে অতীসার এবং নাসিকা, পাকস্থলী, গর্ভাশয়, অন্ত্র এবং ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং প্রদর ও প্রমেহের স্রাব নিবারণের জন্য আম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁঠাল

দেশ ভেদে নাম।—কাঁঠালের সংস্কৃত নাম কণ্টকিফল, পনশ ও অতি বৃহৎফল। হিন্দীতে ইহার নাম কটহর, কটহল্। মহারাষ্ট্রে ফণস্। কর্ণাটে হলসিন হণ্ণু। তৈলঙ্গে পনসকায়া। উড়িষ্যায় পণস্। তামিলে পিলা। আসামে ও বাঙ্গলা দেশে কাঁঠাল। কাঁটালের ডাক্তারি নাম Artocarpus Intergifolia আর্টোকারপাস ইণ্টাগ্রিফোলিয়া।

কাঁঠালের কাঁচা অবস্থা।—কাঁঠালের কাচা অবস্থার নাম এঁচোড়। ইহা বায়ুবর্দ্ধক। কষায় মধুর রস বিশিষ্ট, গুরুপাক, দাহজনক কফ ও মেদোবর্দ্ধক, কিন্তু বলকারক।

পাকা কাঁঠাল।—পাকা কাঁঠাল স্নিগ্ধ, তৃপ্তি জনক, পুষ্টিকারক, মাংসবর্দ্ধক, মধুর রস বিশিষ্ট, বলকারক, শুক্রজনক, পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক; কিন্তু কফজনক।

কাঁঠালের বীচি।—কাঁঠালের বীচি শুক্র-বর্দ্ধক, মধুর রস বিশিষ্ট, মূত্রনিঃসারক কিন্তু গুরু ও মলরেচক।

কাঁঠালের রোগনাশিনী শক্তি।—শুক্রবৃদ্ধির জন্য ইহা দুগ্ধের সহিত সেব্য।

ফোড়ায়।—কাঁঠালের ভুঁতি পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া একটু চূণের সহিত মিশাইয়া ফোড়ার উপরে প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

সিদ্ধির নেশায়।—সিদ্ধি খাইয়া নেশা হইলে কাঁঠাল পাতার রস পান করিলে নেশা ছাড়িয়া যায়।

কাঁঠালের অপকারিতা।—কাঁঠাল গুরু পাক বলিয়া অধিক পরিমাণে খাওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। গুল্ম রোগী এবং মন্দাগ্নিযুক্ত রোগীর পক্ষে ইহা ভক্ষণ করা উচিত নহে।

রোগ প্রতিষেধক শক্তি।—কাঁঠাল বেশী করিয়া খাওয়ার পর একটি বিচি (না চিবাইয়া) গিলিয়া খাইলে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য হইবার আশঙ্কা থাকে না।

কাঁঠাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে।—কাঁঠাল খাইয়া অজীর্ণ হইলে কলা খাইলে জীর্ণ হইয়া থাকে।

জাম

প্রকার ভেদ।—জাম তিন প্রকার, বড় জাম, ছোট জাম ও গোলাপ জাম। আমাদের দেশের বড় জামই সাধারণতঃ কালো জাম নামে অভিহিত।

দেশভেদে বড় জামের নাম।—

জম্বু, সুরভিপত্র, নীলফলা, শ্যামলা মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মেঘমোদিনী—এইগুলি বড় জামের সংস্কৃত নাম। হিন্দীতে ইহার নাম জামুন ও বড়াজামুন। মহারাষ্ট্রে থোর জাম্বুল, নদী জাম্বুল। কঙ্কন দেশ রাজিলে। গুজরাটে রাজজাম্বু, বারণাং, বেলরোপাজাম্ব। আসামে জামজম্ব। কর্ণাটে নিরলু। তৈলঙ্গে—নীলনেরেডি এবং ইংরেজীতে jambir tree ও ল্যাটিনে jambolana বলিয়া থাকে।

দেশভেদে ছোট জামের নাম।—সংস্কৃতে ইহার নাম ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা ইহার হিন্দী নাম জামুনী, ছোটী জামুনী ও বনজামুনী।

বড় ও ছোট জামের গুণ।—বড় জাম—গুরুপাক, রুক্ষ, বাতজনক ও কফপিত্ত প্রশমক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। ছোট জাম—ধারক, রুক্ষ, কফ, পিত্ত, রক্ত দুষ্ট ও দাহ নাশক গুণ বিশিষ্ট।

গোলাপ জাম।—খাইতে রুচিপ্রদ কিন্তু গুরুপাক, এজন্য অজীর্ণ রোগীর পক্ষে বিষের মত।

রোগ নাশিনী শক্তি।—জামের ফল, পাতা, আঁটি এবং জাম গাছের ছালের যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে, তাহাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে;—

রক্তাতিসারে।—জামের ছাল ২ তোলা, জল দেড় পোয়া ও ছাগ দুগ্ধ আধ পোয়া একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধটুকু অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া একটু চিনি মিশাইয়া পান করিলে প্রবল অতীসার আরোগ্য হয়। (২) জামের কচি পাতা—ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে রক্তাতীসারে উপকার হয়।

বমনে।—জাম ও আম পাতার প্রত্যেকটি এক তোলা করিয়া লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া একটু একটু করিয়া পান করিলে পিত্তজনিত বমি আরোগ্য হয়।

শিশুর পেটের পীড়ায়।—জাম ছালের রস ও ছাগী দুগ্ধ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুদের অতীসারাদি সকল প্রকার পেটের পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

ক্ষতশুদ্ধিতে।—জামপাতা পিষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

দন্ত রোগে।—দাঁতের মাড়ী হইতে রক্তস্রাব বা দাঁতে ক্ষত হইলে ও জিহ্বা ফাটিয়া গেলে, জামছাল এবং দুরালভা—এক একটি দ্রব্য এক তোলা করিয়া লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে কুলকুচা করিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে।—জামের আঁটি গুঁড়া করিয়া দুই আনা মাত্রায় সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশমিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদে শস্ত্রবিদ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত বি-এ]

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "অলমনসুর" নামে আরবীয় নরপতির আদেশক্রমে একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। (translated into Arabic), উহার আরবী নাম সিন্দহিন্দ। কালব্রুক উহাকে সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন। মাবুক নামে এক গ্রন্থকার ঐ সিন্দহিন্দ পুস্তক অবলম্বন করিয়া একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রস্তুত করেন।

বীজগণিত বিদ্যা প্রথমে ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয়। ডায়-ফেন্টস্ নামে এক জন গ্রীক গণিতজ্ঞ (a Greek Mathematician) গ্রীস্ দেশে ঐ বিদ্যা প্রথমে প্রচার করেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে ভারতবর্ষীয় বীজগণিত শাস্ত্রের প্রমাণ বারম্বার উদ্ধৃত করিয়াছেন। Vide Asiatic Researches, Vol XII, pp 116—164. অতএব গ্রীকেরা এ বিষয়েও হিন্দুদের নিকট চির-ঋণী আছেন।

অল্মামুন নামক বাদসাহের সময়ে একখানি সংস্কৃত বীজগণিত আরবীতে অনুবাদিত হয়। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯—এই নয় অঙ্কমূর্ত্তি এবং একং, দশং, শতং, সহস্রং ইত্যাদি দশ গুণোত্তর সংখ্যা গণনার যেরূপ প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণই তাহা উদ্ভাবন করেন,—আরবী ও পারসী পাটীগণিত-প্রণেতারা সকলেই তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। (A. R. Vol. XII, pp 183 and 184) আরবীয়েরা হিন্দুদিগের নিকট উহা শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রকাশ করেন ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা ও বাণিজ্য বিস্তার দ্বারা বোগদাদ (Bogdad) নগর হইতে স্পেনের (Spain) অন্তর্গত কারডোবা নগর পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া যান। খুলসৎ-উল-হিসাব্ নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকায় ও অন্যান্য পারসীক গ্রন্থে তাঁহাদের ঐ অঙ্ক প্রণালী শিক্ষার বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরস্ একখানি গ্রন্থে অঙ্ক গণনার যেরূপ পদ্ধতি প্রকাশ করেন এবং বিওয়সের জ্যামিতি শাস্ত্রে তাহা যে প্রকার বিখ্যাত আছে, অঙ্ক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালীর সহিত একরূপ অভিন্ন। একজন ফরাসী গণিতজ্ঞ পণ্ডিত বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পশ্চিমাঞ্চলের খৃষ্টানেরা আরবীদের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষীয় অঙ্কপ্রণালী অবগত হইয়াছিলেন।

৭৮৬—৮০৯ খৃষ্টাব্দে আরবীয় নরপতি হরুণ আল রষীদের আদেশানুসারে সুশ্রুত ও চাণক্যকৃত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উল্লিখিত মঙ্কঃ কর্ত্তৃক পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। চাণক্যকৃত পশুচিকিৎসা বিষয়ক আর এক খানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং চরক নামক সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্র ও আরবী ও পারসী উভয় ভাষাতেই অনুবাদিত হইয়া প্রচলিত হয়। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে সুশ্রুত-গুরু কর্ত্তৃক প্রণীত বলিয়া উল্লিখিত পশুচিকিৎসা বিষয়ক অপর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। অলবীরুনী নামক (Alburuni) আরবীয় পণ্ডিত—৯৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ-মানসে ভারতে আসিয়াছিলেন; সাংখ্য ও যোগ-শাস্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হিন্দুদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিবরণাত্মক অপর একখানি পুস্তক লিখিয়া যান। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে আবুসালেহ্ রাজগণের শিক্ষা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এই সমস্ত গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা আরব হইতে পুনরায় মিসর দেশীয় এলেকজেন্দ্রিয়া (Alexendria) নগরের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয় এবং মুসলমানেরা স্পেনদেশ (Spain) অধিকার পূর্ব্বক তথায় বিদ্যালয় সংস্থাপন (Foundation) করিলে তথায় আরবীভাষায় বিরচিত ভারতবর্ষীয় ঐ সকল জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়া য়ুরোপে প্রচারিত হইয়া যায়। পীজানগর নিবাসী লিয়োনার্ড নামে এক পণ্ডিত বার্ব্বারিদেশে যাইয়া আরবী ভাষায় বিরচিত বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং ১২০২ খৃষ্টাব্দে তাহার লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করিয়া যান। বিখ্যাত জর্ম্মান পণ্ডিত হম্বোলট্ বলিয়া গিয়াছেন, আরবীয়দের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় অঙ্ক প্রণালী এবং গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশীয় বীজগণিত প্রচারিত হইয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণিতাংশের বিশেষরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং জ্যোতিষ, দৃষ্টিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, তেজবিজ্ঞান ও চুম্বক বিজ্ঞানের দুরূহতর ভাগ সমুদায় মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য করিয়া দিয়াছে। নচেৎ ঐ সকল বিদ্যার ঐ সমস্ত অংশের হয়ত দ্বারোদ্ঘাটনই হইত না।

Both these effects the siennlananeons diffusion of the knowledge of the Science of numbers and of numerical Symbols with value by position have variously but Powerfula favo-

ured the advance the mathematical portion of natuara Science and facilitated access to the more abstruse departments of astronomy, optics, Physical geography and the theories of heat. magnetism, which without such aids would have remained unopened—coms translated by E, C. Offe Vol. 11. 1849 PP 599-600. শুক্র কথা দুরারুহ বিজ্ঞানবেদীর ঐ দুইটী ভারতবর্ষীয় অনশ্বর সম্পদের অসদ্ভাবে অনেকানেক অতীব গুরুতর অংশে মনুষ্য বুদ্ধির অসামান্য মহিমা প্রকাশই পাইত না। পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব্বদিকেও ভারতবর্ষীয় গণিতবিদ্যা প্রচলিত হয়। রিনেণো নামে একটী ফরাসী পণ্ডিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ঐ বিদ্যা ৭২০ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় Relation des voyages faits for as Arabes dans l, m le et a la chine, hor Reinand, Tome I ur tome 11. PPy.

মোগল সম্রাট আকবর—রামায়ণ, মহাভারত, অমরকোষ এবং অথর্ব্ব বেদ (বা কতকগুলি উপনিষদ) পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র দারা ১৬৫৭ খৃঃ পারসী ভাষায় উপনিষদ সকল অনুবাদ করেন এবং তৎপর আঁকেতেই দূপের কর্তৃক ঐ পারসী অনুবাদের লাটিন ও ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন হয়।

Rev. W. cureton's extract from the Dialic work enlitced Ayan Amba etc with H. H. wilson's remarks in the journal of the Royal Arialic Society, Vol. 6, PP 107—117, Mox Muller's lectures on the Science of longnagl, firsts Seria 1862, pp 45--153, cole brook's desertation on the Arithmetic & Algebra of the Hindus, Stroe Rey's early History of Algebra in the Asiatic Researches, Vol XII. pp 151—185, Alexander Vom Humboldt's Cosmos translated by Ec. offe. Vol. 11, 1849, pp 555 & 503--600, Memoire Sur I, Inde for Reinand, pp 312—322 & Ellidts Historians of India, pp 259 & 260.

এ পর্য্যন্ত আমরা আয়ুর্ব্বেদে শস্ত্রবিদ্যার প্রাচীনত্বই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমানে ইহার চর্চ্চা ও গৌরব লুপ্ত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্রবিদ্যার প্রাধান্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ঔষধ প্রয়োগদ্বারা (বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়বিধ) যদি অস্ত্রোপচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তবে কোন্ মানব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে চায়? বর্ত্তমান যুগেও—যে যুগে শস্ত্রবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জ্জন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে, সে যুগেও চাঁদসীর চিকিৎসা বর্ত্তমান থাকিয়া উহার সত্যতা ঘোষণা করিয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে শব-ব্যবচ্ছেদ ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়। যদিও বৈদ্যগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই, তথাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবাধিক্যে হিন্দু বৈদ্যগণ শব-ব্যবচ্ছেদে বিরত হন, ইহাই ঐতিহাসিক যুক্তি বলিয়া প্রামাণ্য।

ক্রমশঃ

পাগল হরনাথের মহাপ্রয়াণ

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ)

নাম ও প্রেমানন্দের উজ্জ্বল নিশান হস্তে লইয়া যে পাগল হরনাথ বঙ্গস্থানের অধিবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, যাঁহার শ্রীমুখের এক একটি বাণী শুনিবার জন্য বহু লোক উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা যায়—ইহাই যাঁহার উপদেশের সারাংশ, সেই পাগল হরনাথ আর ইহসংসারে নাই, গত ১২ই চৈত্র ইংরাজী ২৫শে মে রাত্রি ২টার সময় তিনি লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলী শুধু বাঙ্গলাদেশের নহে, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীও তাঁহার শ্রীশ্রীচরণ যুগলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কাহাকেও দীক্ষা দান করিতেন না, অথচ তাঁহার অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে গুরুরও অধিক মনে করিত।

বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রামে তাঁহার জন্ম, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও হইয়াছে সেই সোনামুখীতেই। সন ১২৭২ সালের ১৮ই আষাঢ় শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া তাহার পর কাশ্মীর ষ্টেটের পূর্ত্তকার্য্য অফিসের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী পদ গ্রহণ করেন।

বাল্যজীবনেই তাঁহার প্রাণে যেরূপ ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনেকেই বুঝিয়াছিল, কালে ইনি বিকাশ প্রাপ্ত হইবেন। সেই অনুমান সত্য হইল—কাশ্মীরের চাকরির সময়ে। রাউলপিণ্ডির বাঙ্গালীগণ হরনাথের কৃষ্ণপ্রেম দেখিয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন, ক্রমে তাঁহার অনেক অমানুষিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনুরাগ তাঁহাদের আরও বর্দ্ধিত হয়। এ সকল বিষয়ের পরিচয় বেশী করিয়া আমরা এস্থলে আর প্রদান করিব না, "হরনাথ চরিতামৃত" নামক এতদ্বিষয়ক একখানি গ্রন্থ ২ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতার নিকটই ঐ পুস্তক পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠক ঐ পুস্তক পাঠ করিলেই তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা জানিতে পারিবেন।

হরনাথ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে যে সকল পত্র লিখিতেন, সেই সকল পত্র "পাগল হরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী" নামে চারি খণ্ডে পুস্তকাকারেও বাহির হইয়াছে। ঐ সকল পত্রের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, সেইরূপ সকল পত্রই ধর্ম্মমূলক উপদেশে পূর্ণ। সেই সকল পত্র এত দ্রুত তাঁহার কলম হইতে বাহির হইত যে, ভক্তেরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত। প্রত্যহ তিনি অন্ততঃ এক শত পত্রের উত্তর স্বহস্তে লিখিতেন, অথচ সকল সময়েই তিনি বহুসংখ্যক ভক্ত লইয়া অবস্থিতি করিতেন। তাহারই মধ্য হইতে অতগুলি পত্রের উত্তর দেওয়া বড় সহজ কথা নহে।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যখন উপদেশাবলী বাহির হইত, তাহা যাহারা একদিনও শুনিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন তাঁহার ভিতর হইতে কত রূপাই না বাহির হইত। তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বহুসংখ্যক জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, কবিরাজের নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। পাগল হরনাথের নিকট যাইলে ইঁহারা স্ব স্ব পদমর্য্যাদা ভুলিয়া নিজেরা পাগলের মত হইয়া পড়িতেন। অনেক শাস্ত্রের পণ্ডিত ইঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য হয়তো ইঁহার নিকট গিয়াছেন, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ উপদেশ শ্রবণের পর শেষে তাঁহার শ্রীপদ প্রান্তে পতিত হইয়া দুরভিসন্ধির কল্পনা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন—এরূপ ঘটনা অনেক সময়ই ঘটিয়াছে।

হরনাথের প্রথম বিকাশকালে তাঁহার কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার পরিচয় পাইয়া মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং গুণমুগ্ধ শিশিরকুমার তাঁহার সেই সকল ঘটনা তাঁহার সম্পাদিত "হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে" প্রকাশ করায় বাঙ্গলাদেশের লোক তাঁহার কথা জানিতে পারেন। বাঙ্গালী-হরনাথকে বাঙ্গলা দেশের লোক এইরূপে জানিয়া প্রথমতঃ চুঁচুড়ায় এবং তাহার পর কলিকাতায় লইয়া আসিল,—ইহাই হইল তাঁহার বাঙ্গলায় প্রকট হইবার সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

সংসারে থাকিয়া কর্ম্মময়-জীবনেই ধর্ম্মসঞ্চয়ের ব্যবস্থা কর ইহাই ছিল হরনাথের একমাত্র উপদেশ। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম—"ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সকলকেই [illegible] করিতে চেষ্টা কর এবং কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হও। শুচি, অশুচি মনে করিবার কোনো কারণ নাই, শুচি, অশুচি বলিয়া জগতে কিছুই নাই, যদি থাকে, তবে **কৃষ্ণও নামের স্পর্শে তাহাও শুচিতম** হইয়া উঠে।" এই উপদেশই একদিন মহাপ্রভু আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন,—সে আজ চারি শত বৎসরেরও অধিক কালের কথা। পাগল হরনাথের শ্রীমুখে সেই মহাপ্রভুরই উপদেশের প্রতিধ্বনি সর্ব্বদা ফুটিয়া বাহির হইত। আবার কতদিন পরে ঐরূপ ভাবে সেই সকল পুরাতন কথা কে শুনাইবেন জানি না।

হরনাথের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ মিলিয়া নানাস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরীর "হরনাথ অনাথ আশ্রম," বৃন্দাবনের "কুসুম কুঞ্জ" এই দুইটি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরনাথের সম্পর্কে নানাস্থানে বহু সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই এবং নাগপুরের হরনাথ তত্ত্ব প্রচারিণী সভার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতের নানাস্থানে ভক্তগণ সর্ব্বদাই হরনাথকে লইয়া উৎসব করিতেন, ইহা ভিন্ন প্রতি বৎসর ১৮ই আষাঢ় বিভিন্ন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় সকল ভক্ত একত্র হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার জন্মোৎসব করিতেন। এবার জন্মোৎসবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল মেদিনীপুরে। হরনাথকে হারাইয়া ভক্তগণ জন্মোৎসবের সময়ে এবার কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলা যায় না।

পাগল হরনাথ বলিলে অনেকে মনে করিতে পারেন, তিনি বুঝি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন কিন্তু তাহা নহে, তিনি সংসারী ছিলেন, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ছিল, দুইটি উপযুক্ত পুত্র তাঁহার বর্ত্তমান, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদাই ভক্তগণ সহ ধর্ম্মকথায় কালক্ষেপ করিতেন, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। মূল কথা—পাগল হরনাথের অভাবে বহুসংখ্যক লোক নিজেদের আজ নিরাশ্রয় মনে করিতেছে। অনেকের বল, বুদ্ধি, আশা, ভরসা—এক কথায় সর্ব্বস্ব ছিলেন পাগল হরনাথ, একপ অবস্থায় তাঁহার অভাবে অনেককে যে আজ অনাথ হইতে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা কামনা করি, এই সকল ভক্ত-প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চিত হউক।

*

বিবিধ

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগের বজেট।—আগামী বর্ষের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য ৩৩, ২৯,০০০ টাকা ও চিকিৎসা বিভাগের জন্য ৫৬,২৮,০০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই টাকা উভয় বিভাগের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে বাঙ্গালা ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত কম টাকা এই দুই বিভাগের জন্য ব্যয় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—আগামী

[illegible] অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়স্থ ইণ্ডোর হাসপাতাল আগামী আষাঢ় ১৯শে জুন খোলা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় ইহার দ্বারোদঘাটন করিলেন। আপাততঃ ৫১টি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, পরে ১২৫টি পর্য্যন্ত রোগী রাখা হইবে। [illegible] মাসে এই হাসপাতাল খুলিবার কথা ছিল, কিন্তু নানা [illegible] হইয়া উঠে নাই বলিয়া এই সময় খোলা হইতেছে। আয়ুর্বেদের হাসপাতাল—আমাদের দেশবাসী মাত্রেরই গর্ব্ব গৌরবের সামগ্রী মনে করিয়া দেশের সকলেরই ইহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক কলেজ। গ্রীষ্মাবকাশের [illegible] আগামী ২৭শে জুন বাগবাজার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। [illegible] বৎসর অত্যুত্তমের সহিত এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত হয়, কিন্তু বৎসরান্ত হইতে না হইতে ইহার শ্রেষ্ঠ সেবক রমেন্দ্রমোহন পরলোক গমন করায় অনেকেই ধারণা করেন, বুঝি বা কলেজটীরও শেষ হইল, কিন্তু অতীব আনন্দের বিষয় যে, কর্তৃপক্ষগণ ইহার রক্ষণে ও যথোচিত উন্নতিবিধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্প পূর্ণ হউক।

কলিকাতা কর্পোরেশন সংবাদ।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় পুনরায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা বিলক্ষণ আনন্দিত হইয়াছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরলোক গমনের পর এইবার লইয়া ইনি উপর্য্যুপরি তিনবার মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন। আমরা আশা করি, তিনি কলিকাতাবাসীদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে—ভেজাল খাদ্য বিক্রয় যাহাতে বন্ধ হইতে পারে—সুপেয় পানীয় জল যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহের ব্যবস্থা হয়, আর আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা যাহাতে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য যথেষ্ট [illegible] করিবেন।

শ্রীযুত আনসোফেল্যা ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সঙ্গে শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। তিনি এইবার কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রবেশ করিলেন—তিনি আগুরম্যান মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ একজন অক্লান্তকর্ম্মী, বহু সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সুনাম জড়িত আছে। গত তিন বৎসর তিনি ১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য-সমিতির সভাপতি থাকিয়া ১নং ওয়ার্ডের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে ১নং ওয়ার্ডে চারিদিবস-ব্যাপী স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। সেই জন্য আশা করি, তাঁহার দ্বারা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হইবে। তিনিও একজন আয়ুর্বেদের বিশেষ অনুরাগী। অতএব তিনি যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহা বিশেষভাবে আশা করা যায়।

আর একজন কাউন্সিলারের নির্ব্বাচনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার নাম ডাঃ শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র। ইনিও আয়ুর্বেদের একজন বিশেষ অনুরাগী ও দরিদ্র সেবায় মুক্তহস্ত। ইঁহার পরিচালিত দরিদ্রবান্ধব ভাণ্ডারে অসংখ্য অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, রায় বাহাদুর এইচ, এন, দাস, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস, মন্মথনাথ সেন, ডাঃ কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সেন, ডাঃ বি-সি ঘোষ প্রভৃতির নির্ব্বাচনে ও [illegible] কে, সি, রায় চৌধুরী, রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহারা কলিকাতার করদাতৃগণের অভাব অভিযোগ মোচনে যত্নবান হইলে সুখী হইব।

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ও রায় শ্রীযুত ললিতকুমার মিত্র এইবার নির্ব্বাচিত হইতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।



অর্গেনা।

ভারতে নুতন! মেসিনে প্রস্তুত!

অকাতর অর্থব্যয ও প্রাণপাত পরিশ্রমে "অর্গেনার" রীড বোর্ড, একশেন প্রভৃতি মেসিনে প্রস্তুত করাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন ডিজাইন করিয়া বাহির করিয়াছি।

৩ অক্টেভ,	ডবল রীড,	সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	... ... মূল্য	৪৫৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	...	৫০৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, এক সেট ব্যাস রীড (উদারা) সেগুনকাষ্ঠের বাক্স সমেত	,, ...	৫৫৲
৩॥ ঐ	ঐ	সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	,, ...	৬০৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	,, ...	৬৫৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, এক সেট ব্যাস রীড (উদারা) সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	...	৭০

আর, বি, দাস।

টেলিফোন—৭৩৬, **কলিকাতা মিউজিক হল।** টেলিগ্রাম—আ:বিদাস।

৮।সি, লালবাজার ষ্ট্রীট,——১৩।৮, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কারমাইকেল প্রেস।

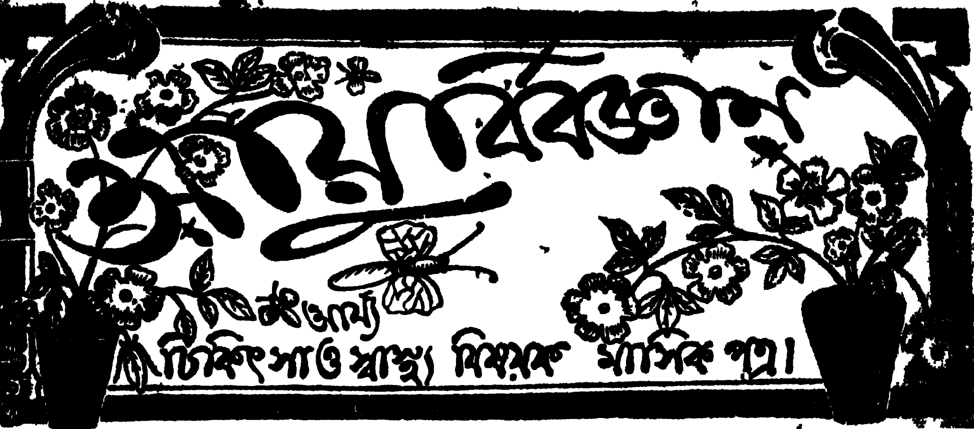
৫৯নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর কষ্ট করিয়া কলিকাতায় আসিতে হইবে না।

পত্রদ্বারায় ছাপার অর্ডার পাঠাইয়া দিন।

আমরা সুলভে করিয়া দিব।

[illegible] শ্রাবণ ১৩৩৪। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্" ৩য় সংখ্যা। July 1927



JOURNAL OF HEALTH AND INDIAN MEDICINES

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন।

সহঃ সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

[illegible]

শ্রাবণ মাসের সূচী।

Printed and Published by Sj. Brojendra Nath Chatterji B. A.
at the Kusumika Press—1, Telipara Lane, Calcutta
Cover Printed at the Carmichael Press—59, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.


অমৃতবল্লীকষায়

কবিরাজ বিনোদ লাল সেন মহাশয়ের প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান।

সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত, যথা —

শারীরস্থান, দ্রব্যস্থান ও নিদানচিকিৎসিত স্থান

১ম খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের ইতিহাস, ঔষধ ও ... প্রস্তুত করিবার প্রণালী। নাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষা, ... বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম। ধাতুদ্রব্যাদির শোধন ও ..., রাসায়নিক যন্ত্র ও শস্ত্রাদির আকৃতি ইত্যাদি ... হইয়াছে।

২য় খণ্ডে—শারীর যন্ত্র, শারীরনির্ম্মায়ক উপাদান ..., আকৃতি, ক্রিয়া ও প্রধান প্রধান ... প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

৩য় খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ... পর্য্যায়, গুণ, আময়িক প্রয়োগ, ... গ্রহণীয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ খণ্ডে—প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, ... অবস্থার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য ... সমস্ত বিশদ ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

... খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা ... ৪৲ চারি টাকা ৪র্থ খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। একত্রে চারিখণ্ডের মূল্য ১০৲ দশ টাকা। মাশুলসহ ১০৮/০ দশ টাকা চৌদ্দ আনা।

সটীক সানুবাদ মাধব নিদান।

... পাঠ অত্যাবশ্যক ... হইবে না। ... প্রধান সোপান, ... আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বা চিকিৎসা সম্যক্ ... হয় না।

শিক্ষার্থীদের ... জন্য সুগম ও সুখপাঠ্য করিবার ... বিষয়রক্ষিত কৃত টীকা ব্যতীত ... টীকা টিপ্পনী পরিদর্শনপূর্ব্বক গ্রন্থকারের ... জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। ... নাম সংযোজিত করিয়া ... করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ... উত্তম কাগজে ... মূল্য নির্দ্দিষ্ট ... ২।০ দুই টাকা ...।

বি, এল, সেন এণ্ড কোং

৩৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন, কবিভূষণ (চিকিৎসক)

... তালিকার ... লিখুন।

অর্ডার দিবার সময় কিঞ্চিৎ মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

আমাদের নববর্ষের শুভ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমাদের নূতন ডিজাইনে প্রস্তুত পোর্টেবল হারমোনিয়ম, সুরের মাধুর্য্যে, গঠন সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক।

সুলভে

ফোল্ডিং অর্গান—সবে মাত্র নূতন আসিয়াছে। আপনি অন্য জায়গায় কিনিবার পূর্ব্বে একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের দোকানে শুভ আগমন করুন কিম্বা পত্র লিখুন।

সুদীর্ঘকাল স্থায়ী

দুলামিয়া এণ্ড কোং

হারমোনিয়াম, অর্গান ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মাণকারক ও বিক্রেতা

...

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৩৪ | ৯ম সংখ্যা

গঙ্গাধর মঙ্গল

[পণ্ডিত শ্রী তারামোহন বেদান্তশাস্ত্রী]

দীপ্ত ললাট গঙ্গাধর পু[illegible]পুত্র,
দ্যুলোকের দ্যুতি পু[illegible] [illegible],
এ সব প্রতিভা মূর্ত্তা ভূলোক বাঙ্গালী [illegible],
[illegible]-[illegible], [illegible]-প্রিয়, তাপস সুধীবর

[illegible] চরণে প্রণত ধীর,
[illegible] আজ তার্কিক দল করিতেছে হাহাকার,
বঙ্গ[illegible] [illegible] মধ্যমণিরূপ। শাস্ত্র-সিন্ধু
বাংলার সেই শ্রেষ্ঠ মানব বাঙালীর কুল-ইন্দু ॥

সত্যের রূপ, ত্রেতার [illegible], দ্বাপরের [illegible],
ত্রিযুগের তুমি মহান্ মানব, সার্থক [illegible],
জ্ঞান কর্ম্ম ও উপাসনা [illegible] সাধনা সিদ্ধ [illegible]—
চিরজাগ্রত, চির উন্নত, গৌরব প্রতিভার।

[illegible] প্রতিভায় [illegible] কত উন্নত কত না উচ্চ
বিদেশী তন্ত্র থাকিলে পড়িয়া কতই নয় কত না তুচ্ছ
[illegible] দর্প করিয়ে চূর্ণ, [illegible],
তোমার মহিমা ঘোষিছে জগৎ—কণ্ঠে বিজয়-গান।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তুমি উন্নত জ্ঞানমণ্ডিত শির,
তন্ত্রে মন্ত্রে, খগোলে, ভূগোলে [illegible] পৃথিবীর,
মহিমা তোমার মুগ্ধ বাঙ্গালী মুক্তকণ্ঠে গায়,
দর্শনে ছিল কত না মনীষা—মনীষা [illegible]।

পরলোক হতে এস হে নামিয়া শৈব গঙ্গাধর,
করুণার বারি ঢাল গো বরষি আর্য্য বাঙ্গালী 'পরে'
মঙ্গল তব পরশ পাইয়া এ জাতি লভিবে প্রাণ,
অশ্রুসিক্ত দীনের অর্ঘ্য ধর মহামহীয়ান্।

অনাগত রোগ-প্রতিষেধের কথা

স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি এবং সংরক্ষণ

প্রাক্তনাধীন, পরসাপেক্ষ এবং স্বায়ত্ত।

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন)

যে যে ক্রিয়া-ক্রম অবলম্বন করিলে শরীর রোগ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে পারে—তাহার নাম চিকিৎসা বা রুক্ প্রতিক্রিয়া। শরীর এবং মনঃ সাধ্যরোগগ্রস্ত হইলে সযত্নে চিকিৎসা করিয়া রোগ নিবারণ করা দেহিমাত্রেরই সর্ব্বাগ্রগণ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনাগত রোগ-প্রতিষেধ বা স্বাস্থ্য সংরক্ষণ। কারণ, শরীর পীড়াগ্রস্ত হইলে, শরীরীর ক্লেশ ভোগ অবশ্যম্ভাবী; ন্যূনাধিক পরিমাণে দেহের অপচয়ও অনিবার্য্য। সুচিকিৎসা দ্বারা রোগ দূর হইলেও দেহ এবং মনঃ সম্যক্ প্রকৃতিস্থ হইতে কালবিলম্ব ঘটে। কুচিকিৎসকের হাতে পড়িলে নানা প্রকার অনিষ্টেরও সম্ভাবনা আছে। কোন কোন পীড়া একবার শরীর আশ্রয় করিয়া ছাড়িয়া গেলেও শরীরী আর পূর্ব্বতন পূর্ণস্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় না। তজ্জন্য দেহে যাহাতে রোগ প্রবেশ করিতে না পারে—তাহার উপায় বিধান করা মনুষ্যের আশু কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যাহার শরীর নীরোগ তাহাকে স্বস্থ বলে। স্বস্থের লক্ষণ—

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতু—মলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে।"

উক্ত শ্লোকের বিশদার্থ এইরূপ—

বায়ু, পিত্ত এবং কফের সাধারণ সংজ্ঞা দোষ। যাহার শরীরে উক্ত দোষত্রয় স্বস্থানে স্বভাবে এবং সমানে রহিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাকে সমদোষ বলে।

কায়াগ্নি এবং জঠরাগ্নি যাহার কোষ্ঠে এবং শাখায় শাখায় অর্থাৎ রক্তাদি ধাতুতে উচিত পরিমাণে [illegible] অব্যাহত ভাবে ধাত্বগ্নিসংরক্ষণ এবং পরিপাক-ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পাদন করে, তাহার নাম সমাগ্নি।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র—শরীরীর শরীর গঠনের এবং ধারণের মূল। এই সপ্ত পদার্থের নাম ধাতু। অব্যাহত সপ্তধাতুক শরীরীর নাম সমধাতু। জীব শরীরে মলোপচয় স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। শরীর মল দ্বিবিধ। এক প্রকার আহারজ মল; অপর প্রকারকে ধাতব মল বলে। আহারজ মল—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—চতুর্ব্বিধ আহার্য্য জঠরানলে সম্যক্ পরিপাক এবং বিপাক প্রাপ্ত হইলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। সার ভাগ রক্তাদি ধাতু-পোষণোপযোগী উপাদান লইয়া তরল শ্বেতস্বচ্ছ রসধাতুতে পরিণত হয়। অসার কঠিন ভাগ পুরীষরূপে তরলাংশ মূত্রাদিরূপে পরিণত হইয়া স্বস্ব পথে বহির্গত হইয়া যায়। ধাতব মল—হৃৎপিণ্ডের কোষ্ঠদ্বয়ে সঞ্চিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রাণবায়ুর তাড়নে, হৃৎকোষ্ঠ হইতে ধমনী পথে অতি দ্রুত বেগে সর্ব্বশরীরে প্রসর্পিত হইয়া শরীর পোষণোপযোগী সারভাগ যথাযথ ভাবে বিতরণ করিয়া, ব্যান বায়ুর তাড়নে শিরাপথে হৃৎপিণ্ডে অপর কোষ্ঠদ্বয়ে হৃতসার হইয়া ফিরিয়া আইসে। আসিবার সময়ে পক্ব-ভূত প্রসাদজ রসধাতু এবং দেহ নিগলিত তন্তকীর সহিত মিশিয়া প্রত্যাগমন করে। সেই শৈরিক রক্ত হৃৎকোষ্ঠ হইতে শ্বাসাশয়ে উপস্থিত হইয়া নাসা পথে মলত্যাগ করতঃ বিশুদ্ধীভূত হয়। যে মল নাসাপথ দিয়া প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত হয়, তাহা এক প্রকার ধাতব মল। তদ্ভিন্ন মেদো-

ূত্র প্রভৃতি কতিপয় মল—স্বেদমার্গ প্রভৃতি পথ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সেগুলিও ধাতুমল। যাহার শরীরে উক্ত পদার্থসমূহ মল স্বপ্রমাণের অধিক বা অল্প হয় না, পরন্তু দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের বাধা পায় না, তাহাকে সমমল বলে।

যাহার শরীরে শ্বাস, প্রশ্বাস, পরিপাক এবং রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে, তাহাকে সমক্রিয় বলে।

ভাগ্যবানের আত্মা সুপ্রসন্ন, মনঃ চিত্ত প্রসন্ন এবং সমুদায় কর্মেন্দ্রিয় স্ব স্ব কর্মে সুদক্ষ, তাহাকে প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ বলে।

উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ—সমদোষ, সমাগ্নি, সমধাতু, সমমল, সমক্রিয় এবং প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ ব্যক্তিই স্বস্থ। স্বস্থ শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্যঞ প্রত্যয় করিয়া স্বাস্থ্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, স্বস্থ ব্যক্তির যে প্রকৃত ভাব তাহার নাম স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের অপর নাম আরোগ্যতা।

অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যপ্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষণ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কারণ সুস্থ দেহপ্রাপ্তি এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কেবলমাত্র স্বাধীন নহে—প্রাক্তন সাপেক্ষ, পরাধীন এবং পুরুষকারায়ত্ত। কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

পূর্বজন্মের কৃতকর্মের নাম দৈব বা প্রাক্তন। জীব যখন পূর্বদেহ ত্যাগ করে, তখন তাহার পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্ম—ছায়ার ন্যায় আত্মার অনুগমন করে। যদি পূর্বকৃত কর্ম শুভ হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা সুক্ষেত্রে নির্দোষ পুরুষ শুক্রার্তবে আশ্রিত হইয়া জন্মান্তর গ্রহণ করে। শুক্রার্তবে আশ্রিত জীবাত্মা স্বকীয় ইচ্ছার বশগ হইয়া, মাতৃ-রক্ত হইতে দেহ গঠনের সম্যক্ উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া দোষ-ত্রয়ের সাহায্যে কর্মানুরূপ দেহ নির্মাণে ব্যাপৃত হয়। যাহার যেরূপ প্রাক্তন, সে সেইরূপ স্বকীয় আবাস ক্ষেত্র গড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। প্রাক্তন সাপেক্ষতার সহিত পরাপেক্ষিতারও সম্বন্ধ আছে।

মাতা যদি গর্ভচর্যা, কুশলা হন, তাহা হইলে ভ্রূণ-শরীরের সুনির্মিতির বাধা ঘটে না। গর্ভাবস্থায় মাতা অহিত আহার-বিহার পরায়ণা হইলে ভ্রূণ দেহের নির্মাণ-পারিপাট্যের ব্যাঘাত ঘটে। প্রসবকালে প্রসূত সন্তানের প্রতিপালনের ভারও পরের হাতে যায়। স্তন্য বিশুদ্ধ হইলে, মাতা বা ধাত্রী সন্তান পালনে সুদক্ষা ও যত্নবতী হইলে, প্রতিপালনোপযোগী দ্রব্যসম্ভারের অপ্রতুল না হইলে এবং বাতালোকপূর্ণ গৃহে সন্তানকে রাখিতে পারিলে, সে সুস্থ শরীরে সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিশোর-কিশোরীর প্রতিপালন ও ইংলৌকিক শিক্ষাদানও পরের উপর নির্ভর করে। সুশিক্ষিত ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনার হিতাহিত বিবেচনা পূর্বক যদি অহিত পরিবর্জন করতঃ হিতাচার বিহারপরায়ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাহা হইলে সুদীর্ঘ সুখায়ুঃ উপভোগের বাধা ঘটে না।

সংক্ষেপতঃ যাহা বলা হইল, তাহা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে যে, সকলেরই স্বাস্থ্য প্রাক্তনাধীন, পরায়ত্ত এবং পুরুষকার সাপেক্ষ।

অনেক সময়ে পরের দোষে পুরুষকার ব্যর্থ হইয়া যায়। (বাস্তবিক পরবশতা অনায়াস বাচী নহে, আয়ত্ত ব্যক্তি মাত্রেই পরবশবর্ত্তী)।

বহুবিষয়ে পরাপেক্ষ হইয়া আমাদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। কৃষিজীবী, পশুপালক, অপক্ক খাদ্য ও পক্ক খাদ্য ব্যবসায়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের জ্ঞানবত্তা এবং সদসৎ আচরণের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কৃষক প্রভৃতি যদি স্বস্ব কার্য্যে ও ব্যবসায়ে সুকুশল এবং সদাচার পরায়ণ হয়, তাহা হইলে জনসমাজের মঙ্গল হইতে পারে। স্বকার্য্যে অনিপুণ এবং অসদাচার কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ আমাদের মহান্ অনর্থের মূল।

কৃষিজীবী যদি কৃষিকর্মে অনভিজ্ঞ ও অযত্নপর হয় এবং ক্ষেত্রের যথোচিত উৎকর্ষ সাধন না করিয়া অযোগ্য বীজ বপন করতঃ শস্যোৎপাদনের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে

তাহারও ক্ষতি হয়, পুষ্টিতুষ্টি বর্দ্ধন শস্যও উৎপাদন হয় না। কৃষিকার্য্যে সুদক্ষ স্ব স্ব ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধনে তৎপর কৃষক, যথাকালে কর্ষিত ক্ষেত্রে শক্তিশালী বীজ বপন করিয়া যে শস্য উৎপাদন করে, তাহাই মানুষের উপযুক্ত খাদ্য। তদিতর খাদ্য পুষ্টি-তুষ্টি বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু উৎপন্ন শস্যের সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহা বিকৃত হইয়া যায়।

যাহারা গাভী, ছাগী এবং মহিষী পুষিয়া দুধের ব্যবসায় করে, অধুনা তাহাদের দুষ্কৃতির সীমা নাই। পশুপালকগণ স্ব স্ব পশুপালনে অভিজ্ঞ ও তৎপর নহে। দুগ্ধদায়িনী গাভী প্রভৃতি যোগ্য আহার উদর পুরিয়া খাইতে না পাইলে এবং তাহাদের নির্ম্মল পানীয়ের অভাব ঘটিলে তাহারা দুর্ব্বল, কৃশ ও রোগগ্রস্ত হয়। তাহাদের দুধ পান করিলে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টের ভাগ বেশী পাওয়া যায়। যে সকল দুগ্ধবতী হিতপরিমিত আহার পায়, বাতালোকপূত অনার্দ্র পরিষ্কৃত স্থানে যাহারা থাকিতে পায় এবং স্বচ্ছন্দে সৌরকর প্রদীপ্ত শষ্পসমাচ্ছন্ন মাঠে চরিয়া কাঁচা ঘাস ও লতাপাতা খাইবার যাহাদের সুবিধা আছে, তাহাদেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সুস্থ হৃষ্ট-পুষ্ট গরুর দুধ অমৃত স্বরূপ। ব্যাধিতা, গর্ভিণী, বিবৎসা এবং নবপ্রসূতার দুগ্ধ বিষকর। দুগ্ধবিক্রেতার এবং ক্রেতৃগণের সে প্রবিচার নাই, তজ্জন্য যে কোন প্রকার দুধের কেনাবেচা অবাধে চলিতেছে। অধুনা দুধে ভেজাল দিয়া বিক্রয় করার প্রথা সুপ্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। জল ভেজাল দেওয়ার ত কথাই নাই, কিন্তু বিশুদ্ধ জল সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, প্রায়শঃ নানা দোষ-দুষ্ট জল দুধে ভেজাল দেওয়া হয়। গোদুগ্ধের সহিত অন্য পশুর দুধ এবং বালিচূর্ণ মিশাইয়া দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা জনসমাজের মহান্ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অধুনা বিশুদ্ধ দুগ্ধ দুর্লভ, দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ দধিও সুলভ নহে, ঘৃত নবনীত অত্যন্ত দুর্লভ। আহার-পানীয়, দেহের পুষ্টি এবং মনের তুষ্টিকর পীযূষবৎ-পানীয়ের অবিশুদ্ধিতার কথা সংক্ষেপে কিছু বলা গেল। অতঃপর অপরাপর খাদ্যের গুণাগুণের এবং অপকারিতার কথা আমিও সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

ভাতই আমাদের প্রধান খাদ্য। সকলের জানা আছে যে, চা'ল জলের সহিত পাক করিয়া ভাত প্রস্তুত করা হয়। চা'ল ভাল হইলেই ভাত ভাল হয়। কিন্তু শুদ্ধ, অবিকৃত চা'ল একান্ত দুর্লভ না হইলেও সুলভ নয়। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত, তৈল আটা ময়দা এবং অপরাপর খাদ্য-পানীয়ের সহিত যেরূপ ভেজাল চলিতেছে, চাউলে সেরূপ ভেজাল চলিবার সম্ভাবনা নাই। বড় জোর নূতন চাউলের সঙ্গে পুরাতন চা'লের, সরুর সহিত মোটার ভাঁজ চলে। তাহাতে চাউলের বিশিষ্ট বিকৃতির সম্ভাবনা কি? এরূপ বিতর্কের প্রতিবাদ করিতে হইলে, অগ্রে নির্দ্দোষ চাউলের নির্দ্দেশ করিতে হয়, যেহেতু বিকৃতি জ্ঞান—প্রকৃতিজ্ঞান সাপেক্ষ দ্রব্যের স্বরূপ জানিলে তাহার বিকার জানিবার সাধ্য হয় না।

ধান্য অর্থাৎ ধান আমাদের দেশের সকলেরই সুপরিচিত শস্য। ধান ভানিয়া বা কুটিয়া যে চাউল প্রস্তুত করিতে হয়—তাহাও সকলের জানা আছে। তজ্জন্য ধান চা'লের স্বরূপ বর্ণন অনাবশ্যক। কিন্তু ধান চা'লের প্রাকৃতিক সুস্থিতির স্বরূপ সকলের জানা না থাকিতে পারে। যাহারা জানেন না, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত সুস্থিত ধান ও চাউলের কথা কিছু বলা যা'ক।

চাউলের আবরণ তিনটী। এই আবরণত্রয়ে সুরক্ষিত তণ্ডুলের বীজাঙ্কুরযোনি, শ্বেত এবং সোমসত্ত্বরক্ষিত থাকে। চাউলের প্রথম আবরণের নাম তুষ, দ্বিতীয় তৃতীয় আবরণ কণ্ড নামে অভিহিত। কণ্ডের চলিত নাম কুঁড়া। কোন কোন ধান্যের উপরিতন কণ্ডস্তর ঈষল্লোহিতাভ এবং পুরু। কোন ধান্যের উক্তস্তর পাণ্ডুচ্ছবি। তন্নিম্নের কণ্ডস্তর প্রায়শঃ পাণ্ডুবর্ণ। ধান কুটিয়া আদৌ তাহাকে তুষ বিমুক্ত করিতে হয়, তাহার পর কণ্ড বিমোচন করা হয়। কণ্ড বিমুক্ত চাউলের নাম কাঁড়াল চা'ল। ধান—ঢেঁকীতে

ছাঁনিলে কিংবা উদূখলে কুটিলে তুষ ও উপরিতন কণ্ডস্তর বিযুক্ত হইয়া যায়। কলে ছাঁটিলে ও মাজিলে কোন স্তরই থাকে না। নিম্নকণ্ডস্তর বিনির্ম্মুক্ত চা"ল উপযুক্ত ভক্ষ্য নহে। তাদৃশ চাউল দীর্ঘকাল খাইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং পাদ-শোথ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা যাক। কথাটা এই, আমরা আমাদের শরীরস্থ সজীব উপাদান-পোষণের জন্য যে সকল আহার্য্য আহার করি, তাহা প্রায়শঃ জড় পদার্থ। "সমঃ সমং বর্দ্ধয়তি"—তজ্জন্য জড় পদার্থদ্বারা অজড় পদার্থ সংবর্দ্ধিত হইতে পারে না। জড়আহার্য্য, পরিপাক যন্ত্র-পরম্পরায় পরিপাক ও বিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার জীর্ণ হ্রাস ঘটে। তজ্জন্য জড় আহার্য্যের জীবনন্যস্ত সার ভাগ জীব শরীর পোষণের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চা'ল ডা'ল, গোধূম, ঘৃত এবং দুগ্ধ প্রভৃতি আহার্য্য-দ্রব্যে এরূপ একপ্রকার উপাদান থাকে, যাহা উদরস্থ হইলে পরিপাক-যন্ত্রদ্বারা জীবন্ন্যাসের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতঃই জীবদেহস্থ রসরক্তাদি পরিপোষণ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ দ্রব্যনিষ্ঠ উপাদানের নাম স্বপ্ন। কোন কোন আহার্য্য দন্তদ্বারা সম্যক নিষ্পীড়িত হইলে প্রক্লিন্ন এবং মধুরীভূত হয়। দ্রব্যে যে উপাদান থাকিলে এইরূপ কার্য্যের সম্ভাবনা হয়, তাহার নাম সোমসত্ত্ব।

দীর্ঘকাল যাবৎ তণ্ডুলস্তরত্রিতয় বিনির্ম্মুক্ত হইয়া রহিলে স্বপ্নভ্রষ্ট হইয়া যায়, সোমসত্ত্বও জীর্ণ হইয়া আইসে। গোলাজাত ও রাশীকৃত চাউল ভাবিয়া উঠে, তখন তাহাতে পোকা ধরে। এই চা'লই অধুনা আমাদের খাদ্য। গোলা-জাত চা'ল কতকাল থাকে—তাহার নিশ্চয়তা নাই। অনেকে বিবেচনা করেন, পুরাতন চাউল লঘুপাক, সুতরাং সুপথ্য। কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু চা'লরূপে দীর্ঘকাল রহিয়া পুরাতন হইলে তাহা সুপথ্য হয় না। তাদৃশ চা'ল লঘু হইতে পারে, কিন্তু নিঃসার, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের বিশিষ্ট হেতু। এক বৎসর কাল সুরক্ষিত ধানের চাউলই সুপথ্য। তারপর ধানও ক্রমশঃ গুণহীন হইতে থাকে। "ধান্যং সর্ব্বং সমাতীতং পথ্যং লঘ্বগ্নিদং ভবং।

ততঃপরং লঘুতরং রুক্ষং বাত প্রকোপনং।"

সম্ভবতঃ একবৎসর অতীত হইলে, আর এক বৎসর কাল যাবৎ ধানের কার্য্য অক্ষুন্ন থাকে। সেই ধান ভানিয়া যে চাউল পাওয়া যায় তাহাই সুপথ্য॥

দুই প্রকার ক্রম অবলম্বন করতঃ আমাদের দেশে তণ্ডুল প্রস্তুতির প্রথা প্রচলিত আছে। এক প্রকার—আদৌ ধানকে পরিমিত জলের সহিত অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। সেই শুষ্কীকৃত ধান ঢেকীতে ভানিয়া কি কলে ছাটিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হয়। এই রূপ চা'লকে সিদ্ধ চা'ল বলে। দ্বিতীয় প্রকারের নাম আতপ চা'ল। ধান—আতপ অর্থাৎ রৌদ্রে শুকাইয়া কুটিয়া ছাটিয়া এই চাউল প্রস্তুত করা হয়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ চা'লেরই প্রচলন বেশী। কিন্তু আতপ চাউল অপেক্ষা সিদ্ধ চা'ল হীনবীর্য্য। কারণ পাক করিবার সময় তণ্ডুল নিষ্ঠ স্বপ্ন দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং বীজাঙ্কুর ক্ষেত্র বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউরোপীয় শল্য-চিকিৎসা

(শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ)

বাঙ্গালায়—শুধু বাঙ্গালার কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে—আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য-চিকিৎসা কত দিন লোপ পাইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে সে দুই এক শত বৎসরের কথা নহে, আরও অনেক পূর্ব্বের কথা।

ডাক্তারি চিকিৎসা ত এ দেশে সে দিন চলিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য-চিকিৎসা লোপ হওয়ার পর শল্য-হননের প্রয়োজন হইলে আমাদের দেশে কি করা হইত? এ প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর জানিনা। তবে বিনা অস্ত্র প্রয়োগে কেবল জড়িবুটির বাহিক ব্যবহারে, যে অনেক সময় রোগী আরোগ্য হইত আধুনিক কালের অস্ত্রোপচারের অবস্থা হইতে যে সে দিন দিন ঐ ঔষধেই আরোগ্যের পথে যাইত, আর তাহাতে যে অনেক স্থলেই অত্যল্প সময়ে মন্ত্রশক্তির ন্যায় নিরাময়ত্ব সাধিত হইত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ আমাদের পিতৃ পিতামহগণ নিজেরা এ প্রকার ঘটনা অনেক দেখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পিতৃ পিতামহদিগের নিকট ঐরূপ ঘটনার কথাও অনেক শুনিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে আবার আমরা শুনিয়াছি; আর আমরাও যে এক কালে ঐরূপ ঘটনা একেবারে দেখি নাই, এমত নহে। তবে যে কারণেই হউক, এখনকার লোকে ঐ সকল ঔষধ বড় একটা জানে না। আগেকার অনেকে—ছোট জাতির মধ্যেও ঐ সকল ঔষধের খোঁজ খবর রাখিত। তখনকার এক একটা তেকেলে বুড়ী সামান্য একটু লতা পাতায় যাহা করিতে পারিত, এখনকার বড় বড় হোমরা চোমরা "অস্ত্রধারীরা" অনেক স্থলেই তাহার কিছু করিতে পারেন না। আবার গৃহস্থদিগের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসীরা আসিয়া ঐরূপ জড়িবুটির প্রয়োগে অনেক অসাধ্য ক্ষতাদি আশ্চর্য্য ভাবে আরোগ্য করিতেন এখনও মধ্যে মধ্যে করেন। আমাদের দেশীয় চাঁদসীর চিকিৎসা ঐ সকলের অন্যতম দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজে ঘাড়ের উপর একটা সংঘাতিক নালী-ঘায়ে ভুগি। নিত্য জ্বর হইত, শরীর একেবারে শীর্ণ—যাহাতে কিছুই বাকি ছিল না। ডাক্তারেরা দুই মাসের উপর চিকিৎসা করিলেন, শেষে বলিলেন chloroform করিয়া কাটাফাড়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই, আর তাহা না করিলে দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত হইবে। সেই দিনই শ্রীভগবানের কৃপায় জনৈক চাঁদসীর চিকিৎসককে (নাম শ্রীযুক্ত নটবরদাস, ইনি ৺কাশীধাম দশাশ্বমেধ ঘাটে থাকেন) পাওয়া গেল, ইঁহার চিকিৎসায় আমি প্রাণ পাই। ডাক্তারি চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে এ দেশে অস্ত্র-চিকিৎসার কাজ পূর্ব্বোক্তরূপেই কতকটা হইত, কিন্তু উহাতে সব কাজ নিশ্চয় হইত না। এই যেমন মানবের দেহের অঙ্গবিশেষ ছেদন (Amputation ইত্যাদি।

ইউরোপীয় অনেক মনস্বী আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্র চিকিৎসার প্রশংসা করিয়াছেন। লণ্ডনের King's College এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক Dr. Royle হিন্দুদিগের ভৈষজ্য-রত্নাবলীর (Materia-Medica)* প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন; তাহার ৪৯ পৃষ্ঠায় তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য-চিকিৎসায় ১২৭ প্রকার অস্ত্র ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। word এর "Hindoos" পুস্তকের দ্বিতীয় ভলিউমের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় এবং Coat এর "Transactions of the Literary Society of Bombay" নামক গ্রন্থের

* An Essay on the Antiquity of the Indian Materia medica.

তৃতীয় ভলিউমের ২৩২ পৃষ্ঠাতেও হিন্দু-চিকিৎসার উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালের হিন্দুরা যে অশ্মরী-রোগে, ছানি প্রভৃতি নেত্র-রোগে, গর্ভ হইতে ভ্রূণ-নিষ্কাশন প্রভৃতি ব্যাপারে অস্ত্রহনন-কুশলী ছিলেন, ইউরোপীয় অনেকের মতে ইহা একরূপ অবিসম্বাদিত সত্য। আয়ুর্ব্বেদের যশ তখন পারিপার্শ্বিক প্রদেশ সকলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক আচার্য্য Dietz বলেন যে, অষ্টম শতাব্দীতে খালিফা হারুন-অল-রসিদের দরবারে দুইজন হিন্দু-চিকিৎসক থাকিতেন। কিন্তু ইঁহারা যে অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন, এমত ঠিক বুঝা যায় না। তিনি যথাক্রমে ইঁহাদের Salch এবং Manka নামে পরিচিত করিয়াছেন। ইঁহাদের যে ঐ নাম ছিল না, ইহা খুব সম্ভব। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। ইতিহাসে আমরা তক্ষশিলাকে "Taxila" পড়ি, পুরুর নাম "Porus" পড়ি, চন্দ্রগুপ্তকে "Sandracottus" পড়ি, আর আজিকার দিনেও বিদেশীয়দিগের কৃপায় আমরা কন্যা-কুমারীকে "Cape Cornorin" পড়ি, মুম্বাইকে "Bombay" পড়ি, বারাসতকে "Baraset" পড়ি ; এ সকল ছাড়া আমাদের দেশের গল্পেই শুনি, বাঙ্গালী "মথুসিংহ" জনৈক স্বদেশবাসীর নিকট "গুড়ব্যাঘ্র" ইতি নাম পাইয়াছিলেন। Salch এবং Manka নামও ঐ রকমের কিছু হইতে পারে। আমরা "চরকে"ও ঋষিদিগের একটা মিটিং প্রসঙ্গে উক্ত দেখি :—

কাঙ্কায়নশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীক ভিষজাং বরঃ।

সূত্রস্থান—২৬ অধ্যায়।

এই বাহ্লীক যদি দেশ-বিশেষের নাম হয়, তবে উহা ভারতবর্ষেই (কাশ্মীরে) বটে। সুতরাং এই শ্লোকে বিদেশ-বাসী হিন্দু-চিকিৎসক পাই না।

আয়ুর্ব্বেদীয় শল্য-চিকিৎসা আমাদের দেশ হইতে কেন লোপ পাইয়াছে, তাহারও কারণ-নির্দ্দেশ সহজ নহে। শব-ব্যবচ্ছেদ কার্য্য আমাদের পূর্ব্বেকার বাঙ্গলা সমাজে সে দিন পর্য্যন্তও হেয় ছিল, ইহা আমরা জানি। কিন্তু ইহাই ঐ লোপ-সম্বন্ধে একমাত্র কারণ নহে ; অন্য কারণও থাকার খুব সম্ভব ঐ কার্য্য আত্যংশে উচ্চ হিন্দুগণের পক্ষে তৎকালে বাঞ্ছনীয় না হইলেও উহা প্রাচীনকালের কাহারও কাহারও মতে শূদ্রগণের অকরণীয় ছিল না। সেরূপ ব্যবস্থা থাকাতেও সে মত কাজ না হওয়ায় বোধ হয় পরবর্ত্তীকালে শূদ্রগণের আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল ; অধ্যাপকগণ শূদ্রদের অধ্যাপনা কার্য্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন। "সুশ্রুতে" ত আমরা স্পষ্টভাবে লিখিত দেখি :—

শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতং
অধ্যাপয়েদিত্যেকে।

সূত্রস্থান, দ্বিতীয় (শিষ্যোপনীয়) অধ্যায়।

তথাপি কোন সৎশূদ্র সন্তান যে পূর্ব্বতন কালে আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষিত হইয়া চিকিৎসক হইয়াছিলেন, এমন কথা আমরা জানি না। কিন্তু উক্ত শ্লোকানুসারে বুঝিতে হয়, যে শূদ্রও তখনকার দিনে আয়ুর্ব্বেদে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন ; তাহা হইলে তিনি ঔষধও প্রস্তুত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কারণ সে সময়ে চিকিৎসকেই ঔষধ তৈয়ার করিতেন। (এখন কোথাও কোথাও এ নিয়মের ব্যত্যয় দেখিতে পাই।) কাল-মাহাত্ম্যে কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে বৈদ্যেতর জাতির নির্ম্মিত ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ হইয়াছিল বোধ হয়। তৎসম্বন্ধে এরূপ শাসনও প্রচলিত হইয়া থাকিবে যে, শূদ্রজাতীয় কেহ ঐ প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে এবং দ্বিজাতীয় কেহ ঐরূপ করিলে এককালে জাতি হারাইবে :—

অন্য জাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্য সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥
মোহাদ্দ্বিজাতি বর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥

(ভৈষজ্যরত্নাবলী—বিনোদ লাল সেন)

কাজেই শূদ্রগণের পক্ষেও আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চার উপায় ছিল না।

আর্য্য ঋষিদের শাস্ত্রের সকল বিভাগেই আমরা কিন্তু অত্যাধিক উদারতার পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের কাহাকেও কাহাকেও—এমন কি জারজ-গর্ভজাতকেও প্রাচীন হিন্দুসমাজ যোগ্যতা দেখিলে ব্রাহ্মণের পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই হিসাবে শূদ্রও আয়ুর্ব্বেদ পড়ার অধিকার পাইয়া থাকিবে বোধ হয়। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলি, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে শূদ্রও অধিকারী, ইহা ভাগবতেই দেখি। কিন্তু এখন যোগ্য শূদ্রের মুখে ভাগবত কয়জন গোঁড়া হিন্দু শুনেন? চণ্ডীপাঠে ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও অধিকার নাই এখন শুনি; আগে কিন্তু ঠিক এ নিয়ম ছিল না। অবশ্য ইহার প্রমাণ আছে। আর কত বলিব? এই সকল মানসিক সঙ্কীর্ণতার ফলে আজি হিন্দুর সকল দিকেই অধঃপতন; সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের শল্য-চিকিৎসারও এককালে লোপ সাধিত হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্র-চিকিৎসা আমাদের দেশে লুপ্ত হইলে পর কোনও এক সময় হইতে নাপিত সাধারণ এ দেশের সার্জ্জন (Surgeon) হইয়াছিল এবং এখনও বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে উহারা সম্পূর্ণ ভাবে ঐ পদবীতেই অধিরূঢ় আছে। গাছ-গাছড়ায় যে সকল ক্ষত ও স্ফোটকাদি সারিত না, নরসুন্দর মহাশয়েরা সে সকল স্থলে হতাশের আশা ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইউরোপেও সে দিন পর্য্যন্ত এই নাপিতই সার্জ্জন ছিল; অনতিপূর্ব্বে সে তাহার সার্জ্জনরূপ উচ্চাভিধান খোয়াইয়া তাহার নিজস্ব নাপিত-ভাব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে সব কথা বলিতেছি।

ইউরোপের মধ্যযুগে—পঞ্চম শতাব্দীতে রোমক-সাম্রাজ্যের পতন হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় সাহিত্যাদির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কাল, যাহাকে ইংরেজীতে Middle ages বলে—নাপিতগণই তথাকার সার্জ্জন ছিল। ইংলণ্ডে, ইহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত উহারাই অস্ত্র চিকিৎসা করিত। প্রথম প্রথম উহারা রক্ত মোক্ষণাদি কার্য্য করা ভিন্ন সন্ন্যাসীদিগকেও কামাইত, এই সকলে উহারা প্রথম শিক্ষা পায়। হাসির কথা এই যে, প্রুসিয়ার ফ্রেডারিক্ দি গ্রেটের (Frederick the Great) সৈন্যদলের সার্জ্জনগণকে ও সেনানীদিগকে ক্ষৌর করিতে হইত। জার্ম্মণির নাপিতেরা বাটি-বসান (cupping) জোঁক বসান (Leeching) রক্তমোক্ষণ (Bleeding) দাঁত তোলা—এ সবই করিত।

১২১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্‌স্ দেশের প্যারী (Paris) সহরের St. Come এ একটি কলেজ (সমব্যবসায়ী লোকদের সভা) সংস্থাপিত হয়। ইহার সভাগণ দুই শ্রেণীর ছিল: একদল ছিল উহারই মধ্যে একটু লিখিয়ে-পড়িয়ে নাপিত সার্জ্জন (Clerical barbar Surgeons),—ইহাদের ফুলদার পোষাক পরার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল—আর অন্য দলে ছিল কেবল সাধারণ (Lay) নাপিত-সার্জ্জন। পরবর্ত্তী কালে রাজাজ্ঞায় শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদের অস্ত্রচিকিৎসার অধিকার লোপ হয়; তবে সে আদেশে ইহাও থাকে যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া উপযুক্ত বিবেচিত হইলে শেষোক্ত দলের লোকেও সার্জ্জন হইতে পারিবে। খৃষ্টের পর ১৩৭২ অব্দে ফ্রান্সের পঞ্চম চার্লস আবার আদেশ করেন যে, কথিত শেষদলের সকল নাপিতই ক্ষত চিকিৎসা করিতে পারিবে, তাহাতে অপর শ্রেণীর কেহ বাধা দিতে পারিবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বিজ্ঞানানুমোদিত অস্ত্রচিকিৎসার প্রচলন হয়; তথাকার পঞ্চদশ লুই St. Corne এ উপদেশ দিবার জন্য ৫ জন অস্ত্রচিকিৎসার অধ্যাপকের নিয়োগ মঞ্জুর করেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তথায় Acadeuing of Surgery প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পঞ্চদশ লুইর বিধি-অনুসারে সাধারণ অর্থাৎ প্রোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাপিত দ্বারা অস্ত্রচিকিৎসা এককালে নিষিদ্ধ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সার্জ্জনদের চেষ্টার ফলে প্যারিসহর অস্ত্র-

চিকিৎসার প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। সার্জ্জন La Peyronie ঐ সকল সার্জ্জনদের অন্যতম।

এখন ইংলণ্ডের কথা বলি। খৃষ্ট জন্মিবার অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডের ইতিহাসে চিকিৎসার উল্লেখ দেখা যায়। তখনও ব্রিটনেরা (Britons) রোমের শাসনাধীন হয় নাই। সে সময়ে ড্রুইড (Druid) নামে তাহাদের পুরোহিতগণই চিকিৎসাকার্য্য করিত। তাহাদের চিকিৎসার প্রধান অবলম্বন ছিল—গাছগাছড়া। Mistletoe নামে একরূপ পরগাছা তখন অনেক গাছে—সময়ে সময়ে ওক (Oak) গাছেও জন্মিত। ঔষধিতে তাহার ব্যবহার ড্রুইডেরা খুবই করিত। সে সকল ঔষধ তাহারা কাহাকেও শিখাইত না। ইহাই ইংলণ্ডের চিকিৎসার আরম্ভ। ইহার বহু পরে দেখি, তথাকার রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময় (খৃঃ ১৪৬১—১৪৮৩) ইংলণ্ডেও পূর্ব্বোক্তরূপ দুই দল নাপিত সার্জ্জন ছিল। উক্ত রাজা সাধারণ নাপিতগণকে অস্ত্রচিকিৎসায় অধিকার দেন। উহারা সকলে মিলিয়া একটা নাপিতকোম্পানী গঠিত করিয়াছিল। এই দলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাপিতেরাই ছিল। অপর শ্রেণীর নাপিতেরা তখন তথাকার কায়চিকিৎসকগণের (Physicians) সহিত মিলিত হইয়া একটী দলবদ্ধ হয়, পরে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তাহারা তাহাদের ভেদের জন্য একটা বিশেষ সনন্দ পায়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উভয় দলে প্রতিযোগিতা চলে। আবার ঐ বৎসরেই ঐ দুই দল মিলিত হইয়া "The united Barber Surgeon Company" এই নাম গ্রহণ করে। Thomous Vicary সর্ব্বপ্রথম উহাদের Master হয়। রাজা অষ্টম হেনরি অনিচ্ছায় উহাদিগকে ঐ কোম্পানীর নিয়ম পত্র দেন। এইরূপে মিলিত হইয়া ঐ দুই দলের ঝগড়া সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল। তখনকার কায়চিকিৎসকগণ ঐ উভয় দলকেই একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় সাধারণ নাপিত সার্জ্জনরা "পুনর্ব্বিধিক" হয়, অর্থাৎ তাহারা অস্ত্রচিকিৎসার অধিকারচ্যুত হয়; আর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে অপর দলের সার্জ্জনগণ বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত স্বতন্ত্র হন; তাহাদের "Master Governors" ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা সার্জ্জন চেসেলডেন (Cheselden) সেণ্ট টমাস্ হাসপাতালে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন; ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পট্ট (Pott) সেণ্ট বার্থলোমিউ (St. Bartholomew) হাসপাতালে ঐরূপ করিতে থাকেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অস্ত্র চিকিৎসা শিখিবার জন্য লণ্ডন হাসপাতালে ছাত্র প্রবেশ করিতে থাকে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গাইজ (Guij's) হাসপাতালেও ঐ প্রকার ছাত্র লওয়া আরম্ভ হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জ সার্জ্জন-সঙ্ঘের বর্ত্তমান "Royal College of Surgeons" নাম দিয়া পুনরায় সনন্দ দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে অস্ত্র চিকিৎসার বিশেষভাবে উন্নতি হয়।

ইংলণ্ডের টিউডর (Tudor) বংশীয় প্রথম রাজা সপ্তম হেনরির সময় (খৃঃ ১৪৮৫—১৫০৯) টমাস্ লিনেকার (Thomas Linacre) নামে জনৈক ব্যক্তির পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই। তিনি তদানীন্তন কালের পণ্ডিত সমাজ ইটালীতে অনেক দিন থাকিয়া গ্রীক্ ভাষা ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহার জন্মভূমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনিই ইংলণ্ডে গ্রীক্ ভাষার প্রথম শিক্ষাদাতা, আবার ইনিই তখনকার ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তথাকার Royal College of Physicians ইহারই স্থাপিত। কিন্তু ইনি অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন না। ইঁহারই সময়ে ইংলণ্ডের লোকেরা লেখা-পড়ায় মন দেয়; তাহার পূর্ব্বে তাহারা কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়াই প্রায় থাকিত। টিউডরদিগের আরও পূর্ব্ববর্ত্তী Plantagenet রাজাদিগের সময় হইতে পাদরীরাই যা-একটু লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন, আর তাঁহারা চিকিৎসাও করিতেন। টিউডরগণের আধিপত্যকালে ইংলণ্ডে Alchemyর (অপ্‌রসায়ন শাস্ত্র) চর্চ্চা আরম্ভ হয়; তাহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল; (১) স্পর্শ-মণির (Philosopher's Stone) ও (২) অমরত্ব ও

ও চিরসৌন্দর্য্যপ্রদ ঔষধবিশেষের (Elixir of Life) আবিষ্কার। ইহা হইতে ক্রমশঃ আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের (Chemistry) উদ্ভব হয়। তখন ডাইনী বা ডাকিনী-বৃত্তিরও (Witch-Craft) খুব চর্চ্চা ইংলণ্ডে হইত। ডাইনীরা তাহাদের ক্রিয়ার জন্য নানা দ্রব্যের ব্যবহার করিত। এই সকলই আধুনিক ইংলণ্ডীয় ভৈষজ্যের মূল। টিউডর দিগের পরবর্ত্তী ষ্টুয়ার্ট রাজাদিগের আমলে যথার্থ রসায়ন বিদ্যার অত্যধিক চর্চ্চা আরম্ভ হয়; তাহার ফলে তখনকার দ্বিতীয় চার্লসের Whitehall রাজপ্রাসাদেও একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Laboratary) রাখা হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত দুই শ্রেণীর নাপিত-সার্জ্জনদের কার্য্য প্রায় সর্ব্বত্রে স্থূলতঃ একই প্রকারের ছিল, কেবল প্রথম শ্রেণীর নাপিতেরা ক্ষৌর কার্য্য করিত না, কঠিন অস্ত্রোপচারের আবশ্যক হইলে সে সব তাহারাই করিত। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যদি তাহাদের কেহ ঐ কার্য্যে সফল না হইত, তবেই তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত। কশাঘাত সহা, চিরদাসত্ব করা, সর্ব্বস্বান্ত হওয়া, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত যাওয়া—সে নিষ্ফলতার পরিণাম ছিল। ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে বোহিমিয়ার জনের (John of Bohemia) অন্ধত্ব সারাইতে না পারায় একজন সার্জ্জনকে ওডার (Oder) নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বেচারা পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া (Strolling) রোগী দেখিত। হাঙ্গেরীর (Hungary) রাজা ম্যাথিয়স্ (Mathias) এক সময়ে ঘোষণা করিয়া দেন যে, তাঁহার দেহের শর-বেধ-জনিত ক্ষত কোন সার্জ্জন আরোগ্য করিতে পারিলে সে বিশেষ ভাবেই পুরস্কৃত হইবে, অন্যথা তাহার প্রাণ যাইবে। এই রকম ছিল তখনকার সার্জ্জনদের কপালের ভোগ।

এখন দেখুন, ইউরোপের অস্ত্র চিকিৎসার বয়স কত। আরও ঐ সঙ্গে ভাবুন, এই প্রথম যৌবনেই উহার কি উন্নতি। আজকাল ইউরোপীয় অস্ত্র চিকিৎসার কত অদ্ভুত কথা শুনা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিব।

৩৪ বৎসর পূর্ব্বে, নিউইয়র্ক ষ্টেটের (Newyork State) Bufalow নামক স্থানে ভিয়েনা-ইউনিভার্সিটির ডাক্তার Hans Finsterer টেবিলের উপর শায়িত জনৈক রোগীর পাকস্থলীটা (Stomach) সম্পূর্ণ বাহির করিয়া তাহাতে সামান্য একটু অস্ত্র-প্রয়োগের পর পুনরায় তাহার পেটের ভিতর পুরিয়া দেন। অন্যান্য অনেক সার্জ্জনও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ কার্য্য করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সে সময়ের আগাগোড়া রোগী সম্পূর্ণ সজ্ঞানই ছিল; অস্ত্র-হননকারী ডাক্তার তাহার সহিত মাঝে মাঝে কথাও কহিতেছিলেন। পরিণামে রোগীর কিছুই মন্দ ঘটে নাই। পাঠক, এ ব্যাপার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায় কি? কিন্তু ইহা খুব সত্য। ইউরোপের এই অল্প কালের বিদ্যার এত চটক যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের আয়ুর্ব্বেদের ঐ বিদ্যার পূর্ব্বাপর চর্চ্চা হইয়া আসিলে না জানি এখন কি হইত।

আয়ুর্ব্বেদের ঐ বিদ্যা আজি কত কালের? ইউরোপীয়েরা ইহার উত্তর দিতে পারেন না। * তাঁহাদের আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ ত মোটামুটি বলিতে গেলে খৃষ্টজন্মের পর হইতে। সে ত সে দিনের কথা। তখনও ইংলণ্ডীয় ব্রিটনগণ অঙ্গরাগ করিয়া উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত বলিলেই হয়। আর ইউরোপীয়দের প্রাচীন পুরাবৃত্তকাল ত আসিরিয়া (Assyria) হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীস রোমেই শেষ। ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকালের তুলনায় সেও ত সে দিনের কথা। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩১৯ বৎসরে আসিরিয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, প্রাচীন গ্রীসের পুরাবৃত্তকালের আরম্ভ হইতেছে, খৃষ্ট জন্মিবার ১৮০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে। আর সেই গ্রীসের পতনের পর সাগরান্ত রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। আসিরিয়ার ইতিবৃত্তের কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং তাহার অনতিপরেই যদুবংশ-ধ্বংস। তাহার পর হইতে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমিক হ্রাস আরম্ভ হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু

* Elphinstone's History of India, Hindu period; p 159

পূর্ব্বগামী সেই সভ্যতার চরম কীর্ত্তি হইতেছে —চরক, সুশ্রুত ইউরোপের পুরাবৃত্ত-কাল যে সময় নাগাল পায় কি? তবে আমরা এ সব কথা খুব জোর করিয়া বলিতে ভয় পাই। কারণ, আমাদের ত তেমন অনুসন্ধান নাই।

এখন লজ্জা হয় না কি? আমাদের আয়ুর্ব্বেদ হইতে জগৎ চিকিৎসা শিখিল, আর এখন কি না অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য আমরা ইউরোপের মুখাপেক্ষী? তা মুখাপেক্ষী হই, প্রাণ রকমেই হইব। হইল না হয় আয়ুর্ব্বেদ অনাদি-কালের—"যাবৎ মেরুস্থিতাঃ দেবাঃ—" সেই সময়ের; আর ইউরোপ হইল বটে, সে দিনের; তথাপি বিধাতার ইচ্ছায় এখন ইউরোপ তুলনায় জ্ঞানবৃদ্ধ; অতএব আমরা তাহার নিকট শিক্ষা লইব। কথায় বলে:—

"বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।"

অতএব আমরা ডাক্তারি-শিক্ষিত কবিরাজের নিকট, অথবা কবিরাজি শিক্ষিত ডাক্তারের নিকট অস্ত্র-চিকিৎসা শিখিয়া সে শিক্ষার সাহায্যে সুশ্রুতাদি বুঝিব। ইহাতে লজ্জা নাই; লজ্জা করিলেই ঠকিব।

ডাক্তারী ও কবিরাজীর সমন্বয় †

(ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি)

নমো ব্রহ্ম দিবোদাস সুশ্রুতেভ্যো নমো নমঃ।
এড্‌মনষ্টন চার্লসায় নমঃ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

প্রথমতঃ সেই আদি কবি—যাঁর মুখ থেকে আয়ুর্ব্বেদ নির্গত হয়েছিল, তাঁকে নমস্কার। পরে সেই কাশীশ্বর ধন্বন্তরি দিবোদাস—যিনি সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিদের নিকট অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে নমস্কার। তৎপর সেই সুশ্রুত ঋষি—যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে নমস্কার। সর্ব্বশেষে আমার গুরু, সেই এড্‌মনষ্টন্ চার্লস্—যাঁর কৃপায় ধাত্রীবিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক'রেছি, তাঁ'কে নমস্কার।

সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য যখন আপনাদের আহ্বান পেয়েছিল, আমি প্রথমতঃ আপনাকে অযোগ্য মনে ক'রে ইতস্ততঃ ক'রেছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম আপনাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তখন মনে ক'রে নিলাম—এই সম্মান আমার প্রতি নয়, কিন্তু আমার আয়ুর্ব্বেদ-প্রীতির প্রতি। তাই আপনাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ ক'রে নিলাম। আর দুটী কারণে এই প্রস্তাব গ্রহণ ক'রেছি—ঋণশোধ এবং আত্ম বোধ।

অনেকে হয় ত শুনে চমৎকৃত হ'বেন, এই বঙ্গদেশে —, বঙ্গদেশে কেন —সমগ্র ভারতে, ডাক্তারী বিদ্যা-প্রতিষ্ঠার মূল একজন আয়ুর্ব্বেদীয় অধ্যাপক। সংস্কৃত কলেজে দুই বৎসর ব্যাপী আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেখানে ছাগল কেটে শবব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দেওয়া হ'ত। পণ্ডিত ক্ষুদিরাম বিশারদ এবং নব কুমার গুপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। ক্ষুদিরামের পর মধুসূদন গুপ্ত আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ডেবিড হেয়ারের নিকট তাঁর ইংরাজী শিক্ষা। এই মধুসূদন গুপ্তকে মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়, এবং তিনি যখন শবব্যবচ্ছেদ করবার জন্য ছুরি ধারণ ক'রেছিলেন, তখন নাকি উইলিউম দুর্গে তোপ ধ্বনি—তাঁহাকে

† চন্দননগর-বৈদ্যবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

ডাক্তারী বিভার বিজয় ঘোষণা ক'রেছিল সেই ডাক্তারী প্রতিষ্ঠানকে আজ স্মরণ ক'রে তাঁর ঋণ-পাশ থেকে কথঞ্চিৎ মুক্ত হ'তে চাই।

দ্বিতীয় কারণ আত্মবোধ জাগ্রত করা। আমরা কাহার সন্তান—সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া। আমরা এখন নকলনবিশ হ'য়েছি; প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য পশ্চিমমুখী হ'য়ে আছি। ঐ জার্মাণ কখ্ ওলাউঠার ও যক্ষ্মার বীজাণু আবিষ্কার ক'রেছেন, তাই আমরা ওলা-উঠা-তত্ত্ব ও যক্ষ্মা-তত্ত্ব জেনেছি। এমন কি ঐ, পঞ্চাশ বৎসরের সভ্যতাভিমানী জাপানের কিতাসাত প্লেগের বীজাণু আবিষ্কার করলেন, তবে আমরা প্লেগ তত্ত্বে-জ্ঞানলাভ ক'রেছি। এই ভারত সরকারের বৃত্তিভোগী রস্ ম্যালেরিয়া বাহিনী মশককে আসামী পাকড়াও ক'রে আমাদের সামনে এনে দিলেন, তবে আমরা বুঝলাম ম্যালেরিয়া কি ক'রে জনপদ ধ্বংস করে। এইরূপে এখন আমরা পরমুখাপেক্ষী হ'য়েছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত তেমন ছিলেন না। সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকারে মগ্ন ছিল, তখন আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানালোকে ভারত উদ্ভাসিত ছিল: অথর্ব্ববেদে, বৌদ্ধ গ্রন্থে, সামরিক অস্ত্রচিকিৎসা, আরোগ্যশালা প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা আপনারা যোগ্যতর ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, সে সব ব'লে সময় নষ্ট ক'রতে চাই না। তবে এই কথাটা বলা আবশ্যক,—যে দিন কাম্পিল্য নগরে সুরধনী তীরে জনপদ ধ্বংস নিবারণের জন্য আত্রেয় প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে উপদেশ ক'রেছিলেন; সেই সমতলভূমিতে যে দিন সভা বা মেডিকেল কংগ্রেস হয়েছিল, সে দিন ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

স্মরণাতীত কাল থেকে একটা ধারণা চ'লে এসেছে যে, রোগ শোক অদৃষ্টের ফল,—সুতরাং চেষ্টা দ্বারা অনিবার্য্য। সেই দিনে আত্রেয় বলেছিলেন,—বায়ু, উদক, দেশ, কাল প্রভৃতির বৈগুণ্যবশতঃ সকলে যুগপৎ এক লক্ষণাক্রান্ত ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বহুতর লোক ভূলোক-চ্যুত হওয়াতে জনপদ প্রায় নির্ম্মনুষ্য হ'য়ে যায়। এই অকাল মৃত্যু ও মহামারি পুরুষকার বা চেষ্টাদ্বারা নিবারণ করা যায়। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জ্জুন, মাধব, বাগভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণ সেই সময়ে যথাসম্ভব চিকিৎসা-তত্ত্ব জ্ঞান প্রচার ক'রে রোগ নিবারণ ক'রেছিলেন। আমরা তাঁদেরই সন্তান, এই কথাটা বুঝে নেওয়া উচিত। এই আত্মবোধ সজাগ হ'লে তবে আমরা মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রতে সমর্থ হব।

সিংহশাবক যতদিন মেষপালের সঙ্গে গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে চ'লেছিল, ততদিন সে জানত—সেও একটা দুর্ব্বল মেষশাবক। একদিন স্বচ্ছজলে আত্মবিম্ব দেখে যখন বুঝলে—সে ভেড়া নয়, কিন্তু সিংহশাবক, এক লম্ফে বনে প্রবেশ ক'রে পশুরাজ হয়ে গেল। আমাদিগকে তেমনি চরক সুশ্রুতের সন্তান জেনে ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে, চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রতে হবে। এই দেশের বিশেষ বিশেষ অনেক রোগ আছে, যার সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট হয় নাই। সেই সমুদয়ের মীমাংসা আবশ্যক।

আমরা বড় বাপের ছেলে—কেবল এই কথাটা জানলে হবে না। উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত ছেলে হ'তে হবে। স্থূল জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের যে সমুদয় আধুনিক উপায়, তা' গ্রহণ করা আবশ্যক। সুশ্রুতের অস্ত্র-বিদ্যা তাই চন্দ্র বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কালের ক্রীড়ায়, স্থানের পরিবর্ত্তনে, চিকিৎসকের অজ্ঞতায়, অনেক ঔষধের আকার ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এবং ধ্বংস হয়েছে। অনেক নূতন রোগেরও সৃষ্টি হয়েছে। নব বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হবে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বলেছেন,—তিনিই ভিষকশ্রেষ্ঠ—যিনি রোগ আরোগ্য করেন; সেই শ্রেষ্ঠ ঔষধ—যাতে মানুষ রোগমুক্ত হয়। ভিষক ও ভৈষজ্যের জাতিভেদ নাই। সকলের নিকট সকল ঔষধ ও তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বহু গুরুর কথা শাস্ত্রে আছে।

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিজয়রত্ন সেন, যামিনী ভূষণ রায় প্রভৃতি কবিরাজেরা এই কথাটী বেশ বুঝে-ছিলেন। তাঁরা আরও বুঝেছিলেন যে, মেডিকেল কলেজ, স্কুল এবং হাসপাতালের দরুণই ডাক্তারী বিদ্যা ও চিকিৎসার এত প্রাধান্য। আমাদের দেশে ছিল চতুষ্পাঠী, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিকট ছাত্রেরা তাঁহারই বৈশিষ্ট্য শিক্ষা ক'রত। মনীষীদের সমবেত অভিজ্ঞতার ফল লাভ ক'রবার কোন উপায় ছিল না।

তাই ১৯০১ সালে বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী আয়ুর্বেদ সভা সংস্থাপিত হ'য়েছিল—সভার উদ্দেশ্য বিদ্যালয় স্থাপন। ঐ বৎসরেই ঝামাপুকুরে বৈদ্যক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার শিশুদের মতন জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যালয়টী কাল-কবলে পতিত হয়েছিল।

তৎপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ, গোবিন্দসুন্দরী বিদ্যালয় প্রভৃতি বিদ্যালয় কলকাতায় সংস্থাপিত হয়ে কবিরাজদের সংঘবদ্ধ হবার শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

এই চন্দননগরে এই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় দেখে আমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে। ছাত্রেরা কৃতী হয়েছে শুনে আরও আনন্দ হচ্ছে।

এমন দিন আসবে—যেদিন ডাক্তারীতে এবং কবি-রাজীতে প্রভেদ থাকবে না। কবিরাজ মহাশয়েরা আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হ'য়ে, ডাক্তারদের সমান মনে করবেন। আর ডাক্তারেরা দেশের দিকে চক্ষু ফিরিয়ে স্থান পাত্র ভেদে পাশ্চাত্য প্রণালী পরিবর্ত্তিত করে, ভারত-মাতৃগর্ভে যে সমস্ত ভৈষজ্যরত্ন নিহিত রয়েছে, সে সমস্ত উদ্ধার ক'রবেন। উভয় সম্প্রদায় মিলিত হয়ে একটী ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া বা ভৈষজ্যতত্ত্ব এমন ভাবে প্রস্তুত ক'রবেন, যাতে পৃথিবীর লোক বুঝবে ভারতে এখনও অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিকতা লুপ্ত হয় নাই।

খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এল, এ, এম, এস)

খাদ্য ও শরীর

খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা।—খাদ্য দ্রব্যই আমাদের শরীর রক্ষার মূল। শারীরিক পুষ্টিসাধন এবং শারীরিক কার্য্যক্ষমতা লাভ—খাদ্য ভিন্ন হইতে পারে না। আমরা খাদ্যরূপে যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের শরীরটিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। শরীরের মধ্যে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখনই তাহাদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য যে প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা-রূপে আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। খাদ্যের প্রয়োজন এই জন্যই; ফল কথা যথোপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্যসকল খাদ্য রূপে গ্রহণ না করিলে মানবের দেহযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে, শারীরিক শক্তিহীনতা এবং স্বাস্থ্যভঙ্গ তাহারই ফল-সম্ভূত।

ইংরাজ স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদের কথা।—ইংরাজীতে খাদ্যের নাম—ফুড। তাঁহারা বলেন, যে সকল দ্রব্য অক্সিজেন কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে এবং শারীরিক সামর্থ্য আনিয়া দেয়—তাহার নাম খাদ্য। তাঁহাদের মতে খাদ্য গ্রহণ করার পরে উহার অর্গানিক

পদার্থ নিঃশ্বাস বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা যে সময় দগ্ধ হইয়া যায়, সেই সময় শরীরে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ তাপই শারীরিক ক্রিয়াসকল সাধন করিবার উপায় স্বরূপ। জাহাজ এবং রেলেরগাড়ী প্রভৃতি তাপ সাহায্যে যেরূপ চলচ্ছক্তি পাইয়া থাকে, খাদ্য গ্রহণের পর উহা হইতে মানবদেহে উৎপন্ন তাপও সেইরূপ গতি সম্পাদক।

শারীরিক ক্ষয়ের কারণ।—আমরা প্রত্যেক কার্য্যেই শারীরিক ক্ষয় করিতেছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, চিন্তা দ্বারা মস্তিষ্কের কতকগুলি স্নায়ুজীবাণু ধ্বংস বা নিস্তেজ হইতে পারে। পদ বিক্ষেপের ফলে মাংসপেশীর গ্রন্থী সকলের কতকগুলি জীবাণুর ধ্বংস হইয়া থাকে। চর্ব্বণের ফলে খানিকটা লালা যাহা নিঃসৃত হইল—তাহার দ্বারা কতকগুলি জীবাণুর ধ্বংস হইয়া থাকে। এইরূপে সর্ব্বদাই আমাদের শারীরিক অপচয় ঘটিতেছে। এই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন। নানা কারণে সর্ব্বদাই আমাদের দেহ হইতে কতকগুলি জীবাণু যেমন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে সেইরূপ উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে নূতন জীবাণু—পুরাতনের স্থান গুলিও পূর্ণ করিতেছে,—কাজেই আমরা শরীরের কোনো অংশের যে ক্ষতি হইতেছে—তাহা মনে করিতে পারি না। এক কথায় শারীরিক ক্ষতি পূরণ—খাদ্য ভিন্ন কোনো ক্রমেই সম্ভব নহে।

কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন?—কিন্তু যা' তা' কতকগুলি দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই শারীরিক ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নাই। প্রাণীমাত্রেরই দেহ নানা প্রকার ধাতব, উপধাতব ও জৈবিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা যাহা আহার করি, তাহা মুখ-মধ্যস্থ লালারসের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে পাকস্থলী, যকৃত এবং অন্ত্রের বিবিধ রস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিভ্রমণ করে এবং কিয়দংশ রক্তের সহিত মিলিত হয়। শরীর মধ্যস্থ জীবাণুগুলি ঐ রক্ত হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ পদার্থ গ্রহণ করিয়া লয় এবং যে সকল জীবাণু মরিয়া গিয়াছে বা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে বাহির করিয়া দেয়। কাজেই মৃত বা অকার্য্যকর জীবাণুর স্থলে নূতন জীবাণুর পরি-পুষ্টির জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করিয়া যদি যা' তা' খাইয়া উদরপূর্ত্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহার ফলে কখনই ক্ষয়ের পরিপোষণ হইতে পারে না। এই জন্যই খাদ্য-নির্ব্বাচন আবশ্যক।

খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা।—সাধারণে মনে করেন, অধিক খাইলেই বুঝি শরীরের পুষ্টিসাধন হইল। কেহ বা মনে করেন, মাছ মাংস অধিক খাইলে শারীরিক পুষ্টিলাভ অবশ্যম্ভাবী। কাহারও কাহারও ধারণা, শাক সব্জী খাইলে শারীরিক উন্নতিলাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই—ওগুলি একেবারেই অসার, শরীর পুষ্টির কোনো উপাদানই উহাতে নাই। এ সকল কিন্তু অতিশয় ভ্রান্ত ধারণা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শরীর মধ্যস্থ কর্ম্মনিরত যন্ত্রসকল যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনই খাদ্যের প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, যদি যন্ত্রসকল অবসন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদি সে সময় খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শারীরিক পুষ্টি লাভের পরিবর্ত্তে শারীরিক ক্ষতিই হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মাংসই হউক, মাছই হউক, দুগ্ধই হউক, ঘৃতই হউক যে জাতীয় শারীরিক ক্ষতি হইতেছে, সেই জাতীয় দ্রব্যোদ্বারা তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। তা' ছাড়া যে শাকসব্জীর কথা বলা হইল—সে গুলিও আমাদের শারীরিক পুষ্টি বিধানের বিশেষ সহায়ক না হইলেও কতকটা যে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চিত। আসল কথা, কতকগুলি গুরুপাক দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলেই শরীরের উন্নতি হয় না,—স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে, দেহ-ধারণের উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে।

মানবদেহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মানবদেহের পদার্থ সমূহ।—আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আমাদের দৈহিক যন্ত্রসকল অনবরত নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখনই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন। এ অবস্থায় আমাদের দেহের ভিতরকার সংবাদ জানাও একটু প্রয়োজন। দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, আমাদের দেহে প্রতি শত অংশে অম্লজান (Oxygen) ৭২, অঙ্গার (Carbon) ১৩॥০, উদজান (Hydrogen) ৯, যবক্ষারজান (Nitrogen) ৪॥০, ক্যালসিয়ম ১'৩ এবং ফস্‌ফরাস ১'১ ভাগ আছে, ইহা ভিন্ন গন্ধক, লৌহ, সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ক্লোরিণ, ম্যাগনেসিয়ম ও সিলিকণও কিছু কিছু আছে।

মূল পদার্থ।—কিন্তু এতগুলি পদার্থ শরীরের মধ্যে পৃথক ভাবে থাকে না, কেবল মাত্র সামান্য পরিমাণে অম্লজান, উদজান্ ও যবক্ষারজান—রক্ত ও অন্ত্রের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, বাকী পদার্থ গুলি পরস্পরের মিশ্রণ সংযোগে Proximate বা আদিমিশ্র নামক পদার্থ উৎপন্ন করে, ইহাদের দ্বারাই শরীর নির্ম্মিত হয়। এই "আদিমিশ্র" পদার্থ গুলিকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়, ১ম যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ সমূহ (Nitrogenous Proximate), ২য় যবক্ষারজান শূন্য দৈহিক আস্তিম পদার্থ সমূহ (Non-nitrogen), এবং ধাতব ও উপধাতব পদার্থ সমূহ (Mineral)

যবক্ষারজান পদার্থ।—এই যবক্ষারজান বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে অঙ্গার, অম্লজান, উদজান এবং যবক্ষারজান নামক—কয়েকটি পদার্থ আছে। গন্ধক ও ফস্‌ফরাসও—বিদ্যমান থাকে। এই যবক্ষার জান বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে (১) এলবুমেন (Albumen) (২) মাইওসিন (Mysine) (৩) ফাইব্রিণ (Fibrin) (৪) গ্লোবুলিন (Globulin) (৫) কেজিন (Caseine) (৬) মিউসিন (Meucine) (৭) জেলাটিন (Gelatine) (৮) ফারমেণ্ট (Ferments) (৯) বর্ণ প্রদায়ক ও সেরিব্রিণ (Cerebrine) নামক কয়েকটি প্রধান, উহারা আমাদের দেহে বহুভাবে বিস্তৃত। এই পদার্থ গুলির মধ্যে এলবুমেন—মনুষ্য দেহের রক্ত ও অন্যান্য দৈহিক রসে নিহিত। ডিম্বের শ্বেত অংশের মত ইহা বর্ণ বিশিষ্ট। মাইওসিন—মানব দেহের মাংসপেশীর রস। ফাইব্রিণ—রক্তের ঘনকারক পদার্থ। গ্লোবুলিন—মানব দেহের রক্ত ও অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়, কেজিন—দুগ্ধের পনিরের মত পদার্থ। মিউসিন—শ্লৈষ্মিক পদার্থ। জেলাটিন—অস্থি ও গ্রন্থি সকলকে উত্তাপ দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া উৎপন্ন হয়। ফারমেণ্ট—পাচক রস সকলের সারাংশ। বর্ণ প্রদায়ক—রক্ত, পিত্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণ। সেরিব্রিণ—স্নায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান।

যবক্ষারজান শূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহ।—ইহাদের উপাদান তিনটি,—অঙ্গার, অম্লজান এবং উদজান। এই তিনটির মিশ্রণেই ইহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে প্রায় সকল স্থানেই তৈলময় পদার্থ বর্ত্তমান। যবক্ষারজানশূন্য আদিমিশ্র পদার্থ সমূহে অঙ্গারের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী এবং অম্লজানের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু ইহা শরীরের মধ্যে থাকিয়া অম্লজানের সহিত মিলিত হইলে শরীরে উত্তাপ উৎপন্ন করে এবং তাহার ফলে শৈত্য দূর হয়। গ্লাইকোজেন অর্থাৎ এক প্রকার শ্বেতসার পদার্থও এই উপাদান গুলিতে আছে, শরীরের যে স্থানে খুব দ্রুত কার্য্য চলিতেছে, সেই স্থলে ইহা পাওয়া যায়। উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন এবং জন্তু দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দুই প্রকার শর্করা এবং অম্লরস সমূহও এই পদার্থ গুলিতে পাওয়া যায়।

ধাতব ও উপধাতব পদার্থ।—মানব দেহে ধাতব এবং উপধাতব পদার্থের সংখ্যাই অধিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—জল শরীরের সকল স্থলেই পাওয়া যায়, এমন কি, অতিশয় কঠিন যন্ত্র—অস্থি এবং দন্তও জল শূন্য নহে। ইহা ভিন্ন সোডিয়ম ও পটাসিয়ম ক্লোরাইড শরীরের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। মানব দেহের অস্থির প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ম ফস্‌ফেট। লৌহও অম্লজানের সহিত পাওয়া যায়।

মূল ভৌতিক পদার্থ গুলির ক্ষয় ও পরিপূরণ।—এখন সহজেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের শরীর কতকগুলি ভৌতিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহার ক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি যা' তা' খাদ্য গ্রহণ করিলেই শারীরিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা দেহতত্ত্ব সংক্ষেপ ভাবে বুঝাইতে গিয়া যে আদিমিশ্র পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়াছি, ঐ আদি মিশ্র পদার্থ গুলির যখন দেহের ক্ষয় হইতেছে, তজ্জাতীয় খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহার পরিপোষণ হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, সুস্থদেহী ব্যক্তি প্রত্যহ ৩০৭ গ্রেণ নাইট্রোজেন এবং ৪৭০০ গ্রেণ কার্ব্বণ শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে, এই নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ প্রত্যহ এত অধিক পরিমাণ বাহির হইয়া যাইলে উহার পুনঃপুষ্টির জন্য ঐ জাতীয় খাদ্যই আমাদিগকে প্রত্যহ খাইবার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মনে না রাখিয়া যাঁহারা অন্যরূপ খাদ্য গ্রহণ করেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্য কখনই সমুন্নত হইতে পারে না।

শরীর ধারণের জন্য কিরূপ খাদ্যের প্রয়োজন

শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য।—মানব দেহ যেরূপ পদার্থ দ্বারা গঠিত, তাহা বিচার করিয়া স্বাস্থ্য তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত পদার্থ সমন্বিত খাদ্যগুলি প্রাত্যহিক ভোজন করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন,—

১ম। প্রোটীড্ বা আমিষ জাতীয়

২য়। ফ্যাট্ বা স্নেহ জাতীয়

৩য়। কার্ব্বো হাইড্রেটস্ বা শালি জাতীয় (শ্বেতসার ও শর্করা)

৪র্থ। লবণ জাতীয়

৫ম। জল

আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।—আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করিলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না এবং দহন ক্রিয়ারও ব্যাঘাত ঘটে। ইহার অভাবে শারীরিক তাপ উৎপাদনেরও বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে মানবদেহে ভৌতিক পদার্থগুলি বুঝাইবার সময় আমরা যে যবক্ষারজানময় ভৌতিক পদার্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছি—আমিষজাতীয় খাদ্য—তাহার অন্তর্গত। যবক্ষারজানময় খাদ্য—এলবুমেনস পদার্থ পূর্ণ। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ বলেন,—এরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে (১) দেহের শক্তি বা তেজ প্রকাশিত হয় (২) শারীরিক রস সমূহও এই যবক্ষারজানময় খাদ্য গ্রহণের ফল (৩) যান্ত্রিকক্রিয়া পরিচালনার ইহা প্রধান সহায় (৪) যদি যবক্ষারজান খাদ্য পরিত্যাগ করা করা যায়, তাহা হইলে যান্ত্রিক ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায়। যবক্ষারজান খাদ্যের দ্বারা—শরীরের মেদ, মাংস ও স্নায়ু প্রভৃতির যে সকল ক্ষয় হইয়া থাকে, তাহার পূরণ ও পুনর্নির্ম্মাণ ঘটিয়া থাকে। কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক বলেন, শ্বেতসার বা তৈলাক্ত খাদ্য গ্রহণও শরীর ধারণের পক্ষে উপযোগী হইলেও যবক্ষারজানের সহায়তা পাইয়াই ঐ সকল খাদ্য হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। এবং ঐ তেজ দ্বারাই পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য হইয়া থাকে এবং উহাই উত্তাপরূপে পরিণত হয়। যবক্ষারজান খাদ্যের অন্তর্গত প্রোটিড্ খাদ্য গ্রহণ না করিলে দেহ-তন্তু (Tissue) এবং রস সমূহের গঠন ও ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না। বায়ু হইতে অক্সিজেন অংশ গ্রহণেরও অভাব হয়। এই প্রোটিড্ খাদ্যের দ্বারা কোনো কোনো স্থলে চর্ব্বির গঠন এবং শক্তির (Energy)র বিকাশ হইয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, ছানা, দাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে এই আমিষ উপাদান পাওয়া যায়।

ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।—এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা—চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং ইহা হইতেই তেজ ও শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলীর পুষ্টি সাধনও ইহা হইতেই হইয়া থাকে। তাছ:

রেন। ইহার নাম দিয়াছেন, ফ্যাটস্ বা হাইড্রোকার্ব্বণ (Fats or Hidro-carbons) এই ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে দেহে চর্ব্বি সঞ্চিত হয়। এই জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে শিশুদিগের রিকেটস নামক পীড়া হইতে হইতে পারে। মৎস্য ও মাংসের চর্ব্বি ঘৃত, তৈল প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্য।

কার্ব্বহাইড্রেটাস্ বা শালি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।—এই খাদ্য গ্রহণের ফলেও চর্ব্বি প্রস্তুত হয় এবং শারীরিক উত্তাপ ও তেজ জন্মিয়া থাকে। আমরা যে পটল, গম, আলু, চিনি এরারুট প্রভৃতি খাইয়া থাকি, তাহারা এই জাতীয় খাদ্য।

লবণজাতীয়খাদ্যের আবশ্যকতা।—এই জাতীয় খাদ্যের অভাবে 'স্কার্ভি' নামক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। মুখনিঃসৃত লালা ও পাকস্থলী নিঃসৃত রসের পরিপাক করিবার ক্রিয়া এই জাতীয় খাদ্যের উপরে নির্ভর করিতেছে। অস্থিগঠন ও পরিপাককার্য্যের সুবিধার জন্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপাদন, শরীরের পুষ্টি সাধন এবং শক্তির পরিচালন—এই খাদ্য গ্রহণ না করিলে হইতে পারে না। আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি, তাহা ভিন্ন—শাকসব্জি ও ফল মূলের মধ্যস্থ ফসফেট অব লাইম পটাস, সোডা ও মাংসস্থিত গন্ধক প্রভৃতি এই সকল জাতীয়।

জলের আবশ্যকতা।—জলের অভাবে পরিপাক ক্রিয়া এবং পোষণ কার্য্য সম্যকরূপে সাধিত হইতে পারে না, মাংসপেশী সকল এবং স্নায়ুমণ্ডলী তেজোহীন হইয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায় এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জল গ্রহণের ফলে রক্ত তরল থাকে। জল গ্রহণ না করিলে রক্ত গাঢ় হওয়ায় শরীর মধ্যস্থ দূষিত পদার্থসকল বাহির হইতে পারে না, কাজেই নানারূপ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। জল গ্রহণের ফলে ঘর্ম্ম ও মূত্রাদিরূপে শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত ও দূষিত অংশ সমস্ত বাহির হইয়া যায়। আমরা যে জল পান করিয়া থাকি, তাহা ভিন্ন সকল খাদ্যেই অল্পাধিক্য পরিমাণে জল মিশ্রিত থাকে।

ভাইটামিন্।—উপরে খাদ্য গ্রহণের যে সকল প্রকারভেদের কথা বলা হইল, তদ্ভিন্ন শরীর রক্ষার জন্য আরও কয়েক জাতীয় খাদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সে গুলিকে 'ভাইটামিন' বলে। মৎস্য পক্ষীর ডিম্ব, দুগ্ধ এবং অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন যথেষ্ট আছে। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে বেরিবেরি, স্কার্ভি এবং রিকেটস্ নামক পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। রন্ধনের সময় আমাদের অনেক খাদ্য হইতেই ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। চাউল ছাটিয়া লওয়ার জন্যও উহা হইতে এই ভাইটামিন নষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে বাজা পরিষ্কার ধবধবে চাউল অপেক্ষা, মোটা এবং আমাজা চাউলে ভাইটামিন অধিক থাকায় উহা শরীর পুষ্টির বেশী সাহায্যকারী।

অজীর্ণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যত প্রকার লোক আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ বা সমাগ্নি কেহ বা মন্দাগ্নি, কেহ বা তীক্ষ্ণাগ্নি এবং কেহ বা বিষমাগ্নি বিশিষ্ট। এই চারিপ্রকার অগ্নি—মানব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে যাহাদের

সম অর্থাৎ সন্নিপাত প্রকৃতি, তাহাদের শরীরে বায়ু পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া অগ্ন্যধিষ্ঠানেও অগ্নির সমতা রক্ষিত হইতেছে। এই কারণে সমাগ্নিজন সুস্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "তেষামনাতুরাঃ পুরো বাতলাদ্যাঃ সদাতুরা"। চরক-সূত্র স্থান—৭ম অধ্যায়। অন্নকালে সঃ মাত্রায় এবং সম্যক মাত্রায় আহার বিধি অনুসারে গৃহীত অন্ন সমাগ্নির সুখে জীর্ণ হয়, কিন্তু অপচয় করিলে অগ্নি বিকৃত হইতে পারে; সুতরাং বিহিত অন্নপান দ্বারা এই অগ্নিকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করা প্রত্যেক আত্মহিত-পরায়ণ ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

যেহেতু বাতলাদ্যাঃ "সদাতুরাঃ", সুতরাং প্রকৃতিভেদে অপর যে তিন প্রকার অগ্নির কথা বলা হইয়াছে, তদ্বিশিষ্ট লোক আতুর। তন্মধ্যে ১ মন্দাগ্নি—শ্লেষ্ম প্রকৃতির শরীরে কফাধিক্য জন্য অগ্ন্যধিষ্ঠান ও কফ দ্বারা উপহত হয় বলিয়া তাহার অগ্নি মন্দ হয়। অল্লাহারেই রোগী তৃপ্তি বোধ করে, খাদ্যের একটু অধিক ভাদক হইলেই অজীর্ণ উপস্থিত হয় এবং নানা প্রকার শ্লৈষ্মিক পীড়ায় রোগী কষ্ট পাইয়া থাকে।

মন্দাগ্নি ব্যক্তির অগ্নি সাম্য রাখিবার তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য যথা,—হিং, মরিচ প্রভৃতির প্রয়োগ, মধ্যে মধ্যে বমন করান, কটু, তিক্ত ও কষায়রস বহুল খাদ্য, নানাজাতীয় ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ মদ্য এবং মধ্যে মধ্যে উপবাস হিতকর। অধিক নিদ্রা—বিশেষতঃ ভুক্তমাত্রেই নিদ্রা, দিবানিদ্রা, আলস্য, এবং গুরু ও মধুর রস বহুল খাদ্য—মন্দাগ্নির পক্ষে একান্ত অহিত বলিয়া বিষবৎ পরিত্যজ্য।

২। তীক্ষ্ণাগ্নি

পিত্ত প্রকৃতির অগ্ন্যধিষ্ঠানে পিত্তাধিক্যবশতঃ অগ্নি অতিশয় তীক্ষ্ণ বলিয়া যে যাহা আহার করে, তাহা সহজেই হজম হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ ভোজনের আকাঙ্ক্ষা হয়। খাদ্য পাইতে বিলম্ব হইলে অস্থির হইয়া উঠে। খাদ্য শীঘ্রই হজম হইয়া যায় বলিয়া তীক্ষ্ণাগ্নি বিশিষ্ট লোককে নীরোগ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পিত্ত প্রকৃতি সম্পন্ন জনের শরীরেও পিত্তাধিক্যবশতঃ দহ কার্য্য অতিমাত্রায় সাধিত হইতে থাকে বলিয়া সঞ্জাত অন্নরস ধাতু পুষ্টির পক্ষে অল্পই অবশিষ্ট থাকে, অধিকাংশ পুড়িয়া যায়, সেইজন্য বহুভোজী অথচ কৃশ হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণাগ্নিজন যদি পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করে, তাহা হইলে তাহার অগ্নিও অতি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। এই সময় তাহাকে মুহুর্মুহু ভোজ্য দেওয়া না যায় তাহা হইলে ইন্ধন অভাবে শরীর ধাতুর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সকল ধাতুকেই দগ্ধ করিতে থাকে, তাহার জন্য তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, দৌর্ব্বল্য—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তিকে মুহুর্মুহু খাদ্য দেওয়া উচিত। মধুর, তিক্ত এবং কষায় রসবহুল অপিচ শীতবীর্য্য খাদ্য তাহার হিতকর। স্নান এবং চন্দনাদির অনুলেপন, পুষ্পমাল্য ধারণ, মাহিষ দুগ্ধের ন্যায় গুরু, মধুর শ্লেষ্মকারক দ্রব্য সেবন, দিবানিদ্রা ও ভুক্ত মাত্রেই নিদ্রা যাওয়া উচিত। মধ্যে মধ্যে কট্‌কি প্রভৃতি পিত্তহর বিরেচন লইয়া পিত্ত হ্রাস করান কর্ত্তব্য।

৩। বিষমাগ্নি

বাত প্রকৃতির অগ্ন্যধিষ্ঠানে বায়ুর আধিক্য জন্য অগ্নি বিষম অর্থাৎ সমের বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট হয়। ইহার ফলে গ্রহণীর কোথাও কোনও দ্রব্য সম্যক্ জীর্ণ হয় এবং কোথাও কোন দ্রব্য জীর্ণ হয় না। যেমন অম্লরস বিশিষ্ট পিত্ত দ্বারা মাংস জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয় এবং অচ্ছ পিত্ত দ্বারা স্নিগ্ধ খাদ্য জীর্ণ হয়; অগ্ন্যধিষ্ঠানে বাতাধিক্য নিবন্ধন হয়ত মাংস জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হইতেছে, কিন্তু স্নিগ্ধ খাদ্য

স্নিগ্ধ খাদ্য বলিতে Fat and carbohydrade এই উভয়কে বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় স্নেহশব্দে দহনানুকূল ব্যাপার যাহার দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে বুঝাইয়া থাকে। যে দ্রব্য নিজে পুড়িয়া অপরকে দহন হইতে রক্ষা করে, সেই দ্রব্যকে স্নেহ বলা হয়। স্নেহ বহুল দ্রব্যকে স্নিগ্ধ দ্রব্য বলা হয়। যেমন তৈল নিজে পুড়িয়া পলিতাকে রক্ষা করিতেছে; চিনিও

জীর্ণ হইতেছে না ; অবার হয়ত মাংস জাতীয় খাদ্য জীর্ণ হইতেছে না, কিন্তু স্নিগ্ধ খাদ্য জীর্ণ হইতেছে। বায়ু কখনও বহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া ঠিক ঠিক পরিপাক কার্য্য সম্পাদন করে। আবার কখনও বা বহ্নিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া উদরে প্রকুপিত বায়ু অতিসার, শূল, উদাবর্ত্ত, উদরের গুরুত্ব, অন্ত্রকূজন, আধ্মান ও কুন্থন প্রভৃতি উৎপাদন করে। এরূপ অবস্থায় বায়ুকে প্রশমিত করিয়া অগ্নির সাম্য রক্ষা করিবার জন্য স্নেহাভ্যঙ্গ ও উদরে স্বেদ প্রয়োজ্য। স্নিগ্ধ, মধুর অম্ল ও লবণ রস বিশিষ্ট খাদ্য রোগীকে দেওয়া উচিত। মধ্যে মধ্যে বস্তি, বিশেষতঃ অনুবাসন বস্তি প্রয়োজ্য। বিষমাগ্নির পক্ষে নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

এই তিন প্রকার অগ্নিবৈষম্যের লক্ষণের সহিত চিকিৎসা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন নিদান সেবন জন্য বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া অগ্ন্যাশয়ে গমন পূর্ব্বক যে অগ্নি-বৈষম্য উৎপাদন করে, তাহার নাম অজীর্ণ। শ্লেষ্মা জন্য আমাজীর্ণ, পিত্ত জন্য বিদগ্ধাজীর্ণ এবং বায়ু জন্য বিষ্টব্ধাজীর্ণ উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অজীর্ণ আছে, তাহার নাম রসশেষাজীর্ণ। অতঃপর এই চারি প্রকার অজীর্ণ আলোচিত হইতেছে।

১। আমাজীর্ণ

ইহা একটী শ্লৈষ্মিক ব্যাধি। শ্লেষ্মাজনক নিদান সেবন জন্য শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া যদি অগ্ন্যধিষ্ঠানে যাইয়া অগ্নিকে আবৃত করে, তাহা হইলে অগ্নি তাহার স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়ে, সেই কারণে ভুক্তান্ন জীর্ণ হয় না। সাধারণতঃ অতিরিক্ত জল পান, পরিমাণাধিক্য গুরু, স্নিগ্ধ ও শীতবীর্য্য দ্রব্য সেবন, দিবানিদ্রা এবং আহারান্তেই নিদ্রা যাওয়া—এই গুলি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরিপাকক্রিয়ায় মনের প্রভাব অসাধারণ। প্রফুল্লমনে অন্ন গ্রহণ করিলে তাহা অতি শীঘ্রই জীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ঈর্ষা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, দৈন্য ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা মন উপতপ্ত হইলে সেই সময় যদি অন্ন গৃহীত হয়; তাহা জীর্ণ হয় না। এই সময় মন বিক্ষিপ্ত থাকে বলিয়া পিত্তনিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। সম্যক্ পিত্ত নিঃসৃত না হইলে ভুক্তান্ন পরিপাকপ্রাপ্ত না হইয়া উদরের গুরুত্ব এবং ক্লেদাদি আনয়ন করে, তাহার ফলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া পূর্ব্ববৎ আমাজীর্ণ উৎপাদন করে। আমাজীর্ণে ভুক্তান্ন শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া মাধুর্য্যভাব প্রাপ্ত হয়। ক্লেদক শ্লেষ্মার দ্বারা অন্ন ক্লিন্ন হওয়ার ফলে আমাশয় হইতে ঐ ক্লিন্ন অথচ অপরিপক্ক অন্ন শরীরে কিঞ্চিৎ শোষিত হয়। উহা পরিপক্ক আমরস নহে বলিয়া শোষিত হইলে শরীরের ভারস্বরূপ (A burden to the circulatory system) হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ফলে শরীরের গুরুত্ব এবং গণ্ড ও অক্ষিকূটে শোথ দেখা যায়। অপরিপক্ক অন্ন অধিক পরিমাণে কোষ্ঠে থাকে বলিয়া উদরের গুরুত্ব এবং অবিকৃত অন্নের গন্ধ উদ্গারে উপলব্ধ হয়। এই অন্ন যখন উদরে শল্যবৎ অবস্থান করিতে থাকে, তখন প্রকৃতির তাড়নায় বমন হয় এবং বমনকালে দেখা যায় যে, যাদৃশ অন্ন অবিদগ্ধই রহিয়াছে অর্থাৎ বিদগ্ধ পিত্তের (অম্লরসবিশিষ্ট) সংস্রবে আসিতে পারে নাই। এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে রোগীকে উপবাস করানই বিধেয়। উপবাস করিলে কালেতে সমান বায়ুর দ্বারা বহ্নি সন্ধুক্ষিত হইয়া সেই অন্নকে জীর্ণ করিতে পারে। রোগীর উৎক্লেদ থাকিলে বচচূর্ণ।০ আনা, সৈন্ধব ১ তোলা এবং গরম জল ৴১সের একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাকে সেবন করাইয়া বমন করান উচিত। সর্জ্জিক্ষার (Sadibicarb) ৴০ এক আনা মাত্রায় প্রয়োগ করিলে

সেই প্রকার। বস্তুতঃ Fat and carbohydrade প্রায় একই জাতীয় দ্রব্য। Fat = Hydro carbon = Hydrgen and carbon and carbohydrade = cardon + Hydrogen + Oxygen। এই দুইটি জিনিষই শরীরেই প্রধান দাহ্য পদার্থ এবং ইহারা নিজে পুড়িয়া শরীরকে দহন হইতে রক্ষা করিতেছে। এই কারণে উভয়কে এক জাতীয় দ্রব্য বলা যায়।

বিশেষ উপকার হয়। ক্ষার বহ্নি তুল্য, সুতরাং বহ্নি বৃদ্ধি করে cf. Alkalin Secretes aeid। অগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খবটী, হিঙ্গ্বষ্টক প্রভৃতি দীপন ঔষধ আমাজীর্ণে বিশেষ উপকার করে। অভুক্তাবস্থায় যদি আমাজীর্ণ রোগী দিবানিদ্রা সেবন করে, তবে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হয়। Cf. অভুক্তস্তু দিবানিদ্রা পাষাণমপিজীর্য্যতি॥

আমাজীর্ণ রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে প্রথমেই অন্ন দিতে নাই। প্রথমে লাজমণ্ড বা অন্নমণ্ড, ঘোল, লেবুর রস এবং লবণ পথ্য দিতে হইবে। যখন পরিপাকক্রিয়া সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অন্নাদি অল্প পরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে পূর্ণমাত্রায় আনিতে হইবে। চিকিৎসাস্থলে নিদান বলিয়া যেগুলি উক্ত হইয়াছে, সে গুলির বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

২নং বিদগ্ধাজীর্ণ।

ইহা পৈত্তিক ব্যাধি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের নিমিত্ত এক প্রকার অম্লরসবিশিষ্ট পিত্ত নিসৃত হয়, পিত্ত বর্দ্ধক দ্রব্য যথা উষ্ণবীর্য্য-কটুরস লবণ ও তীক্ষ্ণ গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে ঐ অম্লরস বিশিষ্ট পিত্ত নিঃসরণ অধিক হইয়া পড়ে; তজ্জন্য অগ্ন্যধিষ্ঠানে তাপাধিক্য ঘটে বলিয়া ঐ পিত্ত অধিকতর অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উহার দ্রবাংশ বাড়িয়া যায় বলিয়া পরিপাক ক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। পরন্তু নানা প্রকার অনিষ্ট সাধন করে। তন্মধ্যে হৃৎকণ্ঠের দাহ, উদরের উষ্মা বোধ, তৃষ্ণা, সধূমাম্ল উদ্গার, স্বেদ ও হৃদয়ের দাহ বিদ্যমান থাকে, রোগ বৃদ্ধির সহিত মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সাধারণ বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে রোগী শান্তি অনুভব করে। অম্লভাব অধিক হইলে রোগীকে সর্জ্জিকার একমাত্রায় কিংবা চুণের জল সহ মহাশঙ্খ বটী প্রভৃতি ক্ষার যুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অম্লভাব নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। রোগীর যদি প্রত্যহই বিদাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে তিক্তরস প্রয়োগ করিলে বিদাহ নষ্ট হয়, এতদর্থে চিরতার রস, ধনে-পলতার কাথ এবং অম্লপিত্তাধিকারের দশাঙ্গ পাচন বিশেষ উপকারী। যাহাদের বিদাহ আছে অথচ কোষ্ঠকাঠিন্য বিদ্যমান—তাহাদিগকে হরিতকী চূর্ণ ।০, কিস্ মিস্ ।০ ও চিনি ½ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ মাড়িয়া ভোজনের একঘণ্ট পূর্ব্বে লেহন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। সাধারণ হরীতকীর পরিবর্ত্তে আমলকী প্রযোজ্য, ইহাতে বিদাহের বিশেষ উপকার হয়। আমলকী ভিজা... বিদগ্ধাজীর্ণের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। তবে ইহা ... পক্ষে সেবন করা উচিত নহে, যাহাদের অত্যধিক অম্ল হয় তাহাদিগকে যষ্টিমধুর কাথের সহিত আকন্দমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমি করান উচিত। নতুবা ঐ বিদগ্ধ রস শরীরে শোষিত হইলে নানা প্রকার অনর্থ উৎপাদন করে, অম্লরসবিশিষ্ট পিত্তকোষ্ঠ অত্যধিক মাত্রায় ... হইলে বিবমিষা এবং অনেক সময় বমন হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত আমলকী, কিসমিস ও চিনি ... মধু সহ লেহন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে অম্লপিত্তাধিকারের দশাঙ্গ পাচন এবং অপরাহ্নে ... দত্তোক্ত ছর্দ্দি অধিকারের এলাচ চূর্ণ প্রয়োজ্য, অত্যধিক মাত্রায় যদি সর্ব্বদাই বিদগ্ধ পিত্তের নিঃসরণ চলিতে থাকে, তবে আমাশয়-প্রাচীর প্রথম হাজিয়া যায়। এমতাবস্থায় যদি নিঃসরণ ক্রিয়া বন্ধ না হয়, তবে ঐ প্রদেশে ক্ষত উৎপন্ন হয়। আমাশয়ের ঊর্দ্ধভাগে ক্ষত হইলে পেটে সামান্য কিছু পড়িলেই বমি হয়। অনেক সময় ... বেগে রক্ত নির্গমন হইয়া থাকে, অধঃভাগে ক্ষত হইলে মলের সহিত রক্ত নির্গমন হইয়া থাকে। পেটে একটা জ্বালা থাকে। এরূপ অবস্থায় রক্তপিত্তের চিকিৎসা করা উচিত। যজ্ঞডুমুর, বাসক পাতার রস, লাক্ষা, ছাগ দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ড, চিনি, তক্রসহ প্রবাল ভস্ম—এরূপ ক্ষেত্রে উপকারী, শূলাধিকারের আমলকী খণ্ড, রক্তপিত্তাধিকারের কুষ্মাণ্ড খণ্ড বা বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, পিত্তান্তক লৌহ বিশেষ সুফল প্রদান করে।

এই রোগে পলতা, ঝিঙ্গার ঝোল, বেগুন, কাঁচকলা, চুর্ন—বিশেষতঃ যজ্ঞডুমুর, থোড়াগ্র, কাঁচা মুগের বা ছোলার ডাইল, দুগ্ধ—বিশেষতঃ ছাগদুগ্ধ, চিনি, কিসমিস, আঙ্গুর, নারিকেল, কেশুর, ডাবের জল, ডাবের নরম নারিকেল, প্রভৃতি অবিদাহী দ্রব্য হিতকর। বিদাহী এবং তীক্ষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য যথা—হিং, মরিচ, সর্ষপ, লঙ্কা, দধি, আলু প্রভৃতির ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য, মদ্য, রাত্রি জাগরণ, আতপ সেবন, স্ত্রী সহবাস অধিক পরিশ্রম—পরিত্যাজ্য। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ]

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান অথবা the science of life বলিতে আমরা বুঝি বাঁচিবার কল-কৌশল আয়ত্ত করা। আমাদের বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই অথচ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন যাপন করিতে আমরা নারাজ। কাহাকেও যদি বলেন—"ভারতবাসীর গড় পরমায়ু ২৫ বৎসর, আর অন্যদের পরমায়ু সকল দেশেই ৫০ বৎসরের অধিক, কেন এমন হয়? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন—"জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এ তিন বিধাতার নিয়ে" অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে মানুষের হাত বড় কম—নিয়তি বা বিধাতাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা।

যদি জিজ্ঞাসা করেন,—বিধাতা এমন একদেশদর্শী হইয়া আমাদের স্বল্পায়ু করিলেন কেন? তাহার উত্তরও আছে। প্রবীণ মাথা নাড়িয়া বলিবেন—"দেহের বিনাশ হইলে কি হয়, আত্মা আমাদের নিত্য, অব্যয় ও শাশ্বত—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইত্যাদি।" আমরা তখন হঠাৎ বেশী রকম আধ্যাত্মিক হইয়া উঠি।

আমার মনে হয়, এই তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা অথবা অদৃষ্টবাদের মূলে রহিয়াছে আমাদের জীবনের প্রতি অনাসক্তি—আনন্দের অভাব। আর সেই নিরানন্দের কারণ—জাগত দারিদ্র্য; প্রবলের নিপীড়ন ও ভবিষ্যতে অন্ধকার। একজন পাশ্চাত্য পরিদর্শক বলিয়াছেন—আমাদের চোখে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব দেখিলাম—loss of interestingness of life—আনন্দের অভাব।

আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? অজ্ঞানতার ফলে আমরা জাতির অতীত জানি না, ভবিষ্যতের ত কথাই নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি।"

নিজেকে জানিতে হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছে "আত্মানাং বিদ্ধি।" আবার নিজেকে জানিতে গেলে পরকেও বাদ দিলে সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইবে। আজ সে দিন পড়িয়াছে—তাহাতে বাঁচিতে হইলে সমষ্টিগত চেষ্টা চাই। আমাদের মধ্যে অনেকের মনোবৃত্তি এইরূপ যে, বাঁচিবার জন্য ব্যক্তিগত চেষ্টার অতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন নাই। কথাটী ঠিক নহে। আফ্রিকার ম্যালেরিয়া রোমের পতন ঘটাইল। চীনের প্লেগ বোম্বাইকে ধ্বংস প্রায় করিয়াছিল আর ইউরোপের ইনফ্লুএঞ্জা সে দিন ভারতের ৯ লক্ষ লোক নাশ করিল। এই যে লোকক্ষয় হইল—ইহার প্রতিরোধ জন্য সহ জাতির সমবেত চেষ্টা না হইলে ব্যাধির মূলীভূত কারণ দূরীভূত হইবে না। ভারত আজ বাঁচিতে হইলে বিশ্বের সমস্ত জাতির জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করিবেন, নতুবা কল্যাণ নাই।

আগামী ডিসেম্বর মাসে Far Eastern Association of Tropical Medicine এর উদ্যোগে কলিকাতায় প্রাচ্য দেশীয় রোগ নিবারণ কল্পে একটি কংগ্রেস হইবে। উহাতে প্রাচ্য দেশসমূহের ২০০ শত প্রতিনিধি সমবেত হইবেন ভারত সরকার ইহার ব্যয়কল্পে ১½ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। সভার উদ্দেশ্য—গবেষণার ফলাফল বিবৃতি, সমবেত চেষ্টা ও জনমত গঠন।

Far Eastern Association of Tropical Medicine আজ ১৭ বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ৬টী কংগ্রেস ও ম্যানিলা, হংকং ও জাভা প্রভৃতি স্থানে হইয়া গিয়াছে। আজ ভারতের সৌভাগ্য যে কলিকাতা নগরীতে বিশ্ববরেণ্য সুধীগণ আগমন করিয়া এই সম্মেলন করিবেন। রোগসংক্রমণ প্রতীকার ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞান আলোচনা তাঁহাদের ব্রত। আমরা প্রার্থনা করি এই অনুষ্ঠান সফল হউক। কলিকাতাবাসী কেন—সমগ্র দেশের দৃষ্টি এই দিকে ধাবিত হউক। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জন্মভূমি এই ভারতের ও আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের যে মহাদান আছে, তাহাও এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত হউক।

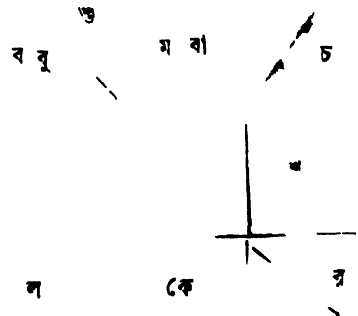
মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ

(কবিরাজ শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন)

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধন্বন্তরি কল্প, ভারতের মনীষি-কবিরাজ মণ্ডলীর গুরু গঙ্গাধরের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও কার্য্যাবলী একদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে অলৌকিক কাহিনীর ন্যায় প্রচারিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় তাঁহার তিরোভাবের অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইতে না হইতেই দেশের জনসাধারণের নিকট তিনি যেন অনেকটা অপরিচিত হইয়া পড়িতেছেন। তাই তাঁহার জীবনের অসংখ্য কার্য্যাবলীর মধ্যে কিছু বলিব।

১২৯ বর্ষ পূর্ব্বে ১২০৫ বঙ্গাব্দের ২৫ শে আষাঢ় শুক্রবার কৃষ্ণানবমীতে যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে বৈদ্যকুলতিলক গঙ্গাধর জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মের গ্রহসংস্থান হইতে তাঁহার ভবিষ্যৎ মহিমাময় জীবনের সূচনা হইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার গ্রহসংস্থান ও জ্যোতিষের ফলাফল তুলিয়া দিলাম।

১২০৫ বঙ্গাব্দ, ২৫শে আষাঢ়, কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।



বিশিষ্ট ভাগ্য যোগ।

১। যদা যেটো ভাগ্যগামী যশেহে সৌমিযুতো যত্র সর্ব্বত্র সুতো ভাগ্যাধিক্যঃ শ্রীরুকথে বলীঃ শ্রেষ্ঠো বুদ্ধা ধর্ম্মশীলঃ সুখাঢ্যঃ।

২। রাজ তুল্য ভাগ্যশালী মহাত্মার যোগ।

স্বাধ্যাহিত শ্চেৎ খচর স্বভুজে স্বর্কে বা—

শুভেক্ষিতোঽসৌ ধরণী পতিতকং বিলাসশীলং সুতরামুদারঃ

ভাগ্যাধিপক্তিঃ স্বভুজে অথবা নিজ গৃহে থাকিয়া শুভগ্রহ দ্বারা পূর্ণদৃষ্ট হইলে রাজা বা রাজতুল্য ভাগ্যশালী দয়ালু মহাত্মার জন্ম হয়। এখানে ভাগ্যেশ স্বগৃহী মঙ্গল, বৃহস্পতি দ্বারায় পূর্ণদৃষ্ট।

৩। কেন্দ্রকোনপতি মঙ্গল নবগৃহী হইয়া রাহু যুক্ত হওয়ায় প্রবল রাজযোগ। বৃহস্পতি স্বগৃহে বিদ্যাস্থানে থাকায় অতিশয় বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান হওয়ার যোগ।

৪। বৃহৎ সংহিতায় উক্ত আছে, মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্বক্ষেত্রে উচ্চগৃহে অথবা কেন্দ্রে থাকিলে মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করে। এখানে দেখা যায় মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনি এই পাঁচটী গ্রহ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন।

৫। ভাগ্য রাজ্যেশ্বরৌশ্বরৌ ভাগ্যে ইত্যাদি পরাশর সংহিতা। নবম-দশম পতি মঙ্গল ও শুক্র স্ব স্ব গৃহে থাকায় প্রবল রাজযোগ এবং বিখ্যাত কীর্ত্তিশালী যোগ।

৬। ক্ষেত্র সিংহাসন যোগ। "দশম ভবন নাথঃ কেন্দ্র কোনে ধনে বা" ইত্যাদি। এই যোগে জাত হইলে জগৎ-বিখ্যাত মহাপুরুষের জন্ম হয়। উক্ত বিংশ যোগ দ্বারা চির ভাগ্যশালী যোগ।

এই সকল গ্রহ সমাবেশ দ্বারাই উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন।

গঙ্গাধর পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁহার পিতার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়, মাতার নাম অভয়া দেবী। শৈশবেই গঙ্গাধরের অসামান্য প্রতিভা ও পাঠানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাঁহাদের কুলপুরোহিত গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট গঙ্গাধরের বিদ্যারম্ভ হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকালেই ছাত্রের মেধা ও স্বভাবের পরিচয় পাইয়া ভবানী প্রসাদকে বলিয়াছিলেন—"আপনার পুত্র বিখ্যাত কবিরাজ ও পণ্ডিত হইবে।"

পিতা ভবানীপ্রসাদ ইতিহাস বিশ্রুত নাটোর রাজ পরিবারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। গঙ্গাধর গ্রাম্য শিক্ষা শেষ করিয়া তদীয় পিতৃবয়স্য নন্দকুমার সেনের নিকট 'মুগ্ধবোধ' পাঠ আরম্ভ করেন ও মাণিক্য চন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট উহা সমাধা করেন, পরে বারুইপালী গ্রাম নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর রামরতন চূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে সাহিত্য, অলঙ্কার, প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধাবী গঙ্গাধর প্রতিদিন দশ পৃষ্ঠা পাঠ গ্রহণ করিয়া এবং স্বহস্তে লিখিয়া তাহা রীতিমত অভ্যাস করিতেন। পাঠাবস্থায় প্রতিদিনের এই লিখন-অভ্যাস ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার বিপুল অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও চিকিৎসা কার্য্যের মধ্যেও অসংখ্য পুস্তক রচনার সাহায্য করিয়াছিল এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত লিখনের শক্তি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল।

চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই তদীয় অধ্যাপক, ছাত্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অন্যান্য ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত করেন। চতুষ্পাঠীর পাঠ সমাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন জন্য তিনি পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হন। এই সময়ে তিনি মুগ্ধবোধের টীকার সংশোধন ও অসম্পূর্ণ অংশ সমাধা করেন। পিতা ভবানী প্রসাদ পুত্রকৃত টীকা দোষশূন্য হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাটোর রাজধানীতে বৃত্তি গ্রহণ জন্য তৎকালে বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে কোন বিখ্যাত পণ্ডিত টীকাখানিতে মূলের অনেক দুরূহ স্থানের সহজ-সরল মীমাংসা দেখিয়া তাহা অতি প্রাচীন ও সম্ভবতঃ বোপদেবেরই কৃত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভবানীপ্রসাদ সবিনয়ে টীকাকারের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রদান করিলে, পণ্ডিত মহাশয় বিস্ময়সহকারে একান্তমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

তিনি রাজসাহী জেলার বৈদ্যবেলঘরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রামকান্ত সেন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানেও অধ্যাপক মহাশয় প্রথম আলাপেই শিষ্যের অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং এখানেও তিনি গুরুর আদেশে সহাধ্যায়িগণের অধ্যাপকতার ভার গ্রহণ করিয়া, অধীত-অনধীত বহুবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনায় সকলের প্রীতি ও

শ্রদ্ধাশান্তে সমর্থ হন। এমন কি, তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও অধিক পাঠরত পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ছাত্র তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া একান্তে তাঁহারই শিষ্যত্ব কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর পাঠ শেষ না করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। গঙ্গাধরের শিষ্যত্ব, পরমানন্দের এতই আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়াছিল, যে তাঁহার পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে [illegible] হইয়াছিলেন। গঙ্গাধর পাঠ শেষ হইলে, গুরুর অনুমতি লইয়া ইঁহাকেই প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে পরমানন্দের পুত্র আনন্দ চক্রবর্ত্তী এবং পৌত্র প্রপিতামহ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও তাঁহার শিষ্য হইবার অধিকার লাভ করেন।

গঙ্গাধরের শ্যালক-পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত গঙ্গাধর-জীবনীতে পড়িয়াছি, তাঁহার শিক্ষা সমাপ্তির পর, প্রথমে তিনি এই কলিকাতানগরীতেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই জ্বর ও উদরাময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া নাটোরে প্রত্যাগমন করিয়া আরোগ্য লাভের পর পিতার ইচ্ছায় মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ নগরীতে থাকিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করেন। তখনও মুর্শিদাবাদ বাঙলার নবাবনাজীমদিগের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল এবং বহু রাজা ও ধনশালী ব্যক্তিবর্গের অধ্যুষিত ছিল।

সে যুগে গঙ্গাধরের কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ গমনে অন্য ক্ষতি যাহাই হউক, একটা লাভ তাঁহার এই হইয়াছিল যে, তখনকার দিনে স্বধর্ম্মনিরতা পুণ্যময়ী স্বর্ণময়ীর রাজধানীতে, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মিথিলা— সারা ভারতের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বৃত্তি গ্রহণের জন্য আগমন করিতেন। তাঁহাদের পরস্পর শাস্ত্র বিচারে, যিনি যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন, তিনি তদনুযায়ী বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। বিদ্যানুরাগী গঙ্গাধর এই সকল পণ্ডিতের সান্নিধ্যে আসিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের আলোচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং যাবতীয় শাস্ত্রে অসামান্য অধিকার লাভ করিয়া সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারসভায় [illegible] লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই বিচারসভায় [illegible] করিতেন, জয়পরাজয় স্থির করিয়া দিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান না থাকিলে এ পদের যোগ্যতা [illegible] করিতে পারা যায় না।

গঙ্গাধরের চিকিৎসার অনেক অলৌকিক ঘটনা [illegible] এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। [illegible] তরুণচিকিৎসক গঙ্গাধর, একটি অসাধারণ [illegible] আপনার নাম প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৈদাবাদ আগমনের অল্প দিন পরেই একদা তিনি [illegible] যোগে বালুচর নামক স্থানে গমনকালে, আচ্ছাদনের [illegible] বসিয়া ভাগীরথীর পারস্থ শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন। নৌকা তীরের নিকট দিয়াই যাইতেছিল। [illegible] শ্মশানে আনীত একটী গঙ্গাযাত্রী মুমূর্ষু রোগী [illegible] নয়নপথে পতিত হইল। কৌতূহলপরবশ হইয়া [illegible] তীরে নামিলেন এবং মুমূর্ষুকে দেখিয়াই [illegible] তখনও আসন্নমৃত্যু লক্ষণ দেখা দেয় নাই। [illegible] বন্ধুদের প্রশ্ন করিয়া ইহাও জানিলেন—তাঁহারা [illegible] দিবস ধরিয়া এইভাবে তথায় আছেন এবং আরও [illegible] থাকিতে হইবে ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়াছে। তখন গঙ্গাধর নিজের চিকিৎসাবৃত্তির পরিচয় [illegible] এবং বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন —"ইঁহার মৃত্যুর এখনও দেরী আছে, চিকিৎসা করাইলে এ [illegible] রক্ষা পাইবেন।" তরুণ যুবকের এ দৃঢ়তা সহযাত্রীগণকে বিচলিত করিল। তাঁহাদের একজন অগ্রসর হইয়া [illegible] গঙ্গাধরকে চিকিৎসার্থ জন্য অনুরোধ করিলেন। [illegible] তত্রত্য সহজলভ্য একটি পাচনের ব্যবস্থা করিয়া সে দিনের মত গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রত্যাগমন কালে রোগীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বুঝিয়া উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং রোগীকে গৃহে লইবার জন্য উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য এই রোগী তাঁহারই

অবস্থায় আরোগ্য হইলে অল্পকালেই তাঁহার খ্যাতির কথা প্রচার হইয়াছিল। তৎকালে বাঙলার নবাব নাজীম সংশয়াপন্ন পীড়িত ছিলেন, ইংরাজ ডাক্তার 'কোটা' প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ তাঁহার পীড়া অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিলে, গঙ্গাধর চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে নিরাময় করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্ব দর্শন করিয়াছেন, এমন লোক এখনও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিরল নহে, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন, কায় ও শল্য—উভয় চিকিৎসায় তাঁহার সমান অধিকার ছিল।

একবার তাঁহাদের পল্লীর জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের এক ব্যক্তির একটি স্ফোটক হইয়াছিল। অস্ত্রোপচার জন্য স্থানীয় খ্যাতনামা ডাক্তার আহুত হইলেন। তিনি সে দিবস অস্ত্র প্রয়োগের সময় হয় নাই, বুঝিয়া সে দিনের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, এবং পরদিবস অস্ত্রোপচার করিবেন বলিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কোথায় কি ভাবে অস্ত্র করা হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে কবিরাজ মহাশয় পীড়িত প্রতিবেশীর তত্ত্ব লইতে আসিয়া ডাক্তার বাবুর অভিমত শুনিলেন এবং একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "ডাক্তারকে আমার নাম করিয়া বলিও—এখানে কাটিলে শিরা কেটে বিলক্ষণ রক্তস্রাব হবে, আর ক্ষত শুকাতে দেরী হবে।" তাহার পর নিজেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এইখানে যেন কাটে, অন্যত্র করে ত আমাকে খবর দিও।" পরদিন যথাসময়ে ডাক্তার বাবু উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিলেন এবং ঈষৎ সহাস্য বদনে "কবিরাজ মহাশয়ের কাছে কি এখন আমাদের অস্ত্র প্রয়োগের উপদেশ নিতে হবে"—এরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর তখন সাক্ষাৎ "গঙ্গাধর" তুল্য, তাই মৌখিক ঔদাস্য প্রকাশ করিলেও অন্তরে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে খবর পাইয়া কবিরাজ মহাশয়ও উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ডাক্তার বাবু তৎপূর্ব্বেই পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনা স্থানীয় অনেক লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়: বহরমপুরেই এক ব্যক্তির যকৃতে অন্তর্বিদ্রধি হইয়া জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। স্থানীয় সিভিল সার্জ্জন অস্ত্রোপচার ভিন্ন কোন উপায় নাই বলিলেন, কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগও যে নিরাপদ, তাহা স্বীকার করিলেন না। বিপদের স্থলে গঙ্গাধরকে একবার সকলেই দেখাইত। তিনিও দেখিয়া অসাধ্য ব্যাধি স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কারণ যথেষ্ট আছে বলিয়া নিজেই চিকিৎসার ভার লইলেন এবং সামান্য পাচন প্রলেপের সাহায্যে বিদ্রধিটি বিদীর্ণ করিয়া রোগীর জীবনদান করিলেন। কৌতূহলী ডাক্তার সাহেব শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই চিকিৎসা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে ডাক্তার সাহেব বীরভূমে অবস্থান কালে ঐ প্রকারের একটি দুরারোগ্য রোগীকে গঙ্গাধরের চিকিৎসাধীনে থাকিবার উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন—মুর্শিদাবাদে এক ব্রাহ্মণ আছে, তাহার কাছে যদি যাও, তবেই ভাল হইবে।"

গঙ্গাধরের শিষ্যপ্রীতি অতুলনীয়। তিনি একবিংশতি বর্ষ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বহু ছাত্রকে অন্ন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন। অল্প বয়সে বিপত্নীক হওয়ায় একমাত্র পুত্র ঘরণী ও ছাত্রদের লইয়াই তিনি সংসারী ছিলেন, তাই ছাত্রদের কেবল অন্ন ও শিক্ষা দান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; যাহার যেরূপ অভাব—সমস্তই তিনি পূরণ করিতেন। আমরা এখানে এইরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব।

পিতৃমাতৃহীন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক দেবকান্ত যেদিন এক বস্ত্রে তাঁহার নিকট আপনার দুর্দ্দশা জানাইয়া বিদ্যার্থে প্রার্থনা করিলেন, সেদিন এই বালকের নিঃসহায় অবস্থা তাঁহাকে অত্যন্ত অভিভূত করিল। তিনি এই বালকের পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া অন্ন বস্ত্র ও [illegible] করেন এবং ভবিষ্যতে নিজমতের বৃত্তিভোগী চিকিৎসক করিয়া দিয়া ও স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া [illegible]

তাঁহাকে সংসারী করেন। কিন্তু দুই বৎসর মধ্যেই তাঁহার এই শিষ্য নবাব বাড়ীর চিকিৎসকের পদ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দরবারে যাইবার কালে তাঁহার উপর চোগা-চাপকান পরিবার হুকুম হইয়াছিল, তিনি বাল্য জীবনে দরিদ্র ছিলেন, কখনও জামা জুতা ব্যবহার করেন নাই; দরবারী পোষাক তাঁহার মনঃপুত হইল না,—তজ্জন্যই কার্য্য ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অর্থাভাব নিবন্ধন কোন ভাল স্থানে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তখন দেবকান্ত জঙ্গিপুর মুকুমার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থান করিয়া নিরুপায় অবস্থায় "পাঠশালা" করিয়া বালকদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এই কার্য্যে—অর্থ গ্রহণ করিতেন না। অনেকেই 'সিধা' দিত, চিকিৎসার দ্বারাও সামান্য কিছু পাইতেন। তাহাতে তাঁহার নিজের ব্যয় এককপে নির্ব্বাহ হইত।

এই সময়ে খ্যাতনামা জমীদার বাগানদান বাবুর চিকিৎসার জন্য গঙ্গাধর জঙ্গিপুর আসিলে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ হইল। তিনি সকল কথা শুনিয়া নিজের মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া দরবারী পোষাক গ্রহণ না করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কাছে না গিয়া এরূপ আত্মগোপন করিয়া থাকার জন্য তিরস্কারও করিলেন।

এখানে থাকিতেই তিনি উক্ত জমীদারগৃহে ও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিজের চেষ্টায় মাসিক বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং দ্বিতীয়বার শিষ্য দেবকান্তকে জঙ্গিপুরে সু প্রতিষ্ঠিত করেন। গুরু গঙ্গাধরের অসীম স্নেহভাজন এই দেবকান্ত কবিরাজ এই প্রবন্ধ লেখকের মাতামহ ছিলেন। সামাজিক ব্যাপারেও মহাত্মা গঙ্গাধরের সহিত আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। একবার তাঁহারই ছাত্র বঙ্গীয় সমাজভুক্ত স্থানীয় একজন কবিরাজের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় একটি অসঙ্গত ব্যবহারে রাঢ়ীয় সকল বৈদ্য তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে মাতৃদায়গ্রস্ত ছাত্রটি বিপন্ন হওয়ায় তিনি বিশেষ রকম বিচলিত হইয়া পড়েন। তখন আমার পিতামহ সহরে আমাদের জাতির মধ্যে প্রবীন ও গণ্যমান্য রূপে পরিচিত ছিলেন। গঙ্গাধরের অনুরোধে, বহরমপুর পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যগণের একরূপ প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র দাশ গুপ্তের ও আমার পিতামহের বিশেষ চেষ্টায় এই দলাদলির অবসান হয়। এই মীমাংসার জন্য কবিরাজ মহাশয় আমার পিতামহকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যদি আমার কাজে আপনার সন্তোষ হইয়া থাকে তবে আমার শেষ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া গঙ্গাযাত্রা করাইবেন। কবিরাজ মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি ত আমার অপেক্ষা বৃদ্ধ ন'ন, কাহার গঙ্গাযাত্রা আগে হবে—তাই ঠিক হোক।"

বলা বাহুল্য পিতামহ—কবিরাজ মহাশয়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। তখন তিনি জরাগ্রস্ত দেহ লইয়াও পিতামহের অন্তর্জলি-গঙ্গার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর শিক্ষা-সমাপ্তির পর একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বগ্রামে পদ্মলোচন দাশ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা দিগম্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার পত্নী অষ্টাদশ মাসের একমাত্র পুত্র ধরণীধরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার পর গঙ্গাধর আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই, সমস্ত জীবন লোকশিক্ষায় ও গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যয় করিয়াছিলেন।

ছাত্রপ্রীতি এবং দরিদ্র ও পীড়িতের প্রতি তাঁহার যেমন অনুকম্পা ছিল, অপরদিকে তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তি হইতে সময় সময় কঠোর ভাবেরও প্রকাশ পাইত। তাই যে রাজধানীর সংশ্রবে থাকিয়া তিনি "বিশ্ববন্দ্য গঙ্গাধর" হইয়াছিলেন, যেখানে তিনি অতুলন চিকিৎসায় ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য "বিক্রমাদিত্যের নব রত্নের" সম্মানলাভ করিয়াছিলেন, আর্থিক হিসাবে যেখানকার আয়—তাঁহার সকল স্থানের প্রাপ্য হইতে অধিক ছিল;—একদিনের একটি কথায় তিনি সেই কাশিমবাজারের সহিত নিজের সকল সম্বন্ধ শেষ করেন। এই জন্য উাঁহাকে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের সংশ্রবও

ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে মহারাণীর কোন সংস্রব ছিল না—তাই রাজধানীর মর্য্যাদাহানি করেন নাই, তিনি শিষ্যের ভিতর দিয়া দূরে থাকিয়া কাশীমবাজারের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুর শিক্ষায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শিষ্য গোবিন্দচন্দ্র আর শ্রীচরণ রায় ইঁহারাই আদেশে রাজধানীতে তাঁহার অভাব অনেকখানি পূরণ করিয়াছিলেন।

অর্থাকাঙ্খা কোনদিন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। অযত্নলব্ধ অর্থে তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও শিষ্যবর্গের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কাশীমবাজার রাজবাটীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে কিছুদিন তাঁহার আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় পূর্ণিয়ায় কোন জমীদার গৃহে চিকিৎসার জন্য তাঁহার আহ্বান আসিল। বঙ্গের অন্যতম নেতা স্বনামখ্যাত রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নিকট তাঁহাকে পাঠাইবার জন্য তার আসে। বৈকুণ্ঠনাথ এই সংবাদ লইয়া গঙ্গাধরের নিকট উপস্থিত হইলে গঙ্গাধর অভাব-দৈন্যের মধ্যেও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ক্ষতি হইবে বলিয়া অত দূর দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া এবং সেখানে এককালীন অনেক টাকা পাইবেন বলিলেও তিনি যাইতে অস্বীকার করেন। পরে তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারায় কৌশলে যাওয়া স্থগিত করিবার জন্য বলেন "আমি গেলে দিন একশত টাকা দিবে ত?" ভাবিয়াছিলেন দিন ১০০৲ শত দিতেও পারিবে না, যাইবার আবশ্যকও হইবে না।

যদিও সেখান হইতে টাকার কোন আভাস দেওয়া হয় নাই, তথাপি তাহাই পাইবেন বলিয়া বৈকুণ্ঠ বাবু কোন মতে তাঁহার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সে সময় কবি ঈশ্বর গুপ্ত কোন কারণে পূর্ণিয়ায় গিয়াছিলেন। গঙ্গাধর চিকিৎসা সমাপ্তির পরও কবি সমাগমে মনের আনন্দে মাসাধিক কাল তথায় কাটাইয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে তথা হইতে তাঁহার ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাদি কিছু দেওয়া হয় নাই। তাঁহারও যে কিছু দাবী আছে তাহাও বোধ হয় মনে ছিল না।

ফিরিয়া আসার পর বৈকুণ্ঠবাবু তাঁহাকে তথায় কেমন ছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলে, কবি-সঙ্গমে তাঁহার সেই আনন্দের কথাই বলিলেন; টাকার কথা কিছু বলিলেন না। বৈকুণ্ঠবাবু জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—টাকা! কৈ, টাকা ত কিছু পাই নাই।

বৈকুণ্ঠবাবু তখন জানাইলেন,—আপনার গুণমুগ্ধ হইয়া দশ হাজার টাকা তাঁহারা দিয়াছেন, অদ্যই টাকা লইয়া লোক আসিয়াছে। গঙ্গাধর বিস্মিত হইলেন।

তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে উদাসের বিষয় বৈকুণ্ঠ বাবুর জানা ছিল, তাই তৎকালে তিনি সমস্ত টাকা তাঁহাকে দেন নাই। তবে সেবার তিনি খুব ধুমধামের সহিত ইষ্টদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, আর ঐ টাকার কতকাংশ দিয়া তাঁহার বর্ত্তমান বাসভবন পুনর্গঠন করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধরের রহস্য প্রিয়তাও কম ছিল না। একদা একটি দুরারোগ্য রোগীর বিষয় লইয়া আলোচনা হইতেছিল, তথায় তাঁহার সহিত শিষ্য গোবিন্দ ও শ্রীচরণ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয় ঐ ব্যাধি কোথায় কাহাকে ভাল করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছিলেন। বলিবার ভঙ্গী হয় ত স্থানোপযোগী হয় নাই, বোধ হয় ঐ কারণেই উপস্থিত জনগণের মধ্যে দেওয়ান রাজীববাবু—শ্রীচরণ রায় মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—শ্রীচরণ, গোবিন্দ ত সব রোগীই ভাল করিয়াছে, এবার তুমি কিছু বল। রহস্যপ্রিয় গঙ্গাধর উত্তর দিলেন—গোবিন্দের ত এখন ভাল করার কথা হচ্ছে। মারিয়াছে ক'টা—তার হিসাব আগে দিক।

মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও গঙ্গাধর পুত্রের উদ্দেশ্যে এইরূপ পরিহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। সে সময় তিনি ও তাঁহার ছাত্রগণ দিবারাত্রি তাঁহার সেবায় রত থাকিতেন। একটি ছাত্র কয়দিন সমান জাগিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিল,

সেদিন তিনি তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। ছাত্র কিন্তু সেরূপ কোন চেষ্টা দেখাইল না, স্থির ভাবেই বসিয়া রহিল। তিনি পুনঃ পুনঃ আদেশ করায় ছাত্র বলিয়াছিলেন—"আপনার এ অবস্থা দেখিয়া আমার ঘুম হবে না।" গঙ্গাধর সহাস্যে বলিয়াছিলেন—"তোমার যদি ঘুমের অভাব থাকে, ধরণীর কাছে ধার লইতে পার।" ধরণী কয় রাত্রি জাগরণের পর সেদিকে দ্বিপ্রহরে নিদ্রিত হইয়াছিলেন,—এবং তখন কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া উত্তর পান নাই,—ইহাই হইল এই রহস্যের কারণ।

গঙ্গাধর শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষ হইলেও চিত্রে ও স্থাপত্যেও সুনিপুণ ছিলেন, তখনকার দিনে বহরমপুর সহরে তাঁহার বাড়ীর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বাসভবন তাঁহারই পরিকল্পনায় ও তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। লোকের অভাবে একবার তিনি স্বহস্তে প্রতিমা গঠন করিয়া পূজাও করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরের যে কার্য্য তাঁহার জীবনের সমধিক প্রিয় ও গৌরবের হইয়াছিল এবং যাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট ঋষিরূপে পূজিত হইয়াছেন, তাহা সমগ্র চরক সংহিতার উদ্ধার ও টীকা জল্পকল্পতরু রচনা। বহু দিন হইতে সমগ্র গ্রন্থের অভাবে এদেশে চরকের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এক প্রকার হইত না বলিলেও চলে। আয়ুর্ব্বেদের এই দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ ব্যথিত হইয়া পড়ে। চরকের পুনর্গঠন জন্য বহু আয়াসে নানাস্থান হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এজন্য তাঁহাকে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল—তাহা বুঝান কঠিন। তখন যানবাহনের সুবিধা ছিল না; ১০।১৫ ক্রোশ গিয়া কোথাও ২।১ খানি পাতা পাইতেন, কোথাও আবার নিরাশ হইয়া ফিরিতেন। বহু চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারও আবার নানাস্থানে পাঠান্তরের অসঙ্গতি দোষ—তাঁহার শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধিই করিত। কিন্তু নিজের প্রতিভা-বলেই তিনি এই মহাগ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন এবং বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা—"জল্পকল্পতরু" লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন।

সুদূর অতীতে একদিন মহর্ষি চরক, অগ্নিবেশকৃত তন্ত্রের প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন, আর দীর্ঘকাল পরে ঋষি গঙ্গাধর চরকের উদ্ধার সাধন করেন। এই গ্রন্থ তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় ছিল, তাই তাঁহার জীবনান্তকালে শেষ বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"আমার চরক।" সারা জীবন ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ফলে বার্দ্ধক্যে তাঁহার 'বহুমূত্র' দেখা দিয়াছিল, তথাপি তিনি কোন দিন নিজের নিয়মিত কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে [illegible] অপরাহ্নে তাঁহার শেষ রচিত গ্রন্থ আগ্নেয় অলঙ্কারের "কাব্যপ্রভাবৃত্তি" লেখা শেষ হয়, সেদিন হইতে [illegible] আর কোন পুঁথি লইয়া বসেন নাই। কাল সমাগত বুঝিয়া তিনি প্রাণাধিক ছাত্রদিগকে একবার 'শেষ দেখা' দেখিবার জন্য সংবাদ দিয়া আনাইলেন। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ প্রমুখ প্রায় সকল ছাত্রই দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া গুরুর পাদমূলে সমবেত হইলেন। যথাসময়ে গঙ্গাধর নিজেই ছাত্রদের আহ্বান করিয়া বলিলেন "এবার আমার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর।" সেইদিনই তাঁহার পুত্রপ্রতিম শিষ্যমণ্ডলী ভাগীরথী বক্ষস্থিত জমীদার ঈশ্বরবাবুর "আটচালা" বাড়ীতে তাঁহাকে তীরস্থ করেন। যে কয়দিন তথায় ছিলেন, দুগ্ধ মাত্র পান করিতেন, মৃত্যুর দিন তাহাও ত্যাগ করিয়া মাত্র জাহ্নবী বারি পান করিয়াছিলেন। অনেকে দুগ্ধপানে অনুরোধ করিলে শাস্ত্রের প্রমাণ উচ্চারণ করিয়া অনুরোধকারীদের নিরস্ত করিয়াছিলেন।

শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি সমান প্রবল ছিল। সময় আগত বুঝিয়া তাঁহার একজন কৃতবিদ্য ছাত্র একটি স্তোত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন, এক স্থানে একটি অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব চরকের বিষয়ে কি বলিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল জানি না,—তিনি "আমার চরক" এইমাত্র উচ্চারণ করিতেই শিবনেত্র

হইয়া গেল। তৎকালেই প্রিয়তম শিষ্য মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের নির্দেশে অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে অর্দ্ধাঙ্গ মৃত্তিকায় শায়িত হইয়া পার্থিব লীলা সম্বরণ করিলেন। গঙ্গার পবিত্র লহরীর সহিত গঙ্গাধরের জীবলীলা মিশাইয়া গেল।

গঙ্গাধরের কর্ম্মবহুল জীবনের অত্যদ্ভুৎ ঘটনাবলী, অধিকাংশ আমাদের অজ্ঞাত; যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতে গেলেও অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তাই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম মাত্র।

উপসংহারে বক্তব্য তাঁহার স্বর্গারোহণের পর পুত্র ধরণীধর কয়েক বৎসর চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া ১৩০১ সালে নদীয়া জেলায় মীরা নামক স্থানে বৃক্ষাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, পৌত্র ত্র্যম্বকেশ্বর তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। দুঃখের বিষয় তাঁহার শেষ বংশধর পৌত্র ত্র্যম্বকেশ্বরও আজ নাই। গত বৎসর ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়া লাহোরে অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। এক্ষণে ত্র্যম্বকের বিধবা পত্নী ও দুইটী কন্যামাত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে একটি বিবাহযোগ্যা।

গঙ্গাধরের স্বরচিত পুস্তকের তালিকা

আয়ুর্ব্বেদীয়

১। আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ ২। পরিভাষা (মুদ্রিত) ৩। ভৈষজ্য রামায়ণ ৪। চরকের আয়ুর্ব্বেদের ব্যাখ্যা ৫। নাড়ী পরীক্ষা ৬। রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণের বিবৃতি ৭। ভাস্করোদয় ৮। মৃত্যুঞ্জয় সংহিতা ৯। আরোগ্য স্তোত্র ১০। প্রয়োগ চন্দ্রোদয় ১১। জল্পকল্পতরু টীকা (মুদ্রিত)

তন্ত্র

১২। নির্ব্বাণ সার ১৩। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

জ্যোতিষ

১৪। কাল বিজ্ঞান।

ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়

১৫। কৌমার ব্যাকরণ ১৬। ত্রিপাঠ ব্যাকরণ ১৭। মুগ্ধবোধের মহাবৃত্তি ১৮। পাণিনীর বার্ত্তিক ১৯। দোষ সন্দর্শনা (মুদ্রিত) ২০। শব্দশক্তিপ্রভা ২১। ধাতুপাঠ ২২। বাদার্থ।

স্মৃতি সম্বন্ধীয়

২৩। প্রমাদভঞ্জনী টীকা (মুদ্রিত) ২৪। পরাশর সংহিতার টীকা ২৫। স্মৃতি সেতু ২৬। দায়ভাগ (মুদ্রিত) ২৭। বৈধহিংসাদি নির্ণয় ২৮। ধর্ম্মানুশাসন ২৯। বিষ্ণুপুরাণের টীকা।

নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ

৩০। লোকালোক পুরুষীয় মহাকাব্য ৩১। শিখণ্ডী প্রাদুর্ভাব আখ্যায়িকা ৩২। তারাবতী স্বয়ম্বর মহানাটক ৩৩। গৌরীশ্বর চরিত (মহাকাব্য) ৩৪। সপ্তকাব্য ৩৫। সত্যোপাখ্যান ৩৬। দুর্গাবধ (মহাকাব্য) ৩৭। ছন্দসারের বৃত্তি ৩৮। আগ্নেয় অলঙ্কারের "কাব্যপ্রভাবৃত্তি" ৩৯। কাব্যলক্ষণের বৃত্তি ৪০। ছন্দোনুশাসন ৪১। পিঙ্গলের টীকা ৪২। বৈশেষিকের ভাষ্য।

ষড় দর্শন সম্বন্ধীয়

৪৩। ষটসিদ্ধান্ত ৪৪। বেদান্ত সর্ব্বস্ব ৪৫। ব্রহ্মবিদ্যামৃত ৪৬। শারীরিক সূত্র বার্ত্তিক ৪৭। বস্ত নির্ণয় ৪৮। পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলী ৪৯। তত্ত্ববিদ্যাকর (পাতঞ্জলাদি ষড়দর্শনের ব্যাখ্যা) ৫০। সংস্কারবাদ ৫১। সাংখ্যভাষ্য বৃত্তি ৫২। পাতঞ্জলভাষ্য ৫৩। গৌতমীয় বাৎস্যায়ণ বৃত্তি ৫৪। কুসুমাঞ্জলীর টীকা ৫৫। বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য।

উপনিষদ

৫৬। মিত্রোপনিষদের ব্যাখ্যা ৫৭। তৈত্তরীয়োপনিষদের ব্যাখ্যা ৫৮। ছান্দোগ্যোপনিষদের ব্যাখ্যা ৫৯। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ব্যাখ্যা ৬০। প্রশ্নোপনিষদের ব্যাখ্যা ৬১। কেনোপনিষদের ব্যাখ্যা ৬২। রাজনামরোপনিষদের ব্যাখ্যা ৬৩। কৈবল্যোপনিষদের ব্যাখ্যা।

বিবিধ

মহাপুরুষের লক্ষণ বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে :—

মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ স্বক্ষেত্রে, উচ্চগৃহে, অথবা কেন্দ্রে থাকিলে ৫ প্রকার মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে।

বৃঃ সং ৬৯ অঃ।

এ অবস্থায় কবিরাজ গঙ্গাধরকে আমরা মহাপুরুষ নামে অভিহিত করিলে তাহা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অহিফেন আন্দোলন

[শ্রীরামলাল সুর]

কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে অহিফেনের ব্যবহার এত অধিক মাত্রায় চলিতেছে যে, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। এই অত্যধিক ব্যবহারের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক তদন্ত-সমিতি বসাইয়াছেন। কয়েকজন সরকারি কর্ম্মচারি ও বেসরকারি ভদ্রলোক লইয়া এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি দুইটী প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া জনসাধারণকে তাহার উত্তর দিবার জন্য আহবান করিয়াছেন। প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে হইলে অহিফেনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

গত বৎসর লিগ অব্ নেশনসের মহাসভায় অহিফেন সম্বন্ধে আলোচনা কালে ভারতের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ ভাবের ছাড়পত্র দেখাইতে না পারিলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে অহিফেন রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না। ভারতগভর্ণমেণ্ট যে স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে অহিফেন ব্যবহারের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রবল লোকমত গঠিত হইয়াছে যে, তাহার সম্মান রক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনেকটা বাধ্য হইয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অহিফেন সম্বন্ধে লোকের ধারণা অন্যরূপ ছিল। তখন অহিফেন ব্যবহারকে লোকে ততটা দূষণীয় বলিয়া মনে করিত না। তবে অহিফেনের ধূমপানকে ভদ্রসমাজ চিরকালই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে।

গত ১৮৯০-৯৩ সালে ভারতে অহিফেনের চাষ বন্ধ করিবার জন্য এক বিরাট আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার ফলে ১৮৯৪ সালে রয়েল কমিশন বসিয়াছিল। উভয় দলে সভাসমিতি ও বাদ প্রতিবাদ যথেষ্ট চলিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের দল তখন প্রবল ছিল। বোম্বাই সহরের আবগারি বিভাগ কয়েকজন পাঞ্জাবী সিপাহীর ছবি,

গুলিখোরের ছবি বলিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। গুলি খাইলে যে লোক পুষ্ট ও সবল হয়, ইহা প্রমাণ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। বিলাতের এক সভায় কয়েক জন উচ্চপদ ইংরাজ নিজদিগকে গুলিখোর বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন নাই। লোকমত তখনও ততটা দৃঢ় হয় নাই। "বঙ্গবাসী"র ন্যায় তখনকার দিনের প্রতিষ্ঠাবান সংবাদপত্র অহিফেন ব্যবহারের কুফল স্বীকার করেন নাই এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া, যাঁহারা অহিফেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এই সকল দেখিয়া সংস্কারকেরা বুঝিয়াছিলেন, গভর্ণমেণ্টকে স্বমতে আনিতে হইলে, আগে লোকমত গঠন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম প্রদেশে অহিফেনের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে অহিফেন-আন্দোলন অনেকটা প্রবল হইয়াছিল। আসামে অহিফেন-ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ১৯২১ সালের ২২শে মার্চ্চ ওখাকার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মিঃ জে, জে, নিকলস্ রায় অহিফেনের ব্যবহার সংযত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিয়াছিলেন—

১। বর্ত্তমান অহিফেনসেবী ব্যতীত অপর কাহাকেও ডাক্তারের বিনা ব্যবস্থাপত্রে (Prescription) অহিফেন বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

২। প্রত্যেক অহিফেনসেবী নিজ ব্যবহারের জন্য কতটা অহিফেন ক্রয় করিতে পারিবেন— তাহার পরিমাণ ডাক্তার মণ্ডলী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৩। প্রত্যেক অহিফেনসেবীর নামের একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এমন একটা সময় বাঁধিয়া দেওয়া হউক যে, সেই সময়ের পরে আর কোন নূতন নাম ঐ তালিকায় যোগ করা হইবে না।

৪। দোকান প্রতি অহিফেন ব্যবহারের পরিমাণ এবং ব্যক্তিগত অহিফেন ব্যবহারের পরিমাণ প্রতি বৎসর এমন ভাবে কমাইয়া দিতে হইবে যে, দশ বৎসরের মধ্যে আসাম প্রদেশ হইতে অহিফেন ব্যবসায় যেন একেবারে উঠিয়া যায়।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি যে সমীচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৬ জন সদস্য কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হইয়াছিল, তথাপি গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন নাই। এই প্রস্তাবমত ব্যবস্থা হইলে আসাম প্রদেশে যে অহিফেনের ব্যবহার অনেকটা নিবৃত্ত হইত তাহা বলা বাহুল্য। ১৯২২-২৩ সালের আসাম প্রদেশের আবগারী বিভাগের কার্য্য বিবরণীতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, দোকানদারগণ অহিফেনসেবীদের নামের তালিকা ও হিসাব রাখায় কিছু সুফল ফলিয়াছে। অনেক অহিফেনসেবী এই ব্যবস্থার জন্য অহিফেন ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন।

১৯০৩ সালে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশে অহিফেনসেবীদের তালিকা প্রথম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৯১১-১২ সালে ১৭,০৭ জন অহিফেনসেবীর নাম ঐ তালিকাভুক্ত ছিল। দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯২২-২৩ সালে ঐ তালিকাভুক্ত অহিফেন সেবীর সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৩,৯১১ জনে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯১৮-১৯ সালে ৮৬,৫০০ সের অহিফেন বিক্রয় হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯২২-২৩ সালে ঐ পরিমাণ কমিয়া গিয়া ৩১,৯০০ সেরে দাঁড়াইয়াছিল।

১৯২৪ সালের ২০শে জুন আসামের প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটি উক্ত প্রদেশে অহিফেন ব্যবহারের ফলে কিরূপভাবে আসামবাসীদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন এবং দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এক বেসরকারী তদন্তসমিতি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

উক্ত সমিতির সভ্যগণ ১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ১৭৫০ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া ৩২৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। উক্ত সমিতির সভ্যগণ কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইলেও এবং অসহযোগনীতির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি থাকিলেও, তাহারা যে নিরপেক্ষ ভাবে অভিমত সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাহা সাক্ষীর তালিকা দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ৩২৫ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৬ জন গভর্ণমেণ্ট পেন্সনভোগী, ৬ জন রায় বাহাদুর, ৩ জন রায় সাহেব, ১ জন খাঁ বাহাদুর, ১১ জন মিউনিসিপালটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১২ জন জেলপরিদর্শক ১৫ জন ডাক্তার, ৭ জন কবিরাজ, ৬ জন মোক্তার, ২ জন কাগজের সম্পাদক, ৫৪ জন অহিফেন সেবী প্রভৃতি ছিল।

মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেব সমিতির সভ্যরূপে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সমিতির সিদ্ধান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। ৪০ বৎসর অধিক বয়স্ক অহিফেনসেবীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাহারা প্রয়োজন মত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অহিফেন ক্রয় করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

২। ৪০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক অহিফেনসেবীদের রোগী হিসাবে গণ্য করা হইবে। ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র দেখাইলেই তিন মাস পর্য্যন্ত তাহারা অহিফেন ক্রয় করিতে পারিবে। পরে প্রয়োজন হইলে পুনরায় তাহাদিগের ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। পরে বিপজ্জনক ভেষজ আইন অনুসারে অহিফেনকে বিষাক্ত ঔষধের তালিকাভুক্ত করিতে হইবে এবং অন্যান্য বিষাক্ত ঔষধের মত অহিফেনের বিক্রয় ও ব্যবহার সংযত করিতে হইবে।

৪। ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ঔষধ ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন ব্যতীত অহিফেন ও অহিফেন সংক্রান্ত দ্রব্যের বিক্রয় হইতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ অপেক্ষা সিলোনের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ১৯১০ সালে তথাকার গভর্ণমেণ্ট "সিলোন অপিয়াম অর্ডিনেন্স, ১৯১০" নামক যে আইন পাশ করিয়াছেন, তাহাতে পুরাতন অহিফেন সেবী ব্যতীত, ডাক্তারের বিনা ব্যবস্থা পত্রে কোন লোককে অহিফেন বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ। ব্যবস্থাপত্রে যে তারিখ দেওয়া থাকে, ঐ তারিখ হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত অহিফেন ক্রয় করা যাইতে পারে। তারপর ঐ ব্যবস্থাপত্র বাতিল হইয়া যায়, এবং অহিফেন বিক্রয় করিবার সময় দোকানদার ঐ ব্যবস্থাপত্র নিজের নিকট রাখিয়া দেন।

পুরাতন অহিফেনসেবী যাহারা তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের জন্ত গভর্ণমেণ্ট একটা দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক অহিফেনসেবীকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি কতটা অহিফেন ব্যবহার করেন, কোথা হইতে সেই অহিফেন ক্রয় করিতে চাহেন, এবং কিরূপভাবে অহিফেন ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছেন—তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়া যেন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে দরখাস্ত করেন।

ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র ব্রহ্মদেশেই অহিফেনসেবীদের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে ৭ই মার্চ্চ বর্ম্মা লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সভায় তথাকার আবগারী বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে যে, তাহার ফলে ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে দশ মাসের মধ্যে যে সকল অহিফেনসেবী সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়া তাহাদের নামে তালিকাভুক্ত না করিবে, তাহারা আর ভবিষ্যতে অহিফেন ক্রয় করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৯২৫ সালের মার্চ্চ মাসের লেজিসলেটিভ এসেমবিলিতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অহিফেন ব্যবহারের এক হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল। উহাতে দেখা যায় যে, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে; বালাসোর জেলায়, গোদাবরী প্রদেশে গুজরাটের পাঁচ মাহালে; বিহারে এবং মধ্য পাঞ্জাবে অহিফেনের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

যে সকল দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই সকল দেশে বৎসরে প্রতি ১০,০০০ অধিবাসীর জন্য গড়ে ৬ সের অহিফেন পাইতে পারিবে—ইহাই জেনেভার লিগ অব্ নেসনসের সভা স্থির করিয়া দেন। ভারতের জন্য উহার পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া ১২ সের ধার্য্য করা হইয়াছে। কিন্তু একা কলিকাতা সহরে গড় প্রতি ১০,০০০ অধিবাসী বৎসরে ১৪৪ সের অহিফেন ব্যবহার করে। এই মাত্রাধিক ব্যবহারের কারণ নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, অহিফেন কেমন করিয়া প্রস্তুত হয় এবং কিরূপভাবে উহার ব্যবহার হয়, তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

পোস্ত নামক ফুলের ঢেড়ী হইতে যে এক প্রকার দুধের মত সাদা রস বাহির হয়—তাহাই অহিফেন। ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি কয়েকটী দেশের কৃষিক্ষেত্রে পোস্ত গাছ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রথমে পোস্তের কাঁচা ঢেড়ীকে ছুরি বা অন্য কোনরূপ ধারাল অস্ত্র দিয়া চিরিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ স্থান হইতে এক প্রকার চটচটে রস নির্গত হইয়া ঢেড়ীর গায়ে শুকাইয়া যায়। তৎপরদিন উহা চাঁচিয়া লইয়া আগুনের তাপে সিদ্ধ করিলে উহার জলীয়াংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া উহা গাঢ় প্রাপ্ত হয়। উহার রং কৃষ্ণাভ পিঙ্গল হয়। স্বাদ অতি তিক্ত হয় এবং উহার গন্ধেরও এক বিশেষত্ব দেখা যায়।

ক্রমশঃ

আমাদের বংশগত কয়েকটী ঔষধ ও যোগ

[কবিরাজ শ্রীশীতল চন্দ্র দত্ত শর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদতীর্থ-শাস্ত্রী]

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের পাঠকবর্গকে আজ কয়েকটি আমাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত অপ্রকাশিত ঔষধের সন্ধান দিতেছি, পরে অপরাপর অপ্রকাশিত ঔষধ গুলি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ইহা আমাদের বহু পরীক্ষিত, অনেক বড় বড় ঔষধ অপেক্ষা এগুলির দ্বারা বেশ ফল পাওয়া যায়। কবিরাজ মহাশয়গণ কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে কেবল শাস্ত্রীয় যোগ বা ঔষধের কিম্বা সাধারণ ব্যক্তির পরিচিত যোগগুলির প্রতিধ্বনি না করিয়া নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ গোপনীয় প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির অপ্রকাশিত অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক যোগ ও ঔষধ এবং নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষিত যোগ বা ঔষধ প্রকাশ করিলে, পাঠক কবিরাজগণ নূতন নূতন কিছু অবগত হইতে পারেন এবং সাধারণেরও বিশেষ উপকৃত হন। প্রবল পাশ্চাত্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কবিরাজগণকে প্রতিনিয়ত যেরূপভাবে যুদ্ধ করিতে হইতেছে এবং প্রতিদিন নব নব রোগ যেরূপভাবে এদেশের অধিবাসিগণকে আক্রমণ করিতেছে, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী অভিজ্ঞ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ কবিরাজগণের ও সাধারণ কবিরাজগণের সুবিধার জন্য তাঁহাদের গবেষণাসম্ভূত ঔষধগুলির প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করা উচিত নহে। অনেক সময় অনভিজ্ঞতার জন্য সাধারণ কবিরাজগণকে পাশ্চাত্য চিকিৎসকের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয়, তাহার ফলে সাধারণ ব্যক্তির কবিরাজীর প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠে। পাশ্চাত্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যেরূপ কঠোর পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে তাঁহাদের চিকিৎসার উন্নতি সাধনে তৎপর আছেন, আমরা—কবিরাজেরা তাঁহার শতাংশের একাংশও যদি করিতাম, তাহা হইলে যে চিকিৎসা হিন্দুর আদি যুগ হইতে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য ছিল, সেই চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদের কখনই এতদূর পতন সম্ভবপর হইত না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও যাহার মহিমা অকুণ্ঠিত, হৃদয়ে ঘোষণা করেন, যে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিশ্বের সমস্ত

চিকিৎসার আদি, যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমাদিগকে অকালমৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই চিকিৎসা আজ আমাদের নিকটই অবহেলা প্রাপ্ত। সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও কাপট্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ঢালিয়া ত্রিকালদর্শী মুনি ঋষিগণের বহু তপস্যার্জ্জিত আয়ুর্ব্বেদকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে চিকিৎসার অধীন থাকিলে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য দূরীভূত হয়, সেই চিকিৎসাই আমাদের আয়ুর্ব্বেদ চ্যবনের পুনর্যৌবন প্রাপ্তি প্রভৃতি এই বিংশ শতাব্দীর কল্পনার অতীত বহু আর্য্য বিজ্ঞান আয়ুর্ব্বেদের গৌরবময় কাহিনীাবলী ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ের জিনিষ নহে। জীবের কল্যাণের জন্যই বিশ্বের কল্যাণকামী পরার্থে উৎসৃষ্টপ্রাণ মহর্ষিগণ বহু সাধনায় ইহাকে লাভ করিয়াছিলেন। যেদিন হইতে তাঁহাদের সেই মহান উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া পণ্য হিসাবে আয়ুর্ব্বেদ বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আয়ুর্ব্বেদেরও পতন আরম্ভ হইয়াছে এবং আমরা (হিন্দুরা) ও বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমাদের আর কেহ পূর্ণ আয়ু ভোগ করিতে পায় না, নীরোগ দেহও আর বড় দেখা যায় না মড়ক মহামারী ত দলে দলে প্রাণ কাড়িতেছে, কত গ্রাম যে জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও যদি আমরা অবহিত না হই, এদেশের ধ্বংস অনিবার্য্য, কারণ "যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্" এই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের বাণী বিস্মৃত হওয়ার ফল আমাদের অবস্থা এইরূপ হওয়া। এমন অনেক হিন্দু সন্তান আছেন, যাঁহারা কবিরাজীর নামে নাক সিটকান। যে চিকিৎসা তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রাণ দান করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের নিকট বর্ত্তমানে তাহা কার্য্যকরী নহে. এখন আমাদের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য পোষাক পরিচ্ছদ, পাশ্চাত্য আহার বিহার— এমন কি পাশ্চাত্য চিকিৎসাও দরকার। নতুবা রোগ সারিবে না। কিন্তু সেই পাশ্চাত্য মোহমদিরা মুগ্ধ আত্মহারা স্বদেশ সম্বন্ধে উদাসীনগণ যদি স্মরণ করেন যে, ভস্মাদি, তেউড়ী, এবং তৈলের বিরেচন ক্রিয়া পূর্ব্বেও যেমন বর্ত্তমানেও ঠিক আছে, চিত্রকমূল বাটিয়া লাগাইলে পূর্ব্বের মত এখনও দাহ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তবে বোধ হয় আমাদের ভ্রম দূর হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে যাঁহারা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপেক্ষার সহিত কটাক্ষ করেন, তাঁহারা কখনও আয়ুর্ব্বেদ স্পর্শ করেন নাই। ইংরাজ গুরুর মুখের প্রশংসা না শুনিলে যাঁহারা তুষ্ট হন না তাঁহারা বাঙ্গালোর ডাক্তার হিরেসবার্গ, সার উইলিয়ম জোন্স, মেজর টইলফোর্ড, মহামান্য জষ্টিস্ উড্রফ প্রমুখ জেনারেল সার পারডি লিউকস্, প্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ চার্লস প্রভৃতির উক্তি পাঠ করুন। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অবহেলার জন্য এ দেশের কি অবস্থা হইয়াছে— তাহা অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের নিত্য নূতন গবেষণায় অজস্র অর্থলব্ধ যে চাকচিক্যময় ও মনোহর ঔষধ ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, তদ্বারা আমাদের দেশের কতটা উপকার হইয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়। মধ্যে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেও এবং এখনকার কথায় অশিক্ষিতা ধাত্রীগণের দ্বারা প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হইলেও বর্ত্তমান কালের (এই ডাক্তারের ছড়াছড়ি দিনের) ন্যায় তখন এত অধিক প্রসূতা বা নবজাত মৃত্যু হইত না। তখন প্রসব হইতে না পারায় মৃত স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইত—এই ফরসেপ প্রচলনের যুগে তদপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে গ্রামে গ্রামে ডাক্তারের সংখ্যা (কি এলোপ্যাথ কি হোমিওপ্যাথ) অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তখন কার মত এখন দশ বার খানা গ্রাম খুঁজিয়া একজন বৈদ্যের চেষ্টা করিতে হইতেছে না, কিন্তু মৃত্যুসংখ্যা বা রোগসংখ্যা কমা দূরে থাক, দেশ শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে— আর্ত্তের হাহাকারে সর্ব্বগ্রাম মুখরিত। যে দেশের রোগ বা মৃত্যুসংখ্যা কবিরাজদের চিকিৎসায় কম ছিল—সে দেশের আজ এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, বাইওকেমি প্রভৃতি

চিকিৎসকের বাহুল্য সত্ত্বেও রোগ বাহুল্য কেন? আমরা কি চাই, চিকিৎসক না স্বাস্থ্য? রোগ বা চিকিৎসক সংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই কি দেশের মঙ্গল হইবে?

যাক্, অনেক অবান্তর কথায় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে দূরে আসিয়াছি, এবার ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বর্ণন করিব। বারান্তরে এ বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

ঔষধাবলী :—

'অম্লারি চূর্ণ।'—সোডা, হরীতকী, সোহাগা, খড়, ফটকিরি, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ।

প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র চূর্ণ করিতে হইবে। পূর্ণমাত্রা ।০ একসিকি। সর্ব্বপ্রকার অম্ল, গলা জ্বালা, বুকজ্বালা, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। সাধারণ কোষ্ঠকাঠিন্যে বা কোষ্ঠবদ্ধেও ইহা উপযোগী। অনুপান—জল। আহারান্তে সেবনীয়। শূলবেদনার কালে উষ্ণ জল বা জলসহ সেবনে আশু উপশম করে। যাহাদের সহজে মলভেদ হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে।

'অগ্নিকুমার।'—গাবফল (এরণ্ড মূল), শামুকের চাকতি।

প্রত্যেক সমান। জল দিয়া বাটিয়া ১ রতি বটী করিবে। প্রাতে ও বৈকালে লেবুর রস সহ সেবনীয়। ইহা অজীর্ণ রোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ। দাস্ত জনিত অজীর্ণ মলত্যাগ, উদরাধ্মান, পেট ভার হইয়া থাকা, অরুচি, পেটের দোষ সত্বর দূর করিতে ইহা অব্যর্থ।

'সর্ব্বজ্বরারি বটিকা।'—ত্রিফলাদি চূর্ণ ১ তোলা, নাটার বীজ চূর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ০ সিকি তোলা, চিরতা চূর্ণ ।।০ তোলা, গুলঞ্চের পালো ।০ সিকি, পিপুল ।০ সিকি।

জল দিয়া মাড়িয়া ৬ রতি বটিকা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ, বিষম ও ম্যালেরিয়া জ্বরের বিরাম অবস্থায় ২।৩টি বটিকা জলসহ বা উপযুক্ত অনুপানে ২।৩ বারে সপ্তাহ সেবনীয়।

'গ্রাহক।'—সিদ্ধি ।০ সিকি, আফিং /০ আনা।

আর্দ্রক মর্দ্দন—১ রতি বটী। সর্ব্বপ্রকার অতিসারের মলত্যাগ বন্ধ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। অনুপান—মধুর রস, চাউলধোয়া জল প্রভৃতি।

'শঙ্খ বটিকা।'—শঙ্খ ভস্ম ।০ সিকি, মরিচ ১ তোলা।

(সোরা —/।০ সোয়া, সৈন্ধব লবণ—।০ অর্দ্ধ ছটাক, ফটকিরি ১ কাচ্চা ও আপাং মূল ১ কাচ্চা অগ্নিতাপে গলাইয়া থালায় ঢালিয়া রাখিয়া প্রস্তুত করিতে হয়) জলে মাড়িয়া ৩ রতি বটিকা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের ইহা মহৌষধ।

"কোষ্ঠ শুদ্ধি চূর্ণ।"—সোনামুখীর পাতা ১ তোলা, জাঙ্গী হরীতকী ।।০ তোলা, হুলফা ।।০ তোলা, চিনি ।০ সের, কিসমিস ১ তোলা, হরীতকী ।।০ তোলা, লবঙ্গ ।।০ তোলা।

একত্র চূর্ণ করিয়া ।০ চারি আনা মাত্রায় চিনি ও জল সহ প্রাতে বা রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনীয়। শোথ, উদরী, শূল ও সাধারণ বদ্ধকোষ্ঠে উপকারী।

শুক্রমেহে—"মন্মথবিনোদ বটী।"

রস— ছোট এলাচ,
গন্ধক— কর্পূর,
স্বর্ণসিন্দূর— কাবাব চিনি,

প্রত্যেক চারি আনা— অশ্বগন্ধা,
লৌহ— বলাডুগ বীজ,
অভ্র— জায়ফল,
জৈত্রী,
বঙ্গ— ধনে
স্বর্ণবঙ্গ— শ্বেত চন্দন,

প্রত্যেক ।।০ তোলা— চন্দন
কাকোলী,
ক্ষীর কাকোলী,
দারুচিনি,

প্রত্যেক ১ তোলা,

জল দ্বারা মর্দ্দন। বটী ২ রতি। শুক্রমেহে ইহা আশ্চর্য্য ফলদায়ক। অন্যান্য মেহেও উপকার করে। অনুপান—যজ্ঞডুমুরের রস প্রভৃতি।

ছিক্কা সংহারিণী।

বংশলোচন— ।০

ছোট এলাচ—৵০

মিছরি— ॥০

চূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেহনে বিশেষ উপকার হয়।

"সিন্দুর যোগ"।

রসসিন্দুর— ১ তোলা,

গন্ধক— ১ তোলা,

রসমাণিক্য— ॥০ তোলা,

নিশুণ্ডী— ২ তোলা,

জল দিয়া মর্দ্দনান্তে ২ রতি বটিকা করিতে হইবে। পান আদা বা পানের রস ও মধু। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা আশু ও আশ্চর্য্য ফলদায়ক।

আজ এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। যদি আগ্রহ দেখি, ক্রমে অপরাপর অপ্রকাশিত বহু বহু ঔষধ, তৈল বা আমার পরীক্ষিত যোগগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

(কবিরাজ শ্রীরাজনারায়ণ দাস কবিভূষণ)

সর্দ্দি ও কাসি।—সর্দ্দিকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করা উচিত নহে। কুপথ্যসেবী ব্যক্তির দুষ্ট সর্দ্দি হইতে শ্বাসকাসাদি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নূতন সর্দ্দি হইলে শীতল জলে স্নান না করাই ভাল। গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে একটু লবণ দিয়া সেই জলে স্নান করা এবং জামা বা মোটা চাদর দিয়া শরীরটি ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথম সর্দ্দি হইলে প্রাতে ও বৈকালে একটু করিয়া কাঁচা হরিদ্রার রস পান করিলে অসাধারণ উপকার দর্শিয়া থাকে।

সকালে ও সন্ধ্যায় ৫।৬টী করিয়া তুলসী পাতা একটু লবণ সহ চিবাইয়া খাইলে সর্দ্দি কাসিতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

গব্য ঘৃতে ২।৪ খানি আদার কুচি ভাজিয়া গরম গরম তিনবার চুষিয়া খাইলে সর্দ্দি কাসি সারিয়া যায়।

সিকি ভরি আন্দাজ তুলসী পাতার রসের সহিত ৪।৫ ফোঁটা মধু মিশাইয়া সেবন করাইলে বালকদিগের সর্দ্দি কাসি নিবারিত হয়।

বাস্তুশাক আগুনে সেঁকিয়া তাহার রস সিকি ভরি আন্দাজ ৪।৫ ফোঁটা মধু সহ সেবন করাইলে বালকদিগের সর্দ্দিকাসি ও স্বরভঙ্গ প্রশমিত হয়।

মস্তকে অপক্ক সর্দ্দি আবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা হইতে থাকিলে কাঁচা হরিদ্রা, ৩।৪টী নারিকেলের ফুল এবং কিঞ্চিৎ সরিষা একত্র পেষণ করিয়া মস্তক ও কপালে ঘন করিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর যন্ত্রণার উপশম হয়।

সমপরিমাণ পুরাতন গব্যঘৃত ও আদার রস পাক করিয়া সেই ঘৃত অথবা পোড়া আমড়ার শাঁস—মাখনের সহিত মিশাইয়া মালিশ করিলে বুকের বসা সর্দ্দি সরল হইয়া উঠিয়া যায়।

প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে পোড়া আমড়ার শাঁসের সহিত একটু সৈন্ধব লবণের গুঁড়া—মিশাইয়া চুষিয়া খাইলে ৩।৪ দিন মধ্যে শুষ্ক কাসের শান্তি হয়।

মিছরী, মরিচ ও কাঁটাআমরুল—প্রত্যেকটী ১০ এগার

জল লইয়া /॥০ সের জলে পাক করিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ নিত্য প্রাতে এক ছটাক ও বৈকালে এক ছটাক পান করিলে বুকের শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠে, কাসের বেগ কমিয়া যায় এবং কোষ্ঠশুদ্ধ হইয়া থাকে।

...তে কোমল কুলের পাতা ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, এই চূর্ণ ৬ রতি ও সৈন্ধব লবণ ২ রতি, একত্র এক মাত্রা প্রতিদিন প্রাতে জলের সহিত সেবন করিলে সপ্তাহ ... কাসের উপশম হয়।

...কের ছাল ও পাত সমভাগে মোট ২ তোলা ... সের জলে পাক করিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথ নিত্য প্রাতে এক ছটাক ও বৈকালে এক ছটাক—পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে প্রবল কাসও প্রশমিত হয়।

হিক্কা ও শ্বাস।—ডাবের জল অল্প অল্প পান করিবে। সেই জল কিম্বা কচি তাল শাঁসের জল পান করিলে হিক্কা শান্তি হয়।

মুড়ি ভিজান জল অল্প অল্প করিয়া পান করিলে হিক্কা দূরীভূত হয়।

বড় এলাইচ কিংবা মরিচ চূর্ণ চিনিসহ সেবন করিলে হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ময়ূর পুচ্ছের চাঁদভস্ম ২ রতি মধুসহ অবলেহ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

বহেড়া বীজের শাঁস ৬ রতি কিঞ্চিৎ মধুসহ মর্দ্দন করিয়া লেহন করিলে শ্বাস বেগের উপশম হয়।

সোরার জলে একখণ্ড সাদা কাগজ ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে, তৎপরে তাহার নল প্রস্তুত করিয়া চুরুটের ন্যায় তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূমপান করিলে শ্বাসকষ্ট আশু নিবারিত হয়।

ধুতুরার ডাটা, পাতা ও ফল কুটিয়া শুকাইয়া লইবে, তৎপরে তাহা তামাকের ন্যায় কলিকায় সাজিয়া ধূমপান করিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসবেগ কমিয়া যায়।

শ্বেতপুনর্নবার শিকড় ।০ সিকি ভরি, লাল আকন্দের শিকড় ৩॥ রতি এবং গোলমরিচ ৭টী একত্র গব্যজল সহ পেষণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া সেবন করিলে অল্পদিন মধ্যে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়।

শ্বেতবর্ণ রাজহংসের গলনলীর অস্থি একখণ্ড ও কিঞ্চিৎ চণ্ডাল ...নের বস্ত্র একত্র একটি তামার মাদুলীতে পুরিয়া শ্বেত সূত্রদ্বারা গলায় ধারণ করিলে চিরজাত প্রবল শ্বাসরোগও প্রশমিত হয়।

শামুকের অভ্যন্তরস্থ ... অথবা কোলাবে (কটকাট) ... ২॥ রতি মাত্রায় ৪। ৫ ... কলার ... পুরিয়া গিলিয়া খাইলে শ্বাসরোগ দূর হয়।

একটা ... গোলমরিচের সহিত ... বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রত্যহ একটী ... উষ্ণ জল ... সেবন করিলে শ্বাসরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

মক্ষিকা বিষ।—বোলতা, ভীমরুল ও মৌমাছি প্রভৃতি কামড়াইলে বিষ ... ফুটিয়া থাকে, তবে প্রথমে ... তুলিয়া ফেলিবে, তৎপরে সেই স্থানে ... কচুর ডাঁটার রস লাগাইলে শীঘ্র জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়।

কালছিড়ার অথবা চাকুন্দা পাতার রস দষ্টস্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে বোলতা ও ভীমরুলের বিষ নষ্ট হয়।

মূল ও পত্র সহিত ...কাঁটানটে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বোলতা বা ভীমরুল দংশনের জ্বালা যন্ত্রণা সত্বর নিবারিত হয়।

ঘৃত ও সৈন্ধব লবণ একত্র মর্দ্দন করিয়া দষ্টস্থানে বারম্বার মালিশ করিলে বোলতা, ভীমরুল ও মৌমাছির বিষ বিদূরিত হইয়া থাকে।

গুড়, মধু কিম্বা তুলসীপত্র রস লেপন করিলে মৌমাছির বিষ নষ্ট হয়।

বালা, শুঠ, মরিচ এবং নাগকেশরপুষ্প সমভাগে জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মৌমাছির বিষ দূর হয়।

প্রেরিত পত্র

সন্দিগ্ধার্থ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

মাননীয়

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

দেশের এই দুর্দ্দিনে ধ্বংসপ্রায় সাত্ত্বিক আয়ুর্ব্বেদের পুণ্যকথা শুনাইবার জন্য "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" আবির্ভাব হইয়াছে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদ ইহার সহায়তায় পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। বিশাল আয়ুর্ব্বেদ সিন্ধু মন্থন করিয়া পরম দয়াল ঋষিগণ আমাদিগকে অমৃতোদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল ও দীর্ঘকাল সাধনা সাপেক্ষ না করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা দুরূহ। এমন অনেক বিষয় আছে যাহার মীমাংসা দুষ্কর। কয়েকটী বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইয়া পণ্ডিত ও বহুদর্শী কবিরাজগণের শরণাপন্ন হইবার মানসে আপনার "আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে"র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আশা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আপনার আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে প্রকাশিত করিয়া বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

(প্রশ্ন)

১। শ্রীগোপাল তৈলে "দমনক" নামে যে দ্রব্যের উল্লেখ আছে, উহা কি? কোথায় পাওয়া যায়?

২। যাবতীয় ঔষধে শুষ্ক আমলকী ব্যবহৃত হয় চ্যবন-প্রাশেই কাঁচা আমলকী ব্যবহৃত হয় কেন?

৩। চ্যবনপ্রাশে কাঁচা আমলকী দেওয়ার বিধিকে সমর্থন করিবার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে কি না?

৪। অশ্বগন্ধা কাহাকে বলে? বাজারে সাধারণতঃ "অশ্বগন্ধা" চাহিলে দুই প্রকারের দ্রব্য পাওয়া যায়। এক মূলজাতীয়, অপর গাছজাতীয়। কলিকাতা অঞ্চলে উভয় প্রকারের অশ্বগন্ধা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত স্থানে "অশ্বগন্ধা" বলিয়া চাহিলে বেনের দোকানে মূল জাতীয় অশ্বগন্ধাই পাওয়া যায় এবং উহাই তত্রত্য অশ্বগন্ধ রূপে ব্যবহৃত হয়। কোনটা খাঁটী অশ্বগন্ধা?

বঙ্গদেশের কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে উক্ত বিষয়ে সকলের সংশয়ান্বিত হইয়া মীমাংসার জন্য বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে উপস্থাপিত করিলাম। আশাকরি সন্তোষজনক উত্তর পাইতে পারিব।

বিনীত—

শ্রীনরেন্দ্রলাল বড়ুয়া

(C/o কবিরাজ শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন)

আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম।

(উত্তর)

১। "দমনক"কে বাঙ্গলায় "দনা" বা "দোনা" বলে। ইহার পর্য্যায়—দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তাপস-পত্র, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজটা, পবিত্র ও কুল ত্রক। ইহা একপ্রকার পুষ্প। ইহাকে হিন্দুস্থানে দমন দৌনা, মহারাষ্ট্রে দব-বাণদবণা, গুজরাটে ডমরো, কর্ণাটে দবনা বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম worm wood। ডাক্তারি নাম Artemisia Scoparia আর্টিমিসিয়া স্কোপেরিয়া ইহার গুণ কষায় তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী শুক্রবর্দ্ধক ও সুগন্ধি। ইহার সাময়িক প্রয়োগ—ইহা গ্রহণী, কুষ্ঠ, রক্ত দোষ, ক্লেদ, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ✓০ দুই আনা।

২য় ও ৩য় যে সকল ঔষধে চূর্ণ বা গুঁড়া দিবার নিয়ম সে সকল ঔষধে শুষ্ক আমলকী ভিন্ন কি করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে? যে সকল ঔষধে আমলকীর রসের ভাবনা আছে, যথা অম্লপিত্তে ধাত্রী লৌহ (যাহা পাকের ধাত্রীলৌহ নহে), সে সকল ঔষধে কাঁচা আমলকীর রসই লওয়া হয়। "চ্যবনপ্রাশে" যে কাঁচা আমলকী লইতে

হইবে—চরক সংহিতার শাস্ত্রাবলোকেই তাহার প্রমাণ, যথা—

এবং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
দত্ত্বা দশাৎ ততৈকধাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ক্বাথ্যা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ।
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥

অর্থাৎ—বেলছাল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি এক পল করিয়া লইবে এবং আমলকী পাঁচশত লইবে। সমুদয় দ্রব্য এক দ্রোণ (একমণ চব্বিশ সের) জলে পাক করিবে। ঔষধের রস—জলের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে, আমলকী তুলিয়া আঁটি ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী বারপল পরিমিত ঘৃত ও তৈলে ভাজিয়া লইয়া—সেই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত বেলছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া অর্দ্ধ তুলা অর্থাৎ ছয়সের মিছরির সহিত পাক করিতে থাকিবে।

'অশ্বগন্ধা'র বর্ণন অশ্বগন্ধার ক্ষুপ দুই হইতে আড়াই হাত উচ্চ, ইহা শাখাবহুল বৃক্ষ। ইহার ... চওড়া, বোঁটা ছোট, পাতায় রোম আছে। ইহার ফুলগুলি ... ফুলের বোঁটা ছোট, ইহার মূল হইতে পত্রবৃন্ত নির্গত হয়। এই পত্রবৃন্তগুলি দলবদ্ধ হইয়া থাকে ইহারা পীতাভ এবং হরিদ্বর্ণ। ইহার ফল টুকটুকে লাল এবং ছোট মটরের মত। ইহার মূল সরু মূলার ন্যায় কিছু ক্ষীণ, মূলের রং উপরে কটা, ও ভাঙ্গিলে ভিতরে সাদা। ইহার কাঁচা মূলে অশ্বমূত্রের গন্ধ পাওয়া যায়, শুকাইলে অতি মৃদু গন্ধ থাকে বা মোটেই গন্ধ থাকেনা। মূলের স্বাদ তিক্ত। ইহার বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অশ্বগন্ধার সর্ব্বাংশই গ্রহণীয়। শুধু মূল বলিয়া যে অশ্বগন্ধা বিক্রীত হয়, তাহা ঠিক না হওয়াই সম্ভব। অশ্বগন্ধা যেরূপ উপকারী ঔষধ, তাহাতে ইহা হইতে সুফল লাভের জন্য ইহার গাছ চিনিয়া তবে ক্রয় করা উচিত। ইহা অন্যান্য বৃক্ষের মত সহজসুলভ নহে, এদেশে আবহাওয়ায় কেবল মূল সংগ্রহ করিয়া লোকে কিরূপে সর্ব্বত্র সরবরাহ করে—তাহা বুঝিতে পারি না। ইহা কাঁচা ব্যবহার করা উচিত—আ–সং।

পুস্তক পরিচয়

স্বায়ত্ত চিকিৎসা।—বর্দ্ধিত সংস্করণ কবিরাজ শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা কলিকাতা ৫৭নং ... ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কবিরাজ মহাশয় প্রবীণ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তাঁহার বহুদিনের চিকিৎসার অভিজ্ঞতার ফল এই 'স্বায়ত্ত চিকিৎসা'। যাঁহারা সুচিকিৎসক থাকিতে চিকিৎসা করিতে অসমর্থ বা যে স্থানে সুচিকিৎসকের অভাব এবং যাঁহারা বিদেশী ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক অথচ দেশীয় ঔষধ সেবনে আগ্রহান্বিত এই স্বায়ত্ত চিকিৎসা পুস্তকখানির দ্বারা তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবেন প্রথমেই ব্রণ, ব্রণশোথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুরোগের কারণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী অতি সুন্দর ভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার "উপক্রমণিকা বিজ্ঞাপনীপ্রাধ্যায়ে" লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থে যে কয়েকটী রোগের চিকিৎসা-কৌশল লিখিত হইল, সেই সমস্ত রোগ নিবারণের উপযোগী যে সকল যোগ-গুলি কথিত হইয়াছে, সেগুলি বহু পরীক্ষিত। ... অধিক স্থলে প্রয়োগ করিয়া যাহার সুফল উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তদ্রূপ যোগই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অপরীক্ষিত একটী যোগও এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। অতএব সাধারণেই এ গ্রন্থে লিখিত যোগগুলি ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল, তখনই ইহা চিকিৎসক সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। এইবার ইহার বর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি চিকিৎসক ও ছাত্র—এমন কি সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দেহতত্ত্ব।—(Anatomy and Physiology) ... মেডিক্যাল কলেজ অব হোমিওপ্যাথির প্রিন্সিপাল ডাঃ আর, ... ডি (আমেরিকা) প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র। কলিকাতা—...

আর্পিকতলা ষ্ট্রীট, ক্রেস্ত হোমিও হোম, হইতে প্রকাশিত শরীরী মাত্রেরই দেহের পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক। গ্রন্থকার এ পুস্তকে অতি সংক্ষেপে তাহার দেহের আবশ্যকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থী ছাত্রবৃন্দের এবং সাধারণের দেহতত্ত্ব জানিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আদর্শ ধাত্রী শিক্ষা। —উক্ত [illegible] মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। আজকাল শিশু ও প্রসূতি [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহাতে এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে [illegible] সকল জননী ও গর্ভিণী কিরূপ ইহাতে প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা বেশ সহজ ও সরল—[illegible] পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। কয়েকখানি আবশ্যকীয় চিত্র সংযুক্ত হওয়ায় বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে [illegible]

হইয়াছে। এইরূপ একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তকের বহুল প্রচার [illegible] আশা করেন তো সঙ্গত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়

দীর্ঘজীবন।—কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত প্রণীত [illegible] চন্দ্র দত্ত বি এস সি কর্তৃক সাভার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৵০ আনা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দিনচর্য্যা রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি [illegible] দীর্ঘ জীবন লাভের যে সমস্ত উপদেশ বর্ণিত আছে গ্রন্থকার [illegible] সরলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ [illegible] কারণ মানুষ সকল সময় সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে [illegible] পরিশেষে [illegible] অব্যর্থ মুষ্টিযোগ নামে একটি [illegible] করিয়াছেন। ইহাতে [illegible] মুষ্টিযোগ প্রদত্ত হইয়াছে [illegible] উপকার করিবে। এইরূপ পুস্তকের যত বেশী প্রচার হয় [illegible]

বিবিধ

গঙ্গাধর স্মৃতিসভা—সম্প্রতি বৈশাখের শেষে কলিকাতা এলবার্ট হলে মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে গঙ্গাধর স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহাত্মা গঙ্গাধরের সম্বন্ধে অনেক গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। গঙ্গাধর বর্ত্তমান যুগের আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁহার জন্ম প্রতি বৎসরই এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়—ইহা আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। এরূপ অনুষ্ঠানের যাঁহারা অগ্রণী—তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদ পাইবার বিশেষ উপযোগী। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত "গঙ্গাধর মঙ্গল" ও "মহাত্মা গঙ্গাধর কবিরাজ" এই দুইটী প্রবন্ধ স্মৃতিসভায় [illegible] পঠিত হইয়াছিল।

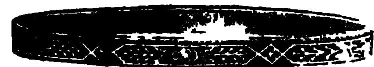
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়—১৫শে জুন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন গুপ্ত মহাশয় সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া [illegible] দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। সেদিন দৈব [illegible] আশঙ্কা হইয়াছিল—বুঝি বা লোক সমাগম অল্প হইবে। কিন্তু এরূপ একটি শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতার রাস্তা জলপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। উদ্বোধন সঙ্গীত এবং কয়েকজনের বক্তৃতা হওয়ার পর মেয়র মহোদয় হাঁসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই হাঁসপাতালে আপাততঃ ৫টী রোগী রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে [illegible] পরে ১২৫টী রোগী রাখা হইবে।

বিলাতে—বৃটিশ-এম্পায়ার একজিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

একজিবিশন্-শাঁখা

উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। ইষোলো ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের [illegible] প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিনি সোনা এবং ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের [illegible] পর্যন্ত নাই। ইষোলো [illegible] স্বভাবতঃই সোনার মত রং, ব্যবহারে মলিন হয় না হাতে দাগ লাগে না। [illegible] ব্যবহারের পর এনগ্রেভ [illegible] প্রাপ্ত হইলে সোনা খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া আঁটিয়া লওয়া যাইতে পারে। [illegible] কথায় এই একজিবিশন শাঁখা নরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে। ইহা যেমন সুদৃশ্য, তেমনই [illegible]। ইহা শাঁখা ও চুড়ী দুই প্রকারে তৈয়ারী হয়। নিম্নে চিত্র ও মূল্য বিবরণ দেওয়া হইল।





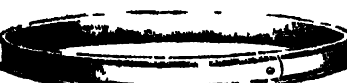
একজিবিশন শাঁখা—(সিকি ইঞ্চি চওড়া) প্রমাণ জোড়া—১৮৸০, (।৶ গিনি সোনা ৮৸০, শাঁখা ৪৲ মজুরী ৬) বালিকা সাইজ—১৫।০ (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫) শিশু সাইজ—১[illegible] (।০ গিনি সোনা ৬।০, শাঁখা ২।০ মজুরী [illegible])।

এই একজিবিশন্ শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

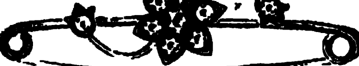
একজিবিশন্ চুড়ী— চিত্রানুযায়ী, প্রমাণ জোড়া—[illegible], (।৵০ গিনি সোনা ৭।০ [illegible], মজুরী ৬)। বালিকা সাইজ— [illegible] ([illegible] ৬।০ ফ্রেম ২॥০ মজুরী ৫৲)। শিশু সাইজ—১১ [illegible] সোনা ৫ , শাঁখা [illegible] মজুরী ৪ ৲)।

প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার এক [illegible] চুড়ী [illegible] টাকা, ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার [illegible] চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

বীণাপাণি শাঁখা—[illegible] দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনায় মোড়া সমগ্র [illegible] সমাজে সুপরিচিত পাত জোড়া—প্রমাণ [illegible] টাকা বালিকা সাইজ—৮।০ শিশু সাইজ—৬৸০ স্পেশাল, প্রমাণ [illegible], বা—১[illegible] শিঃ—৮।০



সেপ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও [illegible] করা ২২—
১৸০ ,, [illegible]
১।০ , [illegible]



তার পেঁচ বালা
—প্রমাণ ১৩৲ বালিকা—
[illegible]

এনগ্রেভ বীণাপাণি শাঁখা—[illegible] হস্তি দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার পুরু পাতে মোড়া চমৎকার লতা ফুল এন্‌গ্রেভ করা। ১৭॥০ ১৬।০, ১১৲ টাকা।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় মোড়া, গৃহলক্ষ্মীদের মনের মত অলঙ্কার। প্রতি জোড়া—প্রমাণ ৭৲, বালিকা সাইজ—৫৲। ঐ চওড়া—প্রঃ ৮৲, বাঃ ৭৲, শিঃ—৬৲ স্পেশাল প্রমাণ ১০৲, বালিকা—৮৸৵০, শিশু—৭।০।

কল্যাণ চিরুণী

মহিষ শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে চমৎকার এন্‌গ্রেভ করা। ১১ দাড়া ১৭৲ ১০ দাড়া ১৪৸০ ৯ দাড়া ১২।০ টাকা।



স্বত্বাধিকারী—
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃমন্দির-সম্পাদক

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস

৬৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; [illegible]-খুলনা।

বিভিন্ন অলঙ্কারের ক্যাটালগ চাহিলেই পাঠান হয়



অর্গেনা।

ভারতে নূতন! মেসিনে প্রস্তুত!

অকাতর অর্থব্যয় ও প্রাণপাত পরিশ্রমে "অর্গেনার" রীড বোর্ড, একশেন প্রভৃতি মেসিনে প্রস্তুত করাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন ডিজাইন করিয়া বাহির করিয়াছি।

			মূল্য
৩ অক্টেভ,	ডবল রীড,	সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত	৪৫৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত ...	৫০৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, এক সেট ব্যাস রীড (উদারা) সেগুনকাষ্ঠের বাক্স সমেত ,, ...	৫৫৲
৩॥ ঐ	ঐ	সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত ,, ...	৬০৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত ,, ...	৬৫৲
ঐ	ঐ	স্পেশাল, এক সেট ব্যাস রীড (উদারা) সেগুন কাষ্ঠের বাক্স সমেত ...	৭০

আর, বি, দাস।

টেলিফোন—৪৩৬, **কলিকাতা মিউজিক হল।** টেলিগ্রাম—আর্বিদাস।

৮।[illegible] লালবাজার ষ্ট্রীট,——১৩।৮, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কারমাইকেল প্রেস।

৫৯নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর কষ্ট করিয়া কলিকাতায় আসিতে হইবে না।

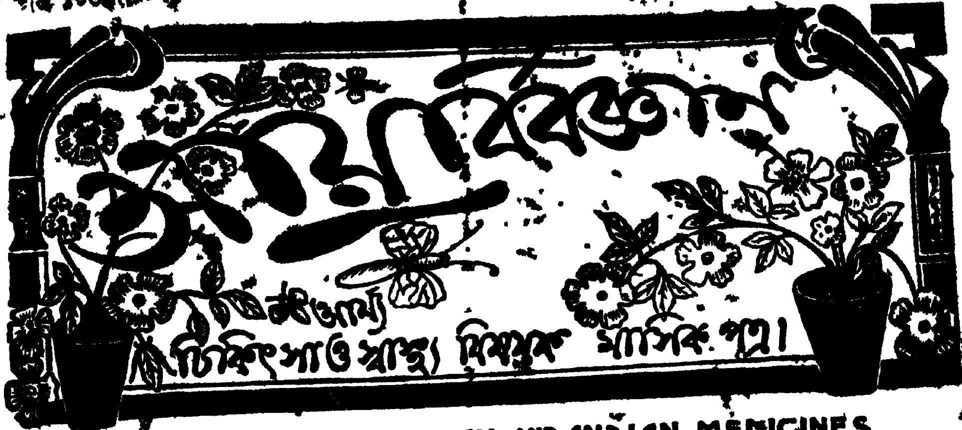
পত্রদ্বারা ছাপার অর্ডার পাঠাইয়া দিন।

[illegible] সুলভে [illegible] দিব।

ভাদ্র ১৩৩৪ সাল

১০ম সংখ্যা।

August 1927



JOURNAL OF HEALTH AND INDIAN MEDICINES

ভাদ্র মাসের সুচী।

Printed and Published by Sj. Brojendra Nath Chatterji B. A
at the Kusumika Press—1 Telipara Lane, Calcutta
Cover Printed at the Carmichael Press—59, Durga Charan Mitter Street, Calcutta.

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

প্রবন্ধ ও বিনিময়ের পত্রাদি নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন,
সম্পাদক—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার এজেন্ট—

কলিকাতা বুকডিপো লিমিটেড,
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবিনোদবিহারি দত্ত
৮১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Rs. 20 Per Pa.

পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	...	...	১৮৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		...	...	৭৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম		...	...	৫৲

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞাপনের মূল্য বাকী থাকিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১নং তেলিপাড়া লেন কলিকাতা।

বেনারসের এজেন্ট—

শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশী বাণীমন্দির,
দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস।

ঢাকার এজেন্ট—

শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি-এ
স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি ঢাকা।

কবিরাজ বিনোদ লাল সেন মহাশয়ের প্রণীত

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান।

এই সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত, যথা,—সূত্রস্থান, শারীরস্থান, দ্রব্যস্থান ও নিদানচিকিৎসিত স্থান।

প্রথম খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের ইতিহাস, ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী। নাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষা, বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম। ধাতুদ্রব্যাদির শোধন ও জারণাদি, রাসায়নিক যন্ত্র ও শস্ত্রাদির আকৃতি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—শারীর যন্ত্র, শারীরনির্ম্মায়ক উপাদান সমস্তের সংস্থিতি, আকৃতি, ক্রিয়া ও প্রধান প্রধান শারীর যন্ত্রের চিত্র প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্যবহৃত দ্রব্য সকলের পর্য্যায়, গুণ, আময়িক প্রয়োগ, মাত্রা ও যাহার যে অংশ গ্রহণীয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে—প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সমস্ত বিশদ ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। ২য়।৩য় খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। চতুর্থ খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। একত্রে চারিখণ্ডের মূল্য ১০৲ দশ টাকা। মাশুলসহ ১০৸৵০ দশ টাকা চৌদ্দ আনা।

সটীক সানুবাদ মাধব-নিদান।

দুরূহ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে নিদান পাঠ যে অত্যাবশ্যক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ইহা প্রথম ও প্রধান সোপান, সুতরাং ইহা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বা চিকিৎসা সম্যক্ কার্য্যকারক হয় না

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য সুগম ও সুখপাঠ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধে, বিজয়রক্ষিত কৃত টীকা ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন টীকা-টিপ্পনী পারদর্শনপূর্ব্বক গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা গিয়াছে। পীড়া সমস্তের ইংরাজী নাম সংযোজিত করিয়া ইহাকে অধিকতর উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ডিমাই ৮ পেজী ৬০০ শত পৃষ্ঠায় উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত; সাধারণের সুবিধার জন্য ব্যয়ানুরূপই মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ২৷০ দুই টাকা আট আনা।

পুঃ মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

বি, এল, সেন এণ্ড কোং

৩৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। | আ |

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন, কবিভূষণ (চিকিৎসক)

অর্ডার দিবার সময় কিঞ্চিৎ মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

আমাদের নববর্ষের শুভ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমাদের নূতন ডিজাইনে প্রস্তুত পোর্টেবল হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্য্যে,
গঠন-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।
ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক।

সুলভে



সুদীর্ঘকাল স্থায়ী।

ফোল্ডিং অর্গান—সবে মাত্র নূতন আসিয়াছে। আপনি অন্য জায়গায় কিনিবার পূর্ব্বে একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের দোকানে শুভ আগমন করুন কিম্বা পত্র লিখুন।

দুলমিরা এণ্ড কোং

হারমোনিয়াম, অর্গান ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মাণকারক ও বিক্রেতা

বীজ গাছ ! বীজ !

এই সময়ের বপনোপযোগী দেশী সজী বীজ !

উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গে, শশা, কুলি বেগুন, পেঁপে, কাঁকুড়, তরমুজ, খরমুজ, লাল-শাক, কন্‌কানটে, দেশী কুমড়া, লঙ্কা ইত্যাদি ২০ রকম বীজের প্যাকেট বড় বাক্স ৪৲, ঐ মাঝারি বাক্স ২৲; ঐ ছোট বাক্স ১৲, কোন নির্দ্দিষ্ট বীজ ১ প্যাকেট ৵০ হইতে ।০ আনা।

এই সময়ের বপনোপযোগী আমেরিকান

সজী বীজ

প্রতি তোলা শশা ॥০, কাঁকুড় ॥০, লঙ্কা ১৲, ঢেঁড়স ॥০, লাউ ৬০ হইতে ১০০ পাউণ্ড হয় ৸০, কুমড়া ১০০ পাউণ্ড হয় ১৲, বক্র ধরণের কুমড়া ॥০, রাঙ্গসে ৸০, টম্যাটো ১৲, মক্কা প্রতি সের ৪৲।

উদ্যান সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি ও কাঁটাতার প্রভৃতি আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

কাঁটাতার প্রতি বাণ্ডিল ৪৪৲ ঐ লাগাইবার জন্য প্রতি সের ৶০ আনা।

ক্যাটালগের জন্য অর্দ্ধ আনার ষ্ট্যাম্প সহ আবেদন করুন।

আমেরিকান ফুলের বীজ।

১০	রকম বীজের বাক্স	১।০
২০	" " "	২।০

মনোহর "লতা"র বীজ।

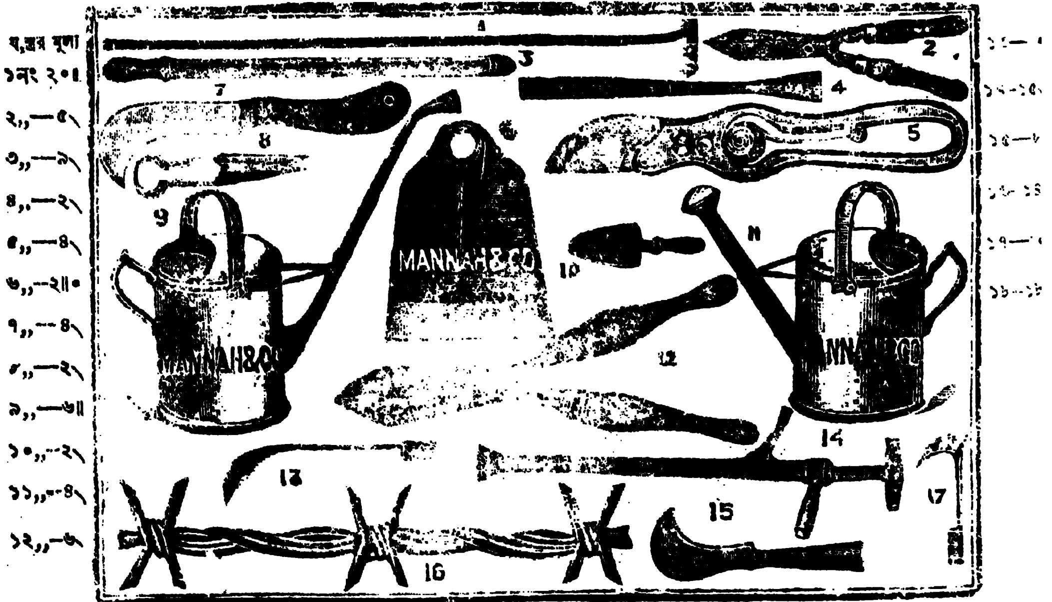
(বেশ সুন্দর, পোষ্ট কিম্বা থামে দেওয়া যায়)

১০	রকম বীজের বাক্স	১॥০
২০	" " " ... =	২॥০

গোলাপের কলম।

আমাদের নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট জাতীয় গোলাপ শতকরা ২৫৲, ৩০৲, এবং ৪০৲ টাকা। ২৫টার কম শতকরা হারে বিক্রয় হয় না।

প্রতি ডজন ৪৲, ৫৲ এবং ৭৲। গাছের অর্ডারের সঙ্গে অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।



মান্না এণ্ড কোং

৬।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৪ { ১০ম সংখ্যা

অনাগত রোগ প্রতিষেধীয় অধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীশাস্তলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন)

চাল সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, ডাল সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী বলিবার কিছু বলবার নাই। অতএব সেই সে টাট্‌কা ভানা ধান ছাঁটা টাটকা ভাঙ্গা ডাল স্বাস্থ্যরক্ষণার্থে ব্যবহার করা উচিত। উচিত বটে কিন্তু উপায় কি? আমরা যে, ক্রমশঃ পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী ঢেঁকীশালা ছিল, তাহাতে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ধান ভানিতেন। কদাচিৎ কেহ ভাড়ানী রাখিয়া পাড় দেওয়াইয়া লইতেন। এখন সে দিন নাই। মেয়েলোকেরা গৃহকর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ অবসর লইতেছেন। বিলাস বাসনা চরিতার্থ করাই তাঁহাদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম হইয়াছে। কাজেই আমরা এখন আর টাটকা ভানা চাল এবং টাটকা ভাঙ্গা ডাল খাইতে পাই না। চিরকালোষিত জীর্ণ চাল ডাল আমাদিগকে খাইতে হয়।

চাউলের ন্যায় গোধূমজাত আটা ময়দা এবং সুজী আমাদের অপর প্রকার শরীরের পুষ্টিকর এবং মনের তৃপ্তিকর খাদ্য। কিন্তু টাট্‌কা ভাঙ্গা নির্ভেজাল ময়দা আটা এবং সুজি সর্ব্বত্র সুলভ নহে। তারপর কিছুকাল যাবৎ আর এক নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ীরা খাদ্য দ্রব্যের সহিত অখাদ্য দ্রব্য মিশাইয়া বলে মিশিয়া ময়দা প্রস্তুত করিতেছে। খাদ্য ময়দা কৃত্রিম ময়দার স্থায় সুলভ নহে। সেই জন্য নানা প্রকার রোগের বিশিষ্ট কারণ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি হেতু, কিছুকাল সেবন করিলে অনেকেই অগ্নিমান্দ্য রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। সকলেই, আটা ময়দা সুজি এবং অন্যান্য প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী খাদ্য দ্রব্য সতর্কতার সহিত একান্ত গ্রহণ করা উচিত।

অন্নরূপ খাদ্য, নির্ম্মল পানীয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের জীবন ধারণের মূল। কত অতিলোভাকাঙ্খি বণিকগণের অত্যাচারে এই তিনটির বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি স্বার্থান্ধ দলই প্রবল হইয়া জনসাধারণের মহান্ অনর্থ সংঘটন করিতেছে। বিশেষতঃ যাহারা ঘৃত, তৈল এবং মেঠাই প্রভৃতি খাদ্যের ব্যবসায় করে, তাহাদের দুষ্কৃতির সীমা নাই। সে সংবাদ সকলেরই জানা আছে। জানিয়া শুনিয়াও অগত্যা অনেকেই সেই সকল দ্রব্য উদরসাৎ করিয়া স্বাস্থ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

বিশুদ্ধ খাদ্যের ন্যায় বিশুদ্ধ পানীয় অধুনা দুর্লভ

অন্নের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা গিয়াছে, এখন পানীয়ের কথা আরও সংক্ষেপে কিছু বলা যা'ক। জলই আমাদের প্রকৃষ্ট পানীয়; জল পানের প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট। বিশুদ্ধ জল জীবন স্বরূপ। কিন্তু ইদানীং বিশুদ্ধ জল কচিৎ কোন স্থানে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ জলের স্বরূপ—"স্বচ্ছনির্গন্ধ নিঃস্বাদ-ক্ষুদ্র জন্তু বিবর্জ্জিতং। যেনাতিরুষ্ট মমলং শাল্যন্নং রাজ-তম্ভিতং। অক্লিন্নমবিবর্ণঞ্চ তজ্জলং দোষবর্জ্জিতং।" ইহার ভাবার্থ এইরূপ—যে জল স্বচ্ছ, আঘ্রাণ লইলে কোন গন্ধ অনুভব হয় না, যে জলের আস্বাদ পাওয়া যায় না, যে জল ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র কীট বিবর্জ্জিত, আর অমল ধবল শালী-ধানের অন্ন রূপার থালায় রাখিয়া তাহাতে যে জল দিয়া রাখিলে অধিকক্ষণ পরেও প্রক্লিন্ন এবং বিবর্ণ না হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট জল। এই জল স্নানপানাবগাহনের সম্যক্ উপযোগী। নিম্নলিখিতরূপ জলও পানের অযোগ্য।" "নপিবেৎ পঙ্ক-শৈবাল-তৃণ-পর্ণাবিলাপ্লুতং। সূর্য্যেন্দু পবনাদৃষ্টমভিবৃষ্টং ঘনং গুরু। ফেনিলং জন্তুমৎ তপ্তং দন্তগ্রাহ্যতিশৈত্যতঃ।" অর্থাৎ পঙ্কিল জলাশয়ের জল অপেয়। শৈবাল-তৃণ-পর্ণাদি সমাচ্ছন্ন জলও পানের অযোগ্য। দিবাভাগে সৌরকরে আর নিশাকালে চন্দ্র নক্ষত্র রশ্মিসম্পাতে বিশুদ্ধীভূত হইতে না পায়, পরন্তু সর্ব্বদা বায়ুর তাড়নে তরঙ্গাসক্ত না হয়, তাহাও পানার্থ ব্যবহার করা উচিত নহে। সদ্যোবৃষ্টির জল সম্পাতে বর্দ্ধিত জল এবং সান্দ্রীভূত, ঘন, ফেনিল, জন্তু সমাকুল, অতিতপ্ত, অতিশৈত্যহেতু দন্তগ্রাহী জলও অপেয়।

জলপানের সাক্ষাৎ ফল

আহারান্তে পরিমিত জল পান করিলে, পীত জল আদৌ আমাশয়াশ্রয় করিয়া, ভুক্তান্নকে প্রক্লিন্ন করে; এবং সোৎক্রমমান পাচক রসের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা ও উষ্ণতা সংযমন করিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সুষ্ঠুতা সম্পাদন করে।

পৌণঃফল—পীত জল, জল শোষণী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালী দিয়া শোষিত হইয়া অপ্‌বহুল ধাতু স্রোতোগত হইয়া, রক্তাদি ধাতুর ক্ষীয়মান জলীয়াংশ পোষণ করে। তারপর সমস্ত স্রোতঃ সঞ্চিত বিগলিত তক্কী ধুইয়া লইয়া রক্ত-স্রোতের সহিত মিলিয়া বৃক্কদ্বয়ে উপস্থিত হয়। পরে, বৃক্কের ক্রিয়া-কৌশলে রক্তগত যে মলাংশ বিয়োজিত হইতেছে, তাহা লইয়া মূত্র স্রোতঃ বহিয়া বস্তিদেশে সঞ্চিত হয়। কালে স্বপথে বাহির হইয়া যায়।

জলের অপরাপর গুণ—

"পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছা পিপাসাপহম্।
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দি বিবন্ধহৃৎ বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যহিতং শীতলম্
লঘ্বচ্ছং রস কারণং নিগদিতং পীযূষবজ্জীবনম্।"

উক্ত শ্লোকের ভাষা দুর্ব্বোধ্য নহে; অনুবাদের আবশ্যকতা নাই।

দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে বিশুদ্ধ আহার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ পীযূষকল্প পানীয়েরও অভাব ঘটিতেছে। প্রকৃতির বিপরিণতি বশতঃ ভারতের অনেকগুলি নদ-নদী মজিয়া গিয়াছে, যে গুলি আছে, সেগুলির মধ্যে প্রায়ঃ সকল গুলিরই গভীরতা ও আয়তন বর্ষে বর্ষে কমিয়া যাইতেছে। প্রায়ঃ সমস্ত নদীই মাতৃনদীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া ক্ষীণ স্রোতঃ হইতেছে তজ্জন্য মলাপসরণের ক্ষমতা হারাইতেছে। পরন্তু পঙ্কশৈবালসমাচ্ছন্ন হইয়া কলুষ সলিলা হইয়া যাইতেছে। কলুষনাশিনী গঙ্গার জলও অধুনা সেপ্‌টিট্যাঙ্কের দ্রবীভূত মল প্রবাহে কলুষিত। বাঙ্গলা দেশের সমস্ত দক্ষিণ দিগ্‌ বিভাগের নদনদীর জল ভূমিষ্ঠ লবণ বিমিশ্রিত। সে জল—পানের অযোগ্য। পূর্ব্বে এদেশের অনেকে জলদানরূপ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা প্রভৃতি নানাকারের জলাশয় খনন করাইতেন; তজ্জন্য দেশে জলাশয়ের প্রাচুর্য্য ছিল। সে কালের

খনন জলাশয় কালক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া, অধুনা বিষোদ্গীরণ করিতেছে। এখনও স্থানে স্থানে যে জলাশয় খনন করা হয়—এমন নহে। কিন্তু দেশের নর-নারীর অনাচারে সে সকল জলাশয়ের জল পবিত্র থাকে না। যে জলাশয়ের জল লোকে পান করে, সেই জলাশয়ে নামিয়া স্নান করে, স্নানকালে অনেকে—বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকেরা মূত্র ত্যাগ করে নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত লোকে অঙ্গ মার্জ্জন এবং মলদ্বার ধাবন করে। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, কোঁড়ে ধোয়া প্রভৃতি কাজের কোন বাধাই নাই। কাজেই শৈবালাদি পরিহীন জলাশয়ের জলও কলুষিত হইয়া উঠে। এ সব দুর্গতির উপায় না করিতে পারিলে বিশুদ্ধ পানীয় পাইবার সম্ভাবনা হইবে না।

বায়ু—অন্ন জল ছাড়িয়া কিছুকাল বাঁচা যাইতে পারে, কিন্তু বায়ু ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও বাঁচিবার উপায় নাই। বায়ুর অন্যতর উপাদান অম্বর পীযূষ দেহে তাহার অভাব ঘটিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই শরীর জীবনমুক্ত হইয়া যায়। অম্বর পীযূষ শরীর প্রীণয়নের এবং জাঠরানল সন্দীপনের নিশ্চিত হেতু।

"নাভিস্থ প্রাণপবনো হৃত্বাহৃৎকমলান্তরং
কণ্ঠাদ্ বহির্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতং।
পীত্বাচাম্বর পীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীণয়েদখিলদেহং জীবয়ন্ জাঠরানলং॥"

বিশুদ্ধ অম্বর-পীযূষবদ্ বায়ু আমাদের দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। অবিশুদ্ধ বায়ু ক্রমশঃ দেহ মলিন করিয়া নানা রোগের সৃষ্টি করে। বায়ুর বিশুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। কিন্তু কি উপায়ে দেশে প্রবহমান বায়ুর বিশুদ্ধি রক্ষা করা যাইতে পারে? একদিকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা, অন্যদিকে দেশবাসি-নরনারীগণের অজ্ঞতা, অকর্ম্মতা ও অদূরদর্শিতা এক হইয়া পবনকে অপবিত্র করিতেছে। এদেশে ছোট বড় মাঝারী যে সকল বিল আছে, পূর্ব্বে তৎসমুদয়ের জলনির্গম প্রণালী ছিল। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় তৎসমুদয়ের জলনির্গমপ্রণালী রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অনেক নদ নদীও বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল বদ্ধ জলাশয় শৈবালাদি নানা জাতীয় উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন এবং শুক্তি শম্বুক ও অপরাপর ছোট বড় প্রাণীর বাস-ক্ষেত্র। বর্ষাকালে সেই সকল উদ্ভিদ্ পচিতে আরম্ভ করে, শরতের শেষভাগে শুক্তি শম্বুক মরিয়া যায়, তজ্জন্য জল কলুষিত হইয়া উঠে। শরতের প্রখর সৌরকরে বাষ্পীভূত জল জীব ও উদ্ভিজ্জ দেহ বিগলিত অণু লইয়া এবং নানাপ্রকার অদৃশ্য জীবাণুর সহিত মিশিয়া বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করিতে থাকে।

অধুনা লোকালয়ে ও লোকালয়ের উপকণ্ঠে বিলোদ্গারে ছোট বড় জলাশয়ের অসদ্ভাব নাই। নানা কাজের জন্য অনেকে বাড়ীর আশে পাশে কূপ খনন করে, খাত-পুষ্করিণী প্রভৃতি, অনেক প্রকার জলাশয় শৈবালাদি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সকল খাতে অনাচারে লোকেরা গোময়, অশ্বপুরীষ এবং নানাপ্রকার আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে, পাট পচান দেয়, বাঁশ বেত প্রভৃতিও পচাইয়া লয়। বর্ষার শেষে সেই সকল খাত হইতেও বিষোদ্গীরণ হইতে থাকে। সেই উদ্গীর্ণ বিষ বায়ুমণ্ডলে মিশিলে বায়ুও বিষকল্প হইয়া উঠে। জলাশয়ের ন্যায় ভূমি, বিশেষতঃ পতিত ভূমি ও গলিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাবয়ব সম্পর্কে দূষিত হয়। বর্ষাকালে জলসিক্ত হইলে সেই সকল অপচীয়মান পদার্থ আরো দ্রবীভূত পশ্চাৎ সৌরকর সন্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিতে থাকে। যে বৎসর বেশী বর্ষা হয়, সেবার ভূ-নিহিত অপচিত পদার্থ বিধৌত হইয়া ধরস্রোতে চলিয়া গিয়া নদ-নদীতে পড়ে; সে বর্ষে ভূবাষ্প সংমিশ্রণে বায়ুর দুষ্টতা অল্প হয়। কিন্তু যেবার বর্ষার জল বেশী হয়, সেই বারই ভূবাষ্প সম্পর্কে বায়ুমণ্ডল অধিকতর বিকৃত হইয়া উঠে।

আগ্নেয় ধূম সংযোগে বায়ু-বিকৃতির কথাও উল্লেখযোগ্য। কোন স্থানে হাড় পোড়ান হইতেছে, স্থান বিশেষে মড়া পোড়ান হয়, স্থানে স্থানে চূণ তৈয়ার করিবার জন্য শামুক,

বিমুক ও ঘোঁওড়া পোড়ান হয় ; রন্ধনেন্ধনসম্ভূত ধূমজালের অসদ্ভাব নাই। তারপর বহুস্থলে কলের চিমনি অহোরাত্র কাল ব্যাপিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেছে। এ সব ধূম ভিন্ন অপরাপর কারণেও অনেক ধূম সম্ভূত ও উৎক্ষিপ্ত হয়। বস্তুতঃ, নানা কারণে পবমান পবনের পবিত্রতা রক্ষা পাইতেছে না। অন্যান্য কারণও আছে, ক্রমশঃ বিজ্ঞানে সে সকল কারণ চক্ষে ধরা পড়িবে।

আহার্য্যের দুর্গতি, জলের বিকৃতি, স্থলের অপবিত্রতা এবং বায়ুর অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতেই বুঝা যাইতে পারিবে যে, আমাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ অনেক বিষয়ে পরাধীন। উপায় কি? কি করিলে আমরা হিতাহার পাইয়া, নির্ম্মল পানীয় পান করিয়া এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতঃ সুপায়ুঃ উপভোগ করিতে পারি? কাজটা দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে। যেহেতু, আপনি সুস্থ রহিয়া আপন আপন সন্ততি ও অপরাপর স্বজনকে সুস্থ রাখিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কাহারও অনিচ্ছা নাই। বরং তদ্বিষয়ে সকলেই সমুৎসুক। তবে সে বাসনা কি উপায়ে চরিতার্থ করা যায়, তাহা অনেকের জানা নাই। যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহাদের অনেকে অলস, অকর্ম্মণ্য এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ... করিলে, আপনার, সন্ততিগণের, অপরাপর স্বজনের ... প্রতিবেশ-বাসি-গণের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ হইতে পারে—তাহা অনেকেই উদাসীন রহিয়া, কুতর্ক ও গল্প বা পরনিন্দা করিয়া সময়ের অসদ্ব্যবহার করেন। তারপর পল্লীসমাজের ... লোক বড়ই দুর্গত। না পাইয়া, কদর্য্য খাইয়া ... খাইয়া অনেকেই জীর্ণশীর্ণ। বুঝিলে এবং কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও, কোন হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের পারগ হইবার সম্ভাবনা হয় না। অধুনাতন দেশের অর্থকৃচ্ছ্রের কথাও চিন্তনীয়। এইরূপ নানা দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের কল্যাণ সংসাধনের উপায় কি? কাজটা মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে। আমরা ক্রমশঃ সে কথার সমালোচনা করিব।

সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু সি, আই, ই, আই, এস, ও এম, বি ; এফ, সি, এস)

জলাতঙ্ক রোগ (Hydrophobia)—ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালের মুখের লালার মধ্যে এই রোগের বীজ অবস্থিতি করে। দংশনকালে উহা ক্ষত মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পথ দিয়া মস্তিষ্কের দিকে মৃদু গতিতে পরিচালিত হয় এবং অল্লাধিক কাল ব্যবধানে মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া ভীষণ লক্ষণ প্রকাশ করে। এই রোগের লক্ষণ একবার প্রকাশিত হইলে মৃত্যু নিশ্চয়—এই রোগ কখন আরোগ্য হইতে দেখা যায় নাই। ক্ষিপ্ত কুকুরে, বানর, বিড়াল, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগের জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয়, তখন উহাদিগের লালার মধ্যেও ঐ রোগের বিষ বিদ্যমান থাকে এবং তাহারা মনুষ্য বা অন্য প্রাণীকে দংশন করিলে উহাদিগেরও ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই ভয়ানক রোগের কোন সুচিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, কুকুরে কামড়াইলেই জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না। কুকুর ক্ষিপ্ত না হইলে এই রোগ জন্মিবার কোন আশঙ্কা থাকে না। পুনশ্চ ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিলেই যে জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। ক্ষিপ্ত কুকুরে অনেক লোককে এক সময়ে দংশন করিলে তাহার বিষ ক্রমে

করিয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রথম দষ্ট হয়, তাহাদেরই ঐ রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ; যাহাদিগকে পরে কামড়ায়, বিষের অসদ্ভাব হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে উক্ত রোগ প্রকাশ পায় না। বিশেষতঃ দেহ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিলে বিষ বস্ত্রের উপর লাগিয়া যায়। দংশন জনিত ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবার সুবিধা পায় না, সুতরাং এরূপ স্থলে ক্ষিপ্ত কুকুরে দংশন করিলেও ঐ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয় এইরূপ দেশীয় চিকিৎসা দ্বারাই দেশীয় ঔষধ বিশেষ আরোগ্য সম্পাদন সম্বন্ধে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রকৃত জলাতঙ্ক রোগ এই ঔষধের দ্বারা উপশমিত হয় না। লোকে মিথ্যা আশায় প্রতারিত হইয়া প্রকৃত চিকিৎসার উপায় থাকিলেও উহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র সুচি-কিৎসা, স্বনামখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পাষ্টুর (Pasteur) উদ্ভাবন করিয়াছেন। উহা সিমলাশৈলের নিকট কসৌলি নামক স্থানে মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত কোন্নুর নামক নগরে এবং আসাম প্রদেশস্থ সিলং নগরে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত চিকিৎসালয়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। একবার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার হয় না। কিন্তু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে এই চিকিৎসাধীন থাকিলে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন জনিত দেহ প্রবিষ্ট রোগের বিষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ; সুতরাং জলাতঙ্ক রোগ একেবারেই প্রকাশ পায় না। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা হইলে এই ভীষণ রোগ সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের সাতিশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুনশ্চ গবর্ণমেণ্ট হীনাবস্থাপন্ন লোকের জন্য এই সকল স্থানে যাতায়াতের রেলভাড়া পর্য্যন্ত দিবার এবং তথায় বিনা ব্যয়ে থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আহারের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যহ চারি আনা প্রদান করিয়া থাকেন। কসৌলি যাইতে হইলে হাবড়ায় রেলগাড়ীতে উঠিয়া কালকায় (Kalka) নামিতে হয় এবং তথা হইতে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা হাতগাড়ী (Rickshow) সাহায্যে ৯ মাইল পথ শৈলারোহণ করিয়া চিকিৎসালয়ে পঁহুছিতে হয়। রাত্রে হাবড়ায় পঞ্জাব মেলে উঠিলে তৎপর দিন রেলে এবং তার পর দিন বেলা ১১টার সময় কসৌলি পঁহুছান যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তথায় থাকিবার বড় অসুবিধা ছিল, এখন দুই চারিটি বাসাবাড়ী নির্ম্মিত হইয়া সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যাইবার পূর্ব্বে চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়কে জানাইলে, এই সকল বাসাবাড়ী খালি থাকিলে, তিনি তথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। চাল, ডাল, ঘৃত, আলু, মাংস প্রভৃতি সাধারণতঃ যে সকল খাদ্যদ্রব্য আমরা ব্যবহার করি, সে সকলই সে স্থানে পাওয়া যায়। তবে চাকর ও বসুইকর ব্রাহ্মণ সেখানে মিলে না, এখান হইতে সঙ্গে না লইয়া গেলে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। শীতকালে সেখানে শীত অধিক হয়, এজন্য শিতরেণ্ডর উপরের গরম কাপড়, জামা ও লেপ কম্বলাদি যথা পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। কসৌলি অতি স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, সেখানে অসাবধানতা হেতু ঠাণ্ডা না লাগিলে কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই রোগের চিকিৎসা প্রণালী অতি সহজ। সকল রোগীকেই বেলা দশটার সময় একবার হস্পিটালে যাইতে হয়। সেখানকার ডাক্তার সাহেব সূচল পিচকারির দ্বারা পেটের ত্বকের মধ্যে দিবসে একবার মাত্র ঔষধ প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাতে সামান্য সূচফোটার অধিক যন্ত্রণা হয় না। দুই এক দিন চিকিৎসার পর ছোট ছোট বালক বালিকারাও এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, তাহাদের নাম ডাকিলেই আপনা আপনি পেটের কাপড় খুলিয়া পিচকারির ঔষধ লইবার জন্য বিনা সঙ্কোচে ডাক্তারের নিকট গমন করে। যে স্থান ফুঁড়িয়া ঔষধ দেওয়া হয়, তথায় দুই একদিন অল্প বেদনা থাকে, কিন্তু জরজাড়ি কিছুই হয় না। দুই

একদিন পরে রোগী স্বচ্ছন্দে সকল কার্য্যই করিতে পারে। আমি স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে এই চিকিৎসাধীনে থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাদের কোন অসুখ হইতে দেখি নাই। আমি একটি ছয় বৎসরের বালক লইয়া এই চিকিৎসার জন্য কসৌলি গিয়াছিলাম এবং তথায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবস্থিতি বিধায় পাষ্টুর মতে চিকিৎসা সম্বন্ধে সকল বিষয়ই ভালরূপ দেখিবার আমার অবকাশ হইয়াছিল। অনেকে এই চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও স্থানীয় অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন বলিয়া তথায় রোগী লইয়া যাইতে ভয় পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের এ বিষয়ে কোন আশঙ্কা করিবার কারণ নাই, ইহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য আমি এস্থলে এই কথাগুলির অবতারণা করিলাম। তিন সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসা শেষ হইয়া যায়, তৎপরে রোগী স্বচ্ছন্দে নামিয়া আসিতে পারেন। যদি দংশন গুরুতর হয় অথবা মস্তক, মুখ বা মস্তকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে দংশন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম প্রথম দুই বেলা ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় এবং চিকিৎসা শেষ হইতে ২।৪ দিন বেশী সময় লাগে।

এক্ষণে কুকুরে দংশন করিলে চিকিৎসার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

১। কুকুরে দংশন করিলে উষ্ণ জলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ ধৌত করিয়া নাইট্রিক এসিড বা কার্ব্বলিক এসিড (Strong Nitric or carbolic Acid) সরু তুলির সাহায্যে ক্ষত প্রদেশের অভ্যন্তরে ৩।৪ বার প্রবেশ করাইয়া দিবে। এই সকল ঔষধ লাগাইলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে, কেননা ইহাদিগের প্রয়োগে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সূচল লৌহখণ্ড লোহিতোত্তপ্ত করিয়া ঐ স্থান পুড়াইয়া দিলেও বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

২। কিন্তু শুধু এই ঔষধ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে ২।১ দিনের মধ্যে সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা দষ্টস্থান যতদূর পর্য্যন্ত দাঁত প্রবেশ করিয়াছে, ততখানি মাংস অস্ত্র সাহায্যে ছেদন করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। অস্ত্রজনিত ঘা শুকাইতে বিলম্ব হয় না। দংশনের অব্যবহিত পরে এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে অনেক স্থলে অন্য কোনরূপ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। দংশনের পর এই রোগের বিষ কিছু দিন দষ্টস্থানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং অস্ত্র সাহায্যে ঐ স্থানের মাংসের সহিত বিষ তুলিয়া লইলে একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

৩। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কুকুরে কামড়াইলেই যে জলাতঙ্ক রোগ হইবে, এমন কোন কথা নাই। অধিকাংশ স্থলেই কুকুরের ক্ষিপ্ততা থাকে না, সুতরাং কোন চিকিৎসা না হইলেও দষ্টব্যক্তির জলাতঙ্ক রোগ উৎপন্ন হয় না। এরূপ স্থলে খরচপত্র করিয়া কসৌলি যাইয়া চিকিৎসা করিবার কোন আবশ্যকতা হয় না। যে কুকুর দংশন করিয়াছে, কামড়াইবার পর ১০ দিন তাহাকে লৌহশিকলে আবদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। যদি ঐ কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া না যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, উহা ক্ষিপ্ত নহে। এরূপ স্থলে কসৌলি যাইয়া পাষ্টুরের মতে চিকিৎসা করিবার প্রয়োজন হয় না, তবে দষ্টস্থান নাইট্রিক বা কার্ব্বলিক এসিড প্রয়োগ দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি কুকুর ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইতে মৃত কুকুরের মুণ্ডটি বেলগেছিয়া পশু চিকিৎসালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইবে। তথায় পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, কুকুর ক্ষিপ্ত কিনা। কিন্তু এই পরীক্ষা ফলের অপেক্ষা না করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব, কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য গমন করিবে। দংশন, মস্তকে, মুখে বা শরীরের উপরভাগে হইলে অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া জানিবে এবং কালবিলম্ব না করিয়া কসৌলিতে চিকিৎসার জন্য প্রস্থান করিবে। পাদদেশে দংশন হইলে কিছুকাল বিলম্ব হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ এই রোগের বীজ কিছুদিন

ক্ষতস্থানে আবদ্ধ থাকে, তৎপরে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সুতরাং মস্তক হইতে ক্ষতস্থান যতদূরে অবস্থিত হইবে, ততই রোগের তীক্ষ্ণতার হ্রাস এবং লক্ষণ প্রকাশ হইবার বিলম্ব হইয়া থাকে। যাহা হউক যদি কুক্কুর ক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় অথবা যে কুকুরে কামড়াইয়াছে, তাহার কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একদিনও বিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বোক্ত যে কোন স্থানে চলিয়া যাওয়া উচিত।

৪। যে ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইবে, তাহার নিকট ঐ রোগ সংক্রান্ত কোন গল্প করিবে না। কোনরূপে তাহার মন যাহাতে উত্তেজিত না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কথাবার্ত্তায় ও কার্য্যে তাহার হৃদয়ে যাহাতে ভয়ের সঞ্চার না হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। অনেক স্থলে শুদ্ধ ভয় পাইয়া রোগীকে এরূপ উত্তেজিত হইতে দেখা গিয়াছে যে, চিকিৎসক পর্য্যন্ত ঐ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন. কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে, কুকুর ক্ষিপ্ত নহে এবং রোগের মিথ্যা লক্ষণ ক্রমে উপশম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই অত্যাবশ্যক বিষয়টি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

দুগ্ধ

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস কাব্যতীর্থ)

জগতে মানুষের যত প্রকার খাদ্য ও পেয় আছে, তন্মধ্যে দুধের তুল্য উপকারী পেয় পদার্থ আর নাই। এই পরম উপাদেয় পেয় পদার্থ মানুষ মার স্তন হইতে এবং গরু প্রভৃতি কয়েকটী চতুষ্পদ জন্তুর নিকট হইতে লাভ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে গো-দুগ্ধই মানুষের সহজলভ্য এবং যতটুকু আবশ্যক, চেষ্টা করিলে ততটুকুই লাভ করিতে পারা যায়। সদ্যঃ প্রসূতা জননীর যখন স্তনে দুগ্ধাগম হয় না বা সদ্যোজাত সন্তানের জননী যখন সূতিকাগৃহেই অসহায় শিশুকে ফেলিয়া কালের কঠোর আহ্বানে চলিয়া যায়, তখন হইতে সারাটা জীবনই রোগে-শোকে-পিপাসায়, ব্রতে-উপবাসে, বাল্যে-যৌবনে-জরায় এই একমাত্র পরম পবিত্র সর্ব্বজনপ্রিয় অমৃতকল্প দুগ্ধই মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। যে উপকার মায়েও সকল সময়ে করিতে পারে না, সেই উপকার একমাত্র দুগ্ধবতী গাভীই করিয়া থাকে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞহৃদয় আর্য্যসন্তানগণ গোজাতিকে মায়ের চেয়ে ভালবাসে ও সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, উট ও হাতী এই সকল জীবের দুধের গুণাগুণ সকল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সিংহ-ব্যাঘ্র-বিড়াল-কুকুর প্রভৃতি কয়েকটী প্রাণীরও দুগ্ধ আছে, সে সকলের কথা সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদে দেখা যায় না। অহঙ্কারী মানুষ যখন অতিরিক্ত শক্তি ও প্রভাবের পরিচয় দেয়, তখন সে বলে "আমি বাঘের দুধ এনে দিতে পারি।" প্রকৃতপক্ষে বাঘকে দোহন করিয়া যে কেহ দুধ আনিতে পারিয়াছে—একথা কখনও শুনি নাই। আমরা এক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত দুগ্ধ সকলেরই পরিচয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের পাঠকগণকে উপহার দিব, তাহার মধ্যে যাঁহার যাহা উপাদেয় বলিয়া মনে হইবে, তিনি উহাই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছু নাই।

গাধার দুগ্ধ—কলিকাতার অর্থবান্ গৃহস্থ ও ডাক্তারগণের পরমপ্রিয় বস্তু। যাহাদের পয়সা আছে, প্রায়ই তাহাদের সন্তানগণ বাল্যে মাতৃস্তন্যের বিনিময়ে

গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ডাক্তারগণের সুমহান্ উৎসাহ ছিল, এখন আর তাদৃশ উৎসাহ আছে কিনা বলিতে পারা যায় না, কেননা তাঁহারা কখনও কোন জিনিসকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করেন না—সর্ব্বদা মত পরিবর্ত্তনই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। তবে বালকের লিবার অর্থাৎ যকৃতের কোনপ্রকার দোষ ঘটিলে বা সদ্যোজাত সন্তানের মাতৃবিয়োগ হইলে, এখনও ডাক্তারগণ গাধার দুধ পান করাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গাধার দুধ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"উহা রুক্ষ, বলকারক, উষ্ণ, শোষ ও বায়ুনাশক, ঈষৎ অম্ল ও লবণাস্বাদযুক্ত, স্বাদু ও লঘু। অর্থাৎ গাধার দুধ পান করিলে বালকের বলাধান হয়, শরীরের ক্ষয় নাশ হয়,—এজন্য শরীর পুষ্ট হইতে থাকে। যেখানে অত্যল্পবয়স্ক বালকের শরীর শুকাইয়া যাইতে থাকে, সেখানে গাধার দুধ পান করাইলে বালক পুষ্ট হইতে থাকে, তাহার অগ্নিবল বৃদ্ধি হয় ও কফের কোন উপদ্রব থাকে না। গাধার দুধ সহজেই হজম হয়। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদও গাধার দুধে পাশ্চাত্যমতের সমর্থন করিয়া থাকে।

ঘোড়ার দুগ্ধ—আমাদের দেশে গাধার দুধের মত চেষ্টা করিলে পাওয়া যায় না। পশ্চিমে হরিহরছত্র প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল বিক্রয়ার্থ সমানীত হইয়া থাকে। ঐ সকল অশ্ব যেখানে জাত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তথায় ঘোড়ার দুধ পাওয়া যায় কিনা এবং তদ্দেশীয় লোকেরা উহা পান করে কিনা আমরা জানি না। আয়ুর্ব্বেদে ঘোড়ার দুধের গুণাগুণ গাধার দুধেরই মত ও যে সকল জন্তুর খুর দ্বিখণ্ডিত নহে—সে সকল জন্তুর দুধই ঘোড়ার দুধের মত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

উটের দুগ্ধ—ঈষৎ লবণাস্বাদযুক্ত মধুর। ইহা পান করিলে সহজেই হজম হইয়া যায় অধিকন্তু পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কৃমি, কুষ্ঠ, পেট ফাঁপা, সর্দ্দি, কাশি, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে—বিশেষতঃ হাত, পা, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া গেলে কিংবা পেটে জল হইয়া উদরী হইলে উটের দুধ পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আরব প্রভৃতি উষ্ট্র প্রধান দেশে হয়তো উষ্ট্র দুগ্ধের প্রচলন থাকিতে পারে।

ভেড়ার দুগ্ধ মুখের ঘায়ের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মুখের ভিতর বা জিহ্বায় যে কেমন ক্ষতই হউক না কেন—ভেড়ার দুধ বা ঘি লাগাইয়া দিলে অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে—একথা বোধ হয় গৃহস্থ মাত্রেই জানেন কিন্তু প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ দেখি না। আয়ুর্ব্বেদ বলে, ভেড়ার দুধ পান করিলে অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগ সারে। ইহা ক্ষীণশুক্র নাশক শুক্রকে বর্দ্ধিত করে। যাহাদের চুল পাতলা বা চুল উঠিয়া যায় থাকে, তাহাদের কেশরাশি দৃঢ়মূল ও ঘন কৃষ্ণ করিয়া থাকে। তবে দোষের মধ্যে ভেড়ার দুধ খাইতে ভাল লাগে না, উহা লবণাস্বাদ যুক্ত মধুর, একটু পান করিলেই পেট ভার হয়, সহজে হজম হয় না, এবং পিত্ত ও কফকে বর্দ্ধিত করে। কিন্তু বাতজ কাস অর্থাৎ "হুপিং কাফ" এবং বায়ু রোগে ভেড়ার দুধে উপকার হইয়া থাকে।

ছাগদুগ্ধ—ছাগলের দুধের এমন কয়েকটী বিশিষ্ট গুণ আছে—যাহা অন্য কোন দুধেই নাই। যাহারা দীর্ঘকাল পেটের অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া ক্ষীণ-দুর্ব্বল ও রক্তশূন্য তাহাদের পক্ষে ছাগদুগ্ধ পরম হিতকর। যাহাদের ক্ষয়রোগ অর্থাৎ যক্ষ্মা হইয়াছে, তাঁহাদের ছাগদুগ্ধ ত পরম উপকারী বটেই, অধিকন্তু ছাগলের মলমূত্র—এমন কি ছাগলের সহিত একত্র অবস্থানও তাহাদের আরোগ্যের কারণ হইয়া থাকে। জীর্ণজ্বর, রক্তাতিসার, রক্তামাশয় রক্তপিত্ত, অর্শ দিয়া রক্ত পড়া, কাসিতে রক্তের ছিটা দেখা দেওয়া প্রভৃতি রোগে ছাগ দুগ্ধের মত হিতকর পথ্য আর দেখা যায় না। ইহা আহার, ঔষধ—দুইই। পূর্ব্বোক্ত রোগ সকলে ছাগদুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল রোগের উপশম তো হইয়া থাকে, অধিকন্তু রোগীর বলাধান হয় ও শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল শিশুর শরীর কিছুতেই

পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে চাহে না অথবা দিন দিন শরীরের রক্ত, মাংস ও অস্থি সকল শুকাইয়া যাইতে থাকে, সেখানে নিয়মিতরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া ছাগদুগ্ধ পানের অভ্যাস করাইলে বালকের সকল রোগ সারিয়া যায়, বালক দীর্ঘ জীবনলাভ করে। ছাগলের দুধ সহজেই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। মোটেই পেট ভার করে না—এজন্য উহা শিশুদিগকে নিঃসংকোচে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শিশু অবস্থায় দোষ (ইন্‌ফেন্টাইল লিবার) হইলে ডাক্তারদিগকে ছাগদুগ্ধের ব্যবস্থা করিতে প্রায়ই দেখা যায়।

কবিরাজী শাস্ত্রে বলে—ছাগলের শরীর ছোট, দিন রাত ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, খুব পরিশ্রম করে, কটুতিক্তকষায়াদি নানারসযুক্ত তৃণ পত্রাদি ভোজন ও অতি অল্প পরিমাণ জল পান করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বপ্রকার রোগই নাশ করিতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য কলিকাতা সহরের পরিশ্রমবিমুখ দানাঘাসভোজী-বাবু ছাগলের দুগ্ধ পল্লীর স্বচ্ছন্দ বিহারী ছাগলের দুগ্ধের ন্যায় তাদৃশগুণযুক্ত ও উপকারী নহে।

মহিষের দুগ্ধ—গোদুগ্ধ অপেক্ষা ঘন ও মধুর। মহিষের দুগ্ধ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, যাহাদের নিদ্রা ভাল হয় না তাহাদের পক্ষে মহিষের দুগ্ধ প্রশস্ত। কিন্তু সর্দ্দি কাসি হাঁপানি প্রভৃতি রোগে অথবা শ্লেষ্ম প্রকৃতি মানুষের পক্ষে মহিষের দুগ্ধ ভাল নহে। মহিষের দুগ্ধ গুরু উহা পরিপাক করিতে গোদুগ্ধের চেয়ে কিছু সময় লাগে। সুশ্রুত বলেন,—মহিষের দুগ্ধে সুপারি হইয়া থাকে। যাহাদের [illegible] তাহাদের নিয়মিতভাবে নিত্য মহিষ দুগ্ধ পান করা উচিত, মহিষ দুগ্ধ শুক্র কারক।

হাতীর [illegible] কষায় রসযুক্ত মধুর। উহা পান করিলে শরীরের স্থিরতা, দৃঢ়তা, বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হাতীর দুগ্ধ গোদুগ্ধের মত সহজে জীর্ণ হয় না। হাতীর দুধের বিশেষ গুণ উহা চক্ষুর হিতকর।

গোদুগ্ধ—সর্ব্বপ্রাণীর পরম হিতকর, সুস্বাদু, অমৃত তুল্য পদার্থ। ইহার মত শরীর পুষ্টিকারক, বল-বুদ্ধি-ধৃতি স্মৃতি-মেধাবর্দ্ধক, জীবনীয়, বায়ু-পিত্ত, রক্তদোষ, রক্তপিত্ত-ক্ষয়-জীর্ণজ্বর ও যাবতীয় চিত্তবিকার নাশক এককালে ঔষধ ও পথ্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। এতদ্ভিন্ন শ্বাস কাস শোথ, গুল্ম, উদর, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, পিপাসা, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ, অর্শঃ, শূল, উদাবর্ত্ত, অতিসার, প্রবাহিকা, যোনি-ব্যাপৎ ও গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগে দুগ্ধ পরম হিতকর। ইহা বালক-বৃদ্ধ, ক্ষত ক্ষীণ ও নিত্য স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা ক্ষীণবীর্য্য ব্যক্তির নিত্য পেয় পরম শ্রেষ্ঠ রসায়ন, বাজীকরণও আয়ুঃবর্দ্ধক। যাহাদের অস্থিভঙ্গ হইয়াছে—তাহাদের দুগ্ধ পানে শীঘ্রই অস্থি জোড়া লাগিয়া থাকে। যাহারা অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত—দুগ্ধই তাহাদের ক্লান্তিশ্রান্তি হরণ করিয়া শরীরের বল ও মনের স্ফূর্ত্তি [illegible] দেয়। যাহারা কালকৃত জরা বা বার্দ্ধক্যাদি হইতে শরীর রক্ষা করিয়া নিত্য যৌবনে অধিষ্ঠিত হইতে চাহে—দুগ্ধই তাহাদের বয়ঃস্থাপক। দুগ্ধ পাপনাশক। যাহার গৃহে দুগ্ধবতী গাভী নিত্য দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহার গৃহে পাপ থাকে না, অলক্ষ্মী বাস করে না। প্রাচীন কালে এমন দুর্ভাগা গৃহস্থ অতি অল্পই ছিল—যাহার গৃহে গোধন ছিল না।

গোদুগ্ধ মহিষ দুগ্ধের ন্যায় কফকারক ও দুষ্পাচ্য নহে, উহা সহজেই জীর্ণ হইয়া যায়। গোদুগ্ধ কাঁচা ও জ্বাল দিয়া এই উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতঃপর আমরা কাঁচা ও পাকা অর্থাৎ জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের গুণাগুণ সকল নির্দ্দেশ করিব।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ—যে কোন দুগ্ধই দোহন কালে গরম থাকে, উহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। গরুর দুধ যদি ধারোষ্ণ অর্থাৎ দোহন করার অব্যবহিত পরেই ঠাণ্ডা না হইতেই পান করা যায়, তাহা হইলে উহা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই শান্তি করিয়া থাকে। অধিকন্তু উহা অমৃততুল্য, বলকারক, অগ্নির দীপক, বিষমজ্বর নাশক, শ্রম নিবারক ও দেহের পুষ্টিসাধক। একটি কাঁসার বাটীতে

একটু গব্যঘৃত, একটু চিনি, একটু মধু রাখিয়া সেই বাটীতে দুগ্ধ দোহন করাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে নিত্য পান করিতে থাকিলে বিষমজ্বর জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাসের জ্বর, বাতিক কাস, ও শরীরের কৃশতা দূর হইয়া থাকে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহোদয় এই যোগটী খুবই প্রয়োগ করিতেন।

গব্যদুগ্ধ কাঁচা পান করিতে হইলে ধারোষ্ণ পান করাই উচিত। নতুবা বহুক্ষণ পূর্ব্বে দোহা ঠাণ্ডা দুধ পান করিবে না।

কাঁচা ঠাণ্ডা দুগ্ধ—পান করিতে হইলে মহিষের দুগ্ধ দোহনের পর ঠাণ্ডা হইলে পান করিবে, উহাতে শরীর স্নিগ্ধ, প্রস্রাব সরল ও বলের বৃদ্ধি হয়। মহিষ দুগ্ধ ধারোষ্ণ হিতকর নহে। মাতৃ স্তন্য কাঁচাই হিতকর।

শৃতোষ্ণ দুগ্ধ—জাল দেওয়া দুধের গরম অবস্থার নাম শৃতোষ্ণ। ভেড়ার দুধ গরম করিয়া গরম গরম থাকিতে পান করিতে হয়। নতুবা উহা অপকারক হইয়া থাকে।

শৃত শীতল দুগ্ধ—জাল দেওয়া গরম দুধ ঠাণ্ডা হইলে শৃত শীতদুগ্ধ বলে। ছাগ দুগ্ধ পান করিতে হইলে উহা গরম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করিবে। ছাগ দুগ্ধ এবং গো ও মহিষ দুগ্ধ ভিন্ন সকল দুগ্ধই কাঁচা পান করিলে কফ বৃদ্ধি হয়, হজম করিতে সময় লাগে ও আমদোষের বর্দ্ধন করে সুতরাং উহা অপথ্য। গো-মহিষ দুগ্ধ জাল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে পিত্তশান্তি হয়।

দুগ্ধ জ্বাল দিবার নিয়ম—যতটা দুধ ততটা জল দিয়া দুধ জাল দিবে। জল মরিয়া গিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে উহা নামাইয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে পান করিলে কফ ও বায়ু নষ্ট হয়। তাদৃশ দুগ্ধ লঘু অর্থাৎ সহজপাচ্য হইয়া থাকে।

জ্বাল দেওয়া নির্জ্জলা ঘন দুগ্ধ—অতি সুস্বাদু বলকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। কিন্তু উহা সুপাচ্য নহে।

ক্ষীর—দুগ্ধ জাল দিবার সময় অনবরত নাড়িতে নাড়িতে যখন উহা অত্যন্ত ঘন হইয়া আসে, তখন উহাকে ক্ষীর বলে। ক্ষীর—বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও ধাতুপোষক। কিন্তু উহা সকলের পক্ষে সহজ পাচ্য নহে। যাহাদের অগ্নিবল অত্যন্ত বেশী—তাহারাই উহা মাত্রাবৎ ভোজন করিয়া হজম করিতে পারে। নতুবা লোভপরবশ হইয়া মাত্রাতিরিক্ত ভোজন করিলে অজীর্ণ, অতিসার, পেট ফাঁপা, পেট ভার, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য কলিকাতায় ক্ষীর বলিয়া দুগ্ধ বাতাসা ও বালি সংযোগে যে বস্তু প্রস্তুত হইয়া নাগরিক বাবুগণের রসনা তৃপ্তি করিয়া থাকে—সে ক্ষীর পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষীরের ন্যায় উপকারক বা অপকারক নহে। তথাপি উহা ভোজনান্তে অধিকমাত্রায় পান করা উচিত নহে।

দুগ্ধের সর—অত্যন্ত বলকারক, পুষ্টিকর, ক্ষয়রোগ নাশক, মেধা ও স্মৃতিজনক ও তৃপ্তিকর। কিন্তু ইহা হজম করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। যাহারা 'পেটরোগা' অর্থাৎ যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল, তাহাদের দুধের সর খাওয়া উচিত নহে। রক্তপিত্ত অর্থাৎ যাহাদের মুখ দিয়া রক্ত উঠে—তাহাদের পক্ষে এবং যাহাদের অত্যন্ত মস্তিষ্কের কাজ অর্থাৎ চিন্তা করিতে হয় অথবা যাহারা বায়ুপ্রকৃতির লোক—তাহাদের নিত্য দুধের সর খাওয়া ভাল।

রাবড়ি—ও দুধের সরের মত গুণশালী, তবে উহা দুধের সর অপেক্ষা গুরু—অর্থাৎ সহজে সকলে হজম করিতে পারে না। চিনি দিয়া পাক করার জন্য রাবড়ি দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। যে সকল যুবার পরিপাক শক্তি প্রবল এবং নিত্য স্ত্রীপ্রসক্ত, তাহাদের পক্ষে রাবড়ি খাওয়া ভাল।

দুধে মিষ্টি দেওয়া অনেকে পছন্দ করেন না। দুধের সঙ্গে চিনি বা মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া পান করিলে বায়ুর শান্তি হয় বটে, কিন্তু কফের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, চিনি বা মিছরি মিশ্রিত দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশ করে এবং উহা শুক্রজনক। দুধের সঙ্গে

গুড় গুলিয়া পান করিলে প্রস্রাব খুব সরল হয়, কিন্তু উহাতে পিত্তের ও কফের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দুগ্ধে লবণ—মিশান বা লবণাক্ত কোন পদার্থ মিশান কখনই উচিত নহে। উহা অত্যন্ত অপকারক। দুধে লবণ বা লবণমিশ্রিত দ্রব্য দিয়া খাইলে, রক্ত দূষিত হইয়া কুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, এজন্য লোকে বলে, দুধে নুন দিলে গোমাংসভক্ষণের ফল হয়। অতএব দুধের সহিত লবণাক্ত কোন জিনিস বা মুড়ি ভিজাইয়া খাওয়া কখন উচিত নহে।

দুগ্ধের সহিত মাছ মাংসের সম্বন্ধ—অত্যন্ত বিরুদ্ধ। উহাতে রক্ত দূষিত করিয়া থাকে। সে জন্য মাছ বা মাংস খাইয়া দুগ্ধ পান করা উচিত নহে।

কালবিশেষ দুগ্ধপানের ফল—সকাল বেলায় দুগ্ধ পান অভ্যাস করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নিরদীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদিগকে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রভৃত পরিশ্রম করিয়া দিন কাটাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে প্রত্যহ প্রাতে (অবস্থার অনুকূল হইলে) খোসকিছু কিছু দুগ্ধ পান করা উচিত। মধ্যাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে কফ ও পিত্ত—উভয়েরই শান্তি হয়, শরীরের পুষ্টি ও বল হয় এবং সত্বর পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বৈকালে দুগ্ধ পান করিলে বায়ুর শান্তি ও শরীরের বলাধান হয়। রাত্রিতেও দুগ্ধ পান করা ভাল, তবে অন্নাদির সহিত নহে। যাহারা রাত্রিকালে লঘু অথচ বলকর আহার করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে রাত্রিতে দুধ খৈ, দুধসাগু, দুধ মুড়ি অথবা কেবল দুগ্ধপান অভ্যাস করা উচিত। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে হজম হইবে না বলিয়া যাঁহারা ভয় করেন, তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিতে দুগ্ধপান করিয়া কিছুকাল জাগিয়া থাকিয়া শয়ন করা উচিত। যাহাদের দিনের আহারের পর বিকালে বা সন্ধ্যার সময় বুকজ্বালা করে, অম্বল হয়, তাহাদিগের পক্ষে রাত্রিতে কেবল দুগ্ধপান বা দুধ খৈ বা দুধ সাগু খাওয়া ভাল। **খালি পেটে**—দুধ খাওয়া ভাল নয়, একটু মিছরী বা খানকতক বাতাসা চিবাইয়া খাইয়া দুগ্ধপান করা উচিত, তাহাতে দুগ্ধপান জন্য অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার অবসর থাকে না। যেখানে দুধ খাওয়া উচিত, অথচ দুধ হজম হয় না, সেখানে দুধের সঙ্গে বার্লি বা সাগু মিশাইয়া খাইলে দুধ হজম হইতে দেখা যায়।

নারী দুগ্ধ—এ যাবৎ আমরা মনুষ্য ব্যতিরিক্ত জীবের দুগ্ধের বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে সংক্ষেপে মনুষ্যদুগ্ধের উল্লেখ মাত্র করিতেছি—ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল। নারীদুগ্ধ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। উহা বায়ু ও পিত্তকে শান্ত করে, শরীরকে স্নিগ্ধ এবং পুষ্ট ও সবল করিয়া থাকে। চক্ষু উঠিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকিলে স্তন দুগ্ধের ধারা দিলে চক্ষুর যন্ত্রণা নিবৃত্তি হয়।

দুগ্ধ সম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার রহিল। ভবিষ্যতে সে সকল কথা পাঠকগণকে শুনাইবার ইচ্ছা রহিল।

খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন এল,এ এম,এস)

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য

চাউল :—আমরা যে সকল খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করি, তাহার মধ্যে চাউলই সর্ব্বপ্রধান। শুধু বাঙ্গলা দেশের কথা নহে পৃথিবীর প্রায় তাবৎ প্রদেশের অধিবাসিগণই অল্পাধিক পরিমাণে চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ত ইহা জীবন স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নানাবিধ তৃপ্তিকর খাদ্য গ্রহণে বাঙ্গালী যতটা না সন্তুষ্ট হইবে, চাউল হইতে প্রস্তুত অন্ন গ্রহণে তাহাপেক্ষা অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই চাউল বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে জন্মিয়া নানা প্রকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে পাটনাই, বালাম, দেশী, বাঁকতুলসী, বোম্বাই, দাদখানি, চিনিশকর, ব্রহ্মদেশীয় প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

চাউলের পুষ্টিকারিতা শক্তি :—এই সকল চাউল সাধারণতঃ সিদ্ধ ও আতপ দুই ভাগে বিভক্ত। সিদ্ধ ও আতপ চাউলের মধ্যে আতপ চাউলই অধিক পুষ্টিকর। সিদ্ধ চাউলের মধ্যে বালাম অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর, কিন্তু বালাম অপেক্ষা দেশী চাউলের অন্ন খাইতে সুস্বাদু বলিয়া আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই দেশী চাউলের অধিক পক্ষপাতী ; বোম্বাই প্রদেশের এবং পূর্ব্ববঙ্গের উৎপন্ন চাউল অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন চাউল অপেক্ষা অধিক সারবান্।

নূতন ও পুরাতন চাউল।—নূতন চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউল সহজপাচ্য এবং অধিক পুষ্টিকর। অন্ততঃ ছয়মাসের পুরাতন না হইলে সেই চাউল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। নূতন চাউল গুরুপাক, এজন্য নূতন চাউল উঠিলে উহা খাইয়া আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোক এই সময় কঠিন রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

ভাতের ফেন।—সাধারণতঃ আমরা যে ভাতের ফেন গালিয়া অন্ন খাইয়া থাকি, উহাতে অন্নের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না, কারণ একসের চাউল সিদ্ধ করিলে প্রায় তিন সের মাড় জন্মে। এই তিন সের মাড়ে দুই ছটাকের অধিক শ্বেতসার বাহির হইয়া যায়। এই শ্বেতসারের মধ্যে যবক্ষারজানেরও অংশ আছে, ফেন গালিলে তাহারও পরিমাণের হ্রাস হয়। আর্য্য ঋষিগণ ভাতের ফেন গালিতে এই জন্যই কোন স্থানে উপদেশ প্রদান করেন নাই, কিন্তু কোন সময় হইতে কাহার কর্ত্তৃক যে ভাতের ফেন গালিবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার তথ্য নির্ণয় করা দুরূহ। আমাদের দেশের গরীব লোকের মধ্যে শুধু ফেন খাইবার প্রথাও প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ। ভাতের ফেন গালিয়া খাওয়ার জন্য আমরা যেরূপ অন্ন গ্রহণের সম্যক ফলে বঞ্চিত আছি, সেইরূপ উহার ফলে আমরা অর্থেরও অপব্যবহার করিতেছি বলিতে পারা যায়। ছোট ছেলেদের পোড়ের ভাত দিবার প্রথা এখনও আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই, এই পোড়ের ভাত প্রস্তুত করিতে হইলে ফেন গালিতে হয় না, এই পোড়ের ভাত যাহাদিগকে খাওয়ান হয়, তাহারা উহার ফলে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া থাকে। এখন পোড়ের ভাতের মত অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য ইকমিক কুকারের যে প্রচলন হইয়াছে, উহাতে ফেন গালিতে হয়

না। ফল কথা, সাধারণ ভাবে এখন আমরা যে ফেন গালিয়া ভাত খাইয়া থাকি, তাহার ফলে আমরা ভাতের বল যতটা পাওয়া উচিত, তাহা প্রাপ্ত হই না।

সিদ্ধ ও আতপ চাউল।—সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিক পুষ্টিকর। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুতের সময় বেশী করিয়া ছাঁটিলে উহাতে লবণ জাতীয় পদার্থ ও ভাইটামিন্ অত্যন্ত কম থাকিয়া যায়, কাজেই উহা বেশী পুষ্টিকর তো হয়ই না, তদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, এরূপ চাউল হইতে অন্ন গ্রহণের ফলে বেরিবেরি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের অন্ন অধিক পুষ্টিকর, আমাদের দেশে সিদ্ধ চাউলের অধিক প্রচলন, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে সিদ্ধ চাউলের আদৌ প্রচলন নাই, সেই জন্য বাঙ্গালী অপেক্ষা সকল স্থানের অধিবাসিগণই অধিক শক্তিশালী। বাঙ্গলার বিধবাদিগের অধিকাংশই সিদ্ধ চাউল না খাইয়া আতপান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহারা পুরুষ অপেক্ষা অনেকটা সুস্থদেহ ও নীরোগ থাকেন। ফল কথা ভাতের ফেন গালিয়া যেমন খাওয়া উচিত নহে, সেইরূপ অন্যান্য দেশের মত সিদ্ধ চাউলের পরিবর্ত্তে আতপ চাউলের অন্ন গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বহু আলোচনা করিয়াছেন, তথাপি যে কেন এই অনিষ্টকর প্রথা আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যায় না বলিতে পারি না।

চাউল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য।—চাউল হইতে শুধু ভাত নহে, মুড়ি, চিড়া, খই প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এগুলি ভাতের অপেক্ষা বেশী সারবান, তাহার কারণ ভাতের মত এগুলি হইতে ফেন গালিবার আবশ্যক হয় না, সেইজন্য চাউলের সমস্ত অংশই ইহাতে থাকিয়া যায়। চাউলের মধ্যে ছানা জাতীয়, মাখন জাতীয় ও লবণ জাতীয় উপাদান অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে, শর্করা জাতীয় দ্রব্যের অংশই ইহাতে অধিক। চাউলে শর্করা জাতীয় অংশ অধিক বলিয়াই ইহার সহিত ডাল, তরকারি, মাছ এবং দুগ্ধাদি খাইবার আবশ্যক হয়।

চাউলের গুণ।—আয়ুর্ব্বেদে চাউলের গুণ—

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যাবদ্ধাল্পবর্চ্চঃ।
কষায়া লঘবোরুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ॥
অল্পানিল কফাঃশীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা।

অর্থাৎ শালিধান্য— মধুর, কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকর, বদ্ধ ও অল্পমল জনক, লঘুপাক, রুচিপ্রদ, স্বরহিত, বৃষ্য, বৃংহণ অল্পবাত কফকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন ও মূত্রকারক।

চাউল সম্বন্ধে ডাক্তারি কথা।—ডাক্তার বেনেট বলেন, অন্নের গুণ ধারক, উদরাময় প্রভৃতি রোগে রোগীকে পুরাতন চাউলের অন্ন ব্যবস্থা করা উচিত। অনেক চিকিৎসকেরই মত যে, বার্লি, সাগু অপেক্ষাও ইহা অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ডাক্তারেরা বলেন, ডেকষ্ট্রিন্ (Dextrine) এবং সেলিউলোজ (Celucloze) নামক অপাচ্য পদার্থ চাউলে ১১ পরিমাণ থাকে।

চাউলের প্রকারভেদে উপাদানের বিশ্লেষণ—এখনকার পণ্ডিতগণ চাউলের প্রকারভেদ করিয়া উহাতে যে সকল উপাদান আছে, তাহার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে :—

চাউল	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	কোথায় পরীক্ষিত
দেশী	৯'৪	৬'৩৯	'১৫	৮৩'৩	'৭৬	মেডিকেল কলেজ
বালাম	১২'৫	৭'৫	'৪২	৭৮'৪৯	'৭৪	ডাঃ শশী ভূষণ ঘোষ
পাটনাই	১০'৮২	৭'৯২	১'২৮	৭৮'২৩	১'২	জে, এন, মৈত্র
বাঁকতুলসী (আতপ)	১২'৪	৬'৮৩	'৭	৭৯'২	'৭৬	সায়েন্স এসোসিয়েসন
বাঁকতুলসী (সিদ্ধ)	১১'০৬	৬'৭	'৯	৮০'১	'৬৮	"
গোবাই	১০'৮৩	৯'১০	১'২৩	৭৭'১৩	'৮৬	জে, এন, মৈত্র
দাদখানি (পুরাতন)	১১'০	৫'৪	'১	৮২'২	'৮২	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
চিনি শক্কর	১১'০	৬'৭	'১৬	৮০'৩৫	'৪০	"
ব্রহ্মদেশীয়	১০'৩২	৬'৮৩	'৮২	৭৯'৮০	'৩০	জে, এন মৈত্র

ডাল।—চাউলের পরই দালের কথা বলিতে হয়, কারণ চাউল হইতে প্রস্তুত অন্নের প্রধান উপকরণই অনেক স্থলে দাল। এক কথায় চাউলের নীচেই বাঙ্গালীর খাদ্যের মধ্যে দালের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে যে সকল দাল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মুগ সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ্য, মসুরও মুগের ন্যায়ই সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু একটু রুক্ষ গুণ সম্পন্ন। পশ্চিম বঙ্গে এবং রাঢ় দেশে কলাইয়ের দালের প্রচলন বেশী কিন্তু এই কলায়ের দালে তিলের ভাগ বেশী থাকে বলিয়া ইহা শরীরে স্থূলত্ব বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গে মসুর, মুগ, খেঁসারী, মাষকলাই, মটর, অরহর প্রভৃতিই বেশী প্রচলিত, কিন্তু ইহাদের মধ্যে খেসারির দাল ক্রমাগত ব্যবহার করিলে লেথ্রিজম (Lathyrism) নামক একপ্রকার বাতব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে—ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মত। মসুর দালে ছানাজাতীয় উপাদান অধিক বিদ্যমান। মুগের দাল এবং ছোলার দালে অধিক সারবান্। মুগের দাল সর্ব্বাপেক্ষা রোগীর সুপথ্য। পূর্ব্ববঙ্গে মসুর এবং মটরের প্রচলন বেশী। ২৪শ পরগণা, কলিকাতা এবং কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অরহর ও খেঁসারির প্রচলন বেশী। সকল প্রকার দালই পুষ্টিকর বটে, কিন্তু পুরাতন দাল ব্যবহার করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, কারণ দাইলে নাইট্রোজেনাস্ পদার্থ যথেষ্ট আছে, কিন্তু টাট্‌কা না হইলে এই অংশের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অল্পতা ঘটিয়া থাকে।

ডাল প্রস্তুতের কথা—খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ না করিয়া দাল আহার করা উচিত নহে। উহা এরূপ ভাবে সিদ্ধ করিতে হইবে যে, উহার মধ্যে একটিও যেন দানা না থাকে। সুসিদ্ধ দাল খাইলে উহার ৯২ ভাগ সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। স্মরণ রাখা উচিত—মাছ, মাংস অপেক্ষা দাল কম পুষ্টিকর নহে। কিন্তু সুসিদ্ধ না হইলে ইহা জীর্ণ হয় না, কাজেই অনিষ্টের আশঙ্কা বেশী।

মাছ মাংস অপেক্ষা দালে ছানা জাতীয় উপাদান অধিক, এই জন্যই নিরামিষভোজী ব্যক্তিগণ যথেষ্ট পরিমাণ দাল খাইলে মাছ বা মাংসভোজীর অপেক্ষা কখনই সামর্থ্যহীন হইতে পারে না।

দালের উপাদানের বিশ্লেষণ—কোন্ কোন্ দালে আমাদের দেহ পোষণের উপযোগী কি কি পরিমাণ উপাদান আছে—তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে :—

দাল গড়ে	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	কোথায় পরীক্ষিত
সোনা মুগ	১১·৪	২৩·৮	১·০	৫৪·৮	৯·০	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
ছাঁটা মুগের দাল	৫·১	২৫·৫	২·৭	৫৪·১	১০·২	”
কৃষ্ণ মুগ	১০·৮	২১·২	১·৪	৫৫·৫	৫·৮	ডাঃ চুণীলাল বসু
মসুর	১১·৮	২৫·১	১·৩	৫৮·৯	৩·৪	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
অড়হর	১৩·৩	১৭·১	১·৬	৫৫·৭	১১·৩	”
খেসারি	১২·৭৪	২৪·০৮	১·৩৮	৫১·৩৮	২·৮	পার্কস
মাসকলাই	১০·১	২১·৭	১·১	৫৫·৮	৯·১	ওয়ার্ডেন, ডিমক ও হুপার
ছোলা (আস্ত)	১১·৫	২১·৭	৪·২	৫৯·০	৩·৬	”
মটর (আস্ত)	১৫·০	২২·০	২·০	৫৩·০	২·৪	”
ছোলার দাল	৯·৫৮	১৩·১৬	৪·৩০	৬০·০২	২·৪৪	সায়েন্স এসোসিয়েসন

আয়ুর্ব্বেদে দালের গুণ :—আয়ুর্ব্বেদে দাইলের সাধারণ গুণ বলা হইয়াছে—ইহা মধুর-কষায় রসযুক্ত, কটুবিপাক রুক্ষ, বাতজনক, কফপিত্ত নাশক, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং শীতবীর্য্য।

মুগ।—উপরে যে দাইল সম্বন্ধে সাধারণ গুণ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শ্রেণী বিভাগে বলা হইয়াছে,—মুগ রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফ পিত্তহারক, শীতবীর্য্য, মধুর রস, অল্প বায়ু বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বর নিবারক। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানাপ্রকার মুগ আছে, তন্মধ্যে সুশ্রুত বলেন, হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

মাষকলাই।—ইহা গুরু, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ু নাশক, উষ্ণ বীর্য্য, তৃপ্তিকর ; বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক। মল মূত্র নিঃসারক, শুক্র বর্দ্ধক, মেদোজনক, পিত্ত বর্দ্ধক এবং ইহা অর্শবলি অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মসুর।—ইহা মধুরবিপাক, মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, দাহকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক।

অড়হর।—ইহা কষায় মধুর রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মল সংগ্রাহক, বায়ু জনক, বর্ণ প্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

ছোলা।—ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, কষায় রস, বিষ্টম্ভী ও বাতজনক। ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, কফ ও জ্বর নাশক।

আতপচাউল।—ইহা কষায় মধুর রস, মধুর বিপাক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, আবদোষ কারক এবং পিত্ত, দাহ ও কফ বিনাশক।

শ্যামাধান্য।—ইহা মধুর তিক্ত কষায় রস, অতীব রুক্ষ, কফ পিত্ত নাশক, রুচিকারক, মল সংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য।

দালের প্রকার ভেদে অন্য দ্রব্য।—দাল যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ রন্ধন করা হয়, তদ্ভিন্ন ধোকা, বড়া, বড়ী, পাঁপর, কচুরী, ডালপুরী, পিঠা, সরুচাকলি এবং বেশমের প্রভৃত নানাপ্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুগের লাড্ডু, জিলিপি, বঁদে, দরবেশ, মিঠাই প্রভৃতি এই সকল হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ সকল খাদ্য অতিশয় রুচিকারক অথচ এ গুলির দ্বারা দাল ভক্ষণের কার্য্যও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

খিচুড়ি।—চাউল ও দাইল মিশাইয়া যে খিচুড়ি প্রস্তুত করা হয়—তাহাও অতিশয় পুষ্টিকর। এই খিচুড়ি প্রস্তুত করিলে চাউলের সারভাগ আদৌ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা বলবর্দ্ধনের বেশী কার্য্য করিয়া থাকে। তবে খিচুড়ি অধিক মসলা এবং ঘৃত দিয়া প্রস্তুত করিলে গুরুপাক হয় বলিয়া অনেকে বলেন, ইহার প্রচলন বেশী হওয়া কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। খিচুড়ি প্রস্তুত করিবার সময় বেশী মসলা এবং ঘৃত না দিয়া প্রস্তুত করিলে উহা কখনই দুষ্পাচ্য হয় না এবং শরীর পুষ্টির বেশী সাহায্য করিয়া থাকে। ভাতের ফেন ফেলিয়া দেওয়ায় চাউলের সারভাগ নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য আমাদের শরীর পুষ্টির সম্পূর্ণ সাহায্য করে না, কিন্তু খিচুড়িতে সারভাগ নষ্ট হয় না বলিয়া ইহা যে শরীর পুষ্টির বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে—ইহা সকলেরই মনে রাখিয়া খিচুড়ির প্রচলন বেশী করিয়া করা উচিত। আয়ুর্ব্বেদে খিচুড়ির নাম কৃশরা। এই কৃশরা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরু পিত্ত কফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধি বিষ্টম্ভ মলমূত্রকরী স্মৃতা॥

অর্থাৎ ইহা শুক্রজনক, বলকারক, গুরুপাক, পিত্ত কফ বর্দ্ধক, দুর্জ্জর, বুদ্ধিপ্রদ, বিষ্টম্ভ কারক ও মলমূত্র প্রবর্ত্তক।

(ক্রমশঃ)

গঙ্গাধরের চিকিৎসা

মহাত্মা গঙ্গাধর যে শুধু বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর গৌরব তাহা নহেন, তাঁহাকে সমস্ত আর্য্যভূমির গৌরব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের এই আর্য্যভূমি আজি কাল-বিপর্য্যয়ে চিকিৎসা-জগতের অনেক নিম্নস্তরে পতিত হইলেও আর্য্যভূমি যে সকল চিকিৎসার আদি জননী, ইহা এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণ আর্য্যভূমির আবিষ্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রকে মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা এখন সর্ব্ববাদী সম্মত। আমি এ সকল কথার আলোচনা এ ক্ষেত্রে বেশী করিয়া করিতে চাহি না, তবে এই টুকু মাত্র বলিতে চাহি—সকল চিকিৎসার মূলসূত্র আর্য্য চিকিৎসা, সেই আর্য্য চিকিৎসার উজ্জ্বল আলোক আমাদিগকে মহর্ষি পুনর্ব্বসু তাঁহার রচিত চরক নামক অমূল্য গ্রন্থ দ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা গঙ্গাধর যদি জল্পকল্পতরু নামক উহার টীকা রচনা না করিতেন, তাহা হইলে মহর্ষি পুনর্ব্বসুর সেই অমূল্য দান পাইয়াও আমাদিগের পক্ষে চরক সংহিতার অধিকাংশ স্থান বোধগম্য হইত কিনা সন্দেহ।

প্রাচ্য ভিষগ্ সম্মিলন

7th
CONGRESS OF FAR EASTERN
TROPICAL ASSOCIATION.

৫ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা অধিবেশন আরম্ভ।

রোগ নিবারণ, গবেষণার

ফলাফল বিবৃতি

ও

আলোচনার জন্য ইউরোপের মনীষিগণ

কলিকাতায় আসিবেন।

আপনি কি যোগদান করিবেন না?

প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা গঙ্গাধর ভগবন পুনর্ব্বসুর একনিষ্ঠ উপাসকই ছিলেন। ভগবান পুনর্ব্বসুর চরক সংহিতা ভিন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত সুশ্রুত সংহিতা চিকিৎসা জগতে অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন; আয়ুর্ব্বেদের এই সমুজ্জ্বল রত্ন সুশ্রুত সংহিতার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসারই পুনঃ প্রচার কল্পে কলিকাতায়—শুধু কলিকাতার কথা কেন, মাদ্রাজ, দিল্লি, লাহোর প্রভৃতি স্থানের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপনা হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে ভগবান পুনর্ব্বসুর চরকীয় মতের প্রবর্ত্তন করা হয় না, আমি এমন কথা বলিতেছি না, চরক সংহিতার শিক্ষা প্রদান ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত থাকিলেও মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত শল্য চিকিৎসার সমুন্নতি সাধনই এখনকার আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান গুলির প্রধান উদ্দেশ্য—ইহাই আমার বক্তব্য। মহর্ষি সুশ্রুত, তাঁহার রচিত গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতা দ্বারা আমাদিগকে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এনাটমী, সার্জ্জারি, মিড্ওয়াইফারি চিকিৎসা এখনকার দিনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসকগণ তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিয়া উল্লেখ করিলেও সুশ্রুত সংহিতা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন—২৫০০ আড়াই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে মহর্ষি সুশ্রুত তাঁহার রচিত সংহিতা গ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা বিশেষ ভাবেই করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আর্য্যভূমির মধ্যে যখন অন্য চিকিৎসা প্রচারিত হয় নাই, তখন আর্য্যদেশের অধিবাসিগণ শস্ত্র চিকিৎসা এবং ধাত্রীচিকিৎসার আবশ্যক হইলে মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা দ্বারাই আরোগ্য লাভ করিত। মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত সংহিতাখানি ভাল করিয়া পাঠ করিলে আমাদের এ কথার যাথার্থ্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে।

যাহা হউক, মহাত্মা গঙ্গাধর মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত সংহিতার বিশেষ পরিপোষক ছিলেন না, তাঁহার বদ্ধ ধারণা ছিল—ভগবান পুনর্ব্বসু চরক সংহিতার মধ্যে চিকিৎসা কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ যে মহামূল্য রত্নাবলী প্রদান করিয়াছেন, তাহারই অনুবর্ত্তী হইতে পারিলে, চিকিৎসার সকল ক্ষেত্রেই বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত পক্ষে চরক সংহিতায় নাই কি? অনেকে যেমন বলিয়া থাকেন, "যা নাই ভারতে, তা, নাই ভারতে"। আমরাও তেমনি জোর করিয়া বড় গলা করিয়া বলিতে পারি—ভগবান পুনর্ব্বসুর অমূল্যদান চরক সংহিতা অভিনিবেশ সহ ঐকান্তিকভাবে আয়ত্ত করিলে আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। এই অমূল্য গ্রন্থে মানব জাতির রোগ প্রতিষেধক ও চিকিৎসা বিধির সকল কথাই এমন সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, মহাত্মা গঙ্গাধর যে একমাত্র চরক সংহিতার প্রবর্ত্তিত মতেরই বিশিষ্ট পরিপোষক ছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে আদৌ অন্যায় হয় নাই।

এখনকার দিনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ চিকিৎসকগণ হাইজিন্ বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান পুনর্ব্বসুর অমূল্য দান—চরক সংহিতার মধ্যে এই হাইজিন বা স্বাস্থ্যতত্ত্ব বাদ পড়ে নাই। চরকে আয়ুর্ব্বেদ শব্দে বুঝান হইয়াছে:-

হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তম আয়ুর্ব্বেদ স উচ্যতে।

অর্থাৎ আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত। আয়ুই সুখ এবং আয়ুই দুঃখ। অতএব হিত এবং অহিতই আয়ুর মান, এই আয়ুর কথা যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ।

এই আয়ু শব্দ বুঝাইতে গিয়া চরক বলিয়াছেন, "শরীর ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু বলে।" চরক সংহিতা পাঠ করিলে বোধগম্য হইবে, এক কথায় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার কলুষ-পঙ্কিল ভাবের নামই রোগ। এই রোগ প্রতিকারের বিধি চরক সংহিতায় যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, এরূপ আর কোন শাস্ত্রে নাই।

ফল কথা বিশেষ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে দেহ ধারণ, রক্ষণ, পোষণ এবং রোগ হইলে তাহার প্রতিকার

করিবার জন্য যত প্রকার ব্যবস্থার আবশ্যক, একমাত্র চরক সংহিতায় তাহার সকল কথা বিবৃত হইয়াছে। এখনকার দিনে অনেকে বলেন, আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞতালাভ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকদিগের জ্ঞানের সাপেক্ষ, কিন্তু আমরা বিশেষভাবে দেখাইতে পারি, পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকগণ শারীরতত্ত্বের অনেক বিষয়ে অধুনা উন্নত হইলেও চরক সংহিতায় ঐ সকল বিষয়ের এমন অনেক মীমাংসা আছে—যাহা তাঁহাদের নিকট এখনও মীমাংসিত হইতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাঁচির বেগ ধারণ করিলে অমুক রোগ হয়, বমির বেগ ধারণ করিলে অমুক রোগ জন্মে, শ্লেষ্মবহ স্রোতঃ সকল আলোড়িত হইলে অমুক অমুক রোগ হইয়া থাকে—এ সকল কথার ব্যাখ্যা শারীর তত্ত্বের জ্ঞানের অপেক্ষা করিলেও পাশ্চাত্য চিকিৎসক মণ্ডলীর শারীরতত্ত্ব এ সকল কথার ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয় নাই। হাঁচি কিরূপে হয়, বমি কিরূপে হয়, নিঃশ্বাসক্রিয়া কিরূপে সম্পন্ন হয়, শ্লেষ্মবহ স্রোতঃ সকলের ক্রিয়া কি—এ সকল কথা পাশ্চাত্য চিকিৎসা পুস্তকে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল লিপিবদ্ধ বিষয়ের সহিত পূর্ব্ব কথিত বিষয়ের সমাধান হইতে পারে না।

চরক বলিয়াছেন শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত, ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক। এই কথায় ইহার অর্থ শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতি রোগে মানবের শারীরিক অবস্থা একই প্রকার হয়। এরূপ অবস্থায় জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ব যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলেও এই কথার ব্যাখ্যায় আমাদিগকে আদৌ সাহায্য করিতে সমর্থ নহেন।

যাক্ এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবনা. মহামতি গঙ্গাধরের কথাই আমাদের আলোচ্য। মহামতি গঙ্গাধর বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন, এক মাত্র চরকের মতের অনুবর্ত্তী হইলে আর কোনও মতেরই অপেক্ষার আবশ্যক নাই। চরকের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার [illegible]জ্ঞান এবং দ্রব্যবিজ্ঞানে এরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল যে তাঁহার খ্যাতিও প্রতিপত্তি ভারতের সকল স্থানেই কীর্ত্তিত হইতেছে। কিংবদন্তী আছে, একদা তিনি এক ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবারের চিকিৎসার জন্য আহূত হইয়াছিলেন, রোগিনী বিধবা। নাড়ী দেখিয়া গঙ্গাধর তাঁহার পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন—মাছের ঝোল ভাত। তচ্ছ্রবণে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি মহাশয়, ইনি যে বিধবা। মাছের ঝোল কি করিয়া দেওয়া হইবে?" গঙ্গাধর তাহার উত্তরে বলিলেন, "ইনি বিধবা, কিন্তু ইঁহার রোগ হইয়াছে সধবার মত, এজন্য আমার ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে।" বলা বাহুল্য সেই এক বিধবার গর্ভ হইয়াছিল, গঙ্গাধর ইহা নাড়ী দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, গঙ্গাধরের নাড়ীজ্ঞানের পরিচায়ক এরূপ গল্প যথেষ্ট আছে, সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর আর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

শেষ কথা, গঙ্গাধরের মত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত চিকিৎসক এ যুগে আর একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। গঙ্গাধরের শিষ্যদিগের মধ্যেও প্রত্যেকে এক একজন মহামহোপাধ্যায় হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী প্রায় [illegible] হইয়াছে, একমাত্র হারাণ চন্দ্রই বর্ত্তমান। তাঁহার শেষ কালের শিষ্য—মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, রাজেন্দ্রনাথ এবং নেবুতলার যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যানিধি। লেখক শেষোক্ত মহাপুরুষেরই ছাত্র। শেষোক্ত মহাপুরুষ যোগেন্দ্র চন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি, গঙ্গাধর বলিতেন,—"চিরদারিদ্র্যকে যিনি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, তিনি যেন চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী না হন।" ইহা শুধু গঙ্গাধরের মুখের কথা ছিল না। তিনি নিজেও এইজন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা অপেক্ষা শাস্ত্রানুশীলনের চর্চ্চাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন।

হায়! সে দিন কোথায় যাইল? কালমাহাত্ম্যে আমরা এখন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি, এখন চিকিৎসা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনই অনেকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। রোগীর রোগযন্ত্রণা দূর করিবার চেষ্টা এখন অনেকের গৌণ উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। গঙ্গাধরের মত কবিকল্প

চিকিৎসকের যুগে এই গৌণ উদ্দেশ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতে এক জনও কিন্তু সাহস করিত না।

সত্যই গঙ্গাধর ঋষিকল্প চিকিৎসক ছিলেন। ঋষিকল্পই বা বলি কেন? গঙ্গাধর ভারতবর্ষে আর্য্য চিকিৎসার শেষ ঋষি ছিলেন। শুধু আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থগুলি নহে, সকল শাস্ত্রেই তাঁহার মত পণ্ডিত সে সময়ে অল্পই পাওয়া যাইত এক কথায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুচিকিৎসক বাঙ্গলা দেশে তাঁহার মত আর একজনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গলায় না জন্মিয়া গঙ্গাধর যদি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সেই দেশের অধিবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে সেই প্রদেশের রাজধানীর বক্ষে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া প্রতিদিন তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের সে কৃতজ্ঞতা কোথায়? এই বাঙ্গালীই এক [illegible] বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বনাশ করিয়াছে; নতুবা আজ বাঙ্গলা দেশের এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? সেদিন প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিবৎসর এইরূপ অনুষ্ঠান করা হউক, মহামতি গঙ্গাধরের নাম স্মরণ করিয়া প্রত্যেক বৈদ্য চিকিৎসক কৃতার্থমনা হউন, প্রকৃত চিকিৎসকগণ সেই মহাপুরুষেরই প্রচারিত চিকিৎসার অনুবর্ত্তন করিয়া সনাতন আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করুন, গঙ্গাধরের মত প্রত্যেক বৈদ্য চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মহিমা কীর্ত্তন করুন—ইহাই এই দীন লেখকের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

রসের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ)

পারদের ব্যবহার

পারদ বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা—ভক্ষণ, মর্দ্দন, ধূমগ্রহণ, সবলায় দ্বারা প্রয়োগ, এণ্ডার্মিক বা হাইপোডার্মিক রূপে প্রয়োগ ও স্নানরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পারদের ক্রিয়া

পারদ ঘটিত ঔষধ শরীরে শোষিত হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রমাণ এই যে, পারদ সেবনান্তর লালা, ঘর্ম্ম, পিত্ত, প্রস্রাবাদি শরীরস্থ রসে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রকাশ পায়। অপর, কিছু কাল গন্ধক সেবন করিয়া পরে পারদ সেবন করিলে চর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হয়; তাৎপর্য্য এই যে, উভয় ধাতুই চর্ম্মপথে নির্গত হয় এবং [illegible] তৎকালে সংযুক্ত হইয়া সালফিউরেট অব্ মার্কারি (কজ্জলী) রূপ ধারণ করে। এ ভিন্ন পারদ সেবন কালে যদি শরীরে স্বর্ণালঙ্কার থাকে, পারদ সহযোগে তাহা শ্বেতবর্ণ হয়।

পারদ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, রজোনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, বিরেচক, অবসাদক, শোষক, প্রদাহ-নাশক। বাহ্য প্রয়োগে—পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, শোষক, পচন নিবারক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, ও দাহক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ডাক্তার [illegible] [illegible]. দাস আয়ুর্ব্বেদ সভার একটী

অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের জনৈক আত্মীয়ের কলেরা হইয়াছিল, এলোপাথিক ঔষধ প্রয়োগে ক্রমশঃ পতনাবস্থায় উপনীত হইলে উত্তেজনার জন্য তিনি মকরধ্বজ প্রদান করেন ও রোগীটীও ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে। মকরধ্বজ প্রদানের পর ডাক্তার লিউকিচ্ সাহেব আসিলে ডাক্তার সরকার তাহাকে একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্র পরিদর্শন করিতে দিলে তিনি বলেন "উহার ভিতর একটী cell এবং cellএর মধ্যে কতকগুলি নীল রংয়ের বিন্দু দেখা যাইতেছে।" তাহাতে ডাক্তার সরকার বলেন,—এই কলেরার রোগীকে মকরধ্বজ সেবন করান হইয়াছে—পরে মলের ভিতর হইতে ঐ cellটী (অণুগোলক) অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। মকরধ্বজের dianamic (ডায়নামিক) ক্রিয়া (অর্থাৎ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আছে) সেইজন্য মকরধ্বজ প্রদান মাত্র তৎক্ষণাৎ শরীরের cell গুলিতে প্রবিষ্ট হয়; এবং কার্য্য করিতে থাকে।

যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী গবেষণা করিলে প্রতীয়মান হয়,—আয়ুর্ব্বেদের এই মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী, এই যে সর্ব্বরোগহর ঔষধ ইহার প্রবর্ত্তক কে? যিনিই হউন তিনি যে আয়ুরহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অজর, অমর হইবার ঔষধ আবিষ্কার করিতে করিতে ইহার উৎপত্তি হয়। অবশ্য কোন ত্রুটীতে কোনরূপ জ্ঞানের অল্পতা হেতু সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ইহার পরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগে আর একবার এ সম্বন্ধে উন্নতির চেষ্টা বা জীবন রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হইয়াছিল। তিব্বতের লামা সন্ন্যাসীগণ এ বিষয়ে অনেক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং ইহা অবলম্বনে যে অমরত্ব লাভ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান এখন পাওয়া যায়। তিব্বতের লামা সম্প্রদায়ের মঠের প্রধান মোহন্তবৃন্দকে অতি বার্দ্ধক্য সময়ে জীবিতাবস্থায় সমাধি দেওয়া হইত এবং তাহার হস্তে একটী বাক্স মুদ্রিত পারদপূর্ণ আধার স্থাপন করা হইত; কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে কখনও কোন সংশয় উপস্থিত হইলে তাহারা সেই সমাধির আবরণ উন্মোচন করিয়া মুষী খুলিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসিত বিষয় জানাইয়া তদুত্তরে সংশয় নিরসন হইলে পুনরায় সমাধিস্থ করিতেন। মোহান্তগণ যে এইরূপে কতকাল অবধি জীবিত আছেন, তাহা কেহই অবগত নহেন। সিদ্ধগণ যে এইরূপ উপায় অবলম্বনে অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন রসশাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হয়। অলীক কল্পনা নয়, স্থির নিশ্চয়। পারদের এই অভাবনীয় কার্য্যকারিতা ও অচিন্ত্যনীয় শক্তি উপলব্ধি করিয়াই আবহমান কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় ও বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য এ্যালোপাথিক ও হোমিওপাথিক চিকিৎসকবৃন্দ সাদরে চিকিৎসার প্রধান উপায়স্বরূপ করিয়া ইহা ব্যবহার করিতেছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসক মণ্ডলী পারদের শোধন, মারণ ও জারণ প্রণালী সম্পূর্ণরূপে না মানিলেও যে ভাবে তাঁহারা ইহা প্রয়োগ করেন, তাহাতে ইহার কার্য্যকারিতা শক্তির কিছুমাত্র হানি হয় না। কোন কোন স্থলে কিছু কুফল দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় শোধন প্রণালী অবলম্বনে ইহা অমৃতোপম হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে অধিকাংশ স্থলেই গন্ধক সহযোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই কারণ ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলেও কুফল প্রদান করে না।

তন্ত্র শাস্ত্রের বহুস্থলে পারদের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। সেই কারণেই পারদ ঘটিত ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা করাকে তান্ত্রিক চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্র শাস্ত্রে পারদের অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে। সেগুলি যে সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য এগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই, তবে তন্ত্র শাস্ত্রে যেরূপ আছে সেইরূপই উদ্ধৃত করিলাম।—সিদ্ধ নাগার্জ্জুন কৃত কক্ষপুট তন্ত্রে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যাস্থলে বলা হইয়াছে—

পুংশুক্রং পারদংতুল্যাং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ।
গাত্রে দেয়ং মৃতস্যৈব কালদষ্টস্য বা ক্ষণাৎ॥
জীবত্যাশু ন সন্দেহো মহাদেবেন ভাষিতং॥

পুরুষের বীর্য্য ও পারদ সমপরিমাণে লইয়া পূর্ব্বোক্ত অংকোল ফলের তৈলের সহিত আলোড়ন করিবে। এই তৈল মৃত ব্যক্তির শরীরে দিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি জীবিত হয়। এই যোগ মহাদেব বলিয়াছেন।

শ্রীনাগভট্ট বিরচিত কামরত্ন তন্ত্রে সর্পবিষ চিকিৎসা স্থলে উক্ত হইয়াছে —

সূতকং গন্ধকং তুত্থং টঙ্কণং রজনীসমম্।
দেবদালাদ্রবৈর্ম্মর্দ্যাং দিনং নিষ্কন্তু ভক্ষয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, তুঁতিয়া, সোহাগা ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দেবদালীর রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে সর্প বিষ নিবারণ হয়। আয়ুর্ব্বেদীয়, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা স্থলে পারদ বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় পারদের কখন কখন কুফল ঘটিতে দেখা যায়। তাহার কারণ শোধনের অভাব। পারদকে বিশুদ্ধ করণান্তর প্রয়োজিত হইলে অমৃত তুল্য ফল প্রদান করে, কিন্তু অশোধিত পারদ বিষবৎ কার্য্য করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীতে বিবিধ প্রকার দ্রব্য সংযোগে পারদের বিষদোষ, বহ্নিদোষ প্রভৃতি প্রক্ষালিত ও গন্ধক সংযুক্ত হওয়ায় তাহা সর্ব্বত্রই সুফল প্রদান করিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় অধিকাংশ বটীকাদি ঔষধেই অতি সূক্ষ্মরূপে কজ্জলী, হিঙ্গুল, মকরধ্বজ প্রভৃতি রূপে পারদ বর্ত্তমান থাকে এবং স্বল্প মাত্রোপযোগী রসং" এই শাস্ত্রবাক্যের উপযোগিতা বিশেষরূপে সুফল দর্শনে প্রমাণ করে। হোমিওপ্যাথিক মার্কুরিয়াস সল, মার্কুরিয়াস কর প্রভৃতি প্রয়োগে যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই অনুধাবন করিয়াছেন। এই পারদ বিশোধিত না হইলেও অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে থাকায় কোন অনিষ্ট করিতে পারে না বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ এলোপ্যাথিতে পারদের কখন কখন কুফল পরিদৃষ্ট হইলেও কার্য্যবেগ প্রকৃতি না থাকিলে বোধ হয় তাঁহাদের চিকিৎসা করা সঙ্কট হইয়া পড়ে। সেই জন্য পারদ ব্যবহার কালে কতকগুলি নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই নিয়ম গুলি রক্ষিত হইলে বিশেষ অপকারিতা আসিতে পারে না।

১। পারদ ঘটিত ঔষধ কখন কখন সংগ্রাহরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার প্রতীকার আবশ্যক।

২। ধাতুবিশেষে পারদ ঘটিত ঔষধ অল্প মাত্রায় কার্য্য করে। সেই স্থলে অধিক প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন।

৩। শৈশবাবস্থায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় পারদ দ্বারা সহজে মুখ আইসে না। অধ্যাপক গ্রেভস বলেন যে, বালক-দিগের লালা গ্রন্থি অপ্রকাশিত থাকা প্রযুক্ত এবং বৃদ্ধাবস্থায় লালা গ্রন্থির ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এইরূপ হয়।

৪। পারদ সেবনকালে লঘু আহার বিধেয়। মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করিলে পারদের ক্রিয়া শীঘ্র প্রকাশ পায়।

৫। পারদ সেবন করিলে শরীর সর্ব্বদা আবৃত রাখিবে। শীতল ও আর্দ্র বায়ু এবং আর্দ্র স্থানে বাস ত্যাগ করিবে।

নিম্নলিখিত রোগ থাকিলে পারদ ঘটিত ঔষধ বিষতুল্য।

স্ক্রফিউলা, যক্ষ্মা, পচাক্ষত, বিদূর্ণক্ষত, গাউট, মূত্রাশয় প্রদাহ, মধুমেহ, ব্রাইট ডিজিজ, [illegible], স্কার্ভি, নিরক্তাবস্থা, শিরোশিল, পূয সংগ্রহ এবং অত্যাজীর্ণ অবস্থা প্রভৃতি স্থলে পারদ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

পারদ ভস্ম বিধি

১। ভড়ভড়ের রস অর্দ্ধ ছটাক একটী শিশিতে রাখিয়া পারা ঢালিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া নাড়িয়া রাখিয়া দিলে এক দিনে জমিয়া যাইবে। তৎপরে তাহা একটী ভাঁড়ে রাখিয়া আকন্দের আঠা অর্দ্ধ ভরি ও ভড়ভড়ের রস ১ভরি ছোট কিরুই পাতা-শিকড় সমেত ১ ভরি লইয়া বাটিয়া

ও ভূম্যামলকীর রস ৩ তোলা, এই সকল দ্রব্য পারার উপর দিয়া বদ্ধ পাত্রে কাদিমাটির লেপ দিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে ভস্ম করিতে হইবে।

২। পারদ ২ তোলা, রাং ২ তোলা, সীসক ২তোলা। লোহার কড়ায় প্রথমে রাং ও সীসক গলাইয়া, পারদ দিয়া ঢালিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আকন্দ পত্রের ৫ম সংযোগ করতঃ তদুপরি আকন্দ পত্র চাপা দিয়া নামাইয়া রাখিতে হইবে। শীতল হইলে কড়া হইতে চটির ন্যায় শ্বেতবর্ণের পদার্থ পাওয়া যাইবে, ইহাই সিদ্ধসূত বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা পূয মেহ, বিদাক্ত মেহ ও গণোরিয়ায় মাখন, মিছরী সহ সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত রসরত্ন সমুচ্চয় গ্রন্থে রসকর্ম্মাধ্যায়ে পারদ ভস্মের নিয়ম ২।১টী লিখিত আছে, তন্ত্র শাস্ত্রে অনেক স্থলে পারদ ভস্মের নিয়ম ও উপকারিতা প্রবন্ধে লিখিত আছে। গরুড় পুরাণোক্ত যক্ষিতামড় তন্ত্রে রসানাধিকারে লিখিত হইয়াছে যথা :—

অথবা পরমেশানি ! মৃৎপাত্রে স্থাপয়েদ্রসম্।
বল্লীরসেন তদ্দ্রব্যং শোধয়েদ্বহ্নযত্নতঃ।
ঘৃতনারীরসেনৈব তথৈব শোধনং চরেৎ।
এবং কৃতে তু গুটিকা যদি স্যাদ্দৃঢ় বন্ধনম্।
ধুস্তুরক্ষ সমানীয় মধ্যে শূন্যঞ্চ কারয়েৎ।
কৃষ্ণাখ্যা তুলসীযোগে তথা ঘৃতকুমারিকা।
এবং কৃতে বহ্নিযোগে ভস্মসাৎ জায়তে কিল।

মৃত্তিকাপাত্রমধ্যে পারদ রাখিয়া পানের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া উত্তম রূপে পারদ শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে যদি পারদ গুটিকা বন্ধন অর্থাৎ জমাট হয়, তাহা হইলে একটী ধুতুরা ফলের মধ্যগত শাঁস বাহির করিয়া তন্মধ্যে ঐ পারদ পুরিয়া তাহার মধ্যে কৃষ্ণতুলসী ও ঘৃতকুমারী পূর্ব্ববৎ লেপনাদি করিবে। পরে সপ্ত প্রহর কাল পর্য্যন্ত বনঘুঁটিয়ার অগ্নিতে জাল দিলে পারদ সুবর্ণ ভস্ম হইবে।

কামরত্ন তন্ত্রে উক্ত আছে :—

অঙ্কোলস্য শিফাক্বাথৈঃ পিষ্টাথস্নে বিমর্দ্দয়েৎ।
সূতং গন্ধক সংযুক্তং দিনান্তে তদ্বিশোধয়েৎ।
পুটয়েদ্ভূধরে যন্ত্রে দিনান্তে ভস্ম সূতং ভবেৎ।
কৃষ্ণধুস্তুর তৈলেন সূতং মর্দ্দ্যং দিনামকম্।
দিনৈকং তৎপচেৎ যন্ত্রে পুটপাকেন সংশয়ঃ।
রসং গন্ধং সমং মর্দ্দ্যং দিনং দিনং নিগুণ্ডিকাদ্রবৈঃ
বস্ত্রমূষাস্থিতং পাতং ভস্ম সূতং ভবেন্মসম্।
টঙ্কণং মধুলাক্ষাঞ্চ উর্ণাগুঞ্জা মৃতোরসঃ।
মর্দ্দয়েৎ ভৃঙ্গজদ্রাবৈর্দ্দিনৈকং চাহ্বয়েৎ পুনঃ।
পাতে ভস্মত্বমায়াতি শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভিঃ।

ইহার পরে আরও কয়েক প্রকার ভস্মের প্রণালী কথিত হইয়াছে। এই ভস্মগুলি সমস্তই শ্বেত ভস্মের অন্তর্গত।

হিঙ্গুল শোধন বিধি।

হিঙ্গুলকে একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁড়ির মধ্যে জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে নিমজ্জিত করতঃ হাঁড়ির নিম্নে জাল দিবে; কিছুকাল পরে ঐ হিঙ্গুল বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই হিঙ্গুল শোধিত হয়। এতদ্ব্যতীত বকফুলের পাতার রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়।

কামরত্ন তন্ত্রে হিঙ্গুল শোধনের জন্য আর একটী নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"মেষীক্ষীরাম্লবর্গানাং দরদং যৰ্ম্ম ভাবিতম্।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্।"

ছাগ দুগ্ধের দধিতে হিঙ্গুল দিয়া রৌদ্রে ৭ বার ভাবনা প্রদান করিলে হিঙ্গুল শোধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্বেদে ধাত্রীবিদ্যা

(কবিরাজ শ্রীগণেশচন্দ্র সেন বি-এ)

সদ্যজাত শিশু ও ইহার ক্রম পরিবর্ত্তন :—

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও জরায়ুতে মাতৃরক্ত হইতে অম্লজান (Oxygen) ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সঞ্জীবিত থাকে। এবং এই কার্য্য অপরা (Placenta) হইতে যে নাড়ী—শিশুর নাভি নাড়ীর সহিত সংযোজিত থাকে, তদ্বারাই সুসম্পাদিত হইয়া থাকে। নাভি-নাড়ী ছেদন মাত্রেই শিশু অপরা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে, ইহার ফলে আর তাহাকে অম্লজানের অভাব বোধ করিতে হয় না এবং বর্ত্তমান অবস্থাতেও মাতৃস্তন্যই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আহার বলিয়া আচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জন্মের পরমুহূর্ত্তে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে :—

(ক) হৃদ্‌পিণ্ডের ভিতরে যে চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে উপরের একটী হইতে অপরটীতে যে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছিল, তাহা চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমান অবস্থায় নাভি নাড়ীর আর কোন কার্য্য থাকে না ও ক্রমশঃ একটী আঁশযুক্ত রজ্জুতে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদনে ৪.৫ দিবস আবশ্যক হয়। তৎপর রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া—ইহার গতি ভবিষ্যৎ জীবনের মত হইয়া থাকে।

ইহার পর দেহের ও মনের পূর্ণ বিকাশ যৌবনে সংশোধিত হইয়া থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধি পরবর্ত্তী যৌবন অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। এই বৃদ্ধির আবার ছেলে মেয়ে ভেদে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদের দেহের ও মনের বৃদ্ধি ছেলেদের অপেক্ষা দ্রুত সংসাধিত হয়। কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিলে উভয়েরই বর্দ্ধন একই রকম দ্রুত পূর্ণতা লাভ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি লোপ পাইতে থাকে। যৌবন অবস্থাতে জননেন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা ও সন্তোৎপাদিকা পূর্ণতা লাভ করে এবং স্ত্রীজাতির পীনোন্নত স্তন ও পুরুষ জাতির গুম্ফ ও শ্মশ্রুর উদ্গম ও কণ্ঠস্বরের পূর্ণতা লাভ—ইহার নিশ্চিত লক্ষণ। নারীজাতির রজোদর্শন ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ। অদৃষ্ট আর্ত্তবা নারীর পক্ষে অপর সকল লক্ষণের উপরে নির্ভর করিতে হয় বটে।

> পীন প্রসন্নবদনাং প্রক্লিন্নাত্মমুখ দ্বিজাম্।
> নরকামাং প্রিয়কথাংস্রস্ত কুক্ষ্যক্ষি মূর্দ্ধজাম্॥
> স্ফুরদ্ভুজ কুচ শ্রোণি নাভ্যূরুজঘন স্ফিচম্।
> হর্ষোৎসুক্য পরাঞ্চাপি বিদ্যাদৃতুমতীমিতি॥

অর্থাৎ ঐরূপ স্ত্রীলোকেরা পীন প্রসন্নবদনা, ক্লিন্নদেহা, ক্লিন্নমুখী, ক্লিন্নদর্শনা (দর্শন শব্দে দন্তবেষ্ট বুঝিতে হইবে) নরকামা, প্রিয়কথা, স্রস্তকুক্ষি, স্রস্তমূর্দ্ধজা ও স্রস্তাক্ষী হইয়া থাকে। উহাদের ভুজ, কুচ, শ্রোণি, নাভি, উরু, জঘন ও স্ফিক স্ফুরিত হইয়া থাকে। আর উহারা হর্ষোৎফুল্লা ও ঔৎসুক্য পরায়ণা হইয়া থাকে; তাহাতে জানা যায় যে, উহারা ঋতুমতী হইয়াছে।

মেয়েদের সাধারণতঃ দ্বাদশবর্ষ বয়সে রজোদর্শন হইয়া থাকে এবং প্রায়ই পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে শরীর জীর্ণ হইলে স্বভাবতঃ রজঃক্ষয় হইতে থাকে। সুতরাং ইহার পর আর রজঃদর্শন হয় না

> তদ্বর্ষাদ্দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমান মসৃক পুনঃ।
> জরাপক্ক শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশত ক্ষয়ং॥

(সুশ্রুত)

জরাজীর্ণতা কি প্রকারে রজঃক্ষয়ের কারণ হয়—তাহা চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, শরীরের জীর্ণাবস্থায় স্বভাবতঃই

শৈহিক বায়ু অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ বর্দ্ধিত বায়ু যে আহারীয় রস হইতে শরীরের ধাতু সমূহ পরিপুষ্ট হয়, সেই আহারীয় রসকে শোষণ করিতে থাকে। সুতরাং পোষকতার অভাবে জীর্ণ ব্যক্তির শরীরের ধাতু সমূহ পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। উক্ত কারণেই জরাজীর্ণ রমণীর রজোবাজ ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ধাতু সমূহের সুপুষ্টতাই রজোদর্শনের হেতু এবং ধাতু সমূহের ক্ষীণতাই রজোদর্শনাভাবের হেতু। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আচার্য্য কথিত দ্বাদশবর্ষ, প্রথম রজোদর্শনের সম্ভাবিত কাল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তৎপূর্ব্বেও (দশম্ একাদশবর্ষে) ধাতু সমূহের সুস্পষ্টতা ঘটিলেই রজোদর্শন হইতে পারে। এবং তৎপরেও (ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ বর্ষে) ধাতুসমূহ সুস্পষ্ট না হইলে রজোদর্শন হয় না। এই প্রকার পঞ্চাশৎ বর্ষের পূর্ব্বেও ধাতুসমূহের ক্ষীণতা ঘটিলে রজোদর্শনের অভাব ঘটিতে পারে।

যৌবন পরিচায়ক নারীর প্রাথমিক রজোদর্শন-কাল সমাজ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সর্ব্বোপরি জল বায়ুর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মেয়েরা শীত প্রধান দেশের মেয়েদের অপেক্ষা অল্প বয়সে ঋতুমতী হইয়া থাকে।

শুক্র ও আর্ত্তব কি ? :—

সম্যক্ পক্ব ভুক্ত দ্রব্যের রস হইতে ক্রমশঃ ও অবস্থান্তর পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় মনুষ্যের রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতু এবং নারী জাতির আর্ত্তব শোণিত নামক এক প্রকার ধাতু জন্মিয়া ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

> রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ সংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
> তদ্বর্ষা দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশত ক্ষয়ং॥
> রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্ মেদ প্রজায়তে।
> মেদোসোঽস্থিততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্ত সম্ভবঃ।
> মেদতত্রৈবাং ধাতু নামন্ন পানরস প্রীণয়িতা॥
>
> (সুশ্রুত)

ততঃ স্থূল ভাগোরসঃ মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবং

শুক্রঞ্চভবতি।

(ভাব প্রকাশ)

সুশ্রুত বলেন, আর্ত্তব শোণিত সাধারণ রক্তাপেক্ষা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গন্ধবিহীন, উপযুক্ত কালে উহা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ভাশয়স্থ (জরায়ুকোষস্থ) দুইটী ধমনী দ্বারা যোনিমুখে নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাকে "রজঃদর্শন" বলা হইয়া থাকে।

> মাসেন্যে পচিতং কালে ধমনীভ্যাং তদার্ত্তবং।
> ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনি মুখান্নোদেৎ॥
>
> (সুশ্রুত)

প্রতীচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে আর্ত্তব শোণিতকে বিশুদ্ধ রক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, যখন উহা যোনিমার্গ দিয়া চলিয়া আসিতে থাকে, তখন পথি-পার্শ্বস্থ তৈলময় পদার্থের সংস্পর্শে ইহা অবস্থান্তর গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ আর্ত্তব রঞ্জিত বস্ত্র খুব সহজেই জলে বিধৌত হয়, কিন্তু রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্রের দাগ কখনও সহজে উঠিয়া যায় না। সুতরাং ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, আর্ত্তব বিশুদ্ধ রক্ত ও এক তৈলময় পদার্থের সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আর্ত্তব শোণিত প্রকৃতি :—

সাধারণতঃ চারি সপ্তাহের পর রজঃ প্রবৃত্তি দেখা যায় এবং এই সময় জরায়ুতে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে এবং ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলি পুরু বা ঘনীভূত হইয়া থাকে। অবশেষে রক্তবাহী কতকগুলি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি কাটিয়া যায় এবং ইহা জরায়ু-রস-কোষের স্রাবের ও যোনি স্রাবের সহিত মিলিয়া শোণিতরূপে নির্গত হইয়া থাকে। আর্ত্তব শোণিত স্রাব তিন চার দিবস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ যে রক্ত নিঃসরণ হয়, তাহা অর্দ্ধ পোয়ার কিছু বেশী হইয়া থাকে (300 C. C.) রজঃ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই শ্লৈষ্মিক

স্বল্পগুলি শুকাইয়া যায়। ইহা সম্পাদনে প্রায় দুই সপ্তাহ কাল প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার ২১ দিন পর হইতেই পুনঃ রজঃপ্রবৃত্তির আবশ্যকীয় কার্য্য চলিতে থাকে। রজোদর্শনের প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত কালকেই ঋতুকাল বলা যায়। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিবস স্বভাবতঃই সবেগে রজঃ শোণিত নিঃসৃত হয়। তৎপরে কাহারও অল্প অল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাহারও বা হয় না। কিন্তু উক্ত ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্তই গর্ভ সঞ্চারের যোগ্য কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ ঐ কালে গর্ভাশয়ের দ্বার (জরায়ুর মুখ) সম্পূর্ণ বিবৃত থাকে।

আর্ত্তব স্রাব দিবসাদৃতু ষোড়শ রাত্রয়ঃ।
গর্ভ গ্রহণ যোগ্যস্তু যা এব সময়ঃ স্মৃতঃ॥

(ভাব প্রকাশ)

যেমন দিবা অবসানে পদ্মিনী সঙ্কুচিত হইয়া থাকে সেরূপ ঋতুর ষোড়শ রাত্রি অতীত হইলেই গর্ভাশয়ে দ্বার (জরায়ুর মুখ) সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সুতরাং তৎপরে পরবর্ত্তী ঋতুকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর আর্ত্তব শোণিত দৃষ্ট হয় না। এবং তৎপরে গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না।

নিয়তং দিবসে হতীতে সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা।
ঋতৌ ব্যতীতে নার্য্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা॥

(সুশ্রুত)

গর্ভাবস্থায় রজোদর্শন না হওয়ার কারণ এই যে, রক্ত স্রাবিনী নাড়ীর মুখ সঞ্চিত গর্ভদ্বারা অবরুদ্ধ হয়; সুতরাং রক্তঃ নির্গত হইতে পারে না। (ক) ঐ সংরুদ্ধ আর্ত্তব রক্তের কিয়দংশ এবং অপর উপচীয়মান রক্ত ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া অমরা রূপে পরিণত হয়। এই অমরার সহিতই গর্ভস্থ শিশুর নাভি-নাড়ী সংলগ্ন থাকে। উক্ত আর্ত্তব রক্তের অবশিষ্ট অংশ স্তন্য বাহিনী নাড়ীর দ্বারা স্তন দ্বয়ে নীত হয়; এই কারণেই গর্ভিণীর স্তন দ্বয় অপেক্ষাকৃত পীন ও উন্নত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-নীতি

[কবিরাজ শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ]

স্বাস্থ্য মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রকৃত গৌরবের অধিকারী হইতে হইলে নিজের, সংসারের, পল্লীর এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিতে হইলে স্বাস্থ্য সঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য।

নীরোগ, কর্ম্মক্ষম, শক্তিশালী ব্যক্তিকে সুস্থ বলা যাইতে পারে। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে স্বাস্থ্যের লক্ষণ :—

শরীরের বায়ু, পিত্ত কফ, অগ্নি, ধাতু, মল এবং ক্রিয়া সমভাবে থাকিয়া যদি আত্ম, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রসন্ন হয়, স্বাস্থ্য ভাল আছে বুঝিতে হইবে।

যে নিয়ম অনুসরণ করিলে প্রকৃত রোগহীন, কর্ম্মপটু, শক্তির আধার দেহ লাভ করা সম্ভব তাহা স্বাস্থ্য-নীতি নামে অভিহিত।

স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য যে কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, তাহার মধ্যে শ্রম, বিশ্রাম, মনের প্রফুল্লতা, পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল জল ও বায়ু এবং আহার বিহারের সংযমই প্রধান।

শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী পরিশ্রম প্রয়োজন। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিদিন আহার্য্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য এবং আত্মরক্ষার উপযোগী যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে কঠোর পরিশ্রম

আবশ্যক। যে অলস প্রকৃতি জীব ইহাতে বিমুখ হয়, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। জগতের অতীত ইতিহাসে কত বিভিন্ন জাতীয় জলচর, স্থলচর ও আকাশবিহারী জীবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? কত জীব যে জগৎবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সন্ধান দিবে? শ্রম বিমুখতাই যে তাহাদের ধ্বংসের মূল কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইলেই আর অধিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগকে জীবনোপায়ের জন্য খাটিতে হয়, তাহাদের আর পৃথক কোন ক্রীড়া বা ব্যায়ামের আবশ্যক হয় না। যাহারা ধনীর দুলাল, অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের মধ্যে যাহারা প্রতিপালিত, তাহাদিগকে শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখিতে উপযুক্ত পরিমাণে নির্দ্দোষ ক্রীড়া ও ব্যায়াম অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন।

সন্তরণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। ইহাতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালনা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং ফুসফুসের প্রসারণ সাধিত হয়। অশ্বারোহণ, ভ্রমণ, নৌবিহার, শরীরের উন্নতিদায়ক। ইহাদ্বারা মনের আনন্দ ও নির্ম্মল বায়ু সেবন দুই-ই সুসম্পন্ন হয়। দেশীয় ক্রীড়ার মধ্যে ডু ডু, সুনদাড়ী, বুড়িছোঁয়া মন্দ নয়।

বিদেশীয় ক্রীড়ার মধ্যে টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন নিরাপদ ও এ দেশের উপযোগী ব্যায়াম। কুস্তি, মুদ্গর ডন ও ডাম্বেল ক্রীড়া বড়ই আনন্দহীন, কিন্তু, যদি অনুশীলন করা যায়, তবে শরীরের পক্ষে যথার্থই উন্নতি বিধায়ক সন্দেহ নাই।

যাহারা পরিশ্রমী ও মিতাচারী, ব্যাধি সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায় না, তাহাদের শরীরে রোগ-জীবাণুর প্রতিষেধক শক্তি অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। ঔষধ, শ্রম ও মিতাচারের প্রতিনিধি মাত্র। প্রকৃত শ্রমী ও মিতাচারীর ঔষধের বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

আরব্য রজনীতে একটী সুন্দর গল্প আছে। এক দেশের এক সুলতান বাতব্যাধিতে ভীষণ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। যাহাই ভোজন করিতেন, তাহাতেই অম্ল হইত, উদরে বেদনা অনুভব করিতেন। দিন দিন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল। বহু হাকিম, বহু ঔষধের দ্বারাও কোন সুফল পাইলেন না।

একদিন সে দেশে এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলতানকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, এ ব্যাধি সহজেই আরোগ্য হইবে।

তাহার পর সেই ফকির সাহেব একটী শূন্যগর্ভ কাষ্ঠ গোলক ঔষধ দ্বারা পূর্ণ করিলেন এবং একখানি ব্যাটের ধরিবার স্থানটীর মধ্যে ঔষধ পূর্ণ করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পরে সুলতানকে বলিলেন, "যতক্ষণ না শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, ততক্ষণ এই ব্যাট দ্বারা গোলকটীকে আঘাত করিতে থাকিবেন। প্রতিদিন এই কার্য্য করিবেন, এক পক্ষ কালের মধ্যে আপনার ব্যাধি আরোগ্য হইবে।

প্রকৃতই এক পক্ষ পরে সুলতান ব্যাধি মুক্ত হইলেন। যষ্টির মধ্যের ঔষধের গুণে যত না হউক, উপযুক্ত ব্যায়াম প্রভাবে সুলতানের ব্যাধি নিরাময় হইয়াছিল। শ্রম ও ব্যায়ামানুবর্ত্তীতা যথার্থই অমৃতময় ভেষজ।

পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রামও বিশেষ প্রয়োজন। অতিশ্রমে জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। দৈনিক ৬ ঘণ্টা নিদ্রা, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম—শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক।

মানসিক সন্তোষ ও আনন্দ শরীরের উন্নতিজনক। অত্যধিক চিন্তা, শোক ও দুঃখ বহুবিধ ব্যাধির হেতু। শোকের প্রাবল্যে মানব উন্মাদ হইতে পারে। মানসিক অশান্তি অত্যধিক দিন পোষণ করিলে, ক্ষয়রোগ হইতে দেখা যায়।

সৎগ্রন্থ পাঠ, সাহিত্যচর্চ্চা, বন্ধু বান্ধবের সহিত সদালোচনা, নির্দ্দোষ অভিনয় ও সঙ্গীত শ্রবণ করিলে মনের আনন্দ বৃদ্ধি পায়। তাস, পাশা, প্রভৃতি অলস ও সময় নষ্টকারক ক্রীড়া পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সকল অলস ক্রীড়া ও প্রমোদে আসক্ত হইলে

জীবনের উন্নতিপ্রদ কঠোর কর্তব্য ও উচ্চ চিন্তার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

সুস্থ শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন। রসনার তৃপ্তির জন্যই খাদ্য নহে। যে সকল খাদ্য সহজে জীর্ণ হয়, শরীর পুষ্টিকর উপাদান যাহাতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে কোনপ্রকার ব্যাধির জীবাণু আক্রমণের আশঙ্কা নাই, তাহাই ভোজন করা কর্তব্য। ঘৃত, দুগ্ধ, ফল, শাক সবজী ও ডাউল নির্দোষ আহার্য্য।

দুগ্ধ ফুটাইয়া পান করা উচিত। নারিকেল, আম, কলা, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা দ্বারা শরীর ও জীবনীশক্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। ডাউল —মাংস অপেক্ষাও পুষ্টিকর। তিনপোয়া ডাউল এক সের মাংসের সমান পুষ্টিকর।

মৎস্য ও মাংস অধিক আহার করা উচিত নহে। ছাগ মাংস ব্যতীত প্রায় সকল মাংসেই বহুবিধ ব্যাধির জীবাণুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্য ও মাংসে সামান্য পরিমাণেও পচন আরম্ভ হইলে ভোজন নিষিদ্ধ। পচা মৎস্য ও মাংসে টোমেইন নামক একপ্রকার বিষ উৎপন্ন হয়, এই বিষ একশত ডিক্রী উত্তাপেও নষ্ট হয় না। নিরামিষ ও আমিষ আহার একসঙ্গে না করিলে ভাল হয়।

আমিষ ব্যতীত আর কোন জীবই এই উভয় জাতীয় ভোজ্য একত্রে আহার করে না।

মানুষের বহুবিধ ব্যাধির সূচনা বোধ হয় এই সব হইতেই। ইতর জাতির মধ্যে চিকিৎসকের অস্তিত্ব আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু, যাহারা জগতের আদিম যুগ হইতে এই পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহাদের বিষয় কি ভাবিবার বিষয় নহে।

উৎসব বাড়ীতে অতিরিক্ত ভোজনদ্রব্য পরিবেশন একটা পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। একশত, দেড় শত পর্য্যন্ত উপাদান প্রস্তুত ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহা কি উন্নত সভ্য জগতের ক্রম পরিণতি? নিমন্ত্রণ করিয়া আত্মীয় স্বজনগণের নূতন ব্যাধির আক্রমণের সহায়তা করিতে বিরত থাকিলেই ভাল হয়।

শরীর রক্ষার জন্য নির্ম্মল জল ও বায়ু পরম বন্ধু। জল ফুটাইয়া শীতল করিলে নির্দ্দোষ হইতে পারে। জলের দ্বারা বহু ব্যাধি সংক্রামিত হয়। বিশুদ্ধ জল ব্যতীত পান করা উচিত নহে।

বাস ঘরের বাতায়ন উন্মুক্ত রাখা কর্তব্য, যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস সহজে প্রবেশ করিতে পারে। রাত্রিকালেও যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু—ঘরের মধ্যে খেলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শীতের ভয়ে বদ্ধ ঘরে বাস করিলে বহু ব্যাধি—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। নদীতীর বা উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী শ্যামল পথে ভ্রমণ করিলে বিশুদ্ধ, নির্ম্মল বায়ু সেবন ও মনের প্রফুল্লতা দুই-ই লাভ করা যায়।

পরিচ্ছন্নতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে ভাল সাবান দ্বারা শরীর মার্জ্জনা করা, পরিষ্কার বস্ত্রাদির পরিধান এবং দন্তের প্রতি দৃষ্টি লওয়া অবশ্য কর্তব্য।

শরীর সুস্থ ও নীরোগ রাখিতে হইলে সর্ব্বোপরি চরিত্রের সংযম প্রয়োজন। উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব ব্যক্তি বহু উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার সম্ভব, কখনই প্রকৃত স্বাস্থ্য ও শক্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না। শারীরিক স্ফীতিই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। নীরোগ দেহ ও প্রফুল্ল অন্তর এই দুইটীই স্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির উজ্জ্বল নয়নযুগল, তেজ ও আনন্দ উজ্জ্বল আনন এবং সুগঠিত, সুদৃঢ় দেহকান্তি দর্শন করিলে প্রত্যেকেরই প্রাণ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

পথ্যাপথ্য বিচার

[ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ-সাহিত্যভূষণ]

বাতশ্লেষ্মা-সান্নিপাতিক জ্বরে।—বাতশ্লেষ্ম সান্নিপাতিক ইত্যাদি কঠিন জ্বরের শেষাবস্থায় যখন রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন অধিকতর বলকারক পথ্যের প্রয়োজন হয়, অবস্থাবিশেষে মসূরী সিদ্ধ জল ও মাংসের যূষ ব্যবস্থা করা যায়, একখানি নূতন মালসা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহাতে বিশুদ্ধ জল দিয়া জালে চড়াইতে হইবে। ঐ মালসার উপরে একখানি কাঠি রাখিয়া কিছু আস্ত মসূরী একখানি ন্যাকড়ায় পুটুলি করিয়া ঐ কাটিতে বাঁধিয়া জলের ভিতরে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ফেনাগুলি একখানি হাতা দিয়া উঠাইয়া ফেলিতে হয়, মুসূরী উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পুটুলির ভিতর হইতে হরিদ্রাভ জল বাহির হইতে থাকিবে, ঐ জল বিশেষ বলকারী এবং রোগীর সর্ব্বাবস্থাতেই দেওয়া যাইতে পারে।

মাংসের যূষ—কচি ছাগলের, ভেড়ার অথবা মুরগীর কিম্বা পায়রার মাংস এক পোয়া আন্দাজ টুকরা টুকরা করিয়া একসের ঠাণ্ডা জলে অন্ততঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, পরে অল্প হলুদ ও ধ'নে বাটা দু একটী লবঙ্গ এবং সামান্য চিনিসহ (চিনি সংযোগে মাংস শীঘ্র সিদ্ধ হয়) একটী আবৃত পাত্রে মৃদু জালে অর্দ্ধ ঘণ্টা জাল দিতে হইবে। এক পোয়া বা দেড় পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া মাংস চট্‌কাইয়া চর্ব্বিসহ (কাহারও কাহারও মতে চর্ব্বি পূর্ব্বেই বাছিয়া ফেলিতে হইবে) ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং অবশিষ্ট যূষে লবণ মিশাইবে, লবণ প্রথমে মিশাইলে সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হয়, পরে একটু সামান্য ঘৃতে দুই একখানি তেজ পত্র, একটু দারু চিনি এলাইচের গুড়া বা মৌরী ভাজিয়া সম্বরা দিবে এবং পুনরায় ছাঁকিয়া অল্প শীতল হইলে প্রয়োজন মত লেবুর রস সংযোগে রোগীকে পান করাইবে। মাংসের যূষ রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া দেওয়া উচিত, রক্তামাশয় রোগে এবং যেস্থলে পেটফাঁপা আছে, সেখানে মাংসের যূষ কদাপি ব্যবস্থা করিবে না।

অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শয্যাশায়ী রোগীর পক্ষে মাংসের যূষ সুপথ্য।

ইক্ষু, আনারস, কমলা লেবু, বাতাবী লেবুর রস কাঁসপাতি পেঁপে ইত্যাদি ফল জ্বর রোগীকে দেওয়া যায় কিনা—এরূপ প্রশ্ন গৃহস্থ কর্ত্তৃক অনেক সময়েই শুনা যায়, এলোপ্যাথিক ডাক্তার বাবুরা এ সমস্ত সর্ব্বত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ইদানীং বাতাবী লেবুর রস ম্যালেরিয়া নাশক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, ইহার প্রত্যেকটীই শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, সুতরাং যে জ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক, তাহাকে ইহার কোনটিই ব্যবস্থা করা উচিত নহে, কিন্তু বাতিক এবং পৈত্তিক জ্বরে রোগীর অবস্থানুসারে এইগুলি ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইক্ষুর গায়ে কাদা মাখাইয়া আগুনের তাপে সেঁকিয়া লইলে উহার শ্লেষ্মাবর্দ্ধক শক্তি নষ্ট হয়, এইরূপ ইক্ষু ব্যবহৃত হইতে পারে।

জল।—তৃষ্ণা—জ্বররোগীর একটী উপসর্গ। কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জল বন্ধ করা উচিত নহে আয়ুর্ব্বেদে আছে—

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্বারিবারয়েৎ॥
অন্নেনাপি বিনাজন্তু প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্;
তোয়াভাবাৎ পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হয়, এবং মোহ হইতে জীবন ধ্বংস হয়, সুতরাং কোন অবস্থাতেই জল একেবারে ব

করা উচিত নহে। অন্ন আহার না করিয়াও অনেক কাল জীবন ধারণ করা যায়, কিন্তু পিপাসিত ব্যক্তি জল না পাইলে শীঘ্র তাহার জীবন নষ্ট হইতে পারে।

ঘর্ম, মূত্র প্রভৃতি দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, সুতরাং জ্বর রোগীকে যথেষ্ট জল পান করাইলেও ইহা ভিন্ন অনিষ্টের কোন কারণ নাই। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়, মুহুর্মুহু জল পানে রোগীর কষ্ট হয়, খুব শীঘ্র পরিপাক না হওয়াতে পেট ফাঁপিয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে তৃষ্ণা নিবারক ঔষধ ও মুষ্টিযোগাদি প্রয়োগ করা উচিত।

কিস্‌মিস্ এক ছটাক দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেকের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হইবে, উক্ত কাথে চারি তোলা খৈচূর্ণ, দুই তোলা মিছরি এবং এক তোলা মধু মিশাইয়া তৃষ্ণাকাতর রোগীকে পান করিতে দেওয়া যায়, এই কাথকে আয়ুর্বেদ মতে তর্পণ বলে যথা—

দ্রবেণালোড়িতা স্তেস্যুস্তর্পণং লাজশক্তবঃ।

তর্পণ পিপাসা নিবারক পুষ্টিকর এবং তৃপ্তিদায়ক।

মৌরী ভিজান ছাকা জলে অল্প মধু মিশ্রিত করিয়া সেই জল রোগীকে পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হইবে।

উক্ত জল শীতল করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘসা শ্বেতচন্দন মিশাইয়া তাহাতে মৌরীর পুটুলী ভিজাইয়া রাখিয়া রোগীকে দিলেও তাহার পিপাসা ও মুখশোষের শান্তি হইবে।

পানীয় জল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া লইলে উহাতে কোনরূপ ব্যাধির বীজাণু থাকিতে পারে না। বাত এবং পৈত্তিক জ্বরে প্রসিদ্ধ জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে কিন্তু শ্লৈষ্মিক জ্বরে যেখানে শ্লেষ্মার প্রকোপ বেশী, সে স্থলে অল্প অল্প গরম জল পান করিতে দেওয়া উচিত।

জ্বরে—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালীন পৈত্তিক জ্বরে দাহ আর একটী কষ্টকর উপসর্গ। রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া নাভির উপর পাতলা কাঁসার বা তামার বাটী রাখিয়া একটু উঁচু হইতে শীতল জল ঢালিলে শীঘ্রই দাহের শান্তি হয়, ইহাতে প্রবল বায়ু জনিত পেট ফাঁপাও দূর হয়।

কুকশিমার (কুকুরসোঁকার) রস অথবা মনসা সীজের পাতার রসে (আগুনে সেঁকিয়া রস বাহির করিতে হয়) যোয়ান বাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে গাত্রদাহের শান্তি হয়।

জ্বরে কষ্টদায়ক শিরঃপীড়ায় মুচকুন্দ ফুল জল সহ বাটিয়া কপালের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিবে।

নারিকেল ফুল, দারুচিনি ও লবঙ্গ অথবা শুধু দারুচিনি সহ বাটিয়া দুই রগে প্রলেপ দিলেও মাথাধরার শান্তি হয়।

মনসাসীজের পাতার রসে অথবা কাঁচা দুধের সহিত কালজীরা বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলেও অতিশয় কষ্টদায়ক শিরশূলও আরোগ্য হয়।

পুরাতন জ্বর। পুরাতন জ্বরে জ্বরকালে লঘু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে, পুরাতন জ্বরে লঙ্ঘন অবিধেয়, নূতন জ্বরে দুগ্ধ অনিষ্টকারী, কিন্তু পুরাতন জ্বরে উহা অমৃতের স্থায় কাজ করে।

জীর্ণ জ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং॥

কফের ক্ষয় হইলে পুরাতন জ্বরে দুগ্ধ অমৃতের স্থায় উপকারী, কিন্তু নবজ্বরে উহা বিষবৎ রোগীর প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

যে ক্ষেত্রে রোগীকে দুবেলা ভাত দেওয়া যায় না, সে স্থলে রাত্রে সুজী অথবা সুজী কিম্বা আটার রুটি—দুধ ও অল্প তরকারী সহ দেওয়া যাইতে পারে। সুজী বেশী জল দিয়া পাতলা করিয়া সুসিদ্ধ করিলে লঘুপাক হয় এবং ইহাতে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে। নূতন জ্বরেও ভাত দেওয়ার পূর্ব্বে এই পথ্য দেওয়া যায়। অনেকে পাঁউরুটীর ব্যবস্থা করেন, কিন্তু যে সমস্ত পাঁউরুটী আমাদের দেশে প্রস্তুত হয়, তাহা রোগীর পথ্য কেন, সুস্থ দেহীরও

খাওয়া উচিত হয় না, উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে উহাতে অম্ল হয়, সদ্যঃ প্রস্তুত পাউরুটী অপেক্ষা দুই এক দিনের বাসী রুটী ভাল। যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন হয়, দায়িত্ব সম্পন্ন শিক্ষিত কারিকরের পাউরুটী ছুরি দিয়া চাকা চাকা করিয়া আগুণে সেঁকিয়া (ইহাকে টোষ্ট করা বলে) দুধ অথবা মাছের ঝোল সহ রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে।

অনেকে বলেন, জ্বরে মৎস্য উত্তম খাদ্য নহে, উহা কফ পিত্ত জনক।

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণ মধুরাঃ কফপিত্ত করাঃ স্মৃতাঃ॥

কিন্তু অবস্থা বিশেষে ক্ষুদ্র মৎস্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ক্ষুদ্র মৎস্যাস্তু লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ।

ক্ষুদ্র মৎস্য লঘু, মল সংহারক ও গ্রহণী রোগে হিতকর। সুজি অথবা সাগু ও মসূর কিম্বা মুগের ডাল দিয়া খিচুরী প্রস্তুত করিয়াও এরূপ স্থলে রোগীকে দেওয়া যায়, ঘৃত না দেওয়াই উচিত। ইহাকে ওগরা বলে, পূর্ব্বকালে ইহার খুব প্রচলন ছিল, ইহাতে কিছু মসলা দিলে খাইতে বেশ সুস্বাদু হয়, ওগরা—সন্দিজ্বরে উত্তম পথ্য।

দেশে আজকাল কালাজ্বরের খুব বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে। ইহা জীর্ণজ্বর সদৃশ এবং ইহার পথ্যাপথ্য জীর্ণজ্বরের ন্যায় বলকারক হওয়া উচিত। সামান্য জ্বর থাকিতেও অনেকে ভাতের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায় তরুণ জ্বরের ন্যায় পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। এই সমস্ত ব্যাধির প্রথমে আমরা দুগ্ধ ব্যবহার করি না। অবস্থা বিবেচনা করিয়া সাগু, বার্লি, এরারুট এবং মসূরীর যূষ ব্যবস্থা করিয়া থাকি। ডালিম, বেদানা এবং উদরাময় না থাকিলে আঙ্গুর ফল স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত ব্যাধির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থায় যখন শ্লেষ্মা সরল হয়, গ্লানি অনেক কমিয়া যায়, এবং রোগেরও উপশম হইতে থাকে, তখন বার্লি ও সাগুর সহিত দুগ্ধ মিশিত করিয়া দেওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে এ অবস্থায় দুগ্ধ দেওয়া উচিত। তরুণ শ্লৈষ্মিক পীড়ায় যেস্থানে দুগ্ধ সুপথ্য নহে, অথচ রোগীর বলরক্ষার জন্য উহার প্রয়োগ নিতান্তই আবশ্যক হয়, যেস্থলে দুখানি তেজপাতা অথবা দুটি ছোট পিপুল অথবা শুঁঠের গুড়া সহ আগুনে জ্বাল দিয়া তাহাই দেওয়া উচিত।

আয়ুর্ব্বেদের প্রচার

(রাজবৈদ্য শ্রীশক্তিচরণ বিশারদ)

বর্ত্তমান সময়ে দিন দিন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিচিহ্ন চারিদিক হইতে দেখা যাইতেছে—প্রায় সকল প্রদেশেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য সরকারী বা বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ছাত্রের কোনও দিকে কিছু হইত না, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে দেওয়া হইত; সেই স্থলে আজকাল আয়ুর্ব্বেদ শিখিবার জন্য ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিয়া দলে দলে ছাত্র সকল আসিতেছে। দেশের লোকেরও এখন কবিরাজী চিকিৎসা করাইবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা একটু আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে। লোকের আগ্রহ বশতঃ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় স্থানে স্থানে কবিরাজ নিযুক্ত হইয়া দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। এমন

কি প্রাস্তীয় সরকার বাহাদুরও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা এতদূর উন্নতি হইলেও শিক্ষিত লোকের ভিতর এখনও আয়ুর্ব্বেদের প্রচার হয় নাই। রোগ হইলে প্রথমেই তাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। তাহাতে ফল না হইলে নিরুপায় হইয়া তবে কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হয়েন। কেবল সময় সময় পুরাতন রোগের বেলায় ডাক্তারী ছাড়িয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও এই ভাব সংক্রামিত হইয়াছে। গ্রামের লোকের মধ্যেও দেখা যায়, অসুখ হইলে ডাক্তার না মিলিলে সহরে ডাক্তারী চিকিৎসা করাইতে আসে। ফল কথা, যে পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির সূচনা দেখা যাইতেছে, সেই পরিমাণে জনসমাজে ইহার প্রচার এখনও হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদের অবনতির বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও সহজ প্রতীকারযোগ্য দুই একটি কারণ ও তাহার প্রতীকারের বিষয় আমরা আলোচনা করিব।

প্রায়শঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে লোকের মুখে এইরূপ অভিযোগ শুনা যায়, যথা—

(১) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্লুরিসি প্রভৃতি নূতন রোগে কার্য্যকরী নহে। ইহা কেবল আমাশয়, গ্রহণী ও বাতব্যাধি প্রভৃতি পুরাতন রোগেই ফলদায়ক হয়।

(২) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাতে সদ্যঃ ফল হয় না। ইহাতে ১৪ দিন অথবা কম পক্ষে ৭ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে তবে ফল হইতে পারে। কাযেই শূল, হাঁপানি, হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগেও তৎকালে ফল দিতে পারে না বলিয়া ঐ সকল রোগেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করান হয় না।

লোকের এই অভিযোগের মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা নূতন রোগে কার্য্যকরী হয় না, ইহা ব্যক্তিগত বা কুবৈদ্যের চিকিৎসা বিষয়ে সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিষয়ে এই অভিযোগ নিতান্ত অমূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ (১) সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, শত করা ৪৫ জন মাত্র ডাক্তারী চিকিৎসা পাইয়া থাকে। বাকী ৫৫ জনের মধ্যে নূতন পুরাতন সকল প্রকারেরই রোগ হইয়া থাকে।

(২) অনেক লোক এখনও আছেন, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন ডাক্তারী চিকিৎসা করান না। তাঁহাদের নূতন রোগে ফল না হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়া কবে ডাক্তারী চিকিৎসা ধরিতেন।

(৩) আবহমান কাল হইতে এদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা চলিয়া আসিতেছে। ডাক্তারীর নাম পর্য্যন্তও যখন শ্রুতিগোচর হয় নাই, তখন কি নূতন রোগ আরাম হইত না?

(৪) এখনও প্রাচীনা গৃহিণী যে সকল গৃহে বর্ত্তমান আছেন, সেখানে সামান্য মুষ্টিযোগ দিয়া তাঁহারা কত কঠিন কঠিন রোগ নিত্য আরাম করিতেছেন।

(৫) গত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সময় প্রায় শত করা ৯৫ জন এই চিকিৎসায় আরাম হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আশু ফলদায়ী হয় না— ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে প্রস্তুত ঔষধ যুক্তি পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে মন্ত্রের মত কার্য্য করে, ইহা আমরা প্রত্যহই অনুভব করিয়া থাকি। সেইগুলি ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করা হইবে। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই এইরূপ অনুভব বার বার হইয়াছে। তাঁহারা যদি সেই গুলি প্রকাশ করিতে মনোযোগ করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে লোকের কুসংস্কার বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই অপনীত হইতে পারে।

কবিরাজী ঔষধ ১৪ দিন বা ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে পর তবে ফল হয়।—এই কথা পুরাতন

রোগের পক্ষে সময় সময় সত্য হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র এই কথা সত্য নহে। দুঃখের বিষয় আজি কালি আয়ুর্ব্বেদের এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, কবিরাজেরা নিজেদের আচরণের দ্বারা লোকের এই অভিযোগ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, কবিরাজেরা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহা লক্ষ্য না করিয়া ১৪ দিন বা ৭ দিনের ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ অনেক সময়ই রোগের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। উহা লক্ষ্য না করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে সেই ঔষধ আরোগ্যের অন্তরায় হইতে পারে, শুধু তাহা নহে, সময় সময় রোগ বৃদ্ধি করিয়াও দিতে পারে। অবশ্য ইহাও দেখা যায় যে, রক্তদুষ্টি, দুর্ব্বলতা প্রভৃতিতে একই ঔষধ বহুদিন যাবৎ সেবন করিলে ফল হইবার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে ঐরূপ করাই বিধেয়। নতুবা অবিচারিতভাবে ১৪দিনের বা ৭ দিনের ঔষধ ব্যবস্থা করা অত্যন্ত অনুচিত। সকল চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য নিজের যশের জন্য ও সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া কি ফলাফল ঘটে—সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার অভ্যাস করেন।

এইরূপ অভ্যাস করিতে থাকিলে ভ্রমবশতঃ নিজের ব্যবস্থার ত্রুটি থাকিলে তাহার সংশোধন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আতুরেরও বহু কষ্টের লাঘব ঘটিবে। ডাক্তারেরা প্রায়ই প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে ইহাতে লাভ ব্যতীত লোকসান হয় না। কিন্তু প্রয়োজন না হওয়ায় পরিবর্ত্তন করিলে লাভ না হইয়া ক্ষতিরই সম্ভাবনা। "সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ" বলিয়া সকল ব্যবস্থাতেই দোষ আছে। তন্মধ্যে বিচার করিয়া ভুল অপেক্ষা বিচারপূর্ব্বক ভুল করা মন্দের ভাল। বিচারপূর্ব্বক ভুল হইলে কোনও সময়ে সংশোধনের আশা আছে, কিন্তু বিচার না করিয়া ভুল করিলে সংশোধনের আশা বড়ই অল্প।

আজ কাল নানা কারণে সমাজের শৃঙ্খলার অভাবে কবিরাজী চিকিৎসার ফলাফল লোকের মধ্যে জানাজানি হয় না বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। লোকের হৃদয় হইতে নানারূপ কুসংস্কার দূর করিতে হইলে রোগের অবস্থা ও চিকিৎসার ফলাফল ধারাবাহিকরূপে পত্রিকাতে প্রকাশ করা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় পত্রিকাতে চিকিৎসার ফলাফল প্রকাশ করিবার জন্য এক অংশ বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে ভাল হয়। ইংরাজী পত্রিকাতেও এই সকল প্রকাশ করিতে পারিলে বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা আছে। এই কার্য্য সকল চিকিৎসকই অনায়াসে করিতে পারেন। প্রত্যহ সকলেই রোগীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রোগীর বিবরণ ও চিকিৎসার ফলাফলগুলি প্রকাশ করিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

দুই তিনটি রোগের বিবরণ ও চিকিৎসার ফল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। রোগ **গণোরিয়া জনিত মূত্ররোধ**—কলিকাতার কোনও ধনীর সন্তানের গণোরিয়াজনিত মূত্ররোধ হয়। ৩৬ ঘণ্টা যাবৎ প্রস্রাব বন্ধ ছিল। তজ্জন্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া রোগী সমস্ত ঘরের মেজেতে গড়াইতেছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি ডাক্তারী শাস্ত্রের উপায় সকল অবলম্বন করিয়া বিন্দুমাত্র প্রস্রাব করাইয়া রোগীর যন্ত্রণার লাঘব করাইতে পারেন নাই। শেষে শলাকা প্রবেশ করাইয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। এমন সময়ে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ ডাক্তারের হাতে এই রোগী আসে। তিনি আমাদের কোন কোন ঔষধের গুণ জানিতেন, আতুরের দুঃখ নিবারণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া ডাক্তারীতে নিরুপায় দেখিয়া আমাদের নিকট হইতে "প্রাণবল্লভ" লইয়া ঐ রোগীকে প্রয়োগ করিলেন। একমাত্রা ঔষধ মন্ত্রের মত কার্য্য করিল। ঔষধ সেবনের ১৫,২০ মিনিট পরে ৩৬ ঘণ্টা যাবৎ অবরুদ্ধ প্রস্রাব নির্গত হইয়া রোগীর এত আরাম হইল যে, তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল।

সেই ডাক্তার ও রোগী এখনও সাক্ষাৎ হইলে আমাদের প্রাণবল্লভের যে শুধুই সুখ্যাতি করিয়া থাকেন তাহা নহে, অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া থাকেন। যথোক্ত বিধানানুসারে প্রস্তুত ঔষধ সুপ্রযুক্ত হইলে, এইরূপই মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করে।

২। রোগ—শিশুর নিউমোনিয়া—আমার একজন বন্ধু ৩।৪ মাসের শিশু লইয়া বড়দিনের পরে প্রয়াগে আসেন। বন্ধুটি প্রয়াগে পৌঁছিতে দেখা গেল—পথে ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুটির খুব জ্বর হইয়াছে, মাতার স্তন মুখে করিতেছে না এবং এক অব্যক্ত শব্দ অনবরত বাহির করিতেছে। পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, শিশুটির নিউমোনিয়া হইয়াছে,জ্বর ১০৪ ও নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হওয়ায় ঐরূপ অব্যক্ত শব্দ করিতেছে। আরও জানাগেল, এখানে আসিবার ৩।৪ দিন পূর্ব্ব হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। বন্ধুটি বদলি হইয়া দিল্লীতে যাইতেছিলেন। পথে শিশুটির ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তার করিয়া ছুটী লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কেবল মাত্র আমাদের চিকিৎসার কিরূপ ফলাফল হয়—দেখিবার জন্য এক বেলা তাঁহার সঙ্কল্প স্থগিত রাখিয়াছিলেন। বেলা ৭টার সময় দেখা গেল, শিশুটির জ্বর ১০৪, নিঃশ্বাস ফেলিতে ভয়ানক কষ্ট, হাত পা নীলাভ, অব্যক্ত শব্দ করিতেছে। দুই এক মাত্রা "অগরু কস্তুরী" সেবনের পর শিশুর যন্ত্রণা কিছু কমিল ও ঘুমাইয়া আসিল। অব্যক্ত শব্দ বন্ধ হইয়া গেল ও নিঃশ্বাসের কষ্ট অনেক কমিয়া গেল। ক্রমশঃ কমের দিকে যাইতেছে দেখা গেল। সে দিন ৩।৪ মাত্রা ঔষধ সেবন করান হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল—জ্বর ৯৯° হইয়াছে। সকল যন্ত্রণাই বেশ কমিয়াছে। বেশ স্তন পান করিতেছে। তাহার পরদিন অর্থাৎ এখানে পৌঁছিবার তৃতীয় দিন সকালে দেখা গেল—জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে। দুই এক দিনের মধ্যেই শিশুটি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া গেল। বন্ধুটিকে আর ছুটি লইতে হইল না। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিল্লীতে গিয়া কর্ম্মে যোগদান করিলেন।

৩। রোগ আধকপালি—পাঁচ সাত দিন যাবৎ একজন লোকের আধকপালি হইয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল। মাথা একটু নড়িলেই মনে হইত—যেন মাথা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল এবং কয়দিন পর্য্যন্ত ঘুমাইবার সামর্থ ছিল না। লোকটি অশিক্ষিত ও সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী হইলেও ডাক্তারী চিকিৎসাই ৫।৭ দিন যাবৎ করাইতেছিল। মাথায় মালিশ ও ঘ্রাণ লইবার ও সেবন করিবার ঔষধ ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া কিছুমাত্র ফল না হওয়ায় রাত্রিতে আমাদের নিকট আসে। তাহাকে শুঁঠ চূর্ণ, চিনি ও দুগ্ধ সহ মিলাইয়া দুইবার নাস লইবার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন রোগী আসিয়া বলিল, যে তাহার মাথায় যন্ত্রণা আর নাই বলিলেই হয়। কেবল মাত্র বসিবার সময় দমক লাগিলে মাথা একটু টন্ টন্ করে। সেই রোগীকে আরও দুই তিন বার পূর্ব্বোক্ত নাসের ব্যবস্থা করাতে সে আরাম হইয়া গেল।

উপসংহারে বক্তব্য, এই ফল দেখাইয়া মানুষকে যেমন বুঝান যায়, শত শত যুক্তির অবতারণা করিয়া তেমন বুঝান যায় না। এই জন্য কবিরাজ মহাশয়েরা যদি তাঁহাদের চিকিৎসার ফল গুলি প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাতে যেমন লোকের ধারণা হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইবে না।

বৃশ্চিক দংশনের কয়েকটি মুষ্টিযোগ

(কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মা বিদ্যানিধি-কাব্যভূষণ)

যে কোনও বিছায় কামড়াইলে

১। কিঞ্চিৎ লবণ জলে গুলিয়া শরীরের যে অঙ্গে বিছায় কামড়াইয়াছে, তাহার অন্ত অংশের চক্ষুতে অর্থাৎ বাম অঙ্গে কামড়াইলে দক্ষিণ চক্ষে ঐ জল এক ফোঁটা ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার শান্তি হয়।

২। আমরুল শাকের কল্ক (বোঁটা ও শাক) প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্ম জ্বালা নিবারণ হয়।

৩। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

৪। শ্বেত জবা বা করবীর বৃক্ষের মূল জ্বালা নিবারক।

৫। তেঁতুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

৬। লঙ্কা শুঁটি ও মরিচ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ভাল হয়।

৭। বকুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

৮। গব্য ঘৃত ও আকন্দের দুগ্ধ (আটা) ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে।

৯। যষ্টিমধুর চূর্ণ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।

১০। কাগজী লেবুর মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

১১। হরিদ্রা বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ভাল হয়।

১২। বকুল বৃক্ষের ছাল বাটিয়া প্রলেপ প্রয়োজ্য।

১৩। বেতকাষ্ঠ ঘষিয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে ভাল হয়।

১৪। ওলের ডাঁটা ক্ষত স্থানে প্রয়োজ্য।

১৫। রাজা শাকের পাতা চিবাইয়া দষ্ট স্থানে লাগাইলে উপকার হয়।

১৬। ছাগলের নাদি (বিষ্ঠা) জল সহযোগে লাগাইলে উপশম হয়।

১৭। গব্য ঘৃত উষ্ণ করিয়া সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া ক্ষত স্থানে প্রয়োজ্য।

১৮। কালকাসুন্দার নস্য মুখে করিয়া দংশিত স্থানে ফু দিলে ভাল হয়।

১৯। জীরা বাটা সহ উষ্ণ গব্য ঘৃত, মধু ও সৈন্ধব লবণ সহ (উষ্ণ করিয়া) বৃশ্চিক দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিবে।

২০। মনসা সিজের আঠা বা তেঁতুলের মাড়ি লাগাইলেও উপকার হয়।

২১। কানচিড়া পাতা বাটিয়া লাগাইলে ভাল হয়।

২২। আপাঙ্গের পাতা বা মূলের ছাল বাটিয়া ক্ষত স্থানে দিতে হয়।

২৩। পেঁয়াজ ছেঁচিয়া ক্ষত স্থানে তাহার রস লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

২৪। মুথা ঘাসের রস, তার্পিণ তৈল, কালকচুর আঠা ও পিঁয়াজের রস এই সকলের মধ্যে যে কোনও একটী দংশন স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয় এবং হিং জলে গুলিয়া বা পাথুরে কয়লা জলে ঘষিয়া অথবা তেঁতুল বীজের শাঁস হুকার জলে বাটিয়া লাগাইলে সর্ব্ব জ্বালা নিবারণ হয়। ইহা বিছা, মৌমাছি, বোল্‌তা ও ভীমরুল এই সকলেরই বিষের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

২৫। দোক্তা তামাক জল সহ ঘষিয়া দিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

২৬। লাউ গাছের মূল বাটিয়া লাগাইলে বৃশ্চিক দংশন জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

২৭। চিটে গুড় লাগাইলে অথবা কেঁচোর মাটির প্রলেপ দিলে দংশন জ্বালা দূর হয়।

২৮। তুলসী মূল বাটিয়া বড়িকা করিয়া দষ্ট স্থানে বুলাইলে বা কালমর্দ্দ মূল চিবাইয়া কাণে ফু দিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

২৯। এক মুষ্টি কুলপত্র, ১তোলা লবণ সহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবে। একটি চিমটা দ্বারা এক খণ্ড জলন্ত নির্ধূম অঙ্গার লইয়া তাহার উপর লাগাইয়া দিয়া স্বেদ দিবে। কিয়ৎক্ষণ স্বেদ দিলে অতি অল্প সময়েই উহার উৎকৃষ্ট বিষের জ্বালা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩০। যে বৃশ্চিক দংশন করে, তাহাকে ধরিয়া তাহার নাড়ীভুঁড়ি বাহির করতঃ জ্বালাস্থানে ঘষিয়া দিলে সহজেই সারিয়া যায়। যেখানে রোগ, সেইখানেই ঔষধ। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা।

৩১। বৃশ্চিক দংশন করিলে প্রথমে দষ্টস্থানে গুগ-গুলুর ধূম লাগাইয়া পরে আকন্দের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবৃত্ত হয়।

৩২। আকন্দের আঠায় পলাশ বীজ বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা দূর হয়।

৩৩। হুড়হুড়ে (সূর্য্যাবর্ত্ত) পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছা ব্যাঙ্ডানির যন্ত্রণা দূর হয়।

৩৪। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানের সমান দিকের কর্ণে হলুদজল দিলে ভাল হয়।

৩৫। কাঁকড়াবিছা বিঁধিলে বিদ্ধ স্থান অগ্নিদগ্ধ করিয়া দিবে। (বিছার ঔষধ কাঁকড়া বিছার দংশনেও প্রযোজ্য)।

৩৬। দুষ্টস্থান বেশী ক্ষত হইলে জ্বালা নিবৃত্তির জন্য ঘৃত মালিশ করিবে ও সম্পূর্ণরূপে বিষনাশ করিবার জন্য উড়ুম্বর রস দিয়া লাগাইয়া দিবে। গব্যঘৃত সেবন সর্ব্ব-প্রকার বিষনাশক হয় জানিয়া বিষসংসৃষ্ট ব্যক্তিকে কিছুদিন পুরাতন গব্য ঘৃত পান করাইলে আর বিষের প্রকোপ দেখা যায় না।

অজীর্ণ (Dyspepsia)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

৩। বিষ্টব্ধাজীর্ণ

ইহা একটী বাতিক ব্যাধি। নিদান সেবন জন্য বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশে স্থান সংশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে। সুশ্রুত বলেন "বিষ্টব্ধমাবদ্ধ বিরুদ্ধ বাতং" অর্থাৎ আবদ্ধ ও বিরুদ্ধ বাতকে বিষ্টব্ধ বলা হয়। আবদ্ধ বলিতে 'অপ্রবৃত্ত' এবং 'বিরুদ্ধ' শব্দে 'বিশেষভাবে রুদ্ধ' বুঝিতে হইবে। বিষ্টব্ধ এই কথাটী 'বিঃ+স্তব্ধ' অর্থাৎ বায়ু যে রোগে বিশেষ ভাবে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয় সেই রোগকে বিষ্টব্ধ কহে। 'ই' লের পর 'স' এর ষত্ব হওয়াতে 'ত' ও ট হইয়া বিষ্টব্ধরূপ প্রাপ্ত হইল। আবদ্ধ ও বিরুদ্ধ বায়ুকে বিষ্টব্ধ বলা হয়। আবদ্ধ শব্দে 'অপ্রবৃত্ত' যেখানে বায়ুর বহিরাগমনে প্রবৃত্তি নাই এবং বিরুদ্ধ শব্দের অর্থ 'বিশেষ ভাবে রুদ্ধ'। তাহা হইলে অপ্রবৃত্ত এবং অবরুদ্ধ বায়ু কোষ্ঠে থাকিয়া যে পীড়া উৎপাদন করে, তাহাকে বিষ্টব্ধাজীর্ণ কহে। অপ্রবৃত্তি এবং রোধ হইতে হইলে আবরণের আবশ্যক। সঞ্চিত মল বায়ুর অধঃপ্রবৃত্তি রোধ করিতে পারে, এই জন্যই বিষ্টব্ধাজীর্ণে মল ও বাতের অপ্রবৃত্তি হয়। প্রকুপিত বায়ু—রোগীকে কোষ্ঠে [illegible]

করে এবং তজ্জন্য আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন সেই কফ-ব্যাকুলিতানিল কর্তৃক আগ্মান ও প্রত্যাগ্মান (পেট ফাঁপা) উৎপাদিত হয়। বায়ুর অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন কোষ্ঠে শূল অনুভূত হয়।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে যে মলবাতপ্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে উহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, মল ও বাতের একান্ত নিরোধ, এখানে 'নঞ্'র ঈষৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া মল ও বাতের অসম্যক্ প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠে শ্লেষ্মাকে উদীরণ করে। মলত্যাগকালে আমরূপী শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল অল্প অল্প নির্গত হইতে থাকে এবং উদরে শূলবৎ বেদনা উপলব্ধি হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন"—কিঞ্চিদ্বিপকং ভৃশতোদশূলং বিষ্টম্ভমাবদ্ধ বিরুদ্ধ বাতং" ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বিষ্টব্ধাজীর্ণে খাদ্যদ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং ঐ পরিপাক জন্য যে অন্নরস প্রস্তুত হয়, তাহা যখন শরীরে শোষিত হয়, তখন উহার সহিত প্রকুপিত বায়ু শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উহার ফলে শরীরে নানাপ্রকার বাত বেদনা অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয় স্থানে (Brain) ঐ বায়ু গমন করিলে রোগীর মোহভাবও আসিতে পারে।

এই রোগে রোগীর যখন উদরে যন্ত্রণা হইতে থাকে, তখন উদরে "বিষ্ণু তৈল" মালিস করিয়া স্বেদ দিলে এবং গরম জলের সহিত "ভাস্কর লবণ" সেবন করিতে দিলে রোগী বিশেষ শান্তি লাভ করে এবং মল ও বাতের অপ্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য হরীতকী চূর্ণ।০ আনা, সৈন্ধব ৵০ আনা ও পিপুল চূর্ণ অর্দ্ধ আনা মিশ্রিত করিয়া গরম জল সহ সেবনীয়। আহারকালে প্রথম গ্রাসের সহিত ৵০ আনা হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ পর্য্যুষিত সহ এবং মৌরি ভিজান জল সহ বারম্বার সেবন করিলে বায়ু প্রশমিত হয়। চক্রদত্তোক্ত শার্দ্দূলকাঞ্জিক বিষ্টব্ধাজীর্ণের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই রোগে চাউল, মটর ডাল এবং রুক্ষ ও শীতগুণ-বহুল দ্রব্য পরিত্যাজ্য। স্নিগ্ধাহার অর্থাৎ ঘৃত-তৈলবহুল এবং মধুর রসবিশিষ্ট খাদ্য বিশেষ উপকারী। কিসমিস, খর্জ্জুর ও সুপক্ক পেঁপে নিয়মিত ভাবে ভোজন করিলে মল ও বাতের অবরোধ বিদূরিত হয়। বেল সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু উহাতে উদরের গুরুত্ব আনয়ন করে।

৪। রসশেষাজীর্ণ

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উক্ত নামে এক প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ আছে। রসশেষ জন্য যে অজীর্ণ—তাহাকে রস শেষাজীর্ণ বলা হয়। সমাস নিবদ্ধ রস ও শেষ এই দুইটী শব্দ লইয়া রসশেষ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আহার পরিপাক জন্য পচ্যমানাশয়ে উৎপন্ন যে সারভূত দ্রব পদার্থ, তাহার নাম রস। পূর্ব্বে পরিপাক প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, পচ্যমানাশয়ে যেমন যেমন পাক হয়, তখনই তাহা পিত্ত-তেজে শরীরে গৃহীত হইয়া থাকে এবং পুরীষ বিযুক্ত হয়, পরে শরীরের ভিতর ঢুকিলে পাক হইয়া মূত্র বিযুক্ত হইলে রস ধাতুতে পরিণত হয় উৎপন্ন অন্নরসের এই যে রস ধাতুরূপে পরিণতি, যদি কোনও কারণে তাহার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। অন্নপরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কোষ্ঠে ক্লেদক ও বোধক শ্লেষ্মা, পাচক পিত্ত, বায়ু ও বিট্ মিশ্রিত শরীরে গ্রহণোপযোগী দ্রব (অন্নরস) রূপে পরিণত হয়। এই সময় পাচক পিত্তের তেজে শ্লেষ্মা, পিত্ত, বায়ু ও দ্রব অন্নরস শরীরে শোষিত হয় এবং বিট্ বিযুক্ত হয়। শরীরে শোষণ হওয়ার পিত্ততাপে পাকপ্রাপ্ত হইয়া বায়ু, পিত্ত ও কফ স্ব স্ব স্থানে প্রেরিত হয় এবং মূত্র বস্তিমার্গে বহির্গত হইয়া যায়। তখন যে সারাংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই রসধাতু। "পিত্তং চতুর্ব্বিধমন্নপানং পচতি বিবেচয়তি দোষরসমূত্র পুরীষাণি" সুশ্রুত সূত্রস্থানে ২১শ অধ্যায়।

আহার যে সময়ে প্রায় পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া আইসে, সেই সময় যদি অধিক পরিমাণে জলপান করা যায়, বরফ প্রভৃতি অতিরিক্ত শীতল দ্রব্য সেবিত হয়, কিম্বা

পুনরায় আহার করা যায়, তখন পিত্ত কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য পূর্ব্বের অসম্যক্ পরিণত অন্ন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সেজন্য পাকক্রিয়া কমিয়া যায়। তাহার ফলে পুরীষ নিঃসরণ এবং শোষণক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। তখন সেই বিড়মিশ্রিত অন্নরস কোষ্ঠে থাকিয়া অন্নবিদ্বেষ এবং উদরের গুরুত্ব আনয়ন করে এবং মলনিঃসরণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। আবার অনেক সময় সেই বিড়মিশ্রিত অন্নরস অতিসার রূপে বহির্গত হয়। এই এক প্রকার রসশেষাজীর্ণ।

কোষ্ঠে পাচক পিত্তের কোনও প্রকার বিকৃতি হয় নাই, অন্ন সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্নরসও বিড়বিযুক্ত হইয়া শরীরে শোষিত হইয়াছে—এমন সময় অতিরিক্ত শীতস্পর্শাদি কারণে পিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং শোষিত অন্নরস হইতে দোষ ও মূত্রসার বিযুক্ত হইতে পারিতেছে না, তখন সেই সর্ব্বদেহে বিসৃত অন্নরস শরীরের গুরুত্ব, হৃদয়ের অশুদ্ধি, প্রসেক (মুখ দিয়া জল উঠা) কার্য্যে অনিচ্ছা, আলস্য, তন্দ্রা, মুখের স্নিগ্ধভাব, সন্ধিদেশে বেদনা এবং শিরোগৌরব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সকল রসই যে কোষ্ঠ হইতে যুগপৎ শোষিত হয়—তাহা নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যেমন যেমন পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তেমন তেমন শোষিত হয়। এই জন্য সকল অন্নরসই যুগপৎ অপক্ক থাকে না। কিছু অংশ অপক্ক থাকিয়া এই সকল লক্ষণ উৎপাদন করে। কিন্তু যদি অধিক মাত্রায় রস অপক্ক থাকে, তাহা হইলে এতদতিরিক্ত শ্বাস, জ্বর, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় এবং তাহা হইতে সকল রোগই উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে।

"তন্দ্রাতিবৃদ্ধে পুনর্শ্বাস জ্বর মূর্চ্ছানাদি চ ভবেৎ সর্ব্বাময়ক্ষোভনম্"—আরোগ্যমঞ্জরী।

এবম্বিধ অজীর্ণকে মোটেই উপেক্ষা করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে এবম্বিধ অজীর্ণ হইতে সকল প্রকার রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। এই রস দোষ সংপৃক্ত হইলে আমরস বলা হয়। সুতরাং দোষ সংপৃক্ত হইবার পূর্ব্বেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

"সমূলং সর্ব্বরোগানামাময় ইত্যভিধীয়তে"।

শরীরের মধ্যে আমরস সঞ্চিত হইলে অন্যান্য ধাতুও তাহার সংস্পর্শে আসিয়া দুষ্ট হয়। সুতরাং আমরসে পরিণত হইবার পূর্ব্বে চিকিৎসা করা একান্ত উচিত।

সুশ্রুত বলেন "রসশেষেতু শয়ীত"। দিবানিদ্রা এই রোগে হিতকর। কিন্তু অভুক্ত অবস্থায়। "অভুক্তস্য দিবানিদ্রা পাষাণমপি জীর্য্যতি"। চক্রদত্ত বাতবর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শীতস্পর্শ জন্য পিত্তের শক্তি কমিয়া যাওয়ায় এই রোগ উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য শীতবাতস্পর্শ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বায়ুকে এখানে উপলক্ষণ ধরিয়া সকল প্রকার শীতস্পর্শ বুঝিতে হইবে।

উদরের গুরুত্ব প্রভৃতি থাকিলে তাহাতে লবণ গরম জলসহ প্রযোজ্য। অতীসার দেখা গেলে রামবাণ অপামার্গের মূলের রস ও মধু সহ প্রযোজ্য। সর্ব্বদেহ বিসৃত অপক্ক অন্নরস জন্য অগ্নিতুণ্ডী—আদার রস ও সৈন্ধব লবণ সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। বজ্রক্ষার এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা মূত্র বিযুক্ত হইয়া যায়, ফলে অন্নরস রসধাতুতে পরিণত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্নাকাঙ্ক্ষা না জন্মে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই না খাওয়া ভাল। পরে লঘু পথ্য গ্রহণ করা উচিত। এ অবস্থায় জলপান করিতে হইলে গরম জলই ব্যবহার্য্য, উহা অতি সত্বর শরীরে শোষিত হইয়া মূত্র নির্গমের সহায়ক হয়।

এই চারি প্রকার অজীর্ণের বিষয় আয়ুর্ব্বেদে চিকিৎসার সহিত বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন "দিন পাকি" এবং "প্রতিবাসর" নামক দুই প্রকার অজীর্ণের উল্লেখ আছে। ইহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইহারা মন্দাগ্নির জন্যমাত্র, খাইলে একদিন বা এক বাসর অজীর্ণাবস্থায় থাকে বলিয়া অজীর্ণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।　　ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যরক্ষায় স্যার সুরেন্দ্রনাথ

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি, এ]

দেশপূজ্য জননায়ক পরলোকগত মনিষী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জীবন-সায়াহ্নে একখানি আত্মচরিত লিখিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ও গত পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় ইতিহাস দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। এই অমূল্য জীবনবেদ সকলকে পাঠ করিতে বলি।

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবি ছিলেন। ৮০ বৎসরের বেশী তাঁর বয়স হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কর্ম্মঠ ছিলেন, তাঁহার চিন্তা ও স্মরণশক্তি অক্ষুন্ন ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ও দীর্ঘায়ুর কারণ তিনি এই অপূর্ব্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যহীনতার এই দুর্দ্দিনে উহার সাহায্যে জাতীয় জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে অনুরোধ করি।

রাজা রাম মোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র, দেশভক্ত কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ ও স্বামী বিবেকানন্দ জীবন মধ্যাহ্নেই অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন পূর্ণভাবে জাতীয় সেবা কার্য্যে যখন নিয়োজিত হইল, কাল তখনই তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ এই অল্পায়ুর দেশে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া গিয়াছেন এবং জীবন সন্ধ্যায় বলিয়া গিয়াছেন—স্বাস্থ্য ও সুগঠিত দেহ জাতীয় উন্নতির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন—"Health and physique of a nation is the first condition of national greatness." কীর্ত্তিবীর্য্য, গলাবাজিপ্রিয় পল্লবগ্রাহী দেশপ্রেমিকদের এই ঋষিপ্রতিম নেতার কথা একবার ভাবিতে বলি। বাঙ্গালীর দৈহিক সামর্থ্য না থাকিলে জাতীয় জীবন ও গড়িয়া উঠিবে না। সকল দেশেই দেখা যায়, জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে আন্দোলন প্রবল হয়। এ বিষয়ে আমরা একেবারে উদাসীন। আমরা যেন কণ্ঠনালীর সাহায্যেই স্বরাজ লাভ করিব। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর জীবনে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করিয়াছেন। বাল্যে পিতার নিকট তিনি শরীর চর্চ্চার উপদেশ পাইয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহার পিতা গৃহে পালোয়ান রাখিয়া তাঁহাদের কুস্তি শিখাইতেন, তাঁহাদের বাড়ীতে আখড়া ছিল। কাপ্তেন জিতেন্দ্র নাথও এই আখড়ায় কুস্তি শিখিতেন। আমাদের অভিভাবকেরা পুত্র পরীক্ষায় পাশ করিলেই খুসী। জীবনে কঠোর পরীক্ষার জন্য পুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁহারা চান না, এ বিষয়ে ভাবেনও না।

সুরেন্দ্রনাথ সারা জীবন প্রাতে খালিপেটে আধঘণ্টা ও বৈকালে ৪০ মিনিট ব্যায়াম করিতেন। কার্য্যগতিকে সভাসমিতির জন্য বৈকালে ব্যায়াম করা সম্ভব না হইলে রাত্রে আহারের পূর্ব্বে ব্যায়াম করিতেন। বাল্যে ডাম্বেল মুগুর ভাঁজিতেন, পরবর্ত্তী কালে ডাম্বেল করিতেন ও ভ্রমণ করিতেন। ব্যায়ামবিমুখতা আমাদের বৈশিষ্ট্য; অজীর্ণ অম্বল তাই আমাদের নিত্য সঙ্গী।

সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন আমাদের ধাতুতে সহ্য হয় না। অসময়ে আহার, অপরিমিত আহার, অনিদ্রা অথবা রাত্রি জাগরণ করা আমাদের রীতি। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "Early to bed and early to rise makes a man heathy, wealthy and wise"—কিন্তু আমরা উহার ব্যতিক্রমেই যেন আনন্দ পাই।

সুরেন্দ্রনাথের জীবন অতিশয় সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। তিনি খুব প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতেন না, কিন্তু রাত্রি অধিক হইবার পূর্ব্বেই ৯টায় শয়ন করিতেন। তিনি জীবনে কখনও অনিদ্রায় কষ্ট পান নাই। তাঁহার মতে সুনিদ্রা

মস্তিষ্ক পরিচালনার সহায়তা করে, মস্তিষ্কের তেজোবৃদ্ধি করে।

তিনি বলিতেন—নিদ্রা যাইতে আমি ভালবাসিতাম, কখনও ৯।১০ ঘণ্টা ঘুমাইতাম; তাহাতে আমার মন সতেজ হইত। কোন চিন্তা—ভাবনা তখন আমি আসিতে দিতাম না, একটু অভ্যাস করিলেই মনঃসংযোগ করা যায়। আমি খুব ভোরে উঠিতাম না, কিন্তু খুব সকালে নিদ্রা যাইতাম, সুনিদ্রা রসায়নের মত কাজ করে—ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। তাঁর ইংরাজী শ্লোকটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—"Early to bed has been the inevitable practice of my life and to it I largely aseribe the good heath I enjoy. I usually sleep about 8 hours and sometimes extend it to nine or even ten hours. Sleep has been my greatest enjoyment. পাছে ঘুমের ব্যাঘাত হয় এই জন্য তিনি কখনও রাত্রের ভোজে যাইতেন না। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া থাকিলেও রাত্রি অধিক হইবার পূর্ব্বে সরিয়া পড়িতেন। এমন কি যে দিন বৌলাট আইনের আলোচনাতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল, তিনি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে বলিলেন যে, তিনি ৯টায় ঘুমান, কাজেই আর থাকিতে চান না। Lord Chelmford মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন "You are excused, Mr. Banerjea."

আর একটা ঘটনা ১৮৯৭ সালে বিলাতে ঘটে। তখন মহামতি গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথ একত্রে বিলাতে গিয়াছিলেন। একদিন গোখলে ধরিয়া বসিলেন যে, Sir Henry Irvingএর অভিনয় দেখিতে হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, দেখিতে পারেন কিন্তু ১১টার পর থাকিবেন না। গোখলে তাহাকে ১১টার মধ্যেই ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। Sir Henry Ireving অদ্বিতীয় হামলেটের ভূমিকাভিনেতা। তার অভিনয়ও চমৎকার হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এমনই নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁর ছিল যে, কিছুতে নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না। বিলাতে একদিন ছাত্রাবস্থায় মিঃ মর্লি বলিয়াছিলেন "সময় নষ্ট করিও না—নিয়ম ভঙ্গ করিও না।" সুরেন্দ্রনাথ গুরুর সে নিয়মানুবর্ত্তিতা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ুর অন্যতম কারণ মিতাচার। যে যুগে মদ্যপান শিক্ষার অঙ্গীভূত বিবেচিত হইত, যখন শিক্ষিতেরা মদ্যপান না করিলে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণিত হইত। তখনকার আবহাওয়াতে বর্দ্ধিত হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ [illegible] স্পর্শ করেন নাই। তিনি [illegible] বলিয়াছেন, মদ্যপান অথবা তামাক সেবন [illegible] জীবনকে তিনি উপভোগ করিয়া গিয়াছেন। মদ্য কমই হোক বেশী হোক পান করিলেই স্বাস্থ্য হানি হয়। "I have been a total abstainer from both (smoking or drinkiug) and cannot say that my enjoyment of life hass been less hearty than that of those who smoke or drink."

সুরেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, অটুট স্বাস্থ্যই তাঁর জীবনের এই সর্ব্বতোমুখী বিকাশের কারণ। সুস্থ দেহ যার নাই, সুস্থ মন তাঁর হইতে পারে না। দেহঘরটী যেন ভিত্তি, আর মন তার উপরে একটী সৌধ। বিবেক যার অক্ষুণ্ণ, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা যাঁর কম; [illegible] যিনি প্রীতি প্রেম আর শ্রদ্ধা পোষণ করেন, সুস্থ শরীর [illegible] তিনিই মাত্র অধিকারী হন, সুরেন্দ্রনাথ [illegible] মনের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন [illegible] আজ সমস্ত জাতি তাঁর কর্ম্মময়-বিরাট জীবনের [illegible] এত মুগ্ধ।

বিবিধ

যামিনী ভূষণ স্মৃতি সভা—গত ২৬শে শ্রাবণ কলিকাতা ১৭০নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ "যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল ভবনে" কলিকাতার সেরিফ কুমার শ্রীযুত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ শ্রীযুত শিবনাথ সেন, কবিরাজ শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীযুত অমৃতলাল কাব্যতীর্থ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি যামিনী ভূষণের বহু সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের উৎসব—গত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ২নং কাশীভূষণ দেব ষ্ট্রীটস্থ ডায়মণ্ড হোমিও মাধবাশ্রম ও ঈশ্বর ঘোষ চ্যারিটেবল ডিস্পেনসারীর প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসরে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ৭৬জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুই জন ব্রঙ্কাইটিস, দুই জন নিউমোনিয়া, দুই জন গণোরিয়া, দুই জন রিউম্যাটিজম ও একজন কলেরা রোগী ছিল। একটী নিউমোনিয়া ও একটী ব্রঙ্কাইটিস ব্যতীত সকল রোগীই আরোগ্য হইতে পারিয়াছে। আমরা এইরূপ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

শোক সংবাদ—আমাদের পরম হিতৈষী, আয়ুর্ব্বেদের একনিষ্ঠ সেবক চুঁচুড়ার স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা ও কবিরাজ শ্রীযুত শঙ্করীপ্রসাদ সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্থির প্রভা-দেবীর গত ১২ই শ্রাবণ মৃত্যু হইয়াছে। শ্রীযুত ব্রজবল্লভ রায় কন্যাগতপ্রাণ ছিলেন ও তাঁহার কন্যাও নানা সদ্গুণের অধিকারিণী ছিলেন। মৃত্যুকালে শ্রীমতী একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা কবিরাজ ব্রজবল্লভের মত পরম বন্ধুর কন্যার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করিয়াছি। শ্রীভগবান তাঁহার প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন।

পরলোকে নারায়ণ দাস—নদীয়া-কৃষ্ণনগরের 'বঙ্গরত্ন' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, ভারতী মহাশয়ের গত ১৭ই আষাঢ় মৃত্যু হইয়াছে। নারায়ণদাস বাবু একজন সু-সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভারতী, আর্য্যশাস্ত্র প্রভৃতি বহু পত্রিকার লেখক ছিলেন। তিনি সংবাদপত্র সেবীদিগের জীবনী সংগ্রহ করিয়া "বঙ্গরত্ন" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে বাহির করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

ক্ষীরোদ স্মৃতি সমিতি—গত ২২শে শ্রাবণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে পরলোকগত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের একটী শোকসভা হইয়া গিয়াছে। মাননীয় মহারাজা স্যার শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, রায়বাহাদুর ডাক্তার চুণীলাল বসু, শ্রীযুত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই শোক সভায় পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের স্মৃতিরক্ষা কল্পে "ক্ষীরোদ স্মৃতি সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে। স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর উহার সভাপতি,—অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুত মন্মথ মোহন বসু—সম্পাদক এবং শ্রীযুত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করি, ইঁহাদের চেষ্টায় ক্ষীরোদপ্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

বিলাতে—বৃটিশ-এম্পায়ার একৃজিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

একৃজিবিশন্-শাঁখা

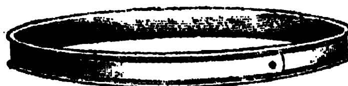
উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিনি সোনা এবং ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ইয়োলো-ব্রোঞ্জ স্বভাবতঃই সোনার মত রং, ব্যবহারে মলিন হয় না, হাতে দাগ লাগে না। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর এন্‌গ্রেভ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সোনা খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া আঁটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায় এই একৃজিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে। ইহা যেমন সুদৃশ্য, তেমনই মজবুত। ইহা শাঁখা ও চুড়ী দুই রকমের তৈরী হয়। নিম্নে চিত্র ও মূল্য-বিবরণ দেওয়া হইল।



একৃজিবিশন শাঁখা—(সিকি ইঞ্চি চওড়া) প্রমাণ জোড়া—১৮৸০, (।৶০ গিনি সোনা ৮৸০, শাঁখা ৪৲ মজুরী ৬৲) বালিকা সাইজ—১৫॥০ (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲) শিশু সাইজ—১২৸০ (।/০ গিনি সোনা ৬।০, শাঁখা ২॥০, মজুরী ৪৲)।

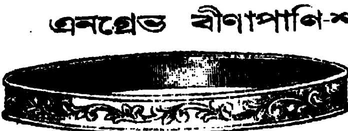
এই একৃজিবিশন্-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার; শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তি-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনায় মোড়া, সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত



প্রতিজোড়া—প্রমাণ ১০৲ টাকা, বালিকা সাইজ—৮॥০ শিশু সাইজ—৬৸০ স্পেশ্যাল,—প্রমাণ ১৩৲, বাঃ—১০৸৵০, শিঃ—৮।০

এনগ্রেভ বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তি-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার পুরু পাতে মোড়া চমৎ-



কার লতা ফুল এন্‌গ্রেভ করা। ১৭॥০ ১৪।০, ১১৲ টাকা।

গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় মোড়া, গৃহলক্ষ্মীদের মনের মত অলঙ্কার। প্রতি জোড়া—প্রমাণ ৭৲, বালিকা সাইজ—৫৲। ঐ চওড়া—প্রঃ ৮৲, বাঃ ৭৲, শিঃ—৬৲ স্পেশ্যাল প্রমাণ ১০৲, বালিকা—৮৸৵০, শিশু—৭।০।



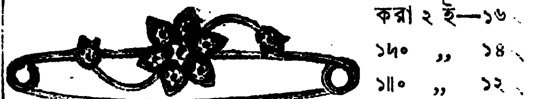
একৃজিবিশন্ চুড়ী—(চিত্রানুযায়ী সরু) প্রমাণ জোড়া—১৮॥০, (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, ফ্রেম ৫৲ মজুরী ৬৲)। বালিকা সাইজ—১৩৸০ (।/০ গিনি সোনা ৬।০, ফ্রেম ২॥০, মজুরী ৫৲)। শিশু সাইজ—১১৲ (।০ গিনি সোনা ৫৲, শাঁখা ২৲, মজুরী ৪৲)।

প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার একসেট চুড়ী ৪৯॥০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার এক সেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

সেপ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা ২ ই—১৬৲

১৸০ „ ১৪৲

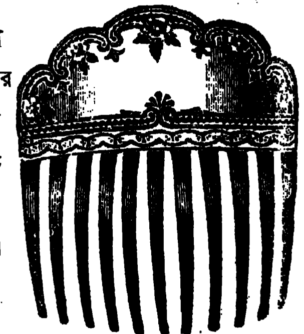
১॥০ „ ১২৲



তার-পেঁচ বালা—প্রমাণ ১৬৲, বালিকা—১৩৸৵০।

কল্যাণ চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে চমৎকার এন্‌গ্রেভ করা। ১১ দাড়া ১৭৲ ১০ দাড়া ১৪৸০ ৯ দাড়া ১২॥০ টাকা।



স্বত্বাধিকারী—
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃমন্দির-সম্পাদক

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

বিভিন্ন অলঙ্কারের ক্যাটালগ চাহিলেই পাঠান হয়।

আশ্বিন মাসের সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। মায়ের পূজা— ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস	৪৫৭
২। আয়ুর্ব্বেদের কথা— কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র দত্ত শর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী	৪৫৯
৩। খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ— কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এল, এ, এম, এস ...	৪৬২
৪। সম্পাদকের সাজি	৪৬৮
৫। কবিরাজ যামিনীভূষণের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য— ...	৪৭১
৬। কায়িক শ্রম— রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু সি, আই, ই	৪৭৪
৭। গণোরিয়া ও সিফিলিস— কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন ...	৪৭৮
৮। অজীর্ণ— কবিরাজ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ...	৪৮১
৯। রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়— ডাঃ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় সেন এম, বি ...	৪৮৫
১০। দুগ্ধ— কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ	৪৮৭
১১। পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ— কবিরাজ শ্রীযুক্তরজনীকান্ত শর্ম্মা কবিভূষণ ...	৪৯০
১২। প্রেরিত পত্র— কবিরাজ শ্রীযুক্তদিগেন্দ্র মোহন কর ...	৪৯২
১৩। বিবিধ	৪৯৩
১৪। পুস্তক পরিচয় ...	৪৯৬

Printed and Published by Brojendra Nath Chatterjee, B. A.—1, Telipara Lane, Calcutta.

Printed at Kusumika Press. 52/7 Bowbazar Street, Calcutta.



রাজকুমারী হেমলতা হোমিও মেডিকেল কলেজ।

৩৩নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট (কর্ণওয়ালিস বায়স্কোপের নিকট) কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী মানবের কি প্রভূত কল্যাণকর তাহা অজস্র লোক অবগত আছেন। যদি শুধু "ডিপ্লমা" লইয়া আত্ম প্রবঞ্চনার ইচ্ছা না থাকে, যদি এই অমূল্য শাস্ত্র এবং এতৎসহ যাবতীয় আনুসঙ্গিক চিকিৎসা বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জন করতঃ নিজের ও পরের পরমোপকার করিতে অভিলাষী হন তবে অবিলম্বে সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত রাজকুমারী হেমলতা হোমিও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করুন। ইহা রাজন্যবর্গ পৃষ্ঠপোষিত এবং প্রথিতযশা চিকিৎসকগণ পরিচালিত এবং ইহার একমাত্র লক্ষ্য সুচিকিৎসার বিস্তার সাধন। এখানে শব ব্যবচ্ছেদ, যাবতীয় তত্ত্ব নিদান, অস্ত্র চিকিৎসা, স্ত্রী-চিকিৎসা হোমিও ফিলজফি এবং হোমিও ভৈষজ্য বিজ্ঞান ইত্যাদির শিক্ষা প্রণালী অতুলনীয়। ৵০ টিকিট সহ পত্র লিখুন।

ডিরেক্টার—ডাঃ জে, এম্, রায়।

সেক্রেটরী, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক সোসাইটী ইত্যাদি।

অফিস—রমেন্দ্র ফার্ম্মেসী ১৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(সুলভে বিশুদ্ধ সর্ব্বপ্রকার হোমিও ঔষধাদি প্রাপ্তির স্থান)

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হইলে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন,
সম্পাদক—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার এজেণ্ট—

কলিকাতা বুকডিপো লিমিটেড,
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবিনোদবিহারি দত্ত
৮১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Rs. 20 Per Page.

পূর্ণ পৃষ্ঠা	...	...	...	১৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম		...	...	৯৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম		...	...	৫৲

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞাপনের মূল্য বাকী থাকিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১নং তেলিপাড়া লেন কলিকাতা।

বেনারসের এজেণ্ট—

শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশী বাণীমন্দির,
দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস।

ঢাকার এজেণ্ট—

শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি-এ
স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি ঢাকা।

কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের প্রণীত

আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান।

এই সুবিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ চারিখণ্ডে বিভক্ত, যথা,— সূত্রস্থান, শারীরস্থান, দ্রব্যস্থান ও নিদানচিকিৎসিত স্থান।

প্রথম খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের ইতিহাস, ঔষধ ও তৈলাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী। নাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষা, বমন বিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্ম। ধাতুদ্রব্যাদির শোধন ও জারণাদি, রাসায়নিক যন্ত্র ও শস্ত্রাদির আকৃতি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—শারীর যন্ত্র, শারীরনির্ম্মায়ক উপাদান সমস্তের সংস্থিতি, আকৃতি, ক্রিয়া ও প্রধান প্রধান শারীর যন্ত্রের চিত্র প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডে—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ব্যবহৃত দ্রব্য সকলের পর্য্যায়, গুণ, আময়িক প্রয়োগ, মাত্রা ও যাহার যে অংশ গ্রহণীয় ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ডে—প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সমস্ত বিশদ ও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। ২য়।৩য় খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা। চতুর্থ খণ্ডের মূল্য ৪৲ চারি টাকা একত্রে চারিখণ্ডের মূল্য ১০৲ দশ টাকা। মাশুলসহ ১০৸৵০ দশ টাকা চৌদ্দ আনা।

সটীক সানুবাদ মাধব-নিদান।

দুরূহ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে নিদান পাঠ যে অত্যাবশ্যক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের ইহা প্রথম ও প্রধান সোপান, সুতরাং ইহা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বা চিকিৎসা সম্যক্ কার্য্যকারক হয় না।

শিক্ষার্থীদের বুঝিবার জন্য সুগম ও সুখপাঠ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক বোধে, বিজয়রক্ষিত কৃত টীকা ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীন টীকা-টিপ্পনী পরিদর্শনপূর্ব্বক গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা গিয়াছে। পীড়া সমস্তের ইংরাজী নাম সংযোজিত করিয়া ইহাকে অধিকতর উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকখানি ডিমাই ৮ পেজী ৬০০ শত পৃষ্ঠায় উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কিত; সাধারণের সুবিধার জন্য ব্যয়ামুরূপই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা। ভিঃ পিঃতে ২৷৹ দুই টাকা আট আনা।

পুঃ মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

বি, এল, সেন এণ্ড কোং

৩৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। [আ।]

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন, কবিভূষণ (চিকিৎসক)

অর্ডার দিবার সময় কিঞ্চিৎ মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

আমাদের নববর্ষের শুভ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমাদের নূতন ডিজাইনে প্রস্তুত পোর্টেবল হারমোনিয়ম সুরের মাধুর্যে, গঠন-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়।

ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক।

সুলভে



সুদীর্ঘকাল স্থায়ী।

ফোল্ডিং অর্গান—সবে মাত্র নূতন আসিয়াছে। আপনি অন্য জায়গায় কিনিবার পূর্ব্বে একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের দোকানে শুভ আগমন করুন কিম্বা পত্র লিখুন।

দুলমিয়া এণ্ড কোং

হারমোনিয়াম, অর্গান ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র নির্ম্মাণকারক ও বিক্রেতা

পি—৮৩—সি, আশুতোষ মুখার্জ্জির রোড, ভবানীপুর কলিকাতা।

প্রাচ্য ভিষগ্ সম্মিলন

7th
CONGRESS OF FAR EASTERN
TROPICAL ASSOCIATION.

৫ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা অধিবেশন আরম্ভ।

রোগ নিবারণ, গবেষণার

ফলাফল বিবৃতি

ও

আলোচনার জন্য ইউরোপের মনীষিগণ

কলিকাতায় আসিবেন।

আপনি কি যোগদান করিবেন না?

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৩৪ | ১১শ সংখ্যা

মায়ের পূজা

(ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস্)

মরা মালঞ্চে ফুল ফোটার মত নিরানন্দ বঙ্গভূমে আবার আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পড়িল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, প্রাণে শান্তি নাই, রোগে শোকে, দৈন্যে-দুঃখে, আধি ব্যাধির সন্তাপ দগ্ধে বাঙ্গালীর স্বস্তি-সুখ বহুকাল হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাপক্লিষ্ট দেহ মন লইয়া বাঙ্গালী জাতি আজি একটি জড়পিণ্ডবৎ জাতি বলিয়া পরিগণিত। বাঙ্গালী হয় তো আগের তুলনায় এখন অনেক অর্থ রোজগার করে, কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় তাহার উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ অকিঞ্চিৎকর, ডাহিনে আনিতে তাহার বামে কুলায় না। সর্ব্বাপেক্ষা রোগের জ্বালা – বড় জ্বালা, এ জ্বালা যে পূর্ব্বে তাহার ছিল না, এমন নহে, এখনকার দিনে ডাক্তার-বৈদ্যও যত বাড়িয়াছে, আগে অবশ্য এতটা ছিলনা। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আগে কড়ি কম ছিল, সেই জন্য বাঙ্গালী রোগ হইলে এত ডাক্তার-বৈদ্যের ধারও ধারিত না। রোগ হইত বটে, কিন্তু অনেক সময় সামান্য সামান্য জ্বরজ্বালায় উপবাস দিয়া,—একটু আদার রস, বেলপাতার রস, তুলসী পাতার রস খাইয়া আপনা আপনিই ভাল হইয়া যাইত, একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইলে বৈদ্যকে ডাকা হইত, কিন্তু এখনকার মত এত দর্শনী বা ভিজিট দিতে হইত না, বড় লোকের পক্ষে এক টাকা দর্শনীই যথেষ্ট ছিল, গরীব লোকের নিকট বৈদ্য ।৹ আট আনা, অবস্থা অতি খারাপ হইলে বিনা দর্শনীতেও তাহার চিকিৎসা করিতেন। এখন ম্যালেরিয়ায় প্রতিদিন দশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অজীর্ণ প্রায় নিরানব্বই জনের, থাইসিসে বহু সংখ্যক লোক পীড়িত, শিশু মৃত্যু এবং মহিলা মৃত্যু এখন সকল রোগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, আগে অবশ্য এরূপ ছিল না। ফলে বাঙ্গালীর এখন নিত্য নৈমিত্তিক বিস্তর খরচের মধ্যে রোগের খরচ ভীষণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যয় বাহুল্যের তাড়নায় বাঙ্গালী ক্লিষ্ট—পীড়িত। এই দারুণ পীড়নের মধ্যে আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া বাঙ্গালী পরমানন্দে আত্মহারা হইবে—না এত বড় আনন্দের দিনে তাহাকে আরও নিরানন্দ হইতে হইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়।

আমাদের মনে হয়, এখন বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এত বড় আনন্দের দিনে তাহার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই যেন অধিক ভাবে স্থান পাইয়া থাকে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অনেকেই যাহা উপার্জ্জন করেন,

সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া তাহার একটি পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারেন না। এ অবস্থায় মহাপূজার অধিকারী হইবার সৌভাগ্য লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটুক আর না ঘটুক, নূতন কাপড়, নূতন জামা, নূতন জুতা প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্যও তাহার যে অর্থ খরচ হয়, তাহার জন্যও তাহাকে কম বিব্রত হইতে হয় না। যাঁহারা কোনোক্রমে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের এ সময় বৈবাহিক-প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উৎকট চিন্তা। ফলে এই অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসাসমস্যায় দারুণ দুর্দ্দিনে প্রতিবৎসর পূজার সময় নিদারুণ দুশ্চিন্তায় অধিকাংশ বাঙ্গালীরই যে শরীর ক্ষয় হইতেছে, ইহার প্রতীকার কি?

ইংরাজী শিখিয়া বাঙ্গালী জাতি যখন প্রথম সভ্য হইল, শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে তখন যথেষ্ট পরিমাণে সুরাদেবীর সাধনা চলিয়াছিল। এমন এক সময় আসিয়াছিল, যে সময় সুরা সেবন না করিলে সভ্যসমাজে নাম লিখাইবারই উপায় ছিল না। কালস্রোতে সেই কদর্য্যপ্রথা বাঙ্গালী সমাজ হইতে উঠিয়া যাইল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পোষাকে-পরিচ্ছদে, বাবুয়ানি-বিলাসিতায়, আচারে বিচারে যে বাঙ্গালী চিরাচরিত প্রথার অনুবর্ত্তী না হইয়া অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীর যুগে সে ভাবের অনেকটা অপনয়ন ঘটিয়াছে। বিলাসী-বাঙ্গালী আগে সিগারেটে বহু অর্থ ব্যয় করিত, এখনো তাহা উঠিয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখেও এখন সিগারেটের পরিবর্ত্তে বিড়ি দেখিতে পাই। মোটা খদ্দর পরিধানে অনেক বাঙ্গালীই এখন গৌরব অনুভব করেন, গোলামী করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা না করিয়া অনেক বাঙ্গালী যুবক এখন ব্যবসায় শিক্ষার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এ সকল পরিবর্ত্তন আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাসটা যেরূপ মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, সে অভ্যাসের পরিবর্ত্তন বাঙ্গালীর এক দিনে যাইবে না। সেই জন্যই জগজ্জননী-ত্রিতাপনাশিনী-পরমানন্দময়ী মায়ের আগমনের সাড়া পাইয়া বাঙ্গালী কোথায় উল্লসিত হইয়া পড়িবে, না নূতন চিন্তায় তাহাকে আরও ক্লিষ্ট—কাতর হইতে হইতেছে।

কিন্তু এ দুশ্চিন্তা বৃথা বাঙ্গালি। আর্য্য ঋষি যে যোগ শিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্রেই যোগের সকল কথা পরিস্ফুট। "চিত্তের বৃত্তির নিরোধের নামই হইল যোগ।" আমরা এই বৃত্তির নিরোধ করিতে জানি না বলিয়াই তো আমাদের এত দুঃখ। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে 'অভাব' বলিয়া কোন জিনিষই নাই,—অভাব মনে এই অভাবকে যদি আমি মনে স্থান দান না করি, তাহা হইলে তো আমি পরম সুখী। আমার যাহা নাই, যাহা বিশ্বনিয়ন্তা প্রদান করেন নাই, তাহা জোর করিয়া পাইবার জন্য যদি আমি কামনা না করি, তাহা হইলে আবার আমার অভাব কি? অভাব বোধ না হইলেই তো দুঃখ-জ্বালা পাইতে হইবে না। এই অতি সত্য কথাটি বুঝিনা বলিয়াই তো আমাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ এবং এই কষ্ট বা দুঃখ হইতে যে আমরা শারীরিক শক্তির অপচয় করিয়া থাকি, ইহাও যথার্থ।

সেই জন্য বলি অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালি। মাতৃ পূজার এই পরম উৎসবের দিনে অভাব উপলব্ধি না করিয়া নূতন শক্তি লাভ করিবার চেষ্টা কর। মা যে আমার মঙ্গলময়ী, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, দৈত্য এবং রাক্ষসের অত্যাচার হইতে দেশের অধিবাসীবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য, কোন্ স্মরণাতীত কালে তিনি আবির্ভূতা হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। রাবণের মত অত বড় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাক্ষস-সংহারের শক্তি রামচন্দ্র অর্জ্জন করিয়াছিলেন—এই মহাশক্তির নিকট। এই মহাশক্তির পূজা ঘটিয়াছিল—ভারতের বাহিরে—লঙ্কা দ্বীপে—আধুনিক সিংহল প্রদেশে। রামচন্দ্র অযোধ্যাপতি এজন্য এই পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেরূপ ভাবে এই পূজার প্রচার হইয়াছে, এমন আর সারা ভারতের কোন স্থানে নহে। বাঙ্গালি! তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ এই মহাপূজার আনন্দে

আত্মহারা হইয়া উঠিতেন। বিজয়ার পর সম্বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী সংসারে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য আবার পূজার অনুষ্ঠান চলিত, রথের সময় পাটায় সিন্দূর চন্দন দেওয়া হইত—তাহাও কত ঘটা করিয়া। তারপর ক্রমে পূজার দিন যতই নিকট হইত, বাঙ্গালীর আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। গ্রামে-গ্রামে, ঘরে ঘরে তখন এইরূপ আনন্দ চলিত। বাঙ্গালীকে তখন তো বড় একটা বিদেশে বাস করিতে হইত না। এখন পল্লী ভাঙ্গিয়া সহর হইয়াছে, কিন্তু তখন অনেক স্থানের এক একটা পল্লীও ছিল যেন এক একটা ছোটখাট সহরের মত। সকালে বিকালে সুকুমারমতি শিশুবৃন্দের হাস্য কোলাহল, যুবক এবং বৃদ্ধদিগের তাস-পাশা দাবার মজলিস্, দীর্ঘিকা পুষ্করিণীর সোপানাবলীর উপর মহিলাকুলের মধুর গুঞ্জনে যেন সকল পল্লীকেই জীবন্ত করিয়া রাখিত। পল্লীর শেষ সীমায় কতকগুলি ইতর ও অসভ্য জাতির আবাস স্থল ছিল—তাহারা লেখা পড়ার ধার ধারিত না, কিন্তু লাঠি খেলায় তাহারা এক একজন অসাধারণ বলবান ছিল। পল্লীতে কোন বিপদ ঘটিলে ইহারাই দেশের রক্ষা করিত।

ফলে এই অবস্থার ভিতর দিয়া তখনকার দিনে বাঙ্গালাদেশে মহাপূজার আয়োজন চলিত। এই মহা-পূজার উৎসবে মহাশক্তিকে পাইয়া বাঙ্গালী জাতি সত্য সত্যই একটা নূতন শক্তি অর্জ্জন করিত। এখনকার বাঙ্গালি! তুমি আর পূর্ব্বের প্রথায় স্থিত নও, এখন তুমি পল্লী ছাড়িয়াছ তোমার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বের ভাব বিগড়াইয়া ফেলিয়াছ, তুমি এখন অন্যপন্থী,—এই অন্য পন্থার অনুসরণই কিন্তু তোমার শক্তিক্ষয়ের কারণ;—রোগ-রাক্ষসগণও অবসর বুঝিয়া তোমাকে সেই জন্য পাইয়া বসিয়াছে। তাই বলি, মহাশক্তির এই পূজার উৎসবে ম্রিয়মাণ হইও না। বাঙ্গালি! দৈন্যদুঃখ, সন্তাপ-জ্বালা, অভাব অসুবিধা কয়দিনের জন্য ভুলিয়া যাও, কয়দিনের জন্য সাংসারিক সকল বিষয় ভুলিয়া মাতৃপদে মনোনিবেশ কর, দেখিবে তুমি আবার নূতন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, নূতন সামর্থ্যে বীর্য্যবান হইয়া, নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সকল করণীয় ব্যাপারে বিশ্ব বিজয় করিতে সমর্থ হইবে। দীনতারিণী যাঁহার নাম, দীনহীন বাঙ্গালী জাতি যদি তাঁহার করুণা লাভ না করে, তাহা হইলে যে তাঁহার নামের মহিমা থাকিবে না। বাঙ্গালি! সেই জন্য বলি, উঠ, জাগ, নব শক্তি লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও নব বলে বলীয়ান হইয়া, নব শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নূতন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হও, তোমার সকল সঙ্কল্পে যে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

আয়ুর্ব্বেদের কথা

(কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত শর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদতীর্থ শাস্ত্রী)

'আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতেঽনেন বা আয়ুর্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ'—যে শাস্ত্রে আয়ু বিদ্যমান আছে বা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আয়ুর জ্ঞান হয়, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বলে। আয়ুর্ব্বেদই পৃথিবীর একমাত্র আদি চিকিৎসা শাস্ত্র। অথর্ব্ববেদান্তর্গত ভারতীয় আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত এক সময়ে এ বিদ্যার অন্যত্র অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। বহু প্রাচীন যুগে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য-ঋষিগণের কঠোরতম সাধনার ফলে এই ভারত-বর্ষেই বেদশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে তাহাই অবলম্বিত হইয়া নানা দেশে নানা ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। 'হিপক্রেটাস' গ্রীকগণ যে ভারতবর্ষের কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ভারতীয় চিকিৎসকগণকে পৃথিবীর গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়েই

একমাত্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গণ্য ছিল এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল। মিশর, ব্যাবিলন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, আরব, চীন প্রভৃতির পণ্ডিতগণ শিক্ষার্থীরূপে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইতেন। গ্রীকগণও আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিখিবার জন্য তথায় আসিতেন। তখনকার আয়ুর্ব্বেদবিৎ চিকিৎসকগণ আয়ুর্ব্বেদের (১) শল্য, (২) শালাক্য, (৩) কায়-চিকিৎসা, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমারভৃত্য, (৬) অগদ, (৭) রসায়ন ও (৮) বাজীকরণ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদেই পারদর্শী ছিলেন। যে শল্য চিকিৎসা বর্ত্তমানে বৈদ্যগণের আবৃত্তির জিনিষ মাত্র, সেই শল্য চিকিৎসার জন্য এক সময়ে হিন্দু চিকিৎসক গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে স্থান পাইয়াছিলেন। তৎকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যে শল্য চিকিৎসায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। "সুশ্রুত সংহিতা" পাঠ করিলেই তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। শল্য চিকিৎসার জন্য সুশ্রুতে যে সকল অস্ত্র, শস্ত্র ও যন্ত্রাদির (Sargical Instruments) উল্লেখ আছে এবং জ্বরবিকার, প্লীহা, যকৃৎ, শিরঃপীড়া, হলীমক প্রভৃতি কায় চিকিৎসার অধিকারভুক্ত ব্যাধির প্রশমনের জন্য সুশ্রুতে শল্য চিকিৎসার যে বিধান আছে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। শল্যতন্ত্রের বিধান অনুসারে কায়চিকিৎসা—শল্যতন্ত্রের প্রধান বিকাশ ক্ষেত্র ইয়ুরোপও অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে 'ইঞ্জেকশান' দ্বারা ঔষধ প্রয়োগের যে বিধান হইয়াছে, সেই কার্য্য আয়ুর্ব্বেদের 'প্রচ্ছানক্রিয়া' দ্বারা সম্পন্ন হইত। 'ষ্টেথেস্কোপ' প্রভৃতি আকর্ষণ যন্ত্র না থাকিলেও সূক্ষ্ম শব্দ শুনিবার যে কোন উপায়ের তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা মহর্ষি সুশ্রুতের ক্ষতের অভ্যন্তরের কুক্কুর বিড়ালের কণ্ঠের অতি সূক্ষ্ম অস্পষ্ট ঘুর্ ঘুর্ শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। শরীরে যে চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম ক্রিমি (জীবাণু) জন্মায় এবং বর্ত্তমান আছে, তাহা জানিবার বা দেখিবার জন্য অধুনা আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র না থাকিলেও তৎকালে যে কোন উপায় বা কার্য্য সম্পন্নের কোন যন্ত্র ছিল না—তাহা কে বলিতে পারে? না থাকিলেই বা শরীরে যে সাড়ে তিন কোটী স্থূল ও সূক্ষ্ম নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহার জ্ঞানই বা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল?

আয়ুর্ব্বেদ যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদে কোন বিষয়ের অভাব নাই। আর্য্য আয়ুর্ব্বেদকে বাদ দিয়া কখনও কেহ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। পরেও পারিবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বর্ত্তমানে যাহা নূতন বলিয়া আমাদের মনে হয়, তাহা নূতন নহে—রূপান্তর মাত্র। ঘসিয়া মাজিয়া পিটিয়া আয়ুর্ব্বেদকেই ভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যদি অষ্টাঙ্গে পারদর্শী হইয়া বর্ত্তমান থাকিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কখনই এ দেশে এতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ পুঁথিগত বিদ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া "অহং সর্ব্বজ্ঞ" হইয়া পড়িয়াছিলেন কোন বিষয়ের কোনরূপ গবেষণাদ্বারা উন্নতির চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মাত্র কায়চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এই হেতু সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিপ্রয়াসী পাশ্চাত্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্গণ আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা এতৎ সম্বন্ধে যতদূর চেষ্টা করিতেছেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ যদি তাহার শতাংশের একাংশও করিতেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হইত।

দেশের বা জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষাই দেশের বা জাতির প্রাণ। যে দেশের বা জাতির বিশিষ্টতা নাই, সে দেশ বা জাতি মৃত। প্রত্যেক দেশের যাহা কিছু নিজস্ব আছে, তাহাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। পৃথিবীর অবলম্বনীয় আয়ুর্ব্বেদের মত আমাদের বিশিষ্ট নিজস্ব কিছুই নাই। অথচ ঐ আয়ুর্ব্বেদই আজ আমাদের নিকট অবহেলাপ্রাপ্ত,

সংকীর্ণ ও শিক্ষা দীক্ষার অভাবে বহু বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত। সাদরে সংকীর্ণতা দূর করিয়া লুপ্ত বিষয়ের উদ্ধারের দ্বারা জীর্ণ-শীর্ণ আয়ুর্ব্বেদকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিলে তবে আমাদেরও বাঁচা সম্ভব হইবে। আয়ুর্ব্বেদের যে অংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ ভুলিয়া গিয়াছেন, অথচ সেই অংশ যদি আর কেহ জানিয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিকট সেই অংশ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যদি ঐ অংশ রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তাহা জানিয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইলে ইংরাজ গুরুর যে আবশ্যকতা আছে, তাহা জ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করেন। বিশেষতঃ বিস্মৃত-শল্যতন্ত্রের চিকিৎসাজ্ঞান ইংরাজগুরু ভিন্ন জানিবার এখনকার অন্য উপায় নাই। তবে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রতীচ্যের অতীত বিদ্যাকে প্রাচ্যই করিয়া তুলিতে হইবে। পরে যেন প্রাচ্য—প্রাচ্যই থাকে। প্রাচ্যের লুপ্ত গৌরব অক্ষুণ্ণ প্রতাপ আবার যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া জগতের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যতদিন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এ দেশের একমাত্র অবলম্বন ছিল, ততদিন এত অকালমৃত্যু ছিল না। যত নব নব চিকিৎসার এদেশে আমদানি হইতেছে, তত যেন আমরা মৃত্যুকে আহ্বান করিতেছি। এক আয়ুর্ব্বেদের সূত্র লইয়া পাশ্চাত্য ছাঁচে পরিবর্ত্তিত পাশ্চাত্যের ভেষজে প্রস্তুত ঔষধ এদেশের জীবন রক্ষার সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না। আমিরিকার বিখ্যাত ডাক্তার ক্লার্ক এম, ডিও স্বীকার করিয়াছেন যে, চরকের চিকিৎসা প্রচলন থাকিলে পৃথিবীতে এত অকালমৃত্যু হইত না।

পূর্ব্বের তুলনায় চিকিৎসক সংখ্যা এদেশে এখন বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগে যেস্থানে চারি পাঁচ খানা গ্রাম খুঁজিয়া একজন কবিরাজ (তাও আবার হাতুড়ে) মিলিত, আজ সেই স্থানে নানারকমের শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব নাই, তথাপি কেন এত অকালমৃত্যু? কেন এত মড়ক-মহামারী? গ্রামকে গ্রাম কেন শ্মশানে পরিণত হইতেছে?

কিন্তু অশিক্ষিত হাতুড়ে কবিরাজের পরিবর্ত্তে শিক্ষিত উপাধিধারী নানা রকমের চিকিৎসকের আমদানীতে দেশের কতদূর মঙ্গল আমরা পাইতেছি বা পাইয়াছি? আগেকার অশিক্ষিতা গৃহিণী ও অশিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্তিগণ (এখনকার মত স্কুল বা কলেজে তাঁহারা পড়েন নাই এবং তাঁহাদের কোনরূপ উপাধিও ছিল না) আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেন। বিশেষ কঠিন না হইলে কেহ বৈদ্যের বাড়ীতে যাইত না। (এই লেখকের প্রপিতামহীই তাঁহার পল্লীর একমাত্র চিকিৎসক ছিলেন, তিনি লেখা পড়া জানিতেন না বলিলেই হয়, অথচ তখনকার দিনে তিনি কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিতেন। শুনা যায়, আমার প্রপিতামহ অপেক্ষা তাঁহাকে পাড়ার লোক বেশী বিশ্বাস করিত।) সকল স্ত্রীলোকই তখন মোটামুটী সন্তান পালন, শিশু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম অবগত ছিলেন। আজ যে হাঁচিলে, কাসিলে, মাথা ধরিলে আমরা এখনকার সুচিকিৎসকের (ডাক্তারের) শরণাপন্ন হই, প্রাথমিক অবস্থাতেই শিক্ষিতের চিকিৎসায় থাকি, তথাপি কেন ঘরে ঘরে আর্ত্তের হাহাকার! নগরে নগরে, পাড়ায় পাড়ায় মড়া মহামারীর তাণ্ডব নৃত্য!

চরকে যে "যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতং" যে দেশের যে জীব, সেই দেশজাত ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর—এই বাণী দেখিতে পাই, বাস্তবিকই ইহা কি সত্য? অন্য দেশের ঔষধ কি তবে আমাদের পক্ষে হিতকর হইতেছে না? উত্তর—নিশ্চয়। ত্রিকালদর্শী আর্য্য ঋষিগণের উক্তি কল্পনাপ্রসূত নহে। বাংলাদেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কোন দেশে পরিণত হয় নাই, সেই মাঠ—মাটী—সেই অভ্রভেদী হিমালয়, গঙ্গা দামোদর নদী ও নদ, অতীতের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ—সবই আছে। তবে কি জন্য এই পরিবর্ত্তন? যে দেশকে পূর্ণসুখ, পূর্ণ স্বাস্থ্য, একদিন শান্তির আধারে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই

দেশের শতকরা নিরানব্বুই জন কেন আজ কঙ্কালসার; তখন কি মশক ছিল না? মূষিক ছিল না? যে মশক বা মূষিক ম্যালেরিয়া বা প্লেগ মহামারী রূপে এ দেশকে এখন ধ্বংস করিতেছে? আজ মশক-মূষিক আমাদের পক্ষে শমনের অনুচর হইয়াছে।

দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী নেতৃগণকে সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। স্বাধীনতার সংগ্রামে যে সব নেতা আপনাদের জীবনকে পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে দেশের জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জীবন রক্ষায় আমরা কি কম পরাধীন হইয়া পড়িয়াছি? এই পরাধীনতা ঘুচাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে এ দেশ অকাল মৃত্যু—অকাল বার্দ্ধক্যের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে আর আয়ুর্ব্বেদেরও প্রতিষ্ঠা হইবে। কম অর্থ এ দেশ হইতে একমাত্র চিকিৎসা ব্যপদেশে বিদেশে যায় না। আয়ুর্ব্বেদকে পূর্ব্বের মত আমাদের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠ করিতে পারিলে, কম অর্থ এ দেশে থাকিবে না। বস্ত্রের মত ঔষধও ত আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়। অথচ ঐ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধের কোন উপায়ের আন্দোলন কোন নেতার মুখে শুনা যায় না। আগে দেশকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করুন—তারপর অন্য কিছু ভাবিবেন। এই মৃতপ্রায় জাতির জীবন-প্রতিষ্ঠায় নিশ্চেষ্ট থাকিলে, বাঙ্গালীর নাম পর্য্যন্ত যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রকৃত পক্ষে—কঙ্কালসার মরণপথের পথিক বাঙ্গালীর,—এ অবস্থায় আগে যাহাতে ইহার পরিবর্ত্তন হয়, ত তাই করা কর্ত্তব্য। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিয়া চীৎকার করিলে এরা উঠিবে না বা জাগিবে না। তাই সকল আন্দোলনের অগ্রে চাই স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলন, আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা নির্জ্জীব জাতিকে প্রাণ দান। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অনাস্থাই এ জাতিকে শক্তি-সাহস-উৎসাহবিহীন অকাল বার্দ্ধক্যে পঙ্গুপ্রায় করিয়াছে।

প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককেও দেশের মঙ্গলার্থে আত্ম নিয়োগ করিতে হইবে। মূল্যাল্পতার জন্য কয়েক বৎসরের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ঘরে ঘরে স্থান লাভ করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদের সময়োপযোগী সংস্কার, দারিদ্র্য পীড়িত বাঙালীর ব্যবহারের জন্য মূল্যের অল্পতা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সকলে দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও অকাল বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যুর করাল ক ল হইতে দেশকে উদ্ধারের জন্য আয়ুর্ব্বেদকে ঘরে ঘরে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হউন। দেশের মতি গতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ফিরিয়াছে, চেষ্টা করিলে এ আন্দোলন সত্বর সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারিবে, যুগযুগান্তরের পরিচিত জিনিস, পিতৃ-পিতামহের এক মাত্র জীবনরক্ষার একমাত্র উপাদান, বহিশ্চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া কয়েক পুরুষ মাত্র ইহাকে অনাত্মীয় মনে করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় বিজড়িত আয়ুর্ব্বেদ, সেই ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারিলে—আয়ুর্ব্বেদ যে আবার তাহার পূর্ব্বাসন লাভ করিবে ইহা নিশ্চিত।

খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী, এল, এ, এম, এস)

গম বা গোধূম।—বাঙ্গালা দেশে যেমন চাউলের প্রচলন অত্যধিক, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং শুধু উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কেন, পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানেই সেইরূপ গোধূমের প্রচলন অধিক। এই গোধূম হইতে

আটা এবং ময়দা প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর তাবৎ প্রদেশেই ইহার সমাদর বেশী। বাঙ্গালীরাও ইহা চাউলের পরেই দ্বিতীয় খাদ্য স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গোধুমের প্রকার ভেদ।—"দুধে", "গঙ্গাজলি" ও "জামালি" এই তিন প্রকার গোধুমের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার গোধুম হইতে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে "দুধে" ও "গঙ্গাজলি" হইতে প্রস্তুত ময়দার বর্ণ শ্বেত এবং "জামালি" হইতে প্রস্তুত ময়দা কিঞ্চিৎ মলিন।

আটা ও সুজি।—গোধুম হইতে আটা এবং সুজিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ময়দা এবং আটা অপেক্ষা সুজি সহজে জীর্ণ হয়, এই জন্য রোগীদিগের পথ্য অনেক স্থলে সুজির ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ময়দা বা আটা অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। ইহার কারণ সুজিতে শ্বেতসার পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ময়দা ও আটার মধ্যে ভুসি থাকায় উহা দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, কিন্তু যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় কলের ময়দা অপেক্ষা আমিষ, স্নেহ এবং লবণ জাতীয় উপাদান বেশী, এজন্য ময়দা অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। বিশেষতঃ কলের ময়দায় ভাইটামিনের অংশ অধিক, এজন্য ময়দা অপেক্ষা আটার প্রচলন অধিক হইলে দেশের মঙ্গল।

ময়দায় ভেজাল।—খাদ্য যেমন আমাদের শরীর পুষ্টির সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ খাদ্যে যদি ভেজাল থাকে, তাহা হইলে তদ্দারা শারীরিক উন্নতি অপেক্ষা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। অন্যান্য দ্রব্যের মত ময়দাতেও যথেষ্ট ভেজাল চলিয়া থাকে। চাউলের গুঁড়া ময়দার সর্ব্বপ্রধান ভেজাল। চাউলের দর যদি সস্তা থাকে এবং গমের দর বেশী হয়, তাহা হইলে অনেক দুষ্ট ব্যবসায়ী ময়দার সহিত চাউলের গুঁড়া মিশাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ফটকিরীর গুঁড়া উহার সহিত মিশান হয়। ফট্‌কিরীর গুঁড়া মিশাইলে ময়দা ধব্‌ধবে সাদা হইয়া থাকে, এজন্য অনেক ক্রেতা মনে করেন, এই ময়দা অতি উত্তম কিন্তু এইরূপ ভেজাল ময়দা ব্যবহার করিয়া অজীর্ণ, অম্ল এবং আমাশয় রোগকে ডাকিয়া আনা হয়। শুনিয়াছি এক প্রকার পাথরের গুঁড়াও নাকি আজকাল ময়দার সহিত দুষ্ট ব্যবসায়ীরা মিশাইয়া থাকে, আমাদের দেশ যে এত অজীর্ণপ্রবণ, বোধ হয় তাহারই ফল সম্ভূত।

যব হইতে ময়দা।—যবাদি শস্য হইতেও ময়দা প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা ময়দার ন্যায় মুখরোচক নহে। ফলতঃ গমের ময়দার প্রচলনই অধিক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চাউল অপেক্ষা ময়দায় নাইট্রোজেন বেশী এবং কার্ব্বণ অল্প। যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় যে ভুসী থাকে, তাহা দুষ্পাচ্য এবং তাহার নীচের অংশ নাইট্রোজেনাস পদার্থে পূর্ণ এবং পুষ্টিজনক। বহুমূত্র বা ডায়বিটিসের রোগীদিগকে যে যাঁতায় ভাঙ্গা আটার ব্যবস্থা করা হয়, ইহাই তাহার কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে গোধুম।—আয়ুর্ব্বেদের মতে গোধুম মধুর রসযুক্ত, শীতবীর্য্য, বায়ু এবং পিত্ত নাশক, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রপ্রদ, বলকর, স্নিগ্ধ, ভগ্নসংযোজক, সারক, দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক, বর্ণপ্রসাদক, বৃংহণ এবং রুচিকর প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট।

গোধুম হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।* গোধুম হইতে প্রস্তুত ময়দা, আটা, সুজি এবং যাঁতায় ভাঙ্গা আটায় যে সকল পদার্থ থাকে, রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তাহার বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত রূপ করিয়া থাকেন :—

* "গোধুমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফ শুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ॥"

খাদ্য	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	কোথায় পরীক্ষিত ও পরীক্ষকের নাম
গোধূম	১২'৪	১৪'৬	১'২	৬৭'৯	১'৬	গটিয়ার
ময়দা	১৫'০	১১'০	২'০	৭১'২	'৮	
ঐ	১৭'৮	১১'২	'৬	৬৭'৫	'৭	পাকস
আটা	১৪'৬৫	১১'৫	১'৯	৬৭'১	১'৮৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন মেডিকেল কলেজ
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	১১'৬০	১২'৮৬	৩'২১	৬৮'৪৪	২'৯৬	জে, এন, মৈত্র
সুজি	১০'৫২	১৪'৩৮	২'২৮	৪৭'৪২	'৫১	স্বাস্থ্য সমাচার পরীক্ষাগার

রুটি ও লুচি—ময়দা ও আটা হইতে রুটি ও লুচি খাদ্য প্রস্তুত হয়। লুচিতে ঘৃতের পরিমাণ অধিক থাকে বলিয়া শ্বেতসার জীর্ণ করিবার জন্য যে প্রচুর লালা রসের আবশ্যক, সেই রসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সাধারণ রুটিতে প্রায় ১৫ হইতে ২৮ ভাগ জল থাকে বলিয়া লুচি অপেক্ষা রুটি সহজে জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ সিদ্ধ করিয়া ময়দা বা আটা হইতে রুটি প্রস্তুত করা হয় না, কিন্তু সিদ্ধ করিয়া লইলে উপকার বেশী। যদি সিদ্ধ করিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে ময়দা বা আটা মাখিয়া এবং বেশ করিয়া ঠেসিয়া এবং একটি তাল করিয়া যদি অন্ততঃ ৬৭ ঘটা কাল রাখিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার পরে ঐ তালটিকে আবার বেশ করিয়া ঠেসিয়া রুটি প্রস্তুত করিয়া সেঁকিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা অতি সহজ পাচ্য হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে রুটি হজম করিতে কষ্ট হয়, তাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিলে অধিক উপকার পাইবেন।

পাঁউরুটি পাঁউরুটির অধিক আদর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। আমাদের দেশেও ইহার আদর এখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই পাঁউরুটি ব্যবহার করিবার সময় আগুনে সেঁকিয়া লওয়া উচিত। ইহা সহজপাচ্য।

সুজির রুটি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সিদ্ধ করা রুটী সহজ পাচ্য। সাধারণতঃ ময়দা বা আটা সিদ্ধ করিয়া রুটি প্রস্তুত করার প্রথা বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু সুজির রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার পরে রুটি প্রস্তুত করা হয়,—এই জন্যই সুজির রুটি সহজে জীর্ণ হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে ময়দা বা আটার রুটি ভালরূপ জীর্ণ হয় না, তাঁহাদের পক্ষে সুজির রুটি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বার্লি—বার্লি বলিয়া যে দ্রব্য অধুনা আমাদের দেশে অধিকভাবে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা যব হইতে প্রস্তুত। যবের ছাতু আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যবের গুণ—ইহা মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ভাত অপেক্ষা ইহাতে নাইট্রোজেন এবং দুষ্পাচ্য পদার্থ অধিক। সাধারণতঃ বার্লি যেভাবে প্রস্তুত করা হয়, তাদ্ভিন্ন বার্লি হইতে রুটিও প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহা ময়দার ন্যায় খাইতে সেরূপ মুখরোচক নহে।

দুগ্ধ—দুগ্ধকে আয়ুর্ব্বেদে অমৃত বা পয়ঃ বলা হইয়াছে, বাস্তবিক ইহা অমৃত স্বরূপ। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে এই দুগ্ধ দ্বারাই শিশুর জীবন ধারণ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ এই জন্য ইহার আর একটি নাম দিয়াছেন "বালজীবন"। ঘৃত, ছানা, মাখন, ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি আমরা যত প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া থাকি—তাহার সকলগুলিই দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক কথায় দুগ্ধে সকল জাতীয় খাদ্যই বর্ত্তমান থাকায় শরীরপুষ্টির পক্ষে ইহা যে বিশেষ সহায়ক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

দুগ্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত—দুগ্ধে এত গুণ থাকা সত্বেও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কিন্তু শিশু ভিন্ন বয়স্কদিগের পক্ষে কেবলমাত্র দুগ্ধদ্বারা শরীরের পোষণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না স্থির করিয়াছেন, কারণ প্রাপ্ত বয়স্কদিগের পক্ষে শরীর ধারণের জন্য খাদ্যসমূহে যে যে উপাদান যে যে অনুপাতে থাকা প্রয়োজন, দুগ্ধে তাহার সমস্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন,—প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিলে দশ ভাগ জলের সহিত পরিত্যাক্ত হয় এবং নব্বই ভাগ শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। আর যদি কেবল মাত্র দুগ্ধ পান না করিয়া অন্য খাদ্যের সহিত ইহা সেবন করা যায়, তাহা হইলে সহজে পরিপাক হয় এবং ইহার অধিক পরিমাণ সারভাগই শরীরে শোষিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা দুগ্ধ বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলের পক্ষেই হিতকর, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিশুদিগের পক্ষেই কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া বর্দ্ধন ও পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে।

দুগ্ধের প্রকার ভেদ।—আয়ুর্ব্বেদে নানাপ্রকার দুগ্ধের গুণাগুণ লিখিত আছে,তন্মধ্যে স্তন্যদুগ্ধ গব্য-দুগ্ধ ছাগীদুগ্ধ, মেষীদুগ্ধ, মহিষ দুগ্ধ এবং গর্দ্দভীর দুগ্ধের প্রচলনই দেখিতে পাওয়া যায়। স্তন্য দুগ্ধ শিশুদিগের পক্ষে অমৃত তুল্য। গর্দ্দভীর দুগ্ধ—স্তন দুগ্ধের অভাবে উত্তম কার্য্য করে। অবশিষ্ট দুগ্ধগুলিও শরীর পোষণের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুদিগের পক্ষে স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে কেবল গর্দ্দভীর দুগ্ধ কেন, গব্য দুগ্ধ এবং ছাগী দুগ্ধও হিতকর। কিন্তু ঐ সকল দুগ্ধ ব্যবহার করিবার সময় কেবল মাত্র দুগ্ধ সিদ্ধ না করিয়া দুগ্ধ যতটা-ততটা জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া একটু মিছরি মিশাইয়া পান করান হিতকর। শিশু যদি ৬মাসের বা তদূর্দ্ধ কালের হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ না লইয়া দুগ্ধের সহিত সামান্য পরিমাণে জল মিশাইয়া ফুটাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধে ভেজাল:—খাঁটি দুগ্ধ এখন একরূপ দুর্লভ হইয়াছে, গোয়ালারা দুগ্ধে এখন যেরূপ জল ঢালিয়া থাকে, তাহাতে দুগ্ধ পানের উপকারিতা তো দূরের কথা, অনেক স্থলে ঐ জল দূষিত থাকায় দুগ্ধ পানের ফলে শরীরে নানা প্রকার রোগই উপস্থিত হইয়া থাকে। মাখন তোলা দুগ্ধ এবং বাছুর মরিয়া গেলে ফুকা দিয়া যে দুগ্ধ দোহন করিয়া লওয়া হয়, তাহা বিশেষ অনিষ্টকারী। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দিগের মতে বিশুদ্ধ গাভী দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০২৬ হইতে ১,০৩৫। একসের গাভী দুগ্ধে মোটামুটি ২½ কাঁচ্চা ছানা, ৩ কাঁচ্চা চিনি, ২৷৷০ কাঁচ্চা মাখন এবং ½ কাঁচ্চা লবণ জাতীয় পদার্থ থাকে। মহিষীর দুগ্ধে গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ মাখন থাকে, এ জন্য ইহা গুরুপাক। কিন্তু খাইতে গাভী দুগ্ধ অপেক্ষা সুমিষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ছাগী দুগ্ধ সর্ব্ব রোগ নাশক, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ছাগী দুগ্ধ—গো দুগ্ধেরই মত উপকারী। মহিষী দুগ্ধের প্রচলনও আমাদের দেশে অত্যধিক, এই দুগ্ধ—গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা মধুর রস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং নিদ্রাজনক কিন্তু গুরুপাক। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, মহিষী দুগ্ধ পানে ক্ষুধা কম হইয়া থাকে।

কিরূপ দুগ্ধ পান করা উচিত।—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দুগ্ধকে অমৃত বা পয়ঃ বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও প্রসবের পরে দশ দিনের মধ্যে গব্যদুগ্ধ এবং ছাগীদুগ্ধ পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গাভীর গর্ভ হইলে সে দুগ্ধ পান করাও আয়ুর্ব্বেদে নিষিদ্ধ। গাভীর বাঁটে যদি ক্ষত থাকে কিম্বা যে গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধ আপনা আপনি ক্ষরিত হইতে থাকে অথবা যে গাভীর দুইটি বাছুর বর্ত্তমান, তাহাদের দুগ্ধও শাস্ত্র মতে অপেয়। সদ্যঃ দোহন করা দুগ্ধ পরম বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ—ত্রিদোষনাশক। এইরূপ দুগ্ধকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলা হয়। এই ধারোষ্ণ দুগ্ধ গাভীরই প্রশস্ত, কিন্তু মহিষীর দুগ্ধ ধারোষ্ণ উপকারী নহে, মহিষীর দুগ্ধ শীতল হইলে গুণকারী হয়। ভেড়ার দুধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত উপকারী। ছাগী দুগ্ধ শীতল হইলে উপকারক হয়। জ্বাল দেওয়া

দুধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক জল অর্দ্ধেক দুধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষে নামাইয়া পান করিলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। নির্জ্জলা দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই গুরু, স্নিগ্ধ, বীর্য্যকারক ও বলবর্দ্ধক হয়।

ভেজাল হইতে আত্মরক্ষার উপায়।—কিন্তু এখনকার দিনে যেরূপ ভেজাল চলিয়াছে, তাহাতে বাজারের দুগ্ধ জ্বাল দিয়াই পান করা উচিত। গোজাতির এক প্রকার পীড়া আছে, তাহার নাম Foot and mouth disease (ফুট এবং মাউথ ডিজিজ)। দুগ্ধ দ্বারা পীড়া মানব শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, এজন্য জ্বাল দিয়া দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধের দোষ কাটিয়া যায়। বাজারের দুগ্ধ আনিয়া বা গোয়ালারা দিয়া যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিয়াও জ্বাল দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কারণ বায়ু সংস্পর্শে নানাপ্রকার বিষ দুগ্ধে প্রবেশ করিতে পারে।

দধি।—সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত এবং মহিষীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত—এই দুই প্রকার দধিই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। শাস্ত্র সকল প্রকার দধিকেই অগ্নি-দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং গুরু বলিয়াছেন। গাভী হইতে প্রস্তুত দধির পুষ্টিকারিতা শক্তি এবং অগ্নিদীপক শক্তি খুব বেশী। গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধি—বায়ু নাশক এবং মহিষীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধি—বায়ু, পিত্ত নাশক কিন্তু মহিষীর দুগ্ধে প্রস্তুত দধি কফকারক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—দধি যে পরিপাকক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার কারণ দধির মধ্যে ল্যাকটিক্ বা অম্লরস আছে। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন,—আমাদের অন্ত্রমধ্যস্থ যে সকল অনিষ্টকারী বীজাণু বর্ত্তমান আছে, দধির ল্যাকটিক্ এসিড, বীজাণুদ্বারা তাহারা নষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের মতে যাঁহারা প্রত্যহ দধি ব্যবহার করেন—তাঁহারা নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন। আমাদের মতে কিন্তু শ্লেষ্মা প্রধান লোকের পক্ষে বেশী পরিমাণ দধি সেবন কর্ত্তব্য নহে। গুরুপাক দ্রব্যাদি আহারের পরে দধি খাওয়া উচিত, তাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। সদ্যঃ প্রস্তুত দধি বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

ঘোল—অতি উপাদেয় দ্রব্য। আয়ুর্ব্বেদের মতে এই ঘোল বা তক্র—অমৃত সদৃশ। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ
প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণা অমৃতং সুখায় তথা নরাণাং
ভুবি তক্রমাহুঃ॥

অর্থাৎ—তক্র সেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্র সেবন করিলে কোন রোগ-গ্রস্তও হইতে হয় না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃত পান দেবতাগণের সুখাবহ, তক্রপান মনুষ্যদিগের পক্ষেও তদ্রূপ সুখপ্রদ হয়।

তক্রের শ্রেণীবিভাগ—আয়ুর্ব্বেদে তক্রকে ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা—এই পাঁচভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। সরের সহিত নির্জ্জলা দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন দধি—জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চারিভাগ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র এবং অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ ও বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা হয়। ইহাদের মধ্যে চিনি সংযুক্ত ঘোল পরম উপকারক। ঘোল—বায়ু ও পিত্ত নাশক। মথিত—কফ ও পিত্ত নাশক। তক্র—ধারক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তজনক এবং বায়ু নাশক। গ্রহণী প্রভৃতি রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। উদশ্বিৎ—কফবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক কিন্তু কফকারক।

ছানা—ছানায় যবক্ষারজানের ভাগ বেশী, এ জন্য মিষ্ট দ্রব্যের সহিত ছানা খাইলে সত্বরে পরিপাক হইয়া

থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, মাংসের আমিষভাগ হইতেও ইহা বেশী বলকারক। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মতে—মাংসের মধ্যে যে সকল অনিষ্টকারক পদার্থ থাকে, ছানায় তাহা থাকে না।

মাখন—সদ্যঃ প্রস্তুত মাখনই অধিক উপকারী। আয়ুর্ব্বেদের মতে ইহা মেধাজনক, লঘু ও ধারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। মাখন—মহিষী দুগ্ধ হইতে এবং গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। উভয় প্রকার মাখনই সহজ পাচ্য অথচ ইহা অতিশয় পুষ্টিকর, কিন্তু পচা মাখন কখনই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা অতিশয় অনিষ্টকারী। এখনকার দিনে যে অম্ল, অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আমাদের দেশ বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার অন্য কারণ আমরা বাজারের পচা মাখন সেবন বলিতে পারি। পচা মাখন খাইলে শরীরে গিয়া বিষ ক্রিয়া করিয়া থাকে। মাখনেও এমন যথেষ্ট ভেজাল চলিতেছে,—জল মিশান দধির সারভাগ, আলু এবং শূকরের চর্ব্বি এখন অনেকস্থলে মাখনে ভেজাল দেওয়া হয়। এ জন্য বিশেষ সাবধানতাসহ ইহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ এবং দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত কয়েকটি দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিম্নে দেখান যাইতেছে :—

দ্রব্য	জল	ছানা জাতীয় উপাদান	মাখন জাতীয় উপাদান	শর্করা জাতীয় উপাদান	লবণ জাতীয় উপাদান	কোথায় পরীক্ষিত
গাভী দুগ্ধ (বিলাতী গরুর)	৮৬·৮	৪·	৩·৭	৪·৮	·৭	ব্লাইদ্
গাভী দুগ্ধ (দেশী গৃহ পালিত গরুর)	৮৬·৮৭	৩·৯৭	৪·২৮	৪·৮১	·৬	সায়েন্স এসোসিয়েশন
গাভী দুগ্ধ (গড়ে)	৮৬·৪০	৩·৯৭	৪·৪০	৪·৫০	·৭৩	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
গাভী দুগ্ধ (কলিকাতার বাজারের)	৯২·১৭	২·২৭	২·২৭	[illegible]	[illegible]	সায়েন্স এসোসিয়েশন
গাভী দুগ্ধ (মাঠা তোলা)	৮৮·০	৪·০	১·৮০	৫·৪০	·৮	[illegible]
মহিষী দুগ্ধ	৮১·০	৪·৪	৯·০	৪·৮	·৮	ওয়াটসন
„ গড়ে	৮১·৮	৪·৫২	৮·২	৪·৬	·৮৮	ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
ছাগী দুগ্ধ	৮৭·৫৪	৩·৬২	৪·২০	৪·০	·৫৬	ব্লাইদ্
গাধার দুধ	৯১·১৭	১·৭৯	১·০২	৫·৫	·৪২	„
ভেড়ার দুধ	৮২·১৭	৭·১০	৫·৩০	৪·২০	১·০	„
(Condensed Milk) ঘন দুগ্ধ	২৪·৯৪	৯·৬৮	৮·৯০	৫৪·৭৩	১·৯৫	হেনার
দধি (উৎকৃষ্ট)	৮৭·৮৪	৪·৭৭	৩·৫৭	২·৮	·৬১	এন, এন, বসু
দধি (নাটোর)	৮৪·৯৩	৫·৬৩	৪·৮৫	২·৬৫	·৯৭	জে, এন, মৈত্র
মাখন	৭·৫	১·০	৯০·৫	...	১·০	বেল্
ছানা	৫৮·৭২	২১·৬৮	১৬·৮	০·২৮	১·৬৮	জে এম, মৈত্র
পনির	৩৬·০	৩১·০	২৮·৫	...	৪·৫	পার্কস্
মাঠা	৬৬·৯	২·৭	২৭·৭	২·৮	১·৮	লেথ্‌বি

ঘৃত—সকল প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ঘৃতের তুলনা নাই। শাস্ত্র—ঘৃতকে রসায়ন, বায়ুর হিতকারক, দীপক ও ধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্য বর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, বয়বর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলবর্দ্ধক, কফনাশক প্রভৃতি গুণসমন্বিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর্য্য ঋষি ঘৃতের এতাদৃশ শক্তি অবগত হইয়াই বলিয়াছিলেন,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"—অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইও।" এখন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলকারক দ্রব্য বা বিশুদ্ধ ঘৃত দেশে দুর্লভ হইয়াছে,—আমাদের দৈহিক অবস্থাও তাহারই ফলে দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া পড়িতেছে।

ঘৃতের প্রধান গুণ—বিষ নষ্ট করা। ঘৃতে অঙ্গারময় পদার্থের ভাগ অধিক, জলের ভাগ কম এবং যবক্ষারজানময় পদার্থ একেবারেই নাই। গব্য ও মহিষ—দুই প্রকার ঘৃত আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। উভয় প্রকার ঘৃতই শরীর পুষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গব্যঘৃত মহিষ ঘৃত অপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী সামর্থ্যানুযায়ী সকলের পক্ষেই এই পরম উপকারী ঘৃত প্রত্যহ অল্পাধিক পরিমাণে সেবন করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকের সাজি

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই যে জগতের আদিম চিকিৎসা,—এই চিকিৎসার অমূল্য গ্রন্থরাজি অবলম্বন করিয়াই যে সকল প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা এখন সর্ব্ববাদীসম্মত। ঋষিযুগে—শুধু ঋষিযুগে কেন, ঋষিযুগের পরবর্ত্তী কালেও এই চিকিৎসা যেরূপ সমুন্নতি লাভ করিয়াছিল, কালক্রমে নানা কারণে এই চিকিৎসা সেইরূপ অবনতির চরম সোপানেও উপস্থিত হইয়াছিল। সময়ের গতিপরিবর্ত্তনে এই চিকিৎসা আবার সর্ব্বজন সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় গুলির প্রতিষ্ঠা, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে নূতন নূতন গ্রন্থের প্রচার, স্থানে স্থানে কর্পোরেশন এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গুলি হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংস্থাপন—বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সাধারণের এইরূপ অনুরাগের ফলে সনাতন আর্য্য চিকিৎসা আবার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত হইবে, সে বিষয়ে আশা করিতে পারা যায়।

কিন্তু অনেকেই যে বলিয়া থাকেন—"এই চিকিৎসা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ",—এ বিষয়ে আমাদের ভাবিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। হিসাব করিয়া দেখিলে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অধিক ব্যয় সাপেক্ষ নহে। সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসার কথা বলিতেছি না,—জীর্ণজটিল রোগে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতে হইলে, শুধু একবার কি দুই বার দর্শনী দিয়াই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, মূত্রপরীক্ষা, মলপরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা—নানারূপ পরীক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সে তুলনায় ব্যয় কম। ইহা ভিন্ন এলোপ্যাথিক ঔষধের মূল্যও যে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অপেক্ষা খুবই অল্প—তাহাও নহে, জীর্ণজটিল রোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সামান্য রোগ গুলির জন্য সাধারণ ফিবার মিকশ্চার বা কুইনাইন মিকশ্চারের যে ব্যবস্থা করা হয়—সে গুলির সহিত তুলনা করিলেও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মূল্য কখনই বেশী হইবে না। তবে এলোপ্যাথেরা প্রেস্ক্রিপসন করিয়া থাকেন—একদিন বা দুই দিনেরই ঔষধ,—আর কবিরাজেরা ব্যবস্থা

করেন সাপ্তাহিক ঔষধ,—সেইজন্ত একটু বেশী ব্যয় করিতে হয় বলিয়া এলোপ্যাথিক ঔষধ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মূল্যাধিক্য মনে হইয়া থাকে।

* * *

তবে কোনে কোনো চিকিৎসালয়ে হয়তো ঔষধের মূল্য কিছু বেশী, কিন্তু তাহার জন্ত সমগ্র চিকিৎসক দায়ী নহেন। প্রকৃত কথা, শুধু উপাদান গুলির মূল্যের হিসাব করিয়াই ঔষধের মূল্যের হিসাব করা হয় না, সরঞ্জামী খরচটাও উপাদান গুলির খরচের সহিত মিশাইয়া লইয়া ঔষধের মূল্য নির্ণয় করা হয়, সেইজন্ত যে চিকিৎসালয়ে সরঞ্জামী খরচ অত্যধিক, সেখান হইতে ঔষধ লইতে হইলে একটু খরচও যে বেশী পড়িবে—ইহা অতি সহজ কথা। যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার লুপ্ত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিতে হইলে, সাধারণে যাহাতে অল্প ব্যয়ে রোগমুক্ত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

* * *

এই ব্যবস্থা করিতে হইলে দেশে পাচন চিকিৎসার অত্যধিক প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাচন চিকিৎসার প্রচলনে দুইটি অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, এক রোগীদিগের পক্ষে ঝঞ্ঝাট ভোগ, অপর চিকিৎসক মহাশয়দিগের আর্থিক ক্ষতি। কিন্তু এই পাচনই যদি চিকিৎসক মহাশয়েরা অন্যান্য ঔষধের মত প্রতি দিন প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই অসুবিধার সমাধান হইতে পারে। পাচন চিকিৎসা যে অনেক সময় রসৌষধির চিকিৎসা অপেক্ষা কার্য্যকারী হইয়া থাকে—একথা তো অস্বীকার করিবার জো নাই। মহাত্মা গঙ্গাধরের যুগে এই পাচন চিকিৎসার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসককে কেবল পাচন ও মুষ্টিযোগাদির দ্বারাই রোগ আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি। এখনকার মত তখন তো এত ডিস্পেন্সারির প্রচলন হয় নাই, সকল প্রকার ঔষধও সকলে প্রস্তুত রাখিতেন না, অথচ তখনকার দিনে ধন্বন্তরিকল্প চিকিৎসক বলিয়া অনেকেরই প্রতিপত্তি ছিল। হায়, সেদিন কোথায় যাইল? হে বঙ্গীয় কবিরাজ মণ্ডলি! আবার সেই অতীত যুগের সকল ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করুন।

* * *

আমরা যে চিকিৎসক মহাশয়দিগকে পাচন প্রস্তুত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি—ইহাতে খুব অসুবিধা হইবে না। বড় বড় ডাক্তারখানায় ঔষধ লইতে যাইয়া যেমন প্রেস্ক্রিপসন খানি দিয়া এবং একখানি টিকিট লইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় গুলিতেও সেইরূপ করিতে হইবে। কবিরাজ মহাশয়েরা কতকগুলি চুল্লী রাখিবেন। কম্পাউণ্ডার ব্যবস্থের পাচন যত শীঘ্রসম্ভব প্রস্তুত করিয়া শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া প্রদান করিবে। এইরূপ ভাবে সদ্যঃ প্রস্তুত ঔষধ যে যথেষ্ট পরিমাণে উপকারী হইবে, তাহা সুনিশ্চিত রোগীদিগেরও ইহাতে অসুবিধা হইবে না, কবিরাজ মহাশয়েরও অর্থাগম বন্ধ হইবে না।

* * *

এই পাচন চিকিৎসা ভিন্ন আসব এবং অরিষ্টের প্রচলনও বেশী করিয়া করিতে পারিলে রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে। রাবণকৃত "অর্ক প্রকাশ" অবলম্বন করিয়া কতকগুলি অর্ক বা আরক যদি প্রস্তুত করিয়া প্রচলন করা হয়, তাহা হইলে ব্যয়ের মাত্রা কমিতে পারে। আসব, অরিষ্ট এবং অর্ক বা আরকের প্রচলনে রোগীদিগকে অনুপানের হাত হইতেও নিষ্কৃতি প্রদানও করা হইবে। এখন এই অর্থসমস্যার দিনে সাধারণকে যাহাতে স্বল্পব্যয়ে নিরাময় করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসকের ধর্ম্মও ইহাই। চিকিৎসাটি এখন ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসক জানেন, ইহা কখনই ব্যবসায়ের সামগ্রী নহে। ফল কথা, এখন-

কোর দিনে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামী, তাঁহারা সকল প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা যাহাতে অতি অল্প মাত্র খরচ করিয়া সাধারণে নিরাময় হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন—ইহাই আমাদের বক্তব্য।

* * *

বড়ই দুঃখের কথা,—চিকিৎসা কার্য্যটি সত্য সত্যই এখন ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। পেটেণ্ট ঔষধ—বিলাতী অনুকরণে এখন আমরা প্রস্তুত করিয়া থাকি, কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষি আমাদিগকে যে সকল অমূল্য-রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি আমরা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের নিজেদের আবিষ্কৃত পেটেণ্ট ঔষধের কোনো প্রয়োজনই হয় না। Reserche বা গবেষণা করা খুব ভাল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু সে গবেষণা করিবার প্রকৃত শক্তি থাকা চাই। এখন গবেষণার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, পেটেণ্ট ঔষধ কিন্তু প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইতেছে। এই পেটেণ্ট ঔষধের আবিষ্কারকর্ত্তৃগণের অনেকে আবার আদৌ চিকিৎসক নহেন, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই "কবিরাজ" সাজিয়াছেন। ইঁহাদের নবাবিষ্কৃত ঔষধাবলীর ফলে দেশের লোকের উপকার হইতেছে কি অপকার হইতেছে—তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

> যথা বিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
> তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥
> বরং দস্যৌ বরং ব্যাঘ্রে বরং ঘোরে বিভীষণে।
> সাগরে জীবনোৎসর্গঃ মরুলোকে বাপিধর্ম্মনি॥
> নাধীত শাস্ত্রেনাভ্যস্ত কর্ম্মণ্যখিল বৈরিনি।
> ন কার্য্যং দুর্ম্মতৌ পাপে ভিষজ্যাত্ম সমর্পণম॥

"অর্থাৎ অজ্ঞাত ঔষধ—সর্পের বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্রের ন্যায় অনিষ্টকর। বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ। দস্যুর হস্তে, হিংস্র জন্তুতে, নক্রাদি জলচর জন্তু সমাকুল ভীষণ সমুদ্রে অথবা ঘোরতর মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন বরং কর্ত্তব্য, তথাপি অনধীত শাস্ত্র, অনভ্যস্তকর্ম্মা; সর্ব্ব বৈরী, দুর্ম্মতি পাপাত্মা চিকিৎসকের হস্তে আত্ম সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে।

* * *

বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা কার্য্যটি এখন অনেক স্থলেই বিশেষ ভাবে ব্যবসায়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকেই চিকিৎসা কার্য্যের ধার আদৌ ধারেন না। পেটেণ্ট এবং অন্যান্য ঔষধ বিক্রয়ই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। এই সকল ব্যবসায়ীর পেটেণ্ট ঔষধ যে কি কি উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, তাহা তো কেহই অবগত নহেন, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে শাস্ত্রীয় ঔষধ বলিয়াও যে সকল ঔষধ বিক্রয় করেন, তাহার মধ্যেও কৃত্রিমতার অভাব নাই। সেই সকল ঔষধের মধ্যে "শ্রীমদনানন্দ মোদকে"র নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই মোদকটি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একটি বিশেষ কার্য্যকারী ঔষধ। রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকারে ইহা লিখিত এই মোদকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সিদ্ধির মিশ্রণ আছে সিদ্ধিসহ ৫০টি দ্রব্যের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত করিতে হয় ইহা পরম পুষ্টিকর রসায়ন ঔষধ। কিন্তু সিদ্ধি থাকায় অনেকে সুস্থ শরীরে নেশার জন্য ইহা সেবন করিয়া থাকেন। কয়েকজন ব্যবসায়ী অবসর বুঝিয়া ইহার প্রচলনাধিক্য করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু যাহা রোগের ঔষধ—তাহা সুস্থ শরীরে সেবন করা যে কোনো ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, সে কথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তদ্ভিন্ন যাঁহারা অতি সস্তায় ইহা বিক্রয় করিবার প্রয়াসী—তাঁহারা যে ইহার ৫০ খানি উপাদানই যথাযথভাবে ইহাতে প্রদান করেন, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

* * *

আমরা যতদূর খবর রাখি,তাহাতে সিদ্ধি,ধুতুরার বীজ এবং আরও কয়েকটি উত্তেজক দ্রব্য মিশাইয়া

কেহ কেহ ইহা প্রস্তুত করেন এবং অতি সস্তায় তাহা বিক্রয়ের জন্য নিজেদের ডিস্পেন্সারি—এমন কি, পানের দোকান, ষ্টেসনারি দোকান প্রভৃতি স্থানে রাখিয়াও ইহা বিক্রয়ের চেষ্টা করেন। এই সকল ব্যবসায়ী—সনাতন আয়ুর্ব্বেদের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতেছেন কি জাতীয় চিকিৎসার গর্ব্ব-গরিমা নষ্ট করিতেছেন—তাহা বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। ইঁহাদের প্রদত্ত পানের দোকান এবং ষ্টেসনারি দোকানের মোদক সেবন করিয়া অনেকে বিপন্ন হইয়াছেন—এমন কথাও আমরা বিশেষ ভাবে অবগত আছি। ঔষধের সহিত সিদ্ধির মিশ্রণ করিতে হইলে আবগারি বিভাগ হইতে লাইসেন্স না লইয়া বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই, কিন্তু পানওয়ালা বা ষ্টেসনারি দোকানের অধিকারীদিগের এ সম্বন্ধে কোনো লাইসেন্স নাই, অথচ তাহারা যে উহা বিক্রয় করে, তাহা তাহাদের নিকট যে সকল কবিরাজ উহা বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন, তাঁহাদেরই নাম দিয়া বিক্রয় করা হয়। নিজেদের ডিস্পেন্সারি ভিন্ন অন্য স্থানে রাখিয়া এরূপ ভাবে সিদ্ধি বিক্রয়ের অনুমতি কখনই আবগারি বিভাগ প্রদান করেন নাই। যাহা হউক আবগারি বিভাগকে আমরা অনুরোধ করিতেছি,—তাঁহারা এই সকলের প্রতীকারকল্পে অবহিত হউন। ঔষধ—ঔষধ, ঔষধ—নেশার জন্য নহে, সুস্থশরীরে মাদক দ্রব্য সেবনে যে বিষবৎ কার্য্য করে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, সেই কার্য্যের যাঁহারা প্রচারক, তাঁহাদিগকে শুধু চিকিৎসক সমাজের কথা নহে, মনুষ্য সমাজেরও কোন্ স্থানে তাঁহাদের স্থান প্রদান করা উচিত—তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন।

* * *

এই ব্যবসায়ে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন,—তাঁহাদের দায়িত্ব—তাঁহাদের কর্ত্তব্য—তাঁহাদের করণীয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্য দানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥

অর্থাৎ আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ সম্পত্তি লাভের একমাত্র কারণ, সুতরাং রোগ আরোগ্য করিলে সমস্তই দান করা হয়। প্রকৃত চিকিৎসক এই পরম দানকর কার্য্যে ব্রতী। একথা ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র ইহাকে পণ্য বিক্রয়ের মত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসক সংজ্ঞা প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য চিকিৎসা ভিন্ন অন্য পন্থাও তো যথেষ্ট আছে, যাঁহারা চিকিৎসার মত ধর্ম্মমূলক বৃত্তির মধ্যে অনাচারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের চিকিৎসক সমাজে কখনই স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই এ সকল কথা বিশেষ ভাবে ভাবিবার বিষয়।

কবিরাজ যামিনীভূষণের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য *

কবিরাজ যামিনীভূষণ যে কর্ত্তব্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে কর্ত্তব্য বাঙ্গালার কর্ত্তব্য—বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য—সমগ্র ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। যামিনীভূষণের সে কর্ত্তব্য বিষয়টি—মৃতকল্প আয়ুর্ব্বেদকে পুনরুদ্ধার করা—আর্য্যবাসীর মনোমধ্যে সনাতন চিকিৎসার উপকারিতা উপলব্ধি করাইয়া দেওয়া, ঋষি প্রবর্ত্তিত চিকিৎসার সাহায্যে আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করিবার

* গত ২৬শে শ্রাবণ কবিরাজ যামিনী ভূষণের স্মৃতি-সভায় সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

চেষ্টা করা। ঋষি প্রবর্ত্তিত চিকিৎসার সাহায্যে আমাদের দেশবাসীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করার কথা কেন বলিলাম, সে কথা খুলিয়া বলিলে অন্য সম্প্রদায় হয়তো বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু এ কথা নির্ভেজাল সত্য যে, যামিনীভূষণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেও কিন্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন আর্য্য চিকিৎসা। ইহার প্রধান কারণ, তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, লোক লোচনে অন্য চিকিৎসা আজি যতই মহামহিম মহিমান্বিত হউক,—অন্য চিকিৎসার আশু কার্য্যকারী শক্তি দেখিয়া জনসাধারণ যতই মুহ্যমান হউক,—অন্য চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ দেশীয় চিকিৎসা অপেক্ষা যতই সহজসাধ্য বলিয়া সাধারণে বিবেচনা করুন, আমাদের আর্য্য চিকিৎসা সকল চিকিৎসার আদি জননী এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষে এই চিকিৎসা যতটা উপকারী, অন্য চিকিৎসা কখনই সেরূপ নহে। আর্য্য ঋষি বলিয়া গিয়াছেন,—'যস্য দেশস্য যো জন্তু, তজ্জং তস্যৌষধং হিতম।' কবিরাজ যামিনীভূষণ এই ঋষি বাক্যই ধ্রুব সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার ঋষিকল্প পিতৃদেব স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় এবং তাঁহার আয়ুর্ব্বেদের গুরু স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন মহাশয়ের উপদেশে ঋষিবাক্য তাঁহার মনোমধ্যে আরও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত হন নাই, পাশ্চাত্য বিদ্যাতেও তিনি চরম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র পাশ্চাত্য ভাবে প্রণোদিত হয় নাই—পরম নিষ্ঠাবান হিন্দুর সন্তান যামিনীভূষণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও ইহারই জন্য হিন্দু জাতির আদর্শ পুরুষ হইয়া জাতিগত হিসাবে বৈদ্য বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছিলেন—সেই অবলম্বনে তাঁহার কৃত্রিমতা ছিল না, আন্তরিকতা সেই বৃত্তি অবলম্বনে অস্থিতে অস্থিতে, পঞ্জরে পঞ্জরে, মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁহার নিহিত হইয়াছিল, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই ফলসম্ভূত।

সত্য কথা বলিতে কি,—কবিরাজ যামিনীভূষণ সত্যই আমাদিগকে চিকিৎসা জগতে এক নূতন আলোক দিয়া গিয়াছেন। এই আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায় না—এই আলোক অতি স্নিগ্ধ। অতি স্নিগ্ধ এই আলোক রশ্মি দেখিয়া এখন আমরা আমাদের প্রকৃত চিকিৎসা কি, তাহা চিনিতে পারিয়াছি,—গোঁড়ামী ছাড়িয়া এখন আমরা বুঝিতে শিখিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিতে হইলে পক্ষপাতী স্বভাব আমাদিগকে একান্তই পরিহার করিতে হইবে—প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের সমন্বয় করিতে হইবে,—আমাদের যাহা আছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না বা আমাদের সকলই ছিল—সুতরাং কিছুরই প্রয়োজন নাই—একথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেও চলিবে না, আমাদের যাহা আছে তাহা থাকুক—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রতীচ্য জগত যেমন আমাদের নিকট হইতে যাহা তাঁহাদের ছিল না তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের মধ্যে প্রাচ্য চিকিৎসায় এখন যে সকল বিষয়ের অভাব ঘটিয়াছে,—শুধু অভাব নহে—সেই সকল অভাবের জন্য যে সকল অসুবিধা আমরা ভোগ করিয়া থাকি, তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসার নিকট গ্রহণ করিলে আমাদের তো লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। কবিরাজ যামিনীভূষণ তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, এই জন্যই বলিতেছি—পরলোকগত যামিনীভূষণ সত্য সত্য আমাদিগকে এক নূতন সরণী দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শুধু সরণীর প্রদর্শন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া—জনে জনে অনুনয় বিনয়—অনুরোধ-উপরোধ করিয়া—কাকুতি-মিনতি—কতভাবে কত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিয়া গিয়াছেন। চৌদ্দ বৎসর মাত্র তাঁহার কর্ম্মকাল, এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক তিন বৎসর বাদে এগার বৎসরকাল তিনি আয়ুর্ব্বেদের অতীত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য—সমগ্র জগতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে বিজ্ঞান সম্মত—ইহা প্রতিপন্ন করিবার

জন্য—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ভিন্ন অন্য চিকিৎসা যে ভারতবাসীর পক্ষে কোনোক্রমে শুভদ নহে—ইহা সকলকে জানাইবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন—সে পরিশ্রম তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল,—আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস—যিনি যাহাই বলুন,—এতটা পরিশ্রম স্বীকারই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়টিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি যতটা পরিশ্রম তখন করিয়া গিয়াছেন,—ততটা পরিশ্রম যদি তখন তাঁহাকে না করিতে হইত,—এখনকার মত তখন যদি বহু সুধীসজ্জন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়টির পরিচালনার জন্য এতটা চেষ্টাশীল হইতেন,—তাহা হইলে যামিনীভূষণকে আমরা কখনই অকালে হারাইতাম না। মৃত্যুকালেও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের জন্য চিন্তা,—বড় কম কথা কি?—শুধু চিন্তা নহে, মৃত্যুকালেও অষ্টাঙ্গ বিদ্যালয়কে যেরূপ দান উইলদ্বারা তিনি করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ দান ইদানীন্তন কালে খুব কম লোকেই যে করিতে পারেন—এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়।

যামিনীভূষণের কর্ত্তব্য এখন শেষ হইয়াছে,—ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা—যামিনীভূষণের যাগযজ্ঞ তপস্যা—সর্ব্বস্ব ছিল,—তাঁহার মৃত্যুর এক বর্ষ যাইতে না যাইতেই তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুগণ তাঁহার আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের হাসপাতাল ভারতবর্ষে নূতন কীর্ত্তি —এই কীর্ত্তি স্থাপনায় যামিনীভূষণ যে অজর—অমর হইয়া রহিবেন—তাঁহার স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান বর্ষে বর্ষে আমরা করি বা না করি—কেবল মাত্র এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি যে শুধু বাঙ্গলার নহে—সমগ্র ভারতবর্ষে—সমগ্র ভারতবর্ষেই বা বলি কেন—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। যে মহাত্মা দেশের কল্যাণ-কামনায় এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—আয়ুর্ব্বেদের একনিষ্ঠ সাধক বলিয়া যিনি আজি সর্ব্বজন পরিচিত—চিকিৎসা-জগতে বর্ত্তমান যুগে সভ্য সভ্য যাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি,—তাঁহার সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের কর্ত্তব্য যথেষ্ট রহিয়াছে;—সেই কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য যামিনীভূষণের পরলোক গমনের কয়েকদিন পরেই মহারাজা কাশীমবাজারের সভাপতিত্বে যে শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার কথা সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সেই অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল—সারকুলার রোডের কিয়দংশ হইতে বিডন ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত "যামিনীভূষণ রোড" এবং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের যে স্থানে যামিনীভূষণের অতুলনীয় কীর্ত্তি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত—তাহারই কিয়দংশ স্থান 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় রোড' নামে অভিহিত করিবার জন্য কলিকাতা করপোরেশনে আবেদন করা হউক। সে কার্য্য সুসিদ্ধ হয় নাই, ইহা ভিন্ন যামিনীভূষণের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এই বিদ্যালয় বাটীর সম্মুখভাগে রক্ষণ করিবার প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল, সে কার্য্যও অদ্যাপি অসমাপ্ত। দেশের জন নায়কগণ,—স্বর্গীয় যামিনী ভূষণের চিরহিতৈষী বন্ধু বান্ধবগণ,—আয়ুর্ব্বেদের শুভচিন্তাকারী মহামহিম মহানুভব মহাত্মাগণ! আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হউন, যত শীঘ্র সম্ভব মৃত মহাত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানে এই কার্য্যগুলি সমাধা করা হউক,—যামিনী ভূষণ দেশের জন্য অনেক করিয়া গিয়াছেন, দেশের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার সম্মানার্থে এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া বাঙ্গালী-কর্ম্মী পুরুষের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করুন—ইহাই এই স্মৃতি বাসরে আমার আন্তরিক অনুরোধ। যামিনীভূষণ যদি আমাদের দেশের না হইয়া বিলাতের কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এই কর্ত্তব্যগুলি অনেকদিন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইত, কিন্তু আমাদের দেশ সেরূপ নহে, আমরা অনেক কর্ত্তব্যই পালন করিতে পারি না, পালন করিতে পারি না কেন,—পালন করিতে জানিও না, সেজন্য আজি সম্বৎসর পরে আমাদের সংকল্পিত কর্ত্তব্যের কথা সাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। আশা করি গত বারের উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্ততঃ অনেকে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

কায়িক শ্রম

(রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু, সি, আই, ই ; আই, এস ; ও এম, বি ; এফ, সি, এস)

যেমন কোন লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র কিছুদিন ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে মড়িচা ধরিয়া উহা বিকল হইয়া যায়, সেইরূপ সমুচিত পরিশ্রমের কার্য্যদ্বারা আমাদিগের দেহযন্ত্রের পরিচালনা না করিলে তন্মধ্যে মড়িচার ন্যায় নানাবিধ দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং উহা শীঘ্রই অপটু হইয়া পড়ে। শরীর অপটু হইলেই দেহস্থিত যাবতীয় যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া স্বভাব নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে অধ্যয়ন, চিন্তা, স্মৃতি, কল্পনা, বিচার প্রভৃতি মস্তিষ্কের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং সেই সঙ্গে দয়া, প্রেম, ভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি সম্যক স্ফূরণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দুর্ব্বল হইলে রক্ত পরিশোধণের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং দেহজাত নানাবিধ দূষিত পদার্থ রক্তমধ্যে সঞ্চিত হইয়া শরীরকে আরও বিকল এবং রোগপ্রবণ করিয়া তোলে। পরিপাক যন্ত্রগুলির দুর্ব্বলতা হেতু খাদ্য সম্যকরূপে পরিপাক না হইয়া উহার অধিকাংশই অসার পদার্থরূপে আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় ; কিয়দংশ মাত্র শরীর পোষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্টাংশ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়া শোণিত মধ্যে শোষিত হয় এবং রক্তকে দূষিত করিয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। কলের মধ্যে মড়িচা পড়িলে উহার ভালরূপে চলিবার যেমন প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়, তেমনি পরিশ্রমের কার্য্য না করিলে আমাদিগের শরীরে অধিক পরিমাণ চর্ব্বি সঞ্চিত হইয়া হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মায়। এই জন্য অলস ব্যক্তি অপেক্ষা পরিশ্রমশীল ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ আমরা দুইটী কারণে পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি—(১) জীবিকানির্ব্বাহ উপলক্ষে এবং (২) ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গচালনা করিয়া শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পরিশ্রমকে আমরা ব্যায়াম (Exercise) বলিয়া থাকি। কোন না কোনরূপ অঙ্গচালনা ব্যতিরেকে আমাদিগের শরীর প্রকৃত স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে কখনই সমর্থ হয় না। পুনশ্চ শরীরের সহিত মনের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অসুস্থতা নিবন্ধন অপরটি বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ল্যাটিন ভাষায় একটি কথা প্রচলিত আছে যে, নীরোগ দেহের আশ্রয় ব্যতীত শক্তিসম্পন্ন মন বাস করিতে পারে না, ইহা অতি সত্য কথা। দেহ অসুস্থ হইলে মন কিরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই।

ব্যায়াম সম্বন্ধে চরক এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"শরীর চেষ্টা যা চেষ্টা স্থৈর্য্যার্থা বলবর্দ্ধিনী।
দেহ-ব্যায়াম-সংখ্যাতা মাত্রয়া তাং সমাচরেৎ॥"

যে শারীর চেষ্টা দ্বারা দেহের স্থিরতা ও বল বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে দেহব্যায়াম কহে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহার সমাচরণ করিবে।

"লাঘবং কর্ম্ম সামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশ সহিষ্ণুতা।
দোষাপায়োঽগ্নি বৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥"

ব্যায়াম দ্বারা শরীর লঘু হয়, কর্ম্মশক্তি, স্থিরতা, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা ও পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং দৈহিক দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চরক অপরিমিত হাস্য, বৃথা বাক্যব্যয় প্রভৃতি অন্যান্য কদভ্যাসের ন্যায় অতি ব্যায়াম নিষেধ করিয়াছেন—

শ্রমক্লম ক্ষয় তৃষ্ণা রক্ত পিত্তং প্রতামকঃ।
অতি ব্যায়ামতঃ কাসোজ্বরশ্চর্দ্দিশ্চ জায়তে॥

ব্যায়াম হাস্য ভাষ্যাধ্ব গ্রাম্য ধর্ম্ম প্রজাগরান্।
নোচিন্তানপি সেবেত বুদ্ধিমানতি মাত্রয়া॥"

শ্রম, ক্লান্তি, ক্ষয়, তৃষ্ণা, রক্তবমন; দৃষ্টিহীনতা, কাসি, জ্বর এবং সর্দ্দি—অতি ব্যায়াম হইতে উৎপন্ন হয়। ব্যায়াম, হাস্য, বাক্যকথন, ভ্রমণ, জাগরণ প্রভৃতি দৈহিক কার্য্যগুলি বিধেয় হইলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি উহাদিগের একটিও অতি মাত্রায় সেবন করিবেন না।

আমাদিগের দেশের 'বড়মানুষেরা' কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য করা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভাবেন যে, 'বড়লোকেরা' পরিশ্রম করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা কেবল খাইয়া, শুইয়া, গল্প ও আমোদ করিয়া সময় কাটাইবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ লোকেরাই কায়িক পরিশ্রম করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যখন তাহারা 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া' জীবিকা অর্জ্জন করে, তখন তাহারা স্বভাব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করে মাত্র। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিজেদের আলস্যপরায়ণতা ও সাধারণ লোকের কর্ম্মবহুল জীবন ভগবানের অনুমোদিত বলিয়া উহার সমর্থন করিয়া থাকেন। শ্রমলব্ধ সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা ভোগ করা যে কি সুখ, তাহা যে একবার জানিয়াছে, সে কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষুধা কাহাকে বলে, তাহা অনেক সময় জানিতে পারে না। সুতরাং বিবিধ ভোগ্যবস্তু আহার করিবার সুবিধা থাকিলেও ক্ষুধার অভাবে, আহারে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহার আস্বাদ তাহার ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না। ক্ষুধাই খাদ্যকে অমৃততুল্য করে, ক্ষুধা বিনা ভোগ্যবস্তুর আয়োজন বিড়ম্বনা মাত্র হইয়া থাকে। অলস ব্যক্তি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এবং তাড়িত-ব্যজন সেবিত হইয়াও রাত্রিকালে সুনিদ্রা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সুনিদ্রার অভাবে অনেক সময়ে তাহার "শয্যাকণ্টক" উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রমশীল ব্যক্তি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াও বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে দেবদুর্লভ শান্তিসুখ লাভ করিয়া থাকে। পরিশ্রম ব্যতীত বিবিধ ভোগ্যবস্তুর প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের ভোগ্যবস্তুর অভাব নাই, তাঁহারা যদি স্বকীয় দোষে তাহাদের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথার্থই কৃপার পাত্র। অবশ্য যাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও স্ব স্ব সাংসারিক অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা পরিশ্রম করে বলিয়াই যে শান্তি, সুখ ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া সকলকেই যে "জনমজুরের" মত খাটিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করা অসম্মানের কার্য্য, এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দেশের অনেক লোকের মনে এখনও বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়া এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই অপুরুষোচিত বিশ্বাস হইতেই আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা এদেশে সমুচিত অপমানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আত্মসম্মানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া মুষ্টিমেয় সাহায্যের জন্য সমস্ত দিন কোন ধনী ব্যক্তির বা দাতব্য সভার দ্বারে "ধর্ণা" দিয়া লোকে বসিয়া থাকিবে বরং তাহাও ভাল, তথাপি সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর থাকিতেও "গতর খাটাইয়া" অন্ন সংস্থানের চেষ্টা কখনই করিবেক না, কারণ ইহাতে তাহার ব্যক্তিগত ও বংশগত মর্য্যাদার হানি হইবে। এইরূপ অলস জীবন কিছুদিন অতিবাহিত করিলেই এমন এক বদভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। দেশের মধ্যে যে কত লোকের জীবন এইরূপ চেষ্টাশূন্য ও উদ্যম বিহীন হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা পরপুষ্ট জীবের (Parasite) ন্যায় সমাজ-

হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আশ্রম-বিশেষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে, বিশেষতঃ সংসারীর পক্ষে, উহা অপেক্ষা নীচবৃত্তি আর কিছুই হইতে পারে না। যাহারা এই বৃত্তি অবলম্বন করে এবং যাহারা ইহার প্রশ্রয় প্রদান করে, তাহারা উভয়েই তুল্য অপরাধী এবং ইহার জন্য যে সামাজিক ও জাতিগত অবনতি সংঘটিত হইতেছে, তাহার জন্য দাতা ও গৃহীতা উভয়েই তুল্য ভাবে দায়ী। পাশ্চাত্যদেশে শ্রমশীল লোকের সংখ্যা এত অধিক বলিয়া উহাদিগের গৃহে কমলা চিরদিনই অচলা হইয়া রহিয়াছেন, আর আমরা আলস্য ও উঞ্ছবৃত্তির সেবা করিয়া দিন দিন এইরূপ "লক্ষ্মী ছাড়া" দশা প্রাপ্ত হইতেছি। নিঃসহায় অন্ধ, খঞ্জ, রোগার্ত্ত বা জরাপীড়িত ব্যক্তি সমাজের অবশ্য পোষ্য এবং এমন কোন দেশই নাই, যথায় তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য কোন না কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। দুঃখীর দুঃখ মোচন করা মনুষ্যোচিত কার্য্য। যে ব্যক্তি ক্ষমতাসত্বে এরূপ কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে "মানব" নাম ধারণের অযোগ্য। কিন্তু আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়াও দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারা যায় এবং প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীর ঐরূপ সদুপায় অবলম্বন করাই উচিত। সেই সকল সদুপায় কি, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নহে, তবে ইহা সত্য কথা যে, সুস্থ, সবল "পেশাদার" ভিখারীকে ভিক্ষা দিয়া আমরা যেরূপ বিনা সঙ্কোচে তাহার আলস্যের এবং অনেক স্থলে তাহাদিগের কুচরিত্রের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া দিই, এবং তাহার ইহ ও পরকালের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিই এরূপ আর অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যতদিন পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশের কায়িক পরিশ্রম সম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিবে না, আমাদের হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদা-বোধ জাগরূক হইবে না, আত্মনির্ভরতা আমাদের জাতীয় চরিত্র সুশোভন করিবে না, এবং কোন বিষয়েই আমাদের দৈন্যও ঘুচিবে না।

কর্ম্ম করিবার জন্যই মানুষের জন্ম, কর্ম্ম করা ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় আর নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
"কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়।
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়॥—সত্যেন্দ্রনাথ।

সকল দেশের সকল ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র দ্বারা এই মত বিশেষভাবে সমর্থিত হইয়াছে। তবে অবস্থা ভেদে মানুষের কর্ম্মের প্রভেদ হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষে কাজ না করিলে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম তাহার জীবনের সহায় স্বরূপ। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার জন্য যাহাদের কর্ম্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না, কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না করিলে তাহাদেরও জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। মানুষকে কাজ করিতে দেখিয়া মানুষের অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কিরূপে জন্মিতে পারে তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। যে মানুষের কণামাত্র আত্মসম্মান ও দায়িত্ব জ্ঞান আছে, সে কখনই অলসজীবন বহন করিতে স্বীকৃত হয় না। কর্ম্ম যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পন্ন করিতে না হয়, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। অবশ্য ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কর্ম্ম অনেক স্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় হইয়া থাকে। কর্ম্ম অপেক্ষা সুশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই। কর্ম্মই মানুষকে শত শত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব ও বিবিধ অবস্থার সংঘর্ষে আনয়ন করে, সুতরাং কর্ম্ম দ্বারাই তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। মহাপুরুষেরা জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারাই জগতের ইতিহাসে অবিনশ্বর কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আজ পৃথিবীতে যাহা কিছু মনস্বিতার, যাহা কিছু জ্ঞানের,

যাহা কিছু উন্নতির; যাহা কিছু উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে মানবের অবিরাম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই॥

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান কর্ম্মভূমি আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম সামগ্রীটিও জীবনব্যাপী পরিশ্রম ব্যতীত উৎপন্ন হয় নাই। একজন ধর্ম্মযাজক রহস্যচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন,—"পরিশ্রম করা অপেক্ষা পরিশ্রম না করাই অধিক পরিশ্রম সাপেক্ষ।" বাস্তবিক অলস ব্যক্তির জীবনের ভার অনেক সময়ই নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া তাহার মনে হয়। ধন, জন, যশ, সম্পদ সুখ, স্বচ্ছন্দতা, সকল গুলিই পরিশ্রমশীল ব্যক্তির করতলগত থাকে। উদ্যোগী পুরুষ সিংহই লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন।

যৌবনকালে আলস্যের ন্যায় অধঃপতনের সরল পথ আর নাই। এই সময়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকিলে, মানুষের চরিত্র ও মহত্ব উভয়ই চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া গিয়াছেন যে, আলস্যই মনুষ্যের জীবন্তসমাধি, সে যখন জীবিত থাকিয়া—না মনুষ্যের, না ঈশ্বরের কাহারও কার্য্যে লাগে না, তখন মৃত বা জীবিত অবস্থা তাহার পক্ষে উভয়ই সমান। প্রাচীন গ্রীকগণ সমাজ রক্ষার জন্য কায়িক পরিশ্রম এতই আবশ্যক মনে করিতেন যে, কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহার সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, "পরিশ্রম- সমাজে পাপ-নিবারণের উপায়।" যে অলস, তাহাকে তাঁহারা চোর ডাকাইতের সহিত তুলনা করিতেন। একখানি ইংরাজী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, "অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক পাপপুরুষের কারখানা স্বরূপ। কারণ যত কিছু গর্হিত কার্য্য পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত।"

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করা যায় না। ব্যায়াম করা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, শিশু ও বালকদিগের স্বাভাবিক চঞ্চলতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সামর্থ্য অনুসারে যে অঙ্গ যত অধিক চালনা করিবে, তাহা ততই পুষ্টি ও শক্তিলাভ করিয়া অধিকতর কার্য্যক্ষম হইবে। হাতপায়ের ব্যবহার না থাকিলে, উহাদের মাংসপেশী হীনবল ও শুষ্ক হইয়া যায়। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর হস্তপদ বা ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদিগের হাত ইহার উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। হস্তপদের যথারীতি চালনা করিলে পেশী সমূহ দৃঢ়, পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে। কামারের হাত, ডাকহরকরার পা, মাঝিদিগের বক্ষঃস্থল ও বাহু প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

ব্যায়াম করিলে, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা হইয়া সর্ব্ব শরীরে রক্ত উত্তমরূপে পরিচালিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। যথারীতি ব্যায়াম না করিলে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করিলে হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন ও অন্যান্য দুরারোগ্য রোগ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এজন্য অতি ব্যায়াম অথবা দুর্ব্বল ব্যক্তি কিম্বা যাহাদের কোনরূপ হৃদ্রোগ আছে, তাহাদের শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা অনুচিত।

ব্যায়াম করিলে, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, এই জন্য ফুসফুস্ অধিকতর অকসিজেন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। এই অতিরিক্ত অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয় এবং এইরূপে শোধন ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে শ্বাস ক্রিয়া সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। গভীর নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। গভীর নিঃশ্বাস লইলে ফুসফুস সমধিক বিস্তৃত হয় এবং অধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার হেতু রক্তশোধন কার্য্যের সুবিধা হয়। পুনশ্চ ফুসফুসের মধ্যে

যে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হয়, শ্বাস ক্রিয়া গভীর হইলে, তাহার অধিকাংশ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। সর্ব্বদা সোজা ভাবে শরীর উন্নত করিয়া রাখা উচিত, নহিলে ফুসফুসের ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। কুঁজা হইয়া বসিলে অথবা কাত হইয়া বাঁকিয়া থাকিলে ফুসফুসের যথোচিত প্রসারণের ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা অনিষ্টকর। আমরা পড়িবার বা লিখিবার সময় প্রায়ই কুঁজা হইয়া বসি, ইহা দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। আমাদিগের যোগশাস্ত্রে শ্বাসক্রিয়া গ্রহণ করিবার যে নিয়ম বর্ণিত আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সোজা ভাবে উপবেশন করিয়া গভীর নিঃশ্বাস লইবার কথাই আছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

গণোরিয়া ও সিফিলিস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন]

গণোরিয়া।—এইবার চিকিৎসার কথা বলিব। গণোরিয়া ও সিফিলিসের একই কারণ হইলেও রোগের অবস্থাভেদে চিকিৎসার প্রকরণ স্বতন্ত্র। সিফিলিসের ভীষণ পরিণামের কথা পূর্ব্বে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, গণোরিয়ার পরিণামও কম শোচনীয় নহে। এই রোগে আক্রান্ত হইয়া ভালরূপ রোগমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিণীতা স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য, নতুবা স্বামীর প্রায়শ্চিত্ত স্ত্রীকেও করিতে হয়, অনেকে এই কথা জানেন না বলিয়াই আমাদের দেশে অবলা জাতিও নানারূপ কুৎসিত রোগে আক্রান্তা হইয়া শরীরটিকে চিরদিনের মত রুগ্ন ও ভগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন। গণোরিয়ার পরিণতি সন্ধিবাত বা গেঁটেবাত, ইহা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাধি। গণোরিয়ার পরিণাম শুধু যে সন্ধি সকলই পীড়িত হইয়া থাকে, এমন নহে, অনেক সময় হৃদপিণ্ডও আক্রান্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

গণোরিয়ার মূল সূত্র।—গণোরিয়া উৎপত্তির মূলসূত্র বা মূল কারণ যে দূষিতযোনি-বেশ্যার সহবাস—সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদে ইহার নাম ঔপসর্গিক মেহ। দূষিতযোনি-বেশ্যা-সহবাসের প্রায় এক সপ্তাহ পরেই এই রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথম প্রথম লিঙ্গের অগ্রদেশে সুড়সুড়ি বোধ হয়, মূত্র ত্যাগের পরে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূতি হয়, বারম্বার লিঙ্গোদ্রেক এবং মূত্র ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। লিঙ্গনালী মধ্যে ক্ষত, লিঙ্গ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, লিঙ্গনালী হইতে ক্লেদ ও পূঁয বা রক্তস্রাব, কুঁচকি প্রদেশে এবং অণ্ডকোষে বেদনার অনুভূতি—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। অচিকিৎসার ফলে বা ঠিক ভাবে চিকিৎসা না হইলে, ইহা হইতে ষ্ট্রিকচার বা মূত্রনালীর সংকীর্ণতা ঘটিয়া থাকে, পীড়া পুরাতন হইলে যন্ত্রণা কমিয়া যায় বটে, কিন্তু সংক্রামকতা দোষ নষ্ট হয় না। এই জন্য পীড়া উপস্থিত হওয়া মাত্র সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গণোরিয়ার চিকিৎসা।—এলোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের নানারূপ ঔষধ আছে এবং সে সকল ঔষধে আশু উপকার হইতে দেখা যায়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবনে যেমন রোগের বীজ সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া থাকে, অন্য চিকিৎসায় সেরূপ আশা করা যায় না। সকল প্রকার চিকিৎসাতেই প্রস্রাব পরিষ্কার রাখা এই পীড়ার প্রধান চিকিৎসা। প্রস্রাব সরল রাখিবার জন্য তৃণপঞ্চমূলের (কুশের মূল, কেশের মূল, বেণার মূল, কৃষ্ণ ইক্ষুর মূল ও খাগড়ার মূল প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া) ক্কাথ

সহ যবক্ষার এক আনা হইতে দুই আনা মাত্রায় সেবন করান উচিত। তদ্ভিন্ন ক্ষত নিবারক যোগ সকলের ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। নিম্নে ক্ষত নিবারক কয়েকটি যোগের কথা বলা যাইতেছে :—

ক্ষত নিবারক যোগ:—ত্রিফলার ক্কাথ (হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেক দ্রব্য ৵৹ সাড়ে ছয় আনা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া) বাবলা ছালের ক্কাথ (বাবলার ছাল দুই তোলা, জল আধসের, শেষ আধ-পোয়া), অশ্বত্থ ছালের ক্কাথ (অশ্বত্থ ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধপোয়া), জাতীফুলের পাতার ক্কাথ (জাতী ফুলের পাতা ২ তোলা, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া) খদির ভিজান জল এবং দধির মাত—ইহাদের যে কোন একটি দ্রব্য দ্বারা পিচকারী দিলে ক্ষত নিবারিত হইয়া থাকে। গণোরিয়ার চিকিৎসা করিবার সময় ক্ষত নিবারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগগুলির পিচকারি দিলে শীঘ্র ফল দর্শিয়া থাকে।

সেবনের ঔষধ—তদ্ভিন্ন সেবনের ঔষধও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ কয়েকটি সহজসাধ্য ঔষধের কথা বলা যাইতেছে। (১) কাবাবচিনির গুঁড়া তিন আনা, সোণামুখীর গুঁড়া এক আনা এবং সোরা ৴৹ এক আনা। একত্র মিশাইয়া প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে এবং রাত্রিতে কাবাবচিনির গুঁড়া এক আনা, কর্পূর দুই রতি ও অহিফেন অর্দ্ধ রতি, একত্র মিশাইয়া ঐরূপ শীতল জল সহ সেবন করাইবে। এই ব্যবস্থায় ক্ষতের শান্তি হইয়া থাকে এবং পরিষ্কাররূপে মূত্র নির্গম হয়। ইহা ভিন্ন **বৃহদ্বঙ্গেশ্বর** এবং **মেহমুদ্গর** নামক ঔষধ দুইটি একবেলা গঁদ ভিজান জল এবং অপর বেলা সোরা ভিজান জল বা বাবলার পাতার রস সহ ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুইটী ঔষধের দ্বারা ক্লেদ পূযাদির নিঃসরণ বন্ধ হইয়া থাকে। নিম্নে এ দুইটি ঔষধের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর—

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রৌপ্যং কর্পূরমভ্রকম্।
কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সুতাস্মিন্ হেমমৌক্তিকম্॥
কেশরাজ রসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফল মানতঃ।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর ও অভ্র—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা এবং স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা। সমস্ত দ্রব্য কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটি।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরের উপাদান গুলির গুণ—এখন দেখা যাউক ইহার উপাদন গুলির গুণ কি?

বঙ্গ—

বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকফক্রিমীন্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥
সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি—
তথৈব বঙ্গোহখিল মেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং
নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥

অর্থাৎ—বঙ্গ, লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য চক্ষুর হিত-কারক,—ঈষৎ পিত্ত বর্দ্ধক। ইহা প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক। সিংহ যেরূপ হস্তীসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গ সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সুখ-দায়ক, ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা সম্পাদক, ও মানবের পুষ্টি বিধায়ক।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক। গন্ধক—কফ-পিত্তঘ্ন।

রৌপ্য—

রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ॥
প্রমেহাদিক রোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্।

অর্থাৎ রৌপ্য—শীতবীর্য্য, অম্ল, কষায়, মধুর রস,—মধুর বিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ ও লেখন (যাহা দ্বারা ধাতু ও দেহস্থ মলাদির শোষণ ক্রিয়া হইয়া থাকে) গুণ-

যুক্ত। ইহা দ্বারা বায়ু-পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

কর্পূর—

কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভি র্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥
দাহতৃষ্ণাস্য-বৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধ্য নাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ॥
বেদনাহারকঃ কামশান্তি কৃচ্ছ্রক্রমেহহৃৎ।

অর্থাৎ—কর্পূর—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক গুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত রস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্ম-বর্দ্ধক, ও কামশান্তিকর। কফ, পিত্ত, বিষদুষ্টি, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দৌর্গন্ধ্য, আক্ষেপ, বেদনা ও শুক্রমেহ ইহাদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।

অভ্র— অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহ-কুষ্ঠ-প্লীহোদর গ্রন্থি বিষ ক্রিমীংশ্চ॥

অর্থাৎ—অভ্র কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতু বর্দ্ধক এবং ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমি নাশক।

স্বর্ণ—

সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বলং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্রং মেধাস্মৃতিমতি প্রদম্।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তি বাগ্ বিশুদ্ধি স্থিরত্ব কৃৎ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ ত্রিদোষজ্বর শোষজিৎ।

অর্থাৎ সুবর্ণ—শীতবীর্য্য শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, রসায়ন মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয় গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পাদক এবং ইহা স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ জ্বর ও শোষ রোগ নাশক।

মুক্তা।—

মুক্তা কষায়া স্বাদী চ বলপুষ্টি প্রদায়িনী।
বৃষ্যা নেত্রাহিতা রাজযক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী॥
স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাৎ গ্রহপাপনুৎ॥

মুক্তা—কষায়-মধুররস, বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বৃষ্য, নেত্রের হিতকর, বিষদোষ ও রাজযক্ষ্মা নাশক। ইহা স্ত্রীলোকদিগের কান্তি ও রতি শক্তি বর্দ্ধিত করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপ নষ্ট হয়।

মেহমুদ্গর রস।—

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহ চূর্ণন্তু তৎসমম্॥
পলৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।

রসাঞ্জন, বিট লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুর বীজ ও দাড়িম বীজ—প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা; লৌহ ৬ তোলা এবং গুগ্গুল ৮ তোলা,একত্র গব্যঘৃত দ্বারা বাটিয়া ৩।৪ রত্তি বটি করিবে।

মেহমুদ্গর রসের উপাদানগুলির পরিচয়।

রসাঞ্জন।—

রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্মবিষনেত্রবিকারহৃৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ॥

রসাঞ্জন—কটু-তিক্তরস, উষ্ণ, রসায়ন, ছেদন ও ব্রণদোষ হারক।

বিট লবণ।—

দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহ বিষ্টম্ভহৃদ্রুগগৌরব শূলনুৎ॥

বিট লবণ—অগ্নির দীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য রুক্ষ, রুচি-কারক ও ব্যবায়ি। বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শারীরিক গুরুত্ব ও শূল ইহা সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

দেবদারু।—

দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মান শোথাম-তন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ॥
প্রমেহপীনসশ্লেষ্মকাসকণ্ডূ সমীরনুৎ॥

ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক। ইহা বন্ধ, আধ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নষ্ট করিয়া থাকে।

বেলশুঁঠ।—

বালং বিল্ব ফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু।
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাত কফাপহম্॥

কাঁচা বেল শুষ্ক করিলে বেলশুঁঠ হইয়া থাকে। ইহা ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, এবং ইহা বায়ু ও কফ নাশক।

গোক্ষুরবীজ।—

বীজং গোক্ষুরকং শীতং মূত্রলং শোথনাবণম্।
বৃষ্যমায়ুষ্করং শুক্রমেহমূৎকৃচ্ছ্র নাশনম্॥

ইহা শীতবীর্য্য, মূত্রকারক, বৃষ্য ও আয়ুবর্দ্ধক।

দাড়িম বীজ।—দাড়িম তিন প্রকার, মধুর অম্ল মধুর ও অম্ল। ইহাদের মধ্যে

মধুর দাড়িম।—

তৎতুস্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্দাহজ্বরনাশনম্।
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।

অর্থাৎ মধুর দাড়িম—বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায় রস, ধারক, স্নিগ্ধ এবং মেধা ও বলবর্দ্ধক।

অম্ল মধুর।—

স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘুং।

অর্থাৎ অম্লমধুর দাড়িম—অগ্নিদীপ্তিকর, রুচিকর, কিঞ্চিৎ পিত্ত বর্দ্ধক ও লঘু।

অম্লদাড়িম।—

অম্লন্ত পিত্তজনকম্লং বাতকফাপহম্।

ইহা পিত্তবর্দ্ধক, অম্লরস, কফ ও বায়ু নাশক।

লৌহ।—

লৌহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ॥
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃ প্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥

লৌহ—তিক্ত-মধুর-কষায় রস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়স্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখন গুণযুক্ত ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ রোগ নাশক।

গুগ্গুলু।—

গুগ্গুলুর্ব্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
কষায়কটুকঃ পাকে কটুরুক্ষো লঘুঃ পরঃ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ।
দীপনঃ পিচ্ছিলঃ বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥
মেদো মেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্।
পিড়কাগ্রন্থিশোথার্শো গণ্ডমালাক্রিমীন্ জয়েৎ॥
মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা।
তিক্তত্বাৎ কফজিৎ তেন গুগ্গুলুঃ সর্ব্বদোষ হা॥

অর্থাৎ গুগ্গুলু—বিশদ, তিক্ত, কটু, কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্ন সন্ধানকারক, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্বরপ্রসাদক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল ও বলকারক। ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, বাত রোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি বিনাশক। গুগ্গুলু মধুর রস দ্বারা বায়ু নষ্ট করে, কষায় রস দ্বারা পিত্ত নষ্ট করে এবং তিক্ত রস দ্বারা কফ নষ্ট করে, সুতরাং গুগ্গুলু ত্রিদোষ-নাশক।

গব্যঘৃত।—

গব্য ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্॥
মেধালাবণ্য কান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম।
সুগন্ধিরোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্॥

ইহা অত্যন্ত চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, অলক্ষ্মী (দুর্ভাগ্য) বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধি, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ। গব্যঘৃত সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের ঘরের চন্দনাদি লৌহ।—

জ্বালা যন্ত্রণাময় মেহ এবং গণোরিয়া রোগে "চন্দনাদি লৌহ" নামে আমরা আমাদের পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত একটি ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা অতিশয় ফলপ্রদ, নিম্নে উহার উপাদান গুলি বলা যাইতেছে :—

মেহে চন্দনাদি লৌহ।—কাবাবচিনি, গোক্ষুর বীজ, ফটকিরি, বঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, যবক্ষার ও রসসিন্দুর—প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ। সমস্ত দ্রব্যের সমান রক্তচন্দন এবং রক্তচন্দন লইয়া সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লৌহ। ইসবগুল ভিজান জলে মর্দ্দন করিয়া ৪।৫ রতি বটি। অনুপান—কর্পূর ভিজান জল।

দ্রব্যগুলির গুণ পরিচয় :—

কাবাব চিনি।—

শ্লেষ্মোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা।
ঔপসর্গিকমেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্॥
শ্বেতপ্রদর মর্শাংসি-কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ।

ইহা বাত প্রশমক, কফনিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্দ্ধক। ঔপসর্গিক মেহ, শুক্র মেহ, শ্বেত প্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র ইহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোক্ষুর বীজ।—মূত্রকারক।

ফটকিরি।—

স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবিসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী॥

ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য যোনিসঙ্কোচক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্প রোগ নাশক।

বঙ্গ—সকল প্রকার প্রমেহ নাশক। হরীতকী—ত্রিদোষ নাশক। আমলা—বায়ু পিত্ত প্রশমক। বহেড়া কফ পিত্ত নাশক।

যবক্ষার।—

যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ।
নিহন্তি শূলবাতাম শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
পাণ্ড্বর্শো গ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্।

ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, অতি সূক্ষ্মস্রোতোগামী ও অগ্নি দীপক। ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ পাণ্ডু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নাশক।

রস সিন্দুর।—

পারদঃ ক্রিমি কুষ্ঠঘ্নো জয়দো দৃষ্টিকৃৎসরঃ।
মৃত্যুঘ্নশ্চ মহাবীর্য্যো যোগবাহী জরাপহঃ॥
স্বাস্থ্যোজোরূপদো বৃষ্যো বুদ্ধিকৃদ্ ধাতুবর্দ্ধনঃ।
যস্ত রোগস্য যো যোগেস্তেনৈব সহযোজিতা।
রসেন্দ্রো হন্তি তং রোগং নরকুঞ্জরবাজিনাম্॥

ইহা ক্রিমি নাশক, কুষ্ঠঘ্ন, স্বাস্থ্যপ্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক অকালমৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান জরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডু রোগ প্রশমক এবং উপযুক্ত কাথাদির সহিত সর্ব্ব ব্যাধি বিনাশক।

রক্ত চন্দন।—

রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্র পিত্তহৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জরব্রণ বিষাপহম্॥

ইহা শীতল, গুরু, স্বাদু, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক ও বলকর। ইহা ব্যবহারে বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষ দোষ নষ্ট হইয়া থাকে।

লৌহ—মেহ নাশক।

গণোরিয়ার দাস্ত পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্রতি সপ্তাহে এরণ্ড তৈলের জোলাপ লওয়া মন্দ ব্যবস্থা নহে। গণোরিয়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে জানিবা মাত্র চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য, নতুবা ইহার পরিণাম যে সন্ধিবাত, বিস্ফোটক প্রভৃতি, সে সকল কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অজীর্ণ (Dyspepsia).

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

সকল প্রকার অজীর্ণ তাহাদের চিকিৎসার সহিত বর্ণিত হইল। আমাদের শরীর খাদ্যের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। খাদ্য সম্যক জীর্ণ হইলে এবং শরীরে সম্যক ভাবে গৃহীত হইলে, শরীর সুস্থ থাকে। সম্যক ভাবে জীর্ণ না হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণগুলির দ্বারা আক্রান্ত হইলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন "অজীর্ণাৎ পবনাদীনাং বিভ্রমো বলবান্ ভবেৎ।" এমন কি তিনি রোগ সকলকে আগন্তুক, শারীর, মানস এবং স্বাভাবিক এই চারি ভাগে ভাগ করিয়া তন্মধ্যে সকল প্রকার শারীর রোগকে অন্নপানের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়াছেন। "শারীরা-স্ত্বন্নপানমূলা বাতপিত্ত-কফ শোণিত-সন্নিপাত বৈষম্য নিমিত্তাঃ॥" সকল শারীর রোগ অন্নপানের বৈষম্য জন্য যে অজীর্ণ তাহা হইতে উৎপন্ন হইলেও সাধারণতঃ অজীর্ণ লক্ষণযুক্ত যে সকল রোগ তাহাদের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। "বিসূচ্যলসকৌ তত্মাত্তবেচ্চাপি বিলম্বিকা।"

১। বিসূচিকা—

সুশ্রুত বলেন "সূচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ। যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে॥"

যে রোগে অজীর্ণ জন্য প্রকুপিত বায়ু সূচীবিদ্ধবৎ সকল গাত্রে বেদনা উৎপাদন করে সেই রোগকে বিসূচিকা বলা হয়। বিসূচি নামকরণ জন্য এই প্রকার নিরুক্তি উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা এই রোগের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। প্রকুপিত বায়ু সর্ব্বদেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া যে কোনও রোগে এবম্বিধ বেদনা উৎপাদন করিতে পারে। আর কেবল যে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনাই এই রোগে উপলব্ধি হয়—তাহাও নহে। অন্য প্রকার বেদনাও থাকে। যদুক্তং "বিবিধৈর্বেদনাভেদৈ-র্বায়্বাদেভৃর্শ কোপতঃ। সূচীভিরিব গাত্রাণি ভিনত্তীতি বিসূচিকা॥" মহর্ষি চরক বলেন "ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ প্রবৃত্তাম দোষাং যথোক্তরূপাং বিসূচীং বিদ্যাৎ।" অর্থাৎ দোষ আমত্বপ্রাপ্ত হইয়া যে রোগে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ প্রবৃত্ত হয়, সেই রোগকে বিসূচিকা বলে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, আম দোষ ঊর্দ্ধ এবং অধোমার্গে বহির্গত হয় এবং গাত্রে নানাপ্রকার যন্ত্রণা হওয়াই এই রোগের অব্যাভিচারী লক্ষণ। অবশ্যই ইহার সহিত পিপাসা, শূল, বমন উদ্বেষ্টন, জৃম্ভা, মূর্চ্ছা, বৈবর্ণ্য, কম্প, হৃদয়ের পীড়া, শিরোভেদ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল লক্ষণই যে যুগপৎ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নহে।

দোষের বলাবলানুসারে এবং রোগের বৃদ্ধির সহিত এই সকল লক্ষণ ক্রমে আসিতে পারে কিন্তু উর্দ্ধাধঃ আমদোষ প্রবৃত্তি অর্থাৎ বমন ও অতিসার এবং গাত্রের তোদ ভেদাদি প্রথম হইতেই থাকিবে।

একণে আমদোষ বলিতে আমরা কি বুঝি। রসশেষা-জীর্ণ প্রকরণে যে ভাবে রস অপরিণত অবস্থায় থাকে, তাহা উক্ত হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ঐ রস দোষ দুষ্ট হইলে, আমরস নামে অভিহিত হয়। "উষ্ণ-পোয়ে বলেছেন ধাতুমাদ্যমপাচিতং। দুষ্টামাশয় গতং রস-মামং প্রচক্ষতে॥ সামেন তেন সংযুক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতা। সামাইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ॥" দোষদ্বারা দুষ্ট এবং আমাশয়গত অন্নরসকে আমদোষ বলে। এই আমদোষ শরীর হইতে আমাশয়ে উপস্থিত হইয়া যখন উর্দ্ধাধঃ প্রবৃত্ত হইতে থাকে, সেই সময়ে আমাশয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে শরীর দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার দ্রব পদার্থ কোষ্ঠাভিমুখে কর্ষিত হয় বলিয়া শরীর স্রোতঃ গুলি রিক্ত হইয়া পড়ে। তখন প্রকুপিত বায়ু সেই সকল স্রোতে অধিষ্ঠিত হইয়া তোদ, ভেদাদি উৎপাদন করে। পূর্ব্বোক্ত অন্নরসের দ্রব্যাংশ যাহা শরীরে উৎপন্ন ক্লেদ সকলকে বিধৌত করিয়া শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে, সেই দ্রব একণে বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া, আর স্বকার্য্য করিতে পারে না। তজ্জন্য বিসূচিকা রোগীর মূত্র সঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। শরীরের উষ্ণ দ্রব দ্রব্যের ক্ষয় জন্য এবং শীত গুণবিশিষ্ট বায়ুর অধিষ্ঠান জন্য রোগীর গাত্রে স্বাভাবিক তাপাপেক্ষা তাপের অল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগীর শরীর হইতে দ্রবাংশের ক্ষয় জন্য তাহার মাংস-তন্তুর আর্দ্রাল্পতা জন্মে—এবং শিরাপথে ভ্রমণশীল রক্তেরও দ্রবাল্পতা নিবন্ধন ঘনত্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটে, সেই জন্য রোগীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিলে একপ্রকার অস্পষ্ট ধ্বনি (Soft murmurs) শ্রুত হয়। হৃদয় একটু বিস্ফারিত (flace-id) হইতে দেখা যায়। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবসন্নতা দূর করিবার জন্য এবং শরীরের ক্লেদ দূর না হওয়ার জন্য ও তাহার উৎপত্তি বিদ্যমান থাকায়—সেই বর্দ্ধমান ক্লেদ এবং প্রদুষ্ট শ্লেষ দ্বারা শরীরে বিষ সঞ্চয় হইবার আশঙ্কা থাকে বলিয়া, প্রকৃতির তাড়নায় বিষ্ণুপদামৃতাখ্য বায়ুর দ্বারা সেই বিষদোষ যাহাতে শরীরে না জন্মিতে পারে, তাহার জন্য রোগীর একটু দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে। কিন্তু শ্বাস যন্ত্রের মাংসতন্তুর দ্রবাল্পতা নিবন্ধন উহা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া, সম্যক্ কার্য্যক্ষম থাকে না। তখন দ্রুত শ্বাস চলিতে থাকে এবং বিষক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার ফলে রোগী শ্যাববর্ণ হইয়া যায়। নখে ও দাঁতে ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। এই সময়ে চর্ম্মের উপর এক প্রকার শীত স্বেদ দেখা যায়। নাড়ী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া সূত্রাকারে পরিণত হয়। চক্ষু বসিয়া যায়,—মুখে কুটিলভাব লক্ষিত হয়, স্বর বসিয়া যায় এবং সংজ্ঞা তমসাভিভূত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার পরেই রোগীর নাড়ী স্পন্দন লোপ পায় এবং মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করে।

(ক্রমশঃ)

রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়

(ডাঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন এম-বি)

আজকাল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক প্রকার সংক্রামক রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল বীজাণু ক্ষেত্রানুসারে বিভিন্ন প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। যেমন শস্যের বীজ প্রস্তরে বপন করিলে অঙ্কুরিত না হয়, সেইরূপ কোন কোন রোগের বীজাণু কোন কোন মানব দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়া যায়। উর্ব্বর-ক্ষেত্রজাত বৃক্ষ হইতে যেরূপ প্রচুর ফল জন্মে, সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য নিস্তেজ দেহে রোগের বীজাণু সকল প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্পকালেই ভীষণরূপ ধারণ করে। একই ফুলকপির বীজ যেমন প্রস্তরে অঙ্কুরিত হয় না, বিশেষ যত্নপূর্ব্বক মাটির টবের উপর লাগাইলে বিকৃত ও ক্ষুদ্র ফুলকপি প্রসব করে, কিন্তু উর্ব্বর ক্ষেত্রে লাগাইলে অতি সুন্দর এবং বৃহৎ পুষ্প ধারণ করিতে সমর্থ হয়; সেইরূপ রোগের বীজাণুরও ক্ষেত্রানুসারে হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বহু প্রকার রোগের বীজাণুর সংস্পর্শে থাকিলেও সকলের দেহে সকল প্রকার সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিতে পারে না; কেন না কোন কোন রোগের স্বভাবসিদ্ধ রোগ-বীজ-সহিষ্ণুতাশক্তি আছে, অর্থাৎ সংক্রামক রোগ সকল ইহাদের শরীরে সহসা প্রবেশলাভ করিতে পারে না। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, প্লেগ, বসন্ত ও ক্ষয়কাস গ্রস্ত রোগীর সেবা করিয়াই যে, সেই সেই রোগগ্রস্ত হইয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু অনেকের এই প্রকার স্বাভাবিক সহিষ্ণুতা নাই বলিয়া যুক্তিযুক্ত উপায়ে যাহাতে এই সহিষ্ণুতা শক্তি জন্মে বা বৰ্দ্ধিত হয় সেইরূপভাবে জীবন যাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

প্রাচীনকালে ঋষিগণ দেহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক রসায়ন সেবন করিতেন, এবং যে স্থানে সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখিতেন, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। কিন্তু যাঁহাদের স্থান পরিত্যাগ করিবার সুবিধা নাই বা যাঁহারা বহুমূল্য ও বহু প্রয়াসসাধ্য রসায়ন সেবন করিতে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে কতকগুলি সদুপদেশ প্রতিপালন করা একান্ত কৰ্ত্তব্য।

১। অনেকেই জানেন যে খাদ্য ও পানীয়ের সহিত অনেক রোগের বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে। ভাত, ডাল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যে উত্তাপে সিদ্ধ হয়, সেই উত্তাপে কোনও রোগের বীজ জীবিত থাকিতে পারে না। অন্ন সিদ্ধ করিবার সময় যে উত্তাপ আবশ্যক হয়, সেই উত্তাপের কিয়দংশ অন্নে বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে ভোজন করিলে আহারের সহিত রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন,—"উষ্ণং ভুঞ্জীয়াৎ।" অন্ন শীতল হইলে তাহাতে অনেক মক্ষিকাদি বসিয়া রোগের বীজাণু মিশাইয়া দিতে পারে, সেইজন্য খাদ্যদ্রব্য ও কৰ্ত্তিত ফলমূলাদি সকল অনাবৃত রাখা কখনও উচিত নহে। এস্থলে আরও একটী কথা বলা আবশ্যক যে, অন্ন অত্যন্ত গরম অবস্থায় খাইলে বলহানি হয় এবং অত্যন্ত শীতল বা শুষ্ক খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয় না। অতএব অন্নের উত্তাপের মধ্যম অবস্থায় ভোজন করাই যুক্তিযুক্ত।

মাংস, অন্ন, দুগ্ধ ও জল সুসিদ্ধ হইলে পাকের অগ্নির প্রভাবে নির্দ্দোষ হয়, অর্থাৎ এই সকল পদার্থের সহিত কোনও রোগের বীজাণু জীবিত থাকিতে পারে না, সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বহ্নি—সর্ব্বভুক্। অগ্নির যুক্তিযুক্ত ব্যবহারে মানবগণ যে উপকার পাইতে পারেন, তাহা শত শত ঔষধে পাওয়া সুকঠিন।

২। শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; ইহা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। অল্প চেষ্টায় অনেক দীনহীন ব্যক্তি এ উপকার ভোগ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। প্লেগ প্রভৃতি রোগের বীজাণু কিয়ৎকাল রৌদ্রে থাকিলেই নষ্ট ও নিস্তেজ হইয়া যায়। অনেক রোগের বীজ অবরুদ্ধ বায়ুতে জন্মায়। বাসস্থানে যাহাতে বায়ু অবরুদ্ধ না থাকে, এইরূপ চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। নদীতীরে অথবা মাঠে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা কমিয়া যায়; যাঁহাদের দূরদেশে গমন করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহাদের নদীতটে বা মাঠে পরিষ্কার বায়ু সেবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। একই গ্রামে বা সহরে গুদামের ন্যায় ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মাঠে কিছুক্ষণ শীতল পরিষ্কার বায়ু সেবন করিলে স্থান পরিবর্ত্তনের ফল পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য প্রদেশে আজকাল ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে যত থাকা যায় ততই দেহাভ্যন্তরস্থ রোগের বীজ ধ্বংস হইয়া যায়।

৩। ব্যায়াম করিয়া শরীর দৃঢ় করিতে পারিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম হয়। আমাদের দেশে ব্যায়াম যতই প্রচলিত হইবে ততই মঙ্গল। আজকাল অজীর্ণ রোগ আমাদিগকে অন্তঃসারশূন্য করিয়াছে। ব্যায়াম করিলে, এমন কি বিরুদ্ধ ভোজন, (দুগ্ধ, মৎস্য ও মাংসাদি একত্র ভোজন) বা বিদগ্ধ ভোজন (ভাজা ও পোড়া) শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, ব্যায়াম দ্বারা সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং এই সত্ত্বগুণের দ্বারা মানুষ ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ হয়; তদ্ভিন্ন সত্ত্বগুণ বাড়িলে, অনেক রকম সংক্রামক রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

জগতে অসংখ্য প্রকার রোগের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং সেই সকল বীজের সংস্পর্শে আমাদিগকে অহোরহঃ আসিতে হইতেছে। ক্ষয় রোগের বা প্লেগ সংক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, এখন কুলের কুলবধূগণেরও যক্ষ্মা হইতে দেখা যায়। সুতরাং জগৎ হইতে বীজাণু ধ্বংস করা অপেক্ষা, দেহরূপ ক্ষেত্র যাহাতে রোগবীজের পক্ষে মরুভূমি হয়, সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

আজকাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আবিষ্কারে জানিতে পারা গিয়াছে যে য়্যানোফিলিস নামক মশকই ম্যালেরিয়া জ্বরের অণুর বাহক এবং মূষিক প্লেগ রোগাণুর বাহক। কিছুদিন পরে এইরূপ কত রোগাণু ও তাহাদের বাহক আবিষ্কৃত হইবে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? ইহাদের সমূলে বিনষ্ট করা বোধ হয় রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ অপেক্ষাও কঠিন কাজ। ঝড়ের সময় নাবিকদের ঝড় নিবারণ করা যেমন কঠিন, ইহাও তদপেক্ষা কিছু পরিমাণে কম নহে। নাবিকের পক্ষে হাল ছাড়িয়া ঝড়ের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ করিতে যাওয়া যেরূপ, জগৎকে রোগ বীজাণুশূন্য করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে সেইরূপ বুদ্ধির কাজ।

মূষিক মারা, মশক মারা, অনেক রোগের বীজাণুবাহি মক্ষিকা মারা, কাক মারা, এই প্রকার কত উপায়েই মনুষ্য আত্মরক্ষা করিতে উপদিষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, এত প্রকার জীবহত্যা না করিয়া নির্ভয়ে চিত্তে বল আকর্ষণ করিয়া সংক্রামক রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সেবা করা উচিত। রোগীর সেবা করিতে করিতে ডাক্তার বা পরিচারকগণের এক প্রকার সহিষ্ণুতা জন্মে। পূর্ব্বে রোগবীজাণু সম্বন্ধে আমার যে সকল সংস্কার ছিল, এক্ষণে কলিকাতার ড্রেন পরিষ্কারক মেথরগণের স্বাস্থ্য দেখিয়া সে ধারণা ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। একটা বাঙ্গলা কথা প্রচলিত আছে যে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়," ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য, যাহাদের মনে বল নাই, তাহাদের সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে আসা উচিত নহে।

প্রত্যেক চিকিৎসকই বিদিত আছেন যে, আমাদের

শরীরের স্বাভাবিক রোগ সহিষ্ণুতা শক্তিই অসংখ্য রোগের বীজ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। কারণ, এই শক্তির অভাবেই আমাদের শরীর নানা রোগের ক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া থাকে। জীবনীশক্তির তারতম্যে এক ব্যাধিই নানাপ্রকারে আমাদের শরীরে বিকাশ পাইতে পারে। এই শক্তি যে পরিমাণে হ্রাস হইবে, তদনুসারে এক রোগের বীজ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইবে। ক্ষেত্রের গুণেই রোগের নানা ভাব বিকাশ হইয়া থাকে।

রোগ বা জরা হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে চিত্তের বল যাহাতে বাড়ে এইরূপ প্রক্রিয়া করা উচিত। চিত্তে বল বাড়াইবার প্রথম সোপান ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধীর ও জিতেন্দ্রিয় হইতে না পারিলে রোগ সহিষ্ণুতা শক্তি বর্দ্ধিত হইবে না, সহিষ্ণুতা শক্তির অভাবেই মানুষ শীঘ্র শীঘ্র রোগগ্রস্ত হয়। যেমন, আফিং, সেঁকো প্রভৃতি বিষ অভ্যাস করিলে অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, সেইরূপ ড্রেন পরিষ্কারক মেথরেরাও অনেক প্রকার রোগ বীজাণু হইতে সহিষ্ণুতা প্রাপ্ত হয়। যত অস্বাভাবিক উপায়ে দেহকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, ততই দেহের সহিষ্ণুতা-শক্তি হ্রাস পাইবে। যত স্বাভাবিক নিয়মের উপর দেহকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করা যায়, ততই দেহ কার্য্যক্ষম হয়। স্থিরচিত্তে দেখিলে, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে, উষ্ণপ্রধান দেশে যাঁহারা কম্ফোর্টার প্রভৃতি গরম পশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অনাবৃত দেহ ধীবরগণের শ্লেষ্মার ব্যাধি কম হয়। দেহ দৃঢ় করিতে হইলে, এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম পালন করতঃ সকল বিষয় সহ্য করিতে শিক্ষা করা উচিত।

দুগ্ধ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ)

যাবতীয় দুগ্ধের সাধারণ গুণ এবং সুস্থ অবস্থায় দুগ্ধ পানের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ইতিপূর্ব্বে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে প্রকাশিত করা হইয়াছে, এক্ষণে রোগে দুগ্ধ প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মতামত আমরা এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব।

১। **জ্বরে দুগ্ধ**—নিষিদ্ধও যেমন, প্রযোজ্যও তেমনই। জ্বরের কোন অবস্থায় রোগীকে দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত এবং কোন অবস্থায় রোগীকে মোটেই দুধ দিতে নাই, দিলে বিষের মত কাজ করে, তাহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। অজ্ঞতার মত পাপ নাই। যে সকল চিকিৎসক ঔষধ ও পথ্যের গুণাগুণ এবং প্রয়োগ সম্যকরূপে না জানিয়া রোগকাতর জনগণের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহাকে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, শাস্ত্র বলেন, তাহাকে দেখিলেও মানুষ নরকগামী হয়।

জ্বরের সাধারণতঃ দুইটী অবস্থা, নূতন এবং পুরাতন অথবা জীর্ণ অবস্থা। যতদিন পর্য্যন্ত রোগীর শরীরে জ্বরের তরুণ অবস্থা অথবা কফের প্রভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রোগীকে দুগ্ধ পথ্য দিবে না। দিলে সেই দুগ্ধ বিষের মত কার্য্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ফেলিবে। সেই দুধই আবার রোগীর জীর্ণাবস্থায় অর্থাৎ জীর্ণ জ্বরে যখন কফক্ষীণ হইয়া যায়, তখন প্রয়োগ করিলে অমৃত-

তুল্য হিতকর হইয়া থাকে। যেখানে জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী জীর্ণশীর্ণ-ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তথায় চতুর্গুণ জলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশেষ থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে সত্বো জ্বর নিবৃত্ত হয়। জীর্ণজ্বরে অথবা ক্ষয়জন্য জ্বরে যথোক্ত দুগ্ধ পান করিলে প্রভূত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। সকল ক্ষেত্রেই একদিন মাত্র দুগ্ধ পান করিলে জ্বর বন্ধ হয় না, অবস্থা বিশেষে কিছুদিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিলে জ্বর তো বন্ধ হয়ই, অধিকন্তু শরীর পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে।

যদিও নূতন জ্বরে দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তথাপি যে সকল ক্ষেত্রে একমাত্র দুগ্ধই পথ্য বলিয়া বিবেচিত হয় অথবা যাহারা দুগ্ধপায়ী শিশু কিংবা দুগ্ধনিত্য বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পথ্য দিতে হইলে দুগ্ধের চতুর্গুণ জল ও ২।১টা পিঁপুল খণ্ড খণ্ড করিয়া দুগ্ধে দিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিবে এবং যখন জল মরিয়া গিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ আবশ্যক মত পান করিতে দিবে, —এইরূপ ব্যবস্থা বৃদ্ধবৈদ্যগণ করিয়া থাকেন।

জীর্ণজ্বরে যেখানে একটু কফের দোষ লাগিয়া থাকে, তথায় গরম দুধই পান করিতে দিবে। কিন্তু যেখানে জ্বরে গায়ে জ্বালা, চোখ মুখ জ্বালা ও মুখ তিক্ত প্রভৃতি পিত্তের চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকে তথায় এবং যেখানে ঐ পিত্তের সহিত বায়ুর যোগ থাকে অর্থাৎ মাথাঘোরা, শরীর রুক্ষ, ঘুম না হওয়া, উঠিতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি উপসর্গ সকল বর্ত্তমান থাকে, তথায় শীতল দুগ্ধ পান করিতে দিবে। আর যদি জীর্ণজ্বরে বায়ুর সঙ্গে পিত্তের যোগ না থাকে অর্থাৎ গাত্রদাহ প্রভৃতি না থাকে, তথায় গরম দুধই রোগীকে পান করিতে দিবে। ফলকথা, পিত্তপ্রকোপে গরম দুগ্ধ নিষিদ্ধ।

জীর্ণজ্বরে মলমূত্রাদি রোধ—অর্থাৎ যেখানে রোগী দীর্ঘকাল ধরিয়া জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণশীর্ণ হয়, দাস্ত পরিষ্কার হয় না, প্রস্রাব অল্প পরিমাণে ও অত্যন্ত হলুদে রঙের হয়, পায়ে বা চোখের কোণে একটু একটু শোথ বলিয়া মনে হয়, আর তার সঙ্গে ঘুসঘুসে জ্বর লাগিয়া থাকে কিংবা বিকালে একটু করিয়া জ্বর হয়, সেখানে গোক্ষুর ৷৷০ আনা, বেড়েলা ৷৷৵, কণ্টকারী ।০ এবং শুঁঠ ৷৷০ আনা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা দিয়া পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে অচিরে রোগী আরোগ্য লাভ করে ও সকল উপসর্গ দূরীভূত হয়। অথবা—

শ্বেত পুনর্নবা ৷৷৵১০, রক্ত পুনর্নবা ৷৷৵১০ ও বেলশুঁঠ ৷৷৵১০ আনা, দুগ্ধ ১৬ তোলা জল ৬৪ তোলা দিয়া পূর্ব্ববৎ পাক করিয়া খাইতে দিবে, ইহাতে অচিরে জীর্ণজ্বর নিবৃত্ত হয়, শোথ চলিয়া যায়, শরীর সবল হয়। কিন্তু যেখানে রোগীর দাস্ত খোলসা না থাকার জন্য রোগী কষ্ট অনুভব করে তথায় এই যোগটী না দিয়া পূর্ব্বের যোগটী দিবে। যেখানে দাস্তের জন্য কোন কষ্ট নাই বা একটু পাতলা দাস্ত হয়, সেখানে এই যোগটী অত্যুত্তম।

ক্ষয় জন্য জ্বরে—দশমূল পাচনের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে বিশেষ উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। দশমূল—বেল ছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গনিয়ারী, শালপাণি, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর। দুগ্ধ ১৬ তোলা জল ৬৪ তোলা শেষ ১৬ তোলা।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জীর্ণজ্বর নাশক পাচনও দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া পান করিলে অচিরে জীর্ণজ্বর নিবৃত্ত হয়।

জীর্ণজ্বরে পেট কামড়ানি—থাকিলে অথবা গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে দুই তোলা এরণ্ডমূল এক পোয়া দুধ ও এক সের জল দিয়া পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধপান করিতে দিবে।

জীর্ণজ্বরে শ্বাস কাস সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা দুই পাঁজরে বেদনা প্রভৃতি থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত

দশমূল সিদ্ধ দুগ্ধ অথবা শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর মিলিত দুই তোলা এক পোয়া দুগ্ধ ও একসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধমাত্র থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে সকল উপসর্গের সহিত জ্বর নিবৃত্ত হইবে।

তরুণজ্বরে দুগ্ধ বিষবৎ বর্জ্জনীয়।

২। জ্বরাতিসারে দুগ্ধ—প্রয়োগ করিবে না। গরম দুধে লেবুর রস দিয়া ফাটাইয়া ছাঁকিয়া ছানা বাদ দিবে এবং আবশ্যক মত ঐ সদ্যঃপ্রস্তুত ছানার জল রোগীকে পান করিতে দিবে। এ ব্যবস্থা আধুনিক। ইহাতে কোন প্রকার অপকার দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু উপকারই হইয়া থাকে বলিয়া এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা গেল। শাস্ত্র বলেন—"তদেবযুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে"—তাহাই ঠিক ঔষধ, যাহাতে রোগ সারে।

৩। অতিসারে দুগ্ধ—প্রয়োগ করিতে হইলে, ছাগদুগ্ধে অথবা গোদুগ্ধে গোটাকতক আধ থেঁতো মুতা ও দুধের সমান জল দিয়া দুধ জ্বাল দিবে এবং জল মরিয়া গেলে ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথবা জ্বরাতিসারের মত ব্যবস্থা করিবে।

রক্তাতিসারে ও রক্তআমাশয়ে দুগ্ধ—প্রয়োগ করিতে হইলে কুড়চি ছালের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে। ইহার তুল্য একাধারে আহার ও ঔষধ বড়ই দুর্লভ। ছাগদুগ্ধ আধপোয়া, কুড়চি ছাল দুই তোলা, জল দেড়পোয়া, শেষ আধপোয়া, পাকাবসানে ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া একটু একটু করিয়া পান করিতে হয়। ছাগদুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধও চলিতে পারে।

৫। গ্রহণীতে দুগ্ধ—অনেক দিনের পুরাতন পেটের অসুখকে গ্রহণী বলা হয়। গ্রহণীতে দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হইলে অন্ন বা যবমণ্ড কিংবা বার্লির সহিত প্রথম অল্প অল্প করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। অথবা দুগ্ধের সহিত বেলশুঁঠ বা মুথা সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। কচি বেলকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে বেলশুঁঠ হয়। বেল এবং শুঁঠ দুইটী পৃথক দ্রব্যকে মিলিত করিলে বেলশুঁঠ হয় না।

৬। শোথযুক্ত গ্রহণীতে—দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হইলে রোগীকে পর্পটী—খাওয়াইয়া দুগ্ধ পথ্যে রাখিতে হয়। প্রথমে একপোয়া-আধসের হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিন চার সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে দেখিয়াছি। ইহাতে রোগ তো সারিয়া যায়ই, অধিকন্তু শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই পর্পটীর সঙ্গে দুগ্ধ পান করিবার সময়, রোগীকে লবণ ও জল খাইতে দিতে নাই, দিলে অপকার হয়। পর্পটী খাওয়াইয়া দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিতে হইলে কোন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ কবিরাজের সাহায্য লইতে হয় অথবা তাঁহার হাতে রোগীর চিকিৎসার ভার দিতে হয়। নতুবা না জানিয়া শুনিয়া পর্পটীও দুগ্ধ প্রয়োগে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

পর্পটী প্রয়োগের মত শোথসংযুক্ত গ্রহণীতে "দুগ্ধবটী" বলিয়া একটী প্রসিদ্ধ ঔষধও কবিরাজগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী প্রভূত দুগ্ধ পান করিয়া হজম করিয়া থাকে, তাহাতে রোগী নীরোগ হয়। দুগ্ধবটীও অভিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়কে দিয়া প্রয়োগ করান উচিত। নতুবা বিপরীত ফলই হইয়া থাকে।

শোথসংযুক্ত গ্রহণী বা কেবল শোথে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ মাণমণ্ডের সহিত দুগ্ধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, মাণমণ্ড শ্রেষ্ঠ ঔষধ ও পথ্য।

৭। কলেরায়—কোন অবস্থাতেই দুগ্ধ পথ্য দিবে না।

৮। বাতাজীর্ণ—অর্থাৎ মোটেই যাহাদের দাস্ত খোলসা হয় না তাহাদের পক্ষে দুগ্ধ পান হিতকর।

৯। অর্শে—দুগ্ধপান ভাল। তবে অর্শোরোগে যে ক্ষেত্রে পাতলা দাস্ত হইতে থাকে, সেখানে দুগ্ধ না দিয়া তক্র বা ঘোল বিশেষ হিতকর।

১০। রক্তপিত্তে—ছাগদুগ্ধ পরম হিতকর। অথবা দুই তোলা শালপানি—আধপোয়া গব্য বা ছাগ-দুগ্ধ ও দেড়পোয়া জলসহ সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া ঠাণ্ডা অবস্থায় কাশীর চিনিসহ পান করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

১১। যক্ষ্মায়—ছাগদুগ্ধ আহার ঔষধ—দুইই। গব্যদুগ্ধও যক্ষ্মায় হিতকর। কিন্তু যক্ষ্মায় যে ক্ষেত্রে পেটের অসুখ দেখা দেয়, তথায় দুগ্ধ সম্বন্ধে গ্রহণীতে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ মুতা বা বেলশুঁঠ দ্বারা পকদুগ্ধ প্রয়োগ করা উচিত।

যক্ষ্মায় অত্যন্ত গাত্রদাহ থাকিলে,—সক্ষম হইলে দুগ্ধে স্নান করাইয়া দিবে অথবা দুগ্ধে গামছা ভিজাইয়া উত্তমরূপে গা মুছাইয়া দিবে, ইহাতে গাত্রদাহ, অনিদ্রা, শরীরের রুক্ষভাব, বহুদিনের ঘুষঘুষে জর অচিরে নিবৃত্ত হয়। যক্ষ্মা রোগীর দাস্ত বন্ধ থাকিলে দুগ্ধের বস্তি বা ডুস দিলে বিশেষ উপকার হয়। তবে যক্ষ্মায় দাস্ত করাইতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করিতে হয়। কেননা যক্ষ্মায় মলও রেতঃ বিশেষরূপে রক্ষণীয়। অন্যান্য রোগে দুগ্ধ প্রয়োগের কথা ইহার পরে বলিব।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ

(কবিরাজ শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মা কবিভূষণ)

বাতের বেদনায়—(১) আদা, সজনা ছাল, বরুণ ছাল, মরিচ, গোমূত্র বা জলে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া দিনে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে উপকার হয়। (২) নিসিন্দার পাতা ও বালি—খোলায় ভাজিয়া বস্ত্রখণ্ডোপরি এরণ্ড পত্র পাতিয়া তন্মধ্যে ঐ ভৃষ্টপত্র ও বালি ঢালিয়া পুটলী করিয়া ব্যথিত অঙ্গ সকলে স্বেদ দিবে। স্বেদ প্রায়শঃ রাত্রে এবং প্রলেপ প্রায়শঃ দিনেই দিতে হয়। (৩) ফণীমনসা ও নূতন রাই সরিষা বাটিয়া গরম করিয়া দিনে ২ বার স্বেদ দিবে। বাত ভিন্ন কোনো স্থানে হঠাৎ বেদনা হইলেও ইহাতে উপকার হয়। (৪) নূতন ফোলা ও বেদনায় বা কুঁচকি ফোলা ইত্যাদিতে মুসব্বর ও আদার রস উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

গাল গলা ফোলায়—ধুতুরা পাতার রস ও সমুদ্রফেণা পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

উপদংশ বা পার্শ্বি রোগে—(১) সাদা ধুনা ও মাখন একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক জলদ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া পটী দিলে এবং এক টুক্‌রা তোপচিনি পেষণ করতঃ ময়দার বা চাউলের গুঁড়ি বাটার উপরে ঐ পিষ্ট তোপচিনিকে রাখিয়া কলাপাতে মুড়িয়া চেপ্টা করিয়া ঠিক কলাপিঠার মত করিয়া এবং আগুনে গরম করিয়া পিঠার মত দুখানি ২ বেলায় খাইবে এবং ঠিক সালসার মত বাঁধা নিয়মে কয়দিন থাকিবে, ইহাতে প্রায় নূতন অবস্থার রোগী আরাম হইয়া যায়। অনেকে ঐ নিয়মে থাকিয়া তোপচিনির চূর্ণ ॥০ এবং কিঞ্চিৎ মধুও ব্যবহার করিয়া থাকেন। (২) সাদা ধুনা ও ঘৃত অথবা মাখন একত্র মিশাইয়া পরে শতবার ধৌত করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া পটী ব্যবহার করিলে অনেক দুঃসাধ্য রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রবাহিকা বা আমাশয়ে—(১) আম গাছের ছালের রস ২ ভাগ, ইক্ষুগুড় ১ ভাগ, চুণের জল ১ ভাগ, সমস্ত দিনে ২।৩ বার করিয়া ৪।৫ দিন সেবনেই

প্রবল বেদনা সহ আমাশয় সারিয়া যায়। পরিমাণ—শক্তি অনুসারে। মোট ঔষধের মাত্রা ৵৹ পোয়া হইতে ৴৷০ পোয়া পর্য্যন্ত। (২) আমছালের রস অর্দ্ধ ছটাক ও কিঞ্চিৎ চুণের জল খানিকটা দুধের সহিত মিশাইলেই ননী হইয়া যাইবে। ইহা দিনে ২ বার সেব্য, ৩।৪ দিনে সদ্যঃ ও চমৎকার ফল দেখা যায়।

(৩) আমাশয়ের পেটের যন্ত্রণায় বেলের সরবৎ দিয়া আমি খুব ভাল ফল পাইয়া থাকি। কেহ কেহ উহার সহিত দধির অম্ল ও তিল তৈলও মিশাইয়া দেন। (৪) কুড়চি—রক্তামাশয়ের প্রসিদ্ধ ঔষধ, কিন্তু বড়ই বিস্বাদ জিনিষ। কুড়চি ছাল, দাড়িম্ব ছাল, বেলশুঁঠ প্রত্যেকটি ৷৵১০, জল আধসের, শেষ আধপোয়া এই কাথ মধু মিশাইয়া খাইলে রক্তামাশয়ে বেশ ফল পাওয়া যায়। ভাদাইল পাতা ও ঠনিমানকুনী (থানকুনি) পথ্য স্বরূপ ব্যবহার করা উচিত। কুড়চির নানাপ্রকার প্রয়োগই আয়ুর্ব্বেদে আছে। এসম্বন্ধে আমার পরীক্ষিত একটি রোগীর বিবরণ নিম্নে লিখিলাম। (৫) একটি দরিদ্র যুবক আমরক্ত গ্রহণীতে ভুগিয়া একেবারে জরা-জীর্ণ হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি বেলশুঁঠ চূর্ণ ৵৹, যোয়ান চূর্ণ ৵৹ আনা, খদির ভিজান জল ও মুথার রসে বাটিয়া ছোট কুলের ন্যায় বটী করিয়া খাইতে দিই ও কুড়চির ছাল ৴১ সের, ৴৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৴১ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটা জাতীফল ঘসিয়া মিশাইয়া পুনঃ জাল দিয়া লেহবৎ ঘন করিয়া ১—২ তোলা মাত্রায় দিনে ২।৩ বার মধুসহ খাইতে দিই। তিনি এই উপায় দ্বারা অতি অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করেন। কুড়চির উপকারিতার এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। (৬) আমাদের দেশে গৃহস্থেরা ঠনিমানকুনীর বা থানকুনির পাতার সেঁক দেয়, তাহা এই:—কতকগুলা থানকুনি পিষিয়া নাভিতে বসাইয়া দিয়া দিতে হয়। পরে লোহার হাতা গরম করিয়া সাবধানে ঐ হাতার নীচের দিকটা ঐ পিষ্ট খুলকুরির উপর পুনঃপুনঃ লাগাইতে হয়। ইহা বেশ সহ্য ও আরামদায়ক হয়,—কারণ তীব্র তাপ থানকুনির মধ্যে লীন হইয়া সামান্য তাপ পেটে যায়। যখন ঐ তাপ অসহ্য হইবে, তখন বন্ধ করিবে। এই কথা কেহ উড়াইয়া না দিয়া দেখিতে পারেন। ইহা আমার বিশেষ ভাবে বহুস্থলে পরীক্ষিত।

বমি ও হিক্কায়—(১) কচি আমপাতার কচলান্ নির্য্যাস ও মধু একত্র সেবনে অনেক সময়ই বমি বন্ধ হইয়া যায়। (২) ছানার জল বা ডাবের জল বমি নিবারক। (৩) কচি ডাব এবং তাল শাঁস হিক্কা বমি দুইয়ের ঔষধ। (৪) লেবুর ফুল পেষা ও মধু দ্বারা অনেক স্থলেই হিক্কা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। (৫) ময়ূর পুচ্ছভস্ম ১ রতি ও রসসিন্দুর এক রতি এবং মধু বা মিছরির রস সেবনে হিক্কা প্রশমিত হয়।

আগুনে পোড়ায়—(১) খাঁটী মধু প্রদানে তৎক্ষণাৎ জ্বালার শান্তি হয়। (২) নারিকেল তৈল ও চুণের জল মিশাইয়া প্রয়োগেও বেশ সারিয়া যায়। (৩) হুকার জল ঢালিয়া কাদা করিয়া প্রয়োগ মাত্র জ্বালার শান্তি হয়।

অর্শ—(১) বামাশ মাছ (শ্রীহট্টের সুনাম গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে আছে)। খাইলে এবং ঘোল বা ননী পথ্য করিলে, ঐরোগ আরোগ্য হয়। ঐ মাছ—শুকনা হইলেও হয়।

পেটের বেদনায়—(১) পেটে অত্যন্ত বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া অতিশয় যাতনা হইলে, সোনালু ফলের বীজ ১টী, মরিচ ২।৩টী পিষিয়া গরম জল সহ সেব্য। ২।১ বার প্রয়োগে উপকার হয়। (২) পোড়া হরীতকী, লবণ ও যোয়ান প্রত্যেকটী অর্দ্ধ আনা মাত্রায় একত্রে চিবাইয়া গরম জল খাইলে পেট কাঁপা সারিয়া যায়।

প্রমেহে।—(১) দুধের সঙ্গে আকনাদির কচি পাতা ১০টার রস দু'বেলা খাইলে আরোগ্য হয়। (২) তিল ফুল ও মুকুল সহ তিল গাছের আগা—কাঁচা দুগ্ধ সহ ছানিয়া ছাঁকিয়া সেব্য।

মূত্র কৃচ্ছ্রে।—(১) স্থল পদ্মের পাতার রস কাঁচা দুগ্ধ সহ সেবনে উপকার হয়। (২) শেওড়া পাতার রস ও কাঁচা দুগ্ধ একত্র সেব্য। (৩) গোরক্ষ চাকুলিয়ার পাতার রস ও কাঁচা দুগ্ধ একত্র সেব্য। (৪) আমড়া গাছের কচি মূলের রস ও দুগ্ধ একত্র সেব্য। স্ত্রীলোকদিগের পেট ব্যথাতেও ইহা উপকার হয়। (৫) আনারসের মূলের রস এবং কাঁচা দুধ সেবনে প্রস্রাব সরল হয়। (৭) ঘৃতকুমারীর নির্য্যাস ও দুগ্ধ সেবনে মূত্র কৃচ্ছ্র দূর হয়।

শুষ্ক কাস বা হুপিং কাশে।—(১) মরিচ চূর্ণ ১ তোলা এবং লবঙ্গ চূর্ণ ঐ পরিমাণ এবং পিঁপুল চূর্ণ ঐ পরিমাণ লইয়া ৫ গুণ আদার রস ও আদাররসের সমান বাসকের রস এবং এই দুয়ের সমষ্টির সমান ইক্ষু গুড় (তরল গুড়ই ভাল) জ্বালে চড়াইবে। যখন রস শুকাইয়া গুড় গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন ঐ তিনটী চূর্ণ পদার্থ দিয়া নাড়িতে থাকিবে, যেন টানিয়া না যায়। এই ঔষধ সর্ব্বদা কাল বেলায় বা দিনে ২.৩ বার গরম জল সহ গিলিয়া বা চাটিয়া খাইবে, ইহার গরম জলই ছেলে বুড়ো সকলের অনুপান। মাত্রা দুই আনা হইতে চারি আনা।

প্রেরিত পত্র

কয়েকটি সন্দিগ্ধার্থ প্রশ্ন

মহাশয়! কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বহুদর্শী কবিরাজমণ্ডলীর শরণাপন্ন হইবার মানসে আপনাদের "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" পত্রিকার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আশাকরি আগামী সংখ্যার আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রশ্ন—

গজপিপ্পলী বা গজপিঁপুল—

"চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।
কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা।"

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ চৈগাছের ফলের নাম গজপিঁপুল; কিন্তু আমি বহু কবিরাজ মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে কবিরাজ মহাশয়গণ দোকান হইতে যে গজপিঁপুল ক্রয় করিয়া আনেন, তাহা প্রকৃত চৈ গাছের ফল নহে। ইহা লতা জাতীয়,—কোন গাছের সাহায্যে উহা লতাইয়া যায়, উহার পাতা কতকটা কচুর পাতার মত, ফল ৮।১০ আঙ্গুল লম্বা এবং উহার পাতার ভিতরে গুচ্ছা আছে। আমি আসাম হইতে উহা আমার একজন বন্ধুলোকের দ্বারা আনাইয়াছিলাম, তাহা পিঁপুল অপেক্ষা কিছু বড়। বাজারে যে গজপিঁপুল পাওয়া যায়—উহা কি এবং আপনারা কোন্ গজপিঁপুল ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অমৃতারিষ্টে "অজাজীষোড়শপলং" উক্ত আছে, এখানে এমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না যে, কৃষ্ণজীরা ব্যবহার করিতে হইবে। দ্রব্যগুণে শাদা জীরার যে প্রমাণ আছে, তাহাতে উক্ত আছে "জীরকো জরণোহজাজী"—এই প্রমাণের দ্বারা অনুমান হয়, শাদা জীরা ব্যবহার করা শাস্ত্র সম্মত। আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে অমৃতারিষ্টে কৃষ্ণজীরা কেন উল্লেখ করিয়াছেন? আরও এক কথা, যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে জীরা উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যেক স্থানে সাদা জীরার ব্যবহার হয়। যেমন সূতিকা রোগে জীরকাদ্য মোদক, "জীরকস্যপলান্যষ্টৌ"—উক্ত মোদকে শাদাজীরা ব্যবহার হয়। গ্রহণী রোগে

'জীরকাদ্য মোদকে" "সুক্ষ্মচূর্ণীকৃতং জীরং"—এখানে শাদা জীরা উক্ত হইয়াছে, তবে অমৃতারিষ্টে কৃষ্ণজীরা ব্যবহার হয় কেন ?

অজাজীর অর্থ কৃষ্ণজীরাইবা কিরূপে হইতে পারে ? কৃষ্ণজীরার শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ যথা—

কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ।
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা॥
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা।
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি॥

এখানে কালাজাজী অর্থে কাল জীরা বা কৃষ্ণ জীরা উল্লিখিত আছে, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় ঔষধে কোন স্থানেই কালাজাজীর উল্লেখ নাই, তবে কেন কৃষ্ণজীরা ব্যবহৃত হয় ?

অমৃতারিষ্টে যে কৃষ্ণজীরা ব্যবহৃত হয়, উহা বেনের দোকানে কি নামে বিক্রী হয়। অনেক বড় বড় বেনের দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি—তাহারা কৃষ্ণজীরা বলিয়া কোন জিনিস চিনে না, তাহারা সজাজীরা বা সাজীরা (যাহা কালিয়া পোলাও তৈয়ার করিতে ব্যবহার করে) তাহাই দিয়া থাকে। কৃষ্ণজীরা ও কালজীরা একই জিনিস কি ?

কবিরাজ মণ্ডলীর নিকটে উপরি উক্ত বিষয় সকলের সন্দেহার্থ মীমাংসার জন্য বিষয়গুলি প্রশ্নরূপে উপস্থাপিত করিলাম, আশা করি, সন্তোষজনক শাস্ত্রোক্ত মীমাংসা পাইব।

বিনীত—
শ্রীদিগেন্দ্র মোহন কর, কবিরত্ন।

বিবিধ

সর্পদংশনের বিষ-চিকিৎসা—ডাঃ রেমণ্ড এল, ডিটমার মার্কিণের একজন বিখ্যাত লোক। সাপ, বিছা প্রভৃতি সরীসৃপ-বিষের তিনি একজন অদ্বিতীয় ওঝা বলিয়া নিউইয়র্ক অঞ্চলে তাঁহার বিলক্ষণ পসার-প্রতিপত্তি। আমাদের এই ভারতে যেমন রঙ বেরঙের নানারকমের সাপ আছে, মার্কিণের স্থানে স্থানেও সেইরূপ দেখা যায়। সর্পদংশনের একটা অব্যর্থ ঔষধ বাহির করিবার ইচ্ছা কয়েক বৎসর হইতে ডাঃ ডিটমারকে পাইয়া বসে, তিনিও রাত্রিদিন ঐ চিন্তায় বিভোর; কখনও বা বিষ লইয়া নানা রকম জন্তুর গায়ে ফুড়িয়া (ইনজেক্ট) বিষের ক্রিয়া লক্ষ্য করেন, কখনও বা সেই বিষ নষ্ট করিবার আর একটা ঔষধ ইনজেক্ট করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এই ভাবে বহু বৎসর নানা পরীক্ষা, নানা চিন্তার পর এত দিনে তিনি একটা নাকি অব্যর্থ ঔষধ বাহির করিয়াছেন! তাঁহার প্রণালী ঠিক হানিমানেরই মত বিষে বিষক্ষয়। ডাঃ ডিটমার বলেন, কোন জীবকে যদি সাপে কামড়ায়, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র যদি তাহার শরীরে সে বিষের সিরাম (ফুঁড়িয়া দিবার তরল ঔষধ) ইনজেক্ট করা যায়, নিশ্চয়ই সে বাঁচিয়া উঠিবে। তবে যে সাপ দংশন করিয়াছে, সেই জাতীয় সাপের সিরামই তাহার শিরায় প্রয়োগ করিলে ভাল ফল হইবে। তিনি সেজন্য নানারকম সাঁপের বিষ সংগ্রহ করিয়া তাহার সিরাম তৈয়ার করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সিরাম তৈয়ারীরও একটু বেশ তারিফ আছে। যে সে জন্তুর শরীরে বিষ ইনজেক্ট করিয়া তাহার রক্তের সিরাম লইলে চলিবে না। নীরোগ ঘোড়াই তাঁহার মতে সব চেয়ে ভাল মিডিয়াম। ডাঃ ডিটমারের ঔষধ এখনও সব দেশে ছড়াইয়া পড়ে নাই। তাঁহার এই বিষ-প্রতিষেধক সিরাম কতটা কার্য্যকরী হইবে বা হইয়াছে, তাহে

হাতে না দেখিলে শীঘ্র কেহই বিশ্বাস করিতে চাহে না তবে তিনি যখন নিজে স্থিরবিশ্বাস হইয়া পণ্ডিত-সমাজে এ সত্য প্রচার করিতে পারিয়াছেন, তখন ইহা যে একেবারেই ভুয়া হইবে, তাহা মনে হয় না।

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়—জাপানের একটী পত্রিকায় প্রকাশ যে, নিম্নলিখিত দশটী নিয়ম পালন করিয়া চলিলে খুব কম হইলেও দুইশত বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায়।

(ক) দিনের মধ্যে একবারের বেশী মাংস খাইও না।

(খ) প্রত্যহ একবার করিয়া গরম জলে স্নান করিবে।

(গ) সমস্ত দরজা-জানলা খুলিয়া প্রদীপ নিবাইয়া অন্ততঃ ৬ঘণ্টা ঘুমাইবে, কিন্তু ৭ঘণ্টার বেশী যেন না হয়।

(ঘ) সপ্তাহে এক দিন বিশ্রাম করিবে।

(ঙ) কখনও অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনা বা ক্রোধ করিও না।

(চ) বিপত্নীক বা বিধবা হইলে পুনর্ব্বিবাহ করিবে।

(ছ) পরিমাণ মত বিশ্রাম করিবে।

(জ) বেশী কথা বলিও না।

(ঝ) যতক্ষণ সম্ভব খোলা যায়গায় থাকিবে।

(ঞ) সর্ব্বদা মোটা গরম কাপড় ব্যবহার করিবে।

পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর সংখ্যা—

সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যা ১৬৪৬৪০১০০০০ জন। ধর্ম্ম হিসাবে নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করা যায়:—

সনাতনী হিন্দু—	২১০৫৪০০০০
বৌদ্ধ—	৪৬৩৮৬১০০০

হিন্দু ও বৌদ্ধ

হিন্দু ও বৌদ্ধকে হিন্দু ধরিয়া হিন্দু অধিবাসীর মোট

সংখ্যা—	৬৭৪৪০০০০০
খৃষ্টান—	৫৪৪৬১০০০০
মুসলমান—	২২ ৮২৫০০০০
ইহুদী—	১২২০৫০০০
প্রোটেষ্টান্ট—	১৫৮২৭০০০০
বিবিধ—	১৫২৮০০০০

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর যেকোন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে শ্রেষ্ঠ।

—ষ্টাণ্ডার্ড বেয়ারার

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ—গত ১১ই ভাদ্র বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ভবনে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্ক-তীর্থ ঐ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ডাঃ স্যার দেব-প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত এম-এ, বিদ্যা রত্ন মহাশয় "ভারতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য গবেষণা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ—গত ১লা ভাদ্র রাত্রি ২—৩৫ মিনিটের সময় স্বামী সারদানন্দজীর সমাধি লাভ হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইহার নাম হইয়াছিল স্বামী সারদানন্দ। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে মহাত্মা বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি লণ্ডনে গমন করেন এবং সেখান হইতে আমেরিকায় গিয়া দুই বৎসরকাল সেখানে প্রচার কার্য্য করেন। ইহার পরে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রস্তুত হইলে তাহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া গুজরাট কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রচার কার্য্যে গমন করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে নিবেদিতা বিদ্যালয় ইঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। স্বামীজি বিবেকানন্দ সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারের সভাপতি ছিলেন। ১৯০৮ খৃঃঅব্দে "উদ্বোধন" পত্রের সম্পাদক হন। বাগবাজারের কালীমাতার বাটী নির্ম্মাণ এবং বেলুড় মঠে ও মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠায় স্বামী-

হাঁরই কঠোর পরিশ্রমের ফল। "তান্ত্রোক্ত শক্তি পূজা", "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ইনি ধর্মতত্ত্ব বুঝাইয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্রোতাবে ধর্ম জগতের একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল।

কলিকাতার রাস্তায় অপমৃত্যু।—১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ খৃঃঅব্দে কলিকাতার রাস্তায় কিরূপ অপমৃত্যু ঘটিয়াছে নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

	১৯২৪		১৯২৫		১৯২৬	
	আহত	হত	আহত	হত	আহত	হত
ট্রামে	২৩৭	১৬	২৮৭	১৮	১১৪	১৪
মোটরে	৮৪৬	৭৪	৯৫০	৮৮	১১৩৩	১৮
ভাড়াটিয়া গাড়ীতে	৭৭	৪	৭৯	৭	৬৮	৪
অপর সাধারণের গাড়ীতে	১৮০	১০	১২৯	৬	৮৮	৫
ঘরের ঘোড়ার গাড়ীতে	৩২	৮	৩৯	৬	৩৫	২

শ্রাদ্ধকার্য্যে দান—সংপ্রতি স্বর্গীয় যামিনীভূষণ রায় মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়স্থ আরোগ্যশালার রোগীদিগের পথ্যাদির জন্য বারশত টাকা দান করিয়াছেন।

কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর দান—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়স্থ হাসপাতালের রোগীদিগের সাহায্যকল্পে প্রসিদ্ধ কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী গত শ্রাবণ মাস হইতে প্রতিমাসে ৬ ছয় কৌটা করিয়া বার্লি দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। এজন্য তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

প্রাপ্তিস্বীকার—কলিকাতা ২।১বি নং গ্যালিফ লেনস্থ কলিকাতা কর্পোরেশনের ১০নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য-সমিতির আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ১০৫।২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "অজীর্ণান্তক বটিকা" নামক ঔষধটী কয়েক শিশি পরীক্ষার্থ পাইয়া উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের অম্ল, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। তিনি অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শিক্ষামন্দির—গত ১৮ই ভাদ্র শ্যামপুকুরস্থ তেলিপাড়াস্থ "শিক্ষামন্দিরে"র ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সেলার ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রসিদ্ধ লেখক ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রবৃন্দকে শুধু লেখাপড়াই শিখান হয় না, প্রকৃতপক্ষে 'মানুষ' করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল প্রকার শিক্ষাই এখানে দেওয়া হইয়া থাকে ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

পুস্তক পরিচয়

সুপ্রজাধাত্রীর রোজ নামচা—ডাঃ শ্রীসুন্দরী মোহন দাস এম-বি-প্রণীত। পি, ৫৩ সি রসারোড সাউথ, কলিকাতা হইতে শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার ধাত্রীবিদ্যায় কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই সুবিদিত। এই গ্রন্থ সেই সুপ্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকের চল্লিশ বৎসর ব্যাপিনী অভিজ্ঞতার ফল। গল্পচ্ছলে আমাদের দেশের অধঃপতনের ফলাফল এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ পড়িলে আমাদের দেশের যুবক যুবতীগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন এই উপন্যাস প্লাবিত যুগে সুন্দরীবাবু দেশের আবহাওয়া বুঝিয়া গল্পচ্ছলে যে এ সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র। অভেলপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের পক্ষে ইহা যেমন চিত্তাকর্ষক হইবে, সেইরূপ ইহা পাঠে তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষা করিতেও সক্ষম হইবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শিশুমঙ্গল ও প্রসুতি কল্যাণ—বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীনিশিকান্ত বসু প্রণীত। ৭০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৹ আনা। আমাদের এই মরণোন্মুখ বাঙ্গলা দেশে শিশু মৃত্যু যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহার কারণ ও উহা নিবারণ করিবার উপায় রক্ষণে যাঁহারা অগ্রসর, তাঁহারা যে সাধারণের নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার সেই কার্য্যে অগ্রণী, সুতরাং তিনি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার এই পুস্তকের প্রধানতঃ আলোচ্য বিষয়ঃ—শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল। প্রসুতির কর্ত্তব্য, ধাত্রীর করণীয়, সদ্যোজাত শিশুর সেবা, প্রসূতি ও শিশুদিগের সাধারণ চিকিৎসা প্রভৃতি বহু বিষয় অতি সহজ কথায় সরল ভাষায় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থখানির মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকে বাঙ্গালীর বিশেষ উপকার হইবে। গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাকটিশনার বা বাঙ্গলা ভাষায় আদর্শ এলোপ্যাথিক চিকিৎসা—ডাঃ শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষ এল, এম, এস প্রণীত। ৯৮।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ টাকা। যাঁহারা ডাক্তারি স্কুল বা কলেজ হইতে নূতন বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের ভাষা অতি সহজ, এজন্য বুঝিবার পক্ষে কোনো কষ্ট নাই।

A hand book of Materia Medica—বাংলায় লিখিত—ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম ডি, প্রণীত। মূল্য ৩ টাকা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটিরিয়া মেডিকার পরীক্ষক ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম ডি প্রণীত বাংলা মেটিরিয়া মেডিকার খনির চতুর্থ সংস্করণ। ইহা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ Pharmacopea-র সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়াছে। মেটিরিয়া মেডিকার এই সংস্করণ হইতে সরল প্রাঞ্জল ভাষা বিষয়ের সুবিন্যাসে সুবৃহৎ মেটিরিয়া মেডিকার সুন্দর সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়া মেটিরিয়া মেডিকার জ্ঞানলাভ করিবার ইহা একটী সুবর্ণ সুযোগ। সংক্ষেপে সহজ ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া এই পুস্তকটী লিখিত এবং ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ছাপা ও বাঁধান সুন্দর। মেটিরিয়া মেডিকায় এমন সংক্ষিপ্ত সুন্দর সংস্করণ দুর্ল্লভ, পড়িতে কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হয় না, আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বিলাতে—বৃটিশ-এম্পায়ার এক্‌জিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

এক্‌জিবিশন-শাঁখা

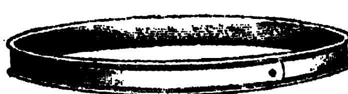
উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এন্‌গ্রেভ করা। ইয়োলো-ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিনি সোনা এবং ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। ইয়োলো-ব্রোঞ্জ স্বভাবতঃই সোনার মত রং, ব্যবহারে মলিন হয় না, হাতে দাগ লাগে না। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর এন্‌গ্রেভ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সোনা খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া আঁটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায় এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে। ইহা যেমন সুদৃশ্য, তেমনই মজবুত। ইহা শাঁখা ও চুড়ী দুই রকমের তৈরী হয়। নিম্নে চিত্র ও মূল্য-বিবরণ দেওয়া হইল।



এক্‌জিবিশন শাঁখা—(সিকি ইঞ্চি চওড়া) প্রমাণ জোড়া—১৮৬০, (।৵০ গিনি সোনা ৮৬০, শাঁখা ৪৲ মজুরী ৬৲) বালিকা সাইজ—১৫॥০ (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲) শিশু সাইজ—১২৬০ (।৵০ গিনি সোনা ৬।০, শাঁখা ২॥০, মজুরী ৪৲)।

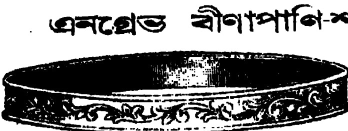
এই এক্‌জিবিশন-শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার; শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তি-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনায় মোড়া, সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত



প্রতিজোড়া—প্রমাণ ১০৲ টাকা, বালিকা সাইজ—৮॥০ শিশু সাইজ—৬৬০ স্পেশ্যাল,—প্রমাণ ১৩৲, বাঃ—১০৬৵০, শিঃ—৮।০

এনগ্রেভ বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তি-দন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার পুরু পাতে মোড়া চমৎকার লতা ফুল এন্‌গ্রেভ করা। ১৭॥০ ১৪।০, ১১৲ টাকা।



গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় মোড়া, গৃহলক্ষ্মীদের মনের মত অলঙ্কার। প্রতি জোড়া—প্রমাণ ৭৲, বালিকা সাইজ—৫৲। ঐ চওড়া—প্রঃ ৮৲, বাঃ ৭৲, শিঃ—৬৲ স্পেশ্যাল প্রমাণ ১০৲, বালিকা—৮৬৵০, শিশু—৭।০।



এক্‌জিবিশন চুড়ী—(চিত্রানুযায়ী সরু) প্রমাণ জোড়া—১৬॥০, (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, ফ্রেম ৩৲ মজুরী ৬৲)। বালিকা সাইজ—১৩৬০ (।৵০ গিনি সোনা ৬।০, ফ্রেম ২॥০, মজুরী ৫৲)। শিশু সাইজ—১১৲ (।০ গিনি সোনা ৫৲, শাঁখা ২৲, মজুরী ৪৲)।

প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার একসেট চুড়ী ৪৯॥০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার এক সেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

সেপ্টিপিন—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা ২ ই—১৬৲



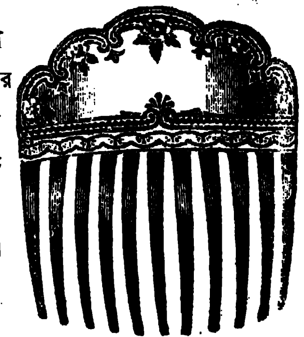
১৬০ „ ১৪৲
১॥০ „ ১২৲

তার-পেঁচ বালা—প্রমাণ ১৬৲, বালিকা—১৩৬৵০।



কল্যাণ চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে চমৎকার এন্‌গ্রেভ করা। ১১ দাড়া ১৭৲ ১০ দাড়া ১৪৬০ ৯ দাড়া ১২॥০ টাকা।



স্বত্বাধিকারী—
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃমন্দির-সম্পাদক

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

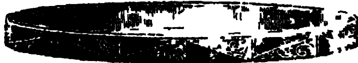
৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাঞ্চ-খুলনা।

বিভিন্ন অলঙ্কারের ক্যাটালগ চাহিলেই পাঠান হয়।

ব্রিটিশ-এম্পায়ার বিলাতে— একজিবিশনে আমাদের দুই বৎসরের শিক্ষার ফল—

একজিবিশন্-শাঁখা

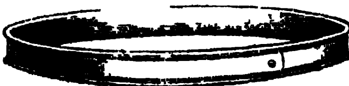
উপরে গিনি সোনার পুরু পাতের উপর মনোরম এনগ্রেভ করা। ইয়োলো ব্রোঞ্জ নামক স্বর্ণবর্ণের ধাতুর ফ্রেম। প্রস্তুতের কৌশলে উপরের গিনি সোনা এবং ব্রোঞ্জের ফ্রেম বর্ণে গঠনে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে—মিলনের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত নাই। ইয়োলো-ব্রোঞ্জ স্বভাবতঃই সোনার মত রং, ব্যবহারে মলিন হয় না, হাতে দাগ লাগে না। দীর্ঘকাল ব্যবহারের পর এনগ্রেভ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সোনা খুলিয়া লইয়া আবার নূতন করিয়া আঁটিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায় এই একজিবিশন-শাঁখা নিরেট গিনি সোনার শাঁখার মতই দেখা যাইবে। ইহা যেমন সুদৃশ্য, তেমনই মজবুত। ইহা শাঁখা ও চুড়ী দুই রকমের তৈরী হয়। নিম্নে চিত্র ও মূল্য-বিবরণ দেওয়া হইল।



একজিবিশন শাঁখা—(সিকি ইঞ্চি চওড়া) প্রমাণ জোড়া—১৮৸০, (।৶০ গিণি সোনা ৮৸০, শাঁখা ৯৲ মজুরী ৬৲) বালিকা সাইজ—১৫॥০ (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, শাঁখা ৩৲, মজুরী ৫৲) শিশু সাইজ—১২৸০ (।৴০ গিনি সোনা ৬।০, শাঁখা ২॥০, মজুরী ৪৲)।

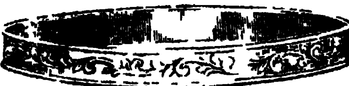
এই একজিবিশন্ শাঁখা কম মূল্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তিদন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনায় মোড়া, সমগ্র শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত

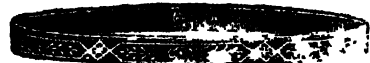


প্রতিজোড়া—প্রমাণ ১০৲ টাকা, বালিকা সাইজ—৮॥০ শিশু সাইজ—৬৸০ স্পেশ্যাল,—প্রমাণ ১৩৲, বাঃ—১০৸৶০, শিঃ—৮।০

এনগ্রেভ বীণাপাণি-শাঁখা—শুভ্র হস্তিদন্তের শাঁখার উপর গিনি সোনার পুরু পাতে মোড়া চমৎকার লতা ফুল এনগ্রেভ করা। ১৭॥০ ১৪।০, ১১৲ টাকা।



গৃহলক্ষ্মী শাঁখা—বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় মোড়া, গৃহলক্ষ্মীদের মনের মত অলঙ্কার। প্রতি জোড়া—প্রমাণ ৭৲, বালিকা সাইজ—৫৲। ঐ চওড়া—প্রঃ ৮৲, বাঃ ৭৲, শিঃ—৬৲ স্পেশ্যাল প্রমাণ ১০৲, বালিকা—৮৸৶০, শিশু—৭।০।



একজিবিশন্ চুড়ী—(চিত্রানুযায়ী সরু) প্রমাণ জোড়া—১৮॥০, (।৵০ গিনি সোনা ৭॥০, ফ্রেম ৲ মজুরী ৬৲)। বালিকা সাইজ—১৩৸০ (৴০ গিনি সোনা ৬।০, ফ্রেম ২॥০, মজুরী ৫৲)। শিশু সাইজ—১১৲ ।০ গিনি সোনা ৫৲, শাঁখা ২৲ মজুরী ৪)।

প্রমাণ—তিন জোড়া অর্থাৎ ছয় গাছার একসেট চুড়ী ৯৭॥০ টাকা; ব্যবহারে ঠিক তিনশত টাকার এক সেট চুড়ীর মত সুন্দর ও মজবুত।

সেফ্‌টিপিন্—সোনার উপর চুণী ও মুক্তা সেট করা ২ ই—১৬৲



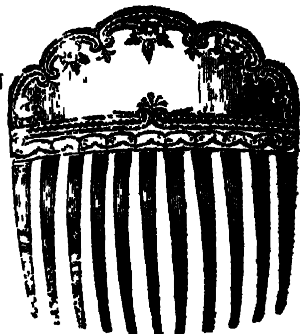
১৸০ „ ১৪৲
১॥০ „ ১২৲

তার-পেঁচ বালা—প্রমাণ ১৬৲, বালিকা—১৩৸৶০।



কল্যাণ চিরুণী

মহিষ-শৃঙ্গের ফ্রেমের উপর গিনি সোনার পালিশ পাতে চমৎকার এনগ্রেভ করা। ১১ দাঁড়া ১৭৲ ১০ দাঁড়া ১৪৸০ ৯ দাঁড়া ১২॥০ টাকা।



স্বত্বাধিকারী—
শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী
মাতৃমন্দির-সম্পাদক

ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাঃ-খুলনা।

বিভিন্ন অলঙ্কারের ক্যাটালগ চাহিলেই পাঠান হয়।

কার্ত্তিক মাসের সূচী।

Printed and Published by Brojendra Nath Chatterjee. B. A.—1, Telipara Lane, Calcutta

Printed at Kusumika Press. 52/7 Bowbazar Street, Calcutta.

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের" নিয়মাবলী।

"আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ, বৎসরের যে কোনো সময় গ্রাহক হইলে তাঁহাকে অগ্রহায়ণ হইতে 'কাগজ' লইতে হইবে।

অপ্রাপ্ত সংখ্যা। "আয়ুর্ব্বিজ্ঞান" প্রতি বাংলা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। কোন মাসের কাগজ না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্তি সংবাদ ডাকঘরে খবর লইয়া ডাকবিভাগের উত্তর সহ আমাদের নিকট পৌছান আবশ্যক।

পত্রোত্তর। রিপ্লাই কাড কিম্বা টিকিট না পাঠাইলে কোন চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রবন্ধাদি। টিকিট বা ঠিকানা লেখা খাম দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। রচনা কেন অমনোনীত হইল, তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কোনো উত্তর দিতে অসমর্থ।

প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন,
সম্পাদক—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১১।১ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতার এজেণ্ট—

কলিকাতা বুকডিপো লিমিটেড,
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীবিনোদবিহারি দত্ত
৮১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বমাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ লইবেন। নচেৎ হারাইয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

বিজ্ঞাপনের সাধারণ পৃষ্ঠা।

Foreign Rate. Rs. 20 Per Page.

পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৬৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	৯৲
সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	৫৲

কভারে এবং বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞাপনের মূল্য বাকা থাকিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ,
স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার—আয়ুর্ব্বিজ্ঞান,
১নং তেলিপাড়া লেন কলিকাতা।

বেনারসের এজেণ্ট—

শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশী বাণীমন্দির,
দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারস।

ঢাকার এজেণ্ট—

শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি-এ
স্কুল সাপ্লাই কোঃ, পটুয়াটুলি ঢাকা।

প্রাচ্য ভিষগ্ সম্মিলন

7th

CONGRESS OF FAR EASTERN

TROPICAL ASSOCIATION.

৫ই ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা অধিবেশন আরম্ভ।

রোগ নিবারণ, গবেষণার

ফলাফল বিবৃতি

ও

আলোচনার জন্য ইউরোপের মনীষিগণ

কলিকাতায় আসিবেন।

আপনি কি যোগদান করিবেন না?

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান

১ম বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৪ { ৭ম সংখ্যা

নরদেহ তত্ত্ব

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস)

[ধমনী পরিচয়]

সমগ্র শরীরে রস রক্ত কিরূপে সঞ্চালিত হয়, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

রক্ত-শরীরের সারভূত ও সকল ধাতুর পোষক লবণবহুল রক্তবর্ণ তরল পদার্থ রক্ত নামে অভিহিত। রসই 'রঞ্জকাখ্য পিত্ত' কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে। রক্তের পরিমাণ সমগ্র শরীরের ভারের দ্বাদশাংশ বা ত্রয়োদশাংশ। কেহ কেহ বলেন বিংশাংশ।

রক্ত পঞ্চভূতাত্মক হইলেও প্রধানতঃ উহার উপাদান দুই প্রকার; যথা, আপ্য ও পার্থিব। তন্মধ্যে আপ্য উপাদান জলের ন্যায় নির্ম্মল ও তরল—উহা লসীকা (Lymph) নামে অভিহিত। রক্ত জমিয়া গেলে লসীকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে এবং তখন উহা রক্তমস্তু (Serum) নামে অভিহিত হয়। পার্থিব উপাদানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুঃ দ্বারা তিন প্রকার পদার্থ দেখা যায়, যথা রক্তকণিকা (Red Corpuscles), শ্বেতকণিকা (White Corpuscles) এবং অণুচক্রিকা (Blood Platelets)। তন্মধ্যে রক্তকণিকা সূক্ষ্ম গোলাকার এবং সংখ্যায় শ্বেতকণিকার প্রায় পঞ্চশত গুণ। উহারাই লোহিত বর্ণের আধার। শ্বেতকণিকাগুলি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম তুলার টুকরার ন্যায় দেখা যায়, কিন্তু উহাদের আকৃতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। রক্তে কোন দূষিত বস্তু প্রবেশ করিলে উহারা তাহা গ্রাস করিয়া রক্তকে রক্ষা করে। অণুচক্রিকার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং উহাদিগের আকার অতীব সূক্ষ্ম ও চ্যাপ্টা।

হৃদয়কে কেন্দ্র করিয়া রক্ত ক্রমে ধমনী, জালক ও শিরার ভিতর দিয়া অহরহঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। হৃদয় দ্বারাই রক্ত ধমনী সমূহে নিক্ষিপ্ত হয়, ধমনী হইতে উহা জালক সমূহে প্রবেশ করে, পরে জালক হইতে সর্ব্বশরীরব্যাপী শিরাসমূহ দ্বারা সংগৃহীত হইয়া ঐ রক্ত

পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। জালক হইতে রক্তের লসীকা নামক তরল ও স্বচ্ছ অংশ চুয়াইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত শরীরের ধাতু সমূহের পোষণ হইয়া থাকে।

ধমনী (Arteries)—হৃদয় হইতে বহির্মুখ রক্ত বহা প্রণালীর নাম ধমনী। জীবিতের শরীরে উহারা অরুণবর্ণ এবং মৃতের শরীরে পাণ্ডুবর্ণ। ধমনী সকল স্থূল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং ঈষৎ কঠিনস্পর্শ। ধমনী সমূহে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়; কেবল ফুস্ফুসাভিগা ধমনী ও উহাদের শাখা প্রশাখা সমূহে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় না। ফুসফুসাভিগা ধমনীগুলি সিরা সমূহ দ্বারা আনীত অবিশুদ্ধ রক্তকে বিশুদ্ধ বায়ুসংযোগের জন্য শাখাপ্রশাখা দ্বারা ফুস্ফুসদ্বয়ে লইয়া যায়।

সিরা (Veins)—হৃদয়াভিমুখে রক্তবহনকারিণী প্রণালীর নাম সিরা। উহারা নীলাভ, পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং কোমলস্পর্শ। সিরা সমূহে শ্যামবর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয়; কিন্তু ফুসফুস হইতে আগত সিরাগুলিতে শ্যামবর্ণ রক্ত প্রবাহিত হয় না। উহাদের ভিতর দিয়া ফুস্ফুস্ দ্বারা বিশোধিত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত হৃদয়াভিমুখে প্রবাহিত হয়।

ধমনী সমূহের নামকরণ নানাবিধ হেতু ধরিয়া হইয়া থাকে। কখন অবস্থান ভেদে, যেমন—অক্ষকাধরা; কখন পোষণীয় অবয়বের নামে—যেমন অনুমস্তিষ্কা; কখন যদৃচ্ছাক্রমে—যেমন মহামাতৃকা। সিরা সকলের নামকরণও এই প্রকারেই হইয়া থাকে।

ধমনী ও সিরাসমূহ তিনটী প্রাচীরিকার দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে বাহ্য প্রাচীরিকা (External coat or Tunica Adventitia) স্নায়ুসূত্রময় নলিকাকৃতি—উহা অপর দুইটী প্রাচীরিকাকে ধারণ করিয়া থাকে। মধ্য প্রাচীরিকা (Middle Coat or Tunica Media) স্বতন্ত্র পেশীতন্তু-নির্ম্মিত নলিকাকৃতি এবং আকুঞ্চন প্রসারণশীল। আভ্যন্তর প্রাচীরিকা (Internal Coat or Tunica Intima) পাতলা কলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই কলাই আয়ুর্ব্বেদে 'রক্তধরা কলা' নামে অভিহিত। উহা স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম স্নায়ুসূত্রজাল দিয়া সংবেষ্টিত। তিনটী প্রাচীরিকার মধ্যে ধমনী সমূহে—বিশেষতঃ মধ্যমাকৃতি ধমনীগুলিতে—বাহ্য ও মধ্যমা প্রাচীরিকা স্থূলাকৃতি—সিরা সমূহে উহারা অত্যন্ত পাতলা। মধ্যমা প্রাচীরিকায়ও স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট স্নায়ুসূত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। স্থূলতর সিরা ধমনীগুলির পাবণের জন্য, উহাদিগের চারিদিকে এক প্রকার শিথিল কঞ্চুক আছে। উহারা **ধমনীকঞ্চুক বা সিরাকঞ্চুক** (sheaths) নামে অভিহিত।

সিরা সকলের অভ্যন্তরে রক্তস্রোতঃপথে কিছু দূরে দূরে স্বয়ংপতনশীল কপাটিকা সকল দেখা যায়। ঐ কপাটিকাগুলি কেবল নির্ম্মাণকৌশলে হৃদয়াভিমুখে প্রবহনশীল রক্তের পশ্চাদ্গতি রোধ করিয়া থাকে। উহারা **সিরাকপাটিকা** (Valve) নামে অভিহিত।

জালক (Capillaries) সমূহ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সিরাধমনী-জাল নির্ম্মিত স্রোতঃ। গাছের পাতায় যেমন সূক্ষ্ম সিরাজাল থাকে, জালক সমূহ সেইরূপ ভাবে সমস্ত শরীরেও পরিব্যাপ্ত আছে। উহারা ক্রমশঃ জালাকারে বিভক্ত সূক্ষ্মতম ধমনী সমূহ ও সূক্ষ্মতম সিরাজালের সম্মিলনে রচিত। উহাদের প্রাচীর এত পাতলা যে, উহাদিগকে কেবল রক্তধরা কলানির্ম্মিত (Endothelical membrane) বলিলেও দোষ হয় না। লসীকা নামক রক্তের স্বচ্ছ জলীয় অংশ এই জালক সমূহ হইতে সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দুরূপে পরিস্রুত হইয়া শরীরের সমস্ত ধাতুগুলিকে (Tissue) পোষণ করিয়া থাকে। এইরূপ লসীকা পরিস্রুতির পর জালকস্থিত অবশিষ্ট রক্ত শরীরে সঞ্চরণ হেতু অঙ্গারক-বাষ্প সংযোগে মলিন হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিরা দ্বারা ক্রমশঃ স্থূল ও স্থূলতর সিরা পথে প্রবেশ করে এবং শেষে দুই মহাসিরা দ্বারা হৃদয়ে উপস্থিত হয়। এদিকে ধাতুপোষণের পরে লসীকার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে

উহা রসায়নী মার্গ দ্বারা যাইয়া শেষে সিরা পথেই প্রবেশ করে। এই সকল বিষয় পরে পুনরায় বিস্তারিতভাবে বলা যাইবে।

চরকে উক্ত হইয়াছে—"ধ্মানাদ্ধমন্যঃ স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ" (সূত্র, ৩০ অঃ); অর্থাৎ ধ্মান হেতু ধমনী, স্রবণ হেতু স্রোতঃ এবং সরণ হেতু সিরা বলা যায়। এস্থলে ধ্মান অর্থে রক্তকে বলপূর্ব্বক বিক্ষেপ করা, স্রবণ অর্থে চুঁয়াইয়া পড়া এবং সরণ অর্থে মৃদু গতিতে চলন—ইহাই আচার্য্যগণের অভিমত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। উক্ত বচনে 'স্রোতঃ' শব্দ দ্বারা জালক সমূহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

রসায়নী সমূহের বিষয় পরে পৃথক অধ্যায়ে বলা যাইবে।

হৃদ্‌যন্ত্র (Heart) রক্তের সংগ্রহণ প্রেরণ যন্ত্র এবং উরোগুহায় অবস্থিত। উহা নিয়ত সঙ্কুচিত ও বিস্ফারিত হইয়া পৃথক কোষ্ঠদ্বারা রক্তের সংগ্রহণ ও বিক্ষেপন করে। হৃদয়ে পেশীকোষময় চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে—দক্ষিণার্দ্ধে দুইটী এবং বামার্দ্ধে দুইটী। উহার দক্ষিণার্দ্ধের উত্তর প্রকোষ্ঠ উত্তরা ও অধরা মহাশিরা দ্বারা সর্ব্বশরীর হইতে আনীত রক্ত আকর্ষণ করিয়া লয় এবং সেই রক্ত অধর প্রকোষ্ঠে বায়ু সংযোগে বিশুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসাভিগা ধমনী দ্বারা ফুসফুসদ্বয়ে প্রেরিত হয়। আর উহার বামার্দ্ধের উত্তর প্রকোষ্ঠ ফুসফুসাগত সিরাচতুষ্টয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত আকর্ষণ করিয়া লয় এবং অধর প্রকোষ্ঠ উহা লইয়া মহাধমনী পথে সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত করে। মহাধমনী ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শেষে সর্ব্বশরীর পোষণের জন্য সূক্ষ্ম জালক সমূহে পরিণত হইয়াছে। জালক হইতে উপচিত রক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিরাসমূহে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর শিরার ভিতর দিয়া যাইয়া, শেষে মহাসিরাপথে হৃদয়ের দক্ষিণার্দ্ধের উত্তর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। রক্তের এই নিরন্তর যাতায়াতকে **রক্ত-সংবহন** (Circulation of blood) বলা যায়।

শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ রক্ত-সংবহনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথমতঃ—সামান্যকায়িক, দ্বিতীয়তঃ ফৌস্ফুস। তন্মধ্যে—সামান্যতঃ সমস্ত শরীর হইতে আগত রক্তের হৃদয়ে প্রবেশ এবং পুনরায় হৃদয় হইতে সর্ব্বশরীরে গমন—ইহাকে সামান্যকায়িক (General circulation) রক্ত-সংবহন বলা যায়। আর দক্ষিণ হৃদয়ার্দ্ধ হইতে রক্তের ফুসফুসে গমন, সেখানে বায়ু-কোষের চারিদিকে অবস্থিত জালক সমূহে প্রসরণ, তথায় বায়ু সংযোগে বিশুদ্ধি এবং বাম হৃদয়ার্দ্ধে আগমন, ইহাই ফৌসফুস রক্ত-সংবহন (Pulmonary circulation)। এই দুই প্রকার রক্তসংবহন পরস্পর-সাপেক্ষ বলিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহারা পৃথক নহে। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রক্ত-সংবহন আছে, উহার নাম রক্ত-সংবহন (Portal circulation)। কেহ কেহ উহাকে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, কেননা উহাতে অন্নরস ও রক্ত একত্র মিশ্রিত হইয়া প্রবাহিত হয় এবং উহাই সামান্যকায়িক রক্ত সংবহনের পোষণদ্বার স্বরূপ। এ কথা পরে বিশদভাবে বলা যাইবে।

রস-সংবহন—আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধান্তে রস-সংবহন দুই প্রকার,—ভুক্তরস-সংবহন এবং লসীকা-সংবহন।

ভুক্তরস-সংবহন—সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে খাদ্য দুই প্রকার এবং দুই প্রকার গুণের প্রধান্য হেতু উহা হইতে দুই প্রকার ভুক্ত রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভুক্তরস যেমন সৌম্য ও আগ্নেয়ভেদে দুই প্রকার, সেইরূপ ভুক্তরস সংবহনও দুই প্রকার। তন্মধ্যে দুগ্ধাদি সৌম্য খাদ্য হইতে উদ্ভূত ভাতের ফেনের ন্যায় যে রস, উহা সৌম্য রস, উহা অন্ত্র হইতে সূক্ষ্ম কেশজালের ন্যায় রক্তস্রোত গুলিতে আকৃষ্ট হইয়া 'পয়স্বিনী' নাম্নী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালী দিয়া 'অন্ত্রমূলিক' রসগ্রন্থিগুলিতে এবং সেখান হইতে রসায়নী পথে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখস্থ রসপ্রপায় প্রবেশ করে। তথা হইতে বাম রসকুল্যা দ্বারা গলমূলিকা সিরায়, তথা হইতে উত্তরা মহাসিরায় এবং ঐ সিরাপথে সির-রক্তমিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। ইহাকে **সৌম্যরস-সংবহন** বলে। মাংসাদি আহারসম্ভূত যে আগ্নেয় ভুক্তরস, তাহা

আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে সূক্ষ্ম সিরাজাল সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং প্লীহাদি হইতে আগত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রতীহারিণী নাম্নী মহা সিরা দ্বারা যকৃতে প্রবেশ করে। যকৃতে প্রবিষ্ট হইয়া উহা পুনরায় পাকপ্রাপ্ত হয় এবং তত্রস্থ সূক্ষ্ম সিরা-জালক সমূহের নির্ম্মাণকৌশলে ও প্রভাবে নির্বিষ হয়। অনন্তর 'যকৃৎকর্ণিকা' সমূহের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম সিরাজাল দ্বারা সংগৃহীত হইয়া ঐ রক্ত যাকৃত সিরাগুলি দ্বারা অধর মহাসিরায় এবং তদ্দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে। ইহাকে **আগ্নেয় বা যাকৃত রস-সংবহন** বলা যায়। এইরূপে রস ও রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় এবং রসের রক্তরূপে পরিণতি হওয়ায় সূক্ষ্মদর্শীরা যাকৃত রক্ত-সংবহনকে সামান্য রক্ত-সংবহন হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন।

লসীক-সংবহন (Lymph circulation)—লসীকা নামক রসের স্বচ্ছ জলীয় অংশ জালক সমূহ হইতে অস্থিমাংসাদি ধাতুর অভ্যন্তরে চুয়াইয়া ধাতুপোষণ করে। পরে অবশিষ্ট অংশ 'রসায়নী' নামক লসীকাস্রোতঃ সমূহ দ্বারা সংগৃহীত ও নীত হইয়া শেষে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। ইহাকে লসীকা-সংবহন বলা যায়। উহা এইরূপে ঘটিয়া থাকে:—মস্তক ও গ্রীবার দক্ষিণার্দ্ধের এবং দক্ষিণ বাহুর লসীকা দক্ষিণ রসকুল্যায় প্রবেশ করে। ঐ রসকুল্যা দক্ষিণ গ্রীবামূলস্থ সিরাসন্ধিতে সংযুক্ত থাকায় উক্ত লসীকা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শেষে উত্তর মহাসিরা পথে হৃদয়ে প্রবেশ করে। গ্রীবার অধোভাগস্থিত সমস্ত শরীরের লসীকা পূর্ব্বকথিত সৌম্য ভুক্ত রসের সহিত একযোগে অন্ত্রমূলিক গ্রন্থিসমূহ দ্বারা বিশোধিত হইয়া রসপ্রপায় প্রবেশ করে।

এইরূপে সঞ্চরণশীল লসীকার রসায়নীগুলির মাঝে মাঝে কুঁড় বা নিম্বফলের ন্যায় একপ্রকার গ্রন্থি দেখা যায়। উহারা লসীকা সঞ্চরণ পথের প্রহরী স্বরূপ। ঐরূপ গ্রন্থি গ্রীবা, কক্ষা ও বঙ্ক্ষণাদি প্রদেশে, উদর ও বক্ষের অভ্যন্তরে এবং পৃষ্ঠ বংশের সম্মুখে বিশেষভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়। উহাদিগের নাম রসগ্রন্থি বা লসীকাগ্রন্থি। এই দুইপ্রকার রস সংবহনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ পরিণামে রস রক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হৃদয়কে কোন স্থলে রস-সংবহনের মূল, কোথাও বা রক্ত সংবহনের মূল বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে রস শব্দ অনেক স্থলে রক্তার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। গর্ভস্থ শিশুর রক্ত-সংবহন 'উরোহৃদয়' বর্ণন প্রসঙ্গে বলা যাইবে।

উরোগুহা ও হৃদয়ের বর্ণনা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে; উরঃপঞ্জর উরোগুহার আধার স্বরূপ। কিন্তু উহার আভ্যন্তর আয়তন ঠিক বাহ্য আয়তনের অনুরূপ নহে। কেন না, উরোগুহার তলদেশে মাজপৃষ্ঠ মহাপ্রাচীরা পেশী দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া হ্রস্বায়তন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ফুসফুসদ্বয়ের শিখরদেশ গলমূলের উভয় পার্শ্বে কিছুদূর পর্য্যন্ত উর্দ্ধে বিস্তৃত বলিয়া উরোগুহার উপবিভাগ কিছু দীর্ঘায়তন বলা যাইতে পারে। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্বাসপ্রশ্বাস-কালে মহাপ্রাচীরা পেশী এবং পর্শুকা ও উপপর্শুকা সমূহের প্রতিনিয়ত উর্দ্ধাধঃ প্রচলনহেতু উরোগুহার আয়তন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

উরোগুহার ভিতর চারিটী যন্ত্র প্রধান—মধ্যে মহাধমন্যাদি সহিত হৃদয়, উভয় পার্শ্বে ক্লোমনলিকা সহ ফুসফুসদ্বয়, পশ্চাতে অন্ননলিকা।

উরঃফলকের পৃষ্ঠদেশ হইতে পৃষ্ঠবংশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে **ফুসফুসান্তরাল বলে**। বর্ণনার সুবিধার জন্য ঐ স্থানের চারিটী বিভাগ কল্পনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ—উত্তর ও অধর প্রদেশ ভেদে উরোগুহার দুইটী বিভাগ করা যায়। পরে অধর প্রদেশকে অগ্রিম, মধ্যম ও পশ্চিম ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এইরূপে বিভক্ত ফুসফুসান্তরালের চারিটী ভাগ, যথা,—উত্তর, অধরাগ্রিম, অধর-মধ্যম এবং অধর-পশ্চিম ভাগ।

তন্মধ্যে উত্তর ফুসফুসান্তরালে যথা—প্রধান শাখাত্রয়ের সহিত তোরণী মহাধমনী, উত্তর মহাসিরার উত্তরার্দ্ধ, 'গলমূলিকা' সিরাদ্বয়, 'প্রাণদা' নাড়ীদ্বয়, 'অনু-

কোষ্ঠিকা' নাড়ীদ্বয় ক্লোমনলিকা, অন্ননলিকা, রসকুল্যা, বালগ্রৈবেয়ক (Thymus gland) নামক গ্রন্থির অবশেষ, লসিকাগ্রন্থি সমূহ এবং অন্যান্য পেশী ও নাড়ী সমূহ।

অধরাগ্রিম ফুস্‌ফুসান্তরালের স্থান উরঃফলকের পৃষ্ঠ হইতে হৃৎকোষের সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত। ঐ স্থানে 'অন্তঃস্তনিকা' ধমনীদ্বয়, উরঃস্থিত লসীকাগ্রন্থি সমূহ ও উরস্ত্রিকোণিকা নাম্নী পেশী।

অধরমধ্যম ফুস্‌ফুসান্তরালের হৃৎকোষবেষ্টিত হৃদয়, আরোহিণী মহাধমনী, উত্তরা মহাসিরার নিম্নার্দ্ধ, ক্লোমনলিকার শাখাদ্বয়, দ্বিধাবিভক্ত ফুস্‌ফুসাভিগা ধমনী, ফুস্‌ফুসীয় সিরা, 'অনুকোষ্ঠিকা' নাড়ীদ্বয়, উরোমধ্যস্থ লসীকাগ্রন্থি সমূহ।

অধর-পশ্চিম ফুস্‌ফুসান্তরালে অবরোহিণী মহাধমনী, অন্ননলিকা, রসকুল্যা, পুরোবংশিকা সিরাদ্বয়, 'প্রাণদা' নাড়ীদ্বয়, ইড়া ও পিঙ্গলা মহানাড়ীদ্বয়ের উরস্থ ভাগ এবং লসীকাগ্রন্থি সমূহ।

উরোগুহার ঊর্দ্ধদ্বারে মধ্যরেখায়—পেশী পরিবৃত বালগ্রৈবেয়ক গ্রন্থির অবশেষ, ক্লোমনলিকা ও অন্ননলিকা (পূর্ব্বাপর ক্রমে), উহার উভয়পার্শ্বে মহামাতৃকাখ্য ধমনীদ্বয়, গলমূলিকা সিরাদ্বয়, 'প্রাণদা' নাড়ীদ্বয়, ইড়া ও পিঙ্গলা মহানাড়ীদ্বয়, রসকুল্যা এবং গ্রীবাবংশের সম্মুখস্থ কোন কোন পেশী এই স্থানে উভয় পার্শ্বে সমুত্থিত দুইটী ফুস্‌ফুস্‌শিখর, উরস্থা কলা ও ফুস্‌ফুস্‌শীর্ষণ্যা নাম্নী গভীর প্রাবরণী দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায়।

উরোগুহার আভ্যন্তর ভাগ উক্ত উরস্থা বা ফুস্‌ফুস্‌ধরা কলার পরিসরীয় ভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ কলার বিষয় যথাস্থানে বলা যাইবে। উরোগুহার তলদেশ মহাপ্রাচীরা পেশীর দ্বারা নির্ম্মিত, তিনটী ছিদ্রযুক্ত এবং উক্ত কলা দ্বারা আচ্ছাদিত। মহাপ্রাচীরা বর্ণন প্রসঙ্গে উহার বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

হৃৎকোষ বা পুরীতৎ- অধর ও মধ্যম ফুস্‌ফুসান্তরালে উরঃফলকের পশ্চাতে হৃদয় অবস্থিত; কিন্তু উহার অধিকাংশ উরঃফলকের বামদিকে থাকে। উহা স্থূল সিরা ও ধমনীগুলির মূলভাগ সহ হৃদয়ধর 'নামক কলাকোষের দ্বারা আবৃত। বৈদিক সাহিত্যে উহার নাম "পুরীতৎ" *।

হৃৎকোষ বা পুরীতৎ নাতিস্থূল দুইটী স্তর দ্বারা নির্ম্মিত। উহার বাহ্যস্তর দৃঢ়স্নায়ুময় ও শিথিল—উহা হৃদয়ে সংসক্ত নহে। পরন্তু উহা উত্তরা মহাসিরা ব্যতীত অন্যান্য স্থূল সিরা ও ধমনীগুলির মূলে সংসক্ত এবং উপরদিকে গ্রীবামধ্যকঞ্চুকের সম্মুখভাগের সহিত সংবদ্ধ। উহার তলদেশ অধোদিকে মহাপ্রাচীরা পেশীর মধ্যপত্রকে সংবদ্ধ। উহার আভ্যন্তর স্তর পাতলা ও মসৃণ কলাময়। উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃদয়ের সহিত সংসক্ত এবং চারিদিকের সীমাবর্ত্তী অংশ দ্বারা বাহ্যস্তরের সহিত মিলিত। উভয় স্তরের অন্তরালে স্বল্পমাত্র পিচ্ছিল লসীকা বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ লসীকা দ্বারা অভ্যক্ত থাকায় নিয়ত সঙ্কোচ ও প্রসরণবশতঃ হৃদয় উরঃ পঞ্জরাদির ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ঐ লসীকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ঘন হইলে রোগ জন্মিয়া থাকে। সেই রোগে হৃদয়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক ঘটে। অন্তঃস্তনিকা ধমনী ও মহাধমনীর সূক্ষ্ম শাখা দ্বারা উক্ত কলাকোষের পোষণকার্য্য সম্পাদিত হয়। উহার সংজ্ঞাবহা নাড়ী প্রাণদা, অনুকোষ্ঠিকা এবং ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের সূক্ষ্ম শাখাসমূহ।

হৃদয়।—হৃদয় স্বতন্ত্রপেশী নির্ম্মিত শূন্যোদর যন্ত্র। উহা অধোমুখ বৃহৎ পদ্মমুকুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট, হৃদয়ধর কলাকোষের দ্বারা আবৃত এবং অধর-মধ্যম ফুস্‌ফুসান্তরালের সম্মুখভাগে বামদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। উহার তলদেশ দক্ষিণদিকের তৃতীয় উপপর্শুকার উরঃফলক-সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া, বাম দিকের দ্বিতীয় উপপর্শুকার উরঃফলক-সন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

* কেহ কেহ বলেন 'পুরীতৎ' নামটীর অর্থ হৃদয়ের সন্নিহিত "অনাহত চক্র" (Cardiac Plexus)।

আর উহার অগ্রভাগ পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্শুকার অন্তরালে মধ্যরেখার চারি অঙ্গুলি বহির্দ্দিকে অবস্থিত। উহার নিয়ত স্পন্দন স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়, কখনও দেখাও যায়।

হৃদয়ের গুরুত্বের পরিমাণ—যুবা পুরুষের পাঁচশ তোলা হইতে ত্রিশ তোলা পর্য্যন্ত। স্ত্রীলোকের হৃদয় লঘুতর, প্রায় কুড়ি তোলা বা কিঞ্চিৎ অধিক। হৃদয়ের দৈর্ঘ্য ছয় অঙ্গুলি, প্রস্থ চারি অঙ্গুলি এবং বেধ প্রায় তিন অঙ্গুলি প্রমাণ।

হৃদয় দৈর্ঘ্যের অনুক্রমে অবস্থিত মাংসময় অন্তঃপ্রাচীর দ্বারা—দক্ষিণার্দ্ধ ও বামার্দ্ধ—দুইভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে দক্ষিণার্দ্ধের বেশী ভাগ সম্মুখে এবং বামার্দ্ধের বেশী ভাগ পশ্চাতে অবস্থিত। আবার প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ প্রস্থের অনুক্রমে অবস্থিত সচ্ছিদ্র প্রাচীরের দ্বারা দুই প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, যথা, উত্তর প্রকোষ্ঠ ও অধর প্রকোষ্ঠ। তন্মধ্যে উত্তর প্রকোষ্ঠের নাম অলিন্দ (Auricle) এবং অধর প্রকোষ্ঠের নাম নিলয় (Ventricle)। এইরূপে হৃদয়—দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়, এবং বাম অলিন্দ ও বাম নিলয় এই চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

হৃদয়ের বহির্দ্দেশ হৃৎকোষের পাতলা কলা দ্বারা আবৃত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিলয়দ্বয়ের মধ্যে দৈর্ঘ্যের অনুক্রমে সম্মুখে ও পশ্চাতে এক একটী সীতা বা খাঁজ আছে। উহাদিগের নাম **অধিনিলয়িকা**। ঐ সীতা দেখিয়া নিলয়দ্বয়ের মধ্যস্থ প্রাচীরের সীমা বাহির হইতেই নির্দ্দেশ করা যায়। এইরূপ অনুপ্রস্থ ভাবেও সম্মুখে একটী ও পশ্চাতে একটী সীতা আছে। ঐ সীতা অলিন্দ ও নিলয়ের বিভাগ সূচনা করে। উক্ত সীতাদ্বয়ের নাম **অলিন্দনিলয়ান্তরিকা**। অধিনিলয়িকা সীতাদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া বামা ও দক্ষিণা হার্দ্দিকী ধমনী হার্দ্দিকী সিরাদ্বয় সহ প্রসৃত হইয়া থাকে। অপর সীতাদ্বয়ের অন্তরালে উহাদিগের শাখা সমূহ প্রসৃত হয়।

প্রথমেই হৃদয়ের বাহিরে ও ভিতরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক, যথা—দক্ষিণালিন্দে উর্দ্ধদিকে সংসক্ত উত্তরা মহাসিরা এবং অধোদিকে সংসক্ত অধরা মহাসিরা। দক্ষিণ নিলয় হইতে উর্দ্ধে প্রসৃত ফুস্ফুসাভিগা ধমনী। বামালিন্দে প্রবিষ্ট ফুস্ফুসপ্রভবা চারিটি সিরা। বামনিলয় হইতে উর্দ্ধে প্রসৃত মহাধমনী।

ঐ সকল সিরাধমনীর মধ্যে হৃদয়ের বহির্দ্দেশে সম্মুখ হইতে দ্রষ্টব্য—দক্ষিণদিকে মহাধমনী, বামদিকে ফুস্ফুসাভিগা ধমনী। তন্মধ্যে মহাধমনী স্বীয় তোরণভাগ দ্বারা ফুস্ফুসাভিগা ধমনীকে ক্রোড়ে করিয়া অবস্থিত। পশ্চাৎ হইতে দ্রষ্টব্য—উত্তরা ও অধরা মহাসিরা এবং হৃদয়-প্রবেশিনী চারিটী ফুসফুসপ্রভবা সিরা। হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সকল বিষয়ই সাবধানে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা সম্যক্‌রূপ দেখা যায়। হৃদয়ের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ হৃদয়ান্তরীয়া নাম্নী সুসূক্ষ্ম রক্তধরা কলা দ্বারা আবৃত। ঐ কলা সিরাধমনী সমূহের অভ্যন্তরস্থ রক্তধরা কলার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অনুবৃত্তিরূপ।

এক্ষণে বিস্তারিতভাবে হৃদয়ের বর্ণন করা যাইতেছে।

দক্ষিণালিন্দ (Right Auricle) পাতলা মাংসল প্রাচীরবিশিষ্ট এবং বামালিন্দ অপেক্ষা আয়তনে কিঞ্চিৎ বড়। উহার অভ্যন্তরস্থ গুহা প্রায় পাঁচ তোলা পরিমাণ রক্ত ধারণ করে। উহার দুইটী অংশ—**অলিন্দশীর্ষক** ও **অলিন্দোদর**। তন্মধ্যে অলিন্দশীর্ষক উপরি ভাগে অবস্থিত এবং ভিতরে 'কঙ্কতিকা' নাম্নী চিরুণীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পেশীগুচ্ছ দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। আর অলিন্দোদর নিম্নদিকে অবস্থিত, উহা সিরারক্তের আয়তনস্বরূপ। অলিন্দোদরের উর্দ্ধে ও অধোদিকে উত্তরা ও অধরা মহাসিরার দ্বারভূত দুইটী বৃহৎ ছিদ্র আছে। উহারা **উত্তর ও অধর মহাসিরা-বিবর** নামে অভিহিত। তন্মধ্যে অধরা মহাসিরার ছিদ্রমুখে স্বয়ংপতনশীল সিরা-কপাট দেখা যায়, উহা গর্ভস্থ শিশুর শরীরে কার্য্যকর। উক্ত উভয় ছিদ্রের মাঝামাঝি (উভয় অলিন্দের মধ্যস্থ প্রাচীরে) অলিন্দান্তরীয়

প্রাচীরকায় ক্ষুদ্র ঝিনুকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট খাত আছে; উহার নাম **শুক্তিখাত**। উহা গর্ভস্থ শিশুর শরীরে ছিদ্রাকারে থাকে, শিশু প্রসূত হইবার পর দশ দিনের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কচিৎ ঐ ছিদ্র অনবরুদ্ধ থাকিলে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ রক্ত মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া বাল্যকাল হইতেই শিশুর আকৃতি নীলাভ হয় এবং শিশু চিররুগ্ন ও অল্পজীবী হইয়া থাকে।

শুক্তিখাতের বামদিকে 'হার্দ্দিকী' নাম্নী সিরার দ্বারভূত যে বিবর দেখা যায়, উহার নাম হার্দ্দিক-সিরাবিবর। (হার্দ্দিকী সিরা হৃদয়ের চারিদিকে অবস্থিত সিরাসমূহ দ্বারা রক্তপূরিত হইয়া দক্ষিণালিন্দে প্রবেশ করে)। উক্ত বিবরের মুখে একটী ক্ষুদ্র সিরাকপাটিকা আছে। উহা হার্দ্দিক-সিরা রক্তের প্রতিনিবর্ত্তন রোধ করিয়া থাকে। দক্ষিণালিন্দ ও দক্ষিণ-নিলয়ের মধ্যে একটী মহাদ্বার আছে, উহা **দক্ষিণালিন্দ দ্বার** নামে অভিহিত। এই দ্বার প্রায় গোলাকার, দুই অঙ্গুলি আয়ত, পাত্‌লা স্নায়ুচক্ররক্ষিত এবং ত্রিপত্র-কপাট সংযুক্ত।

দক্ষিণ নিলয় (Right Ventricle) প্রায় ত্রিকোণ, পাত্‌লা প্রাচীর বিশিষ্ট এবং দক্ষিণালিন্দ-দ্বার হইতে হৃদয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আয়ত। উহার সম্মুখের প্রাচীর কিঞ্চিৎ কুব্জপৃষ্ঠ ও হৃদয়ের সম্মুখভাগ নির্ম্মাণকারী এবং উহার তলদেশ মহাপ্রাচীরার উপরে অবস্থিত। উহার গুহা প্রায় সাড়ে সাত তোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম। দক্ষিণ নিলয়ে নিম্নলিখিত অংশগুলি দ্রষ্টব্য।

ত্রিপত্র কপাট (Tricuspid Valve)—তিনটী স্বয়ংপতনশীল পত্রবৎ অংশদ্বারা নির্ম্মিত। ঐ পত্রকত্রয় অলিন্দ হইতে নিলয়াভিমুখে প্রসরণশীল রক্তের গতির অবরোধ করে না, কিন্তু নিলয় হইতে অলিন্দাভিমুখে রক্তের বিপরীত গতি রোধ করে—উহার নির্ম্মাণ-কৌশল এইরূপ বিচিত্র। প্রত্যেক পত্রক প্রায় ত্রিকোণ এবং উর্দ্ধভাগে অলিন্দদ্বয়ের অভ্যন্তরে পাশের দিকে সংসক্ত। উহাদের নিম্নপ্রান্তগুলি সূত্রাকার-স্নায়ুযুক্ত ও নিলয়-প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসস্তম্ভিকা দ্বারা সংলগ্ন। ঐ সকল স্তম্ভিকা **কপাটস্তম্ভিকা-পেশীগুচ্ছ** (Musculae Papillares) নামে অভিহিত। উহাদের উর্দ্ধমুখে সংলগ্ন স্নায়ুসূত্রগুলি ঐ স্তম্ভিকা পেশী সমূহের কণ্ডরার ন্যায়—এইজন্য উহারা **সূত্রকণ্ডুরিকা** (Chordae Tendinae) নামে অভিহিত।

ফুস্‌ফুস্‌ ধমনী দ্বার (Opening of Pulmonary Artery) দক্ষিণ নিলয়ের উর্দ্ধাস্থঃ কোণে অবস্থিত, প্রায় গোলাকার এবং স্নায়ুচক্র দ্বারা রক্ষিত। ঐ দ্বার অবরোধের জন্য স্বয়ংপতনশীল তিনটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাট আছে। উহারা উর্দ্ধে কোরোদর এবং পরস্পর সংসক্ত। উহারা দক্ষিণ নিলয় হইতে ফুস্‌ফুসাভিগা ধমনীতে প্রবর্ত্তমান রক্তের অবরোধ করে না; কিন্তু ঐ ধমনী হইতে দক্ষিণ নিলয়াভিমুখে রক্তের বিপরীত গতি রোধ করে। উহাদিগের নির্ম্মাণকৌশল এইরূপ বিচিত্র। উহারা **অর্দ্ধেন্দু-কপাটিকা** (Semilunar Valves) নামে অভিহিত।

বামালিন্দ (Left Auricle) দক্ষিণালিন্দ অপেক্ষা ঈষৎ স্বল্পায়তন, কিন্তু বিশেষ স্থূল প্রাচীর বিশিষ্ট। উহার গুহা প্রায় পাঁচতোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম। বামালিন্দেরও দুইটী অংশ—অলিন্দশীর্ষক ও অলিন্দোদর। অলিন্দোদরে চারিটী ছিদ্র আছে, দুইটী দক্ষিণদিকে ও দুইটী বাম দিকে। উহারা ফুস্‌ফুসপ্রভব সিরা চতুষ্টয়ের (Pulmonary Veins) প্রবেশ দ্বার। বামালিন্দের অধোদিকে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে দুই অঙ্গুলি আয়ত, স্নায়ুচক্রবেষ্টিত ও দ্বিপত্রকপাটযুক্ত দ্বার আছে। উহার নাম বামালিন্দ দ্বার।

বাম নিলয় (Left Ventricle) ত্রিকোণাকার, দক্ষিণালিন্দ অপেক্ষা তিনগুণ স্থূল প্রাচীরযুক্ত এবং

বামালিন্দ দ্বার হইতে হৃদয়াগ্র পর্য্যন্ত আয়ত। উহার গুহা সাড়ে সাত তোলা রক্ত ধারণ করিতে সক্ষম। উহার পশ্চিম প্রাচীরের কিয়দংশ অধোদিকে হৃদয়ের অগ্রভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বাম নিলয়ের নিম্নলিখিত অংশগুলি বিশেষরূপে দর্শনীয়:—

দ্বিপত্র কপাট (Bicuspid or Mitral Valve) নামক স্বয়ংপতনশীল পত্রকদ্বয় নির্ম্মিত কপাট। ইহা অলিন্দদ্বারের রক্ষক এবং পূর্ব্বোক্ত ত্রিপত্র-কপাটবৎ কার্য্যকারী।

মহাধমনী দ্বার (Aortic opening) বাম নিলয়ের ঊর্দ্ধান্তর কোণে অবস্থিত, ফুসফুসাভিগা ধমনী-দ্বারের তুল্য আয়তন বিশিষ্ট এবং তিনটী অর্দ্ধেন্দু-কপাটিকা দ্বারা রক্ষিত। মহাধমনী ফুসফুসাভিগা ধমনীর সম্মুখ দিকে বক্রভাবে অবস্থিত এবং উহাকে নিজের তোরণাকার অংশ দ্বারা উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিমদিকে প্রসৃত, এইজন্য ইহার দ্বারটীও সম্মুখ দিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে অবস্থিত।

হৃৎকার্য্য চক্র—রক্ত-সংবহন হৃদয়ের কার্য্য-সাপেক্ষ—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছাত্রদিগের বিশদরূপে বুঝিবার জন্য এই স্থলে হৃদয়ের কার্য্য স্পষ্টতর ভাবে বলা যাইতেছে। হৃৎ-পেশীর সঙ্কোচ সিরাদ্বার-গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র অলিন্দদ্বয়ে, পরে নিলয়দ্বয়ে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমে অলিন্দদ্বয়ের সঙ্কোচ বশতঃ দক্ষিণালিন্দস্থিত কায়িক সিরারক্ত দক্ষিণ নিলয়ের দিকে এবং বামালিন্দস্থিত ফুসফুসীর সিরারক্ত বাম নিলয়ের দিকে যুগবৎ প্রবাহিত হয়। এই সময়ে সিরাদ্বারগুলি—কপাটরহিত হইলেও,—দৃঢ় আকুঞ্চনের ফলে বদ্ধ হইয়া যায় এবং কপাটপত্রক সমূহের অধঃপতনহেতু অলিন্দদ্বারদ্বয় সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে নিলয়দ্বয় রক্তপূর্ণ হয়। ইহাই প্রথম কার্য্যক্রম।

অনন্তর সঙ্কোচ নিলয়দ্বয়ে প্রসৃত হইলে দক্ষিণ নিলয়স্থ রক্ত ফুসফুসাভিগা ধমনীপথে এবং বাম নিলয়স্থ রক্ত মহাধমনী পথে প্রেরিত হয়। ঐ রক্ত-প্রবাহদ্বয় অলিন্দদ্বার দিয়া পশ্চাতে ফিরিতে পারে না, কারণ রক্তবেগ বশতঃ স্বয়ং পতনশীল কপাট-পত্রকগুলির দ্বারা উক্ত দ্বারদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই দ্বিতীয় কার্য্যক্রম।

অনন্তর ক্রমে সঙ্কোচন কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় অলিন্দদ্বয়ে বিস্ফারণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার ফলে প্রথমে অলিন্দদ্বয় সিরারক্ত আকর্ষণ করিয়া লয়। পরে বিস্ফারণ নিলয়ে প্রবর্ত্তিত হইলে নিলয়দ্বয় অলিন্দদ্বয় হইতে ঐ রক্ত আকর্ষণ করিয়া লয়। এই সময়ে আকৃষ্ট রক্ত নিলয়দ্বয় হইতে মহাধমনীতে বা ফুসফুসাভিগা ধমনীতে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না; কারণ ধমনীস্থ রক্তের প্রাত-ঘাতে অধঃপতনশীল অর্দ্ধেন্দু-কপাটিকাগুলির ক্রিয়াবশতঃ ধমনীদ্বয়ের দ্বার সে সময়ে অবরুদ্ধ থাকে। ইহাই তৃতীয় কার্য্যক্রম বা হৃৎপেশী সমূহের বিশ্রামাবস্থা। এইরূপে আদ্য কার্য্যক্রমকালে হৃদয়ের সঙ্কুচিতাবস্থা এবং শেষে বিস্ফারিতাবস্থা হয়—ইহা স্মরণ রাখা উচিত। সঙ্কোচ-কালের পরিমাণ বিপলমাত্র (২।৫ সেকেণ্ড) বিস্ফারণ কালের পরিমাণও ঐরূপ। এইরূপে বিপলে (৪।৫ সেকেণ্ডে) স্বভাবতঃ হৃৎকার্য্য-চক্র প্রবর্ত্তিত হয়, পরীক্ষকগণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কার্য্য-চক্র বালক, বৃদ্ধ শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ ও জ্বরিত লোকের আরও শীঘ্র বা বিলম্বে ঘটিতে পারে।

হৃৎকার্য্যক্রমের বাহ্য-চিহ্ন—শরীরের বাহিরে হৃৎকার্য্য-চক্রের ত্রিবিধ চিহ্ন দেখা যায়। যথা—হৃচ্ছব্দ, হৃৎপ্রাতিঘাত এবং ধমনী প্রতিঘাত। তন্মধ্যে—

হৃচ্ছব্দ (Heart—sound)—হৃদয়ের সম্মুখ-ভাগে কাণ দিয়া শুনিলে—ধগ্‌ টপ্‌—এইরূপ দুইটী শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ধগ্‌—এই গম্ভীর শব্দটী নিলয়দ্বয়ে সঙ্কোচ প্রবর্ত্তিত হইলে দ্বিপত্র ও ত্রিপত্র নামক কপাটগুলি দ্বারা উভয় অলিন্দদ্বারের যুগপৎ অবরোধ সূচনা করে। আর দ্বিতীয় টপ্‌—এই তীব্র শব্দটী নিলয়দ্বয়ের বিস্ফারণ আরম্ভ হইলে অর্দ্ধেন্দু কপাটিকা-

গুলি দ্বারা ধমনীদ্বার দ্বয়ের যুগপৎ অবরোধ সূচনা করে। বিশেষতঃ ত্রিপত্র-কপাটকৃত অবরোধ ধ্বনি উরঃফলকের অগ্রপত্র সন্ধিতে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। দ্বিপত্র কপাটকৃত অবরোধ ধ্বনি বাম চুচুকের নিম্নে পঞ্চম পর্শুকান্তরালে স্পষ্টতরভাবে শোনা যায়। অর্দ্ধেন্দুকপাটিকা গুলি দ্বারা মহাধমনীদ্বারের অবরোধ ধ্বনি উরঃফলকের দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় পর্শুকা ও উপপর্শুকার সন্ধিস্থলে সুস্পষ্টভাবে শ্রুত হয়। আর উরঃফলকের বামদিকে ঐরূপ স্থলে ফুসফুসাভিগা ধমনীর দ্বাররোধ ধ্বনি স্পষ্টতর শোনা যায়।

হৃৎপ্রতিঘাত (Heart-beat or Cardiac Impulse) বা হৃদগ্র-প্রতিঘাত কৃশ পুরুষের বক্ষঃস্থলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্শুকান্তরালে বাম চুচুকের অনুলম্ব রেখার অন্তঃসীমায় দুই অঙ্গুলি বা দেড় অঙ্গুলি স্থানে দেখা যায় এবং স্পর্শদ্বারা অনুভব করা যায়। উহাই হৃৎ-প্রতিঘাতের স্বাভাবিক স্থান, ঐ স্থান হইতে স্পন্দনচ্যুতি হওয়া রোগের লক্ষণ। হৃৎ-প্রতিঘাত—সঙ্কোচপ্রাপ্ত হৃদয়ের ধমনীমূল অভিমুখে ঈষৎ প্রচলন হেতু হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পুরোবিবর্ত্তন বশতঃ ঘটিয়া থাকে, পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

ধমনী-প্রতিঘাত (Pulse-beat) স্পর্শদ্বারা সমস্ত ধমনীতে, বিশেষতঃ মণিবন্ধাদি স্থানের ধমনীতে অনুভব করা যায় (কচিৎ দেখাও যায়)। অঙ্গুষ্ঠমূলাদিতে উহা বিশেষরূপে অনুভবযোগ্য। এইজন্য শাস্ত্রে "ধমনী জীবসাক্ষিণী" অর্থাৎ ধমনী-প্রতিঘাত জীবনের পরিচায়ক স্বরূপ বলা হইয়াছে। ধমনী-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য-বিশেষের অনুভব দ্বারা সুচিকিৎসকগণ হৃদয়ের কার্য্য এবং বাতাদি দোষের হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন।

ধমনী-প্রতিঘাত সাধারণতঃ "নাড়ীর গতি" নামে পরিচিত।

কায়িক শ্রম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু সি, আই, ই ; আই, এস, ও ; এম, বি ; এফ, সি, এস)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গভীর ভাবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলে রক্ত পরিষ্কৃত হইবার বিশেষ সুবিধা হয়। এই অভ্যাস যদি আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যখন আমরা মুক্তস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া থাকি, তখন ইহার সুফল বিশেষ ভাবে লাভ করিতে পারি। গভীর শ্বাসক্রিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির এক বিশিষ্ট উপায়।

আমাদের নাসিকাই শ্বাসক্রিয়ার স্বাভাবিক পথ, সুতরাং মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করা কোন মতে উচিত নহে। নাসিকার অভ্যন্তর প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোম দ্বারা আবৃত থাকে। বায়ুমধ্যে ধূলিকণা, ভুষা প্রভৃতি সূক্ষ্ম নানাবিধ দূষিত পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও উহারা ঐ রোমরাজির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং শ্বাসবায়ুর সহিত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বালাইলে নাসারন্ধ্রের মধ্যে পরদিন কিরূপ "কালি" জমিয়া থাকে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইলে এই সমস্ত দূষিত পদার্থ বায়ুর সহিত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত

অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। পুনশ্চ বাহিরের শীতল বায়ু নাসিকার মধ্য দিয়া দীর্ঘপথ বহিয়া যাইবার সময়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে, কিন্তু মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইলে বাহিরের শীতল বায়ু (বিশেষতঃ প্রবল শীতের সময়) তদবস্থায় ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া ফুসফুসের প্রদাহ প্রভৃতি কঠিন রোগ উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা।

যথারীতি ব্যায়াম করিলে বক্ষঃস্থল উন্নত ও প্রসারিত হয় এবং মাপে ৩।৪ ইঞ্চির অধিক বাড়িয়া যায়।

ব্যায়াম দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং উদরের পেশীসমূহের চালনা হেতু মলত্যাগ সহজ ও সরল হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ মূত্র ও ঘর্ম্ম শরীর হইতে নিঃসারিত হইয়া যায়, সুতরাং দেহমধ্যে সঞ্চিত বিবিধ দূষিত পদার্থ শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়াম করিলে মস্তিষ্ক সবল ও সতেজ হয় এবং কল্পনা ও চিন্তাশক্তি অধিকতর প্রসার লাভ করে।

ব্যায়াম করিবার সময় চর্ম্মের দিকে অধিক রক্ত সঞ্চারিত হয়, এজন্য ঐ সময়ে প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইতে থাকে। কিন্তু এত অধিক ঘর্ম্ম নিঃসারিত হইলেও যতক্ষণ ব্যায়াম করা যায়, ততক্ষণ বাহিরের বায়ু দ্বারা ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যায়াম হইতে ক্ষান্ত হইবামাত্র ফ্লানেলের ন্যায় ঘর্ম্মশোষক গরম কাপড় গায়ে দেওয়া উচিত। কারণ ঐ সময়ে চর্ম্মের রক্ত শীঘ্র শীতল হইয়া পড়ে, সুতরাং ঘাম শুকাইবার সময় অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাসি প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা।

মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যদি গৃহের মধ্যে ব্যায়াম করার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে যে গৃহের মধ্যে অধিক আলো ও বাতাস আসে, তাহার সমস্ত বায়ু-পথ উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে ব্যায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কুস্তি, বৈঠক, মুগুরভাঁজা, লাঠিখেলা, দাঁড়টানা, ডন্‌ফেলা ইত্যাদি নানারূপ ব্যায়াম, কি উচ্চ কি নিম্ন, সকল শ্রেণীর লোক দ্বারাই অল্পাধিক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। কপাটী খেলা, গুলিডাণ্ডা, দৌড়ান, লাফান, সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া আমাদিগের বালক ও যুবকদিগের অতিশয় প্রিয় ছিল। তখন গাড়ী ঘোড়া ও ট্রামওয়ের এত প্রাদুর্ভাব ছিল না; সহরের সম্পন্ন গৃহস্থ লোকেরাও সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে দিনে ২।৪ ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে কষ্টবোধ করিতেন না। এখন ট্রামওয়ের অনুগ্রহে ভদ্রলোকদিগের ত কথাই নাই, শ্রমজীবি লোকের পক্ষেও এক ক্রোশ পথ ভ্রমণ কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে পয়সা তাহারা ট্রাম-ওয়ের জন্য খরচ করে, পথ হাঁটিয়া যদি তাহার দ্বারা সারবান আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করে, তাহা হইলে, ব্যায়াম এবং পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, উভয়েরই সুফলের অধিকারী হইতে পারে!

জিম্‌নাষ্টিক পরদেশীয় হইলেও আমাদের বাল্যাবস্থায় বালক ও যুবকেরা এই ক্রীড়ার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র মহাশয় আমাদের দেশের যুবকদিগের মধ্যে যাহাতে এই ব্যায়াম বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজকাল জিম্‌নাষ্টিকে ছেলেদের বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস খেলার উপরেই ছেলেদের বেশী ঝোঁক হইয়াছে এবং এই সকল খেলায় তাহারা দিন দিন পারদর্শিতা লাভ করিতেছে। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় শুদ্ধ যে শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট হয়, তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কার্য্যক্ষিপ্রতা এবং একাগ্রতা প্রভৃতি জীবনযাত্রার উপযোগী সদগুণ গুলি ক্রীড়াস্থলে সহজেই আয়ত্ত হইয়া যায়। তবে ফুটবল খেলা অতিশয় পরিশ্রম সাপেক্ষ। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ এবং সবল ব্যক্তির পক্ষেও উহা পরি-মিতভাবে আচরণীয়। যাঁহারা অধিক পরিমাণে ফুটবল খেলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইয়া

থাকেন এবং এই কারণে অনেক সময়ে আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। *

ক্রিকেট খেলা ইংরাজদিগের জাতীয় ক্রীড়া। একটা ইংরাজী কথা আছে 'বিখ্যাত ওয়াটালু যুদ্ধ এক দিনে জিত হয় নাই—ইংলণ্ডের প্রত্যেক ক্রিকেট প্রাঙ্গনে প্রত্যহ এই যুদ্ধজয়ের সূচনা হইয়া আসিয়াছে।" একেলা ব্যায়াম করা অপেক্ষা অনেকে একত্রে ব্যায়াম করিলে সবিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। যে সকল ক্রীড়ায় শরীর চালনার সহিত মানসিক শক্তিগুলির সবিশেষ পরিচালনা করিবার সুবিধা হয়, সে গুলি অন্য প্রকার ব্যায়াম হইতে যে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে মোহনবাগান "ফুটবল ক্লাবে"র বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি ডাক্তার থর্ণহিল (Dr. Thornhill) বলিয়াছিলেন যে, ব্যায়াম ক্রীড়া দ্বারা সকল শ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে জাতি, বর্ণ ও আভিজাত্যমূলক অভিমান অনায়াসে দূরীভূত হইয়া সহানুভূতি ও আত্মীয়তা যেরূপ প্রসার লাভ করে, যেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই জন্যই ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ, নবনগরের জামসাহেব রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি এ দেশের রাজন্যবর্গকেও সাধারণ লোকের সহিত ক্রীড়া ভূমিতে আমোদ করিতে দেখা গিয়াছে।

দাঁড় টানিলে বাহু, হস্ত, বক্ষঃ ও উদরের পেশী সমধিক সবল ও পুষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে নৌকার "বাচ" খেলা এ দেশীয় যুবকদিগের এক প্রিয় ক্রীড়া ছিল। পূজা ও উৎসবাদি উপলক্ষে নদীবক্ষে বিস্তর নৌকা "বাচ" খেলায় নিযুক্ত থাকিত, আজকাল সে দৃশ্য নিতান্ত বিরল হইয়াছে। এই খেলা নানা কারণে ঐরূপ মনুষ্যত্ব স্ফূরক যে, ইহা পুনরায় দেশের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত, যাহারা "বাচ" খেলিত, তাহারা প্রায় সকলেই সন্তরণ বিষয়ে পটু ছিল। সন্তরণ যে কেবল একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম তাহা নহে, ইহা শিক্ষা করিলে আপনাকে এবং অপর লোককে অনেক সময়ে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারা যায়। আজকাল যুবকদিগকে (বিশেষতঃ সহরে) সন্তরণ অভ্যাস করিতে প্রায় দেখা যায় না। কয় বৎসর পূর্ব্বে শিবপুরের ঘাটে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সন্তরণে অভ্যাস থাকিলে এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা বিরল। বড় সুখের বিষয় এই যে, কলিকাতা সহরের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ বালকদিগকে সন্তরণ শিক্ষা দিবার জন্য সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কলিকাতা সুইসিং এসোসিয়েসন (Calcutt Swiming Association) সাঁতারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুষ্ঠান করিয়া এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক যুবকদিগের মধ্যে নৌকা চালনা শিক্ষার বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

অশ্বারোহণ আর একটি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহাতে শরীরের বল এবং মনের সাহস উভয়ই বাড়িয়া যায়। বাঙ্গালী ভিন্ন পৃথিবীর অপর সকল জাতি অশ্বারোহণে অভ্যস্ত। এই ব্যায়াম আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। অশ্বারোহণ শিক্ষার জন্য বড় বড় সহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া উচিত।

আজকাল অনেকে স্যাণ্ডোর উদ্ভাবিত ডম্বেল ও অন্যান্য

* মন্মাউথ সায়রের রগ্‌বি ক্লবের সভাপতি ডাক্তার আর জোন্‌স এ সম্বন্ধে বলেন,—"Speaking, he said, as a medical man with some Experience of the Casualties in Rugby football, he has been astonished by the early breakdown of many men of former robust physique with cardiac troubles and injuries to limbs due, in a large measure, to Overexertion and over playing in the football field."

বস্ত্রাদি লইয়া এ দেশের ব্যায়াম অভ্যাস করিতেছেন। স্যাণ্ডোর উদ্ভাবিত প্রণালী যথারীতি অনুসরণ করিয়া ব্যায়াম করিলে শরীরের সমস্ত পেশীরই সম্যক পরিচালনা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা দ্বারা ব্যায়ামের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহারা "স্যাণ্ডো" অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ইহাদ্বারা কত অল্পদিনের মধ্যে শরীর সবল ও মাংসল হইয়া উঠে।

গ্রিপ্ ডম্বেল ভাঁজা, ডন ফেলা ও বৈঠক করা একত্রে সম্পাদিত হইলে শরীরের প্রায় সমস্ত পেশীই সম্যক্‌রূপে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিনটি ব্যায়াম সহজসাধ্য এবং সকল স্থানেই সর্ব্বসময়ে সকলেরই দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই তিনটি ব্যায়াম প্রত্যহ অভ্যাস করিলে দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কোন কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ অতি প্রশস্ত সহজ সাধ্য ব্যায়াম। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে দুইবেলা অন্ততঃ ৩।৪ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে ভ্রমণের উপকারিতা লাভ করা যায় না।

দুর্ব্বল শরীরে কাহার কতটুকু ব্যায়াম করা উচিত, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এরূপ অবস্থায় ব্যায়ামের মাত্রা কিঞ্চিদধিক হইলে শরীর আরও দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল ব্যক্তির বিশেষ ক্লান্তি অনুভব না করা পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিলে কোন অনিষ্ট হয় না।

যাহাদের নিজ নিজ কার্য্যোপলক্ষে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাদের ব্যায়ামের পরিমাণ তদনুসারে কম হওয়া উচিত। তবে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর মুক্তস্থানে টেনিসক্রীড়া প্রভৃতি স্বল্পশ্রমসাধ্য ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিলে শরীর ও মন উভয়েরই স্বচ্ছন্দতা সাধিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটি কথা বলিয়া ব্যায়ামের আলোচনার শেষ করিব। আমাদের সমাজে শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ব্যায়াম অভ্যাস স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের রমণীদিগের শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য করিবার আবশ্যকতা হয়। সুতরাং উহাদ্বারা তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনা কিয়ৎপরিমাণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কার্য্যে সমস্ত অঙ্গের পরিচালনার সুবিধা হয় না এবং অধিকাংশ স্ত্রীলোকের পক্ষেই ঐটুকু পরিশ্রম স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। নিম্নশ্রেণীর রমণীরা পথ চলা, জল তোলা, ধানভানা, মোটবহা, নিজেদের কাপড় কাচা, বাটনা বাটা, বাসন মাজা, গো-সেবা প্রভৃতি নানাবিধ গৃহকার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং সেইজন্য তাহাদের দেহের মধ্যে স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও সৌষ্ঠবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের অবস্থাপন্ন "বড় লোকে"র ঘরের মেয়েরা শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য হইতে অনেক সময়ে একেবারেই অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং কোনরূপ অঙ্গচালনার অভাবে তাঁহাদের শরীর অতিশয় স্থূল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পরিশ্রমের অভাব হেতু অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে তাঁহারা প্রায়ই কষ্ট পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মনও সর্ব্বদা অপ্রফুল্ল থাকে। ইহাদ্বারা সংসারে যে নানারূপ অসুবিধা ও অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মাতার দেহ দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইলে, তাঁহার সন্তান সন্ততি কখনই সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন মাতাকে দুগ্ধ দান করিয়া শিশু-সন্তান পালন করিতে হয়, তখন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ রোগহীন ও সবল না হইলে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশু চিরদিনের জন্য রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ—সমাজের দুইটী অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ, সমাজ একাঙ্গের উন্নতির দ্বারা, কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাপ্রণালী এক ছাঁচে গঠিত হওয়া উচিত

নহে, ইহা স্বীকার করিলেও যেরূপ শিক্ষা স্ত্রীলোক ও পুরুষকে "মানুষ" করিয়া তুলিবার উপযোগী, তাহা সমভাবে অনুশীলিত না হইলে সমাজ কখনই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এইজন্য পুরুষের ন্যায় রমণীদিগেরও কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত।

ধাত্রীবিদ্যার ইতিহাস

(ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম, বি)

আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, ধাত্রীবিদ্যার উন্নতি—জাতীয় সভ্যতার মানদণ্ড। এই দণ্ডের পরিমাণে কলিকাতার মেডিকেল কলেজগুলি বিলাতী মেডিকেল কলেজ অপেক্ষা অনেক খাট, বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বিলাতী অধ্যাপকদের ব্যবস্থার উপরেই নাকি এ দেশীয়দের জীবনমরণ নির্ভর করে। তাই বিলাতী অধ্যাপক বিলাত হইতে আসিয়া এ দেশীয় ছাত্রদের পরীক্ষার সময় দেখিতেছেন—ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে তাহারা কতদূর পারদর্শী।

ধাত্রীবিদ্যা যদি সভ্যতার মানদণ্ড হয়, পুরাতন ভারত যে সভ্যতার উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গর্ভিণীর প্রতি আর্য্যদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এথেন্স ও কার্থেজ প্রভৃতি দেশেও গর্ভিণী অতি যত্নে রক্ষিত হইত বটে ; এমন কি, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত নরঘাতক গর্ভিণীর কিম্বা প্রসূতির গৃহে আশ্রয় লইলে, তাহার অনুসরণ ও দণ্ড রহিত হইত। এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আসামীর অনুসরণ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ভারতবর্ষে গর্ভিণী-পরিচর্য্যার ব্যবস্থা আরও উৎকৃষ্ট। গর্ভিণীর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হইলে স্বয়ং ভগবানেরও দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি ছিল না। নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি দৈত্যদলন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিকট চীৎকারে যখন গর্ভিণীর গর্ভপাত হইল, তাঁহাকে শাপগ্রস্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ এবং স্ত্রী-বিচ্ছেদযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাই আর্য্যেরা বলিয়াছেন :—

"পূর্ণমিব তৈলপাত্রমসংক্ষোভ্যান্তর্বত্নী ভবত্যুপচর্য্যা"

তৈল পরিপূর্ণ পাত্র নাড়াচাড়া না করিয়া যেমন যত্নে রক্ষা করিতে হয়, তেমনি যত্নে গর্ভিণীকে রক্ষা করিবে। চরকের ভ্রূণতত্ত্ব, সুশ্রুতের গর্ভিণী ব্যাকরণ, মূঢ়গর্ভ নিদান, সুসন্তান উৎপাদন (Engenies), প্রতি মাসে গর্ভিণীর আহারের ব্যবস্থা, উপযুক্ত ধাত্রীর লক্ষণ, শিশু পরিচর্য্যা, মণ্ডলাগ্র অঙ্গুলী, বৃদ্ধাপত্র প্রভৃতি অস্ত্র প্রয়োগ, কঠিন প্রসবে শিশুর পদাকর্ষণ, উদরচ্ছেদপূর্ব্বক শিশু নিষ্ক্রামণ ইত্যাদির বিবরণ পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাই Neubergor বলিয়াছেন :—

Indian medicine was thus in possession of an imposing treasure of impirical knowledge and technical achievement and has found its way East and west along the path of commerce. Links can still be found uniting Medicines of India with that of Greace. through the instrumentality of the Arabs many Indian discoveries were carrield far into the west."

মূলকথা ভারতের চিকিৎসাতত্ত্ব-রত্নসমূহ বাণিজ্য

পথে পরিচালিত হইয়া পাশ্চাত্য দেশে নীত হইয়াছে। ভারত হইতে আরব, আরব হইতে গ্রীস এবং গ্রীস হইতে উরূপায় ভারতের চিকিৎসা তত্ত্ব জ্ঞান বিস্তৃত হইয়াছে। সুশ্রুতের মুগ্ধশঙ্কু এবং চেম্বার্লেণের গর্ভ-সাঁড়াশী একই পদার্থ বলিয়া মনে হয়। বিভিন্নতা এই সুশ্রুত শিষ্যদিগের নিকট যন্ত্রের আকার প্রকার এবং ব্যবহার প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর চেম্বার্লেণ একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহার যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যেই গোপনে রাখিয়াছিলেন। কোন কোন চিকিৎসক "আমার জ্বরের মিক্‌চার," "আমার জ্বর বটিকা" নাম দিয়া ঔষধ বিক্রয় করেন, সেই প্রথা যেমন অসঙ্গত, চেম্বার্লেনের সেই প্রথা অসঙ্গত হইলেও সেই সময়ে এই প্রথা নিবারণের কোন বিধি ছিল না। এখন কোন রেজিষ্টরীভুক্ত-চিকিৎসক এই প্রকার "গুপ্ত ঔষধ" বিক্রয় করিলে কিম্বা "গুপ্ত যন্ত্র" ব্যবহার করিলে চিকিৎসক সমাজে দোষী বলিয়া গণ্য হন। এমন কি রেজেষ্টরী হইতে তাঁহার নাম খারিজ হইতে পারে। ভারতের ঋষিরা চিরকাল জ্ঞানদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

ইউরোপে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে হিপক্রেটিসের সময় ধাত্রীবিদ্যাতত্ত্ব জ্ঞানের কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ধাত্রীদিগের প্রধান কার্য্য ছিল বোধ হয় শিশুর নাড়ী কাটা, কাজেই তাহাদিগের নামই ছিল "নাড়ী কাটা।" আমাদের দেশেও ঐ কাজটা প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন বালিকা যদি বয়সে বড়—কাহাকেও নাম ধরিয়া ডাকে, তাহাকে বলা হয় "তুমি কি আমার নাড়ী নাড়ীকাটা দাই ? "হিপক্রেটিক শপথ" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। তিনি চিকিৎসককে এই শপথ করিতে বলিতেন যে, তিনি গর্ভস্রাব করাইবার ঔষধ ব্যবহার করিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার সকলে ডাক্তারী ভুলিয়া তুক্‌তাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল।

খ্রীষ্ট জন্মের ১৩০ বৎসর পর গ্যালেন নামক একজন গ্রীক এসিয়ামাইনারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধাত্রীবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক লোকদের অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান অধিক ছিল, এই অপরাধে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রোমনগর হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। ইউরোপে ইঁহারাই প্রথম চিকিৎসা-তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া নিম্নে তাঁহাদের মুখচ্ছবি প্রকাশ করা গেল।



হিপক্রেটিস্



গ্যালেন

গ্যালেনের মৃত্যুর পর আবার চিকিৎসা বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। জন্ম মৃত্যু বিষয়ে ডেল্‌ফীয় দৈববাণীর উপরই নির্ভর করা হইত। গ্রীক নরনারী কি আগ্রহের সহিত ডেল্‌ফীয় দৈববাণী শ্রবণ করিত!

যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ সম্বন্ধে গ্রীক দেবতার যেমন সহায় বা অন্তরায় হইতেন, প্রসব সম্বন্ধেও তাঁহারা সাহায্য কিম্বা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন। থীবিরাজকুমার ক্যাড্‌মাসের (cadmus) কন্যা এবং মদ্যদেবতা ব্যাকাসের Baechusমাতা আসন্নপ্রসবা সেমেলী যখন মৃত্যুমুখে, এপলো তাঁহার উদরচ্ছেদ (casarian section) করিয়া গর্ভস্থিত ধন্বন্তরি-ইসকিউলেপিয়াসকে গর্ভমুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রীকদের ইন্দ্র জিয়াস (Zeus) দেবতার মানস কন্যা মস্তিকোদ্ভূতা এথিনীর অঙ্গুলী সঙ্কেতে জরায়ু হইতে সন্তান নির্গত হইত। তিনিই আবার অসচ্চরিত্রা গর্ভিণীদের প্রসবে অঙ্গুলী সঙ্কেতে বাধা প্রদান করিতেন। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরাও প্রসব কার্য্যে সহায়তা করিতেন, যথা সুপ্রসিদ্ধ সক্রেটীসের মাতা।

উপবাস

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেন কাব্যতীর্থ]

শরীরকে রক্ষা করিতে হইলে যেমন আহারের প্রয়োজন, উপবাসের তেমনই প্রয়োজন, একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী পদার্থ শরীরের উপাদান অর্থাৎ এই কয়টী পদার্থ দ্বারা মানব শরীর গঠিত, ইহাদিগকে ধাতু বলা হয়। ইহা ছাড়া আরও তিনটী ধাতু আছে, তাহাদের নাম বায়ু, পিত্ত ও কফ, এই দশটী পদার্থই মনুষ্য শরীরের সম্পত্তি। ঐ সকল সম্পত্তি এক মাত্র আহার দ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু নানা-কারণে প্রতি নিয়তই মানুষের শারীর-সম্পত্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতেছে, সেজন্য মানুষ ধ্বংশের পথে ছুটিতেছে। মানুষের অর্থাভাব ঘটিলে যেমন সে পুনরায় অর্থার্জ্জন করিয়া উহার পূরণ করে, তদ্রূপ মানুষ প্রতিনিয়ত হ্রাস বা ক্ষয় প্রাপ্ত শারীর সম্পত্তির পূরণের জন্য আহার করিতেছে। এই আহার ব্যাপার মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

মানুষ ততটুকুই আহার করে—যতটুকু তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত শারীর-সম্পত্তির পূরণের জন্য আবশ্যক হইয়া থাকে। শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য যে চৈতন্যময়ী শক্তি বাস করে, তাহার নাম প্রকৃতি প্রত্যেক জীব-শরীরেই প্রকৃতি মাতার ন্যায় বাস করে এবং যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহাই চাহিয়া লয় এবং অনাবশ্যক দ্রব্যকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পূর্ব্বোক্ত রস-রক্তাদি শারীর-সম্পত্তির ক্ষয় হইতে থাকিলে তাহার পূরণের জন্য প্রকৃতি যে অন্নপানাদির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে আমরা ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বলিয়া থাকি। ঐ ক্ষুধা বা তৃষ্ণা-দির অবমাননা করিতে নাই। অবমাননা করিলে দেহের রক্ষাকর্ত্রী-প্রকৃতির অবমাননা করা হয়। প্রকৃতি অবমানিতা হইলে তিনি আর সে দেহ রক্ষার্থ যত্নপরায়ণা হয়েন না, মরণের দিকেই ঠেলিয়া দেন। প্রকৃতির অব-মাননার অপর নাম বেগাবরোধ বা বেগবিঘাত। আয়ু-র্ব্বেদ বলেন, বেগাবরোধই অধিকাংশই রোগের হেতু,—মরণের সুপ্রশস্ত পথ।

মানুষের আহারের ও পানের জন্য প্রতিদিন যে অন্নপানাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহার মাত্রার কোন স্থিরতা থাকিতে পারে না। কেন না মানুষের শারীর-সম্পত্তির ক্ষয় প্রতিদিন সমান ভাবে হয় না। যে দিন যেমন ক্ষয় হয়, সেই দিন তেমনই বুভুক্ষা ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরীরকে সর্ব্বদা সুস্থাবস্থায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি আবশ্যকমত অন্নপানাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আবশ্যক না থাকিলে প্রকৃতি কোন জিনিস চাহিয়া লয় না। যাঁহারা বুদ্ধিমান, সংযতেন্দ্রিয় অর্থাৎ লোভবশে ভোজ্য পেয়াদি গ্রহণে সচেষ্ট নহেন, তাঁহারাই সর্ব্বদা প্রকৃতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলেন, কখনও শারীর প্রকৃতির অনভিমত বা অনাবশ্যক কিংবা আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত অন্নপানাদি গ্রহণ করিয়া দেহ-প্রকৃতিকে অসন্তুষ্ট করিয়া রোগ ডাকিয়া আনেন না। একজন শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্‌ভুঞ্জতে যেহপ্রমাণতঃ। রোগানীকস্য তে মূলং অজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি।" অর্থাৎ যাহারা শরীরের অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা না বুঝিয়া লোভের বশে পশুর মত যত খুসী ভোজন করে, তাহারা সকল রোগের মূল—অজীর্ণ রোগকে ডাকিয়া আনে।

বারমাসে ছয়টা ঋতু,—এই ছয়টা ঋতু সমান ভাবে কাটে না, কাজেই সকল ঋতুতে মানুষের সমান ভাবে

ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয় না। ত্রিশটা দিনে একটা মাস, ত্রিশটা দিন একভাবে যায় না, মানুষেরও ত্রিশটা দিন একভাবে কাটে না। সুতরাং সব দিন সমান ভাবে আহার করা চলে না। তা'ছাড়া নিমন্ত্রণ যদি মিলিল অথবা বাড়ীতেই কোন দিন যদি বিশিষ্টরকম কিছু আহারের আয়োজন হইল, তবে সেদিন আর আহারের মাত্রার ঠিক রহিল না। অবিতৃপ্ত রসনা নানাবিধ রস-ভোজনে আত্মাকে কৃতার্থ করিতে গিয়া অনাত্মবান্ (লোভপরবশ) হইয়া পড়িল,—মানুষ দেহপ্রকৃতির প্রয়োজনের অনেক বেশী ভোজন করিয়া বসিল। তখন আর তাহার পূর্ব্বের মত শরীর-সম্পত্তির ক্ষয় নিবারণের জন্য অন্নপানাদির আবশ্যক থাকে না,—প্রকৃতিকে যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্নপানাদি দেওয়া হইয়াছে,—সে তাহাই পরিপাক করিতে ব্যস্ত থাকে,—এবং পরিপক্ব হইলে তাহা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া শরীরের ধাতু সকলকে বণ্টন বা পরিবেশন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। যে সময়ে শরীর-প্রকৃতি অতিরিক্ত ভুক্ত পদার্থের রস সমাধান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে,—তখন আর তাহাকে আহার দিয়া বিব্রত বা বিকৃত করিতে নাই। এই আহার-বিরতির নাম উপবাস;—আয়ুর্ব্বেদ ইহাকে বলেন "লঙ্ঘন"—অর্থাৎ অভুক্ত অবস্থায় কাল অতিক্রমণ করা।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং অতি সত্য কথা যে,—অধিকাংশ লোকই নিজের প্রকৃত অবস্থা কখনই বুঝিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে সংসারে এত দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক কখনই থাকিত না। আজ আমার কতটুকু খাওয়া দরকার এবং কি, কি, খাওয়া দরকার—একথা কয়জন লোক আহার করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া থাকে? সকলেই অভ্যাসের বশে অথবা লোভের বশে আহার করিয়া থাকে এবং প্রতিদিন এইরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত ও বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিতে করিতে প্রকৃতি যখন উত্যক্ত হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার বিকার উৎপন্ন হয়, সেই বিকারের নাম রোগ। এই রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানুষের মধ্যে মধ্যে লঙ্ঘন বা উপবাস দেওয়া আবশ্যক।

ভুক্ত পদার্থের প্রয়োজনাতিরিক্ত রস যেমন মানুষের শরীরকে ভার করিয়া রাখে, পুনরায় ভোজনের আকাঙ্খা জন্মায় না; তেমনই অমাবস্যা-পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিও নিজের প্রভাব দ্বারা মনুষ্য-শরীরে রসের সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহাতে মানুষের দেহ ভার হয়। তিথির প্রভাব যে কত প্রবল,—তাহা যাহাদের বাতিক বা সাঁধোরের জ্বর হয় কিংবা একশিরা বা কোষবৃদ্ধি আছে অথবা শ্লীপদ অর্থাৎ 'গোদ' হইয়াছে, তাহারাই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে। আর সাধারণ লোকে গঙ্গার জোয়ার ভাটার কারণ সম্বন্ধে প্রনিধান করিলেই তিথির প্রভাব বুঝিতে পারিবেন। তিথি ধীরে ধীরে মনুষ্য-শরীরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, এজন্য প্রথম হইতেই শরীরে রসের সঞ্চার বুঝিতে পারা যায় না। যখন শরীরে রসের পরিমাণ বেশী হয়, তখনই শরীর ভার এবং নানা প্রকার রসজ বিকার উৎপন্ন হয় বলিয়া মানুষে বুঝিতে পারে। আমার একটী ছাত্র অধ্যাপকতা করেন, তিনি পঞ্জিকা না দেখিয়া শারীরভাবের পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া নবমী তিথির প্রবৃত্তি বলিয়া দিতে পারেন। সাধারণতঃ নবমী দশমী হইতেই তিথিপ্রভাব অনুভবযোগ্য হইতে থাকে, সে জন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের মূলস্বরূপ দেহকে তিথি-প্রভাবজন্য রসবৃদ্ধিজাত রোগ সকল হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার নিমিত্ত আর্য্য মহর্ষিগণ হিন্দুগণকে একাদশী তিথিতে উপবাস দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ মনুষ্যমাত্রেই নিত্যভুক্ত পদার্থ নিচয়ের রস কতটুকু শরীর মধ্যে সঞ্চিত থাকে, তখন তাহার আহার-মাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা সে বুঝিতে পারে না বলিয়া মনুষ্যমাত্রকেই পক্ষকালের মধ্যে একদিন উপবাস দেওয়া উচিত, না পারিলে অন্নাদি ত্যাগ করিয়া ফলমূলাদি

লঘু ভোজন করিয়া কাটান উচিত। তাহাতে শরীরের সকল দোষ নষ্ট হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কোন রোগ হয় না। শরীরটা বেশ হালকা থাকে, মনটাও প্রসন্ন থাকে ও কুচিন্তার উদয় হয় না। যাহা কিছু শরীরের লঘুতা সম্পাদক, তাহাই লঙ্ঘন বলিয়া কথিত, সুতরাং নিরম্বু উপবাস না দিলেও যৎকিঞ্চিৎ লঘু দ্রব্যের ভোজন দ্বারাও উপবাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে এক সম্প্রদায় বৈদেশিক চিকিৎসক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা উপবাসের বড়ই ভক্ত। শুনিয়াছি ইহাঁদের চিকিৎসা প্রণালীর নাম Fasting Treatment। তাঁহারা দেহকে নীরোগ রাখিবার জন্য উপবাসের যেরূপ বিধি-ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—সেরূপ বিধিব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদের অনুমত নহে। আয়ুর্ব্বেদ লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত দীর্ঘকালব্যাপী নিরম্বু উপবাসের পক্ষপাতী নহেন,—অথবা শীতপ্রধান দেশবাসী গোমাংসভোজী অসুরসম বলবান ব্যক্তিগণের পক্ষে উপবাসসাধ্য চিকিৎসা-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে হইলে আর্য্যমহর্ষিগণও বোধ হয় ঐরূপ একটা কিছু করিতেন। তবে আমাদের বিবেচনায়—দেহকে নীরোগ, স্বস্থ ও রোগ সকলের অধিকার হইতে মুক্ত রাখিতে হইলে উপবাস বা লঙ্ঘনের একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সেই উপবাস বিজাতী ব্যবস্থানুগত না হইয়া দেশ-কাল ও মনুষ্য-প্রকৃতির রহস্য সকল সর্ব্বভাবে অভিজ্ঞ আর্য্য মহর্ষিগণের অভিমত হওয়াই উচিত। সকল মানুষের রুচি যেমন সমান নহে, তেমনই প্রকৃতিও সকল মানুষের এক নহে। মানুষের প্রকৃতি যেমন এক নহে, তেমনই রোগ সকলও এক নহে, এমন কি, এক জ্বরই নানাপ্রকৃতির হইয়া থাকে। সেই সকল,—দেশ-প্রকৃতি,—কাল-প্রকৃতি,—মনুষ্য প্রকৃতি ও রোগ-প্রকৃতি বিচার করিয়া অন্নপানাদি ও উপবাসাদির প্রকৃতি বিচার হওয়া আবশ্যক। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, জ্বরের প্রথম অবস্থায় অন্নাদি ভোজন করা বা বলকর পথ্যাদি দেওয়া একান্ত অনুচিত। সেই জ্বরেরই আবার জীর্ণাবস্থায় বলকর পথ্যাদি বা অন্নাদি ভোজন করিতে দেওয়া একান্ত উচিত। না দিলে প্রাণহানি ঘটে। যে দুগ্ধ তরুণ জ্বরে বিষবৎ মানুষকে মারিয়া থাকে, সেই দুধই আবার জীর্ণজ্বরে অমৃত তুল্য হইয়া থাকে। সুতরাং আহার যেমন জীবনরক্ষার প্রধান সহায়, তেমনই আহারই জীবন নাশের প্রধান সহায়। সেই আহারের অত্যাচার ও বিকার হইতে দেহকে রক্ষা করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়া দরকার। সে উপবাস অবস্থা বুঝিয়া এক দিন ব্যাপী অথবা একাধিক দিন ব্যাপী কিংবা ঘণ্টা কয়েক ব্যাপীও হইতে পারে; নিরম্বু হইতে পারে অথবা অতি লঘু ভোজ্য দ্রব্য আহার করিয়াও হইতে পারে। উপবাসের উদ্দেশ্য শরীরের সঞ্চিত রসকে ক্ষয় করা, অগ্নির দীপ্তি করা ও দেহের লঘুতা সম্পাদন করা, এ সকল নানা প্রকার হইতে পারে বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ উপবাস বা লঙ্ঘনের নানাপ্রকার ভেদ করিয়াছেন।

ভগবান্ অগ্নিবেশ বলেন,—"যৎকিঞ্চিৎ লাঘবকরং দেহে তল্লঙ্ঘনং স্মৃতম্।" যাহা কিছু শরীরে লঘুতা সম্পাদক তাহা লঙ্ঘন বলিয়া কথিত। আমরা সাধারণতঃ লঙ্ঘনকে উপবাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এজন্য যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি ভক্ষণ করিলেও তাহাকে উপবাস বলা হইয়া থাকে। তবে যদি কেহ অন্নাদি ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাঁহার শরীর লঘু না হইয়া ভার বলিয়া মনে হয়, তবে তাহাকে উপবাস বলা চলে না। নিরম্বু উপবাস বা যৎকিঞ্চিৎ লঘু পথ্য ভোজন দ্বারা যেমন দেহের লঘুত্ব সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ বমন, বিরেচন প্রভৃতি সংশোধনকর্ম্ম, পিপাসা, মারুতসেবন, আতপ, পাচন, (অগ্নিবৃদ্ধিকর ঔষধাদি সেবন), ব্যায়াম ও অনশন দ্বারাও শরীরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। এজন্য ঐ সকল কর্ম্মও শাস্ত্রকরগণের মতে লঙ্ঘন বা উপবাস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

যাহারা কফ প্রধান, প্রমেহ রোগগ্রস্ত, মেদস্বী বা অতি-

রিক্ত স্নিগ্ধ পদার্থাদি ভোজন করিয়া তৃপ্ত, তাহাদের পক্ষে নিরম্বু উপবাসই শ্রেয়ঃ। আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে ঈষদুষ্ণ জলপান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের পিত্তপ্রকৃতি বা বায়ুপ্রকৃতি, তাহাদিগকে স্বস্থশরীরে উপবাস দিবার প্রয়োজন হইলে মিছরীর সরবৎ, ডাবের জল বা কোন প্রকার ফলের রস পান করিতে দেওয়া ভাল। তাহাতে তাঁহাদের উপবাসজন্য বাতপিত্তাদির বৃদ্ধি হয় না, অথচ শ্লেষ্মক্ষয়ে শরীর লঘু হইয়া থাকে। যাহাদের শ্লেষ্ম ও পিত্ত উভয়ই প্রবল, দাস্ত পরিষ্কার হয় না ও শরীর ভারী, তাহাদিগকে সংশোধন দ্বারা অর্থাৎ বিরেচনাদি প্রয়োগরূপ উপবাস দিতে হয়। তাদৃশ ব্যক্তিগণের বমন-বিরেচনাদির দ্বারা শারীর মল সকল নির্গত হইয়া গেলে শরীর লঘু হইয়া থাকে ও তাহাতে উপবাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেখানে অতিভোজনাদি দ্বারা অতিসার জন্মিয়াছে, অথবা মিথ্যা আহার-বিহারাদি দ্বারা ভুক্ত পদার্থের রস বিকৃত হওয়ায় তরুণ জর দেখা দিয়াছে, কিংবা বমি, বিসূচিকা, অলসক, বিষ্টম্ভ, হৃদরোগ, হৃল্লাস, অরোচক প্রভৃতি রোগ সকল দেখা দিয়াছে—সেই সকল ক্ষেত্রে পাচনরূপ লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। পাচনদ্বারা উক্ত প্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দোষের পরিপাক ও দেহের লঘুতা সম্পদিত হইয়া থাকে। যাহাদের রোগ মোটেই প্রবল নয়, সামান্য রোগের আভাষমাত্র দেখা যায়, রোগী ও দুর্ব্বল,—সেরূপ ক্ষেত্রে পিপাসানিগ্রহ করিলেই শরীর লঘু হইয়া উপবাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। যাহাদের রোগ অল্প নহে প্রবলও নহে, মাঝামাঝি রকমের, তাহাদের ব্যায়াম, মারুত ও আতপ সেবনরূপ উপবাসের দ্বারা শরীর লঘু ও রোগশূন্য হয়।

নবজ্বরে, আহারাদি করিয়া জ্বর হইলে অথবা সর্দ্দি লাগিয়া জ্বর হইলে উপবাসের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ অতি অল্পই দেখা যায়। সাধারণতঃ নবজ্বরে পাচকাগ্নি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া থাকে। সেজন্য সর্ব্বশরীর সন্তপ্ত ও দাহযুক্ত হয়, বাতপিত্তকফ সকল বিকৃত হইয়া থাকে এবং অপরিষ্কার রস শারীর-স্রোতামার্গ সকলকে রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে। ঐ সকল যাবতীয় শারীর বিকারের সংশোধন করিতে, দুষ্ট রসকে পরিপাক করিতে, পাচকাগ্নিকে স্বস্থানে পুনরানয়ন করিতে, স্রোতোমার্গের অবরোধ মুক্ত করিয়া স্বেদ প্রবর্ত্তন করিতে এবং দেহ-ইন্দ্রিয় ও মনের লঘুতা সম্পাদন করিয়া শরীরকে জ্বরমুক্ত করিতে, লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস পরম ঔষধ। যতদিন না শরীর সুস্থ হয়, ততদিনই লঙ্ঘন বা উপবাস দেওয়া উচিত তবে যখন দেখিবে, উপবাসদ্বারা শরীরের বলহানি ঘটিতেছে, তখন উপবাস দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া লঘু অথচ সুপথ্য দ্রব্যাদিদ্বারা রোগীর বলাধান করা কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করিতে পারেন—রোগী হয়তো উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। তাঁহাদের এরূপ ধারণা ভুল। কেননা যতদিন শরীরে জ্বরকারক দোষের প্রবলতা থাকে, ততদিনই রোগী উপবাস সহ্য করিতে পারে এবং যত যত পরিমাণে তাহার শরীরে দোষের পরিপাক হইতে থাকে, তত পরিমাণে তাহার উপবাস সহ্য করিবার ক্ষমতাও চলিয়া যায়। উপবাস দিতে দিতে যখন দেখিবে—রোগীর মলমূত্রাদির যথাকালে নির্গমন হইতেছে, উদ্গারাদি যথারীতি হইতেছে, মুখের বিরসতা কাটিয়া গিয়া স্বাভাবিক স্বাদ আসিয়াছে, ক্ষুধা ও পিপাসার একই সঙ্গে উদয় হইতেছে, অন্নপানাদিতে বেশ রুচি জন্মিয়াছে, শরীরের আর কোন ভার নাই, গ্লানি নাই, ক্লান্তি নাই, স্বাভাবিক ঘাম হয়, তন্দ্রার তো কথা নাই, ভাল করিয়া ঘুম হয় না, কেবল অন্নপথ্যের কথা মনে হয়, শরীর বড় লঘু, মনও প্রসন্ন, অন্তরাত্মা ব্যথা শূন্য বলিয়া মনে হয়, তখনই জানিবে তোমার উপবাস দেওয়া সার্থক হইয়াছে, আর উপবাস দিবে না। তার পরেও যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশঃ উপবাস দিতে থাক, তাহা হইলে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও হাড়ে হাড়ে বেদনা, শুষ্ক কাসি, কেবলই মুখ শুকাইয়া যাওয়া, ক্ষুধার লেশ নাই, অথচ কেবল পিপাসা, অরুচি, দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল, চোখে অন্ধকার দেখা, কাণে কম শোনা, চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্য

ও নানাবিধ বায়ুজন্য উপসর্গ সকল দেখা দিবে, এমন কি মরণ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

* * *

যদিও শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখিতে গেলে সকলেরই মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর উপবাস দেওয়া দরকার, তথাপি যাহারা বায়ুরোগগ্রস্ত বা বাতিক প্রকৃতির অথবা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রম, মুখশোষ ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতিতে কাতর এবং বালক-বৃদ্ধ-গর্ব্ভিণী বা দুর্ব্বল, তাহাদিগকে উপবাস দিবে না।

সম্পাদকের সাজি

সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, বাঙ্গলাদেশে পুরুষ জাতির মধ্যে শতকরা ৫ জন মাত্র এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ১ জন মাত্র লেখাপড়া জানে, ইহাদিগের মধ্যে সকলেই যে শিক্ষিত তাহা নহে, কোনরূপে নাম লিখিতে জানে মাত্র। কলিকাতার হিসাব গণনায় শতকরা ৪০ জন মাত্র লেখাপড়া জানে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণই সকল বিষয়ে সুশিক্ষিত বলিয়া যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, এই হিসাবে তাঁহাদের সে গর্ব্ব কোথায় থাকিবে ?

* * *

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের যে বিশেষ আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালী বক্তৃতায় কল্পতরু হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষা বিষয়ে তাহার স্থান যে অনেক নিম্নে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যেরূপ শিক্ষা এখনকার দিনে আমাদের দেশে প্রচলিত, এরূপ শিক্ষাবিস্তারের আমরা পক্ষপাতী নহি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, ইহা পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ, এরূপ শিক্ষা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে শুভদ হইলেও বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে যে কল্যাণপ্রদ নহে, তাহা অবশ্যই বলিব।

* * *

প্রথম কথা, আগে আমাদের দেশে শিক্ষা-কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতে ও অপরাহ্নে। এখন পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শিক্ষাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে ছাত্রজীবনে স্বাস্থ্যোন্নতির অন্তরায় ঘটে বলিয়া আমরা মনে করি। দ্বিতীয় কথা—যে সকল গ্রন্থ তাঁহাদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত, তাহার মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তক নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সে সকল পুস্তকের শিক্ষা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হয় না। সাহিত্য ও গণিত শিক্ষার জন্য তাহাদিগের প্রতি যেরূপ বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়; বাঙ্গলাদেশের দুর্গতি দেখিয়া তাহার অপেক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়বিধির শিক্ষা প্রদানেই বেশী জোর দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। আগে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই, তখন সুকুমারমতি বালকবৃন্দের মনে প্রাথমিক জীবনেই যেরূপ ধর্ম্মবীজ বপন করা হইত, এখন তাহারও অভাব হইতেছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, সরকারি রিপোর্টে শতকরা ৫ জন মাত্র পুরুষ লেখাপড়া জানে বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছে, বিশেষভাবে হিসাব করিলে তাহার মধ্যে ১ জনের বেশী প্রকৃত শিক্ষিত পুরুষ পাওয়া যাইবে না।

* * *

প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে বহুসংখ্যক ছাত্র ছাপ লইয়া বাহির হইতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত শিক্ষিত হইতেছেন—তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। 'শিক্ষা' বলিলে যাহা বুঝায়,—ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা প্রাপ্ত হন না। চাকরি করিবার প্রবৃত্তি লইয়াই

ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পাঠ সমাপ্ত করেন। এই চাকরীর মায়ায় 'ডিগ্রি' পাইবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহাতেও বাঙ্গালী-যুবকের কম স্বাস্থ্যহানি হয় না। এখনকার দিনে অনেক বাঙ্গালী-যুবককেই যে উপনেত্র ধারণ করিতে দেখা যায়—ইহারও অন্যতম কারণ ইহাই। তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত পরিশ্রমে অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্য তো শতকরা নব্বই জনের বলিলেও অন্যায় হইবে না। বাঙ্গালীর গড়পরতা পরমায়ু এখন ২২ হইতে ২৩। ইহারও কারণ ছাত্রজীবনে নানাকারণে বিশেষতঃ অতিরিক্ত অধ্যয়নের ফলে স্বাস্থহানি। স্বরাজ লাভের যাঁহারা বিশেষ চেষ্টাশীল, তাঁহাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে ইহার প্রতি আকর্ষিত হওয়া উচিত। সত্য কথা বলিতে কি,—এখন বাঙ্গালীর মধ্যে বি-এ, এম-এ—উচ্চ শিক্ষিত যুবকের অভাব নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি যে ক্রমশঃ মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে—ইহা সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

* * * *

বি-এ, এম-এ পাস করিয়াই বা বাঙ্গালীর দুর্গতি ঘুচিতেছে কই? ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালী-যুবক যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিল, তখন তাহার স্বাস্থ্যের অপচয় যথেষ্ট ঘটিয়াছে। তাহার পরে যে কারণে এই কঠোর শ্রম-স্বীকার, শিক্ষার অন্তে তাহারই বা পুরস্কার কই? চাকরির জন্য কিরূপ দুশ্চিন্তায় শিক্ষা-অবসানে কাটাইতে হয়—তাহা যুবকেরাই অবগত আছেন। বহু চেষ্টা করিয়াও অনেকের ভাগ্যে ভাল চাকরি জুটে না। ফলে অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব অনেকেরই ঘটিয়া থাকে। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল অল্প হইবে না তো হইবে কাহার? উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের আবশ্যক সন্দেহ নাই কিন্তু যেরূপ শিক্ষায় পেটের ভাত, পরণের কাপড় জুটে না, যে শিক্ষায় কঠোর পেষণে জরা ও বার্দ্ধক্য অসময়ে উপস্থিত হইয়া মানুষকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, যে শিক্ষার পরিণতি উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইতে না পাইয়া অকাল মৃত্যু—সে শিক্ষার প্রশংসা তো আমরা কোনকালে করিতে পারিব না,—সে শিক্ষার পরিবর্ত্তন একান্তই প্রয়োজন।

* * * *

সত্য কথা বলিতে কি,—এখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, সেরূপ উচ্চ শিক্ষায় আমাদের লাভ অপেক্ষা ক্ষতির ভাগই অধিক। সে শিক্ষার ফলে না হয় দেশের যুবকেরা প্রকৃত শিক্ষিত, না জুটাইতে পারে তাহাদের উদরের অন্ন। এইরূপ শিক্ষার ফলে চাকরির মোহে বাঙ্গালীকে একরূপ কর্ম্মণ্যশক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া লেখাপড়া শিখিবার যে আদৌ প্রয়োজন নাই,—এমন কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যিনি যে কার্য্য করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান করুন, লেখাপড়া শিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষাই সর্ব্বপ্রকার সাফল্যের মূল। কিন্তু এই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হওয়া চাই। আমাদের দেশে আগে এইরূপ শিক্ষারই প্রচলন ছিল। গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্রই সুশিক্ষিত হইত। সে সময় শিক্ষা কাল ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বেলা ৩টার পরে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে সময়ে অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করিতেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সকালে বিকালে পাঠশালা বসিত। এখন কলিকাতা করপোরেসন সেই প্রাচীন পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগ হইতে যদি এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

* * *

তার পরে রাশি রাশি পুস্তকের কথা। সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াও একান্ত আবশ্যক। শিক্ষা-বিভাগ সহসা এ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিবেন কি না বলা যায় না, কিন্তু এই রাশি রাশি পুস্তক পাঠের জন্য ছাত্রজীবনে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, দেশের জননায়কগণের এ বিষয় শিক্ষা-বিভাগকে পুনঃপুনঃ বুঝাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রাশি রাশি পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার ফলে অনেক গ্রন্থকারের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু

তাহার ফলে কুসুমসুকুমারমতি অনেক বালকেরই যে মুণ্ড ভক্ষণের ব্যবস্থা করা হইতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া এই দুর্দ্দৈব নিবারণের চেষ্টা করুন,—ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

*　　*　　*

দেশের যুবকেরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া ডিগ্রি লইয়া বাহির হইতেছেন, কিন্তু তাহার পরিণাম হইতেছে কি—না অন্তঃসার শূন্য জীবনযাপন। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" আগে স্বাস্থ্য, তাহার পরে সব। স্বাস্থ্যই যদি ভগ্ন হইল, তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া লাভ কি? সেই জন্য আমাদের মনে হয়, দেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা বিশেষ ভাবেই চলুক, সে বিস্তারের বিশেষ আবশ্যকতাও আছে, কিন্তু যেরূপ পদ্ধতির শিক্ষায় বাঙ্গালীকে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া চির জীবন যাপন করিতে হয়, যে শিক্ষার আস্বাদ পাইয়া বাঙ্গালীকে বিলাসপ্রিয় করিয়া আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতাকে ডাকিয়া আনিয়া দেয়,—যে শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীকে স্বরৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরবৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে উমেদারি করিয়া বেড়াইতে হয়, যে শিক্ষায় মানসিক তেজঃ বিকশিত হয় না, যে শিক্ষায় বাঙ্গালী জাতি আজি একটি জড়পিণ্ড জাতি বলিয়া সর্ব্বদেশে পরিচিত—সে শিক্ষার আস্বাদ গ্রহণে বাঙ্গালীর দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বাঙ্গালী-ছাত্রের অভিভাবকগণ এ কথা বুঝুন, বুঝিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করুন—ইহাই আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ।

*　　*　　*

ইংরাজী রাজত্বে ইংরাজী না শিখিলে গত্যন্তর নাই, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মারোয়ারি, মান্দ্রাজি—তাবৎ প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যেই কথার আদান-প্রদানের সুবিধা এখন ইংরাজীই দাঁড়াইয়াছে। এ অবস্থায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন রহিত করিলে চলিবে না। কিন্তু ইংরাজী ধরণে ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে মুখ্য করিয়া গৌণ ভাবে কেবল মাত্র ভাষা শিখাইবার জন্য ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হউক, তাহাতে উপকারই হইবে। কিন্তু শিক্ষা-কাল নির্দ্দেশ করা হউক পূর্ব্বের মত প্রাতে ও বৈকালে। শিক্ষার পুস্তকগুলির মধ্যে বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হউক। বাঙ্গালী স্বাবলম্বনের শিক্ষা প্রাথমিক জীবনেই প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে কর্ম্মঠ হউক, পরমুখাপেক্ষিতাকে ঘৃণাজনক মনে করিয়া দূরে পরিহার করুক, প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করুক—ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে দেখিতে ইচ্ছা করি।

মা

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন)

নিখিল বিশ্বের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিশুর যখন বাক্য-কথনের প্রথম ক্ষমতা জন্মে, তখন সে আধ আধ মধুর স্বরে ডাকিয়া থাকে—'মা'। সেই মহামন্ত্রই হইল মনুষ্যের প্রথম দীক্ষা। সন্তানের প্রতি তাহার মঙ্গলের জন্য জননী যতই কঠিন ব্যবহার করুন—পুত্রের কিন্তু তাহার জন্য রাগ বা অভিমান করিয়া থাকিবার আদৌ ক্ষমতা নাই,—তাহার একটু কষ্ট হইলেই সে প্রাণ ভরিয়া ডাকিবে—'মা।' মা যে শিশুকে প্রহার করেন না, এমন নহে, কিন্তু শিশু তাহা মনে রাখে না—প্রহৃত শিশু ক্রন্দন করিয়া করিয়া ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিলেও তখনি নিমেষের মধ্যে প্রহারের কথা

তুলিয়া অপরের ক্রোড় হইতে মাতৃক্রোড়ে গিয়া জুড়াইবার জন্য বাহু প্রসারণপূর্ব্বক ডাকিয়া থাকে—'মা।' বিশ্বসংসারে মা আমার এমনি শান্তিদায়িনী।

এ তো গেল শিশুর কথা। পরিণত বয়সেও মাকে ছাড়িবার জো নাই। দৈন্যে দুঃখে মানুষ যখন যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না,—বুভুক্ষিত মনুষ্যের কষ্টের পরিণাম যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয়,—দারুণ দুশ্চিন্তা ও অশান্তির শেল যখন হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া মানবকে সন্ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে,—তখন সেই তাপদগ্ধ মানব উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকে—"মা, মা তুমি আমায় রক্ষা কর।" রোগ শয্যায় উৎকট যন্ত্রণায় মানুষ যখন অস্থির হইয়া পড়ে, তখন আপনা হইতে অলক্ষিতে তাহার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে থাকে—"মা"। প্রিয়জন-বিরহে উদ্ভ্রান্ত মানবের প্রাণে এক মাত্র শান্তি—এই মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া। এক কথায় স্ত্রী আমাদের যতই আনন্দদায়িনী হউন, পুত্র-কলত্রের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যতই আমরা উল্লাস অনুভব করি, সখা সুহৃদের সঙ্গসুখে যতই আমরা আনন্দলাভ করি,—মায়ের মত এমন স্বস্তি-সুখ পাইবার স্থান আর নাই। মায়ের মত এমন স্বার্থত্যাগ,—এমন কল্যাণ কামনা,—এমন শুভ চিন্তা—বিশ্বসংসারে আর কেহই করিতে পারেন না।

কোন স্মরণাতীত যুগে শরৎকালে মায়ের আগমন আমার ইহারই জন্য ঘটিয়াছিল। ভগবান রামচন্দ্র মানবোচিত ব্যবহারে যখন লঙ্কাধিপতি দশাননের নিকট বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিলেন,—তখন দেখিলেন, রাক্ষস-সমরে বিজয়লাভ করিতে হইলে মায়ের আগমন ভিন্ন আর উপায় নাই। অসময়ে মায়ের আগমন আমার ইহারই জন্য ঘটিয়াছিল। সে তো বহু বর্ষ—বহু যুগ অতীত হইয়াছে, দয়াময়ী জননীর অপার করুণা কিন্তু বাঙ্গালী ভুলে নাই,—সেই জন্যই প্রতি বৎসর এমনি সময়ে মাতৃপূজায় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালী কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে।

কিন্তু মা আমার,—তুমি যেমন করিয়া আসিয়াছিলে বা খুব বেশী দিনের কথা নহে, কিছুকাল পূর্ব্বেও যেমন আসিতে, তেমন করিয়া আর আসনা কেন মা? তুমি আসিবে বলিয়া সারা বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী তোমার আশা-পথ চাহিয়া থাকিত। বালকের দল নূতন বসনে সজ্জিত হইবে বলিয়া উল্লাস করিত, যুবকের দল প্রিয়জন সম্মিলনের আশায় আনন্দে আত্মহারা হইত, বৃদ্ধের দল তোমার ঐ অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য কামনা করিত। বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে সে আশা—সে আনন্দ—সে আকাঙ্ক্ষা—সে কামনা কাড়িয়া লইলে কেন মা? বাঙ্গালীর সে উৎসাহ—সে উদ্যম—সে আসক্তি—সে অনুরাগ—সে ইচ্ছা—সে সঙ্কল্প কেন চলিয়া গেল মা। সারা বাঙ্গলার যদি সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে কোথাও তো মা, সেকালের মত আর পূর্ব্বের ভাব অক্ষুণ্ণ নাই। কেন এমন হইল মা? মহাপূজার পরমানন্দ মহোৎসবে বাঙ্গালীর পূর্ব্বের মত শান্তি—পূর্ব্বের মত স্বস্তি কেন কাড়িয়া লইয়া বাঙ্গালীকে এরূপ নির্জ্জীব করিয়া তুলিলে মা?

বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বাঙ্গালীর পরণে কাপড় নাই,—রোগের জ্বালায় বাঙ্গালী সারাবর্ষ ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থিকঙ্কাল সার হইয়া পড়িয়াছে, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব গণনায় বাঙ্গালীর গড় পরতা আয়ুকাল এখন ২৩ এর বেশী নহে, বাঙ্গালী যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকে, রোগে—শোকে, দৈন্যে, দুঃখে, দারুণ অস্বস্তিকে অনিচ্ছায় বরণ করিয়া। কেন এমন হইল মা? জীবনের আরম্ভ কাল হইতে মাতৃমন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত—সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে 'মা' 'মা' ভিন্ন যাহাদের অন্য বুলি নাই, মাতৃনামে যাহারা গর্ব্ব গরিমা অনুভব করিয়া থাকে,—সেই মায়ের সন্তান—বাঙ্গালী জাতির এই অবস্থান্তর কেন হইল মা? মাগো করুণারূপিণি! বাঙ্গালী জাতি যদি তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তো তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে, এখনো তাহাকে রক্ষা কর মা, তাহার দুঃখ-কষ্ট, সন্তাপ-জ্বালা, ব্যথা-বেদনা

সমস্তই দূর কর মা! তুমি যে দুর্গতিহারিণী দুর্গা! এই অধঃপতিত মরণোন্মুখ জাতিকে স্নেহের নজরে তুমি না রাখিলে তাহার যে আর কোনো আশা—কোনো ভরসা নাই মা! তাহার দুঃখ দূর কর, তাহার বেদনা নিবারণ কর, তাহার স্বভাবের অভাব পরিবর্ত্তন করিয়া আবার তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন কর। ইহা ভিন্ন যে আর রক্ষা নাই মা।

বাঙ্গালীর কি ছিল না মা! তাহার তো সবই ছিল। তাহার ক্ষেত্রে ধান্ত জন্মিত, বাগানে তরকারী হইত, পুষ্করিণী-দীর্ঘিকায় মৎস্ত হইত। ঘরে ঘরে গাভী-পালনের ব্যবস্থা ছিল, সে গাভী পালনের ফলে দুগ্ধ-দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনের অভাব ছিল না। এক কথায় বাঙ্গালীর জীবিকা-নির্ব্বাহের চিন্তার জন্ত তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইত না। চাকুরীপ্রিয় বাঙ্গালী এখন স্বদেশ ভুলিয়াছে, স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছে, স্বদেশ ছাড়িয়া, প্রবাসী হইয়া বাঙ্গালী এখন যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, অনু-শোচনার সহস্র যন্ত্রণা সহ্ করিয়াও বাঙ্গালী এখন আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সক্ষম হইতেছে না।

বাঙ্গালীর অবস্থা কি কম শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে? ম্যালেরিয়ায় এখন প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বীকার করি, কালচক্রে—বাঙ্গালীর গ্রহবৈগুণ্যে এই ম্যালেরিয়া আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্ত আমরা করিয়াছি কি? পল্লী ছাড়িয়া সহরে পলাইয়া আসিলেই কি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল? আমরা তো পলাইয়া আসিলাম, কিন্তু আমাদের মুখের গ্রাস যাহারা জোগাইয়া দিতেছে—যাহারা ভিন্ন আমাদের আহার জোগাইবার এক দিনও কেহ নাই, ম্যালেরিয়া বলিয়া আমরা দেশ ত্যাগ করি, কিন্তু যাহারা সেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে পড়িয়া থাকিয়া সমগ্র বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতেছে—তাহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা কি আমরা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছি? ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করাই আমাদের যথেষ্ট নহে, পল্লীর মধ্যে থাকিয়াই যে সকল কারণে ম্যালেরিয়ার প্রসার লাভ ঘটে, সেগুলি দূর করিবার জন্ত আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা কি তাহা করিতেছি? এমনই করিয়াই না গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন হইতেছে, পল্লীর পর পল্লী ধ্বংশ হইয়েছে, বাঙ্গালীর অবস্থা ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িয়াছে।

সহরে আসিয়াই বা বাঙ্গালী সুখী কই? অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট,—সর্ব্বাপেক্ষা রোগের জ্বালা সহরেও কম নহে। কলিকাতার মত সহরের মৃত্যু তালিকার খবর লইলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ,—কলিকাতায় যত শিশুর মৃত্যু হয়, এমন আর কোনো স্থানে নহে, মহিলা-মৃত্যুও কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে আমরা পল্লী ছাড়িয়া সহরে বাস করিয়াই বা কি সুখে আছি? দীনদুঃখনিবারিণী, জগজ্জননী দেবী দুর্গে, কেন এমন হইল মা? বাঙ্গালীর প্রায়শ্চিত্ত কি বাঙ্গালী জাতির বিলোপ সাধন? বাঙ্গালী অনেক কষ্ট সহিয়াছে,—অনেক বন্যা—অনেক বাত্যা তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—আর যে বাঙ্গালী পারিতেছে না মা! তাহাকে রক্ষা কর,—তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বভাব জাগাইয়া দাও,—পূর্ব্বতেজে তেজীয়ান হইয়া, পূর্ব্ববলে বলীয়ান হইয়া, তোমার সন্তান বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পূর্ব্বভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে উদ্দী-পিত কর—বাঙ্গালী জাতির অতি বড় দুর্দ্দিনে তোমার ওই রাজীবচরণ যুগলে ইহা ভিন্ন অন্ত প্রার্থনা নাই মা!

তুমি মা দুর্গারূপে শান্তস্নিগ্ধ করুণারূপিণী, বরাভয় প্রদায়িনী, দনুজদলনিবারিণী। অথচ স্নেহের উৎস শতধা বিগলিত হইয়া থাকে। তোমার সেই স্নেহ শক্তিতেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটীকল্প জীব উদ্ভূত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। আবার তুমিই মা যখন দিগম্বরী বিভীষণময়ী কালী মূর্ত্তি ধারণ কর, তখন তোমার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দর্শনে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। ত্রাহি

ত্রাহি ডাক না ছাড়িয়া প্রাণী-জগত থাকিতে পারে না। তুমিই বিশ্ব জগতের প্রসব কারিণী, কিন্তু এই ভয়ঙ্করী কালী মূর্ত্তিতেই আবার তুমি বিশ্ব সংসার গ্রাস করিতেছে। অন্য পরে কা কথা,—তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকেও ভয় পাইতে হইয়াছিল। তোমার তারা মূর্ত্তি—আরও ভয়ঙ্করী, ষোড়শী মূর্ত্তিতে তুমি বিশ্ববিমোহন করিয়াছিলে, ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিতে তোমার স্নেহ-করুণার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকটিত, তোমার ভৈরবী মূর্ত্তি—তোমার ছিন্নমস্তা—তোমার ধূমাবতী মূর্ত্তি—প্রাণী জগতে অত্যন্ত ভীতি উৎপাদক,সে মূর্ত্তিও দেখিতে চাহি না মা! বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা মূর্ত্তিতে মাতৃস্নেহ বুঝিতে দাও বটে, কিন্তু যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে যে মূর্ত্তিতে তুমি প্রতি বৎসর বাঙ্গলা দেশে আসিয়া থাক, সে মূর্ত্তির মত অত আনন্দ—অত উল্লাস আর কোনো মূর্ত্তি দেখিয়া যে হয় না মা! সারা বিশ্বের মধ্যে যত মাতৃ মূর্ত্তি বিরাজিত, তাহার সকল গুলিই বুঝি তোমার ঐ দুর্গা মূর্ত্তিতেই প্রকটিত। শুধু গর্ভধারিণী নিজের মায়ের কথা নহে, বিশ্ব সংসারের সকলের মাকেই মা বলাইবার জন্য তোমার ঐ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সত্য যুগে রাজা সুরথের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য এই মহামহিম মহিমান্বিতা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী স্নিগ্ধ শান্তি আনন্দ-দায়িনী মূর্ত্তি তুমি পরিগ্রহ করিয়াছিলে। সে মূর্ত্তিতে শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশ সাধন করিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিখিল চরাচরের সমগ্র প্রাণী সে মূর্ত্তি দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিল। আমরা প্রদেশের নির্জ্জরাবৃন্দের এক একটি অংশ এই মূর্ত্তির মধ্যে প্রকটিত,—তাই তুমি মহাশক্তি বলিয়া বিশ্ববন্দিতা। ত্রেতায় রাক্ষস নিধনের জন্য রক্ষঃ কুল মুকুট রামচন্দ্র কর্ত্তৃক আবার তুমি অবতীর্ণ হইয়াছিলে। দশ মহাবিদ্যার সকল মূর্ত্তিতেই তুমি প্রকটিত, কিন্তু সত্য ও ত্রেতায় তুমি যে মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়াছিলে,—সে মূর্ত্তির তুলনা নাই। দ্বাপরেও এই মূর্ত্তিতে তুমি আর একবার আসিয়াছিলে মা,—সে গোপিনীদিগের মনোরথ পূরণের জন্য, গোপিনীগণের কৃষ্ণলাভের জন্য—ব্রজগোপিনীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী করিবার জন্য। কাত্যায়ণী ব্রত তাহারই ফল সম্ভূত।

কলিযুগে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের মত সেরূপ ভাবে তুমি কাহাকেও দর্শন দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছ কিনা ইতিহাস তাহার খবর দিতে পারে না। কিন্তু তোমার মহীয়সী শক্তি বাঙ্গালী ভুলিতে পারে নাই—তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইবার জন্য,—তোমার গর্ব্বে গরীয়ান হইবার জন্য,—তোমার আনন্দে আত্মহারা হইবার জন্য বাঙ্গালী আবহমান কাল হইতে বর্ষে বর্ষে তোমার পূজা করিয়া, তোমার শ্রীচরণ-কোকনদে জবাবিল্বদল দিবার জন্য, তোমার ঐ বিশ্ববিমোহনকারিণী স্নিগ্ধোজ্জ্বল কারুণ্যমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া থাকিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছে। বাঙ্গালী এখানে কামনা বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই, বাসনায় আগুণ ধরাইতে পারে নাই, নিষ্কাম হইয়া বাঙ্গালী এ পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারে নাই,—তাই বলি, দাও মা, বাঙ্গালী যেমন ছিল, আবার তাহাকে তেমনি করিয়া দাও, তাহার রূপ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও, তেজঃ দাও, গর্ব্ব দাও। তাহার হৃদয়ে শক্তি দিয়া, তাহাকে নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান করিয়া, তাহাকে সকল সম্পদের অধিকারী কর;—তাহার তেজোদ্দীপ্ত বীর্য্যবিক্রম আবার ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে ধন্যমনা করুক। বাঙ্গালী বর্ষে বর্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া পূর্ব্বের মত তোমার সেবাব্রত গ্রহণে আত্ম-নিয়োগ করুক, 'মা আসিয়াছেন' বলিয়া একটা আনন্দের সাড়া সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ুক, সমগ্র বিশ্ব চাহিয়া দেখুক—বাঙ্গালী মায়ের সন্তান—বাঙ্গালীর সবই আছে। বাঙ্গালীর শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, বল আছে, বিক্রম আছে, ভীরু-কাপুরুষ বাঙ্গালী জাতি মাতৃমন্ত্রে পুনরায় দীক্ষিত হইয়া নূতন ভাবে তাহার জীবন গঠন করিয়াছে, আর সে নির্জ্জীব—নিষ্কর্ম্মা-জড়প্রায় জাতি বলিয়া জগতের কোনো জাতির নিকট ঘৃণ্য, অবমানিত, লাঞ্ছিত এবং হেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত নহে।

জগজ্জননী, ত্রিলোক পালনকারিণী মা আমার, বাঙ্গালীর এই সকল কামনা পরিপূর্ণ কর মা! বাঙ্গালী বর্ষে বর্ষে তোমাকে লইয়া আসিয়া নীরোগ ও সুস্থ দেহে সকল সম্পদ উপভোগ করুক।

খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, এ, এম এস)

আমিষ খাদ্য

আমিষ খাদ্যের প্রকার ভেদ।—আমিষ খাদ্য মৎস্য ও মাংস ভেদে দুই প্রকার—কিন্তু আমাদের দেশে মাংস অপেক্ষা মৎস্যের প্রচলনই বেশী। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীবৃন্দ অধিক পরিমাণে মাংসাশী। আমাদের দেশের অধিবাসীবৃন্দও যে মাংস ভোজন করেন না, এমন নহে—তবে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংস ভক্ষণ প্রতিদিন না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে।

মৎস্য।—মৎস্যের গুণ আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—মৎস্য—সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট কিন্তু মৎস্য ভক্ষণে কফ ও পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে মৎস্য বিশেষ হিতকর। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আরও বলেন,—মৎস্যাশী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয় না। নানাপ্রকার মৎস্য আছে, নিম্নে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

রোহিত মৎস্য।—ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বাতঘ্ন। অর্দ্দিত নামক বাতব্যাধিতে এবং ঊর্দ্ধজক্রগত অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পীড়ায় বিশেষ হিতকর।

কাতল মৎস্য।—আমাদের দেশে ইহা কাৎলা নামে অভিহিত। ইহা ত্রিদোষ নাশক।

মৃদ্গাল মৎস্য।—আমাদের দেশে ইহার নাম —মিরগেল। ইহার গুণ রোহিত মৎস্যের অনুরূপ।

পাঠীনঃ বা বোয়াল।—ইহা বলবর্দ্ধক কিন্তু কফজনক। ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, অধিক পরিমাণে সেবন করিলে রক্ত ও পিত্ত দূষিত হয় এবং কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শৃঙ্গী বা শিঙ্গী মাছ।—ইহা বায়ু শান্তিকর, স্নিগ্ধ কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপক।

ইল্লিশ বা ইলিশ।—ইহা অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু এবং পিত্তনাশক, কিন্তু কফকর।

ভাকুট বা ভেটকী মাছ।—ইহা শুক্রজনক, খাইতে অতিশয় রুচিপ্রদ, পিত্তনাশক কিন্তু ইহা বেশী খাইলে আমবাত হয় এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ হইয়া থাকে।

শিলিন্দ বা সিলন মৎস্য।—আসাম অঞ্চলে ইহার নাম পুঙ্গা। ইহা বলবর্দ্ধক, বায়ুপিত্ত নাশক কিন্তু শ্লেষ্মকর ও আমবাত উপস্থিত করিয়া থাকে।

কবিকা বা কই মাছ।—ইহা রুচিকর, কফ প্রশমক, বায়ু নাশক এবং আগ্নেয়, কিন্তু কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

বর্ম্মিন বা বাইন মাছ।—ইহা রক্তপিত্ত নাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

আড়িম বা আড় মাছ।—ইহা বায়ু এবং কফ প্রকোপক।

মদগুর বা মাগুর মাছ।—ইহা শুক্রকারক, স্নিগ্ধ এবং মল সংগ্রাহক।

ত্রিকণ্টক বা টেংরা মাছ।—ইহা কফ নাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং পিত্ত নাশক।

প্রোষ্ঠী বা পুঁটি মাছ।—ইহা শুক্রজনক

কফ এবং বায়ু নাশক, কণ্ঠগত রোগ নাশক এবং লঘু। এই পুঁটি মাছ দুই প্রকার। যেগুলি বড়—সেগুলির আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বৃহৎ শফরী। ইহা মুখগত এবং কণ্ঠগত রোগ সকল দূর করিয়া থাকে।

ভঙ্গকী বা ভেলে মাছ।—ইহা শুক্রজনক কিন্তু শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চিত্রফল ও চিতল মৎস্য।—ইহা শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

কুলিশ বা বেলে মাছ।—ইহা বায়ু রোগে হিতকর, অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, লঘু ও মল সংগ্রাহক।

বায়ুষ বা কালবোস্ মাছ।—ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক কিন্তু বায়ুবর্দ্ধক।

শকুল বা শোল মাছ।—ইহা রক্তপিত্ত নাশক।

চিঙ্গড় বা চিঙ্গড়ী মাছ।—ইহা শুক্রজনক, বলবর্দ্ধক, রুচিকর, মেদ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক, কিন্তু কফ-বাত বর্দ্ধক।

চন্দ্রক বা চাঁদা মাছ।—বলবর্দ্ধক।

চাপিলা বা খয়রা মাছ।—ইহা বাতপিত্ত নাশক, শুক্রজনক, বলবর্দ্ধক কিন্তু শ্লেষ্ম প্রকোপক।

মলঙ্গী বা মৌরলা মাছ।—ইহা বায়ু নাশক কিন্তু শ্লেষ্মকারক।

ফলি বা ফলুই মৎস্য।—ইহা বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

খলিশ বা খলিশা মাছ।—বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল এবং আম বিনাশক এবং বলকারক।

পর্ব্বত বা পাবদা মাছ।—শুক্রজনক, বায়ু নাশক ও বলকর।

বাচ বা বাচা মাছ।—বায়ু পিত্ত নাশক কিন্তু শ্লেষ্মকর।

গবাটী বা পাকাল মাছ।—ইহা শ্লেষ্ম প্রকোপক এবং অজীর্ণ কারক।

মাছের ডিম।—ইহা অতিশয় শুক্রকর, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, মেহনাশক, কফ এবং মেদোবর্দ্ধক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—মাছের ডিমে অধিক পরিমাণে 'নিউক্লিন' থাকে বলিয়া ইহা বাতগ্রস্ত লোকের পক্ষে উপযোগী নহে, নতুবা ইহা অতিশয় সারবান খাদ্য।

মৎস্য বেশী সারবান কিনা?—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—মৎস্যে ফস্‌ফরাস্ ঘটিত লবণ বেশী পরিমাণে থাকে, এজন্য যাঁহারা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মৎস্যের প্রকার ভেদ।—সাধারণতঃ মৎস্য দুই জাতীয়, এক সাদা, অপর মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ। সাদা মৎস্য অপেক্ষা যে সকল মৎস্যের মাংস কাটিলে লালবর্ণ দেখায়, সেইগুলি খাইতেও সুস্বাদু এবং অধিক পুষ্টিকর—কিন্তু সাদা রঙের মৎস্য অপেক্ষা ইহা গুরুপাক। সাদা মৎস্যের মধ্যে বাটা, পুঁটি, মৌরলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, এগুলি সহজ পাচ্য, অল্প পুষ্টিকর, এজন্য রোগীর পথ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৎস্যের মধ্যে রুই, কাৎলা প্রভৃতির নাম করিতে পারা যায়। রোগীর পক্ষে শিঙ্গী, মাগুর এবং কই বেশী উপকারী, কারণ এ সকল মৎস্যে বসার ভাগ কম। ইলিস, চিংড়ি বিশেষতঃ গলদা চিংড়ি এবং পার্শে এবং ভেট্‌কী—অতিশয় দুষ্পাচ্য, এজন্য অধিক খাওয়া উচিত নহে।

লোণামাছ ও শুষ্ক মাছ।—লোণা মাছ ও শুকনা মাছ অতিশয় অপকারী। ইহার দুষ্পাচ্য এবং স্বাস্থ্যের অপচয়কারক।

মৎস্য কিরূপ ভাবে খাওয়া উচিত? সাধারণ গৃহস্থ সংসারে মৎস্য অল্প তৈল দিয়া ভাজা হয়, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ছাঁকা তৈলে মৎস্য ভাজা উচিত, তাহাতে মৎস্যের সারাংশ নষ্ট হয় না। মাছ অধিকক্ষণ সিদ্ধ করাও ঠিক নহে, তাহাতে উহার ছানা জাতীয় উপাদান জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইয়া পড়ে—এবং এই জন্য ইহা দুষ্পাচ্য

হইয়া থাকে। মৎস্যের তরকারী করিবার পূর্ব্বে মৎস্যকে ফুটন্ত গরম জলে যদি একবার:ফেলিয়া এবং ২।৩ মিনিট পরে তুলিয়া লইয়া তরকারির সহিত মৃদু আলে সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহা সহজ পাচ্য হইয়া থাকে।

কয়েক প্রকার মৎস্যের বিশ্লেষণে যে সকল উপাদান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে :—

মৎস্য	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	কোথায় পরীক্ষিত
বিলাতী মৎস্য (White fish)	৭৮.০	১৮.১	২.৯	•	১.০	পার্কস্‌
সামন (Salmon)	৪৬.৯	১২.১	৬,৭	•	১.০	গাটিয়ার
ঐ লোণা …	৪৬.০	২০.০	১০.৮	•	১৭.২	"
হেরিংস (Herrings Salted)	২৮.০	১৪.০	১৪.০	•	১০.০	"
ইলিশ …	৭৬.৩৩	১৪.৮৫	৯.২৩	• •	.৯৫	জে, এন, মৈত্র
রুই (পুকুরের) …	…	১৭.৫	৭.৪	•	…	মেডিকেল কলেজ
রুই … …	৭৬.৬০	১৮.২৫	৯.৫৬	•	১.৪২	জে, এন, মৈত্র
মৃগেল, (ছাল, কাঁটা প্রভৃতি বাদে)	৮০.১	১৮.০৭	.৩৩	•	১.০৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন
কই (ছাল, কাঁটা বাদে) …	৮১.৮৩	১৮,৭৩	.৪২	•	১.০৬	জে, এন, মৈত্র
মাগুর (ছাল, কাঁটা বাদে) …	৭৮.৮৫	১৯.৪৯	.৫	•	১.৩	সায়েন্স এসোসিয়েসন
ভেটকি (ছাল, কাঁটা বাদে) …	৭৭.২৭	১৬.২৬	৪.১২	•	.৮৪	জে, এন, মৈত্র
টেংরা (ছাল, কাঁটা বাদে) …	৭৭.৭	১৭.২৮	.৩	•	১.১৫	সায়েন্স এসোসিয়েসন
পার্শে (ছাল, কাঁটা বাদে) …	…	১৫.৭২	৬.৩২	•	.৯৭	জে, এন, মৈত্র
তপসে (Mango fish) …	৭৭.৮২	১৬.৭৬	৪.১২	•	.৮৩	"
গলদা চিংড়ি (মুড়া বাদে) …	৮৩.০৫	১৫.৭৫	.৪৮	•	.৯০	সায়েন্স এসোসিয়েসন

ডিম্ব।—ডিম্ব পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু গুরুপাক। ইহাতে সলফার (গন্ধক) এবং ফস্‌ফসারেরর পরিমাণ অধিক, এই জন্যই জীর্ণ হইতে বিলম্ব ঘটে। আমাদের দেশে হংস ডিম্বেরই প্রচলন বেশী। এই ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে ছানা জাতীয় ও মাখন জাতীয় উপাদান বর্ত্তমান। এজন্য ডিম প্রত্যহ খাইলে ছানা ও মাখন জাতীয় উপাদান দ্বারা শরীরের পোষণ কার্য্য উত্তমরূপ সাধিত হইতে পারে। অনেকে ডিম্ব সিদ্ধ না করিয়া কাঁচা অবস্থায় খাইয়া থাকেন, ইহা খাইতে সুস্বাদু নহে, কিন্তু অধিক পুষ্টিকর। কাঁচা ডিম অপেক্ষা অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম হজম করিতে একটু বেশী

সময় লাগে বটে, কিন্তু শরীর পুষ্টির পক্ষে ইহাও কম নহে।

অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া এবং অধিক মসলা দিয়া খাইলে উহা জীর্ণ করিতে সময় লাগে। এজন্য যাহাদের হজম শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে অধিক সিদ্ধ ডিম্ব না খাইয়া অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব একটু গোল মরিচের গুঁড়া ও লবণসহ মিশাইয়া খাইলে বিশেষ ভাবে শরীর পুষ্টির কার্য্য করিয়া থাকে।

ডিম্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত।—বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, ডিম্বের শ্বেতবর্ণ অংশে আমিষ উপাদান এবং পীতাংশে স্নেহ উপাদান অধিক এবং জলীয় ভাগ কম ও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ উপাদান বর্ত্তমান। এই জন্যই শ্বেতাংশ অপেক্ষা পীতাংশ জীর্ণ করিতে বেশী সময় লাগে। ডিম্ব পরিপাক হইলে সম্পূর্ণরূপে শরীরে শোষিত হয়, এই জন্যই ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, কারণ ইহাতে যে ফসফরাস আছে—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন ক্যালসিয়ম এবং লৌহ ঘটিত লবণ উপাদান থাকার জন্যই ইহা সহজে রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের কথা।—আয়ুর্ব্বেদে ডিম্বের প্রকার ভেদের কথা নাই, কিন্তু পক্ষী ডিম্বের উল্লেখ আছে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে,—

নাতি স্নিগ্ধানি বৃষ্যানি স্বাদুপাকরসানি চ ;
বাতঘ্নান্যতি শুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম ॥

অর্থাৎ পক্ষি ডিম্ব—অনতিস্নিগ্ধ বৃষ্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, বাতঘ্ন, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

সাধারণের কথা।—সাধারণের ধারণা হংস ডিম্ব অধিক খাইলে বাত রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। ইহা ভুল ধারণা। হংস ডিম্ব অপেক্ষা কুক্কুট ডিম্ব অধিক বলকর—ইহাও অনেকের ধারণা,—ইহাও ভুল। প্রকৃত পক্ষে কুক্কুট ডিম্ব অপেক্ষা হংস ডিম্বের পুষ্টিকারিতা শক্তি অনেক অধিক এবং হংসডিম্ব ভক্ষণের ফলে বাত রোগে আক্রান্ত হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ২০টি ডিম্ব ও একসের মাংস—একইরূপ পুষ্টিকর।

মাংস—আয়ুর্ব্বেদে মাংসের গুণ যথেষ্ট বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ ॥

অর্থাৎ সকল প্রকার মাংসই বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিপ্রদ, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস ও মধুর বিপাক।

আয়ুর্ব্বেদে মাংসের প্রাধান্য।—আয়ুর্ব্বেদ সকল প্রকার মাংসের পুষ্টিকারিতা-শক্তির উল্লেখ করিলেও পশু মাংসাপেক্ষা পক্ষীর মাংসের অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে পক্ষী মাংস, পশু মাংস অপেক্ষা লঘু, এজন্য সহজ পথ্য। পারাবতের মাংস যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী দিগের জন্য চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইহা রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন ও বীর্য্যবর্দ্ধক। কুক্কুটমাংসের গুণও আয়ুর্ব্বেদ যথেষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বলকর। তবে বন্য না হইয়া গৃহপালিত হইলে হিন্দুর পক্ষে অখাদ্য।

পশুর মাংস।—পশুর মাংসের মধ্যে ছাগমাংসের প্রচলনই অধিক। আয়ুর্ব্বেদেও ইহার যথেষ্ট গুণ বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতি শীতমদাহিত্বাৎ স্বাদুপীনস নাশনম্ ॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।

অর্থাৎ ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, মধুর বিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুররস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক।

অবস্থাভেদে গুণ ভেদ।—অবস্থাভেদে এই ছাগমাংসের নানাপ্রকার গুণ বর্ণিত আছে, যথা,—

অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্।
শুষ্ক কাসে হ্রুকচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্॥
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্॥
মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্ গুরু।
স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ॥
বৃদ্ধস্য বাতলং কক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
উর্দ্ধজত্রু বিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্॥

অর্থাৎ **অপ্রসূতা ছাগীর মাংস**—পীনস নাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা শুষ্ক কাস, অরুচি ও শোষ রোগে হিতকর। **কচি ছাগমাংস**—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। **খাসী ছাগের মাংস**—কফজনক, গুরু, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংস বর্দ্ধক ও বাতপিত্ত নাশক। **বৃদ্ধ এবং ব্যাধিগ্রস্ত ছাগের মাংস**—বাতজনক ও গুরু। **ছাগীমুণ্ড**—উর্দ্ধ জত্রুগত রোগ নাশক ও রুচিপ্রদ।

মেষমাংস।—মেষমাংসও অনেকে খাকেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—ইহা পুষ্টিকর কিন্তু পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু। আয়ুর্ব্বেদের মতে মেষের মাংস বাসি হইলে কিছু লঘু হইয়া থাকে।

হরিণের মাংস।—ইহা অগ্নিদীপক, সন্নিপাত নাশক, শীতবীর্য্য, লঘু, মধুর রস, মধুর বিপাক, সুগন্ধি এবং মলমূত্রের রোধক।

খরগোসের মাংস।—ইহা শীতবীর্য্য, লঘু, সংগ্রাহক, মধুর রস, সর্ব্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক এবং কফ পিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাসরোগ নাশক।

কচ্ছপ মাংস।—বলসন্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং পুংস্ত্ব কারক।

মাংস সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মত।—আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মাংসে তিন ভাগ জল ও একভাগ সার উপাদান বর্ত্তমান। সারভাগের মধ্যে আবার আমিষ উপাদানই অধিক এবং মাংসে শালি উপাদান একেবারেই নাই। আমিষ উপাদান অধিক থাকার জন্যই মাংসের পুষ্টিকারিতা শক্তি বেশী।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে কয়েক প্রকার মাংসের মধ্যে যে সকল উপাদান বর্ত্তমান, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইতেছে :—

মাংস	জল	ছানা জাতীয়	মাখন জাতীয়	শর্করা জাতীয়	লবণ জাতীয়	কোথায় পরীক্ষিত
ছাগ মাংস … …	…	২৪.৬	২.৫	০	১.২	মেডিকেল কলেজ
হরিণ মাংস … …	৭৫.৭	১৯.৭	১.৯	০	১.১	হচিনসন
মেষ মাংস (অস্থিসহ স্থুলকায় মেষের)	৪০.৭	১৩.৫	৩৩.২	০	০৮	পটিযায়
মেষ মাংস (নাতি স্থুলকায়)	৫২.০	১৬.০	১৬.০	০	১.০	„
কুক্কুট মাংস (foul) …	৭০.০	২৩.১	৩.১	০	১.০	„
কাঁচা মাংসের কাথ …	…	১.৮	…	…	…	মেডিকেল কলেজ
রোষ্ট মাংস (Roast) ..	৫৪.০	২৭.৬	১৫.৪৫	০	২.৯৫	রাঙ্ক

মাংস প্রস্তুতের বিধি।—মাংস সাধারণতঃ যেরূপভাবে ঘৃত ও মসলাদির সহ প্রস্তুত করা হয়—তাহা হজম করিতে আরও বিলম্ব ঘটে, এজন্য অল্প মসলা দিয়া অধিকক্ষণ মাংস সিদ্ধ করিয়া লইলে উহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পরিপাক হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণ এদেশের উপযোগী কি না ?—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার বৈজ্ঞানিকগণই মাংসের শরীর পুষ্টির যথেষ্ট পরিমাণে গুণ বর্ণনা করিয়া থাইলেও মাংস আমাদের দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষে ঠিক উপযোগী খাদ্য নহে, কারণ বাঙ্গালাদেশ সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, প্রত্যহ মাংস ভক্ষণ কোনক্রমেই শরীরের পক্ষে উপযোগী নহে। মাংস সারবান পদার্থ হইলেও ইহা শীত প্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পক্ষেই সম্যক উপযোগী। বাঙ্গালাদেশে শীতকালে ইহা ভোজন করিলে শারীরিক উন্নতি ঘটিতে পারে।

কলম্বী বা কলমী শাক

[কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র দত্ত শর্ম্মা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী]

কলম্বী বা কলমী শাক বাঙালীর বিশেষ পরিচিত। শাকান্নভোজী বাঙালীর নিকট কলম্বীশাক নিতান্ত মন্দ খাদ্য নহে। এই শাক স্বয়ং বা অপর দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগে মানবের যে কল্যাণ সাধন করে, তৎসম্বন্ধে যাহা আমার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আছে, তাহা আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। এ সম্বন্ধে তাঁহাদেরও যদি কোন বিষয় জানা থাকে, তাহা প্রকাশ করিবেন—এই আমার অনুরোধ। কলমীশাকের গুণ সম্বন্ধে দ্রব্যগুণে যাহা উক্ত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

'কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যন্তে তদ্গুণা যথা।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥'

কলম্বী ও শতপর্ব্বা কলমীশাকের নামান্তর। কলম্বী স্তন্যজনক, মধুর রস ও শুক্রবর্দ্ধক। প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অপ্রাচুর্য্যে বা অভাব হইলে কলমী শাক ভাজা বা কলমীশাকের ঝোল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। স্তনদুগ্ধকারক বেণামূল, ইক্ষু, কুশমূল, গন্ধতৃণ, ইকড়মূল প্রভৃতির সহিত প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। মহর্ষি সুশ্রুত স্তন্য উৎপাদনার্থ কলমীশাক, শতমূল, কেশুর প্রভৃতি সেবন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পারদদুষ্ট রোগীকে ঘৃতে ভাজা কলমীশাক খাওয়াইয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। সমূল কলমীশাকের রসে মাণিক্যরস পারদদুষ্ট রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। বসন্তের দাহ নিবারণের জন্য কলমীশাকের রস সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে দাহ শান্তি হয়। কলমীশাকের অগ্রভাগ (ডগা) ও আদা বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে বিষাউজ (কাউর ঘা) ভাল হয়।

অম্ল—শঙ্খভস্ম ৵০ আনা ও কলমীশাকের রস এক তোলা পরিমাণ একবারে পান করিলে আশ্চর্য্য উপকার করে। সকল প্রকার অম্লরোগীকে ইহা ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

শুক্রতারল্যে ও ধ্বজভঙ্গে—আলকুশী-বীজ চূর্ণ।০ সিকি, কলমী শাকের রস ২ তোলা ও মধু ১০ ফোঁটা সেবন করিলে উপকার দর্শে।

ফোঁড়া, বাগী, ব্রণ প্রভৃতির মুখ না হইলে—কলমী শাকের মূল ও অগ্রভাগ এবং পান্তা (বাষ্টি) ভাত সমভাগে লইয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখ হইবে, ইহা বহু পরীক্ষিত। কোন স্থলেই ব্যবহার করাইয়া হতাশ হইতে হয় নাই।

বিছা বা মৌমাছি দংশন করিলে—কলমীর রসে উপকার হয়। একবার একটি বালককে বিছা কামড়াইয়াছিল, তাহাতে, তাহার মাতা কলমীশাকের ডাঁটা ঐ স্থানে ঘর্ষণ করে, আশ্চর্য্যের বিষয় ৫।৭ মিনিটের মধ্যে বালকের জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়াছিল।

আফিং সেবনে বিষাক্ত হইলে—যদি বুঝা যায় যে রোগীর উদরে আফিং গলিয়া যায় নাই—তবে প্রচুর পরিমাণে কলমীশাকের রস খাইতে দিবে। তাহাতে বমি হইয়া সহজেই আফিং উঠিয়া যাইবে।

কলমীশাকের ঝোল খাওয়াইলে বসন্তের গুটি সকল ঝাড়িয়া বাহির হয়।

উপদংশ ও ফিরঙ্গ রোগের সহজ চিকিৎসা

[কবিরাজ শ্রীরাজনারায়ণ দাস কবিভূষণ]

উপদংশ (গর্মির) কারণ।—লিঙ্গে হস্ত বা নখদন্তাদির আঘাত, অত্যধিক মৈথুন, মৈথুনান্তে লিঙ্গনাল ধৌত না করা বা ক্ষার মিশ্রিত উষ্ণজলে ধৌত করা এবং ব্রহ্মচারিণী কিম্বা দূষিত যোনি স্ত্রী গমনাদি বিবিধ কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগে প্রথমতঃ পুংঅঙ্গ ফুলিয়া উঠে ও লিঙ্গমুণ্ডে বা তৎ আবারক চর্ম্মের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা জন্মে, তৎপরে ক্রমশঃ ঐ পিড়কা গুলি পাকিয়া উঠে ও তাহা হইতে বিবিধ যন্ত্রণার সহিত পূয এবং জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে কাহারও কাহারও কুচকিতে বেদনা ও বাগী হইতে দেখা যায়।

এই অতীব লজ্জাকর ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্র চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে ক্রমে ক্ষত বর্দ্ধিত হইয়া শিশ্ন ক্ষয় ও জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

উপদংশ ক্ষতে প্রলেপাদি প্রয়োগের পূর্ব্বে জাতী, নিম্ব কিম্বা জয়ন্তী পত্র সিদ্ধ জলে প্রত্যহ ২।৩ বার ক্ষতস্থান প্রক্ষালন করা বিধেয়।

ক্ষতে অত্যন্ত ক্লেদাদি সঞ্চিত হইলে গেরিমাটি জল সহ ঘর্ষণ করিয়া একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতের উপর স্থাপন করিবে এবং শুকাইবার পূর্ব্বেই তুলিয়া লইবে, ইহাতে উপদংশের ক্ষত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—(১) শ্বেত ধুনা চূর্ণ—মাখনের সহিত মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় হইলে জলদ্বারা ধৌত করতঃ কাচ বা পাথরের পাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ দুইবেলা ইহার প্রলেপ প্রয়োগ করিলে উপদংশক্ষত শীঘ্র প্রশমিত হয়।

(২) বুচির গোপানের শিকড় মধুসহ মর্দ্দন করতঃ ক্ষতের উপর স্থাপন করিয়া বাল্সান পান বা কচি কলাপাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপদংশক্ষতে অসামান্য উপকার পাওয়া যায়,—ইহাতে ক্লেদাদি দূরীভূত হইয়া ক্ষত পূরিয়া উঠে।

(৩) সমভাগ রসাঞ্জন ও শিরীষ ছাল চূর্ণ, মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে সর্ব্ববিধ উপদংশের লিঙ্গক্ষত অচিরে বিদূরিত হইয়া থাকে।

(৪) নর কপালের পুরাতন অস্থি জলসহ শিলায় ঘষিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে উপদংশ ক্ষত সত্বর নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয়।

হস্তিশুণ্ডাদ্য ঘৃত—এক বৎসর স্থিত পুরাতন গব্যঘৃত ।॰ এক পোয়া, জল ।১র একসের, কুঞ্চিত হাতিশুঁড়ার শিকড়ের ছাল ও নাটা করঞ্জার ডগা সমভাবে মোট একছটাক, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া নীরস হইলে ছাঁকিয়া লইবে, অতঃপর ইহার সহিত মুদ্রাশঙ্খের সূক্ষ্ম চূর্ণ সিকি ভরি মিশাইয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে উৎকট উপদংশক্ষত সত্বর প্রশমিত হয়।

কর্পূরাদি ঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।॰ এক-পোয়া, কর্পূর অর্দ্ধতোলা ও জাঙ্গালে দুই তোলা—একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ একখানি সাদা কাগজে লেপন করিয়া পলিতা প্রস্তুত করিবে, অনন্তর একটি লম্বা চিমটা দ্বারা ঐ পলিতাটি ধরিয়া জ্বালিয়া দিয়া একখানি পাথরের পাত্রের উপর হেলাইয়া ধরিবে, ইহাতে ঐ পলিতা, হইতে ঘৃত জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হইলেই ঘৃত প্রস্তুত হইল। এই ঘৃত লেপন করিলে উপদংশ ক্ষত আশু উপশমিত হয়।

প্রত্যহ প্রাতে ২ তোলা মাত্রায় কুকশিমার (কুকুর শোঁকার) কিম্বা কলমী ডগের রস পান করিলে উপদংশে অসাধারণ উপকার দর্শে।

পটোলাদি কষায়—পলতা, নিমছাল, বহেড়া, আমলকী হরীতকী ও গুলঞ্চ সমভাগে মিলিত ২ তোলা ।৷॰ আধ সের জলে পাক করিয়া ।৶॰ আধ পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। এই কাথে।॰ চারি আনা মাত্রায় শোধিত গুগ্‌গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নিত্য প্রাতে সেবন করিলে উপদংশ রোগে সমধিক উপকার হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গ (সব্রিষ্ঠ পার্ণিম)—ফিরঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহবাস বা গাত্রসংস্পর্শে কিম্বা ফোটকাদি হইতে স্রাবিত রস-পুয প্রভৃতি কোনরূপে অন্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বিশেষতঃ উক্ত রোগগ্রস্থিতা রমণীর সংসর্গে এই উৎকট সংক্রামক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ লিঙ্গমুণ্ডে বা তাহার আচ্ছাদক চর্ম্মের নীচে পীড়কা উদ্গত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষতে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে পুযাদি নিঃসৃত হইতে থাকে; পুংঅঙ্গ অত্যধিক স্ফীত হইয়া উঠে ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধির উপরিভাগে ব্রধ্ন (বাগী) উপস্থিত হয়। ইহাতে কাহারওকাহারও মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

এই রোগে স্ত্রীলোকের যোনিওষ্ঠের অভ্যন্তরে ক্ষত ও তাহা হইতে রসাদি স্রাব হইতে থাকে, ভগোষ্ঠ ফুলিয়া উঠে এবং কুচ্‌কির ঊর্দ্ধভাগে বাগী প্রকাশ পায়।

এই পীড়ায় প্রায়শঃ রোগীর জ্বর, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, সন্ধিস্থলে শোথ এবং সমস্ত শরীরে কণ্ডু, পিড়কা ও ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকটিত হইয়া থাকে।

ইহার বর্দ্ধিতাবস্থা অতীব ভয়ঙ্কর, ইহাতে তালু, ওষ্ঠ, নাসারন্ধ্রে ক্ষত, অস্থিশোষ, অস্থিবেদনা ও বক্রতা এবং নাসাভঙ্গ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

সুচিকিৎসার অভাবে ইহার বিষ শরীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া নানাবিধ রোগোৎপাদন করিয়া থাকে এবং পরিশেষে সন্তান-সন্ততিগণকেও আক্রমণ করে।

এই দুর্দ্দমনীয় ব্যাধি সঞ্জাত মাত্র লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক—ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মুষ্টিযোগাদি ব্যবহার করিয়া ক্ষত শুকাইয়া গেলে রোগ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। অন্ততঃ ৫।৬ মাস সুপথ্যাশী হইয়া শাস্ত্রীয় সারিবাদ্যারিষ্ট, অনন্তাদ্যঘৃত ও অনন্তাদ্যাবলেহ প্রভৃতি পুষ্টি ও রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা—সমভাগ বীজ রহিত বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী কিম্বা জাতী, জয়ন্তী, করবীর, আকন্দ ও সোঁদাল ইহাদের পাতার কাথ অথবা কেবল নিম্বপত্র সিদ্ধ জলে প্রত্যহ ২।৩বার ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ প্রলেপাদি ব্যবহার করা বিধেয়।

শ্বেত করবীর মূল জল সহ ঘর্ষণ করিয়া নিত্য ২।৩ বার প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য উপদংশ ও ফিরঙ্গক্ষত শীঘ্র প্রশমিত হয়।

শিয়াল কাঁটার শিকড় জলের সহিত নিষ্পেষণ করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করিলে ফিরঙ্গ ক্ষত আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

শোধিত রসাঞ্জনচূর্ণ—মধু সহ মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে উপদংশ ও ফিরঙ্গের লিঙ্গ ক্ষত অচিরে দূরীভূত হয়।

চতুর্গুণ গন্ধকের সহিত জাঙ্গালে পুটদগ্ধ করিয়া শ্বেতাভ হইলে সেই ভস্ম—ঘৃতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ, ফিরঙ্গ ও অন্যান্য দূষিত ক্ষত সকল নিশ্চিত নিবারিত হয়,—ইহার ক্ষতনাশক শক্তি অসাধারণ।

রসচন্দন যোগ—রসকর্পূর অর্দ্ধ ভরি এবং ছাগীদুগ্ধে ঘষা শ্বেতচন্দন ।০ অর্দ্ধ ভরি একত্রে শ্বেতচন্দন কাষ্ঠের দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মলমের ন্যায় হইলে ইহা একটী পানের পটীতে মাখাইয়া প্রয়োগ করিলে উপদংশ ও ফিরঙ্গের শিশ্নক্ষত নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয়।

নাগদন্ত্যাদ্য ঘৃত—হাতিশুঁড়ো, ভূতভৈরবী ও শ্বেত করবীর—ইহাদের শিকড়ের ছাল সমভাগে মিলিত এক ছটাক, এক পোয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে অনন্তর এই ঘৃতের সহিত ৵০ দুই আনা তুঁতের শ্বেত ভস্ম ও ৵০ দুই আনা মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ মিশাইয়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপদংশ ও ফিরঙ্গ জনিত লিঙ্গক্ষত সত্বর বিদূরিত হয়।

অমৃতাদ্য তৈল—গুলঞ্চ, নিম্বপত্র, ছাতিম ছাল ও ছোট গোয়ালে লতার মূল সমভাগে মিলিত এক ছটাক, এক পোয়া খাঁটী সরিষার তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈলে পুরাতন তুলা ভিজাইয়া স্থাপন পূর্ব্বক একটী বল্সান পানের আবরণ দিয়া বাঁধিয়া পুংঅঙ্গে রাখিলে উপদংশ ও ফিরঙ্গক্ষতের উপশম হয়।

তোপচিনি প্রয়োগ—প্রত্যহ ৵০ আনা মাত্রায় তোপচিনি চূর্ণ—মধুসহ সেবন করিলে ফিরঙ্গরোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

তোপচিনি সেবন করিয়া কদাচ লবণ ভক্ষণ করিবে না। ইহা পরিত্যাগে একান্ত অশক্ত হইলে, অল্প মাত্রায় সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করিবে।

তিক্তকাদি কষায়—পলতা, কট্কী, নিমছাল, তোপচিনি ও অনন্তমূল সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৷৷০ সের শেষ ৷৵০ পোয়া, প্রত্যহ প্রাতে এই ক্বাথ সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগে অশেষ উপকার পাওয়া যায়—ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকর ও রক্তদোষ নাশক।

ফিরঙ্গজনিত মেহে—বটের কোমল ঝরি ।০ সিকি ভরি, কিম্বা লাল ক্ষীরুই এর শিকড় ৵০ দুই আনা মাত্রায় কাঁচা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া নিত্য সেবন করিলে ফিরঙ্গাশ্রিত মেহের নিবৃত্তি হয়।

গোধূমাদ্য বটী।—গোধূম চূর্ণ বা ময়দা ও ফটকিরীর খই সমভাগ একত্রে জল সহ মর্দ্দন করিয়া ৪ চারি রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে ইহার এক একটি বটী—বাসি জল কিম্বা গুলঞ্চের রসের সহিত সেবন করিলে ফিরঙ্গ-মেহের শান্তি হয়।

উপদংশ ও ফিরঙ্গে ব্রধ্ন বা বাগী:—উপদংশে কুঁচকিতে এবং ফিরঙ্গ রোগে কুঁচ্কির উপরি ভাগে বাগী উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপদংশের বাগী—প্রলেপাদি ব্যবহারে সত্বর পাকে বা বসিয়া যায়, কিন্তু ফিরঙ্গের বাগী সহজে পাকে না বা বসে না। ইহা প্রলেপাদির দ্বারা বসান অপেক্ষা যাহাতে পাকিয়া পূয়াদির সহিত শরীরস্থ বিষ বহির্গত হইয়া যায়—তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য।

গোধূম কিম্বা কুন্দুরুখোটী—মেষী দুগ্ধে পেষণ করতঃ ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্নের (বাগীর) বেদনা ও শোথ আশু নিবৃত্তি হয়।

জয়ন্তীপাতা কিম্বা সজিনা-মূলের ছাল—বিনাজলে

বাটিয়া অল্প গরম করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ (বাগী) সত্বর বিনষ্ট হয়।

আফুলা হাতিশুঁড়ার পাতা—বিনাজলে বাটিয়া ৩,৪ বার দিনে প্রলেপ প্রয়োগ করিলে অথবা গন্ধ বিরজা একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় মাথাইয়া অল্প গরম করিয়া বসাইয়া দিলে ব্রণের বেদনা ও শোথ শীঘ্র নিবারিত হয়।

ব্রণ পাকিবার উপক্রম হইলে।—তেলাকুচা, কৃষ্ণকলি ও রাখালশশা—ইহাদের কোন একটির মূল জল সহ বাটিয়া কিম্বা তীক্ষ্ণ শিমূল কাঁটা গোদুগ্ধে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ পাকিয়া যায়।

ছোট গোয়ালের লতার পাতা অথবা কাঁচা হলুদ ও নারকুলী গাছ—বিনাজলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা জলে তোকমারী ভিজাইয়া বসাইয়া দিলে ব্রণশোথ সত্বর পাকিয়া উঠে।

পক্ক ব্রণ স্বয়ং বিদীর্ণ না হইলে।—করবীরমূলের ছাল—জলের সহিত বাটিয়া কিম্বা জলসহ অনন্তমূল ঘষিয়া অল্প পরিসর স্থানে প্রলেপ দিলে পক্ব ব্রণ ফাটিয়া যায়।

কৃষ্ণ কলির পাতা গোদুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা জল সহ দোনস্ত ঘষিয়া বিন্দু মাত্র প্রয়োগ করিলে সেই স্থান বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি বহির্গত হইয়া যায়।

ব্রণের ক্ষত নিবারণের জন্য।—প্রত্যহ দুইবেলা নিম্ব পত্র সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান উত্তম রূপে ধৌত করতঃ প্রলেপাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হাতিশুঁড়ার শিকড়ের ছাল পোড়াইয়া সেই ছাই তিল তৈল সহ মর্দ্দন করিয়া প্রয়োগ করিলে পূয়াদি পরিষ্কৃত হইয়া ক্ষত পুরিয়া উঠে।

জাতী ও নিম্বপত্র, প্রয়োজন মত গব্যঘৃতে ভাজিয়া (যেন চুঁয়িয়া না যায়) ঐ ঘৃতের সহিত পাতা গুলি মর্দ্দন করিয়া মলমের ন্যায় প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ইহা একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় উহা মাথাইয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ ক্ষত আশু উপশমিত হয়।

রসোনাদ্য ঘৃত।—রসোন ও বাজবরণের শাঁস সমভাগে মিলিত এক ছটাক, ।৵০ একপোয়া পুরাতন গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃতে পুরাতন তুলা ভিজাইয়া ক্ষতে স্থাপন পূর্ব্বক একটি কলপান পানের আবরণ দিয়া রাখিলে ব্রণক্ষত নিশ্চিত নিবারিত হইয়া থাকে।

ব্রণে নাড়ীব্রণ (নালীঘা) হইলে—নারিকেলের কোমল শিকড়—মধুসহ মর্দ্দন করিয়া ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণের শান্তি হয়।

মাণকচুর শিকড় নালী মধ্যে পূরণ করিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্র পূরিয়া উঠে।

খদির ও শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্ববিধ নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয়।

চিত্রক ঘৃত—কুট্টিত চিতামূল এক ছটাক, ।৵০ এক পোয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে, অনন্তর ইহার সহিত ৵০ দুই আনা ওজনে তুঁতের শ্বেত ভস্ম মিশ্রিত করিয়া তুলার পলিতায় মাথাইয়া ক্ষত মধ্যে প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য নাড়ীব্রণ (নালীঘা) আরোগ্য হয়।

জাতী পত্রাদি তৈল—জাতী ও নিম্বপত্র এবং ছোট গোয়ালে লতার মূল্য ।৵০ এক পোয়া খাঁটি সরিষার তৈলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই তৈলে তুলা ভিজাইয়া প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ ও অন্যান্য দূষিত ক্ষত সকল সত্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

ফিরঙ্গে গাত্র কণ্ডু ও পীড়কা ক্ষতে—দূর্ব্বারসে দারুহরিদ্রা কিম্বা শ্বেত চন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দিলে গাত্র কণ্ডু প্রশমিত হয়।

ডালিম পাতার রসে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া লেপন করিলে কণ্ডু ও পিড়কা ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে।

গুড়ুচ্যাদি ক্ষত—রেড়ীর তৈল ।৵০ অর্দ্ধ পোয়া ও পুরাতন গব্যঘৃত ।৵০ অর্দ্ধ পোয়া, কুটিত পদ্ম গুলঞ্চ এবং নিম্বপত্র সমভাগে মিলিত এক ছটাক,

পাকার্থ জল ৴১ এক সের একত্রে যথারীতি পাক করিয়া নীরস হইলে ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘৃত বাহ্য প্রয়োগ করিলে গাত্রকণ্ডু ও পিড়কাক্ষত আশু উপশমিত হয়। ইহা পারদবিকৃতি ক্ষতেরও মহৌষধ।

উপদংশ ও ফিরঙ্গ রোগের পথ্যাপথ্য—প্রাতে—পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, ছোলা ও অড়হর ডাইলের যুষ, পলতা, পটোল, বেগুন, ডুমুর, কচি মুলা, কাঁচা কলা, থোড়, মোচা, কপি, উচ্ছে, করলা, গোলআলু প্রভৃতি দ্রব্যের ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন। অল্প দুগ্ধ।

রাত্রিতে—ক্ষুধানুসারে সাগু, বার্লি, খৈয়ের মণ্ড, লুচি বা রুটী ও পূর্ব্বোক্ত তরকারী সেব্য।

গরম জল শীতল করিয়া স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে। স্নান যত কম হয়, ততই ভাল।

নূতন চাউলের অন্ন, কলায়ের ডাল, কোন প্রকার শাক, অম্ল, মিষ্ট ও গুরুপাক দ্রব্য মৎস্য, মাংস, লঙ্কার ঝাল, সর্ষপতৈল, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, মল মূত্রের বেগ ধারণ, মৈথুন, প্রবল বায়ু ও শৈত্য সেবন ও শীতল জলে স্নান প্রভৃতি পরিত্যাজ্য।

আয়ুর্ব্বেদের কথা

(শ্রীনিরঞ্জন সেন শর্ম্মা)

রোগ পঙ্কার্ণবে মগ্নং যঃ সমুদ্ধরতে নরম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চিৎ পূজাং ন সোঽর্হতি॥

প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদের গৌরব ও প্রভাব দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে পৃথিবীর অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। পুণ্য মহর্ষিগণের অনুকম্পায় কত চিকিৎসক স্বল্প জ্ঞানীই হউন আর বহুজ্ঞানীই হউন এই বিশাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কণামাত্র জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতি গ্রাম, নগর, পল্লীতে অসংখ্য রোগীর প্রাণরক্ষা করিয়া পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ করিতেছেন। অনেক ঘটনা বিপর্য্যয়ে যদিও বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদের পুরাতন গৌরব কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তবুও আয়ুর্ব্বেদের সাক্ষাৎ উজ্জ্বল বহু প্রাণদায়ক প্রমাণের দ্বারা শিক্ষিত জনসমাজে দিন দিন উহার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ বিশাল ও প্রত্যক্ষ শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন মহিমার কথা স্মরণ করিলেও আমাদের বহু উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসকে আমরা চারিভাগে বিভক্ত করিতে পারি (১) বৈদিক যুগ (২) আর্য্যযুগ ও মৌলিক গবেষণাকাল (৩) সিদ্ধ সম্প্রদায় কাল (৪) আয়ুর্ব্বেদের ধ্বংসারম্ভ এবং সংগ্রহ ও প্রতিসংস্কার।

আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ।

যেরূপ নিয়মে আহার বিহারাদি করিলে মনুষ্য সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে এবং যেরূপ চিকিৎসার দ্বারা রোগমুক্ত হইতে পারা যায়, আয়ুর্ব্বেদে তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—এই উভয় উদ্দেশ্যের জন্য এই শাস্ত্র আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখ সাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥

এই আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব, ভেষজ, চিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি

নানা বিষয় বেদের বিভিন্নস্থানে উল্লেখিত আছে দৃষ্ট হয়। এই শাস্ত্রকে মুনি ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"তদিদং শশ্বতং পুণ্যং স্বর্গ্যং যশস্যমায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি।"—এবম্বিধ আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—ব্রহ্মা ধ্যানের দ্বারা এই শাস্ত্র আয়ত্ত করেন এবং তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে শিক্ষা দেন ; তাঁহার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় শিক্ষালাভ করেন, ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট শিক্ষা করেন। অতঃপর মর্ত্ত্যধামে ব্যাধিপীড়িত মানবের দুঃখ নিবারণের জন্য দয়াপরবশ হইয়া ঋষিগণ হিমালয়ের পদপ্রান্তে সম্মিলিত হইয়া ভরদ্বাজ মুনিকে ইন্দ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন এবং অন্য এক সময়ে কাশীরাজ ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট বিশেষভাবে শল্যচিকিৎসা ও গর্ভিণী চিকিৎসা শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া ভরদ্বাজ সম্প্রদায় School of Physicians এবং ধন্বন্তরি সম্প্রদায় School of Surgeons নামীয় দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

ভরদ্বাজ সম্প্রদায়ের ৬ ছয় জন শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর হারীত এবং ক্ষারপাণি প্রত্যেকে এক একটী আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণের মধ্যে সুশ্রুত, ভোজ, ঔপধেনব, ঔরভ্র, পুষ্কলাবত, গোপুররক্ষিত প্রভৃতি শিষ্যেরা শল্যচিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদে মৌলিক গবেষণাদির দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থাদি সঙ্কলিত করা হয়। এই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আটভাগে বিভক্ত।

(১) **শল্য**—শস্ত্রসাধ্য ব্যাধির নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসাবিধি, যন্ত্র-শস্ত্র সমূহের লক্ষণ, অগ্নি, ক্ষার, জলৌকা, রক্তমোক্ষণ ও শস্ত্রাদি প্রয়োগের প্রণালী সমূহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(২) **শালাক্য**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি ঊর্দ্ধজত্রু গতরোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) **কায় চিকিৎসা**—রোগ প্রতিষেধক ও রোগ নিবারক ভেষজ চিকিৎসা—জ্বর, অতিসার, কাস, যক্ষ্মা, মেহ প্রভৃতি রোগের নিদান, পূর্ব্বরূপরূপ সম্প্রাপ্তি,—ভেষজ প্রয়োগ ও তত্তৎরোগের পথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা এই বিভাগে করা হইয়াছে।

(৪) **ভূতবিদ্যা**—উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি মানসিক রোগ চিকিৎসা।

(৫) **কৌমারভৃত্য**—শিশুপালন, বালরোগবিজ্ঞান, বালরোগ চিকিৎসা প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(৬) **অগদতন্ত্র**—স্থাবর জঙ্গম বিষ, সর্পাদি দংশন প্রভৃতি বিষ চিকিৎসা এই বিভাগের আলোচ্য বিষয়।

(৭) **রসায়ণ**—জরাব্যাধি বিনাশক, যৌবন ও আয়ুবৃদ্ধিকর ঔষধাদির বিবরণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে এই বিভাগে বলা হইয়াছে।

(৮) **বাজীকরণ**—দুষ্ট শুক্র, অল্পশুক্র, ক্ষীণশুক্র হইলে তাহার চিকিৎসা ও সুস্থব্যক্তির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির উপায়াদি এই বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকালে "সিদ্ধ" অথবা "রাসায়ণিক সম্প্রদায় নামক ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। তাঁহারা নানাবিধ খনিজ দ্রব্যাদি প্রয়োগ সম্বন্ধে গবেষণাদি করিয়া উহা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারা বিশেষভাবে রস চিকিৎসার সহায় গ্রহণ করেন। রস প্রয়োগ ও লৌহ, বঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ ধাতব ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে নানা প্রকার গ্রন্থাদি সঙ্কলন করিয়া এই সম্প্রদায় আয়ুর্ব্বেদের আর এক যুগ প্রবর্ত্তন করেন। দক্ষিণ ভারতে এই সম্প্রদায়ের বহুল প্রচার আছে—তবে বঙ্গদেশে চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থে ভেষজ ও রস চিকিৎসা একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পরে এবং সিথিয়ন, গ্রীক মুসলমানের উপর্য্যুপরি ভারত আক্রমণের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদের ধ্বংসারম্ভ হয়। এতদ্কালে অশোকের রাজত্ব

সময়ে শববাবচ্ছেদ একেবারেই লোপ পায়। বাগ্‌ভট্ট শার্ঙ্গধর প্রভৃতি মনীষি গ্রন্থকারগণ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর সংহিতা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর চক্রপাণি, ভাবমিশ্র বঙ্গদেশ ও কণৌজ হইতে চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ নামক দুইটী অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উপকার করেন। ভাবমিশ্রের গ্রন্থে আধুনিক ফিরঙ্গরোগ সম্বন্ধে ও অহিফেন প্রয়োগ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিগত আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের বৃদ্ধি ও প্রসার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—মিশর, আরব প্রভৃতি দেশে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ ও চিকিৎসা প্রণালী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ গৌরবের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মাত্র তাহার একাঙ্গ কায় চিকিৎসাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সঙ্কীর্ণতার দরুণ পাশ্চাত্য চিকিৎসক সম্প্রদায়ে ইহাকে অনেক বিষয়ে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত। পুনরায় এই গৌরব উদ্ধার করিতে হইলে বিশেষ যত্নসহকারে যাহাতে অষ্টাঙ্গের সম্যক্ শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয় তাহাই প্রধান কর্ত্তব্য। শল্য চিকিৎসাদি বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গের যথাযথ বিবরণ যদিও আমাদের সুশ্রুতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে—যদিও পুরাকালে ইহার চর্চ্চা বিশেষরূপেই ছিল তবুও বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিয়া ইহার সংস্কার বিশেষ প্রয়োজন। তবে রাজশক্তির সাহায্য ভিন্ন এই শিক্ষাদানের সম্যক্ ব্যবস্থারও হইতে পারে না। তবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমুদয় বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের প্রভূত চেষ্টা সাধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই চিকিৎসা শাস্ত্রের সারবত্তা সম্যকরূপে অজ্ঞাত হইয়া আজ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত, যাঁহারা এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে বদ্ধ পরিকর—যাঁহারা কালের পরিবর্ত্তনে ধ্বস্ত, বিধ্বস্ত বিলুপ্ত প্রায়—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের গৌরব উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন—যাঁহারা বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গসমূহের পুনপ্রবর্ত্তনের জন্য অমূল্য গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন—বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বর্ণিত যে কায়চিকিৎসার একটী অঙ্গকেই বুঝায় না—যাঁহারা এই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আশৈশব সংস্কৃত ভাষায় চেষ্টা করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন এবং তাঁহারাই সম্পূর্ণাঙ্গের জন্য উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া—যাঁহারা পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক নিগূঢ় তত্বাদি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই এই বিলুপ্তপ্রায় শাস্ত্রের গৌরব পুনরুদ্ধার হইবে ইহা সুনিশ্চিত। কাজেই বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভ কাল বলা যাইতে পারে।

গণোরিয়া ও সিফিলিস্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন)

সিফিলিস্।—গণোরিয়া বা উপসর্গিক মেহের চিকিৎসার কথা গত বারে বলিয়াছি, এই বার উপদংশ বা সিফিলিসের কথা বলিব ; এই উপদংশ বা সিফিলিস রোগ আমাদের দেশে যে ছিল না—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দুরন্ত ব্যাধি আমাদের দেশে হইল না বলিয়া ইহার চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থগুলিতেও লিখিত হয় নাই। মহামতি ভাবমিশ্রের সময়ে এই রোগ ফিরঙ্গ দেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানি হয়।

এবং সেইজন্য "ভাব প্রকাশে" এই রোগের বিবরণ পাওয়া যায়। ভাবমিশ্র যে ইহার নাম দিয়াছেন "ফিরঙ্গ রোগ" তাহার কৈফিয়তে তিনি বলিয়াছেন,—

ফিরঙ্গ সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যস্তবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ।

অর্থাৎ ফিরঙ্গ দেশে এই রোগ অধিক পরিমাণে হয়, একারণ ইহাকে ফিরঙ্গ বলে।

প্রকৃত পক্ষে ইহা আমাদের দেশের ব্যাধি নহে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেই ইহার বহুল পরিমাণে উৎপত্তির এবং বিস্তারের কথা অবগত হওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই রোগ হইতে যে সকল ভীষণ পরিণাম প্রাপ্ত রোগীর পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই বিলাতী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এ সকল ঘটনার অধিকাংশ বিলাতী হাঁসপাতাল সমূহের রিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম নহে। বিলাতের মত এ দেশেও এই রোগের পরিণামে অনেক পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

চিকিৎসায় পাশ্চাত্য মত।—এই রোগের চিকিৎসায় পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় পারদের প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পারদই ইহার একমাত্র ঔষধ। এমন কি, তাঁহাদের মতে পারদ ব্যবহার না করাইলে এই ভীষণ রোগ কিছুতেই আরোগ্য হইবার উপায় নাই।

এডিনবরার চিকিৎসকদিগের মত পার্থক্য।—ইউরোপের সমস্ত চিকিৎসকই উপদংশ বা সিফিলিস রোগে পারদ ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী কিন্তু এডিন্‌বরার চিকিৎসকমণ্ডলীর মত ভিন্ন প্রকার। তাঁহারা বলেন, এই অবস্থায় পারদ ব্যবহার করিলে রোগ আরও ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে। ডাঃ হাণ্টারের নাম এই বিরুদ্ধ মতের পরিপোষক দিগের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, উপদংশ রোগে পারদ ব্যবহার করিলে উহার সহিত আরও নূতন রোগ উপস্থিত হইতে পারে।

পারদের বিরুদ্ধবাদী অন্যান্য চিকিৎসক।—পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উপদংশ রোগে শুধু যে দুই একজন চিকিৎসকই অভিমত প্রদান করিয়াছেন, এমন নহে, পারদ ব্যবহারের বিরুদ্ধবাদী বহু চিকিৎসকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জর্ম্মন দেশীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্যারেনস্প্রং, হামবার্গ হাঁসপাতালের ডাক্তার, ফিক্ ভায়না ইন্‌ফারমারি চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হারমান, স্কচ্ দেশীয় ডাক্তার বেনেট্ প্রভৃতি বহু চিকিৎসকই উপদংশ রোগে পারা ব্যবহারের এইরূপ নানারূপ দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সারাংশ এইরূপ—পারদ ব্যবহারে হয়তো সাময়িক রোগ আরোগ্য হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু রোগকে ইহাদ্বারা কিছু দিনের জন্য চাপা দেওয়া হয় মাত্র, পারদের চিকিৎসায় কিছুদিন পরে আবার এই রোগ ভীষণ ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশে উপদংশ চিকিৎসা।—কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে পারদ ব্যবহারের যতই মতানৈক্য থাকুক, পাশ্চাত্য চিকিৎসায় উপদংশ রোগে পারদেরই আদর বিশেষ ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। তবে চিকিৎসার প্রকরণ বিধির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আগে উপদংশ রোগে বহুল পরিমাণে পারদ ব্যবহার করান হইত, তাহাতে তাড়াতাড়ি রোগ সারিয়া যাইলেও কিছুদিন পরে আবার ভীষণ ভাবে উহা প্রকাশ পাইত। এখন বেশী পরিমাণে উহা ব্যবহার না করাইয়া অল্প মাত্রায় উহা প্রয়োগ করা হয় এবং তাহার ফল শুভজনকই হইয়া থাকে।

পারদের পিচকারি।—"হাইপোডারমিক" নামে পারদের পিচকারি চর্ম্মের উপর প্রবেশ করাইয়া দিয়া ডাক্তারেরা এখন বিশেষ ফল পাইয়া থাকেন। দার্জ্জিলিংয়ের সুবিখ্যাত সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার "লড" বহুল গবেষণা দ্বারা ইহা আবিষ্কার

করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এই উপায়ে ইন্‌জেকসন দিলে ১ মাস হইতে ২ মাসের মধ্যে উপদংশ বিষ শরীর হইতে দূর হইয়া যায় এবং কস্মিন কালে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

ভাবমিশ্রের মত—মহামতি ভাবমিশ্রও এই রোগে পারদ ব্যবহারের বিশেষরূপ মতই প্রদান করিয়াছেন। ভাবমিশ্র বলেন,—

ফিরঙ্গ সংজ্ঞকং রোগং রসকর্পূর সঞ্জকঃ
অবশ্যং নাশয়েদেবমূচুঃ পূর্ব্বচিকিৎসকাঃ ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালের চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, রসকর্পূর নামক ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয়ই ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পূর্ব্বে আমাদের দেশে এই রোগ ছিল না, সুতরাং ভাবমিশ্র যে পূর্ব্বকালের চিকিৎসক বলিয়া কাহাদের উল্লেখ করিলেন, তাহাও ভাল বুঝা যায় না। "পূর্ব্বকালের চিকিৎসক" অর্থে তাহার সময়ে যখন এই রোগ আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসকেরা পারদ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া সুফল দেখাইতেন।" ইহাই যদি বুঝায়, তাহা হইলে তাঁহার এই উক্তির মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে।

রসকর্পূর।—পূর্ব্বোক্ত ভাবমিশ্র তাঁহার মতে ফিরঙ্গ রোগ বা এখনকার সিফিলিস রোগে রসকর্পূর নামক ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে রসকর্পূর ব্যবহারের বিধি এইরূপ,—

গোধূম চূর্ণ সলিলে বিলোড্য সূক্ষ্ম কূপিকাম্।
তন্মধ্যে নিক্ষিপেৎ সূতং চতুর্গুঞ্জামিতং ভিষক্ ॥
ততস্তু বটিকাং কুর্য্যাদ্যথা ন দৃশ্যতে বহিঃ।
সূক্ষ্ম চূর্ণে লবঙ্গস্য তাং বটিমবগুণ্ঠয়েৎ।
দন্তস্পর্শো যথা ন স্যাৎ তথা তামম্ভসা গিলেৎ।
তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ পশ্চাচ্ছাকাম্ললবণং ত্যজেৎ।
শ্রমমাতপসঞ্চারং বিশেষাৎ স্ত্রীনিষেবণম্।

অর্থাৎ গোধূম চূর্ণ করিয়া একটি ছোট বটিকা (মণ্ড) প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ৪ চারিরতি রসকর্পূর নিক্ষেপ করিবে, পরে কূপিকা দ্বারা রসকর্পূরের আবরক স্বরূপ গোলাকৃতি একটি বটিকা করিবে, যেন উহা দৃষ্টিপথে পতিত হইতে না পারে। তাহার পরে লবঙ্গের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ ঐ বটীর চারিপার্শ্বে প্রক্ষেপ করিয়া জল সহ গিলিয়া ভক্ষণ করিবে। যাহাতে উহা দন্তসংলগ্ন না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তাহার পরে একটি তাম্বুল (পান) খাইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম রৌদ্র সেবন এবং পথ পর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

রসকর্পূর প্রস্তুত করিবার বিধি—

তত্র পারদস্য সংক্ষিপ্তং শোধনং কথ্যতাম্।
শুদ্ধ সূত সমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধাঃ।
ইষ্টিকাং খটিকাং শুক্তং স্ফটিকাং সিন্ধুজন্ম চ ॥
বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকাং।
সর্ব্বাণ্যেতানি সঞ্চূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ ॥
এভিঃসঞ্চূর্ণ্য খল্বে স্বং সূতং যাবদ্‌যামং চতুষ্টয়ম্।
তচ্চূর্ণ সহিতং সূতং স্থাল্যামধ্যে পরিক্ষিপেৎ।
তস্যাঃ স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্
সর্ব্বত্র পুটিত মৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্।
ততো মুদ্রাং বিশোষ্যাথ ভূয়ঃ সংশোষ্য দাপয়েৎ।
ধাম্নি বিশোষ্য চ স্থালীং চুল্ল্যাং নিধারয়েৎ।
তস্যা নিরন্তরং দদ্যাদ্বহ্নিং দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্যন্ত্রং স্থাপয়েদহর্নিশম্ ॥
স্বাঙ্গশীতলমুত্তার্য্য ঊর্দ্ধস্থাল্যাগতং রসম্।
কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াৎ যত্নতঃ বুধঃ।
তদেতৎ কুসুমং প্রোক্তং কর্পূরাখ্যং রসোত্তমম্।
সেবনাদ্ধরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং রোগান্‌ বহূনপি।

পারদের সমান গেরিমাটি, ইষ্টক, খড়ি, ফট্‌কিরি, বাল্মীমাটি, সৈন্ধব, চক্ষুশুক্তা ও ক্ষার লবণ—পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই সমুদয় চূর্ণ ও একভাগ পারদ একত্র মর্দ্দিত করিয়া এক এক প্রহর কাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মিশ্রিত চূর্ণ একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটি হাঁড়ি উপুড় করিয়া চাপা দিবে। মিলিত মুখদ্বয় বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপ ২।৩ বার লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া চুল্লীর উপর যন্ত্র স্থাপন করিবে। ক্রমশঃ অগ্নি তীব্রতর করিবে। এইরূপ ক্রমাগত ৪ দিন পাক করিয়া পঞ্চম দিবসে অহোরাত্র অঙ্গারোপরি স্থাপন করিয়া রাখিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ ও যন্ত্র শীতল হইলে অবতরণ করিয়া ঊর্দ্ধস্থালীগত কর্পূরবৎ নির্ম্মল রস গ্রহণীয়। ইহা সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নাশ হয়। মাত্রা ১ রতি।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ

করপোরেসনের সাহায্য—যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালায় এবার কলিকাতা করপোরেশন সর্ব্বসমেত ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্র পীঠে দেড় হাজার টাকা এবং গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে দেড় হাজার টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে করপোরেসন যে এইরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহারা দেশের লোকের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্ব্বেদীয় আরোগ্য-শালা।—হাঁসপাতালের জন্য সংপ্রতি নিম্নলিখিত দান গুলি পাওয়া গিয়াছে :—

(১) রাজা হৃষিকেশ লাহা সি, আই, ই, ১০০০৲

(২) ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তুলসীদাস জিউরাজ—পঞ্চাশ টাকার খাদ্যদ্রব্য এবং হাঁসপাতালের জন্য ১টি আলমারি।

(৩) সুকিয়াষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু—২ মণ চাউল।

(৪) ৪৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫৲।

(৫) কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা শতকরা ৩া০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০০০৲।

(৬) শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫০৲।

(৭) শ্রীযুক্ত অনিলনাথ বসু পাঁচশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২০০৲।

(৮) শ্রীযুক্ত অটল কুমার সেন ১০০৲।

(৯) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ১০০৲।

(১০) শ্রীযুক্ত অশোকচন্দ্র রক্ষিত "শ্রীমার্কা ঘৃত" অর্দ্ধ মণ।

(১১) কে, সি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সর্ব্বাধিকারিগণ—প্রতি মাসে ৬ কৌটা বার্লি দানের প্রতিশ্রুতির মধ্যে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের দরুণ ১৮ কৌটা।

মাদকদ্রব্য নিবারণী সভা।—কয়েকদিন পূর্ব্বে উত্তর কলিকাতা মাদক নিবারণী সমিতির উদ্যোগে মহারাজা কাশীমবাজারের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি তাহাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

স্বাস্থ্যসমিতি।—কলিকাতার ১নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য সমিতির কার্য্য খুব ভালরূপেই চলিতেছে। সমিতির কর্ম্মকর্ত্তৃগণ এজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। সমিতির এই ওয়ার্ডে একটি এলোপ্যাথিক এবং একটি কবিরাজী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ২টি চিকিৎসালয়েই রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন যথেষ্ট হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য সমিতির অন্যান্য ওয়ার্ডে কবিরাজী চিকিৎসালয়ের অভাব। আমরা এজন্য সকল ওয়ার্ডের কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা।—কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার নূতন কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ১৬নং গ্রে ষ্ট্রীটে। ইহার কার্য্য ভালরূপেই চলিতেছে। অনেক কবিরাজ মহাশয়ই কিন্তু এই সভার এখনো সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন নাই। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের মেডিকেল ক্লাবের মেম্বর কিন্তু অনেক ডাক্তারই ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ সভার মেম্বর হইবার জন্য কবিরাজদিগকে অনুরোধ করিতে হয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের পক্ষে লজ্জার কথা বলিতে হইল।